ভারত-ইতিহাস চর্চার ভূমিকা

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৯৫

প্রকাশক : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১২
টাইপসেট : অভিনব মুদ্রণ
৭৪ হরি ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৬
মুদ্রণ : দে'জ অফসেট
৩/২ মহেশ্বরতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

ভারত সোভিয়েত সৌহার্দ্যের প্রতি—

সূচিপত্র

পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা

এ বইয়ের পরিমার্জনের জন্য, পেশাদার ঐতিহাসিকদের সমালোচনা থেকে যতুটুকু শেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু আশা করেছিলাম। ভারত-ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য ক্ষেত্রানুসন্ধানের সর্বোচ্চ গুরুত্বের কথাটা মনে হয় তাঁদের একেবারেই চোখ এড়িয়ে গেছে। এই ধরনের ক্ষেত্রানুসন্ধানের কাজ আন্তঃসম্পর্কযুক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত ঃ প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্ব। তিনটির প্রত্যেকটির জন্যই প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান, স্থানীয় কথ্যরীতিকে আয়ত্ত করার ক্ষমতা এবং উপজাতিমানুষ ও সেইসঙ্গে কৃষকদের আস্থা অর্জন। প্রতিটি ক্ষেত্রানুসন্ধানে প্রয়োজন হলো সন্ধানের সূত্র ধরেই একটা প্রকরণ এবং বিশ্লেষণ-পদ্ধতির বিকাশ ঘটানো। পর্যবেক্ষণগুলিকে কোন অপরিবর্তনীয়, পূর্বধারণাকৃত ছাঁচে ফেলে দেওয়াটা মারাত্মক ক্ষতিকর। ঠিকভাবে ঠিক প্রশ্ন করার কৌশলটা মাটি থেকে ছাড়া আয়ত্ত করা বা শেখানো যায় না। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে পৌঁছনোর জন্য যে গাড়িই ব্যবহার করা হোক না কেন, প্রকৃত সমীক্ষার কাজটা করা যায় কেবলমাত্র পায়ে হেঁটেই।

কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে খননকাজের সঙ্গে অঞ্চলের খনন কাজের তফাৎ হয় এই যে খোঁড়ার কাজটা করতে হয় অল্পই, কিন্তু বিস্তৃত ক্ষেত্রটা ঢাকা থাকে। এ কাজের অপরিহার্য হাতিয়ার হলো ছেনি আঁটার আংটাসহ একটা শক্তপোক্ত দন্ড—যা দিয়ে শিল্পকৃতিগুলিকে খুঁড়ে তোলা হয়। এই দন্ডটি পরিমাপক বা অন্বেষণ দন্ড ইত্যাদি হিসেবে কাজে লাগে এবং সেইসঙ্গে আরো বেশি উচ্চাভিলাষী গ্রামীণ কুকুর বা ক্বচিৎ আসা লুঠেরাদের নিরস্ত করতেও। খুঁড়ে তোলা সামগ্রীর প্রাচীনত্ব নির্ণয় এবং স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস, অতিকথা বা লোককাহিনীগুলির সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখাটাই প্রধান কাজ। খননের স্থান নির্বাচন সঠিক হলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে এবং তাতে কম খরচে বেশি তথ্য পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে বাস্তব কৌশল O.G.S. Gawford তাঁর চমৎকার গ্রন্থ *Archaeology in the Field* গ্রন্থে বিবৃত করেছেন ভারতীয় অঞ্চলে তার প্রয়োগ না-ও চলতে পারে।

একইভাবে, সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং 'অনুসন্ধানী ভাষাতত্ত্ব' (*Enquete Linguistique*)-এর যে প্রচলিত ছাঁচ—তারও যথেষ্ট ও ধারাবাহিক পরিবর্তন না ঘটালে এখানে প্রয়োগযোগ্য না হতে পারে। আমাদের অনেকেই স্বপ্ন দেখেন ক্যামেরা ও ডার্করুম, টেপ রেকর্ডার, নৃতাত্ত্বিক ও রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার ল্যাবরেটরি বা এইরকম আরও অনেককিছু সমেত একটা সম্পূর্ণ সুসজ্জিত ভ্রাম্যমান শিবিরের। ঠিকভাবে ব্যবহার করলে এ থেকে চমৎকার ফল না পাওয়ার কোন কারণ নেই। সাধারণভাবে অবশ্য, শৌখিন সাজসরঞ্জাম দিয়ে অন্য কিছু লোকদেখানো বা মনোহর উদ্দেশ্য (যেমন, কোন মেডিকেল ইউনিটের ঘুরে বেড়ানো) সাধন না হলে শুধুই উত্তেজনাকর লোভ বা সন্দেহ এবং রাশিরাশি ভুল তথ্যের জন্মের মধ্য দিয়ে সমীক্ষকের লক্ষ্যটি হারিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই ঘটে না।

আবার, অক্ষর-পূর্ব ইতিহাসকে খুঁজে পেতে মাটিতে কাজ করার কোন বিকল্প নেই। ভারতবর্ষের মতো কোন দেশের ক্ষেত্রে যেখানে একদিকে লিখিত সূত্র অতি অল্প এবং ত্রুটিপূর্ণ, অন্যদিকে স্থানিক বৈচিত্র্যগুলি অবর্ণনীয় রকমের বিপুল সেখানে এই পদ্ধতি সমস্ত ঐতিহাসিক কালপর্বের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পুনা — ডি ডি কোসাম্বি

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ভারতবর্ষের ইতিহাস হিসেবে এ-বই নিজেকে জাহির করতে চায় না, এটা নিছকই ভারত-ইতিহাসকে বোঝার এক আধুনিক প্রয়াস—লেখা হয়েছে এই আশায় যে পাঠক হয়ত নিজের প্রয়োজনেই সেই ইতিহাসকে বুঝতে উদ্বুদ্ধ হবেন, বা অন্তত আর একটু সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে দেশটার দিকে তাকাতে সক্ষম হবেন। সেই লক্ষ্য থেকেই, আমার নিজস্ব (অবশ্যই সীমাবদ্ধ) অভিজ্ঞতা ও পাঠের ওপর ভিত্তি করে, দৃষ্টান্তগুলিকে নেওয়া হয়েছে নিবিড়ভাবে, বিপুলভাবে নয়। সেগুলি খুবই সহজ-সরল দৃষ্টান্ত—এমনই যে, আন্তরিক ক্ষেত্রানুসন্ধান থেকে যে কেউই তা খুঁজে পেতে পারেন, এবং তার প্রত্যেকটিই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। সন্দেহ নেই, এর চেয়ে ভালো চিত্র হয়ত পাঠক নিজেই পাবেন তাঁর প্রতিবেশীদের জীবন ও আচরণের মধ্যে বা তাঁর অঞ্চলে টিকে থাকা প্রাচীনত্বের অবশেষগুলির মধ্যে। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোটা খুব সহজ কাজ নয়। বহু প্রজন্মব্যাপী নিষ্ঠুরতম দারিদ্র ও শোষণের যে মানসিক বাধা তার সাথে যুক্ত হয় গরম, ধূলো-কাদা আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ঠিকভাবে করতে পারলে এ কাজ উদ্দীপক হয়ে উঠতে পারে—এমনকী তাঁদের কাছেও যাঁদের ধৈর্য শেষসীমায় গিয়ে পৌঁছেছে বা হাতপায়ের জোড়গুলো বয়ঃজনিত যন্ত্রণায় আর বাঁকতে চায় না। এই ধরনের ক্ষেত্রানুসন্ধান চালাতে হয় এক বিশ্লেষণমূলক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে—কোনকিছুকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে বা বিশ্বাসী চোখে দেখলে চলে না এবং নাকউঁচু ভাব, আবেগতাড়িত সংস্কার প্রয়াস বা মেকি নেতৃত্বের মানসিকতাটা ছাড়তে হয়—কেননা এগুলোই আমাদের অধিকাংশের কাছে বাজে পাঠ্যবই ছাড়া অন্য কোনকিছু থেকে কিছু শেখার পথের প্রতিবন্ধক।

ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় দর্শন, জটিল ধর্মমত, অলংকৃত সাহিত্য, কারুকার্য মন্ডিত স্মৃতিস্তম্ভ, বা ব্যঞ্জনাময় সঙ্গীত—এ সবই সৃষ্টি হয়েছিল সেই একই ঐতিহাসিক কার্যকারণসূত্র থেকে যা থেকে জন্ম নিয়েছিল গ্রামজনতার ক্ষুধার্ত নিস্পৃহতা, 'সংস্কৃতিবান' শ্রেণীর কান্ডজ্ঞানহীন সুবিধাবাদ ও ঘুনপোকার মতো লোভ, শ্রমিকদের মধ্যেকার সংহতিহীন চাপা অসন্তোষ, সাধারণ অনৈতিকতা, দুঃখ, দারিদ্র্য এবং যথেচ্ছ কুসংস্কার। এর একটি আর একটির ফলশ্রুতি, একে অপরের বহিঃপ্রকাশ। আদিমতম উপকরণসমূহ যে অকিঞ্চিৎকর উদ্বৃত্ত উৎপাদন করেছিল তার দখল নিয়েছিল সংশ্লিষ্ট এক আদিম সমাজরীতি। এই রীতিই মুষ্টিমেয় মানুষকে লালন করেছিল সেই মার্জিত অবকাশে—যেটাকে তারা ধরে নিয়েছিল দুর্দশাক্লিষ্ট অগণন সংখ্যাগরিষ্ঠের তুলনায় তাদের সহজাত শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে। ইতিহাস যে কিছু অসংলগ্ন ঘটনার অনুক্রম নয় বরং প্রাত্যহিকতার প্রয়োজন মেটাতে মানুষই তাকে সৃষ্টি করেছিল তা উপলব্ধি করার জন্য এই কথাটা মাথায় রাখা দরকার। আরও স্পষ্ট হবার জন্য ইতিহাসকে অবশ্যই প্রতিফলন করতে হয়—স্বার্থতৃপ্তির জন্য অজস্রের বলিদানের মধ্য দিয়ে সীমিতের সাফল্যকে নয়—বরং মানুষের সেই অগ্রগতিকে যা প্রয়োজনের তাগিদে সকলের সহযোগিতায় সে সম্ভব করেছিল। অন্য দেশগুলির কথিত সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাদের জুতোর গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া 'শতচ্ছিন্ন-ট্রাউজার পরিহিত মানবদরদীদের' কল্যাণে। ভারতবর্ষে এদের সমগোত্রীয়েরা ট্রাউজার বা জুতোর মতো তেমন কিছু জোগাড় করতে পারেনি।

কোন দর্শন প্রবক্তা, ঝকমকে রাজাবাদশা, সেনাপতি, পুঁজি মালিক, বা বক্তৃতাবাজ-রা নয়, বরং এই ধরনের পশ্চাদপদ, অজ্ঞ, সাধারণ মানুষই চিরকাল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতে অবশ্যই তারা ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করবে এমনটা ভাবাকে মনে হতে পারে এক ধৃষ্ট প্রকরণ-সর্বস্বতা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা সত্য। শ্রেণীবিভক্ত কোন সমাজে ইতিহাস গবেষণার অর্থ হলো উপরের শ্রেণীগুলির স্বার্থ এবং বাকি জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যেকার পার্থক্যগুলির বিশ্লেষণ; এর অর্থ সেই পরিসরটিকে মাথায় রাখা যেখানে কোনো নবোদ্ভূত শ্রেণী ক্ষমতায় আসাকালীন নতুন কিছু অবদান রেখেছিল, এবং সেই পরিস্থিতির—যখন সে তার কায়েমী স্বার্থকে রক্ষার জন্য প্রতিক্রিয়ায় পিছু হটেছিল (বা হঠবে)।

কিছু পাঠক তর্ক তুলবেন যে, মানুষ শুধুমাত্র উদরপূর্তিতেই বেঁচে থাকে না এবং নিজের শাশ্বত আত্মায় ব্যক্তিমানুষের নিয়ন্ত্রণের উপরই ইতিহাস ও সমাজ উভয়ই নির্ভরশীল; বস্তুবাদ সমস্ত মানবিক মূল্যবোধকেই ধ্বংস করছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, উদরপূর্তি ছাড়াও আবার মানুষ বাঁচে না—সেটা তার আত্মাকে (যদি তেমন কিছু থাকে) দেহের মধ্যে ধরে রাখার জন্যে একান্ত প্রয়োজন। অনেক মানুষের সমাহারেই কোন সমাজ গঠিত হয় তখন, এবং কেবলমাত্র তখনই, যখন মানুষ কোন-না-কোনভাবে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত হয়। এই আবশ্যিক সম্পর্কটা জ্ঞাতিত্বমূলক নয়, বরং তার চেয়ে আরও ব্যাপক; অর্থাৎ উৎপাদন ও পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে যা গড়ে ওঠে। সেই নির্দিষ্ট সমাজের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয় কোন্‌টাকে সে প্রয়োজনীয় মনে করছে তার দ্বারা; জিনিসপত্র কে দখলে রাখে? কারা উৎপাদন করে? কি কি উপকরণ দিয়ে? অন্যের উৎপাদনে কারা বাঁচে? কোন্ অধিকারে—ঐশ্বরিক না আইনসম্মত? (ধর্মবিশ্বাস ও আইনগুলি সমাজেরই উপজাত।) হাতিয়ার, জমি, এবং কখনও কখনও উৎপাদকের দেহ ও আত্মার মালিক কে? উদ্বৃত্তের বিলি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে কারা? বা যোগানের পরিমাণ ও ধরনকে? *সমাজ একত্রে বাঁধা থাকে উৎপাদনের বাঁধনে।* বস্তুবাদ, মানবিক মূল্যবোধগুলিকে ধ্বংস করা তো দূরের কথা, বরং দেখায় কীভাবে তারা সমকালীন সামাজিক অবস্থাগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মূল্যের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে। মূল্যের মতো ভাষাও (যা ছাড়া ভাববাদীরা তাঁদের আত্মাকে ধারণা করতে পারবেন না) জন্ম নিয়েছিল দ্রব্যের বিনিময়-সম্পর্ক—যা নিয়ে গিয়েছিল ভাবের আদানপ্রদানের দিকে—তার মধ্য দিয়ে। কোন গরুর গাড়ির দেশে দু'হাজার বছর আগে বিকশিত এক 'শাশ্বত' ভাবাদর্শকে দিয়ে কোন দার্শনিকপ্রবর এক যান্ত্রিক জগতকে তাঁর মনের মতো করে পুনর্গঠন করতে পারেন না।

আজকের ভারতে শাসন, তথা সর্বোচ্চ ক্ষমতায় যারা আছে তারা হলো ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। এই শ্রেণীর অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে—যা প্রাথমিকভাবে ইতিহাসের ধারা বেয়েই এসেছে। ভারতীয় বুর্জোয়ারা প্রকরণগতভাবে পশ্চাদপদ। এদের উৎপাদন (এবং মানসিকতা) এখনও পর্যন্ত বহুল পরিমাণে পাতিবুর্জোয়াদের মতোই। পথঘাটহীন অজস্র গ্রামগঞ্জের মধ্যেকার নৈরাশ্যব্যঞ্জক অপর্যাপ্ত সংযোগ ব্যবস্থার দিকে ওপর থেকে একবার তাকালেই এ কথাটা বোঝা যায়। এ দেশের সরকার পুঁজি-সম্পদের সর্ববৃহৎ মালিকানা এবং যেখানে ইচ্ছা হয়েছে সেখানেই একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে এক অদ্ভুত অবস্থানে বিরাজ করছে। এটা বাহ্যত দেশের প্রকৃত প্রয়োজন ও তার ব্যক্ত সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর পাতি-বুর্জোয়া ও ধনকুবের অংশগুলির অর্থগৃধ্নুতাকে মেলানোর দায়বদ্ধতার

কারণে এক নিরঙ্কুশ ক্ষমতাভোগ। আরও একটা কথা হলো, ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় এসেছে অনেক দেরিতে—এমন একটা সময়ে যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের সমগোত্রীয়দের ব্যর্থতা ও সংকট ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে পড়েছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলি এবং ভবিষ্যত ঐতিহাসিক বিকাশে সেগুলির সম্ভাব্য প্রভাবের ব্যাখ্যা সমন্বিত একটি একাদশ অধ্যায় অনিচ্ছাভরেই বাদ দিতে হয়েছে।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়ের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ আউন্সের হিসেবে হলো এই রকম (বন্ধনীর মধ্যে প্রকৃত প্রাপ্ত পরিমাণ দেওয়া হলো)ঃ চাল, গম ইত্যাদি খাদ্যশস্য ১৪ (১৩.৭১); ডাল, কলাই ইত্যাদি ৩ (২.১); দুধ ১০ (৫.৫); ফলমূল ৩ (১.৫); তরিতরকারি ১০ (১.৩); শর্করা ২ (১.৬); মাছ-মাংস ৩ (০.৩৫); ডিম (সংখ্যায়) ১(-); উদ্ভিজ্জ তেল ও ঘি ২(১)। (*ইন্ডিয়া* ১৯৫৪, পৃ. ২৯৫; ১৯৫৫, পৃ ৪১৩; ১৯৫৬ পাওয়া যায়নি)। সাম্প্রতিক সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে যে ভারতীয়দের খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। মাথাপিছু খাদ্যাভাবের এই নির্মম কাহিনী আরও করুণ হয়ে ওঠে যখন জানা যায় যে খুব অল্প সংখ্যক ভারতীয়েরই এমনকী রাশিবিজ্ঞানের গড় হিসেব মতো খাদ্য কেনারও ক্ষমতা নেই। প্রশ্নটা হলো, ক্ষুধা ও ব্যধিতে আক্রান্ত জনসাধারণের এই অবস্থাটা কী বহাল থাকবে—না কী ভারতীয় সমাজ এই ধরনের মৌলিক দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পাবে। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের এত অত্যল্প রসদ নিয়ে কতদিন একটা দেশ গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে? উত্তরটাকে খুঁজে পেতে হবে সঠিক চিন্তার মধ্য দিয়ে—যে কারণে ইতিহাস অনুসন্ধানটা একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু তারপর, সমাধানটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রয়োগ, অর্থাৎ নিছকই অতীত অধ্যয়নের অতিরিক্ত এক পদক্ষেপ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভারতীয় জীবনে অক্ষয় পাথরের মতো চেপে থাকা নিষ্ক্রিয় কষ্টভোগ দিয়ে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো অবস্থায় পৌঁছনো যায় না। এখন সময় এসেছে ইতিহাস সৃষ্টি করার, সুচিন্তিত প্রয়াসে সচেতনভাবে তাকে গড়ে তোলার—যাতে এশিয়া তথা বিশ্বের শান্তি রক্ষিত হয়।

এখন এ-বইয়ের ব্যবহারিক দিকগুলি সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা যাক ঃ একবচনে উত্তম পুরুষ ব্যবহারের অর্থ হলো বক্তব্যটি বলা হচ্ছে লেখকের নিজের দায়িত্বে; 'আমরা' অর্থে পাঠকের অংশগ্রহণকে আবাহন জানানো, সাধারণত কোন যুক্তিবিচারের ক্ষেত্রেই শুধু এটি করা হয়েছে। প্রচলিত ইতিহাস সম্পর্কে অপর্যাপ্ত পূর্বজ্ঞান থাকা পাঠকের পক্ষে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম টীকায় উল্লিখিত গ্রন্থগুলি পাঠে অবহেলা থাকা উচিত নয়, কেননা সেগুলি থেকে তাঁরা তা অর্জন করতে পারেন। ভারতীয় ভাষার নাম ও শব্দগুলির ক্ষেত্রে প্রচলিত রোমান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে (অর্থাৎ 'c' এর উচ্চারণ হবে 'চ'), কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে নয়, কেননা বেশকিছু শব্দ ইতিমধ্যেই বানান সমেত পরিচিত হয়ে গেছে—যা পাল্টালে বোঝা মুস্কিল। পাঠককে অবশ্যই বানান পদ্ধতির তারতম্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে—যেমন, সংস্কৃতের রাজগৃহ হলো হিন্দির রাজগীর। অনুবাদগুলির ক্ষেত্রে, এমনকী যখন মূল ভাষা আমার জানা আছে তখনও, প্রকাশিত অনুবাদগুলিই আমি ব্যবহার করেছি, কিন্তু প্রয়োজনমতো সংশোধন করে নিয়ে। অনুবাদের বিপদ হলো অনুবাদকের নিজস্ব সংস্কারগুলিকে পাঠের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার ঝোঁক। সেই কারণেই, কেউ কেউ *ঋগ্‌বেদ* ও *অর্থশাস্ত্র*-এর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন সামন্ত

ক্রীতদাস—যা সমাজের পুরো চিত্রটাকেই পাল্টে দেয় এবং সেইসঙ্গে যে কোন ইতিহাস-বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে নিয়ে আসে এক দুঃখজনক পরিণতির সামনে। একটা অপরিহার্য সতর্কতা হলো, পুরাণকথাকে প্রত্যক্ষ যুক্তিসম্মত করে তোলার চেষ্টা থেকে বিরত হওয়া; এই চেষ্টাকে গ্রীক পরিভাষানুযায়ী বলা হয় ইউহেমারিজম (Euhemerism)—তাদের নিজেদের লোকজনের মধ্যে প্রচলিত মিথগুলিকে নিয়ে তারা এ চেষ্টা করেছিল। পুরাণকথার প্রকৃত অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে বোঝা খুবই মুশকিল এবং প্রত্যক্ষ ইতিহাসগত তথ্যও সেখানে খুব কমই থাকে। ভারতীয় ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাগুলি দুর্ভাগ্যক্রমে কুয়াশাচ্ছন্ন লোককাহিনীগুলির মধ্যে মিশে যাওয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়েছে—সময়ের অতিক্রমণের সাথে সাথে যেগুলি উত্তরোত্তর পুরাণকথার সদৃশ হয়েই ফিরে আসে।

এ গ্রন্থের প্রস্তুতিতে যাঁরা আমাকে উৎসাহ ও সহযোগিতা যুগিয়েছেন এখানে আমি তাঁদের প্রত্যেককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

ডেকান কুইন — ডি ডি কোসাম্বি

ডিসেম্বর ৭, ১৯৫৬

অনুবাদ প্রসঙ্গে

দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি-র বর্তমান গ্রন্থটি বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া বাহুল্য। কিন্তু মনে আছে, *ঐতিহাসিক অধ্যাপক বরুণ দে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন এ বইটির প্রকাশকালের স্মৃতির* কথা—"১৯৫৬ সালে বইটি যখন প্রথম বের হয় আমাদের মনে তখন প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।...ইরফান হাবিব কিনলেন-*An Introduction to the study of Indian History*। সে বই তাঁর কাছ থেকে নিয়ে আমি পড়লাম সাতান্ন সালে। আমার মনে হয়েছিল যেন একটা নতুন দরজা খুলে গেল।" (*অভিযাত্রিক*, জুলাই '৯৫ -জুন '৯৬)।

ঘটনাক্রমে, এই সাক্ষাৎকার যিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই অরুণ ঘোষের হাতেই পরবর্তীকালে প্রকাশক দায়িত্ব দিলেন কোসাম্বির-র বইটি অনুবাদের। হয়তবা স্নেহবশতই তিনি সে দায়িত্ব অর্পণ করেন বর্তমান অনুবাদককে—যদিও অনুবাদের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর প্রত্যক্ষ ও নিরন্তর সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হতো না। গ্রন্থের জার্মান শব্দগুলির উচ্চারণ ও অর্থ জেনে নেওয়া হয়েছে শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত বা শোভনলাল দত্তগুপ্তের কাছ থেকে। লাতিন ও বহু ইংরেজি শব্দের অর্থ বুঝতে সাহায্য পেয়েছি সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কৃষি সংক্রান্ত আলোচনা বুঝতে সহায়তা করেছেন অবনী লাহিড়ী। দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে সাহায্য করেছেন বন্ধু বিশ্বমিত্র। এ অনুবাদের সাফল্য যদি কিছু থাকে তাহলে তা এঁদের কারণেই সম্ভব হয়েছে। ব্যর্থতা যদি কিছু থাকে সে দায় আমার।

অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলানুগ থাকাটাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ভাষার লালিত্যের কারণে কোথাও তা থেকে সরে আসা হয়নি। পরিভাষার সমস্যা সব অনুবাদের ক্ষেত্রেই থাকে। আমরা চেষ্টা করেছি বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের বাংলা গ্রন্থ বা বাংলায় অনূদিত গ্রন্থগুলিতে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলি সন্ধান করে গ্রহণযোগ্য হলে ব্যবহার করতে।

অনুবাদক

সংক্ষেপসূচি ও গ্রন্থপঞ্জি

অথর্ববেদ : অধিকাংশই W. D. Whitney-র অনুবাদ থেকে, *এইচ ও এস* ৭-৮; সেই সঙ্গে *এস বি ই* ৪২-এ নির্বাচিত অংশের M. Bloomfield কৃত অনুবাদ থেকেও নেওয়া হয়েছে।

অর্থশাস্ত্র : কৌটিল্য (বা চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত, এবং কৌটিল্য নামেও পরিচিত)-এর *অর্থশাস্ত্র*, সম্পাদনা—টি গণপতি শাস্ত্রী, ত্রি.স.গ্রি. ৭৯,৮০,৮২। সেইসঙ্গে আর শামশাস্ত্রী-র দ্বিতীয় সংস্করণ (মূল), মহীশূর ১৯২৪; শেষোক্ত পন্ডিতের করা অর্থশাস্ত্রের শব্দ নির্দেশিকা অপরিহার্য, কিন্তু তাঁর ইংরেজি অনুবাদ (তৃতীয় সংস্করণ, মহীশূর ১৯২৯) তৃপ্তি দেয় না। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে ভাল যে অনুবাদ, যদিও অবিতর্কিতভাবে গ্রহণ করা যায় না, তা হলো, J. J. Meyer-এর *Das altindische Buch vom Welt-und Staatsleben, Das Arthaśāstra des Kauṭilya* (লাইপজিগ ১৯২৬)। সেই সঙ্গে দ্রষ্টব্য *Meyer*-এর *Ueber das Westen dar altindischen Rechtsschriften und ihr Verhältnis zu einander und Kauṭilya's* (লাইপজিগ ১৯২৭); মূল্যবান বিশ্লেষণ, কিন্তু কোন নির্দেশিকা নেই। J. S. Karandikar এবং B. R. Hivargäokar কৃত *অর্থশাস্ত্র*-র মারাঠা অনুবাদ (২ খন্ড, করজট ১৯২৭-৯) পাঠের পরামর্শ দেওয়া যায় না।

অ্যান্টিক্যুইটি : *Antiquity*, প্রয়াত O.G.S. Crawford প্রতিষ্ঠিত প্রত্নতত্ত্ব পর্যালোচনার একটি ত্রৈমাসিক।

আই এ : *Indian Antiquity*

আই এ আর : *Indian Archacology, A Review;* ১৯৫৪-৪ তে শুরু হয়ে ১৯৫৪-৫-তে এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, আপাতভাবে সাধারণ্যে বিক্রয়ের জন্য নয়, কিন্তু সাম্প্রতিক প্রত্নতত্ত্বের কাজের উপর এটি একটি মূল্যবান সমীক্ষাপত্র।

আই এইচ কিউ : *Indian Historical Quarterly*।

আই জি : *Imperial Gazetteer of India (new edition)*, ২৬ খন্ড, অক্সফোর্ড ১৯০৭-৯। এরই সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের গেজেটিয়ারগুলিও ব্যবহার করা উচিত ছিল—কিন্তু তা এখানে করা হয়নি। এর কারণ সেগুলি দুঃখজনকভাবে পুরনো, যদিও অনেকগুলিতেই (যেমন, *Gazetteer of the Central Provinces of India;* সম্পা. Charles Grant, নাগপুর ১৮৭০) সংশ্লিষ্ট আমলের উপজাতি জীবন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য দেওয়া আছে।

আই টি এম : L Dela Vallée Poussin : *L' Inde aux temps des Mauryas et des barbares, Gecs, Scythes, Parthes et Yue-Tehi*, প্যারিস ১৯৩০।

আলবিরুনি : *Albirūní 's India*, অনু. ও সম্পা. Sachau, ২ খন্ড, লন্ডন ১৯১০, ২ খন্ড একত্রে লন্ডন ১৯১৪। আলবিরুনি ছিলেন একজন খোয়ারিজমিয়ান (৯৭৩-১০৪৮ খ্রী.); এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল ১০৩০ খ্রী. নাগাদ।

ই. আই : *Epigraphia Indica* (ভারতীয় খোদাইলেখগুলি সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রকাশন)।

ই-ৎসিং : ভারত এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে ই-ৎসিং (I-tsing)-এর বিবরণ (*Records of the Buddhist Religion*)-এর J. Takakusu (অক্সফোর্ড ১৮৯৬)-কৃত

অনুবাদ। মূলত, বৌদ্ধ বিহারের জীবন ও প্রশাসন সম্পর্কে জানার জন্য ই-ৎসিং ষোলো বছর ভারতে কাটিয়েছিলেন—যার মধ্যে দশ বছর (আনু, ৬৭৫-৬৮৫ খ্রী.) ছিলেন নালন্দায়।

ই. ডি ঃ H. M. Elliot (সম্পা. J. Dowson) : *The History of India by Its Own Historians ; the Muhammadan Period* (৮ খন্ড, লন্ডন ১৮৬৭ +)।

ইন্ডিয়া ঃ ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক ১৯৫৩ থেকে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ঐ মন্ত্রকেরই গবেষণা-অনুসন্ধান বিভাগ-কৃত সংকলন। এ থেকে পুরো দেশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

ইয়ুল ঃ H. Yule, "Cathay and the way thither", ২য় সংস্করণ, H. Cordier, ৩ খন্ড, লন্ডন ১৯১৩-৫ (Hakluyt Society nos 38,33,37)।

ই সি ঃ *Epigraphia Carnatica*, সম্পা. ও অনু. Lewis Rice।

ঋগ্‌বেদ ঃ সায়ন-এর ভাষ্যসহ মূল পাঠ, ৪ খন্ড, পুনা ১৯৩৩-৪৬। সেই সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে Grassmann-এর *Wörterbuck Zum RV* এবং A. Ludwig-কৃত জার্মান অনুবাদ (৬ খন্ড, প্রাগ ১৮৭৬-৮৮)। K. G. Geldner-এর জার্মান অনুবাদ (*এইচ ও এস* ৩৩-৩৫) থেকেও নেওয়া হয়েছে।

এ আই ঃ *Ancient India* (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রকাশন, সংখ্যা ১-১১)।

এ আই এ ঃ Hugo Obermaier-এর একটি পরিকল্পনার রূপায়ন হিসেবে J. Mariger ও H. G. Bandi-র *Art in the Ice Age, Spanish Levant Art, Arctic Art* (অনু. R. Allen, লন্ডন ১৯৫৩)।

এইচ ও এস ঃ *Harvard Oriental Series* (হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ ম্যাসাচুসেটস, ইউ এস এ)।

এ এস ডব্লিউ আই ঃ *Archaeological Survey of Western India*; বিশেষ করে এর ৪র্থ খন্ডটি (১৮৭৬-৯) যেখান থেকে বর্তমান গ্রন্থের গুহা-বর্ণনাগুলি নেওয়া হয়েছে—যদিও ততটা নিঁখুতভাবে নয়, এমনকী Burgess-এর *Buddhist Cave Temples*-এর সহায়ক সংযোজন থাকা সত্ত্বেও।

এনথোভেন ঃ R. Enthoven : *Tribes & Castes of Bombay*, ৩ খন্ড, বোম্বাই ১৯২০-২২।

এফ ও এম ঃ *Oriental Memoirs;* ভারতে সতেরো বছর কাটানো James Forbes Esq. F.R.S-এর একটি বিবরণী; তাঁর কন্যা মোন্টালেমবার্ট-এর কাউন্টেস কর্তৃক পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২ খন্ড, লন্ডন ১৮৭৪। সরকারী লেখক হিসেবে Forbes বোম্বাই-এ আসেন ১৭৬৬ সালে এবং ১৭৮৪-তে দেশে ফিরে যান।

এ বি আই এ ঃ *Annual Bibliography of Indian Archaeology* (লাইডেন)

এ বি ও আর আই ঃ *Annals of the Bhāṇḍārkar Oriental Research Institute* (পুনা)

এস বি ই ঃ *Sacred Books of the East*। সাধারণভাবে F. Max Muller-এর সম্পাদনায় বিভিন্ন পন্ডিতদের দ্বারা অনূদিত ইংরেজি অনুবাদমালা। অধিকাংশই ১৯ শতকের শেষ কুড়ি বছরে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত হয়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঃ অনু. A. B. Keith, *এইচ ও এস* ২৫।

কথাসরিৎ সাগর ঃ সোমদেব ভট্ট-র *কথা-সরিৎ-সাগর*; সংস্কৃত পুঁথি, ৪র্থ সংস্করণ (নির্ণয়সাগর)

বোম্বাই ১৯৩০; এর যে কোন বিষয় বুঝতে ব্যাখ্যা, পরিশিষ্ট ও নির্দেশিকা সহ N. M. Penzer-এর সম্পাদনায় C. H. Tawney-র অসাধারণ অনুবাদ *The Ocean of Story*, ১০ খণ্ড, (লন্ডন ১৯২৪ ও পরবর্তী) গ্রন্থটি অপরিহার্য।

কুম্ভভাগঃ *এস বি ই* ২০।

কের্নঃ *Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien;* Henrik Kern রচিত মূল ডাচ থেকে জার্মান অনুবাদ H. Jacobi, ২ খন্ড, লাইপজিগ ১৮৮২, ১৮৮৪। বুদ্ধকে এখানে এক কাল্পনিক চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু অনুশাসনিক সূত্রগুলিকে উপস্থাপন করা হয়েছে যথাযথভাবে।

ক্রুকঃ W. Crooke : *Rural and Agricultural Glossary for the N. W. Provinces and Oude (= U.P.)* কলকাতা ১৮৮৮।

গারনেট ঃ J. Gernet : *Less aspects économiques du Bouddhisme dons la sociétéchinoise du V^{e} au X^{e} siécle;* (Saigon 1956 = vol 39 of the Publications de l'école française d'extrême-orient)।

গ্রিয়ারসনঃ George A. Grierson : *Notes on the District of Gaya* (কলকাতা ১৮৯৩)। *Bihār Peasant life* (২য় সংস্করণ, পাটনা ১৯২৬)।

ছা. উঃ *ছান্দোগ্য উপনিষদ।*

জাতকঃ V. Fausböll-কৃত পালি পুঁথির রোমান সংস্করণ ঃ "The Jātaka together with its commentary, being tales of the anterior births of Gotama Buddha", ৭ খণ্ড, লন্ডন ১৮৭৭-৯৭। Julius Dutiot-কৃত জার্মান অনুবাদ "Jātakam–Das Buch der Erzählungen aus fraheren Existenzen Buddhas" (৭ খন্ড, ম্যুনচেন ১৯০৬-১৯২১)-এর তুলনায় বিভিন্ন পন্ডিতদের করা ইংরেজি অনুবাদ অনেক কম নির্ভরযোগ্য।

জে আর এ এসঃ *Journal of the Royal Asiatic Society of London*।

জে এ এস এইচ ওঃ *Journal of the Social and Economic History of the Orient;* আন্তর্জাতিক এক পর্ষদের সম্পাদনায় লাইডেন থেকে প্রকাশিত।

জে. এঃ *Journal Asiatique*

জে এ এস বিঃ *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (তিনটি পর্যায়ে সোসাইটি প্রথমে পরিবর্তিত হয়েছিল 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি'-তে এবং পরে শুধুই 'এশিয়াটিক সোস্যাইটি')। মধ্য পর্যায়ে, মুদ্রাতত্ব বিষয়ক সংযোজন আলাদা পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।

জে এন এস আইঃ *Journal of the Numismatic Society of India*।

জে এ ও এসঃ *Journal of the American Oriental Society*।

জে ও আরঃ *Journal of Oriental Research,* মাদ্রাজ (কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মইলাপুর, মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত)।

জেড ডি এম জিঃ *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.*

জে বি ও আর এসঃ *Jouranl of the Bihār and Orissa Research Society* (এখন শুধুই বিহার রিসার্চ সোসাইটি)।

জে বি বি আর এ এসঃ *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*।

টি এস: A. B. Keith (অনু.), 'Veda of the Black Yajus School', *এইচ ও এস* ১৮-১৯।

ডব্লিউ আই এস: *Indische Studien,* সম্পা. A. Weber।

ডব্লিউ জেড কে এম: *Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes*।

ডি আর: A. Shakespeare : *Selections from the Duncan Records* (বেনারস, ১৮৭৩, ২ খন্ড)। এরই সঙ্গে পড়া দরকার *Selections from the Revenue Records North West Provinces*।

ডি এইচ আই: Louis de la Vallée Poussin : *Dynasties et histoire de l'Inde depuis Kaṇiṣka jusqu'aux invasions musulmanes* (প্যারিস ১৯৫৩)

ডি বি : "The book of Duarte Barbosa" (1500-1517; পর্তুগীজ মূল রচনা থেকে লিসোবা ১৮১২), অনু, M. L. Dames (লন্ডন ১৯১৮। *Hakluyt Society no. 44*)।

ত্রি স সি: ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ।

দিঘ নিকায়: *Dighā Nikāya* (পালি টেক্সট সোসাইটি সংস্করণ)

পারজিটার: F. E. Pargiter : *The Purāna Text of the Dynasties of the Kali Age* (অক্সফোর্ড ১৯১৩); পুরাণগুলির ঐতিহাসিক অংশের সংক্ষেপিত পাঠ ও অনুবাদের জন্য এ গ্রন্থটি এখনও আদর্শ। পুরাণগুলির সাধারণ সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণের জন্য দ্র. R. C. Hazra : *Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs*, ঢাকা ১৯৪০।

ফিক: R. Fick : *Die sociale Gliederung im nordöstlichen Indien Zu Buddhas Zeit mit besonderer Rücksicthtigung der Kastenfrage vornehmlich auf Grund der Jātaka dargestellt* (কিয়েল ১৮৯৭)।

ফেরিস্তা: Md. Kasim Ferishta-র বিবরণীর J. Briggs-কৃত অনুবাদ *History of the Rise of the Mohammadan Power in India till the Year A.D. 1612;* মূল সংস্করণ, লন্ডন ১৮৯২; ব্যবহৃত সংস্করণ ৪ খন্ড, কলকাতা ১৯০৮-১০।

ফ্লিট: J. F. Fleet : "Inscriptions of the early Gupta Kings and their successors", (*Corpus Inscriptionum Indicarum III,* কলকাতা ১৮৮৮)। এর একটি পরিমার্জিত সংস্করণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয়নি, বা শাতবাহন ও অন্যদের খোদাই লিপি বিষয়ে কোন সংযোজন অংশও বেরোয়নি।

বতুতা : "Selections from the travels of Ibn Battūta (1325-1354)", অনুবাদ H.A.R. Gibb (লন্ডন ১৯২৯, পুনর্মুদ্রণ ১৯৩৯; "The Broadway Travellers")।

বর: *The Itinerary of Ludovico Varthema of Bologna* from 1502 to 1508; অনু. J W. Jones, ১৮৬৩; বিশেষ সংস্করণ, লন্ডন ১৯২৮।

বল: V. Ball : *Jungle Life in India, or the Journey and Journals of an Indian Geologist* (লন্ডন ১৮৮০)।

বি. আই : J. Burgess ও Bhagwanlal Indraji : *Inscriptions from the Cave Temples of Western India* (বোম্বাই ১৮৮১)।

বি ই এফ ই ও: *Bulletin de l' Ecole Française de l'extréme Orient* ।

বি এ এস ও আর : ***Bulletin of the American Schools of Oriental Research***।

বি এস ও এ এস : ***Bulletin of the School of Oriental and African Studies*** (of the University of London)

বিল : ***Ta-Fang-Si-Yu-Ki : Buddhist Records of the Western World,*** হিউয়েন সাং (৬২০ খ্রী.) থেকে অনুবাদ Samuel Beal; ২ খন্ড লন্ডন ১৮৮৪; ভূমিকা অংশে ফা হিয়েন-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত ও অন্যান্য নথিপত্রের কিছু অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

বুকানন : Francis Buchanan : "A Journey from Madras through the countries of Mysore, Canara and Malabar performed under the orders of the Most Noble the Marquis of Wellesley, Governor General of India for the express purpose of investigating the state of Agriculture, Arts, and Commerce, the Religion, Manners and Customs, the History Natural and Civil, and antiquities, in the dominion of the Rajah of Mysore and the countries acquired by the Honourable East India Company in the late and former wars, from Tippoo Sultaun." (৩ খন্ড, লন্ডন ১৮০৭; ২ খন্ডের ২য় সংস্করণ, মাদ্রাজ ১৮৭০)।

ব্যাডেন-পাওয়েল : B. H. Baden-Powell : *The Land-system of British India* (৩ খন্ড, অক্সফোর্ড ১৮৯২)। সেটলমেন্ট রিপোর্ট সম্পর্কে এই কাজটি ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক একটি সারসংক্ষেপ—কেননা এ বিষয়ে অধিকাংশ তথ্যই সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্লভ; যদিও ইতিহাস ও জাতিগুলি সম্পর্কে এর অপ্রমাণসিদ্ধ তাত্ত্বিকতাটা উপেক্ষণীয়। একই লেখকের *Manual* (of the Land Revenue System and Land Tenure of British India, কলকাতা ১৮৮২)-এ তথ্যগুলিকে সংক্ষেপিত করা হয়েছে, অবশ্য তত্ত্বগুলিকে করা হয়নি।

ব্রাউ : J. Brown : *The Early Brahmanical System of Gotra and Pravara* (জনৈক মধ্যযুগীয় লেখক পুরুষোত্তম-এর *গোত্র-প্রবর-মঞ্জরী*-র অনুবাদ), কেমব্রিজ ১৯৫২।

বৃহদারণ্যক : *বৃহদারণ্যক উপনিষদ।*

ম. নি : *মজ্‌ঝিম নিকায়।*

মনুস্মৃতি : কুল্লুক-র ভাষ্যসহ সংস্কৃত মূল পাঠ, বোম্বাই (নির্ণয়সাগর, ৯ম সং.) ১৯৩৩; গঙ্গানাথ ঝা সম্পাদিত মেধাতিথি-র ভাষ্যসহ, ৩ খন্ড কলকাতা ১৯৩২-৩৯ (Bibliotheca Indica 1516, 1522, 1533)। ইংরেজি অনুবাদ G. Buhler, *এস বি ই* ২৫।

মহাভাষ্য : *এস বি ই* ১৩, ১৭

মহাভারত : *মহাভারত*-এর প্রথম বিশ্লেষণমূলক সম্পাদনা করেন বিষ্ণু এস. সুক্‌থাঙ্কর (অন্য অনেকের সহায়তায়), পুনা ১৯৩৩; কাজটি এখনও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যদিও ১৯৪৩-এ সুক্‌থাঙ্করের মৃত্যুর পর তা আর যথেষ্ট সন্তোষজনকভাবে নয়। ইংরেজির তুলনায় সংস্কৃত পাঠে যাঁরা (আমারই মতো) শ্লথ তাঁদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক উপাদান সহজে খুঁজে পাবার জন্য সহায়ক যুগবাহিত স্ফীতকায় মূল পাঠের পি সি রায়-কৃত অনুবাদ (১৮৮০-র দশক থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়ে চলেছে)।

মানুচ্চি **:** *Storia di Mogor* (or *Mogul India,* 1653-1708), Niccolao Manucci, Venetian; ভূমিকা ও টীকাসহ অনুবাদ W. Irvine, ৪ খন্ড লন্ডন ১৯০৭-৮।

মার্টিন **:** Montgomery Martin : "The history, antiquities, topography and statistics of EASTERN INDIA, comprising the districts of Behar, Shahabad, Bhagalpoor, Goruckpoor, Dinajpoor, Puraniya, Rungpoor and Assam, in relation to their geology, mineralogy, botany, agriculture, commerce, manufactures, fine arts, population, religion, education, statistics & c., surveyed under the orders of the supreme government and collated from the original documents at the E.I. House, with the permission of the honourable court of directors." (৩ খন্ড, লন্ডন ১৮৩৮)। এটি হল ফ্রান্সিস বুকাননের রিপোর্টের এক পরিচ্ছন্ন নকল। পাঠকেরা ধরতেই পারবেন না যে মূল কাজটি করেছিলেন বুকানন। মূল রিপোর্ট থেকে বিহার জিলা সম্পর্কিত অংশ নিয়ে Bihar and Orissa Research Society পরবর্তীকালে আলাদা রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং তা বুকাননের নামেই।

মিলিন্দপনহো **:** পালি রচনা, সম্পাদনা. R. D. Vāḍekar (বোম্বাই ১৯৪০); ইংরেজি অনুবাদ *এস বি ই* ৩৫, ৩৬।

মেগাস্থিনিস **:** J. W. McCrindle : *Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian* (কলকাতা ১৯২৬, *আই এ* থেকে নিকৃষ্টভাবে পুনর্মুদ্রিত)। মূল লেখাটি স্ট্রাবো, ডিওডোরাস সিকুলাস এবং অন্যদের লেখায় ছড়িয়ে থাকা মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও উদ্ধৃতি নিয়ে সংকলন করেছিলেন E. A Schwanbeck (বন ১৮৪৬)। ডিওডোরাসের ক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করেছি Dindorf-এর সংস্করণ এবং Carl Muller (প্যারিস ১৮৭৮)-এর লাতিন অনুবাদ।

মোরল্যান্ড **:** W. H. Moreland : (ক) *The Agrarian System of Moslem India,* কেমব্রিজ ১৯২৯, (খ) *India at the Death of Akbar,* লন্ডন ১৯২০, (গ) *From Akbar to Aurangzeb,* লন্ডন ১৯২৩।

ম্যান (MAN) : নৃতত্ত্ব গবেষণার জার্নাল।

রাউ **:** *Staat und Gesellschaft im alten Indien nach den Brahmanen-Texten dargestellt,* von Withelm Rau (Wiesbaden, 1957)।

রাজতরঙ্গিণী **:** "Kalhana's *Rājataranginī*, a chronicle of the kings of Kaśmir", অনু. M. A. Stein, ২ খন্ড, লন্ডন ১৯০০; অত্যন্ত কার্যকর এর টীকাগুলি—তা না হলে স্টেইন, দুর্গা প্রসাদ ও অন্যদের সম্পাদিত সংস্কৃত পাঠ দুর্বোধ্য থেকে যেত।

রায় **:** S. C. Roy : *The Mundas and their Country,* কলকাতা ১৯১২।

ল্যুডার্স **:** H. Lüders : "List of Brāhmi inscriptions from the earliest times to about A. D. 400 with the exception of those of Asoka." *ই. আই.*, খন্ড ১০-এর পরিশিষ্ট। *ই. আই.* ১৯-২০-তে D. R. Bhāndārkar-এর তালিকা এবং *ই আই* ৫ ও ৮-এ Kielhorn কর্তৃক তার পরিমার্জন দ্রষ্টব্য ; এ দুটির তুলনায় ল্যুডার্স অনেক বেশি কার্যকর।

শতপথ ব্রাহ্মণ ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে Julius Eggeling কৃত অনুবাদ, *এস. বি. ই.* ১২, ২৬, ৪১ ৪৩, ৪৪।

শফ ঃ W. H. Schoff অনু. ঃ *Periplus of the Erythracan Sea, Travel and Trade is Indian Ocean by a Merchant of the First Century,* নিউ ইয়র্ক ১৯১২। লেখাটি নেওয়া হয়েছে C. Müller-এর *Geographici Graeci Minores* প্যারিস ১৮৫৫ এবং B. Fabricius, লাইপজিগ ১৮৮৩ সংস্করণ থেকে। মূল লেখাটি ৬০ খ্রী.-এর বলে শফ মত প্রকাশ করেছেন—কিন্তু রাজা মমবানুস, যা নমবানুস-এর ভুল পাঠ, তাকে শফের কথামতো নহপান হিসেবে ধরলে এই মত গ্রহণযোগ্য হয় না, বরং মনে হয় তা ৯০ খ্রী-এর আগের হতে পারে না। এ বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য ঃ W. McCrindle, *আই. এ.* ৮, ১০৮-১৫১।

শিফনার ঃ Anton Schiefner : *Tāranathas Geschichte des Buddhismus in Indien aus dem Tibetischen übersetzt,* সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৮৯৬।

শিলালেখ ঃ অশোকের শিলালেখ, দ্রষ্টব্য, 'স্তম্ভলিপি'।

সি আই আই ঃ *Corpus Inscriptionum Indicarum*

সি এ আই ঃ *The Cambridge History of India* খন্ড-১, "Ancient India", সম্পা. E. J. Rapson, কেমব্রিজ ১৯২২, ১৯৩৫।

সুত্তনিপাত ঃ পালিভাষায় সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ অনুশাসনিক রচনা, সম্পা, Faushöll; *এস বি ই* ১০-এ তাঁর অনুবাদ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

স্ট্র্যাবো ঃ তাঁর ভূগোল রচনার পাঠ ও অনুবাদ, বিশেষ করে ১৫ তম গ্রন্থের জন্য, Classics-এ H. L. Jones কে অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলির অনুবাদ অধিকাংশই নেওয়া হয়েছে J. W. McCrindle-এর 'মেগাস্থিনিস'-এ উল্লিখিত গ্রন্থ এবং Ancient India as Described in Classical Literature, লন্ডন ১৯০১ থেকে—যেটি সূত্রগুলির অনুবাদ সম্বলিত McCrindle-এর ছটি খন্ডের সর্বশেষ খন্ড। এই খন্ডে Pliny, Kosmas Indikopleustes এবং অন্যদের রচনার চুম্বকও আছে।

স্তম্ভলিপি ঃ অশোকের স্তম্ভলিপি (এবং শিলালেখ)-এর সংখ্যা, পাঠ ও অনুবাদ নেওয়া হয়েছে Corpus Inscriptionum Indicarum (ইংরেজি অনুবাদ সহ) খন্ড ১, নতুন সংস্করণ, E. Hultzsch (অক্সফোর্ড ১৯২৫) থেকে।

হর্ষচরিত ঃ বাণভট্টের *হর্ষচরিতম ;* শঙ্করকবি-র ভাষ্যসহ সংস্কৃত মূলপাঠ, বোম্বাই, ৭ম সং. (নির্ণয়সাগর) ১৯৪৬; এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত রঙ্গনাথ-এর ভাষ্য আমি দেখেছি (Madras Govt. MSS Collection R-2703) এবং তা থেকে আমার প্রয়োজনীয় অংশ লিখে নিয়েছি। E. B. Cowell এবং F. W. Thomas-কৃত ইংরেজি অনুবাদ (লন্ডন ১৮৯৭, পুনর্মুদ্রণ ১৯২৯; রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ওরিয়েন্টাল ট্রান্স. ফান্ড)-ও কাজের, যেমনটা হিন্দিতে V. S. Agarwala (*হর্ষচরিত, এক সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন,* পাটনা ১৯৫৩)-র বিশ্লেষণ (কখনও কখনও অবশ্য অতি সরল ভাবে) এবং ভাষ্য।

হান্টার ঃ W. W. Hunter : *Annals of Rural Bengal* (লন্ডন ১৮৬৮), বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য।

কালানুক্রমিক রূপরেখা

প্রথম দুটি অধ্যায়ে কোনো কালানুক্রম অনুসরণ করা হয়নি।

তৃতীয় অধ্যায় : সিন্দু নগরীগুলির পত্তন হয় আনুমানিক ৩০০০ খ্রী. পূ.-এ, অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ার জেমদেত্-নাস্‌র পর্বে (তুলনায়ী, চিত্র-৬)। হামুরাবি-র কাল ধরা হয় ১৭২৮-১৬৮৬ খ্রী. পূ.।

চতুর্থ অধ্যায় : প্রথম আর্য আক্রমণ ঘটে আনুমানিক ১৭৫০ খ্রী. পূ.-এ মূল ঋগ্‌বৈদিক আমল ১৫০০ খ্রী. পূ. নাগাদ। দ্বিতীয় আর্য স্রোত আসে আনুমানিক ১১০০ খ্রী. পূ.-এ।

পঞ্চম অধ্যায় : *যজুর্বেদ* রচনা শেষ হয় ৮০০ খ্রী. পূ-এর মধ্যে, *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৬০০ খ্রী. পূ-এর মধ্যে; উভয় ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে কখনো কখনো যে প্রক্ষেপণ ঘটেছে তা গণ্য করা হয়নি।

ষষ্ট অধ্যায় : খ্রী. পূ. ৭ম শতকের মধ্যেই কোশল এবং মগধে রৌপ্যমুদ্রার নিয়মিত প্রচলন ঘটে। বুদ্ধ ও পসেনাদি-র মৃত্যু (উভয়েরই ৮০ বৎসর বয়সে) ৪৮৩ খ্রী. পূ. নাগাদ। বুদ্ধের কয়েকবছর পরেই সম্ভবত ৪৬৮ খ্রী. পূ. নাগাদ মহাবীরের মৃত্যু। মগধে বিম্বিসার শাসন ক্ষমতায় আসেন ৫৪০ খ্রী. পূ. নাগাদ, অজাতশত্রু ৪৯২ খ্রী. পূ. এবং মহাপদ্ম নন্দ ৩৫০ খ্রী. পূ-এর আগে।

সপ্তম অধ্যায় : আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ শুরু হয় ৩২৭ খ্রী. পূ.-এর শেষদিকে, ৩২৬ খ্রী. পূ-এ বিয়াসে-র তীর থেকে পশ্চাদপসরণ; ব্যাবিলনে মৃত্যু ৩২৩ খ্রী পূ-এ। চন্দ্রগুপ্ত থেকে শুরু হয়ে মৌর্য আমল চলে প্রায় ৩২১-১৮৪ খ্রী. পূ.। অশোকের কাল আনুমানিক ২৭৫-২৩২ খ্রী. পূ.। অশোকের শিলালেখে উল্লেখিত সমকালীন যবন রাজারা হলেন : অ্যান্টিওকোস দ্বিতীয় থিওস (সিরিয়া ২৬১-২৪৬ খ্রী. পূ.); টলেমি ফিলাডেলফোস (মিশর, ২৫৮-২৪৭ খ্রী. পূ.); অ্যান্টগোনোস গোনাটস (ম্যাসিডন, ২৭৮-২৪২ বা ২৩৯ খ্রী. পূ.); মাগস (সাইরেন, মৃত্যু ২৫৮ খ্রী. পূ.); এপিরাস-এর আলেকজান্ডার (২৭২-২৫৮ খ্রী. পূ নাগাদ)।

অষ্টম অধ্যায় : প্রথম শাতবাহন আনুমানিক ২০০ খ্রী. পূ, রুদ্রদামন-এর গিরনার খোদাই ১৫০ খ্রী., সিরিয়ার তৃতীয় অ্যান্টিওকোসের ওপর ভারতীয় হানা ২০৬ খ্রী. পূ., ভারতীয়-গ্রীক রাজারা ২০০-৫৮ খ্রী. পূ.। এগুলির মধ্যে ইউথিডেমোসের বংশ কাবুল উপত্যকা শাসন করত, সেইসঙ্গে ভারত ও ব্যাকট্রিয়া-র অধিকৃত অংশ। ইউকেটাইডস ও তাঁর বংশধরদের কাল ১৬৫-২৫ খ্রী. পূ.। পাঞ্জাবে শক-পহ্লব শাসন ৭৫ খ্রী. পূ.-৫০ খ্রী.। কনিষ্ক কর্তৃক কুষাণ রাজবংশের ভিত্তি স্থাপিত হয় ৭৮ খ্রী.। শেষ কুষাণ সম্রাট বাসুদেব শাসন করেছিলেন প্রায় ২০০ খ্রী—কিন্তু এই বংশের 'দেবপ্রিয়' উপাধিটি (চীনে প্রচলিত 'স্বর্গের পুত্র' বা সম্ভবত ইরান থেকে নেওয়া) ৪র্থ শতকের শেষদিকে গুপ্ত রাজবংশের কিছু শত্রু দাবি করেছিল, এবং হতে পারে যে, কুষাণ বংশধরেরা ৮ম শতকের শেষপর্যন্ত কাবুলে শাসনক্ষমতা বজায় রেখেছিল।

নবম অধ্যায় : প্রথম সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মাধ্যমে গুপ্তযুগ শুরু হয় ৩১৯-২০ খ্রী; তাঁর পিতা ঘটোৎকচ এবং পিতামহ শ্রীগুপ্ত ছিলেন ফৈজাবাদ-প্রয়াগ অঞ্চলের স্থানীয় সর্দার। এই বংশের প্রধান রাজারা সিংহাসনে বসেন মোটামুটি এইভাবে : সমুদ্রগুপ্ত ৩৩০ খ্রী.; দ্বিতীয়

চন্দ্রগুপ্ত ৩৮০ খ্রী.; প্রথম কুমারগুপ্ত ৪১৫ খ্রী.; স্কন্দগুপ্ত ৪৫৫ খ্রী.; বুধগুপ্ত উত্তরে শাসন করেন প্রায় ৫১৫ খ্রী. পর্যন্ত। ভতারক কর্তৃক বলভী বাজবংশ স্থাপিত হয় ৪৮০ খ্রী. এবং তা টিকে থকে ৭০০ খ্রী. পর্যন্ত। হুন তোরমাং ও মিহিরগুল কর্তৃক মালব আক্রান্ত হতে থাকে প্রায় ৫০০ খ্রী. থেকে ৫২৮ খ্রী. পর্যন্ত। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল আনুমানিক ৬০৫-৬ খ্রী. থেকে ৬৪৭ খ্রী.। হর্ষ-র শত্রু নরেন্দ্রগুপ্ত-শশাঙ্ক ছিলেন উত্তরের গুপ্তদের শেষ রাজা। ফা হিয়েন ভারতে আসেন ৪০৫ খ্রী; হিউয়েন সাং প্রায় ৬২৯-৬৪৫ খ্রী.। কদম্ব রাজ্য ময়ূরশর্মনের রাজত্বকালকে এখন নির্ণয় করা হয়েছে ৪র্থ শতকের শেষ দিক হিসেবে।

দশম অধ্যায় : মার্কো পোলো-র দুবার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ—১২৮৮ খ্রী.-এ এবং ১২৯২-৩ খ্রী.এ। মিং সেনাপতি চেঙ হো-র নেতৃত্বে ১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ খ্রী. এর মধ্যে ভারতীয় জলপথে জ্ঞাত বৃহত্তম চীনা নৌ-অভিযান। শেষ চারটি জাহাজ সুদূর ওরমুজ ও আফ্রিকার উপকূলে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেল (দ্র. *China Reconstruct* 5.7, জুলাই ১৯৫৬, পৃ. ১১-১৪)। প্রথম মুসলমান (আরব) আক্রমণ সম্ভবত শুরু হয় ৬৩৭ খ্রী. নাগাদ। ৭১২ খ্রী. দাহির-এ মহম্মদ বিন আল-কাশিম-এর জয়ের ফলে স্থায়ী দখলদারির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য হাতছাড়া হতে শুরু হয়—যার পর থেকে মুলতান এবং সিন্দুর সমগ্র নিম্ন উপত্যকা মুসলমান অধীনে আসে। গজনী-র মাহমুদ (মৃত্যু ১০৩০ খ্রী.) উদভাংড়া (উন্দ)-র শাহিয় রাজবংশ কনৌজের প্রতিহারদের ধারাবাহিক আক্রমণে পরাস্ত করেন। জনৈক নাগভট্ট কর্তৃক গুর্জর-প্রতিহার (পরিহার) রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৭২৫ খ্রী.। একই নামের দ্বিতীয় রাজা ৮১০ খ্রী. নাগাদ কনৌজের দখল নেন (যা ছিল রাজধানী)। মাহমুদের কাছে পরাস্ত হয়ে ঐ বংশের শেষ রাজা রাজ্যপালের মৃত্যুর সাথে সাথে ১০২০ খ্রী. এঁদের শাসনের অবসান ঘটে। বিহার ও বঙ্গের পশ্চিমে ৭৫০ খ্রী. নাগাদ পাল রাজংবশের সূচনা ঘটান এক স্থানীয় গোষ্ঠীপতি গোপাল এবং তাঁদের শাসনের অবসান ঘটে ১১৭৫ খ্রী. এ—যদিও বংশটি টিকেছিল অন্ততঃ ১৫০০ খ্রী. পর্যন্ত। ১১০৮ খ্রী.-এর কাছাকাছি সময় থেকে সেন রাজবংশ পালেদের সাম্রাজ্যের এক বড় অংশ হস্তগত করতে শুরু করে এবং তা শেষ হয় শতাব্দীর শেষে মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি-র আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ৯ম শতকে প্রতিহারদের এক পরাজয়ের পর চান্ডেল রাজারা—যাঁরা শুরু করেছিলেন আদিবাসী (গোন্ড) সর্দার হিসেবে—তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১২ শতকের শেষ পর্যন্ত বুন্দেলখন্ড (জেজাকভুক্তি) শাসন করেন। গাহড়বাল (রাঠোর) রাজারা কনৌজের সিংহাসনে বসেন ১০৯০ খ্রী.। চন্দ্রদেব ছিলেন এঁদের প্রথম রাজা। মহম্মদ ঘুরি কর্তৃক ১১৯৪ খ্রী.এ এই বংশ সিংহাসনচ্যুত হয়—যিনি এর বছর খানেক বা তার একটু বেশি আগে চৌহান বংশীয় পৃথ্বিরাজকেও পরাস্ত করেন। দাক্ষিণাত্যে বদামি-তে ৫৫০ খ্রী. নাগাদ প্রথম পুলিকেশিন চালুক্য রাজবংশের শাসনের সূচনা ঘটান এবং ৭৫৭ খ্রী. রাষ্ট্রকূটদের হাতে কীর্তিবর্মনের পরাজয়ের সাথে সাথে এই বংশ ক্ষমতাচ্যুত হয়। পূর্বের চালুক্যরা তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল (কুলোত্তুঙ্গ)-এর নেতৃত্বে দুই শাখাকে সংহত করায় ১০৭০ খ্রী. পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। প্রথম বিশিষ্ট রাজা এবং বংশের জ্ঞাত চতুর্থ প্রধান প্রথম কৃষ্ণ শাসন করেন ৭৬৮-৭৭২ খ্রী.। এই বংশের অবসান ঘটে ৯৮২ খ্রী.-এ। কল্যাণীর চালুক্যরা শাসন করেন ৬৯৬ থেকে ১২০০ খ্রী। পল্লব-রা ৪র্থ শতক থেকে ৯ম-এর শেষ পর্যন্ত। চোল-রা ৮৪৬ থেকে ১২৭৯ খ্রী.।

মহম্মদ ঘুরি-র দাস কুতুবউদ্দিন আইবক ১২০৬ খ্রী. এ দিল্লিতে মুসলিম 'দাস' বংশের শাসনের সূচনা করেন—যা শেষ হয় ১২৯০ খ্রী.-এ। খলজি সুলতানরা ক্ষমতায় আসেন ১২৯০-১৩২০ খ্রী. (আলাউদ্দিন ১২৯৬-১৩১৬) তুঘলক ১৩২০-১৪১৩ খ্রী. (ফিরূজ ১৩৫১-১৩৮৮ খ্রী.)। সঈদ ১৪১৪-১৪৫১ খ্রী.; লোধি ১৪৫১-১৫২৬ খ্রী.; মুঘল ১৫২৬-১৮৫৮ খ্রী., কিন্তু আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রী.) পরের সম্রাটরা ছিলেন কার্যত পুতুল। দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজবংশ (অধিকাংশই গুলবার্গ-এ) ১৩৪৭-১৪২৬ ; কিন্তু ১৫১৮ খ্রী.-এ পাঁচজন আলাদা প্রাদেশিক শাসক আলাদা পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিজাপুরের আদিলশাহী বংশ, যারা ক্ষমতাচ্যুত হয় ১৬৮৬ খ্রী.-এ আওরঙ্গজেবের হাতে পরাস্ত হওয়ার পর। ১৩৩৬ খ্রী.-এ প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি মুসলমান রাজ্যের মধ্যে চারটির সম্মিলিত আক্রমণে ১৫৬৫ খ্রী.-এর ২৬ শে জানুয়ারী তালিকোটার যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যদিও রাজবংশধরেরা টিকে থাকেন আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে।

চিত্র পরিচিতি

বিভাগ -১ : মৃৎশিল্প (১-৭)

১. কুমোরের চাকতি ('শেবলা'); পাথরের, ব্যাস ২২ সে.মি.। উপরের অর্ধাংশকে খুলে নিয়ে ডানদিকে উল্টো করে রাখা আছে। ক্ষয় রোধ করার জন্যে সকেটের গায়ে টিন বা পাতলা স্টিলের পাত আংশিকভাবে লাগানো হয়।

২. চাকতি শুধুমাত্র মহিলারাই ব্যবহার করে। ছবির মহিলা হলেন শ্রীমতী বেলসারে; তাঁর স্বামী যথেষ্ট সহৃদয়ভাবেই পুনার মৃৎশিল্পের সমগ্র কৃৎকৌশল আমাদের দেখিয়েছেন। একটা প্যাডের সাহায্যে মাটিকে ছাঁচে বসানো হয়। চাকতিটিকে ঘোরানো হয় মাটির ওপর চাপ দিয়ে এবং বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল উপরের অর্ধাংশে চেপে রেখে।

৩. কুমোরের চাকা (পুরুষরাই কেবল ব্যবহার করে), পুনা। পুনার মাটি দিয়ে সবচেয়ে বড় যে পাত্রগুলি তৈরি হয় তা এই চাকার সাহায্যেই। লক্ষ্যণীয়, কোন মাপনী-র সাহায্য ছাড়াই পাত্রগুলির সম আয়তন বজায় রাখা। চাকার অরগুলি কাঠের এবং চার থেকে ছটি বাঁখারীর বেড় বাঁধা অরগুলির কেন্দ্রে উলুমাটির মন্ড রাখা থাকে। ঠিক ঠিক তৈরি হলে এটি কমপক্ষে দশবছর চলে। পাটাতনের উপর রাখা আবর্তন দন্ডটি শক্ত কাঠের (*Acacia catechn*) এবং তা সহজে খোলা বা লাগানো যায়। চাকার কেন্দ্রের কাঠের সরু অংশে পাথরের বিয়ারিং লাগানো হয়। চাকায় গতি কমে গেলে ধারের দিকের কাঠের গর্তে একটা দন্ড দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

৪. প্রথমে চাকা ঘুরিয়ে মাটির তাল বানানো ও পাত্রের সম্প্রসারণ ঘটানো হয় ; মূল আকারটি ছবিতে কুমোরের সামনে দেখানো হয়েছে, যদিও তা ফোটোগ্রাফির কারণে অপেক্ষাকৃত বড় দেখাচ্ছে। বেড়ে কখনও হাত দেওয়া হয় না। মাটির তাল থেকে, পুরুষদের মতোই মেয়েরাও চাকতিতে সমস্ত পাত্রই তৈরি করে সম্পূর্ণভাবেই—তাতে কোন সম্প্রসারণ করতে হয় না। বড় পাত্রগুলি চাকতিতে ক্রমান্বয়ে প্রায় তিনটি পর্যায়ে তৈরি করা হয় এবং সংযোগগুলি আস্তে আস্তে পিটে এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয় যে বোঝা যায় না। খোলা পাত্রে ছাই রেখে দেওয়া হয় যাতে মুগুরে মাটি আটকে না যায় এবং পাত্রের ভেতরে রাখা হয় পোড়ামাটির 'নেহাই'। এমনকী কুমোররা পুরনো টিনের পাত্রে জলও রেখে দেয়, যদিও এই টিনের পাত্রগুলিই তাদের কারবার গোটাচ্ছে।

৫. বেনারসের কুমোর। উৎকৃষ্ট মাটি পাওয়ায় এরা চাকায় অপেক্ষাকৃত বড় পাত্র (উত্তরাঞ্চলের লাল মৃৎপাত্র) তৈরি করতে পারে—যেগুলি শক্ত এবং পুনার মৃৎপাত্রগুলির চেয়ে ভারী।

৬. পন্ডিচেরীর নিকটে আরিকামেড়ু-তে আর ই এম হুইলার-এর খনন থেকে পাওয়া বিখ্যাত 'চক্রাকৃতি' কালো মসৃণ মৃৎপাত্র। এই মৌলিক আবিষ্কার মৃৎপাত্র সূচকের প্রথম নির্দিষ্ট কাল নির্দেশ করে। আমদানি করা রোমান মৃৎপাত্রগুলিতে সাধারণত প্রস্তুতকারকদের নাম দেওয়া থাকত—যা থেকে সঠিক নির্মাণকাল পাওয়া যায়। ৫০ খ্রী. নাগাদ এগুলির চল বন্ধ হয় এবং শাতবাহন যুগে এগুলির নকল অচিরেই চালু হয়ে যায়।

৭. শাতবাহন যুগের জল পাত্র—নেওয়াসা-য় দাক্ষিণাত্য কলেজ-এর খনন থেকে পাওয়া।

বিভাগ- ২ : উৎপাদন (৮-২৬)

৮. সিন্ধুর সীলমোহরের উপর 'গিলগামেশ'। আদিরূপটি মেসোপটেমিয়ার সব পর্যায়ের সিলিন্ডার-সীল প্রস্তুতিতেই ব্যবহার করা হয়েছে ঃ শ্মশ্রুধারী, উলঙ্গ (শুধু একটি বেল্ট পরিহিত), সিংহহন্তা যোদ্ধা—যাকে সুমেরীয় বীর বলে মনে করা হয়। সিন্ধুর নমুনাটি বেল্টবিহীন, অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ (যদিও ঐ ধরনের আর একটি অশোধিত সীলমোহরের কথা জানা যায়) এবং শ্বাসরুদ্ধ জন্তুগুলি বাঘ বলে মনে হয়। এই সীলমোহর এবং পরেরটি মেসোপটেমিয়া ও ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের একই স্তরের ইঙ্গিত বহন করে এবং সেই সঙ্গে বাণিজ্যেরও।

৯. 'এনকিডু' ঃ মহাকাব্যে এই ষন্ড-মানবকে গিলগামেশ-এর এক বন্ধু বলা হয়েছে এবং হামেশাই চিত্রিত হয়েছে মেসোপটেমিয়ার সীলমোহরগুলিতে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সিন্ধুর সীলমোহরগুলির একটিতেই মাত্র একে পাওয়া গেছে।

১০. গাধা ও কাথিয়াবাড়ের ধরনের একটি ছোট কুঁজওয়ালা ষাঁড়ে ঘোরানো পারস্যের জলচক্র; ব্রিটিশ মিউজিয়মের একটি মিনিয়েচার। পারস্যের জলচক্রের কথা সপ্তম শতাব্দীতে জানা ছিল (*হর্ষচরিত* ৯৪,১০৪), কিন্তু আপাতভাবে কন্সট্যানটাইনের মেট্রোডোরাস কর্তৃক অনেক আগেই পশ্চিম পাঞ্জাবে তার প্রচলন করা হয়েছিল, (ম্যাকক্রিন্ডল, *এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া*, পৃ. ১৮৫)।

১১. সিন্ধু কুঁজওয়ালা ষাঁড়। ছবিতে যেমনটা দেখা যাচ্ছে এর কারুকার্য তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর, কেননা সীলমোহরে দুটি তল কৌণিকভাবে আছে, যে কারণে সামনের দিক থেকে ছবিতে মাথাটি ছোট দেখাচ্ছে।

১২. সূচের কাজ করা কাপড়ে সজ্জিত মন্দিরের ষাঁড়; এর মূল কাজ জ্ঞানেশ্বরের পালকি আলন্দি থেকে পান্ধারপুরে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং বিশাল বাৎসরিক শোভাযাত্রায় তা ফিরিয়ে আনা। আঠারো শতকের শেষ নাগাদ হৈবত বাবার আমল থেকে এই শোভাযাত্রা গুরুত্বে ও আকারে বেড়ে ওঠে, কিন্তু পবিত্র এই তীর্থযাত্রা তার বহু আগেও নিশ্চিতই ছিল এবং নব্য প্রস্তরযুগ-বসতির চিহ্নবাহী অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে পথটি গিয়েছিল। রঞ্জিত শিং ও একই ধরনের সজ্জা পরিহিত ষাঁড়েদের প্রদর্শনী হতো নবরাত্রে (অক্টোবরের অমাবস্যায় পরের ন'দিন)—যখন বেশিরভাগ গ্রামেই মালা পরানো ও সাজানোগোছানো ষাঁড়দের মিছিল বের করা হতো। এটা সম্ভবত প্রাচীন বলিদান প্রথা থেকেই এসেছিল।

১৩. ষন্ড, বেনারস ১৯৪০; শিবের ষাঁড়। এই ষাঁড়গুলির পাছায় নম্বর দেগে দেওয়া হয় যাতে সহজে ভবঘুরে ষাঁড়েদের থেকে একে আলাদা করা যায়।

১৪. বিশ্রামরত ভারতীয় মহিষ। ভারী, কৃষ্ণবর্ণ, মন্থর, বলিষ্ঠ, প্রজননশীল, অল্প যত্নেই উৎপাদনক্ষম, বাহ্যিকভাবে যা মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং এত নিরীহ যে শিশুও একে চরাতে পারে। কিন্তু নতুন কিছুর প্রতি সন্ধিহান এবং ক্ষেপে গেলে সত্যিই ক্ষমতা ধরে কোন বাঘ বা রেলইঞ্জিনকেও ধাক্কা দিতে। প্রকৃত অর্থেই এটি ভারতের জাতীয় পশু হতে পারত।

১৫. লাহোর মিউজিয়মে রক্ষিত কুষাণ যুগের গান্ধার রিলিফে লাঙল চষার দৃশ্য। ছবিতে দেখানো হয়েছে যুবা গোতম প্রথম ধ্যানে বসেছেন যখন তাঁর পিতা ও অন্য শাক্যবংশীয়েরা

হাল চষছেন; যে গাছটির নীচে তিনি বসেছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে তার ছায়াটি স্থির হয়ে ছিল। ভাস্কর্যটি একটা ধারাকে বহন করছে যা থেকে প্রমাণ হয় যে বুদ্ধদেবের পিতা কোন রাজা ছিলেন না, ছিলেন একজন উপজাতি গোষ্ঠীপতি—যিনি নিজের হাতে জমি চষতেন, আবার অস্ত্রবহনের অধিকারীও ছিলেন। এটা খাদ্য-উৎপাদনে পরিবর্তনকে বোঝায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্ণপ্রথার পরিবর্তন নয়। বুদ্ধ ও দেবতারা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু সে কথা পরিকল্পিতভাবে চেপে যাওয়া হয়েছে; চাষী ও ভারী লাঙল (কুঁজওলা ষাঁড় সমেত) কালবাহিত হয়ে চলেছে বিনা মন্তব্যেই।

১৬. পেশাওয়ার মিউজিয়মে রক্ষিত রিলিফে সাহ্‌রি-বাহ্‌লোল-এর বোধিসত্ত্ব বেদি; সম্ভবত এটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ দিককার। ডানদিকের লাঙল ও কর্মীরা আগের ছবিটির সঙ্গে

১৭. মই চষা। লক্ষ্য করার বিষয় বীজ পোতার গর্ত করা হচ্ছে একটাই হাত-নলের সাহায্যে এবং বীজ লাগানো হচ্ছে আলাদাভাবে, মেয়েদের দ্বারা।

১৮. কবীর তাঁত বুনছেন ও শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন। বৃটিশ মিউজিয়মের একটি মিনিয়েচার থেকে।

১৯. চর্মকারদের চৌবাচ্চায় মোষের কাঁচা চামড়া থেকে লোম ও মাংস তুলে ফেলার জন্যে চুনে ভেজানো হয়। চর্মকাররা হল ধোর জাত এবং কারখানার মালের তাড়ায় এরা গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে গেছে। পুঁজির অভাবে এরা পাকা চৌবাচ্চা, আধুনিক কারিগরি, সুরক্ষার জন্য রবারের বুট্ বা দস্তানা ব্যবহার করতে পারে না; সেই সঙ্গে, যেহেতু কাঁচা চামড়া তারা নগদে কিনতে পারে না তাই মধ্যস্বত্বভোগীদের দয়ার ওপরই তাদের নির্ভর করতে হয়। কুমোরদের অবস্থাও একই রকম। কারখানার উৎপাদনের জন্যে উভয়ই মার খাচ্ছে।

২০. অর্ধ পরিশোধিত চিনি উৎপাদন। আখের রস একটি বড় পাত্রে (ছবির ডানদিকের পিছনে) ফোটানো হয়, পাথরের বড় পাত্রে (ছবির সামনে) কিছুটা জমতে দেওয়া হয়। তারপর চটচটে হলে এটি চেঁছে তোলা হয় এবং ছাঁচে চেপে চেপে দেওয়া হয়।

২১. অম্বরনাথে গ্রামের কুটীর ; কাঠ ও বাজরার খড় দিয়ে তৈরি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত।

২২. মাটি ও কেরোসিনের পুরনো ড্রামের টিন দিয়ে তৈরি মাঙ ঝুপড়ি। জাতের কারণে এটাকে অন্য ঝুপড়িগুলি থেকে তফাতে থাকতে হয়েছে; পয়সার অভাবে ঝুপড়িটাকে ভালভাবে বাঁধাও যায়নি, যেহেতু এর বাসিন্দা নিজেই একজন জমির খাজনা না-দেওয়া জবরদখলকারী।

২৩. ১৯৫১-র বিহারের দুর্ভিক্ষে মহিলারা অপেক্ষা করছে ত্রাণের খাদ্যের আশায়। ১৯৪৩-এ ব্রিটিশ শাসন ও যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বাংলার দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। কিন্তু এখন, মৌলিক কারণগুলিকে দূর না করে বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও দুঃখদুর্দশা না কমিয়েই রেল ও সরকারের কাজের প্রত্যক্ষ কারণে একটা ছোটখাটো দুর্ভিক্ষ হলো।

২৪. জ্বালানী হিসেবে গোবর থেকে ঘুঁটে তৈরি। এর ফলে মাটির উর্বরতা কিছুটা কমে, অন্যদিকে গাছ ধ্বংসও ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।

২৫. স্বাধীনতার পর ভারত সরকার নির্মিত সিন্ধ্রি সার কারখানা। কোন বেসরকারী উদ্যোগ বা ইংরেজরা উৎপাদনে এই অতি আবশ্যক অগ্রগতি ঘটাতে পারত না।

২৬. ভাকরা-নাঙাল জলপ্রণালী—আর একটি রাষ্ট্র পরিকল্পিত জাতীয় প্রকল্প। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচের জন্য জল সরবরাহ এবং গৃহ ও কারখানায় ব্যবহারের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই ধরনের বহুমুখী পরিকল্পনা আরও অনেক বেশি সংখ্যায় নেওয়া দরকার। এগুলির আরও আকর্ষণীয় কাজ হলো শাসক শ্রেণীর জন্য বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা।

বিভাগ-৩ : মুদ্রা (২৭-৪১)

(বেছে নেওয়া নমুনাগুলি (২৭-৪১) ঐ সময়কালের প্রধান প্রচলিত মুদ্রা নয়, কিন্তু নির্বাচন করা হয়েছে এগুলির অস্বাভাবিক চরিত্রের কারণে। নিয়মিত মুদ্রাগুলির সম্পর্কে জানার জন্য পাঠকরা ভারতীয় মুদ্রা বিজ্ঞান বিষয়ে র‍্যাপসন, ক্যানিংহাম, ভি এ স্মিথ, জে অ্যালান, আর বি হোহাইটহেড এবং অন্যান্যদের বৈশিষ্ট্যমূলক কাজগুলির সাহায্য নিতে পারেন।)

২৭. পূর্ব খান্দেশ ভান্ডার থেকে পাওয়া অশোক-পূর্ব ছাপ-চিহ্নিত রৌপ্য মুদ্রা (*জে এন এস আই* ৮, ১৯৪৬, পৃ ৬৩-৬)। এটা হলো পুরনো কার্ষপণ।

২৮. পিউকেলাওটিস-এর মুদ্রা। উল্টো দিকে কুঁজওয়ালা ষাঁড়-এ গ্রীক লিপিতে TAUROS ও খরোষ্ঠি। সোজা দিকে আছে পিউকেলাইটিস-এর 'তাইচি' (প্রজনন ও সুরক্ষার দেবী); তাঁর মাথায় পদ্মের মুকুট, ডান হাতে পদ্ম এবং বামহাতে পদ্মের বীজ-ফল (যেমনটা যদু মন্দির ভাস্কর্যে অপ্সরাদের থাকে)—এ দুটিই প্রজননের প্রতীক। খরোষ্ঠি লিপিতে আছে ঃ পখলবড়ি-দেবড়া AMBI—অর্থাৎ ইনি একজন দেবীমাতৃকা।

২৯. মেনান্দার। এটা হলো পুনার আইনজীবী শ্রী এস এ জোগলেকার-এর সংগ্রহে থাকা মুদ্রার মতোই যার কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম অংশে বলা হয়েছে। সোজা দিকে আছে মেনান্দার-এর প্রতিকৃতি ঃ BASILEOS SOTEROS MENANDROU। উল্টোদিকে, জ্ঞানের দেবী এথেনী ঃ *মহারাজস ত্রতারস মেনমদ্রস।*

৩০. অ্যাপোলোডোটোস, পুনার কাছে পাওয়া গেছে। সোজাদিকে হাতি এবং লেখা আছে BASILEOS APOLLODOTOU SOTEROS। উল্টোদিকে, কুঁজযুক্ত ষাঁড় এবং *মহারাজস অপুলুদতস ত্রতরস।*

৩১. নহপাণ। সোজাদিকে রাজার প্রতিকৃতি; সঙ্গে গ্রীক অক্ষরে লেখা ঃ *রন্নিও নাপনস কারতস।*

৩২. অভিনব শাতবাহন প্রতিকৃতি সমন্বিত রৌপ্য মুদ্রা; আগে প্রচলিত এক পরিচিত শাতকর্নি, সম্ভবত গোতমীপুত্রের অনুকরণে তৈরি।

৩৩. যৌধেয় উপজাতি মুদ্রা।

৩৪. উদুম্বর উপজাতি মুদ্রা।

৩৫. চন্দ্রগুপ্ত ও লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমারদেবীর যৌথ নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা।

৩৬. প্রথম কুমারগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা ঃ ঘোড়ার পিঠে বসে গন্ডারকে তাড়া করছেন।

৩৭. শ্রী-হ ; বোম্বের প্রিন্স ওয়ালেস মিউজিয়মে গচ্ছিত ৯৯৪ টি রৌপ্যমুদ্রার এক ভান্ডার থেকে। সোজা দিকে, শ্রী-হ। উল্টোদিকে, সাসানিয়ান ধাঁচের যজ্ঞদেবী। সব মুদ্রাগুলিই দেখতে এক রকম, কিন্তু ওজনের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে এগুলি অবশ্যই বিভিন্ন সময়ে তৈরি করা হয়েছে। এবং অসম সময়কাল ধরে বাজারে চলেছে।

ওজনের নির্দিষ্ট মানটা (৩.৫১ গ্রাম) কার্ষাপণ-এর সমান, কিন্তু তফাৎটা (০.০৩০৭) অনেক বেশি। কনৌজের হর্ষ যে এটি আরোপ করেছিলেন তার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই।

৩৮. সামন্তদেব, দশম শতাব্দীর প্রথমদিকের সীমান্ত অঞ্চলের (ওহিন্দ, উন্দ) রৌপ্যমুদ্রা। সোজাদিকে, কুঁজওয়ালা ষাঁড়। লেখা—শ্রী-সামন্তদেব। উল্টোদিকে, ঘোড়ার পিঠে বীর, ভি। ইতিমধ্যে, যে বীর একহাতে শত্রুকে প্রতিহত করেছিলেন তিনি একটা নিজস্ব যুদ্ধরীতির জন্ম দেন এবং সংস্কৃতে একটি বিশেষ অভিধা লাভ করেন, 'নাসির'।

৩৯. গজনীর মাহমুদ-এর দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা (১০৩০ খ্রী.)ঃ আরবী ও সংস্কৃত লিপিযুক্ত।

৪০. আকবরের রৌপ্যমুদ্রায় রাম ও সীতা বনবাসে যাচ্ছেন। এটা ছিল বর্ণ হিন্দু ও মুসলিম সামন্ত অভিজাতদের ঘনিষ্ঠতার যুগ।

৪১. জাহাঙ্গীরের প্রতিকৃতি-মুদ্রা।

বিভাগ-৪ : ধর্ম (৪২-৫১)

৪২. সূর্য রাহুমুক্ত হবার পর ১৯৫৪-এ কুরুক্ষেত্রে স্নানের ভিড়।

৪৩. সাঁচী। স্তূপের সমাহার ক্ষেত্র। মনে হয়, স্থানটির নতুন নাম হয়েছে কাকিনাড়-বোত। প্রাচীন কালেই স্তূপটিকে ব্যাপক পরিবর্ধিত করা হয়, ১৯ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ রত্নদস্যুদের হাতে তা ধ্বংস হয় এবং পুনর্নির্মাণ হয় বিশ শতকে।

৪৪. মোহেঞ্জোদারোর 'বৃহৎ স্নানাগার'-এর ধ্বংসাবশেষ। এই জলাধারটির আয়তন প্রায় ২৯ ফুট x ৪১ ফুট, এবং ডানদিকের একটি ঘরের মধ্যেকার কূয়ো থেকে এটি জলভর্তি করা হতো। এর সঙ্গে যুক্ত আচার পালনের কারণে ঘরগুলি পুষ্করটির তিনদিক ঘিরে সম্প্রসারিত। *জে বি বি আর এ এস* ২৭ (১৯৫১), ১-৩০-এ 'উর্বশী ও পুরুরবস' শীর্ষক আমার লেখার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৪৫. বেড়সা, বিহার গুহার অভ্যন্তরের শেষ প্রান্তে লাল (?) রঙে রঞ্জিত যমাই-এর রিলিফ মূর্তি; সংলগ্ন চৈত্যগুহার সূক্ষ্ম স্তম্ভশীর্ষগুলির তুলনায় এর কাজ অনেক অমার্জিত, কিন্তু যমাই-এর প্রতি বিশ্বাস আজও জীবন্ত! গ্রামবাসীরা তাঁর কাছে পূজা ও বলি (সাধারণত নারকেল) দেয়, দীর্ঘদিন পূজা বাকি পড়লে তিনি তাদের স্বপ্নে তাগাদা দেন। অন্যদিকে, স্বপ্নে নির্দেশ না পেলে, কার্লে-তে মনে হয় কোন নিয়মিত পূজা হয় না।

৪৬. স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়া কোন এক অখ্যাত বিধবার সতী স্মৃতিসৌধ, অম্বরনাথ। এটি সম্ভবত ১৭ শতকের প্রথম দিককার।

৪৭. কার্লে-তে চৈত্য গুহার প্রবেশ মুখ। কোন ভিক্ষুর প্রার্থনা কক্ষ হিসেবে ৫০ নং চিত্রের মতোই বিস্ময়কর অলংকরণ। এ দুটিই তৈরি হয়েছিল দাতা বা তাদের পিতামাতার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে, যদিও প্রায়শই বলা হয় যক্ষদের।

৪৮. অর্থের বিনিময়ে জমি ক্রয় বিষয়ে প্রাপ্ত প্রাচীনতম সাক্ষ্য ভারহুত রিলিফ ; ভূমিকে মুদ্রা দিয়ে ঢেকে কিনে নিয়ে অনাথপিন্ডক সুদত্ত শ্রাবস্তীতে নৃপতি জেতার কুঞ্জবন দান করছেন। মুদ্রাগুলি ছাপচিহ্নিত এবং সে ছাপের মানুষগুলির কেশবিন্যাস আজকের দিনে কিছুটা বেখাপ্পা—যদিও মজুর, বলদ টানা গাড়ী বা সুরা পাত্র অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

৪৯. বেনারসে আওরঙ্গজেব কর্তৃক মহাদেবের মন্দির ভেঙে তৈরি বিখ্যাত মসজিদ। ধর্মীয় বিচারে উত্তেজনা ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের এই সাক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ৪০ নং চিত্রটি। বেনারসের ঘাটটি ছিল বাঁশ কেনাবেচার একটি কেন্দ্র।

৫০. চৈত্য গুহায় স্তম্ভশীর্ষ, কার্লে।

৫১. মামল্লপুরমে পল্লবদের বিখ্যাত পর্বত খোদাই-এর বামপার্শ্বে অসংগত এক বিষ্ণুমূর্তি। মামল্লপুরম বা মহাবলীপুরম হল মাদ্রাজ থেকে ৩৬ মাইল দক্ষিণে, সমুদ্রতীরে। দৃশ্যটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা শিবের উপস্থিতিতেই তপশ্চর্যা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং বিষ্ণুমূর্তি খোদাইয়ের ফলে অন্তত্পক্ষে চারটি মূর্তি (সামনের দিকে মুন্ডচ্ছেদিত একটি সমেত) দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যদিও মূল কাহিনীতে বিষ্ণুর তখন কোন ভূমিকাই ছিল না। স্মার্ত-বৈষ্ণব এই বিবাদের নিহিত কারণ হিসেবে উপর থেকে সামন্ততন্ত্র ও নীচের থেকে সামন্ততন্ত্রের বিরোধকে দেখা যেতে পারে, যদিও রাজারা হয়ত গুপ্ত যুগের পর থেকে কোন একটির বা উভয় দেবতার উপাসনা করত। মহাবলীপুরমের বিষ্ণু বিষয়ে আর একটি ব্যাখ্যা (অত্যন্ত গোলমেলে)-র জন্য দ্রষ্টব্য : এল বি কেনি, *এ বি ও আর আই* ২৯, ২১৩-২৬।

বিভাগ-৫ : সামরিক শিল্পকলা (৫২-৫৭)

৫২. গান্ধার রিলিফে মায়াবী মার-এর রাক্ষস সৈন্যদল। নীচের দিকের সেনারা রোমান যোদ্ধাদের ধাঁচে সজ্জিত—যদিও একটি দেহবর্মের অংশগুলি ওপরে উঠে থাকায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। মার শব্দটি এসেছিল ইরানীয় অহ্‌বিমন থেকে।

৫৩. বোম্বের বোরিভলি স্টেশন থেকে দু'মাইলেরও কম দূরত্বে খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পরবর্তীকালে নয় এমন এক অজ্ঞাত নৌযুদ্ধে নিহত বীরদের স্মৃতিতে সারিবদ্ধ সমাধিফলক।

৫৪. ১৭৩১-এ অ্যাংগ্রিয়াসদের হাতে তাদের দ্বীপ দুর্গ জঞ্জিরা কুলাবা (বোম্বের বিপরীতে আলিবাগ-এর দিকে) থেকে দূরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নৌবহরের পরাজয়। শ্রী জি এইচ খার-এর বদান্যতায় তৎকালীন একটি অঙ্কিত ছবির (জল রঙে) পাকানো কাগজ বর্তমান পুনার ভারত ইতিহাস সংশোধক মন্ডল-এ রক্ষিত আছে। ছবিটির নীচের মাঝখানে সাখোজি বাবা কর্তৃক একটি ব্রিটিশ জাহাজকে আটক করা হয়েছে এবং উপরের বাঁদিকে আর একটি লড়াইয়ের আংশিক দৃশ্য। উপরের ডানদিকে উপকূল থেকে কিছুটা দূরে সমুদ্রে পাতা মাছ ধরার জাল। উভয়পক্ষের জাহাজগুলিকেই দেখা যাচ্ছে আকার, গঠন, অস্ত্রসজ্জা এবং দড়ি, পাল ইত্যাদিতে পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয়। ১৭৩৯-৫৭-য় ব্রিটিশরা পেশোয়াদের সঙ্গে জোট বেঁধে শেষ পর্যন্ত আংগ্রিয়াসদের পরাস্ত করে। এরা উভয়েই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সমুদ্র অধিপতি (কানহোজি আংগারে, যিনি অভিযানের আগেই দেহত্যাগ করেন, ছিলেন মারাঠা নৌবহরের সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ এবং সরখেল উপাধিধারী)-দের ভয় করত, কেননা তারা পুনা ও কোঙ্কন-এর মধ্যেকার অধিকাংশ দুর্গকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল। এর ফলশ্রুতি হয়েছিল যে, জাহাজ নির্মাণ ও বৃহৎমাত্রায় পণ্য পরিবহন ব্যবসা এরপর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া হয়ে যায় এবং ভারতীয় জাহাজ পরিবহন পড়ে থাকে আদিম স্তরে।

৫৫. বিজাপুর দুর্গের দেওয়ালে মালিক-ই-ময়দান কামানের মুখ। গোলার ব্যাস (২ ফুট ৪ ইঞ্চি) বোঝানো হয়েছে মানুষের ছবি দিয়ে ; এই নলের উপযোগী পাথরের গোলা এখনও আছে। কামানটি আহ্‌মদনগরে ঢালাই করা হয়েছিল পিতল দিয়ে—১৫৪৯ খ্রীস্টাব্দে তুর্কি ইঞ্জিনিয়ার মুহম্মদ বিন হাসান রিউমি-র তত্ত্বাবধানে। কামানের মুখের নকশাটি প্রতীকী—দেখানো হয়েছে একটি হস্তি (কামানের গোলা) এক ড্রাগনের মুখে আঘাত হানছে। ব্যবহারের জন্যে যতটা না তার চেয়ে বেশি আড়ম্বরের জন্যে হলেও কামানের ভিতর মুখের মসৃনতা সামন্তযুগের এই ব্যর্থতাকে প্রমাণ করে যে তা প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনেক পেছিয়ে ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়নগর রাজ্যের পদাতিক বাহিনী ছিল নিশ্চিতভাবেই দুর্বল—যদিও কৃষ্ণ দেব রায় (নং ৬৩)-এর পর হিন্দু রাজারা প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন। এই পার্থক্য চূড়ান্ত যুদ্ধে (জানু, ২৩, ১৫৬৫ তাগড়ি-রাকসস্-এ বা কখনও কখনও বলা হয় 'তালিকোটা-র') বিপর্যয় ডেকে আনে এবং বিজয়নগর সেনাবাহিনী, রাজধানী ও রাজার বিনাশ ঘটে। বলা হয়, প্রদর্শিত কামানটি ৬০০ বাছাই করা কামানের মধ্যে বৃহত্তম এবং এগুলিতে ছররা গুলির পরিবর্তে তামার মুদ্রায় ব্যাগ ভর্তি করে বিজয়নগরের সেরা সেনাবাহিনীর প্রতি-আক্রমণকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে মুসলিম জোটের জয় সুনিশ্চিত হয়। কামানটির রক্ষক ও স্থানীয় কিছু লোকজনের দ্বারা এর উপরে একটি পূজ্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৫৬. গোয়ালিয়র দূর্গ, 'দুর্গগুলির মধ্যে রত্নবিশেষ' ঃ ১৫ শতকের শেষে নির্মিত রাজা মান সিংহ-র প্রাসাদের দৃশ্য। ষষ্ঠ শতকের শুরুতে পর্বতশীর্ষটি (তখন বলা হত গোপগিরি) ছিল মিহিরগুলের নেতৃত্বাধীন হুনদের দখলে। কিন্তু বাণিজ্য পথগুলির সংযোগস্থল হিসেবে একে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রথম গুপ্ত সম্রাটের আমলের আগেই একে নিশ্চিতই সুরক্ষিত করা হয়েছিল। এই প্রাসাদ থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বিখ্যাত ঘরানা জন্ম নিয়েছিল।

৫৭. লোহগড়-এর বহিঃপ্রতিরক্ষা (*আই জি* ১৬.১৭০)। প্রধান ফটকের ভিতরের দিকের দেওয়াল এবং কার্লে ও ভাজা থেকে (বামদিকে) পৌনা উপত্যকা ও উপকূলের দিকে যাওয়া গিরিবর্ত্ম থেকে তোলা ছবি। টিকে থাকা সুরক্ষা ব্যবস্থা বাহ্‌মনি আমলের আগের নয়।

বিভাগ-৫ : দরবারী জীবন ও প্রতিকৃতি (৫৮-৬৪)

৫৮. প্রধান অমাত্যদের উপস্থিতিতে জাহাঙ্গীর তাঁর পুত্রকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। মূল রঙ সম্বলিত এই প্রতিকৃতি চিত্রটি মুঘল শিল্পকলার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন এবং এই শিল্পকলা আকবর ও জাহাঙ্গীর-এর আমলে এক চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছেছিল। অমাত্যদের বংশানুক্রমিক হিসেবে নেওয়া হতো না বরং বিভিন্ন অঞ্চল, ধর্ম ও গোষ্ঠীগুলি থেকে সযত্নে নির্বাচন করা হতো—যাতে না কোন শক্তিশালী বিরুদ্ধ জোট গড়ে ওঠে। এর অর্থ প্রকৃত সামন্ত ভূম্যাধিকারীদের হাতে ক্রমান্বয়ে বেশি ক্ষমতা চলে যাওয়া।

৫৯. কলহস্তি-র শিব মন্দিরে নিবেদিত মেষশাবক সমেত চোল আমলের কোন অজ্ঞাত সামন্ত দম্পতি। জোড়হস্ত অভিব্যক্তিটি কার্লে-র দাতা দম্পতি (চিত্র ৪৭)-র বিপরীত।

৬০. মথুরার মিউজিয়মে রক্ষিত হলুদ বেলেপাথরের খোদাই মুন্ডহীন কনিষ্ক। লিপিগুলি বৈশিষ্ট্যসূচক, কেননা কুষাণরাজের উপাধি সেখানে দেবপুত্র—যা চীনদেশের 'স্বর্গের পুত্র'-র নকল। সূর্য-দেবতার মূর্তিতেও যখন নরত্বারোপ করা হয়েছে (যেমন, গোয়ালিয়রের আর্কিওলজিকাল মিউজিয়মে দুটি ও দিল্লির একটি মূর্তিতে করা হয়েছে) তখনও একই ধরনের অপহরণ ও আরোপণ চলেছে—যেটা কুষাণ যুগে শাকদ্বীপ থেকে ম্যাজিয়ান পুরোহিতদের সাথে সাথে ধর্মবিশ্বাস আমদানি হয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যাশিতই ছিল।

৬১. বিজয়নগর রিলিফে রাজকীয় চিত্তবিনোদন—অর্থাৎ অশ্বারোহণ, শিকার, মল্লভূমিতে লড়াই, হারেমের দৃশ্য ইত্যাদির পুনরীক্ষণ।

৬২. চিদাম্বরমের সুব্রহ্মন্য মন্দিরের সম্মুখভাগে দরবারী নর্তকীর দল, সঙ্গে গায়ক ও বাদক-রা।

৬৩. দুই প্রধান রানি সহ বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব-রায় (১৫০৯-২৯); শ্রীনিবাস পেরুমল মন্দিরে জোড়হস্ত তামার পেটাই মূর্তি। রাজার প্রিয় রানি চিন্না দেবী বা নাগলা দেবী (তাঁর ডানদিকে) ছিলেন একজন রাজনতর্কী। রাজা তাঁর নামে নাগলাপুরম নগরটি পত্তন করেন (আধুনিক হসপেট) এবং তা ছিল বিজয়নগর থেকে বনবাসী হয়ে ভট্কল বন্দরের দিকে যাবার যে শিরা-উপশিরার মত বাণিজ্যপথ তার উপর প্রথম ঘাঁটি।

৬৪. তাঞ্জোর-এর বৃহদীশ্বর মন্দিরে পরবর্তীকালে অনুকৃত রাজেন্দ্র চোল-এর জোড়হস্ত ব্রোঞ্জমূর্তি।



চিত্র ১



চিত্র ২



চিত্র ৩



চিত্র ৪



চিত্র ৫



চিত্র ৬



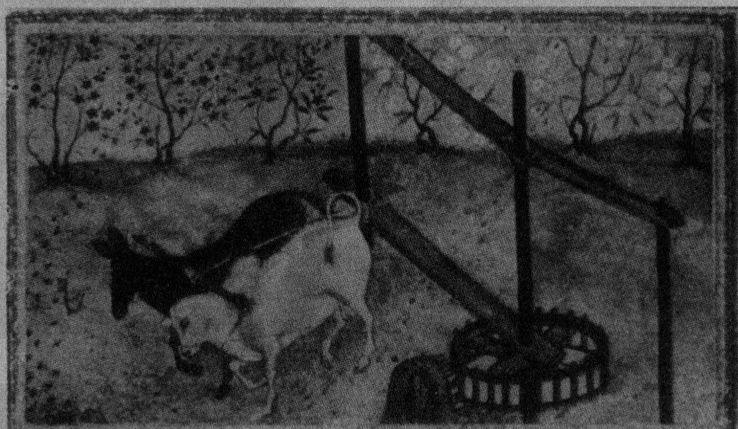
চিত্র ৭



চিত্র ৮



চিত্র ৯



চিত্র ১০



চিত্র ১১



চিত্র ১২



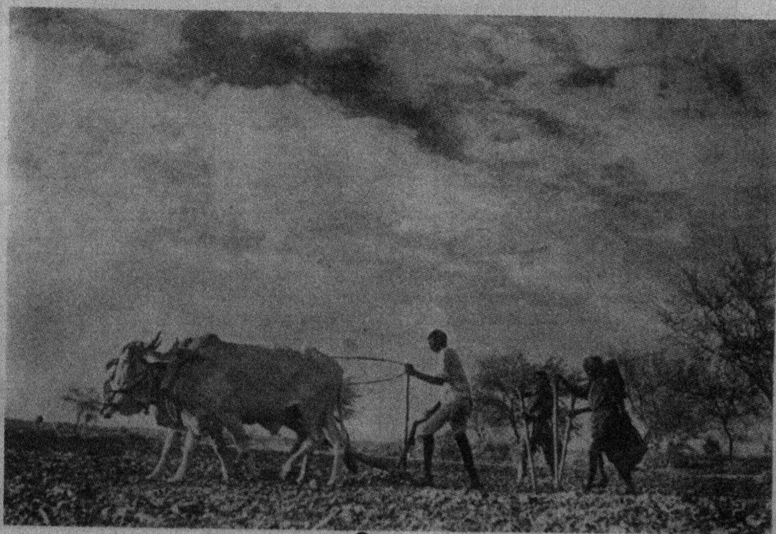
চিত্র ১৩



চিত্র ১৪


চিত্র ১৫

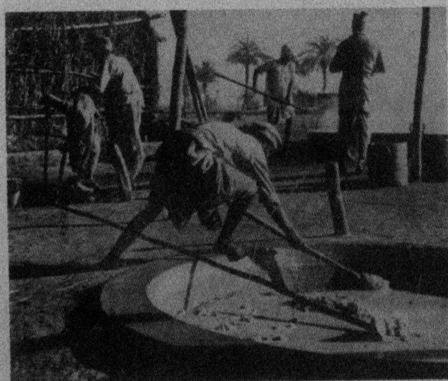

চিত্র ১৬


চিত্র ১৭

চিত্র ১৮



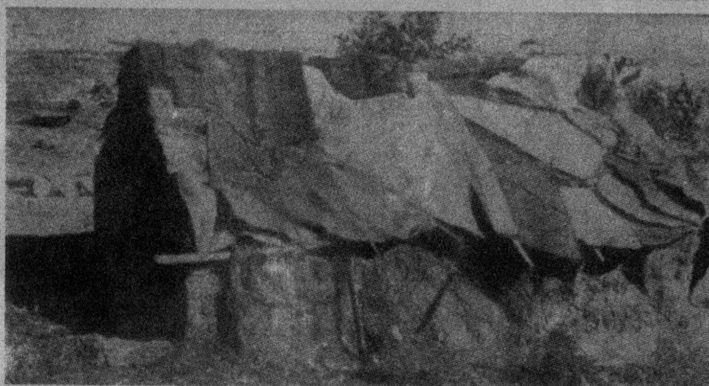
চিত্র ১৯



চিত্র ২০



চিত্র ২১



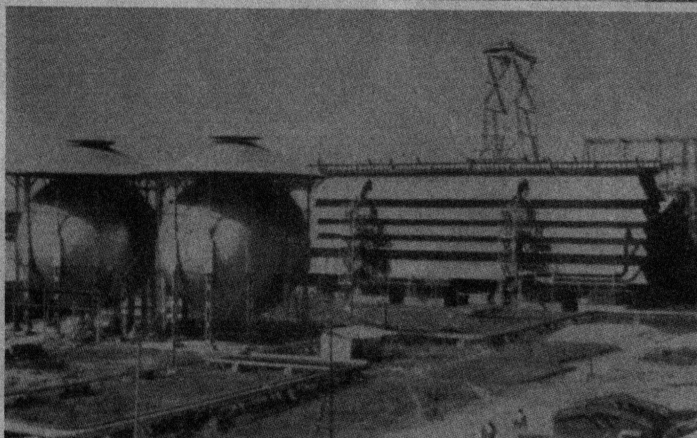
চিত্র ২২



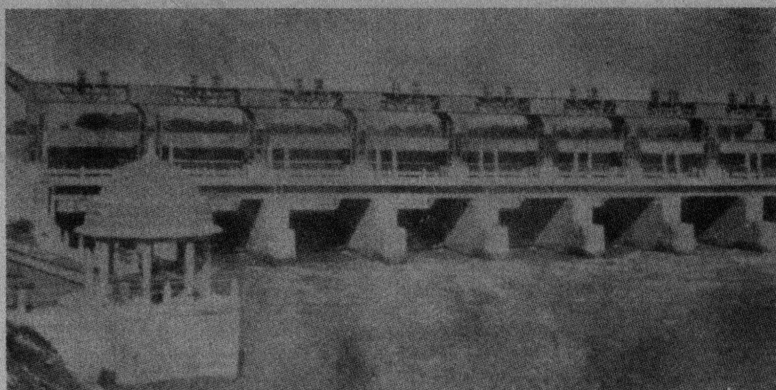
চিত্র ২৩



চিত্র ২৪



চিত্র ২৫



চিত্র ২৬



চিত্র ২৭(ক)



চিত্র ২৭(খ)



চিত্র ২৮(ক)



চিত্র ২৮(খ)



চিত্র ২৯(ক)



চিত্র ২৯(খ)



চিত্র ৩০(ক)



চিত্র ৩০(খ)



চিত্র ৩১(ক)



চিত্র ৩১(খ)



চিত্র ৩২(ক)



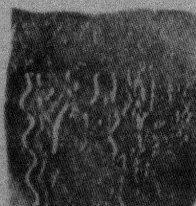
চিত্র ৩২(খ)



চিত্র ৩৩(ক)



চিত্র ৩৩(খ)



চিত্র ৩৪(ক)



চিত্র ৩৪(খ)


চিত্র ৩৫(ক)


চিত্র ৩৫(খ)


চিত্র ৩৬(ক)


চিত্র.৩৬(খ)


চিত্র ৩৭(ক)


চিত্র ৩৭(খ)


চিত্র ৩৮(ক)


চিত্র ৩৮(খ)


চিত্র ৩৯(ক)


চিত্র ৩৯(খ)

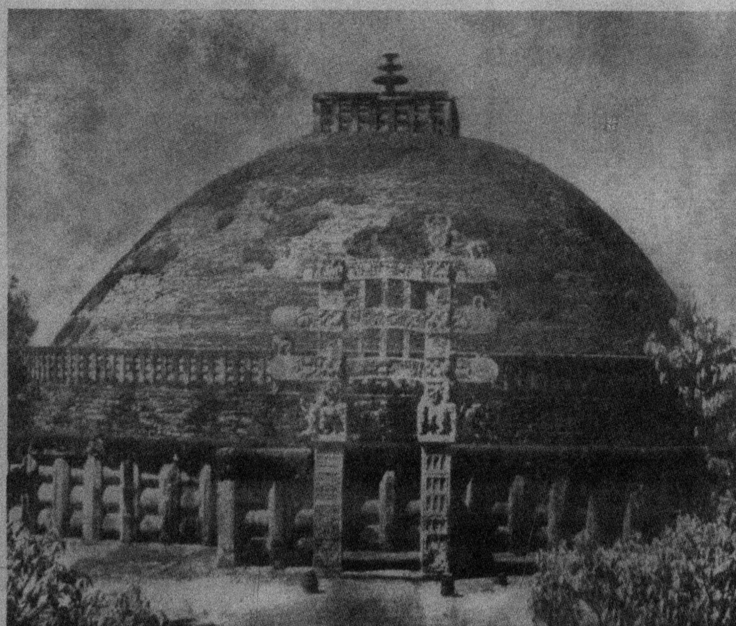

চিত্র ৪০(ক)


চিত্র ৪০(খ)


চিত্র ৪১(ক)


চিত্র ৪১(খ)

চিত্র ৪২



চিত্র ৪৩



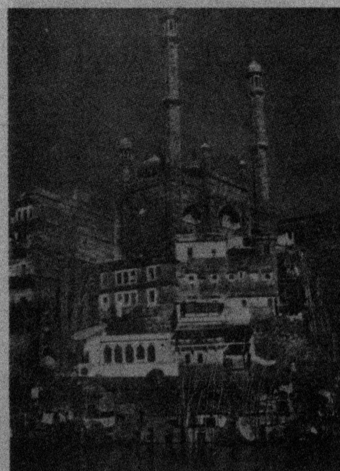
চিত্র ৪৪


চিত্র ৪৫


চিত্র ৪৬


চিত্র ৪৭


চিত্র ৪৮

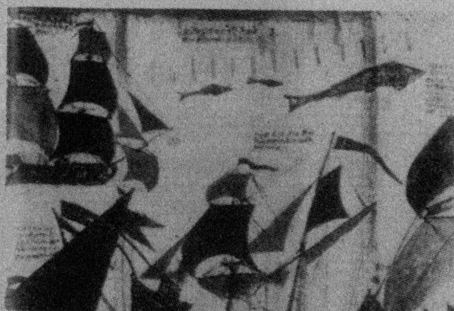

চিত্র ৪৯

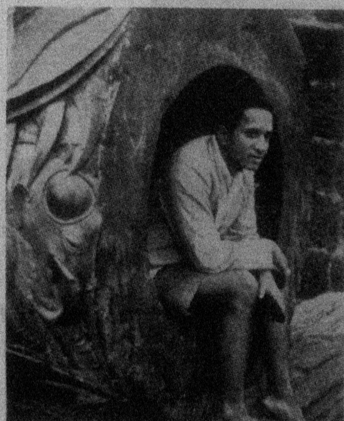

চিত্র ৫০


চিত্র ৫১

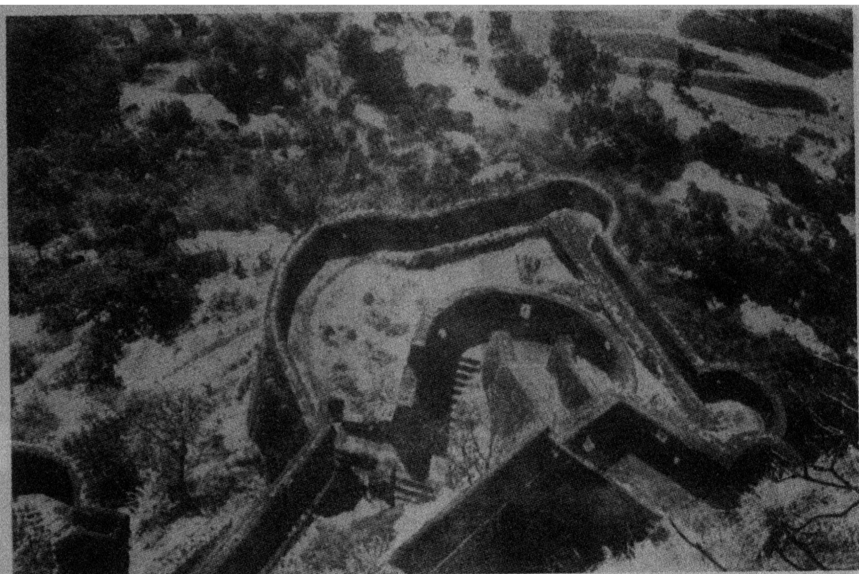

চিত্র ৫২


চিত্র ৫৩


চিত্র ৫৪


চিত্র ৫৫


চিত্র ৫৬



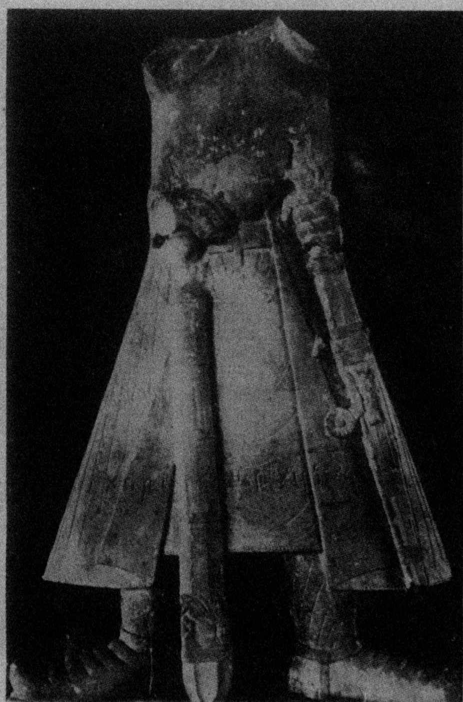
চিত্র ৫৭



চিত্র ৫৮

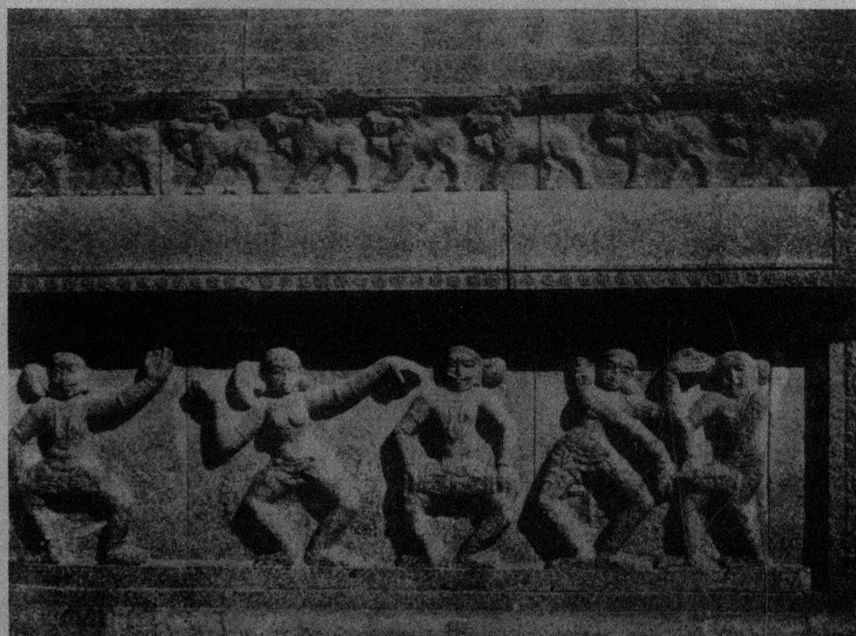


চিত্র ৫৯

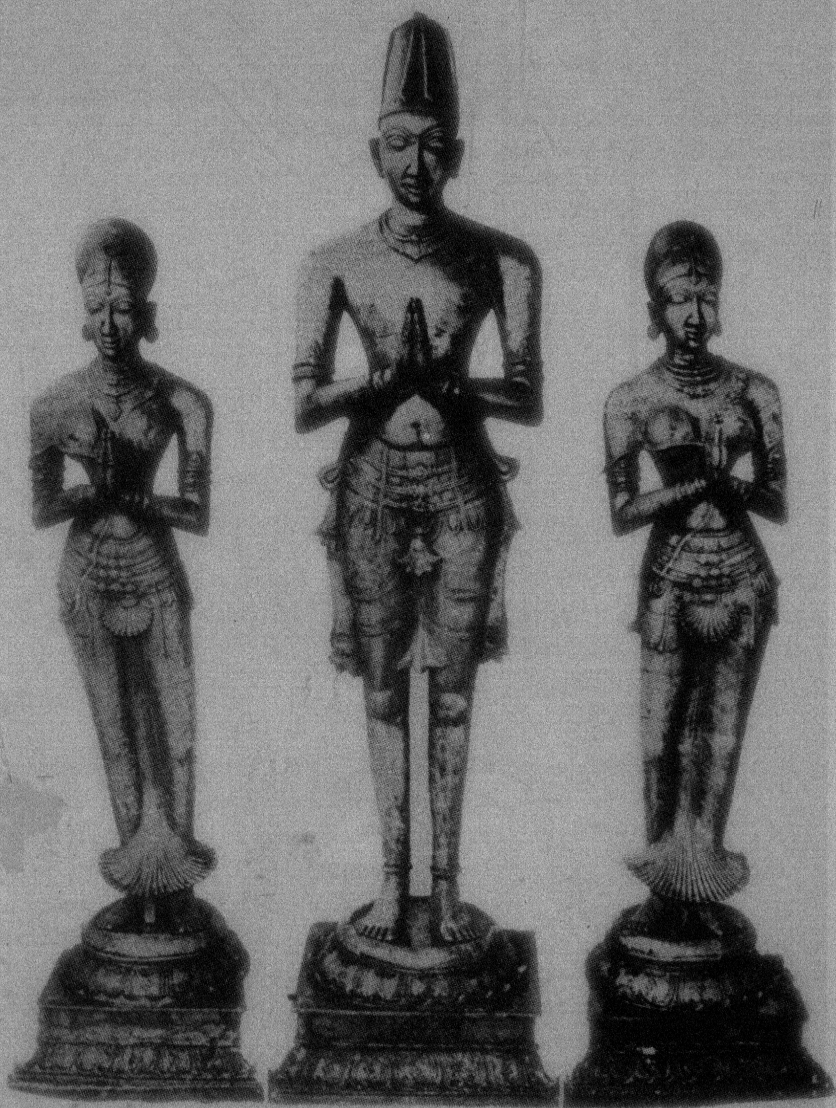


চিত্র ৬০

চিত্র ৬১



চিত্র ৬২


চিত্র ৬৩



চিত্র ৬৪

প্রথম অধ্যায়

লক্ষ্য ও পদ্ধতি

'ভারতবর্ষের কিছু উপাখ্যান আছে, কিন্তু কোন ইতিহাস নেই'—বিদেশী পণ্ডিতদের এই অগভীর ব্যঙ্গোক্তিকেই ভারতের অতীত সম্পর্কে তাঁদের অধ্যয়ন, উপলব্ধি ও বুদ্ধিমত্তার অভাবের সপক্ষে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়। পরবর্তী আলোচনা প্রমাণ করবে যে, যথার্থ অর্থে এই উপাখ্যানগুলিই—পাঠ্যবইগুলিতে *ঠেসে* দেওয়া রাজা ও রাজবংশগুলির তালিকায় বা যুদ্ধ ও পরাক্রমের রঙ চড়ানো কাহিনীগুলির ভিড়ে—ভারতীয় নথি থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এখানে, এই প্রথম, আমাদের এমন এক ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করতে হবে যা হবে উপাখ্যান ব্যতিরেকে—অর্থাৎ, যা কিনা ইউরোপীয় ঘরানার ইতিহাস-এর মতো হবে না।[১]

১.১ এই কাজের লক্ষ্য থেকেই, *ইতিহাসের সংজ্ঞা হল—উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সম্পর্কের ক্রমবিকাশের কালানুক্রমিক বিবরণীর উপস্থাপন।* এর নিহিতার্থ বা কার্যকর ব্যবহার-বিধি সম্পর্কে আলোচনায় আসার আগে, আমরা দেখব, কেন এই সংজ্ঞা-র প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ, তার সাহিত্যকৃতির বিশাল ঐতিহ্য সত্ত্বেও—হেরোডোটাস, থুসিডাইড্স, পলিবিয়াস্, লিভি বা ট্যাসিটাস্-এর সঙ্গে তুলনীয় কোন ইতিহাস-রচয়িতার জন্ম দেয়নি। মধ্যযুগের বহু ভারতীয় রাজাই (যেমন, হর্ষবর্ধন, আনু. ৬০০-৬৪০ খৃ.) শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগে তাঁদের সমকালীন ইউরোপীয় শাসকদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রবর্তী ছিলেন; বড় বড় যুদ্ধজয়ের জন্য বিশাল বিশাল সেনাবাহিনীও তাঁরা নিজেরা পরিচালনা করেছেন। কিন্তু জুলিয়াস সিজারের *কমেনটারিজ* বা জেনোফেনের *অ্যানাবেসিস*-এর মত বর্ণনাত্মক কোন রচনার কথা কেউ ভেবেছিলেন বলেও মনে হয় না। ঐতিহ্যটা ছিল—শিল্পসমৃদ্ধ দরবারী নাটক, অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেবতাদের স্তব গাথা, অথবা কোন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ রচনার। নাম করার মত বড়জোর একটি মাত্র ভারতীয় আখ্যায়িকাই আছে—*রাজ তরঙ্গিনী,*[২] যা ১১৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলহন নামক এক কাশ্মিরী পণ্ডিত কর্তৃক সংস্কৃত ছন্দে রচিত এবং পরে তাঁর দুই উত্তরসাধকের দ্বারা পরিবর্ধিত হয়। কিন্তু এ আখ্যায়িকাও সংস্কৃত কাব্যের প্রচলিত রীতিগুলির দ্বারা আক্রান্ত, বিশেষ করে এর দুরূহ

দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতায়। ফলে, যতটুকু বাস্তবতাকে লেখক ফুটিয়ে তুলতে চান তা-ও প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। বিবরণীর বিস্তার-কালটি ছিল কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে কাশ্মীরের সামন্তপ্রভুদের তীব্র সংঘর্ষের অধ্যায়। কিন্তু, এমনকী প্রকৃত স্থান ও কাল যে অংশে বিবৃত হয়েছে তাকেও বিষয়বস্তুর সারবত্তা, গভীরতা ও উৎকর্ষের দিক থেকে থুসিডাইড্‌স-এর পেলোপনেসীয় যুদ্ধের বিবরণীর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। দেশের বাকি অংশের ক্ষেত্রে, মুসলিম শাসনকালের আগে পর্যন্ত, এমনকী কলহ্‌ন-এর মতো মানেরও কোন কিছু আমরা পাইনি—যদিও কলহ্‌ন (রাজদরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে যে কোন নথিপত্র তাঁর কাছে সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও) স্ব-ভূমির সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেকার ইতিবৃত্ত রচনার চেষ্টায় লোকগল্প, অতিকথা বা বিশুদ্ধ কল্পকাহিনীর কাছেই আত্মসমর্পণ করে ফেলেছিলেন। অতীতযুগ অন্বেষণের টিকে থাকা সূত্র হচ্ছে *পুরাণ*গুলি, যেগুলির ইতিহাসগত সারবস্তু অসংখ্য অমনোযোগী লিপিকারদের হাতে যুগ যুগ সম্পাদনায় অতিকথার কঠিন আবরণে আবৃত বা আধা-ধর্মীয় উপকথায় দ্রবীভূত হয়ে নিশ্চিহ্ন হতে হতে আজ শুধু ধর্মীয় কাহিনী ও নীতিগল্পে পর্যবসিত হয়ে গেছে; তাই, কারও পক্ষে, এমনকী যথাযথ রাজবংশ-তালিকার সংরক্ষণও দুরূহ হয়ে ওঠে।[৩] কিউনিফর্ম নথিগুলিতে, এমনকী সুমেরীয়রাও, এর চেয়ে অনেক বেশি তথ্য, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণ রেখে গেছে।

এ হেন অবস্থায়, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ইতিহাস লিখতে গেলে কি হয় তা একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে।[৪] এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে [সংখ্যা ৭২ (১৯০৩), পৃ. ১-১৩] সেসিল বেন্ডল নেপাল থেকে প্রাপ্ত সংস্কৃত মহাকাব্য *রামায়ণ*-এর একটি অংশের পাণ্ডুলিপির বর্ণনা দিয়েছেন—যার পরিচিতি-পত্র থেকে জানা যায় যে অনির্দিষ্ট কোন সম্বতের ১০৬৭ বৎসরে ত্রিহুত (বিহার)-এ গাঙ্গেয়দেব নামক এক রাজার রাজত্বকালে এটির অনুলিপি হয়েছিল। এই রাজাকে বর্ণনা করা হয়েছে গৌড়ধ্বজ হিসেবে, অর্থাৎ 'বঙ্গ বৈজয়ন্তী'। বেন্ডল এবং অন্যেরা অলঙ্কারমূলক এই উপাধির অর্থ 'বঙ্গবিজেতা' ধরে নিয়ে এই ব্যক্তিকে আলবিরুনির *কিতাব-উল-হিন্দ্*-এ[৫] (১০৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় রচিত) উল্লিখিত দাক্ষিণাত্যের কলচুরী-বংশীয় রাজা গাঙ্গেয়দেব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই, এই চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে ঃ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ কলচুরী রাজত্বের সময়কার যা কিছু পাওয়া গেছে তাতে এই বিশিষ্ট উপাধি বা বঙ্গ বিজয়ের সমর্থনে কোন উল্লেখ নেই। ১৯৪০-এ লাহোরে যখন পাণ্ডুলিপিটির একটি পরিচ্ছন্ন ফোটোস্টাট প্রদর্শিত হচ্ছিল তখন উপস্থিত গবেষকদের মধ্যে একজন লক্ষ্য করেন পরিচিতি পত্রটি ভুল পাঠ করা হয়েছে, প্রকৃত উপাধিটি ছিল 'গরুড় ধ্বজ'। অর্থাৎ একটিমাত্র অক্ষরের সামান্য পরিবর্তনে পুরো অর্থটিই পাল্টে গেছে। বঙ্গ বিজেতা হওয়াতো দূরের কথা এই ক্ষুদ্র নৃপতিটি বড়জোর গরুড়বাহন বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং পৌরাণিক কাহিনীর সে পক্ষিটি সম্ভবত রাজপতাকায় চিত্রিত হত। আপাতযুক্তিসম্মত হাল আমলের আরও একটি ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—তা হল, ১০১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলিম শাসন যখন সংহত হয়ে উঠছিল, দক্ষিণী (রাষ্ট্রকূট) এক ক্ষুদ্র অধীনস্থ শাসক তখন বিহারের একটি সীমিত অঞ্চলে শাসন করতেন। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্যসূত্রগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলনামূলকভাবে আধুনিক এবং পর্যাপ্ত প্রমাণ-সমন্বিত পর্বের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন—তা'তে ভারতে প্রথাগত ইতিহাসবিদদের অনুসৃত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করা যাবে।

অবশ্য, ইউরোপের চিরায়ত ঐতিহাসিক রচনাগুলিও পাঠকের কাছে আপনা থেকেই কোন অর্থ তুলে ধরে না বা নিখুঁত কোন ইতিহাসও গঠন করে না। পলিবিয়াস, লিভি বা ট্যাসিটাসের ভাল অনুবাদে যে কেউই স্পষ্ট উপস্থাপনা, উচ্ছ্বাসহীন ও অলংকারবর্জিত বিবরণ উপভোগ করবেন; তা সত্ত্বেও, রোম সম্পর্কে জানার জন্যে তাঁকে অবশ্যই পড়তে হবে—থিয়োডর মমসেন-এর *রোমের ইতিহাস* (*Römische Geschichte*) বা কেম্ব্রিজ হিস্ট্রির প্রাসঙ্গিক খণ্ডগুলি। ধ্রুপদী লেখাগুলির সঙ্গে এগুলির তফাতের একটা কারণ, আধুনিক ব্যাখ্যাতারা বিভিন্ন লেখার তুলনামূলক বিশ্লেষণের সুযোগ পেয়েছেন। আনুপূর্বিক এই বিশ্লেষণের ফলশ্রুতির সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ, গ্রোটের—*গ্রীসের ইতিহাস*, যেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে অত্যন্ত সুলিখিত ও গ্রহণযোগ্যভাবে এথেন্সের গণতন্ত্রকে বিচার করা হয়েছে। এডোয়ার্ড মেয়ার-এর একক প্রচেষ্টা *প্রাচীন যুগের ইতিহাস* (*Geschichte des Altertums*)-এর প্রামাণ্যতা ও চিরায়ত চরিত্রের কারণ ব্যাখ্যাতেও শুধুমাত্র পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের যুক্তিটাই যথেষ্ট নয়, প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে আজকের বিদ্বৎসমাজের সমন্বিত গবেষণার কথাটাও মাথায় রাখতে হবে। পার্থক্যটা ঘটে গেছে প্রত্নতত্ত্বের অভূতপূর্ব অবদানের জন্যই—যার ফলে প্রাচীন যুগের পুরানিদর্শনগুলির অস্তিত্বই শুধু নয়, সেগুলির যথাযথ মর্মোদ্ধারও সম্ভব হয়েছে। শিলালিপি, মুদ্রা বা সাধারণভাবে সব ধরনের খোদিতলিপিই বৃত্তান্ত-রচনা বা ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে; দ্বিভাষিক ব্যাখ্যায় কিউনিফর্ম ফলক ও মিশরীয় চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালাগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হওয়ায় প্রামাণ্য নথির বিস্তার ঘটেছে। এমনকী প্রাচীন রোমের ক্ষেত্রে, ট্রাজান ও মার্কস অরেলিয়াস-এর সৈন্যব্যূহ রচনাপদ্ধতি, বিজয়স্তম্ভ-লিপি বা শিল্প অলংকৃত প্রস্তর শবাধার এবং অন্যান্য ভাস্কর্যগুলি আমাদের টেস্টুডো (*testudo*) বা আগার (*agger*)-এর মতো পরিভাষাগুলিকে বুঝতে সাহায্য করেছে, যেগুলির ব্যবহারিক অর্থ ধ্রুপদী যুগ ও রেনেসাঁসের মধ্যবর্তীকালে হারিয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন সম্রাটদের অস্তিত্ব তাদের মুদ্রার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে; ধারাবাহিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে নথিপত্রের বক্তব্যও যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। যেমন, আলিসে-স্তে-রেইন-এ খননকার্যের ফলে অ্যালেসিয়ায় সিজার-এর চমকপ্রদ দ্বিমুখী আক্রমণের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আবার, প্রাচীন পর্বের ক্ষেত্রে, যেমন এট্রুস্কানে, যেখানে দলিলপত্র পর্যাপ্ত নয় সেখানে ভাষার মর্মোদ্ধারও পুরোপুরি সম্ভব হয়নি এবং প্রত্নতত্ত্বের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও মূল প্রশ্নগুলির সম্পূর্ণ উত্তর মেলেনি বা আজও সন্দেহ থেকে গেছে। কিন্তু এমনকী এসবের তুলনায়ও, ভারতে আমাদের যা অর্জন তা সামান্যই। পসেনিয়াসের গ্রীস-বর্ণনার যাথার্থ্য খননের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং তা আজ এক মূল্যবান নির্দেশিকা। এমনকী হিসারলিকে খননকাজ চালিয়ে শ্লিম্যান প্রমাণ করেছেন যে হোমারের ট্রয়-এর উপাখ্যান, যা একসময় বিশুদ্ধ কাল্পনিকতা বলে বাতিল করা হয়েছিল, তা বাস্তব। আবার, ধর্মগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও, তুলনীয় যে কোন ভারতীয় গ্রন্থের চেয়ে বাইবেল ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে মূল্যবান, কেননা যাঁরা যুগপরম্পরায় এটির প্রচার করেছিলেন বর্ণিত ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁদের ধারাবাহিক সংযোগ ছিল এবং তাঁরা তা ঘটনা ও স্থানের বিবরণে পেশাগত নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। আমাদের ক্ষেত্রে, দুই মহাকাব্য *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* দুই মহা যুদ্ধ—যদি আদৌ এগুলি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা হয়—তবে তা সঠিক কোথায় হয়েছিল তা আজও নির্ণয় করা অসম্ভব, কবে হয়েছিল সে প্রশ্ন না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। গুগ্‌লিয়েলমো ফেরেরোর[৬] কাল্পনিক কিন্তু যুক্তিঋদ্ধ বর্ণনা রোমান গণরাজ্যের শেষের

দিনগুলিকে প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনাপঞ্জির মতো তুলে ধরে; সুয়েটোনিয়াস্ বা প্রোসোপিয়াস্‌দের অন্ধকার অধ্যায়ও রবার্ট গ্রেভস্-এর লেখনীতে ন্যায়সঙ্গত সুস্পষ্টতা পায়। আর ভারতবর্ষে, আমাদের এখনও প্রমাণ করাই বাকি যে বিক্রমাদিত্য নামে সত্যিই কোন রাজা ছিলেন। ৫৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে যুদ্ধজয় বা রাজ্যাভিষেকের মধ্য দিয়ে যে বিক্রমাদিত্য-যুগের সূচনা তা এখানে এখনও আধুনিক, অথবা শুরুই হয়নি। কিংবদন্তীর এই রাজাটি যে পূর্ববর্তী আদি জনগোষ্ঠীর উপেক্ষিত কিন্তু লোকায়তিক ধারা বেয়ে আসা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের গৌরব-প্রভাবই প্রতিফলন—সেই ধারণাটাই এখনও আবছা!

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে, যেখানে যথার্থ উপাদান-সূত্রগুলি অপ্রতুল (যেমন দুই মহাকাব্যের বেলায়) এবং প্রত্নতত্ত্বও এখনও পর্যন্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পরিপূরক কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি—সেখানে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি কতটা অচল। হোমারের বিখ্যাত চরিত্র একিলিস বা অডিসিয়াসের অস্তিত্বের সমর্থনে অকাট্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। হিট্টাইট শিলালিপিতে উল্লিখিত টাওয়াগালোয়াস্ বলে যাঁকে মনে করা হয় সেই ইটিওক্লিস-ও এক অপ্রধান চরিত্র।[৭] *শাঁস দ্য রোনাল্ড* বা রোনাল্ড গাথা রচিত হওয়া সত্ত্বেও রোনাল্ড-ই যে শারলামান-এর সেনাপতিদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন—তা নয়, বা রন্‌সেভ্যালিসে পরাজয়টাই তাঁর রাজত্বকালের দৃষ্টান্তমূলক সামরিক ঘটনা ছিল না। থিয়োডোসিয়াস-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাক্সিমাস (৩৮৩-৮ খৃ.) সম্পর্কে লিখিত নথিপত্র এবং প্রত্নতত্ত্ব দুদিক থেকেই আমরা বিশদ জানতে পারি—রোমান সাম্রাজ্যে কিছুদিনের জন্য যিনি ভাঙ্গন এনেছিলেন; যদিও ম্যাক্সেন লেডিগ-এর *ওয়েল্যান্ড স্মিথ সাগা* বা ওয়েলস্ ভূখণ্ডের কাহিনী সঞ্চয়ন *ম্যারিনোজিওন* থেকে তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মায় না। জার্মান মহাকাব্য নেবেলুঙানলেট (*Niebelungenlied*)-এর এটজেল্ বা দিয়েত্রিশ চরিত্র থেকেও হূনরাজ অ্যাটিলা বা ইতালি জয়ী রাজা থিয়োডোরিস সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। রাজা আর্থার, যিনি ব্রিটেন থেকে রোমান সৈন্যবাহিনীর অপসারণ ও স্যাক্সন বিজয়ের মধ্যকালীন সময়ে রাজত্ব করেছিলেন, ঠিকভাবে বলতে গেলে আজও বিশুদ্ধ উপকথার নায়ক। ঐতিহাসিক অস্তিত্ব থেকে আহৃত হওয়া সত্ত্বেও রবিনহুড এখনও লোককাহিনীর এক চরিত্র ছাড়া কিছু নয়। ভারতীয় প্রধান পুঁথিপত্রগুলির ওপর যদি আমরা ভরসা রাখি তাহলে এই একই ধরনের রোমান্টিক উপাখ্যান-এর কাছে পৌছনো ছাড়া আমাদেরও কোন গতি নেই।

বিক্ষিপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্যোগগুলির গৌণ অর্জন হিসেবে পাওয়া অজস্র প্রস্তরলিপিও পরিচিত ভারতীয় রাজাদের কোন নির্ভরযোগ্য রাজত্বতালিকা বা রাজত্বকাল বা রাজ্যের সঠিক সীমারেখা নির্ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাই কিছু ঐতিহাসিক সাধারণ অতিকথা থেকে অপ্রমাণযোগ্য এক অলীক ইতিহাস রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এফ ই পারজিটার-এর *এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল ট্রাডিশন* (অক্সফোর্ড, ১৯২২) তার একটি উদাহরণ। অন্যদিকে, অপ্রামাণিক-পর্বের ইতিহাস-রচনার আর একটি অবলম্বন ভাষাতত্ত্ব। সাধারণ বা মিলযুক্ত শব্দগুলি থেকে ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগুলির আন্তঃসম্পর্ক বোঝা যায়—তাই সেগুলি থেকে আর্যদের মূল জনগোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার আগে পিতৃভূমিতে তাদের আদি-সমাজ সম্পর্কিত তথ্য জানা যেতে পারে বলে মনে করা হয়। কিন্তু আর্যজনতার ভ্রাম্যমানতা ব্যতিরেকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং আত্মীয়তা সম্পর্কিত ধ্যানধারণার মধ্য দিয়েও যে শব্দগুলি সঞ্চারিত

হতে পারে— এমন সম্ভাবনার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়নি। ইংরেজির *daughter,* জার্মান *Tochter* (টোশ্‌টার), গ্রীক *thygatêr* (থাইগেটিয়ার), আইরিশ *dear* (ডিয়ার), লিথুয়ানিয়ান *dukte* (ডুকটে), রাশিয়ান *doch* (ডশ্)—এ সবই সংস্কৃত 'দুহিতৃ'-র প্রকৃতিপ্রত্যয়গত শব্দ। সংস্কৃত মূল 'দুহ্' শব্দের অর্থ দুধ দোওয়া বা দুগ্ধদোহন এবং এই তত্ত্বানুযায়ী মূল শব্দটি ছিল দোগ্ধ্রু = দুগ্ধদোহনকারিণী—যা থেকে বুঝে নেওয়া হয় যে, প্রাচীন আর্য পরিবারে কন্যারাই দুগ্ধদোহন করত। নয়নাভিরাম এই চিত্রকল্পটি সম্ভবত প্রথম আঁকেন ল্যাসেন, তাঁর থেকে সপ্রশংস উদ্ধৃতি নিয়ে ম্যাক্সমুলার[৮] এবং ম্যাক্সমুলার থেকে মারাঠা হয়ে কুম্ভীলক বেশ কিছু ভারতীয় লেখকদের প্রকৃত অর্থেই দুষ্পাঠ্য বিভিন্ন লেখায়! বর্তমানে আবার মারাঠা থেকে রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত হওয়ার ফলে[৯] তা এক অচিন্ত্যপূর্ব পবিত্রতা লাভ করেছে এবং একশ্রেণীর 'বামপন্থী বুদ্ধিজীবী'-কে কষ্ট করে কোন কিছু পড়া বা নিজের মাথায় চিন্তা করার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মনোহর অনুমান দিয়ে এখনও পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না যে আর্যভাষাগুলিতে 'দুগ্ধদোহনকারিনী'-র সমশব্দ থাকলেও 'দুগ্ধ'-এর নেই কেন! এটাও হয়ত মাথায় আসেনি যে পশুচারণ-যুগের সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে এবং দুগ্ধদোহনের ব্যাপারটা এসেছে এই যুগেরই বিলম্বিত পর্যায়ে—যখন গরু ছিল পুরুষেরই সম্পত্তি। সুতরাং এটা আদি আর্যসমাজের ঘটনাও নয় বা প্রথমে মেয়েদের দ্বারাই করা হত তা-ও নয়। পরিহাসপ্রিয় কিছু ভাষাতাত্ত্বিক আবার ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগুলিতে 'পদ' (foot) শব্দটির সদৃশ ব্যুৎপত্তিগত শব্দ পাওয়া গেলেও, 'হস্ত' (hand) শব্দটির পাওয়া যায় না। আগের যুক্তি অনুসরণ করলে এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে আদি মাতৃভূমিতে আর্যদের পা ছিল বটে, কিন্তু হাত ছিল না—নিশ্চিতই বিচ্ছিন্ন হবার পর গজিয়েছে!

১.২ এ অবস্থায় অবধারিতভাবে উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদন-সম্পর্কের কালানুক্রমিক বিকাশের প্রতিই নিবিষ্ট হতে হবে এবং একমাত্র তা থেকেই আমরা বুঝতে পারব কোন্ যুগে মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করেছিল। এক্ষেত্রেও, বিজ্ঞানের যে কোন শাখার মতোই, দৃষ্টিভঙ্গিকে হতে হবে যথার্থভাবে বস্তুবাদী। হাতিয়ারগুলির সাহায্যে পরিপার্শ্বের ওপর প্রভাব খাটিয়ে মানুষ আরও ভালভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় নিজেই নিজেকে তৈরি করেছে।[১০] অতীতে, উৎপাদনের উপায়ের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক আবিষ্কারের সাথে সাথে তুলনামূলকভাবে অপ্রত্যাশিত জনসংখ্যাবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে তার কৃতিত্বের সার্বিক কার্যকরী পরীক্ষাও হয়েছে। উৎপাদনের উপকরণগুলির সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ সংগঠন এগিয়ে যেতে পারে না—বিশেষ করে সেই যুগে, যখন মানুষ খাদ্য-সংগ্রহকারী প্রায়-জান্তব স্তর থেকে রূপান্তরিত হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনকারীতে, যা নিশ্চিতভাবে তাকে পশুত্বের চেয়ে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল। আমাদের পূর্বোল্লেখিত সংজ্ঞা-র সেই উপযোগিতা আছে যা দিয়ে আমরা ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, যেমন জাতপ্রথা ইত্যাদিকে লক্ষ্য ও বিশ্লেষণ করতে পারব এবং সেই সঙ্গে, গাঁটেগোনা কয়েকজনকে বাদ দিলে, আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস চেতনার প্রকট অভাবগুলিকেও। বস্তুত, এটাই একমাত্র সংজ্ঞা যা দিয়ে লিপি-পূর্ব ইতিহাস অর্থাৎ প্রাক্-ইতিহাসকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এই সংজ্ঞার কার্যকরী প্রয়োগকৌশল বলতে শুধু লিখিত নথি ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির সমন্বয়ই বোঝায় না বরং, সেগুলির প্রত্যেকটিকে জাতিবিদ্যার (ethnography) তথ্যগুলির আলোকে বিশ্লেষণও বোঝায়। যে কোন ধ্রুপদী

সাহিত্যের অস্তিত্বই সমাজের শ্রেণী বিভাজনের সাক্ষ্য দেয় ; প্রাচীন যুগের জ্ঞানচর্চা বলতে—মন্দির, পুরোহিততন্ত্র, নগরজীবন এবং উৎপাদনকারী ও তুলনামূলকভাবে কম হলেও তাদের উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত করা গোষ্ঠীতে সমাজের বিভক্ত হয়ে যাওয়াটা বোঝা যায়। কেবলমাত্র এই শেষোক্তরাই প্রস্তরলিপি লিখত—যা দিয়ে ঐতিহাসিকদের কাজ করতে হয়; উৎপাদক শ্রেণীর অক্ষরচর্চার অবসর ছিল না। অতীতকে ঠিকভাবে কথা বলালে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পারব। প্রত্নতাত্ত্বিকদের আবিষ্কৃত বাসগৃহ, খোদিত-বস্তু, যন্ত্রপাতি, বাসনপত্রগুলি থেকে শুরু করলেও আমরা প্রাচীন উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে পারব যা জাতিবিদ্যারও গবেষণার বিষয়। ইউরোপের আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকরা আদিম স্তরে থেকে যাওয়া আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার জনগোষ্ঠীগুলিকে বুঝতে এই নীতি অনুসরণ করেন; এর ফলে, একধরনের যৌথ-সমাধিক্ষেত্র থেকেই আভাস পাওয়া যায় যে তাদের সমাজ মূলত মাতৃতান্ত্রিক ছিল, না পিতৃতান্ত্রিক; অথবা প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে রূপান্তরের পর্যায়ে, বা উভয়েরই পূর্ববর্তী প্রাক্-কৌম স্তরে।

ভারতীয় ধারাকে অধ্যয়ন করতে আমাদের আরও গভীরে যেতে হবে। অন্যদেশের আদি-জনগোষ্ঠী বা এ দেশের উপান্ত্য এলাকায় টিকে থাকা আদিম খাসিয়া, নাগা, ওঁরাও, ভীল, টোড্ বা কাডার-রা এখানে মূল আলোচ্য নয়। বরং রীতিমত উন্নত অঞ্চলগুলিতে, যেমন বিভিন্ন শহর ও তার চারপাশে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে টিকে থাকা জনগোষ্ঠীগুলির অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায় যে একটি বর্ণ- সমাজের প্রতিটি স্তর কোন এক পুরোন যুগে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছিল।[১১] প্রাচীন নথি ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির বিশ্লেষণে এদের এই অস্তিত্বের মূল্য অপরিসীম! আবার, পশ্চাদপদ গোষ্ঠী হিসেবে এই অস্তিত্বমানতা ঐতিহাসিক বিকাশের আলোকে বিশ্লেষণ করার পক্ষে এক জটিল বিষয়ও বটে। ভারতবর্ষ এক দীর্ঘ কালোত্তীর্ণ দেশ। পারমানবিক যুগের মানুষ এখানে ব্রোঞ্জ-প্রস্তরযুগের মানুষের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে। গ্রাম-ভারতের বহু দেবদেবীর মূর্তি আজও লাল রঙে রাঙানো—যা দীর্ঘ অপ্রচলিত নরবলি-প্রথারই স্পষ্ট অনুকল্প এবং এখনও ক্বচিৎ কোথাও দেখা যায়—যদিও বহু ভক্তের অনুভূতিতেই তা এখন বেদনাদায়ক। অনেক আচার-অনুষ্ঠানও আছে যা স্পষ্টতই প্রস্তরযুগ থেকে পালিত হয়ে আসছে—যদিও পালনকারীরা, যারা প্রায়শ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, এগুলির অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সচেতন নয়। হতে পারে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এগুলির কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু সংস্কৃত অন্যান্য আচার পালন বিধিগুলির মধ্যে আদি প্রথা হিসেবে তা প্রতি যুগেই সংযোজিত হয়ে এসেছে, এমনকী গত শতাব্দী পর্যন্ত। উচ্চবর্ণের গোঁড়া হিন্দুদের বিবাহ বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আজও তিনহাজার বছরের পুরনো ঋগ্‌বেদের মন্ত্র পাঠ হয়; আবার এমন অনেক ক্রিয়াকর্মও আছে যেগুলির কোন বৈদিক প্রমাণসিদ্ধতা নেই, কিন্তু কোন বিরুদ্ধতা বা অসঙ্গতিবোধ ছাড়াই সেগুলি বৈদিক নিয়মের মতো সমান আগ্রহে পালিত হয়ে চলেছে।

ধর্ম, সংস্কার বা আচার পালন বিধিগুলির প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ অবশ্য ইতিহাস থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে; আবার, এগুলিকে উপেক্ষা করলে উপরিকাঠামোর অনেক বৈশিষ্টপূর্ণ দিককে অস্বীকার করা হয়—যেগুলি মূলের বাস্তব পরিবর্তনগুলিকেই সূচিত করে। প্রাচীন কিছুর প্রচলন থাকার অর্থই হল, হয় সেটি কোন দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়নি—অথবা

আরোপন, জটিলতাবৃদ্ধি বা প্রায়শই যেমনটা হয়, উপরিকাঠামোর টেনে হিঁচড়ে উন্নতি ঘটানো সত্ত্বেও উৎপাদনের আদিম উপকরণগুলির বহাল থাকা। দক্ষিণ-আমেরিকার আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুটিবসন্তবাহী স্প্যানিশ বিজেতাদের বা দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপমালাগুলির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল অধিবাসীদের সঙ্গে সিফিলিস, যক্ষা, হাম ও সুরাবাহী বণিকদের বিধ্বংসী মিথস্ক্রিয়ার মতো তিক্ত ও প্রচন্ড বিরোধ ভারতের সবচেয়ে আদিম সমাজের সঙ্গে সবচেয়ে উন্নত সমাজের কদাচিৎ ঘটেছে। আলপ্‌স পেরিয়ে গলদেশে রোমান সৈন্যবাহিনী ও মহাজনদের অথবা জার্মানীর আদিবাসী যাজকদের ওপর মধ্যযুগীয় খ্রীশ্চান মিশনারীদের অভিযানের মতো সর্বগ্রাসী প্রভাব কোন ভারত-বিজয়ের ক্ষেত্রেই ঘটেনি।

১.৩ যে সুনির্দিষ্ট ইতিহাসতত্ত্বকে আমরা এখানে অনুসরণ করব তা হল, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ—এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে যা মার্কসবাদ নামেও পরিচিত। কার্ল মার্কস তাঁর *ক্রিটিক অফ্ পলিটিক্যাল ইকনমি* (১৮৫৯)-র মুখবন্ধে[১২] এক অসাধারণ বক্তব্য বিবৃত করেছেন যা আমাদের পক্ষে যথোপযুক্ত ঃ

মানুষ তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, সুনির্দিষ্ট এক আবশ্যিক সম্পর্কের জগতে প্রবেশ করে—যাকে বলা হয় উৎপাদন-সম্পর্ক এবং তা আবার বস্তুগত উৎপাদনী শক্তির কোন নির্দিষ্ট স্তরের বিকাশের সঙ্গেও সম্বন্ধিত। এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলির সমষ্টিই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করে—যা আইন ও রাষ্ট্রনৈতিক উপরিসৌধের মূল ভিত্তি এবং সামাজিক-চেতনার যে কোন রূপের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্রে গ্রথিত। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত নিমিত্তগুলির উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা। মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বের নির্ধারক নয়, বরং বিপরীতে, সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। সমাজের বৈষয়িক উৎপাদনী শক্তিগুলি বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে পৌঁছলে বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্ক সমূহ বা সেগুলির আইনী অভিব্যক্তি অর্থাৎ সম্পত্তি-সম্পর্কসমূহ, যার মধ্যে এতদিন তারা কাটিয়েছে, সেগুলির সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। উৎপাদনী শক্তির বিকশিত রূপ যখন উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকে শৃঙ্খলে পরিণত করে তখনই সূচিত হয় সামাজিক বিপ্লবের এক নবযুগ। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে সমগ্র উপরিসৌধেও কমবেশি রূপান্তর ঘটে। এই ধরনের বিপ্লবকে সম্যক অনুধাবনের জন্য যে পৃথকীকরণটা সবসময়ই প্রয়োজন, তা হল ঃ উৎপাদনের অর্থনৈতিক শর্তগুলির বস্তুগত আমূল পরিবর্তন—যা বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুলতায় নিরূপণ করা যায়; এবং আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নন্দনতাত্ত্বিক, দার্শনিক—বা এককথায় ভাবাদর্শগত রূপ, যার মধ্য দিয়ে মানুষ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে ও দ্বন্দ্বের বিলোপ ঘটাতে চায়। উৎপাদনী শক্তিগুলির যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হবার সুযোগ আছে তেমন কোন সমাজব্যবস্থা কখনই হঠাৎ বিলুপ্ত হতে পারে না এবং নতুন উন্নত উৎপাদন-সম্পর্কগুলিও কখনও বাস্তবায়িত হতে পারে না যতক্ষণ না তাদের রূপ পরিগ্রহের বস্তুগত শর্তগুলি পুরনো সমাজের গর্ভে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই, মানুষ চিরকাল সেই সমস্যাগুলিরই সমাধান করতে এগোয়—যা তারা পারে; আরো তলিয়ে দেখলে, সর্বক্ষেত্রেই সমস্যাগুলি তখনই জেগে ওঠে যখন সেগুলি সমাধানের বস্তুগত শর্তগুলি ইতিমধ্যেই অস্তিত্ব পেয়েছে অথবা নিদেনপক্ষে অস্তিত্ব পেতে চলেছে। একটি বৃহত্তর রূপরেখায় এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক এবং আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন রীতিগুলিকে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রগতি অভিমুখীন এক একটি যুগারম্ভ হিসেবে

চিহ্নিত করা যায়।[১৩] সুতরাং বর্তমান বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার সাথে সাথে মানব সমাজের প্রাক্ ইতিহাসও একটা পরিসমাপ্তিতে এসে পৌঁছয়।

এই উদ্দীপ্ত বাক্যবন্ধগুলিকে কেউ যখন ভারতীয় বাস্তবতায় প্রয়োগ করবেন, তখন অবশ্যই আমাদের মনে রাখা দরকার, মার্কস কথাগুলি বলেছিলেন সমগ্র মানবজাতির প্রেক্ষিতে, এবং আমাদের কাজ তার একটি ভগ্নাংশকে নিয়ে। কিছু কালের জন্য কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে কানাগলিতে ঘুরপাক খাওয়া, পশ্চাদগামিতা অথবা ক্ষয়জনিত বিবর্তন—এ সবই ঘটতে পারে, কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে মানবজাতির প্রগতিকে রুদ্ধ করতে পারে না; এমনকী পারমানবিক যুদ্ধের সর্বাত্মক বিলয়ের হুমকির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নয়। ভাবাদর্শগত উপরিসৌধে টিকে থাকা চিহ্ন থেকে বস্তুগত পরিবর্তনগুলিকেও আমরা মাঝে মধ্যে সন্ধান করব, কিন্তু এই কথাটা মনে রেখে যে, মার্কসবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদের অনেক তফাৎ—এর বিরোধীরা প্রায়শই যেটা ভুলে যান। সেই কারণেই, যে কোন উল্লেখযোগ্য নিমিত্তবাদী আলোচনায় 'অবস্থা'-র ব্যাখ্যা অবশ্যই থাকে, কিন্তু 'কারণ'-এর নয় এবং ঐতিহাসিক বিকাশের সমগ্র ধারাটিকে মাথায় রাখা হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ভি জি চাইল্ড-এর দুটি বই—*পিসিং টুগেদার দি পাস্ট* (লন্ডন, ১৯৫৬) এবং *দি প্রি-হিস্টরি অফ ইউরোপিয়ান সোসাইটি* (লন্ডন, ১৯৫৮)। কোন ধারণা (সংস্কার সহ) একবার যদি জনমনে বদ্ধমূল হতে পারে তবে তা শক্তিতে পরিণত হয় এবং এই শক্তি থেকেই উৎসারিত হয় সেই গুণ—যা দ্বন্দ্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে এবং তার অবসান ঘটাতে চায়। কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই এই 'ধারণা'গুলিকে অগ্রাহ্য বা বাতিল করা সম্ভব নয়, আবার তাঁর কাজও সম্পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না এই 'ধারণা'গুলি কখন, কীভাবে, কেন বদ্ধমূল হয়েছিল তা দেখানো হয়। মার্কসীয় তত্ত্বের অবলম্বন মানে এই নয় যে সবসময়ই তাঁর সব সিদ্ধান্তকে (এবং বিশেষ করে যেগুলি মার্কসীয় পার্টি-লাইন অনুমোদিত) অন্ধভাবে পুনরাবৃত্তি করে যেতে হবে। এটা প্রমাণ করা যায় যে, গ্রীক বা রোমের ধাঁচের চিরায়ত দাস অর্থনীতি ভারতে কোনদিনই ছিল না। সব মানুষ মুক্ত ছিল না বা এক ধরনের দাসত্বপ্রথা ছিল ইত্যাদি অন্ধ যুক্তিগুলি এখানে বিবেচ্য নয়; বিবেচ্য হল পরিমাণ—যা এক সার্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গুণগত রূপান্তরও আনে। প্রকৃতই যেটা বিতর্কিত বিষয় তা হল, এশীয় উৎপাদন-রীতি বলতে যা বোঝায়[১৪] মার্কস তা কখনই সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেননি। এশিয়ার সংস্কৃতিতে প্রাধান্যটা ছিল চীন ও ভারতের। বিপুল ইতিবৃত্ত, পারিবারিক ও রাজদরবারের নথিপত্র, খোদাই এবং সাম্প্রতিককালের খনন থেকে পাওয়া মুদ্রাগুলির সাহায্যে ১০০০ খ্রী. পূ. পরবর্তী চীনের যে ছবি আমরা পাই, ভারতের ক্ষেত্রে তা আশা করাটাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে, ৮৪১ খ্রী. পূ. পর্যন্ত চীনের যে কালানুপঞ্জি তা তর্কাতীত এবং সমাধি-অস্থিগুলির নিবিড় বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রায় ১৪০০ খ্রী. পূ. পর্যন্ত তথ্য আহরণ সম্ভব। ভারতের দীর্ঘ ফাঁকগুলি পূরণের জন্য ঐ ধরনের প্রমাণ পরে আবিষ্কৃত হতে পারে এমন আশা করাটা বৃথা—কেননা, এটা জানা যায় যে অপ্রকাশিত সংস্কৃত পুঁথিগুলির অধিকাংশেরই প্রকৃত ঐতিহাসিক গুরুত্ব বলতে যা বোঝায় তা নেই। ভারতবর্ষ সম্পর্কে মার্কসের নিজের যে উক্তি,[১৫] তা-ও হুবহু মেনে নেওয়া যায় না।

'এই ক্ষুদ্র এবং সু-প্রাচীন ভারতীয় (গ্রাম) সমাজগুলির—যার কিছু অবশেষ আজও আছে—ভিত্তি হল জমির সর্বজনীন মালিকানা, কৃষি ও হস্তশিল্পের মিশ্রিত উপস্থিতি এবং এক অপরিবর্তনীয় শ্রম-

বিভাগ—যা স্বতঃনির্ধারিত পরিকল্পনা ও পদ্ধতি অনুযায়ী যখনই কোন নতুন সমাজ জন্ম নিয়েছে তার সেবা করে এসেছে। একশ' থেকে কয়েক হাজার একর পর্যন্ত এলাকা জুড়ে এক একটি সন্নিবদ্ধ অঞ্চল তার যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে নিত। উৎপাদিত সামগ্রীর মূল ভাগটাই নির্ধারিত থাকত সমাজের প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য এবং তা পণ্যের রূপ পেত না। সুতরাং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজে, শ্রমবিভাগ নিরপেক্ষভাবে উৎপাদনই বিনিময়যোগ্য পণ্য হিসেবে কাজ করত; কিন্তু, কেবলমাত্র উদ্বৃত্তটুকুই এইভাবে পণ্যে রূপান্তরিত হতে পারত এবং এমনকী, তারও একটা অংশ রাষ্ট্রের হাতে জমা পড়ার পরই এটা সম্ভব ছিল—কেননা স্মরণাতীত কাল থেকেই উৎপাদনের একটা ভাগ খাজনা হিসেবে জমা দেওয়াটাই রীতি। ... স্বয়ংসম্পূর্ণ এইসব গ্রাম সমাজগুলির উৎপাদন সংগঠনের এই সরলতাই তাদের যুগ যুগ ধরে অবিকৃতভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ঘটনাচক্রে যখন ধ্বংসও হয়েছে তখনও আবার, একই জায়গায় একই নামে জেগে উঠেছে; এই সরলতার মধ্যেই নিহিত থেকেছে এশীয় সমাজের সনাতনত্বের চাবিকাঠি—যে সনাতনত্ব এশীয় রাষ্ট্র বা রাজবংশগুলির অবিরাম ভাঙাগড়া বা পরিবর্তনে টোল খায়নি। রাজনীতির আকাশের ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভ সমাজের অর্থনৈতিক উপাদানগুলির সংহতিকে স্পর্শ করতে পারেনি।' *(ক্যাপিটাল ১, ৩৯১)*

তীক্ষ্ণ এবং মননশীল হওয়া সত্ত্বেও এ মন্তব্য যথার্থ নয়। অধিকাংশ গ্রামেই ধাতু ও লবণ উৎপন্ন হত না—অতিপ্রয়োজনীয় এ দুটি বস্তুই বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পেতে হত। সুতরাং কিছু পণ্য উৎপাদন হতই, কারা তা বিনিময় করত—সেটা স্বতন্ত্র বিষয়। মার্কসের এ বক্তব্য ঠিক যে উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রের হাতে জমা পড়ার আগে পর্যন্ত পণ্যের রূপ নিতে পারত না—কিন্তু কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্বের ক্ষেত্রে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখলে তবেই এ কথা প্রযোজ্য। গ্রামগুলি 'স্মরণাতীত কাল' থেকে ছিল না। আদিবাসী ভারতের গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতিতে লাঙল-এর প্রচলন এমনিতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অগ্রগতি। দ্বিতীয়ত, গ্রামগুলির আয়তনের যখন কোন পরিবর্তন ঘটে না, তখন সেগুলির ঘনত্ব একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে; একটা অঞ্চলে দুটো বা দু'শো বা কুড়িহাজার গ্রাম একই বৈশিষ্ট্যের উপরিসৌধকে বহন করতে বা একই ধরনের রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা শোষিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, এই উপরিসৌধের ক্রমান্বয়িক গুরুত্ব বৃদ্ধির চাপে গ্রামের অভ্যন্তরে ভূমি-মালিকানায় পরিবর্তন আসে। পরিমাণগত পরিবর্তন শেষপর্যন্ত গুণগত পরিবর্তনে রূপ নেয়। একইভাবে, মার্কসের এই উক্তিকেও আমরা তর্কাতীতভাবে মেনে নিতে পারি না যে, "ভারতীয় সমাজের আদৌ কোন ইতিহাস নেই, অন্তত কোন সুপ্রতীত ইতিহাস। এখানকার ইতিহাস বলতে যা আমরা জানি, তা এক প্রতিরোধহীন, স্থানু গ্রাম সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তির ওপর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী ধারাবাহিক আক্রমণকারীদের ইতিহাস।" বাস্তবে, ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় যুগগুলি—যেমন, মৌর্য, শাতবাহন বা গুপ্ত যুগের সঙ্গে বহিরাক্রমণের কোন সম্পর্ক ছিল না; বরং সঠিক অর্থে এই যুগগুলিতেই প্রকৃত গ্রাম সমাজের গঠন ও বিস্তৃতি বা নতুন বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির বিকাশ ঘটেছিল।

এই সমস্ত কারণে, আমাদের পর্যালোচনার শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ভিত্তিটাই হবে মার্কসবাদী—অবশ্য এ বিষয়ে আমার যা ধ্যানধারণা সেই অনুযায়ী। আমার মনে হয়, প্রত্যেক ঐতিহাসিকেরই, স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন, কিছু-না-কিছু তত্ত্ব থাকে—যার ওপর ভিত্তি করে তিনি কাজ করেন। গ্যুজোট (Guizot) বা থিয়ারস্ (Thiers)-দের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও রচিত ইতিহাসের মধ্যে একটা

যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে। শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা ফরাসী বিপ্লবের ওপর টেইন (Taine)-এর লেখা ইতিহাসকে রঞ্জিত করে বা টার্ডে (Tarde) ও লা বঁ (Le Bon)-দের ভন্ডামিপূর্ণ 'বিজ্ঞানসম্মত' বিশ্লেষণ 'জমায়েতের মনস্তত্ত্বে' গিয়ে হাজির হয়। র‍্যাংকে (Ranke), যিনি নির্মোহ বর্ণনার আদর্শের ওপর জোর দিয়েছেন : *'Ich werde es bloss sagen, wie es eigentlich gewesen its'* অর্থাৎ প্রতিটি শব্দই ব্যবহৃত হবে আসলে যা ঘটেছিল তা বর্ণনার প্রয়োজনে, তিনিও তাঁর *Weltgeschichte*-এ জার্মান-ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। মম্‌সেন (Mommsen) প্রাক্-পুঁজিবাদী রোমান আমলে পুঁজিবাদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব খুঁজে পেয়েছেন—কিন্তু, প্রকট হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর সমকালে পাননি।[১৬] ওয়ার্নার সোমবার্ট (Werner Sombert)-এর 'দূরদৃষ্টি'-তে ১৯৩৪ সালে ধরা পড়েছিল এবং অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবেই তাঁর "এতাদৃশ কোন আকস্মিক সম্ভাবনার কথাও কল্পনাতীত [ছিল] যে, এমনকী কোন পরোক্ষ কারণেও, জার্মানী আগামী দশ বছরে শত্রুসৈন্যের ঘাঁটিতে পরিণত হতে পারে।"[১৭] স্পেংলার (Spengler)-এর *Untergang des Abendlandes* কথার ফুলকি উড়িয়ে তাঁর সমকালে আলোড়ন তুললেও এটাকে কেউ প্রকৃত ইতিহাস হিসেবে গণ্য করতে পারে না।[১৮] আমার পক্ষে, আর্নল্ড টয়েনবি পড়া থাকা সত্ত্বেও, গুরুত্বহীন বিষয়গুলি নিয়ে ধানাইপানাই করাটা কষ্টকর—যদিও এ দেশের কিছু ঐতিহাসিকের মতে সেগুলি মূল্যবান; যেমন, ভারতীয় আত্মা, বংশগৌরব, আদর্শের বিজয়ী হওয়া, চতুর্বর্ণ প্রথার অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য ইত্যাদি। মার্কসের একটা বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব ছিল, যাকে হয়ত আরও প্রসারিত করা যেতে পারে (যেমনটা তাঁর সমসাময়িক গাউস, ম্যাক্সওয়েল, ডারউইন বা মেন্‌ডেলেভ-দের স্ব স্ব ক্ষেত্রগুলিতে করা হয়েছে) কিন্তু তা আজও সমানভাবে প্রয়োগোপযোগী এবং পরীক্ষিত হবার ক্ষমতা রাখে। ভারতে বৃটিশ-শাসনের ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কেও একমাত্র মার্কসই সঠিক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন; রেলপথ ও যন্ত্রচালিত উৎপাদন পুরনো গ্রামীণ অর্থনীতিকে ধ্বংস করে এক নতুন ভারতীয় আমলাতন্ত্র, বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণী এবং সামরিকবাহিনী সৃষ্টি করবে—যা পরিশেষে ভারতকে ব্রিটিশ-শাসন থেকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে।

'বাধ্য হয়ে ইংরেজ বুর্জোয়ারা যে উন্নতিই ঘটাক না কেন তা ভারতীয় জনতার বন্ধনমুক্তিও ঘটাবে না বা তাদের সামাজিক অবস্থায় কোন বস্তুগত পরিবর্তনও আনবে না—কেননা এগুলি শুধু উৎপাদন-শক্তির উন্নয়নের ওপরই নির্ভর করে না, নির্ভর করে সেগুলিতে জনগণের অধিকার-সংক্রান্ত প্রশ্নের ওপরও। কিন্তু যে ঘটনা তারা ঘটাতে বাধ্য হবে তা হল, এই উভয় চাহিদারই বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করা। বস্তুত, বুর্জোয়ারা এর চেয়ে বেশি কিছু কোথাও কখনও করেছে কি? ব্যক্তি ও জনতার অপরিমেয় দুর্দশা ও আত্মাবমাননার ঘৃণ্য, রক্তাক্ত পথ দিয়ে ছাড়া তাদের অগ্রগতির রথ কি কোথাও কখনও এগিয়েছে? ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের ছড়িয়ে দেওয়া নতুন সামাজিক উপাদানগুলির সুফল ভারতীয়দের ততদিনই অনায়ত্ত থাকবে যতদিন না তারা ব্রিটিশদের হটিয়ে দেওয়ার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করে, অথবা খোদ গ্রেট বৃটেনে শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে। যে পথেই হোক না কেন, আমরা নিশ্চিতভাবেই প্রত্যাশায় থাকতে পারি যে, আজ অথবা কাল এই মহান ও সমৃদ্ধ দেশটির পুনরুত্থান ঘটবে। ...' (*নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন*, আগষ্ট ৮, ১৮৫৩, 'দি ফিউচার রেজাল্টস অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া।')

যা আবশ্যক তা হল, উপজাতিক সংগঠনের প্রকৃতি ও অবলুপ্তি বিষয়ে মার্কসের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস[১৯] পরবর্তীকালে যে কাজগুলি করেছিলেন তা প্রনিধান করা। সেগুলিকে এ ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলির সঙ্গে মেলালে, আমরা নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছব।

ফলত, যে প্রশ্নটা জরুরী তা হল, আলোচ্য কালে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে মানুষ লাঙ্গল ব্যবহার করত কিনা—ভারি অথবা হালকা; কে রাজা ছিল অথবা আদৌ কোন রাজ্য ছিল কিনা—তা নয়, রাজ-শাসনের ধরন, সম্পত্তি-সম্পর্ক ও উদ্বৃত্ত-উৎপাদনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারেই, কৃষি-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল, তার উল্টোটা নয়। উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে সমাজে অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে জাত-প্রথার কি ভূমিকা ছিল? ধাতুর যোগান কোথা থেকে আসত? বিনিময়যোগ্য পণ্য হিসেবে শস্য, যেমন নারকেল-এর গুরুত্ব কবে থেকে বাড়তে শুরু করল বা এগুলির সঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ভূমি-মালিকানার কি সম্পর্ক ছিল? আমাদের প্রাচীন যুগে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে দাসপ্রথার বহুল অস্তিত্ব বা সামন্ততান্ত্রিক যুগে প্রকৃত ভূমিদাস-প্রথার প্রচলন কেন ছিল না? সব শ্রেণীর মধ্যেই, এমনকী আজও, মধ্য প্রস্তর যুগের লোকাচার বা প্রস্তরযুগের দেবতাদের পূজার প্রচলন কেন টিকে আছে? নতুন পদ্ধতিতে ইতিহাসকে খুঁজতে হলে এই প্রশ্নগুলিকে অন্তত তুলতে হবে এবং যতদূর সম্ভব এগুলির সমাধান করতে হবে। বৃহৎ রাজশক্তিগুলির উত্থান-পতন বা বিপুল ধর্মীয় আলোড়ন—এ সব কিছুর পেছনেই মূলত উৎপাদন ভিত্তির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি কাজ করে, তাই সেগুলিকে সে ভাবেই বিচার করতে হবে—কোন অপরিবর্তনীয় সামাজিক উপস্তরের বহিরাবরণের চেতনহীন কম্পন বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। আমাদের অনুসন্ধানে পদ্ধতির এই রূপরেখাটিকেই আমরা সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করব—কারণ, তার যথার্থতা অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রমাণিত।

আমাদের আলোচনা খুব স্বাভাবিক কারণেই ব্যাপক হতে পারে না, কেননা কোন একক গবেষকের পক্ষে ক্ষেত্রটা এখন মস্ত বড়। কিন্তু, আশা করি যে, একটা বিস্তৃত কাঠামোর নকশা অন্তত এখানে খাড়া করা সম্ভব হবে যার মধ্যে আনুপুঙ্খিক ফলাফলগুলি আশা করা যায় এবং একইসঙ্গে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর অনুসৃত পদ্ধতিকেও চিহ্নিত করা যায়। এর জন্য পাঠকের কাছ থেকে ইতিহাসের পুনঃপাঠ অথবা কিছু পূর্বলব্ধ জ্ঞান দাবি করা যেতেই পারে। বিশেষত, যেহেতু, পাঠক এখানে মুখোমুখি হবেন সেই ভিন্ন ভিন্ন পথগুলি পুনরাবিষ্কারের অভিজ্ঞতার যেগুলি দিয়ে ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান ভৌগোলিক বিভাগ—সিন্ধু উপত্যকা, গাঙ্গেয় উপত্যকা ও দাক্ষিণাত্য (অধুনাসৃষ্ট পাকিস্তান আলাদাভাবে আলোচ্য নয়) প্রতিষ্ঠিত এবং সভ্যতা-অভিমুখী হয়েছিল। তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটিমাত্র ধারা সারা দেশের ওপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি; সুতরাং, সেই ধারাটিকেই বিশ্লেষণের জন্য বেছে নেওয়া প্রয়োজন যা কোন নির্দিষ্ট পর্বে সবচেয়ে সক্রিয় এবং উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে সবচেয়ে সক্ষম ছিল; এবং যা অবশ্যই দেশের বৃহত্তর অংশে বিস্তৃত হতে পেরেছিল—কতগুলি পুরোনো রূপ বাহ্যিকভাবে টিকেছিল তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১. কিছু আপত্তি সত্ত্বেও, সাধারণ পাঠের জন্য পরামর্শ দেওয়া যায় ঃ ভারত-ইতিহাসের ওপর লেখা ভিনসেন্ট স্মিথের অধুনা অপ্রচলিত বইগুলি এবং দুঃখজনকভাবে অসম্পূর্ণ কেমব্রিজের

—*এন্‌সিয়েন্ট হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া।* Louis de la Valleé Poussin-এর *L' Inde aux temps des Mauryas* (প্যারিস, ১৯৩০) এবং *Dynasties et Histoire de L' Inde* (প্যারিস, ১৯৩৫) বই দুটিতে প্রচলিত ইতিহাসের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি এবং বহু অমীমাংসিত প্রশ্ন ঈর্ষণীয় স্বচ্ছতা ও সচেতনতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে পরবর্তীকালে প্রকাশিত বইগুলির তুলনায় আজও অনেক বেশি সহায়ক। বম্বের ভারতীয় বিদ্যা ভবন দশখণ্ডে যে ভারত-ইতিহাস প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রথম চারটি খণ্ড এখন পাওয়া যায় এবং এর প্রথম তিনটির সমালোচনা আমি আমার 'হোয়াট কনস্টিটিউটস্ ইন্ডিয়ান হিস্টরি' (*এ বি ও আর আই*, ৩৫, ১৯৫৫, পৃ. ১৯৫-২১০) শীর্ষক লেখায় করেছিলাম। L Renou, J Fillozat এবং অন্যদের *L 'Inde Classique* প্যারিস, খণ্ড-১, ১৯৭৪; খণ্ড-২ ১৯৫৩) সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য। এ এল ব্যসম-এর *দি ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া* বইটিতে সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তগুলির সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত বইগুলি থেকে মূল্যবান সূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি পাওয়া যায়। মার্কসবাদ বদহজম হলে ভাল সংস্কৃত জানাটাও কীভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তার প্রমাণ ডব্লিউ রুবেন-এর *Einfiihrung in Indienkunde*। এর পরবর্তী সংস্করণ প্রসঙ্গে এখানে কেবলমাত্র এই প্রতিশ্রুতিই আমরা পেয়েছি যে, মূলগত পরিবর্তন আর কিছু করা হবে না। ('Inihr wird der Radikalismus ausgemerzt')

২. এম অরেল স্টেইন-এর *কলহন'স রাজতরঙ্গিনী, এ ক্রনিকল অফ্ দি কিংস অফ্ কাশ্মীর* (২য় খণ্ড, লন্ডন, ১৯০০)। অত্যন্ত মূল্যবান ভাষ্যসহ এটি একটি অনবদ্য অনুবাদ।

৩. এফ ই পারজিটার : *দি পুরাণ টেক্সট অফ দি ডাইনাস্টিস অফ দি কলি এজ* (অক্সফোর্ড, ১৯১৩)। এটি পুরাণ বিষয়ে মূল্যবান গবেষণাগুলির অন্যতম যেখানে প্রাপ্ত তথ্যগুলির সংকলন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এমনিতেই পুরাণগুলির ওপর বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ লেখালেখির কাজ এখনও হয়নি এবং দুর্বোধ্য *ভবিষ্য-পুরাণ* সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে প্রয়োজ্য।

৪. *এ বি ও আর আই*, ২৩ সংখ্যা, ১৯৪২, পৃ. ২৯১-৩০১-এ ভি ভি মিরাসি-র রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

৫. *আলবেরুনিস ইন্ডিয়া* (২ খণ্ড, লন্ডন, ১৯১০)। সম্পাদনা ও অনুবাদ এডওয়ার্ড সাচাউ।

৬. গুগলিয়েলমো ফেরেরো : *Grandezza e decadenza di Roma* (৫ খণ্ড, ১৯০২-৫; পুনর্মুদ্রণ, মিলানো, ১৯২৭-৯)।

৭. ও আর গুরনে : *দি হিটটাইটস* (পেলিকান বুকস এ-২৫৯, লন্ডন, ১৯৫২) বইতে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য একটি আলোচনা করা হয়েছে। ইলিয়সের জনৈক আলেক্সান্ডার (প্যারিস) সম্বন্ধে এখানে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

৮. এফ ম্যাক্সমুলার : *চিপস্ ফ্রম এ জার্মান ওয়ার্কশপ* (২ খণ্ড, লন্ডন, ১৮৬৮), খণ্ড-২, পৃ. ২২-২৬।

৯. এস এ ডাঙ্গে : *ইন্ডিয়া ফ্রম প্রিমিটিভ কমিউনিজম টু স্লেভারি (বম্বে,* ১৯৪৯); *এ বি ও আর আই*, ২৯(১৯৪৯), পৃ. ২৭১-২৭৭ সংখ্যায় লেখাটির পর্যালোচনা দ্রষ্টব্য।

১০. ভি গর্ডন চাইল্ড : *ম্যান মেকস্ হিমসেল্ফ* (লন্ডন, ১৯৩৬; সামান্য পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ, থিংকারস লাইব্রেরী, ১৯৪১); *হোয়াট হ্যাপেনড্ ইন হিস্টরি* (পেলিকান বুকস্ এ-১০৮, পরিমার্জিত সংস্করণ, লন্ডন, ১৯৫৪)। এখানে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানবপ্রগতির ধারাবাহিক বস্তুগত বিকাশকে মূল্যায়ন করেছেন।

১১. ১৯৫১-র আগে যখন জাতপাতের পার্থক্য বিলোপের ক্যানুসিয়-পদ্ধতি অনুসারে জাতপাতভিত্তিক শ্রেণীবিভাজনের সমগ্র ধারণাটি সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ছিল তখনকার দশবার্ষিকী জনগণনা রিপোর্টগুলি মূল্যবান। উপরন্তু, বিচ্ছিন্ন উপজাতিগুলির উপর লেখালেখি ছাড়াও দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের জাতিবিদ্যা-সংক্রান্ত রিপোর্টগুলিও পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য—থার্স্টন ও রঙ্গচারী : *ট্রাইবস্ অ্যান্ড কাস্টস্ অফ সাউথ ইন্ডিয়া;* এইচ এইচ রিজলি : *ট্রাইবস্ অ্যান্ড কাস্টস্ অফ বেঙ্গল (এথনোগ্রাফিক গ্লসারি,* ২ খণ্ড, কলকাতা, ১৮৯১); আর ভি রাসেল ও হীরা লাল : *ট্রাইবস্ অ্যান্ড কাস্টস্ অফ দি সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস;* আর ই এনথোভেন : *ট্রাইবস অ্যান্ড ক্যাস্টস্ অফ বম্বে* (৩ খণ্ড, বম্বে, ১৯২২)। ভেরিয়ার এলউইন-এর *দি বৈগাস,* এবং *দি মারিয়া অ্যান্ড দেয়ার ঘোটাল* বা এস সি রায়-এর *দি ওঁরাওস* সাম্প্রতিককালের কাজের নিদর্শন। ও আর হ্রেনফেলস (O. R. Ehrenfels) -এর কিছু লেখায় যেমন হয়েছে তেমন যৎসামান্য ঘটনার ভিত্তিতে ভাসা ভাসা পর্যবেক্ষণ থেকে পাঠকদের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে বি ম্যালিনস্কির *ক্রাইম অ্যান্ড কাস্টমস ইন স্যাভেজ সোসাইটি* (লন্ডন, ১৯৪০) একটি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের বই।

১২. মার্কসের যে সমস্ত রচনার উল্লেখ করা হয়েছে তার অধিকাংশই পাওয়া যাবে এমিল বার্নস সম্পাদিত *হ্যান্ডবুক অফ মার্কসইজম-এ* (লন্ডন, ১৯৩৫)।

১৩. মার্কসীয় শিক্ষার ওপর লেখা এক অসাধারণ নিবন্ধে লেনিন এই অংশটির পুনরুল্লেখ ও বিশ্লেষণ করেছেন। স্তালিন তাঁর ডায়ালেকটিকাল অ্যান্ড হিস্টরিকাল মেটিরিয়ালিজম'-এ (*হিস্টরি অফ দি সি পি এস ইউ*-এর, অধ্যায়-৪, বিভাগ-২, সংক্ষিপ্ত পাঠ, মস্কো, ১৯৫০ পৃ. ১২৮-১৬১ এবং বিশেষভাবে পৃ. ১৫১(৩) স্তরগুলির তালিকার পরিবর্তন করে আদিম উপজাতিক পর্যায়টিকে যুক্ত করেছেন—যা মার্কস এবং এঙ্গেলসের পরবর্তী কাজগুলির মধ্যে নিহিত ছিল এবং সমাজতান্ত্রিক পর্যায়টিকেও—যা অত্যন্ত সাম্প্রতিককালে রূপ পেয়েছে ; কিন্তু এশীয় ধারাটি সম্পূর্ণভাবেই বাদ রেখেছেন।

১৪. এশীয় উৎপাদন রীতি বলতে যা বোঝাত সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তহীন কিছু আলোচনা ছিল অধুনা অপ্রচলিত *Pod Znamenem Marksizma*-তে। ভারতবর্ষে একটা সমান্তরাল রীতির ধারাবাহিক প্রচলন ছিল যাকে ছোট করে দেখা সম্ভব নয়—কেননা সে রীতিটা দাসত্বপ্রথার ওপর নির্ভরশীল ছিল না এবং ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ভূমিদাস বা তালুকদারী অর্থনীতির ধরনের সঙ্গেও তার বিরাট তফাৎ ছিল।

১৫. মার্কস ও এঙ্গেলস-এর ভারত-বিষয়ক অভিমত তাঁদের ব্রিটেন সম্বন্ধীয় বক্তব্যগুলির একটি সুন্দর সংকলন (মস্কো, ১৯৫৩) থেকে ভালভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে এলাহাবাদের সোশ্যালিস্ট বুক ক্লাব পাবলিকেশনের চতুর্থ সংখ্যায় মূলক রাজ আনন্দ স্বাক্ষরিত তারিখবিহীন এবং অত্যন্ত দায়সারা টীকা-সমন্বিত এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এখন সেটা পড়লে বাস্তবিকই অবাক লাগে যে রজনীপাম দত্ত, এডগেল রিকওয়ার্ড, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সাজ্জাদ জাহির, পি সি যোশী এবং জেড এ আহমেদ—এঁরা সব সম্পাদকের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু, নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ, এম আর মাসানি, রামমনোহর লোহিয়া—এঁরা ছিলেন এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এঁদের কেউই, আদিম সমাজ সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর পরবর্তীকালের গবেষণা যুক্ত না হওয়ায় এ কাজটি যে অসম্পূর্ণ সে বিষয়ে পাঠককে সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমনতর অগভীরতা থেকেই বোধহয়, এই সমস্ত

বিস্ময়কর ব্যক্তিবর্গের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক রূপবদলকে ব্যাখ্যা করা যায়, যাঁদের প্রায় প্রত্যেকের সম্বন্ধেই বলা যেতে পারে—'কি ছিলেন, আর কি হইলেন।' *(Quantum matatus ab illo)*

১৬. দ্রষ্টব্য ঃ বেঞ্জামিন ফ্যারিংটন, মডার্ন কোয়ার্টারলি, ৭, ১৯৫১-২, পৃ. ৮৩-৬।

১৭. ওয়ার্নার সোমবার্ট ঃ *এ নিউ সোশ্যাল ফিলজফি* (অনুদিত, প্রিন্সটন, ১৯৪৭)। উদ্ধৃতিটি এ বই-এর ভূমিকার (বার্লিন, ১৯৩৪) একাদশ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

১৮. স্পেংলার তাঁর *Preussentum and Sozialismus*-এ (মানচেন, ১৯২০) পছন্দমতো অংশগুলি নিয়ে একধরনের জগাখিচুড়ি বানিয়েছেন। আর, এইচ এল ফিশারের *হিস্টরি অফ ইউরোপ*-এ প্রকৃতই এক করুণ দর্শন ফুটে উঠেছে এবং আর্নল্ড টয়েনবির দশখণ্ডের ইতিহাসের দর্শনে ইতিহাসটাই গৌণ হয়ে গেছে।

১৯. বিশেষ করে, *দি অরিজিন অফ ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দি স্টেট।* এছাড়া, কৃষক-কমিউনের ওপর মার্কস-এর নিজের লেখা *দি মার্ক*-ও মূল্যবান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রেণী-পূর্ব সমাজের উত্তরাধিকার

ইতিহাস বলতে যা আমরা পড়তে অভ্যস্ত তার বিষয়বস্তু হল সমাজের রূপ বা ধরন—যে সমাজ হাতিয়ার ব্যবহারকারী জন্তু তথা মানুষের গোষ্ঠীবিকাশের অনতিপূর্বে শুরু হয়েছিল। আধুনিক যুগে এই সমাজগুলিরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়া। তার অর্থ এই নয় যে শুধুমাত্র শ্রমেরই বিভাজন ঘটেছে—বরং এ এক মৌল বিক্ষেপ যা দুই প্রধান অংশ, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-উৎপাদনকারী এবং কোন উপায়ে তা নিয়ন্ত্রণকারী-র অস্তিত্বের ফলশ্রুতি থেকেই এসেছে। সাধারণভাবে, নির্দিষ্ট কিছু মানুষের দ্বারা একটা সময় সম্পত্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে মালিকানার অধিকার বলবৎ করার মধ্য দিয়ে এটা চালু হয়েছিল। অবশ্য, আমরা জানি যে (সাধারণ অর্থেই শুধু নয় বরং বিশেষ করে ভারতবর্ষে), প্রকৃত উদ্বৃত্ত উৎপাদিত হবার আগে থেকেই নারী-পুরুষদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব ছিল; এমনকী মানুষ খাদ্যের মত অপরিহার্য বস্তু—যা জল-বাতাসের মত সহজলভ্য নয়—যখন উৎপাদন করতে শিখেছে তারও আগে থেকে। কারণটা হল, এমনকী খাদ্য সংগ্রহ করার জন্যও একটা সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল এবং তার অনিয়মিত যোগানের মোকাবিলা করার জন্য সঞ্চয়ের; অর্থাৎ একটা কৌশল—যত কাঁচাই তা হোক না কেন। তাই, খাদ্য-উৎপাদনকারী হয়ে ওঠার অনতিপূর্বে খাদ্য-সংগ্রহকারী মানুষও গোষ্ঠীবদ্ধভাবেই বাস করত—যেগুলিকে এখন আমরা বলি বিভিন্ন পরিবারের কৌম-একক (clan-unit), যদিও পরিবার বা নির্দিষ্ট পিতৃপরিচয়ের ধারণাটা তখনও সর্বক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

দু'টি ভিন্ন সূত্র থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। প্রথমটি হল, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির কিছু অবশেষ (নিষ্ক্রিয়তা, উপজাতিক সংহতিবোধ, সাধারণ লোকাচার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে) এমনকী আজকের দিনেও, খাদ্য-সংগ্রহকারীর জীবনকেই প্রাণপণে আঁকড়ে আছে।[১] পোড়ো এলাকা, শিকার-সামগ্রী বা বন্য ফলমূলের ক্রমবর্ধমান

অভাবের জন্য বাধ্য হয়ে এরা যখন উন্নত অঞ্চলে ঢুকে পড়ে তখনও খাদ্য সংগ্রহের জন্য সাধারণত ভিক্ষা বা চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করে। এই সমস্ত আদিবাসীদের অভ্যাসগুলিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, অতীতে এদের খাদ্য-সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন; পশুপাখি মারত, অথবা ফাঁদ পেতে ধরত, অথবা জঙ্গলের মাটি খুঁড়ে আকন্দ, মূল ইত্যাদি জোগাড় করত। যে সমস্ত হাতিয়ার এরা ব্যবহার করে সেগুলি যৎসামান্য এবং সাদামাটা—অবশ্য, যদি না ক্ষিদের তাড়নায় অন্তত কিছু সময়ের জন্যও কৃষি বা অন্য শ্রমে যোগ দিতে বাধ্য হয়ে থাকে।[২] আজকের দিনে এদের হাতিয়ারগুলি হয়ত লোহা বা স্টীল দিয়ে তৈরি, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে ব্যবহারকারীরা নিজেরা তা তৈরি করতে পারে না এবং অতীতেও জীবনধারার মৌলিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে এ সব তৈরি করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরের যুগে, সুস্থিত এবং অনেক বেশি অগ্রবর্তী সমাজই ধাতু বা হাতিয়ার উভয়েরই উন্নতি ঘটিয়েছে। ঠিক এই পর্যায়ে, আমাদের যে দ্বিতীয় সূত্র তা হল—প্রত্নতত্ত্ব। অতীতকে পর্যায়ক্রমিকভাবে খুঁড়ে খুঁড়ে গেলে আমরা এমন একটা স্তরে (অসম) গিয়ে পৌছব যেখানে আদৌ কোন ধাতব হাতিয়ার ছিল না। আবার, ধাতব যুগের স্তরের ঠিক নীচেই যে স্তর সেখানে সঞ্চিত নিদর্শনগুলি সেই মানুষদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় যারা পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত ঃ ধারালো পাথর, সূচালো পাথর, হাত কুড়ুল, ছুরির মত ফলক, ছোট ছোট পাথরের টুকরো (যেগুলি ব্যবহারের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি)। প্রশ্নাতীতভাবে, এ সবই ছিল মানুষের হাতে তৈরি এবং এর অনেকগুলিরই ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত কাঠের প্রয়োজন হত—যেমন, তীরের ফলা বা ক্ষুদে পাথর (যেগুলির নিশ্চিতই কাস্তের মত দাঁত ছিল); এগুলিকে কাঠের খাঁজে আটকানো হত। অন্যগুলির সম্ভবত হাতল ছিল অথবা কাঠের ওপর আঠা দিয়ে সেঁটে হারপুন বা বর্শার ফলক তৈরি করা হত। যদিও এই প্রত্নস্তরগুলির সঠিক কালনির্ণয় সহজসাধ্য নয়,[৩] কিন্তু তা যুগানুক্রমিক ধারাবাহিকতার এক স্পষ্ট নির্দেশ দেয় এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া এই স্তরগুলির তুলনামূলক বিচারই প্রাক্-ইতিহাস চর্চার একটি মূল পদ্ধতি[৪]; উভয় প্রকরণই ভূ-তত্ত্বের কাছ থেকে প্রত্নতত্ত্বে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাতিয়ারের যে সাধারণ পর্যায়ক্রম সেই অনুসারে, প্রত্নস্তর ও কাল ধরে নীচে নামলে আমরা স্টীল, লোহা, ব্রোঞ্জ, তাম্রপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর, মধ্যপ্রস্তর ও আদিপ্রস্তর যুগের সন্ধান পাব। গোড়ার যুগের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীবিন্যাস সর্বত্র সমান প্রযোজ্য নয়, আবার ভারতের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োগও সবসময় যুক্তিযুক্ত নয়। প্রাচীন যুগগুলির সময়সীমা অত্যন্ত দীর্ঘ। ভারতের ক্ষেত্রে, ব্যাপক ও সুসম্বদ্ধ খননকার্যের দ্বারা তলাকার স্তরে পৌছতে না পারার জন্য যে কোন দেশের তুলনায় ছবিটা অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। কোথাও হয়ত ব্যাখ্যাতীত সামাজিক সীমাবদ্ধতা, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে চলা আদিমতম সংস্কৃতি, আবার কোথাও হয়ত অজানা মূল থেকে উদ্গাত এক বিমিশ্র শাখার এলাকাজোড়া অধিষ্ঠান। সমগ্র উপাদানই অপ্রতুল—বিশেষ করে, বিশাল এই দেশের অজস্র আঞ্চলিক বিভিন্নতার কথা যখন মাথায় রাখা হয়।[৫] বিকাশের ক্ষেত্রেও লাফিয়ে চলার ঘটনা ঘটেছে। দাক্ষিণাত্যে, মনে হয়, তাম্রযুগের আয়ুষ্কাল ছিল খুবই সীমিত; সম্ভবত, বহু জায়গাতেই মানুষ প্রস্তরযুগ থেকে সরাসরি লৌহযুগে গিয়ে পৌছেছিল। সমুদ্রে অভিক্ষিপ্ত ত্রিভুজাকৃতি ভারতীয় ভূখণ্ডে গ্রানাইট ও আগ্নেয়শিলা আদিম হাতিয়ার তৈরির পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল—যা যথেষ্ট পরিমাণে আজও সংগ্রহ করা যেতে পারে। আবার, ধারওয়ারের মতো পাহাড়ের উপাঙ্গগুলিতে লোহার প্রাচুর্য—অল্প

খোঁড়াখুঁড়ি বা আদৌ তা না করলেও একটি কঠিন পুরু আস্তরণ এমনকী আজও স্পষ্ট দৃশ্যমান। এগুলিকে চূর্ণ করে, কাঠকয়লার আগুনে পুড়িয়ে পেটাই করে হাতিয়ার বা পাত্র তৈরি করা যায়। আদিম প্রযুক্তিতে স্থানীয়ভাবে তৈরি এই ধরনের বাসন মহীশূরের ভদ্রাবতীতে বা চিপলুন-এর কাছে হেলভেক-এ কিনতে পাওয়া যায়। হায়দ্রাবাদের জনমপেট[৬]-এর বিশাল সমাধিক্ষেত্রের কিছু স্মৃতিস্তম্ভের উন্মোচনে চিত্রখোদিত পাথরের শবাধার-এর সন্ধান মিলেছে, কিন্তু সেগুলি তৈরি করা হয়েছিল লোহার হাতিয়ার দিয়ে। কোলারের প্রথমযুগের স্বর্ণখনি বা হায়দ্রাবাদের নিঃশেষিত স্বর্ণখনিগর্ভে পাথরের যুগের হাতিয়ার ব্যবহারের প্রমাণ আছে।

উত্তর সিন্ধুপ্রদেশের রোহরি[৭]-র মত জায়গাগুলির ব্যাপক এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সেখানে আগে পাথরের হাতিয়ার তৈরি করা হত এবং একধরনের শ্রমবিভাজনও ছিল। হাতিয়ার প্রস্তুতকারকরা, সম্ভবত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সব হাতিয়ার নিজেরা ব্যবহার না করে কিছু বিনিময়ও করত। মহীশূর রাজ্যে আবিষ্কৃত[৮] পরিত্যক্ত শস্যাগারগুলির অভ্যন্তরে সুনিপুণভাবে কাটা, পাতলা ও কর্কশ গ্রানাইট পাথরের সারিবদ্ধ অজস্র থাকগুলি, মনে হয়, ঐতিহাসিক কালপর্ব পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এবং হয়ত এগুলি তৈরি হয়েছে সেই যুগে যখন ধাতুর ব্যবহার চালু হয়ে গেছে—যদিও আপাতভাবে সেখানে পাওয়া গেছে কেবলমাত্র পাথরের হাতুড়ি ও সূচালো ফলা। আবার, বাঙ্গালোর থেকে ২৬ মাইল দূরে মহীশূর যাবার রাস্তায় এক বিশাল শিলাখণ্ডের নীচে চাপা পড়া গুহায়[৯] সুদীর্ঘ লৌহদণ্ডের সন্ধান মিলেছে এবং সন্দেহাতীতভাবে আচার-অনুষ্ঠান-পালন সংক্রান্ত কাজে সেগুলির গুরুত্ব ছিল। আমার ধারণা, ইউরোপ বা এমনকী ইরান ও আফগানিস্থানের তুলনায়ও ভারতের ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক গুহাগুলির তাৎপর্য যথেষ্ট কম—যদিও কোন ভারতীয় চৌ-কৌ-তিয়েন-এর আবিষ্কার এখানে যে কোন সময়েই সম্ভব। উত্তর গোলার্ধের তুলনায় তুষার-যুগের প্রভাব এখানে তেমন ছিল না। সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ, ইঁদুর এবং বন্যজন্তুদের উৎপাতের জন্য কেবলমাত্র বৃষ্টির সময় ছাড়া গুহাগুলির ব্যবহার হত না। পাচমারহি-র চারপাশের গুহাগুলির পরীক্ষায় এখনও আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটেনি, যদিও মির্জাপুরের উত্তরাংশে পরীক্ষিত গুহাগুলিতে স্বল্পকালীন বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে—যা বিশেষ সময়ে ব্যবহারের যুক্তির সঙ্গে সঙ্গত। বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ঐতিহাসিক কালপর্বে অনেক প্রাকৃতিক গুহাকেই মঠ বা গুহামন্দির নির্মাণের প্রয়োজনে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

২.২ আজও পর্যন্ত সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা—যেমন, পাঞ্জাব, গাঙ্গেয় উপত্যকা বা দাক্ষিণাত্যের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির প্রস্তরপূর্ব যুগ থেকে পরম্পরাগত বিকাশের সম্পূর্ণ ধারাটিকে বোঝা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে, পরে আমরা দেখব যে এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ এক ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে এসেছে। রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ উপরিকাঠামোগত উত্থান-পতনেও দীর্ঘ প্রচলিত লোকাচারগুলিকে নিষিদ্ধ করা যায়নি—যদিও সেগুলি ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুমোদিত ছিল না এবং এখানকার আদিমতম সমাজের গর্ভেই তাদের উৎপত্তি। আরও উল্লেখ্য যে, হিন্দু শাস্ত্রাদি এবং বিশেষ করে, পালনীয় ব্রাহ্মণ্য আচারগুলিতেই বরং স্থানিক অব্রাহ্মণ্য লোকাচারগুলির আরোপন ঘটেছে। অর্থাৎ, আত্মীকরণের প্রক্রিয়াটা ছিল পারস্পরিক—যা ভারতবর্ষের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। শুধুমাত্র সংস্কৃত পুঁথিনির্ভর ছদ্ম-ইতিহাসচর্চার হেঁয়ালিপূর্ণ

আদি থেকে আধুনিক ধারায় এই কথাটা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। তাদের 'সিদ্ধান্ত-সূত্রে' ধরা পড়ে না যে বৃহত্তম জনসাধারণ উচ্চশ্রেণী ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের 'বিশুদ্ধ' লোকাচারের প্রতি খুব একটা আগ্রহী ছিল না।

পাথরের হাতিয়ারের সাময়িক ব্যবহার সবসময় শ্রেণীহীন সমাজের সাক্ষ্য দেয় না—বিশেষ করে, ভারতের মত কোন সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের দেশে। হেস্টিংসের যুদ্ধে স্যাক্সনদের একটা মুষ্টিমেয় অংশ পাথরের কুড়ুল ব্যবহার করেছিল। মেক্সিকো, গুয়াতেমালা বা পেরুর বিজয়-পূর্ব স্মৃতিস্তম্ভগুলি মিশরের বিখ্যাত পিরামিডগুলির মতোই তৈরি হয়েছিল পাথরের হাতিয়ার দিয়ে—যদিও তামার ব্যবহার তখন জানা ছিল এবং সোনাও প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ ও পরিশোধন করা হত; কৃষিকাজে লাঙ্গলের ব্যবহার না জানা সত্ত্বেও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা লোকাচার পালনের জটিল পঞ্জিকার প্রচলন, ব্যাপক নরবলি প্রথা, অভিজাত ও শ্রমিক শ্রেণীর বিভাজন এবং নতুন নতুন এলাকা দখলের জন্য যুদ্ধ—এ সবই করেছিল। সুতরাং, কেবলমাত্র ব্যবহৃত হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য—যা হয়ত চারপাশে ঐতিহাসিক কালপর্ব (পাঠ্যবইয়ের অর্থেই) শুরু হয়ে যাওয়ার পরও মেষপালকদের কোন ক্ষুদ্র গ্রাম বা বিচ্ছিন্ন কোন আদিম মানুষদের টিকে থাকার মতোই ব্যতিক্রমী ঘটনা—তার প্রতি নিবিষ্ট না থেকে যে কোন পর্বের ছবির সামগ্রিকতাটার অনুসন্ধানই জরুরী। বস্তুত, পাঞ্জাবে যখন নগর-সভ্যতার উত্থান ও পতনের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে, গাঙ্গেয় উপত্যকা প্রত্যক্ষ করছে ধর্মীয় বিরোধ ও বিশাল বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—দাক্ষিণাত্য তখন শাসিত হচ্ছে সবচেয়ে আদিম সমাজব্যবস্থায়। তাই, আমাদের কাজ হল, এই আদিম সমাজের (উৎপাদনের উপকরণের বিচারে আদিম) শ্রেণী-বিভাজনপূর্ব সমাজ-সংগঠন কেমন ছিল তা বোঝা—যা আজও অনুন্নত অংশবিশেষের মধ্যে টিকে আছে বা প্রাতিষ্ঠানিক 'হিন্দুত্ব'-এ প্রভাব রেখে দিয়েছে।

সমাজ বলতে যা বোঝায় তার সূচনার যুগে, অর্থাৎ প্রাক্-শ্রেণী সমাজ ছিল গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংহত। কেবলমাত্র জন্মসূত্রেই কেউ তার পূর্ণ সদস্য—এমনটা হত না, বয়ঃপ্রাপ্ত হলে কিছু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাকে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হত। গোষ্ঠীর কোন মানুষের কাছে সমাজ বলতে যা কিছু—তা তার নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; অন্য গোষ্ঠীর মানুষকে মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হত না। তাদের কাউকে মেরে ফেলা বা সর্বস্বান্ত করাটা প্রায়শ কর্তব্য হিসেবেই বিবেচিত হত, গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোন মানুষের ক্ষেত্রে যেমন মনে করা হত—তেমন কোন অপরাধ নয়। অবশ্য বহিরাগত কাউকে পূর্ণসদস্য হিসেবে গোষ্ঠীভুক্ত করার রীতিও ছিল। গোষ্ঠীগুলি বিভক্ত ছিল বিভিন্ন বহির্বৈবাহিক একক বা কৌম-এ যা পরবর্তীকালের বংশের সঙ্গে তুলনীয়। আবার খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতার সময় তা সংগ্রহের জন্য কৌমগুলিকেও পাঁচ-ছটি পরিবার নিয়ে এক একটা দলে ভাগ করা হত। প্রতিটি কৌমেরই কোন একটি নির্দিষ্ট খাদ্যে সহজাত বিশেষজ্ঞতা আছে বলে মনে করা হত—যেটি ছিল তাদের একান্তই নিজস্ব জিনিস এবং এ নিয়ে তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ঐক্যবোধও ছিল। হয়ত সেটা কোন আহারোপযোগী ফল বা পতঙ্গ বা পশু—সাধারণত গোষ্ঠীর টোটেম হিসেবে আমরা বৃক্ষ বা প্রাণীকেই দেখতে পাই। এমনকী এটাও হতে পারে যে, গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন কৌমের সংহতির মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল (যদিও হয়ত কোন গোষ্ঠী এক সময় এই ধরনের বিভিন্ন এককে ভাগ হয়ে যেত, কিন্তু প্রবণতাটা ছিল বৃহত্তর যৌথতার দিকেই) এবং তা ঘটত সম্ভবত খাদ্যবস্তুর বিনিময়কে ভিত্তি করে। এই

পর্যায়ে, টোটেম—অর্থাৎ নির্দিষ্ট পশু বা ফলটির ভক্ষণ সংশ্লিষ্ট কৌমের মানুষদের কাছে নিষিদ্ধ (Taboo) হত, কেবলমাত্র উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় ছাড়া। যেমন, কিছু টোড মন্ত্রের—সাম্প্রতিককালে যার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে—আসল অর্থ ছিল মোষ-বলি ও তার মাংস ভক্ষণ। এই ধরনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আধুনিক টাবু হল গো-মাংস ভক্ষণ (পশুপালন যুগ থেকে চালু হয় কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের মূল অনুশাসনগুলির একটি হিসেবে প্রবল হয়ে ওঠে)। পূর্বোক্ত কালে, খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কৌমের মধ্যে মানুষের আদানপ্রদানও শুরু হয়। আদিম বিবাহপ্রথা বলতে যা ছিল তা হল গোষ্ঠীভুক্ত এক বা একাধিক সদস্যের সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ হওয়া (আন্তঃবিবাহ) এবং নিজস্ব কৌমের বাইরে যদি কেউ বিবাহ করে (বহির্বিবাহ) তবে তা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কৌমগুলিকে সংহত করতে সাহায্য করত। প্রথমে বিবাহ হত দলভুক্ত নরনারীর মধ্যে। তখন কৌমগুলি ছিল মাতৃতান্ত্রিক—জন্মপরিচয় ও উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিল মাতৃধারা অনুসারী; বাবার কোন গুরুত্ব ছিল না—এমনকী সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিচারেও নয়।[১০] মাতৃতান্ত্রিক সমাজ দেশের সেই সমস্ত অংশে এখনও টিকে আছে যেখানে লাঙ্গলচালিত কৃষিপদ্ধতির প্রচলন অনেক দেরিতে হয়েছে—যেমন, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে বা কিছু কিছু উপজাতিদের মধ্যে। কারণটা হল, মূলগতভাবে সম্পত্তির ধ্যানধারণা বলতে যা বোঝায় তখন তা ছিল না, কেবলমাত্র ব্যক্তিনির্মিত কিছু হাতিয়ারের ক্ষেত্রে ছাড়া—যেগুলি সম্ভবত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমতার (মান) পরিচায়ক ছিল। জমি ছিল কাজের ক্ষেত্র, কারো সম্পত্তি নয়; শিকার এবং সংগৃহীত খাদ্য সকলের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হত। শ্রম-বিভাজনটা প্রথম এসেছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে; নারীরাই প্রথম মাটির পাত্র তৈরি করেছিল, ঝুড়ি বুনেছিল, কোদাল[১১] বা মাটি খোঁড়ার হাতিয়ার দিয়ে চাষের কাজ করেছিল। শস্য যখন খাদ্য হিসেবে গুরুত্ব পেল তখন তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেমন মৃৎপাত্র বা ঝুড়ির প্রয়োজন ছিল, তেমনি পেষাই-এর জন্য প্রয়োজন ছিল জাঁতার। কিন্তু শস্য শুধুমাত্র সংগ্রহ করা যায় না—তা উৎপাদন করতে হয়। সমাজে পুরুষাধিপত্য এল তখনই—যখন পুরুষ-নির্ভর সম্পদের বিকাশ ঘটল; অর্থাৎ, পশুপালন—যা প্রথমে মাংস, পরে দুধ ও চামড়ার (বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হত) প্রয়োজনে শুরু হয়েছিল—তা-ই কৃষি ও পরিবহণে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হল। এই প্রক্রিয়ায়, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে জয় করে মানুষ ক্রমশ আরও ভালভাবে বাঁচতে শিখল; প্রথম, নিজের শ্রম দিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত, অর্থাৎ, উদ্বৃত্ত উৎপাদন করল। এইভাবেই পুরুষ প্রাধান্য, ব্যক্তি-সম্পত্তি, শ্রেণীবিভাজন ইত্যাদি এসে পৌঁছল, যদিও তা সবসময় অনিবার্য ছিল না। দাসকে দিয়ে পশুপালন করানো যেত, চাষের কাজও। কিন্তু দাস সংগ্রহ করতে হলে যুদ্ধ করতে হয়—শিকার বা মাছ-ধরার তীর, হারপুন অন্য মানুষদের দিকে তাক করে। প্রক্রিয়াটা ত্বরান্বিত হল ধাতুর ব্যবহার শেখার পর, বিশেষ করে তামা ও ব্রোঞ্জের—কেননা, সেগুলো যথেষ্টই দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং যোদ্ধা ও অভিজাতশ্রেণীর একচেটিয়া অধিকারে। লোহা, যদিও সহজলভ্যতার কারণে কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হল, কিন্তু তা একই সঙ্গে বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের কঠোর শ্রমের বিনিময়ে একদল মানুষকে কাজ করার প্রয়োজন থেকে মুক্তি দিল। এটাই ছিল 'লৌহযুগে'র তিক্ত নিহিতার্থ। নিয়মিত কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে গবাদি পশুর জৈব সার জমির উর্বরতা বাড়াল —যা আদিম মাটি-খুঁড়ে আগুন-জ্বালানো (বা ঝুম) চাষ পদ্ধতির ফলে দ্রুত নষ্ট হত; ফলে, জমিকে স্থায়ীভাবে দখলে রাখাটাই রীতি হয়ে উঠল এবং জমির ওপর ব্যক্তি-মালিকানা কায়েম হতে লাগল। তা সত্ত্বেও, একটা সমাজ বিভিন্ন রীতির

মিশ্র রূপ-কেও রক্ষা করে যায়—যদি না, খাদ্য উৎপাদন-পদ্ধতির কোন নতুনধারা তাকে সার্বিকভাবে প্রভাবিত করে। যেমন, কিছু কিছু বান্টু গোষ্ঠীতে গৃহপালিত গবাদি পশুর উত্তরাধিকার পুরুষদের, যেহেতু পশুপালন কাজটা তাদেরই এবং জমির—যা কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভারী খুরপার সাহায্যে কেবলমাত্র মেয়েরাই চাষ করত—উত্তরাধিকার মেয়েদের।

আচার-অনুষ্ঠান বা বলিদান—এ সবের ধ্যানধারণাও শ্রেণী-উদ্ভবের আগেই বিকশিত হয়েছে। এগুলি ছিল দুর্জ্ঞেয় ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতার বাইরের রহস্যময় প্রকৃতিকে তুষ্ট করার জন্য মানবজাতির প্রথম প্রয়াস। শিকার করা পশুদের অনুকরণ করেই তারা উন্নততর শিকার কৌশল আয়ত্ত করেছিল, কিন্তু সে কৌশলকে তারা দেখত জাদু হিসেবে—যা পশুদের প্রভাবিত করে। আমাদের গুহা অভ্যন্তরের (মধ্যভারত, মির্জাপুর) শিকার-চিত্রগুলি বিবরণ হিসেবে আঁকা হয়নি, আঁকা হয়েছিল শিকারের পরিমাণ বাড়ানোর বাসনায় যাদু-প্রক্রিয়া রূপে। এইভাবেই ধর্ম, নৃত্য, চিত্রকলা, কাব্য ও সঙ্গীতের জন্ম হয়েছিল। আগুনের ব্যবহার, এমনকী আদি প্রস্তরযুগের মানুষও জানত বলে মনে হয়—কিন্তু তা জ্বালানো, প্রজ্বলিত রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করা এতই দুরূহ ছিল যে তার জন্যেই বলিদান চালু ছিল; কুমারী মেয়েদের অগ্নির উদ্দেশে বলি দেওয়া হত। বলিদানের ধারণাটা কোথা থেকে এসেছিল তা বোঝা কঠিন, তবে মনে হয়, আদিম মানুষ তার নিজের মত করে এটা লক্ষ্য করেছিল—যে হরিণীটিকে গতবছর খাওয়া হয়নি সে-ই এ বছর আর একটা ভোজ্য শাবকের জন্ম দিয়েছে; না খেয়ে ছুঁড়ে ফেলা বীজ থেকে শস্যের চারা গজিয়েছে। এইভাবেই হয়ত নিয়মিত চাষ ও পশু-উৎপাদনের প্রচলিত আদিরহস্য হিসেবে বলিদান প্রথা ব্যাখ্যাত হয়েছে! এ থেকে অবশ্য আঙুল কেটে উৎসর্গ করা, মাথার খুলি ফুটো করা বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে নরবলি প্রথা কিভাবে চালু হল তা জানা যায় না—যদিও রক্তের জাদুক্ষমতার কথাটা সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল। ফল-কামনার এই আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে চলত এক ধরনের উন্মত্ত উৎসব—যা আজকের দিনে মনে হতে পারে স্থূল যৌনতা (যদিও কালেভদ্রে ঘটত), কিন্তু তা সে যুগের মানুষের খাদ্যাভাব, উন্মুক্ত ও নিরাপত্তাহীন জীবনের পটভূমিতে যথেষ্ট কষ্টকরই ছিল; তবু এর দ্বারা তারা প্রকৃতিকে জাগ্রত করে তার করুণার প্রতিদান ভিক্ষা করত। ইউরোপের প্রস্তর-যুগের মানুষদের, এমনকী চকমকি পাথরের কামনায় আচার পালনের কথা জানলে আজ হয়ত আমাদের কৌতুক বোধ হয়। শরীরের ঋতুচক্র বিষয়ে রহস্যময় ভীতি, রজঃস্বলা নারীর শরীর বা না-কাচা কাপড়চোপড় পুরুষের পক্ষে এমনকী অজান্তে স্পর্শ করার ওপর নিষেধ আজও ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত; তার সঙ্গে দেবীমাতৃকার পূজা এবং চন্দ্রের—যার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে নারী শরীরের ঋতুচক্রের সম্বন্ধ আছে বলে মনে করা হয়। গূঢ় সাধনপ্রণালীর মধ্যে নিহিত ফলকামনার এই আদিম লোকাচারগুলি—যাবতীয় স্থূলতা, অশ্লীলতা, এমনকী বীভৎসতা সমেত অবিকলভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে এবং এ গুলিই রূপ পরিগ্রহ করেছে তন্ত্রসাধনায়। দ্বিতীয়, আপাত গুরুত্বহীন লোকাচারসমূহ সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে মৃত্যুর সঙ্গে—যা এক দীর্ঘ নিদ্রা অথবা ধরিত্রীমাতার গর্ভে প্রত্যাবর্তন হিসেবে গণ্য হত; এই ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে সমাধি প্রথার মধ্যে। জড়োসড়ো করে শুইয়ে সমাধি দেওয়ার রীতিটা প্রায়শই দ্ব্যর্থবোধক, কেননা হয়ত মৃত মানুষটি উষ্ণতার প্রয়োজনে জড়োসড়ো মেরে শুতো—যেমনটা তার হতভাগ্য বংশধরদেরও দীর্ঘদিন শুতে হয়েছিল; কিন্তু কোন ধরনের পাত্রের মধ্যে শুইয়ে সমাধিস্থ করাটা নিশ্চিতভাবেই মাতৃজঠরে প্রত্যাবর্তন। আকরিক পরিশোধন-পদ্ধতি আবিষ্কারের পর মানুষের

নশ্বর অপরিচ্ছন্ন মাংসল অংশ পবিত্র আগুনে শুদ্ধ করার জন্য দাহপ্রথা চালু হয়, এবং ভস্মাবশেষ কলসীতে পুরে মাটিতে পুঁতে দেওয়া বা কোন পুণ্যতোয়া নদীতে বিসর্জন দেওয়া হত—যে রীতি আজও প্রচলিত। এগুলি আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে তখনই গুরুত্বপূর্ণ যখন প্রত্নতত্ত্ব ও জাতিবিদ্যা সম্মিলিতভাবে কোন আদিম সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সম্পর্কের বিষয়ে আলোকপাত করে। পরবর্তীকালের শ্রেণী-সমাজে এই লোকাচারগুলি প্রায়শই রূপগতভাবে টিকে গেছে—যদিও সেগুলির মর্মবস্তু সামগ্রিক অর্থে ভিন্ন। সাধারণভাবে একটি স্থিতিশীল উৎপাদনক্ষম সমাজের আশু লক্ষ্যই থাকে পুরোহিত শ্রেণীর জন্য মুনাফা অর্জন—যার জন্য কিছু আচার পালনকে জরুরি হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়। আরও তলিয়ে দেখলে, দুরূহপালনীয় এইসব অজস্র লোকাচারগুলির সাহায্যেই অনাগত সমাজের সম্ভাবনাকে রোধ করা বা যে কোন পরিবর্তনকে নিরুৎসাহিত করা হয়; ফলে, শ্রেণী কাঠামো এবং স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। কিছু কিছু মানবগোষ্ঠী যে খাদ্য-সংগ্রাহকের স্তরে আটকে থেকে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার এটাও একটা কারণ। গোড়ার যুগে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরোহিত ছিল কোন গোষ্ঠীর বা কৌমের প্রধান অথবা বিশেষভাবে উৎসর্গিত কোন গুনিন এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কোন দেবীসমা প্রধানা যোগিনী বা নারীসঙ্ঘের কোন সদস্যা।

প্রস্তরযুগে আদিম মানুষদের মূল সমস্যাটা ছিল খাদ্যের স্বল্পতা ও অনিয়মিত প্রাপ্তি এবং তা দীর্ঘদিন সংরক্ষণও করা যেত না। ফলে খাদ্যবস্তু ভাগ করে নিতে হত; কিন্তু তার মধ্যে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের পারস্পরিক ভাগাভাগি হবে—এ ছাড়া অন্য আর কোন বাধ্যবাধকতা থাকত না। সুতরাং যারা ভাগাভাগি করত তাদের নিয়ে গড়ে উঠত এক একটি গোষ্ঠী এবং খাদ্য সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গঠিত হত এক একটি কৌম—যেগুলির প্রায়শই এক একটি খাদ্য-টোটেম নির্দিষ্ট থাকত। প্রথমদিকে যখন উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেত কোন গোষ্ঠীর সামগ্রিকভাবেই তাতে স্বাভাবিক 'অধিকার' থাকত এবং সম্ভবত অন্য কোন বিশেষ খাদ্যের সংগ্রাহক গোষ্ঠীর সঙ্গে তা বিনিময় হত। অর্থাৎ, বিনিময়কারীদের মধ্যেও (খাদ্য অথবা কৌশল) একটা সম্পর্ক গড়ে উঠত—যা নিশ্চিতভাবেই গোষ্ঠী-সম্পর্ক এবং প্রায়ই গোষ্ঠী-বিবাহের মধ্যে রূপ পেত। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে খাদ্য ভাগাভাগির এই বন্দোবস্তটা কোন হিসাবসম্মত লেনদেনের মতো ছিল না। জাঁকজমকের প্রতি টান, কোন লেনদেনকে গোষ্ঠীসম্মত করে তোলার প্রক্রিয়া, উৎসবকে উপলক্ষ করে অগণিত মানুষের মহাভোজ বা আদিম বদান্যতা—এ সব কিছুরই এক একটা ভূমিকা ছিল। 'আদিম সাম্যবাদে'-র ব্যাখ্যাতারা যেমনটা ভাবেন যে, সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যে সকলেরই সমান অধিকার থাকত—তার কোন প্রশ্ন ছিল না [দ্রষ্টব্য ঃ *নিউ এজ* (মাসিক), দিল্লী, ফেব্রু, ১৯৫৯, পৃ. ২৬-২৯]। আবার গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যে বিনিময় হত তা কোন ব্যবসায়িক লেনদেনও ছিল না। আদান-প্রদানগুলি ছিল উপহার স্বরূপ এবং তা কোন নির্দিষ্ট সম্পর্কের অংশীদারদের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই হত। কোন উপহারই প্রত্যাখ্যান করা হত না, কিন্তু তার মধ্যে সম-গুরুত্বের কোন প্রতিদান দেওয়ার একটা দায়বদ্ধতা নিহিত থাকত, হয়ত তৎক্ষণাৎ না হয়ে পরে কোন এক সময়ে। যদিও দান-প্রতিদানগুলি মিলিয়ে দেখার জন্য কোন হিসেব রাখা হত না, কিন্তু এ সবের পেছনে এক নিখুঁত অনুমানক্ষমতা ও স্বার্থবোধ কাজ করত—যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী লেনদেনগুলির মধ্যেও ভারসাম্য বজায় থাকত। একইভাবে, উপজাতিক বিধিগুলির ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছালব্ধ অন্তর্ভুক্তি মানেই ব্যক্তিসত্তার অবদমন বোঝাত না, সেখানে সামাজিক ঘৃণা,

সমাজ বহিষ্কার, আত্মহত্যা, হত্যা, যাদু বা লোকাচার—প্রত্যেকটিই রীতি ও তার প্রয়োগ সংক্রান্ত সামগ্রিক জটিলতাগুলিকে উপলব্ধি করানোয় যে যার নিজস্ব ভূমিকা পালন করত। কিন্তু বলপ্রয়োগ বা দৈহিক শাস্তির প্রচলন ছিল না। এমনকী আজও, ঘটনাচক্রে কাউকে আদিবাসী সমাজ থেকে বহিষ্কার করার পদ্ধতি খুবই সাদামাটা; বহিষ্কারের হুমকিই কোন অভিযুক্তকে নুইয়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। দশহাজার বছর আগের গোষ্ঠী-সমাজের ক্ষমতা ক্ষয়িত হতে হতে এখন ব্যক্তির গুরুত্ব নিশ্চিতভাবেই অনেকবেশি শক্তিশালী হয়েছে। খাদ্য সংরক্ষণে ঝুড়ি, চামড়ার থলে ও মৃৎপাত্রের পর্যায়গুলি শেষ পর্যন্ত দ্রব্য বিনিময় প্রথা, উদ্বৃত্ত ও পণ্য উৎপাদন বা এককথায় এক নতুন সমাজ-সংগঠনের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে।

আদিম জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল অজস্র বৈচিত্র্যের খুঁটিনাটি। প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব আলাদা ভাষা ছিল—যা অনেকসময় হয়ত মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের মধ্যেই প্রচলিত থাকত। সাধারণ ভাব প্রকাশ করার মতো কোন শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়নি। হয়ত 'প্রাণী'-র অর্থবোধক কোন শব্দ তখন ছিল না, যদিও প্রতিটি ধরনকে (হতে পারে রঙ অনুযায়ী) আলাদা করা হত এবং এক একটি গোষ্ঠীর কাছে এক এক নামে চিহ্নিত হত। সুতরাং বিনিময়কেন্দ্রিক জ্ঞাতিসম্পর্ক শুধু যে খাদ্যের যোগানই বাড়িয়েছিল তা নয়, ভাষারও উন্নতি ঘটিয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলির মানুষদের মনোজগতের বিকাশ ঘটিয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা, প্রচুর সন্তান উৎপাদনক্ষম দুই স্বতন্ত্র কৌমের মধ্যেকার বিবাহগত সম্পর্কের ফলে উৎপন্ন সন্তানসন্ততির মানসিক এবং দৈহিক সক্রিয়তা পূর্বজ ধারার চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার জিনগত আনুকূল্যটি এসেছিল—জিনতত্ত্ববিদদের ভাষায় যা 'সংকর-প্রাণ' হিসেবে পরিচিত।

২.৩ এখনও ভারতের প্রান্তিক ও পশ্চাদপদ এলাকাগুলিতে উপজাতি সমাজের অবশেষগুলির উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি সাধারণ পর্যবেক্ষকদের চোখেই ধরা পড়ে। আসামের মত ছোট্ট রাজ্যে প্রায় ১৭৫টির মত ভাষা ও বাগরীতি টিকে আছে—এক একটি ছোট ছোট উপজাতি গোষ্ঠী যেগুলিকে তাদের প্রথা ও সংগঠনের সঙ্গেই রক্ষা করা যায়। এদের মধ্যে কিছু, যেমন—নাগা, আবর বা গারো-রা জাতিবিদ্যা বিশারদদের গবেষণার আওতায় এসেছে। দু-একটি গোষ্ঠী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি তুলেছে। কোন গোষ্ঠী শিকারের কাজে যুক্ত, কোনটি বা অল্পস্বল্প চাষবাসের পাশাপাশি পশুচারণের কাজ চালাচ্ছে এবং বৃহত্তর অংশটা দিনমজুরের বাজারে ঠাঁই করে নিয়েছে। মধ্য ও উপকূলবর্তী ভারতের বনাঞ্চলে, নীলগিরির পাদদেশগুলিতে এবং মালাবারে অন্য উপজাতি অবশেষগুলির সন্ধান মিলবে ঃ মুন্ডা, ওঁরাও, ভীল, টোড, কাডার। এরা সবাই এখন শান্ত। সাঁওতাল বা ভীলদের মতো কোন কোন উপজাতি অনেকদিন আগে ঘটনাক্রমে কখনও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও উন্নত অস্ত্রের সাহায্যে তাদের নুইয়ে দেওয়া হয়েছে। সকলেই আদিম। কিন্তু নিয়মিত খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রাপ্ত যৎসামান্য বিকল্পগুলির প্রতিটিকেই প্রত্যাখ্যান করায় বা চারপাশের সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতিকে স্বীকার ও ব্যবহার করতে না পারার কারণে এরা আজ ফসিলে পরিণত হতে বসেছে। অন্ধ সংস্কারের জন্য, উপরিকাঠামোর বিলীয়মান আদিম ধরন ও খাদ্যসংগ্রহের উপর ভিত্তি করে তারা পুরনো জীবনকে আঁকড়ে থাকতে চাইছে। অবশ্য ভারতবর্ষে শুধুমাত্র এইসব অরণ্য অঞ্চলেই যে উপজাতি সমাজ টিকে আছে তা নয়। প্রতিটি অঞ্চলে, এমনকী উন্নত আধুনিক শহরগুলির পাশেই দেখা যাবে স্বল্পসংখ্যক কিছু উপজাতি মানুষ—পুলিশের নিয়ত সন্দেহ এবং মুদ্রা-অর্থনীতির বাতাসে শ্বাস

নেওয়া 'সভ্য' মানুষদের প্রবল চাপের মধ্যেও তাদের আদিম প্রথাগুলিকে যতদূর সম্ভব রক্ষা করে চলেছে। এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলির লক্ষ্যণীয় দিক, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক; যখনই তারা সম্পদের মালিক হয়ে সামাজিক উৎপাদনে অংশ নেয় তখনই এই দুই অবস্থারই উন্নতি ঘটে। উপজাতি-বহির্ভূত সাধারণ সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় কোন কিছু উৎপাদনে এদের অনীহার যে অভিযোগ—তা সুপ্ত অপরাধ-প্রবণতার অভিযোগের মতই স্থূল। *ভারত-ইতিহাসের সমগ্র পর্যায়েই দেখা যাবে উপজাতিক উপাদানগুলি একটা সাধারণ সমাজের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।* এর প্রমাণ, ভারতীয় সমাজ বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে দিক, জাতপ্রথা, তার মধ্যেই বর্তমান এবং তা প্রাচীন ভারতের এক প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনাও বটে। বিভিন্ন প্রক্রিয়া— যেগুলির সাহায্যে উপজাতিক উপাদানগুলি একটা সমাজে রূপান্তরিত হয়েছিল অথবা পূর্বতন কোন সমাজে মিশে গিয়েছিল—সেগুলিই যে কোন প্রকৃত ঐতিহাসিকের কাছে জাতিসত্ত্বাসম্বন্ধীয় প্রধান সূত্র।

এই ধরনের বিস্তারিত গবেষণার সুযোগ এখানে নেই এবং তা বিপুলায়তন গ্রন্থের বিষয়। তবু, এ বইয়ের উদ্দেশ্য—এক সমান্তরাল অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের কাজে পাঠককে স্বতঃচেষ্ট করা, কেননা লিখিত বিবরণ না থাকায় শিল্পায়ন অচিরেই এসব মুছে দেবে, আর তা উদ্ধারও করা যাবে না। তাই, পাঠকদের আমি সঙ্গে নিতে চাইছি একটি পরিভ্রমণে এবং তা বেশি দূরে নয়—পুনা শহরের প্রান্তে আমার বাড়ির কাছেই। এটি একটি ছোট্ট উপত্যকা অঞ্চল, সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে' কলেজ (যেখানে ইংরাজিতে ব্রিটিশ-পরবর্তী যুগের আইন পড়ানো হয়), ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (যেখানকার সংস্কৃত গ্রন্থমালা ও *মহাভারতের* সংস্করণ সংগ্রহের আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে), ফার্গুসন কলেজ, বোম্বের কোটিপতিদের বাগানবাড়ি, এবং একটি আধুনিক ভেড়া প্রজনন খামার—যেখানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেশী ও বিদেশী ভেড়ার সংকর সৃষ্টি করা হয় (স্থানীয় পশুপালক, কৃষক বা কসাইদের ঘরে জন্মানো বা তাদের কেনা পশুসম্পদের ওপর কোন প্রভাব ব্যতিরেকেই)। সীমিত এই ক্ষেত্রটুকুর নিবিড় বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া দৃষ্টান্তগুলি আমাদের প্রথম অধ্যায়ের পদ্ধতি-সংক্রান্ত বক্তব্যের ব্যাখা দেবে এবং একই সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতেও তার প্রচ্ছন্ন-প্রয়োগের মূল্যবান সূত্র যোগাবে। নির্বাচিত অঞ্চলটির সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের তফাৎ শুধু প্রাথমিক বৃত্তান্তের, সারবস্তুগত পার্থক্য কিছু নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে বাতিল হয়ে যাওয়া সমাজের সঙ্গে আধুনিক সমাজকাঠামোর আন্তঃক্রিয়া, ইতিহাসের বিকাশধারার ব্যাখ্যান এবং সেই ধারার বাইরে টিকে থাকা জনগোষ্ঠীগুলির অস্তিত্ব।

আমার বাড়ীর কাছেই তাঁবু বেঁধে থাকে রাস-ফাসে-পার্ধি (Rās Phāse Pārdhis) নামের এক যাযাবর গোষ্ঠী যাদের মূল পোশাক (পুরুষদের) একটা সাধারণ কটিবস্ত্র। এরা কখনও স্নান করে না কিন্তু এক স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা, ক্ষিপ্রতা এবং বন্য জন্তুদের চেয়ে উন্নত বোধ এদের মধ্যে আছে। বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত এদের ছটি কৌম বা গণ আছে, যাদের নামগুলি মারাঠা সামন্ত পরিবারগুলির পদবী হয়েছে—যথা, ভোঁসলে, পাওয়ার, চ্যবন, যাদব, সিন্ধে, কালে। শেষ পদবীটি আসলে চিৎপবন ব্রাহ্মণদের গোত্র নাম এবং শেষের আগেরটি দিয়ে একসময় 'কোন দাসীর পুত্র' (পিতৃপরিচয়হীন) এই অর্থটিই বোঝাত—অন্তত গোয়ালিয়রের সিংহাসনে বসে আভিজাত্যে উন্নীত হওয়ার আগে পর্যন্ত। ঐ সমস্ত নামগুলি যে মারাঠা আধিপত্যের কালে অর্জিত হয়েছিল তা এদের কথাবলা থেকে বোঝা যায়—যা আসলে একটি গুজরাটি কথ্যভাষা।

ভিক্ষাবৃত্তি ও ছোটোখাটো চুরি চামারির পাশাপাশি এই পারধিরা পাখি শিকারেও দক্ষ। আজও তারা এক দেবী মাতৃকার পূজো করে, যদিও প্রধান দেবীমূর্তিটি এখন ব্রাহ্মণদের অনুকরণে রূপোর পাতে খোদাই করা—এদের কেউ কেউ যেটিকে তুলজাপুরের দেবীমূর্তির সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই দেবী গোটা মহারাষ্ট্র জুড়েই পূজিতা হতেন, কিন্তু পারধিদের মধ্যে তাঁর অনুপ্রবেশ তুলনামূলকভাবে আধুনিক এবং তাদের লোকাচারগুলির সঙ্গে বেখাপ্পা। ইউরোপে ক্রো-ম্যাগনন-এর মতো উন্নত ধরনের মানুষের সহসা আবির্ভাব হয়ত এই ধরনের ফলপ্রসূ মিশ্রণের ফলেই হয়েছিল। উৎসব-অনুষ্ঠানে দেবীমূর্তির সামনে নাচের দায়িত্ব থাকে কৌমপতি বা দলের প্রধানের, কিন্তু তা করার জন্য তাকে মেয়েদের এমন এক ছাঁটের স্কার্ট ও ওড়না পরতে হয় যার প্রচলন দেশের এ অঞ্চলে নেই—বিশেষ করে, উপজাতি মহিলাদের মধ্যে তো নয়ই। সে ঘোষণা করে—'এখন আমিই দেবী', এবং এই জোরালো দাবিকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য (তার গানের সুরে সুর মেলানো দলের সমবেত অন্যদের সামনে) তাকে এক কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়—সাধারণত সেটা হল ফুটন্ত তেলের মধ্যে ডান হাতটি ডোবানো। তখন এমনই এক ভাবাবিষ্ট অবস্থা যে, পুরোহিত-প্রধানের কাছে গরম তেলের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না বা হাতও পোড়ে না। যদি পোড়ে, তা হলে প্রমাণ হয় যে দেবী পূজা বা পুরোহিতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্তবগান তিনদিন পর্যন্ত চলতে পারে এবং সেইসঙ্গে দেবীর প্রিয় খাদ্য ষাঁড় বা মহিষ শাবক বলি। স্পষ্টতই এ অনুষ্ঠান শিকারের সংখ্যা ও খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির কামনায়—যা পুরুষরা মেয়েদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল, যদিও গোষ্ঠীটি এখন চারপাশের সমাজের মতই পুরুষতান্ত্রিক। মাতৃতান্ত্রিকতার শিকড়ের অস্তিত্বের আর একটি প্রমাণ—চড়া কন্যাপণ,[১২] যার প্রচলন এখনও আছে। ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা পাত্রীর বাবাকে দিতে হয় এবং বাবা যত গরীব কন্যাপণের পরিমাণও তত বেশি। এঁটোকাটা ভিক্ষে করে খেয়ে, দিনমজুরী খেটে বা শিকার করা পশুপাখি ফলমূল বেচে পাত্রেরা টাকাটা জোগাড় করে, ভাড়া বা ট্যাক্স দেওয়ার বালাই কিছু নেই। এই নিরক্ষর উপজাতিরা আবার চড়া সুদে টাকাও খাটায়; সুদের হার বছরে ২৫ শতাংশ (বলা হয়, 'ষোলোর বদলে কুড়ি')। ধার শোধ না করলে ঝগড়া বেধে যায়। ১৯৫৪ সালে এই রকম এক ঝগড়ার পরিণতিতে দুটো খুন হয়েছিল। এমনকী তখনও তারা পুলিশের সামনে সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়নি। রীতি অনুযায়ী, গোটা কৌম অথবা কৌমের মধ্যের একটা দল তাদের নিজস্ব সভায় দলপতির উপস্থিতিতে বিষয়টার নিষ্পত্তি করতে বসেছিল। প্রমাণও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অভিযুক্ত তার অপরাধ অস্বীকার করায় তপ্ত লোহা বা ফুটন্ত তেল ছুঁয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে বলা হয়েছিল। সে তা না করায় তার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। মুন্ডাদের মধ্যে এই ধরনের রীতির প্রচলনের কথা আমরা জানি (রায়, পৃ. ৪২৫)। আবার, কোন মৃতদেহ এই উপজাতিদের কাছে অচ্ছুৎ। বিবাদ মীমাংসার জেরে যদি কারো মৃত্যু হয় তাহলে মৃতদেহ যে অবস্থায় আছে সেই অবস্তায় ফেলে রেখে গোটা দল তাঁবু গুটিয়ে দ্রুত অন্যত্র কেটে পড়ে। তাই সাংঘাতিক অপরাধ করা কোন লোককেও কেউ সরাসরি মেরে ফেলতে পারে না, বড়জোর হাত-পা কেটে নিয়ে জঙ্গলে ফেলে রাখে যাতে সেখানেই পড়ে পড়ে মারা যায়। যেহেতু পুলিশের ভয়ে এ ধরনের শাস্তিবিধান এখন শক্ত হয়ে উঠেছে, তাই দোষীরাও উপজাতি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। উপজাতিদের মধ্যে ভাঙন আসছে। তারা মনে করছে, ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথ (অর্থাৎ উপজাতি প্রথা) তারা অনুসরণ

করতে পারছে না বলেই তাদের দেবতাদের মাহাত্ম্যও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জাতিগত বিশুদ্ধতার কোন প্রশ্ন কোনকালেই ছিল না, কেননা বাইরের লোককেও নির্দিষ্ট দক্ষিণা নিয়ে কৌমের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হত। তবু, উপজাতি জীবনকে পরিত্যাগ করার আজকের যে প্রবণতা তার আসল কারণ—এটা এখন আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। শিকারের প্রাণী প্রায় বিলুপ্ত, অন্যদিকে শিকারের লাইসেন্স জোগাড় করাটাও এদের সাধ্যের বাইরে। কোন নির্দিষ্ট কাজে লেগে থাকা যদিও এদের স্বভাবে নেই, কিন্তু বিকল্প হচ্ছে অনাহার—কেননা, ভিক্ষের আয়ও দিন দিন অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। অবশিষ্টদেরও নিশ্চিতই খুব তাড়াতাড়ি অন্য কাজ খুঁজে নিতে হবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শ্রবণক্ষমতা—যেটা পাখি শিকার বা রাতে পড়শীদের পোলট্রিতে ছিঁচকে চুরির কাজে লাগায়—তা দিয়ে এরা খুব ভাল পাহারাদার হতে পারে। অবশ্য পারধিরা খরগোশের চেয়ে বড় কোন প্রাণী শিকার করে না, কেননা তাদের তেমন কোন অস্ত্র নেই। একটা সাধারণ ছুরি ব্যবহার করে, অনেকটা মুচিদের ধরনের এবং তা দিয়েই হালকা কাঠের ফ্রেমে ভাঁজ করা যায় এমন একধরনের সুন্দর ফাঁদ তৈরি করে—তবু, অন্য কোন অস্ত্র বা সরঞ্জাম ব্যবহারে আগ্রহবোধ করে না। তীর ছোঁড়া, ঝুড়ি বোনা, মাটির পাত্র তৈরি, চামড়ার কাজ বা চাষের কাজ—কোনকিছুই এরা শেখে না। যদিও তাঁবুগুলি আগে তৈরি করত জোয়ারের ডাঁটা (বা খড়) দিয়ে, এখন তৈরি করে ক্যানভাসে—যা কিনতে হয়। এদের গরুগুলির চেহারা হাড় জিরজিরে, পরের ক্ষেতে ঢুকে ঘাস, খড় খায়, চাষের কাজে চলে না, দুধ যা দেয় তাতে বড়জোর বাছুরগুলো বাঁচে; সেগুলিকে এরা ভার বইবার বা পাখি তাড়িয়ে ফাঁদে ফেলার কাজে ব্যবহার করে। অর্থাৎ, মানুষগুলি তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে অনেক কিছুই আত্মস্থ করেছে—কেবলমাত্র জমির মালিকানা বা উৎপাদনের অত্যাবশ্যক উপকরণগুলি ছাড়া এবং 'মানুষ নিজেই নিজেকে তৈরি করে' আমাদের এই প্রতিপাদ্যেরই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। সম্প্রতিকালে এদের পুনর্বাসনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা সফল হলে এরা সর্বহারা শ্রেণীর অঙ্গীভূত হবে। অর্থাৎ সমাজের দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকা একটা ক্ষুদ্র অংশ থেকে যাদের দাক্ষিণ্যে সমাজ বেঁচে থাকে সেই বৃহত্তম অংশে মিশে যাবার এক সন্ধিক্ষণে এরা এখন দাঁড়িয়ে।

একই জায়গায় পাশাপাশি বাস করা তিন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে অজস্র অমিল। এদের মধ্যে রামোসিস—যারা সাকুল্যে ২০ ঘর আছে—তাদের ১৮৩০ *নাগাদ* ইনামী জমিতে এনে বসানো হয়। সে সময় তারা ছিল বন্য উপজাতি দস্যু; এখনও এরা একটা স্বতন্ত্র জাত হিসেবেই রয়ে গেছে ; কিন্তু চেহারা, ভাষা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সাধারণ মারাঠা চাষীদের থেকে এদের আলাদা করা যায় না। জমিতে হাল করা, মই দেওয়া বা গাইগরু পোষা-ই এদের জীবিকা। এদের অদূরেই একদল ভইদু-র গ্রাম। আদিতে এরা ছিল উপজাতি ব্যাধ—এখনও মদ্যপান ও শিকারে আসক্ত; সাদাসিধে লোকজনের কাছে মাদুলি, ভেষজ বা জড়িবুটি বিক্রি করে সম্পন্ন ওষুধ বিক্রেতা গোষ্ঠীর মতো এরাও এখন দু-পয়সা করেছে ; তার ওপর জ্যান্ত কেউটে ধরে মেলায় খেলা দেখানোর বাড়তি আয়ও আছে। শক্ত সমর্থ, উদ্ধত ও দাঙ্গাবাজ হওয়া সত্ত্বেও কখনও কিছু চুরি করে না—এই সুখ্যাতিটার জন্যে এরা বেশ গর্ববোধ করে; কাঁচা হাতে তৈরি এবং অস্বাস্থ্যকর হলেও নিজস্ব শক্তপোক্ত বাড়িগুলোর জন্যেও বেশ একটা অহংকার আছে। এদের আদিভাষা হল তেলেগুরই একটা কথ্যরূপ এবং এখনও নিজেদের মধ্যে সেই ভাষাতেই কথা বলে। এদের নিজস্ব দেবী আছেন; এবং একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল কবর দেওয়ার পদ্ধতি—ভারতীয় ধরনে

পা দুটো ভাঁজ করে আসনে বসে থাকার ভঙ্গিতে। কবরের গর্তের মধ্যে মৃতদেহের মাথার কাছে খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়—স্পষ্টতই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনে। বছরে একবার কবরের ওপরে ঢিবিতে খাবার রেখে আসা হয়। কবরের ধরনের সঙ্গেও দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ প্রস্তরযুগের সমাধি স্তম্ভ ও শবাধারগুলির মিল আছে।* ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে বোম্বাই ধাঁচের কোন প্রধান বা গিল্ড এদের নেই কিন্তু গিল্ডেরই মতো দৃঢ়বদ্ধ একটা বর্ণ-গোষ্ঠী আছে। গিল্ডের মতো আরও একটি প্রতিবেশী তেলেগুভাষী উপজাতি-গোষ্ঠী হল ভাদ্দার—যারা বর্তমানে রাজমিস্ত্রী ও নির্মাণকাজের জন্য পাথর কাটার কাজ করে। পারধি বা ভইদু-দের মতো এদের মেয়েরাও (রামোসিস-রা অন্যরকম) এখনও সাধারণ এক খণ্ড আদিবাসী পোশাক পরে; প্রতিদিন ঝোপঝাড়, কাঁটাজঙ্গল, ডালপালা এসব সংগ্রহ করে—আগে বনে থাকতে যেমনটা করত। পুরুষরা নিম্ন মধ্যবিত্তের সাধারণ পোশাক পরে (টুপি, শার্ট ও ধুতি) এবং স্বতন্ত্রভাবে পাথর কাটার ঠিকা নেয়। আয় ভাল হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞতার কারণে স্বাস্থ্যসম্মত বা উন্নত জীবনযাপন এরা করে না। ঠিক আগের প্রজন্মে এদের প্রধান ছিল এক শ্রমিক সর্দার—যার মাধ্যমে সমস্ত ঠিকাদারী বা টাকা পয়সা বিলি হত (যেমন বোম্বাই শহরের গরীব ভাদ্দার শ্রমিক দলগুলির মধ্যে হয়)। সে তার নিজের বিবেচনা মতো প্রত্যেক পরিবারের যার যেমন প্রয়োজন সেই অনুযায়ী টাকাপয়সা দিত। এই টাকা থেকেই নিজের নামেও জমিজমা করে নেয়। ফলে বিরোধ বাধে। শেষ পর্যন্ত সেই প্রধান সর্দারের আত্মসাৎ করা সম্পদ—যা বুর্জোয়াসুলভ একান্ত নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করতে চাওয়া হয়েছিল তা উদ্ধার করে একটি সমবায়ভিত্তিক আবাসন

* এই মিল আরও বেশি চোখে পড়ে, মৃতদেহের কপালে (বা কখনো কখনো গোঁড়া ভইদু-দের ক্ষেত্রে মৃতদেহের কাঁধে) চুন ও সিঁদুরের প্রলেপ দেওয়ার প্রথা থেকে। বৃহৎ প্রস্তরযুগে শবাধার বা কবরের গর্তের গোলাকৃতি মুখ এঁটে দেওয়ার জন্য চুনের ব্যবহার করা হত। হাতের কাছে মাহার-দের হাল আমলের রীতিতেও দেখা যায় যে তারা কবরের ওপর চুন ছড়িয়ে দেয়। মং-গারুদি বা মাহার-রা সমাধিস্তূপের ওপরে মাঝখানে যে প্রস্তরফলক রাখে তাতে লাল রঙ বা চুনের প্রলেপ দিয়ে দেয় এবং সে প্রলেপ বিবর্ণ হলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নতুন করে লাগান হয়। অনেক উচ্চবর্ণের মধ্যেও, মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় তার ওপর লাল রঙ (গুলাল, কুমকুম ইত্যাদি) ছিটোনোর রীতি আছে, কিন্তু সরাসরি চুনের ব্যবহার দেখা যায় না। কয়েকটি নিম্নবর্ণের, কেবলমাত্র শিশুদের ক্ষেত্রে (যদিও সবসময় নয়) মৃতদেহ কবরের আগে পাত্রের মধ্যে রাখা হয় এবং অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটা সত্ত্বেও গোটা ভারত জুড়ে অন্ত্যেষ্টির সময় (কখনও কখনও বিবাহ অনুষ্ঠানেও) ক্রিয়াকর্ম সমাধান বা তাতে সাহায্য করার জন্য কুম্ভকারদের উপস্থিত থাকাটা এত বহুল প্রচলিত যে মনে হয় এর সঙ্গে শবাধারে সমাধিস্থ করার প্রাচীন প্রথার একটা সম্পর্ক আছে। অন্যদিকে, কবর দেওয়াটা দাহ করার চেয়ে কম খরচে হয়; ফলে, দারিদ্র্যের কারণে দাহপ্রথা অনুসারী জাতগুলির কেউ কেউ বসন্ত, কুষ্ঠ বা কোন মহামারীতে মৃতদেহগুলিকে কবর দেওয়া বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার দিকে ঝুঁকে থাকতে পারে—যেমন, কবরপ্রথা অনুসারী জাতের কোন কোন সম্পন্ন মানুষ দাহপ্রথার দিকে ঝুঁকে যায়। মাহারদের মধ্যে সাধারণভাবে অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে কবর দেওয়ার প্রচলন থাকলেও এদের কয়েকটি উপবর্ণের মধ্যে বসিয়ে কবর দেওয়ার রীতিও আছে। চুনের ব্যবহার সম্ভবত একধরনের পরিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ারই ইঙ্গিতবাহী। ভোড় অঞ্চলে পাথরের বেতাল বা কখনও কখনও হনুমান মূর্তিতে সিঁদুরের সঙ্গে চুনেরও প্রলেপ দেওয়া হয়। বেতালদের, অধিকাংশক্ষেত্রে, অল্প লাল রঙ বা কিছু না মিশিয়েই চুনকাম করে দেওয়া হয়। সাদা চুন জীবানুনাশের ঘরোয়া উপকরণ এবং মৃত মানুষের প্রেতাত্মা যাতে পরিবারের অন্যদের মেরে না ফেলে তাই ঘরের প্রবেশপথে লাগিয়ে রাখা হয়।

উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নির্মাণকাজে যুক্ত ভাদ্দার পরিবারগুলির নিজস্ব মোটা আয় তাদের গিল্ড চরিত্রটিকেও পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে— কেবলমাত্র গোত্র মিলিয়ে বিবাহের ক্ষেত্রে ছাড়া। (খাদ্যের পেছনে পয়সা খরচ না করা পারধিরা কিন্তু এমনটা নয়।) এখন এরা যেন শুধুই একটা বর্ণ-গোষ্ঠী। ভাদ্দার-দের একটা শাখার কাজ মাটি কাটা। এদের পূর্বপুরুষরা সারা দেশে ঘুরে বেড়াত এবং যুক্তপ্রদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এরা পুকুর কেটেছে। কাজের অভাবে এই স্বাতন্ত্র্য অবশ্য এখন বিলীন; পরিবর্তে মদের চোরাচালান, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি ঘৃণ্য পেশার মধ্য দিয়ে টিকে আছে। ভাঙাচোরা জঘন্য ঝুপড়িতে এদের জীবনযাত্রা প্রায় পারধিদের মতোই। উপজাতি-বৈশিষ্ট্যের যা কিছু প্রকাশ তা শুধু কৌতুহলী বহিরাগতদের প্রতি ব্যক্ত মনোভাবে, বিশেষ করে, পুলিশ বা কোন জমি মালিকের প্রতি—যার জমিতে অনুমতি না নিয়েই এরা দলবদ্ধভাবে বাস করে। মিউনিসিপ্যালিটির ভোটার হওয়ায় এবং রাজনৈতিক ছলাকলায় সমীহ করার মতো আয়তনের একটা ভোট-ব্লক হাতে থাকায় একধরনের নিরাপত্তাও এরা পায়। পুনা শহরের আশেপাশের আধা-ভ্রাম্যমান অন্য ভাদ্দার গোষ্ঠীগুলি উপজাতি-সত্ত্বা থেকে সরাসরি শিল্পশ্রমিকে রূপান্তরের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এখন অপেক্ষাকৃত ভাল মজুর; এদের বাসস্থানগুলি এখন বস্তি চরিত্রে নেমে এসেছে—যা পুনা মিউনিসিপ্যালিটির কাছে এক শিরঃপীড়ার কারণ। সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে বেকারীত্ব, বাহুল্যবোধে নিকাশী ও জল সরবরাহের জন্য পুরকর দিতে ভইদু বা নির্মাণকাজে যুক্ত ভাদ্দারদের অনীহা, এবং পারধিদের একই সারিতে কেবলমাত্র পুবমুখো ঝুপড়ি বানিয়ে বাস করার সংস্কারগত বিধানের জন্য। ঝুপড়ি উচ্ছেদের পরিকল্পনার সময় রামোসিসদের ইনাম জমির স্বত্ব দিয়ে দেওয়া হয়—কিন্তু তা জীবিকানির্বাহের অন্য উপায়গুলির সন্ধান ছাড়াই। ফলে তাদের অবস্থাও মূলগতভাবে খুব একটা ভাল নয়। পুনা হল সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সদর দপ্তর। সেখানে আধুনিক বোমারু বিমান মহড়ার অবিরত গর্জনের নীচে বাসহীন চাষহীন কোন খণ্ডজমির আবার মালিক থাকে কী করে—আদিম বোধশক্তির এই অক্ষমতার মুখোমুখি হলে হয়ত কোন পরিদর্শক অপ্রতিভ হয়ে পড়বেন; অথবা, যদি দেখেন তাঁর সংগৃহীত ছবির সেই 'সপ্তমাতা'-র স্থুলশৈলী ভাদ্দার দেবকুটিরটি ধ্বংস হয়ে গেছে সামনের রাস্তা দিয়ে গুড়গুড় শব্দে চলে যাওয়া কোন ভারী সাঁজোয়ার ওড়ানো ধুলোর মধ্যে!

এ সব বিষয়গুলিই সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে আকর্ষণীয়। আমাদের কাছে সেগুলির গুরুত্ব এই কারণে যে এ দিয়ে আমরা উপজাতি থেকে গিল্ড বা সঙ্ঘ ও বর্ণ—রূপান্তরের এই গতিপথকে ব্যাখ্যা করতে পারব, সারা ভারতেরই ঐতিহাসিক বিকাশের যা মূল বৈশিষ্ট্য। বিশেষ দিনে, কাটকারি উপজাতিদের মধ্যে হেঁয়ালির উত্তর দেওয়ার দলগত প্রতিযোগিতার রেওয়াজ এখনও আছে। এককালে, এতে হারলে প্রচুর ক্ষতি ও ত্যাগস্বীকার করতে হত। *মহাভারত-জাতক* কাহিনীর যক্ষ প্রশ্নমালা থেকে জানা যায় যে হেঁয়ালীর অর্থোদ্ধার করতে না পারার অর্থ ছিল মৃত্যু (অনেকটা স্ফিংক্স-এর মতো)। মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদের পদবী থেকে বোঝা যায় যে জনগোষ্ঠীগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণ বা উপবর্ণে মিশে যাবার পরেও তাদের কৌম-টোটেম দেবতারা বেঁচে থাকে। টোটেম সম্বন্ধীয় পালনবিধিগুলি হয়ে যায় পারিবারিক ব্রত এবং কৌমের নাম থেকে আসে পদবী। যেমন, পদ্বল পদবীর অনেক কৃষকই চিচিঙ্গে খায় না—যেহেতু তা তাদের পদবীর সমার্থক; মোরে-দের কাছে ময়ূরের মাংস ভক্ষণ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ এবং সেলার-দের কাছে ছাগল বা কাতুরেদের কাছে কাতুরা পাখি; গোড়াম্বে-রা আমগাছের ডাল পোড়ায় না ও প্রত্যেক প্রতিপদে আম্রপল্লব পূজা তাদের

অবশ্য পালনীয়—ইত্যাদি ইত্যাদি। আত্তীভবনের অনুপুঙ্খগুলি, অবশ্যই উপজাতিক এককগুলি যে সমাজের অঙ্গীভূত হয় তার সমকালীন উৎপাদন-কাঠামোর তারতম্য অনুযায়ী পৃথক হয়। চা বাগান, কলকারখানা বা নিয়মিত বেতনের চাকরি—এ সবই আধুনিক বিকাশ; আগে, ধরা যাক, ৪০০ খ্রী. পূর্বাব্দে উপজাতি মানুষদের মিলিয়ে নেওয়ার জন্য প্রচার মাধ্যমের মতো এ সবেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। নব-আত্তীভূত মানুষরা সাধারণত একধরনের সাজাত্য বজায় রাখত এক একটা উৎপাদক-একক গঠন করে—যা ফুটে উঠত নতুন নতুন বর্ণগোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে। শুরুতেও কারণগুলি ছিল একই ঃ খাদ্যসংগ্রহের চেয়ে খাদ্য-উৎপাদন অনেক বেশি কার্যকরী; শিকার বা প্রকৃতির পরিত্যক্ত খাদ্য খেয়ে বেঁচে থেকে পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই-এর যে অসহায়তা তা স্থায়ী কৃষিজীবনের চেয়ে অনেক প্রবল। পারধিদের যখন (জুন, ১৯৫৫-তে) ব্যবহারের জন্য সরকারী জমি থেকে পরিবার পিছু ২৫০০ বর্গফুট করে জমি দেওয়া হয় তখন তারা দেরি না করে সেই টুকরো টুকরো জমিতে সবজি চাষ শুরু করে দেয় এবং সেটাই ছিল প্রথম। এক ক্ষিপ্ত প্রতিবেশী যখন দাবি জানাল যে জমিগুলি তার, তখন তারা খাজনা হিসেবে তাকে টাকাপয়সাও দিতে থাকে—যতক্ষণ না সরকারী ওপরমহলের হস্তক্ষেপ ঘটে। স্থায়ী কর্মসংস্থানের ফলে এখন তারা এক নতুন মানুষ, সমাজের অংশীদার হয়ে গড়ে ওঠার পথে। আশা করা যায়, পরিবর্তনের এই পথ বেয়ে একদিন তারা সাবানও ব্যবহার করতে শিখবে!

থিতু হয়ে বসায় চারবছরে এদের মধ্যে রোগের প্রকোপ বেড়েছে এবং গায়ের একটা বিকট গন্ধ। সকলের সারাবছরের কর্মসংস্থানও হয়নি। উপজাতি ঐক্যটা ভেঙে গেছে এবং যে উন্নত সমাজে তারা মিশে গেছে তাদের প্রতি সে সমাজের বা সে সমাজের প্রতি তাদের কোন অতিরিক্ত শ্রদ্ধাও নেই। শিকারের কৌশলগুলি এখন বিস্মৃত, ফাঁদ বা চিল-মারা কাঠিগুলি ইঁদুরে কাটছে; ভিক্ষে আর চুরিটা চালু আছে। ডেহু-র সামরিক গুদামে এদের বেশ কিছু লোক কাজ করে এবং হাতের কাজে সূক্ষ্মতা থাকায় বিনা দুর্ঘটনাতেই উচ্চ-বিস্ফোরক মেশানো ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চালিয়ে যায় বা উখো-র মত হালকা যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করে দক্ষতার সঙ্গে। কিন্তু এদের প্রকৃত আদিম ধরনটা প্রকাশ পায় বেতনের দিনে—বেপরোয়া খাওয়াদাওয়া, সেকেন্ড-হ্যান্ড জমকালো পোষাক, গয়না—এইসব আজেবাজে জিনিস কেনার মধ্য দিয়ে। সঞ্চয় বলে কিছু করে না।

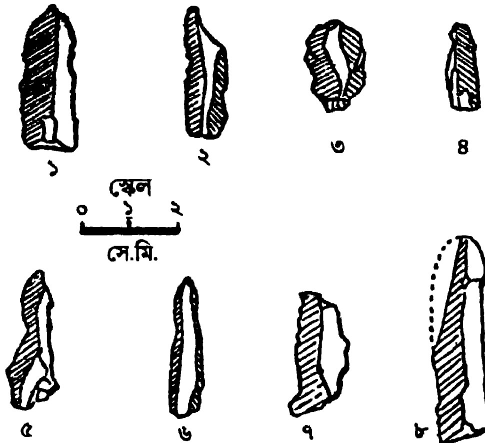
২.৪ এই সমস্ত মানুষদের আরাধ্য দেবতাদেরও নিজস্ব সব কাহিনী আছে—দৃষ্টান্ত হিসেবে, যা আমরা এই ভুখণ্ডের নিরিখেই আর একবার খতিয়ে দেখতে পারি। পুনার প্রাচীনতম যে মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে তা ত্রয়োদশ শতাব্দীর যাদব গঠনশৈলীর (পুরনো দাগদি-পুল বাঁধের শেষ প্রান্তে)। চত্বরের বাড়তি অংশে এই মন্দিরের পাথর দিয়েই গড়া হয়েছে সেখ সল্লা-র দরগা। পাথরের কিছু সমাধি সৌধ এবং প্রাঙ্গণে বেদির মতো কাঠের থামও নজরে পড়ে। মূল মন্দিরটি নিশ্চিতভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আলাউদ্দিন খলজির সৈন্যদের হাতে ধ্বংস হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ দপ্তরের পেছনে 'পাতালেশ্বর'-এ আছে নবম শতাব্দীতে গঠিত শিবের একটি অসম্পূর্ণ গুহামন্দির, যেখানে শিবলিঙ্গটি বসানো হয়েছে মাত্র এক প্রজন্ম আগে। যুদ্ধের সময়ে টাকা করা এক কালোবাজারীর বদান্যতায় ১৯৪৬ নাগাদ এর মেঝেরও কিছু অংশের সংস্কার করা হয়েছে (যদিও গুহাটি একটি 'সংরক্ষিত নিদর্শন')। জনশ্রুতি, পেশোয়া রাজত্বের শেষদিকে নানা ফড়নবিশ শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই গুহাগুলির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গুহানির্মাণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ পাথর কাটা হয়েছিল

পাশে জমা হয়ে তা থেকে এক ঢিবির জন্ম হয় এবং কালক্রমে ধূলোতে ঢাকা পড়ে তার ওপর গাছপালা জন্মায়। এই কৃত্রিম ঢিবি-র ওপর এখন এক জমজমাট মন্দির—যা তৈরি হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর এক সাধুর স্মৃতিতে। 'জংলী মহারাজ' নামের অধুনা পূজ্য এই সাধু এখানে বাস করতেন এবং এখানেই দেহ রাখেন। ফার্গুসন কলেজের পিছনে, কলেজেরই জমির ওপর, আরও পাঁচটি গুহা আছে। এগুলি মূলত বৌদ্ধ গুম্ফা ধাঁচের (অনেকটা ৪০ মাইল দূরের কার্লে ও ভাজা বা মাঝের সেলারওয়াদির তুকারাম গুহাগুলির মতো)—গত শতাব্দীর শেষদিকে যেখানে কিছু পরিচিত দেবদেবীর মূর্তি বসিয়ে মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ১৯৩০ পর্যন্ত এগুলি ছিল ভবঘুরে আর চোর-জোচ্চোরদের আশ্রয়স্থল। উপত্যকা-মুখের উল্টোদিকে কেতুশৃঙ্গি মন্দিরের কাছেও কয়েকটি ভাঙাচোরা গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে। যদিও প্রত্নতত্ত্বে আগ্রহী এক পর্যটকই প্রথম এসব নজরে আনেন, কিন্তু এর কোনটিই প্রকৃত কোন তথ্য জোগায় না। আমাদের অবশ্যই ফিরে তাকাতে হবে সরলতর ধর্মবিশ্বাসগুলির দিকে।

আমার বাড়ি থেকে একশ গজের মতো দূরে নতুন বাড়ি তৈরির একটা প্লট জমি আছে; তারই এক কোণে, পাথর আর ইঁট-চুন দিয়ে গাঁথা একটা লাল রঙের স্তূপ—মাঝে মধ্যে অচেনা ভক্তরা এসে যাকে নতুন করে রাঙিয়ে তাদের ভক্তি জানিয়ে যায়। ইনিই হলেন বেতাল—যাঁর কথা লোকে এখন প্রায় ভুলে গেছে। ১৯৩৯ পর্যন্ত এ সবই ছিল চোখে পড়ার মতো বিশাল ও প্রাচীন এক বোর (*Zizyphus jujuba*) গাছের ছত্রছায়ার নীচে—যাকে উদ্দেশ্য করে বিশেষ বিশেষ দিনে ছাগল অথবা মুরগি বলি দেওয়া হত। গাছটি এখন আর নেই; নবনির্মিত বাড়ির মালিকও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে থানটিকে যথোচিত শ্রদ্ধায় ফুট কয়েক সরিয়ে দিয়েছে। উপত্যকার পিছন দিকে ভইদু-দের পাড়ায় গেলে দেখা যাবে একই ধরনের রক্তবর্ণ-রঞ্জিত প্রস্তরপুঞ্জ এবং এবড়োখেবড়ো পাথরে তৈরি এক বাতিঘর; তার ঠিক মাঝখানের পাথরটি হলেন 'লাডুবাঈ' এবং তিনি 'সঙ্গিনী' অন্য পাথরগুলির মতোই বেখাপ্পা। এক বৃদ্ধ এঁর পূজা করেন—যাঁর প্রপিতামহ দাক্ষিণাত্যের পূর্বাংশ, যেখানে এঁর পূজা বহুল প্রচলিত, সেখান থেকে এঁকে নিয়ে এসেছিলেন। এটি এবং আমার বাড়ির মধ্যবর্তী অংশে আরও সব থান আছে—যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, রামোসি পাড়ার কাছাকাছি বেতাল উপদেবতার চালাবিহীন বেদিটি। পবিত্র এই পাথরটি অনেকটা শিবলিঙ্গের মতো; আরও সাদৃশ্য হল, এর সামনে পাথরের একটি ছোট্ট ষাঁড় (নন্দী)-এর উপস্থিতি। সাধারণ শিবলিঙ্গের সঙ্গে তফাৎটা শুধু এই যে ষাঁড় এবং বেতাল উভয়েই পুরোপুরি লাল রঙে রাঙানো। জায়গাটিতে সামন্তযুগের একটি ছোট মন্দিরও ছিল—সম্ভবত যুদ্ধে নিহত কোন পেশোয়ার স্মৃতিতে তৈরি। মন্দিরটি নিশ্চিতই বেতাল-ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল, কিন্তু তা বিলুপ্ত হতে দেওয়া হয়েছে। এর ধ্বংসাবশেষগুলির একটি ছোট গাদার এক ধারে দুটি পাথরে খোদাই বহুহস্ত বিশিষ্ট অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ছোট দেব ও দেবী মূর্তি পাওয়া গেছে—যেগুলিতেও ঈষৎ লাল ছোপ আছে। এবং অপেক্ষাকৃত বড় এক হনুমান মূর্তি—ঢাল-তলোয়ার সমেত, যা থেকে বোঝা যায় যে এটা কোন মৃত-যোদ্ধার স্মৃতি। এদের পূজ্য অন্য নিজস্ব হনুমান মূর্তিগুলির মুখের রঙ এর চেয়ে অনেক বেশি টকটকে লাল। সেই কারণেই ফার্গুসন কলেজ পাহাড়ের রূপান্তরিত গুহামঠটির মূল প্রবেশপথের বাঁদিকে এক নতুন হনুমান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—যা পুরনো হালকা রিলিফকেই কেটে গভীর করা এবং তা-ও এই ১৯৪৩ সালে।

এই বেতাল মূর্তিটির সামনে অমাবস্যায়, কখনও কখনও পূর্ণিমাতেও পশুবলি (মুরগি অথবা ছাগল) দেওয়া হয়। যদিও বলি দেওয়ার পর সেটি রান্না করে ভক্তরা (অধিকাংশই পুনা শহরের

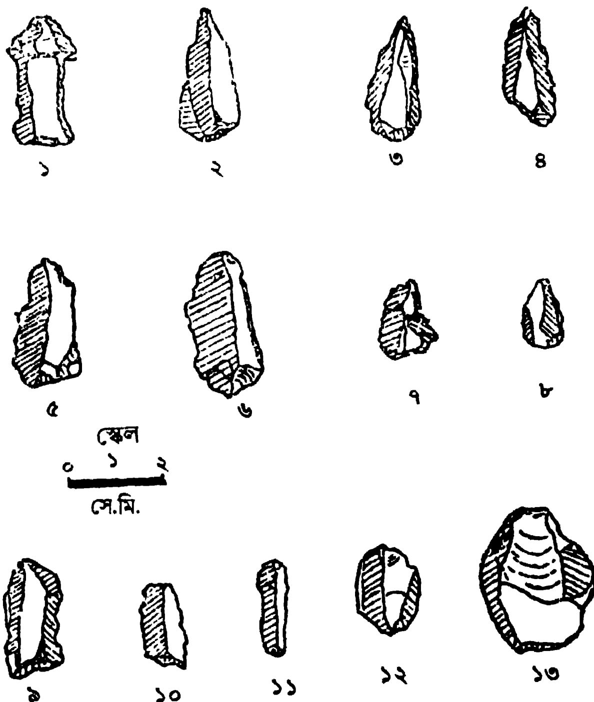
কুস্তিগীর, যারা ভবিষ্যৎ লড়াই-এ জেতার আশায় বা আগের লড়াই-এ জেতার জন্য এইভাবে মানত করে) মূর্তির সামনেই খেয়ে নেয়, তবু হতে পারে যে তাজা রক্তের অল্প একটু ছোপ তারা বেতাল পাথরটিতে লাগিয়ে দেয়। পিছনের পাহাড়ের মাথার 'বড় ভাই' বেতাল-এর হয়ে 'ছোট-ভাই' বেতাল বলি গ্রহণ করেন বলে বলা হয়। বড় বেতালের অধিষ্ঠান হল এলাকার পাঁচটি গ্রামের সংযোগস্থলের পর্বত অধিত্যকার একটি শৃঙ্গের ঠিক মাথায় (জাতীয় রসায়নাগারের পেছনে, ২৩৬৫ ফুট উচ্চতায়)ঃ ৩৮×২২ ফুট খোলা থান, তিনদিকে তিনফুট উঁচু পাথর বসানো দেওয়াল, মাথায় করোগেট টিন। টিন লাগানো হয়েছে এই সেদিন—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে। অবসরপ্রাপ্ত এক সৈনিক কৃতজ্ঞতার বশে ওটি লাগান। কিন্তু তিনি ছিলেন অদূরদর্শী—অন্তত গর্বমিশ্রিত দুঃখের সঙ্গে গ্রামবাসীরা যেটা বলে যে, এর ফলেই তিনি নির্বংশ হয়ে যান—কেননা প্রকৃত বেতালের মাথার ওপর থাকে শুধু খোলা আকাশ! মূল উপদেবতার চারপাশে ছড়িয়ে আছে অল্পবিস্তর লালের ছোঁয়া লাগানো প্রায় ৫০টির মতো পাথর—তাঁর সৈন্যদল। থানের ভেতরেও কয়েকটি আছে। কয়েকটিতে আবার লালের উপর চুনের ছোপও লাগানো আছে। চালের কড়িকাঠ থেকে একসময় অনেকগুলি ঘণ্টা ঝুলত—সেগুলি বাজিয়ে ভক্তরা তাদের আগমনবার্তা জানাত। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধাতুর আকালের সময়, একটিমাত্র ছাড়া সবকটিই চুরি করে বিক্রি করে দেওয়া হয়। উপত্যকার 'ছোট ভাই'-এর সুন্দর ঘণ্টাটির গতিও তাই হয়েছে। একসময়, খুব স্বল্পকালের জন্য, মনুষ্যাকৃতির এক বিকট মাটির মূর্তি বড় বেতালকে আড়াল করে বসানো হয়েছিল (যেমনটা শহরের বেতাল মন্দিরে করা হয়েছে), কিন্তু ক্রুদ্ধ ভক্তেরা সেটি ভেঙে দেয়। ৫০ সে.মি. উচ্চতার চেটালো এবং ওপরের দিক কিঞ্চিত সরু—প্রায় শিবলিঙ্গাকৃতির নিরাভরণ আদি পাথরটি ৫½ বর্গফুট বেদিস্তম্ভে কিছুটা প্রাকৃতিক এবং কিছুটা চেষ্টাকৃত ভাবে বসানো। অবয়বহীন মূর্তিটির দুটি চোখও আছে, অবশ্য তা পাথরে কাটা নয়— লাল রঙে আঁকা এবং ক্রমশ প্রলেপ পড়তে পড়তে এখন প্রায় ৩০ মি.মি. এর মতো পুরু। এখানেও মাঝেমধ্যে বলি দেওয়া হয় এবং দেয় তারাই যাদের কাছে মাইলের পর মাইল ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খাড়াই পাহাড় ভেঙে ওঠা কষ্টকর নয়। মনে হয়, জায়গাটার একটা আশ্চর্য মাহাত্ম্য আছে, যে কারণে, চৈত্র-পূর্ণিমায় বেতালের জন্মদিনে (শুধু এই বেতালের নয়, সব বেতালেরই ওটা জন্মদিন) দূর-দূরান্ত থেকে বহুলোক আসে এখানে পূজো দিতে—এবং শুধু গেঁয়ো লোকজনই নয়, নিরেট শহুরে মধ্যবিত্তরাও; এমনকী এক



চিত্র ১: পুনার আশপাশে উঠে থাকা ক্ষুদে বালি পাথরের হাতিয়ার; ৩ ও ৫ কারনেলিয়ান, ৪ অ্যাগেট, বাকি স্ফটিক।

মোটাসোটা ইংরেজি বলিয়ে অফ্‌সরকেও ঠাকুরকে স্নান করিয়ে, তেল-সিঁদুর মাখিয়ে পূজাকৃত্যগুলি করার জন্য তামার কলসিতে গ্যালন চারেক জল আর ফুল নিয়ে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে পাহাড় ভাঙতে দেখা যায়।

নিশ্চিতভাবেই, এই বেতাল ল কলেজের কাছের মধ্যবিত্ত হনুমান মন্দিরটির চেয়ে বয়সে প্রাচীন। লুপ্তপ্রায় এক মেয়েলি বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৩৪ নাগাদ—বিশেষভাবে বসানো একটি বট (*Vada*)* গাছের নীচে; এবং একটা ঢিবি (*Mang Ceda*)-ও আছে—যাতে আছে চুন মাখানো প্রায় ডজন-দুয়েক পাথর, মন্ত্রোচ্চারণের সময় যেগুলি ওল্টানোর



চিত্র ২ : পুনা থেকে পাওয়া ছোট নদীবালুকা-প্রস্তরের হাতিয়ার; ৫ ও ৭ কারনেলিয়ান, বাকি স্ফটিক; ১ নংটিতে অভিনব ভাবে তীরের ফলা বা ছেনি করা আছে; দু'মাথায় পরিকল্পনা করে ভাঙা পাথর দুর্লভ।

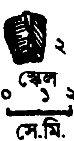
সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর নাম যদি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। এ সব কিছু একই পাহাড়ের ওপর পাশাপাশি। যখন জানলাম যে জ্ঞাতিদ্বন্দ্বের পরিণতিতে ১৯২৫ থেকে অন্তত দুটি খুন এই জায়গায় ঘটেছে এবং অভিযুক্তদের দূর থেকে ধরে এনে সম্ভবত দেবতার সামনে খুন করে মৃতদেহ চত্বরে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল, তখন মনে হল, জায়গাটির সঙ্গে নেহাত এই দৈব-চৌহদ্দির বাইরের আরও বৃহত্তর কিছুর সম্পর্ক আছে। পাহাড়ের মাথার দিকে তাকাতে এক বিস্ময়কর জিনিস চোখে পড়ল—শেষ প্রস্তরযুগের অজস্র ছোট ছোট পাথরের হাতিয়ার (চিত্র ১-৩) বেতাল-থানের

* Vada = Ficus Bengalensis = বট।

চারপাশে শৃঙ্গের ওপর ছড়ানো! টুকরো পাথরগুলিকে ঘষে ঘষে পাতলা করে প্রিজম্-এর মতো এমনভাবে বসানো হয়েছে যাতে সেগুলির গোড়ার দিকে সবকটিতেই একটা মুখ এবং ডগায় দুটি বা তারও বেশি। বড় অস্ত্র বানানোর উপযোগী বড় পাথর পাওয়া যেত না, কিন্তু এই ছোট টুকরোগুলিই কাঁচের ফালির মত ধারালো। এগুলি বানানোয়, আপাতদৃষ্টিতে যা চোখে পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্মতাবোধ এবং চোখ ও হাতের সমন্বিত নৈপুণ্যের প্রয়োজন ছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, স্ফটিক ও অ্যাগেট পাথরের (দাক্ষিণাত্যের পাহাড় অঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণ আগ্নেয়শিলার খাঁজে খাঁজে যা প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়) তৈরি এই ধরনের প্রচুর হাতিয়ার বেতালের ৫০ মিটার ব্যাসার্ধের বাইরেও অন্তত দশগুণ জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এটা নিশ্চিত যে, এ জায়গাটার সঙ্গে শেষ প্রস্তর যুগের কোন সম্পর্ক আছে। আমার অনুমান, এমনকী প্রস্তরযুগেও—যখন আজকের মতোই পাহাড়ের ওপরে পশুচারণ করা হত এবং মাটি খোঁড়ার দন্ড বা হালকা লাঙ্গলের সাহায্যে সবে কৃষিকাজ শুরু হয়েছে—তখনও এটা একটা পীঠস্থান ছিল। (মন্দিরের সঙ্গে হাতিয়ারের সম্পর্কের বিষয়টি উপেক্ষার জন্য দ্রষ্টব্য: *আই এ আর,* ১৯৫৫, পৃ. ৫৯।) উপত্যকার যেটুকু জমি উর্বর তা ইউক্রেনের চেরনোজেম্-এর জমির মতোই অত্যন্ত শক্ত এবং এমনকী আধুনিক ইস্পাতের লাঙ্গল ব্যবহার করলেও সাত-আটটি বলদ ছাড়া সেখানে হাল করা অসম্ভব। সুতরাং, প্রথম কৃষিকাজ নিশ্চিতভাবেই শুরু হয়েছিল অনেকটা দূরে—পাহাড়ের মুকুটের মতো সংকীর্ণ মালভূমিতে।

মাইলখানেক দূরে ঘন লাল রঙে রাঙানো এক শৈলখণ্ড আছে। ইনি হলেন মাহ্সোবা—দু-মাইল দূরের উপত্যকার কোঠারূঢ় গ্রামের রক্ষক দেবতা। কথিত আছে, ইনি রাখাল বালকদের সঙ্গে নিয়ে ওয়াকদ গ্রাম (যেখানে এখনও এঁর একটি মন্দির আছে—এ ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আমার আর বিশেষ কিছু জানা নেই) থেকে আসার পথে এই পাহাড় চূড়াতেই বিশ্রাম নিতে থাকেন। এ কাহিনীর মধ্যে পশুচারণ যুগের বিচরণশীল জীবনযাত্রার কোন স্মৃতির অবশেষ লুকিয়ে আছে এবং কোঠারূঢ় গ্রামের অধিবাসীরা আজও তাদের বাৎসরিক পালকি মিছিল নিয়ে দীর্ঘ খাড়াই পথ বেয়ে এখানে এসে হাজির হয়। এই দেবতারই অনুকল্প একটি পাথর স্ত্রী-সমেত স্থাপন করা হয়েছে গ্রামের ভিতরে—যদিও পাহাড় চূড়ায় কোন স্ত্রী নেই। সংখ্যার দিক থেকে চারণ-দেবতারা খুবই বিরল এবং তা সবসময়ই পুরুষ। এঁদেরই অন্যতম হলেন বাপুজী বাবা—পুনার চল্লিশ মাইলের মধ্যে যাঁর তিন-চারটি নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে। ইনি মূলত গৃহপালিত পশুদেরই দেবতা—কিন্তু মেয়েরা এঁর পূজো করতে পারে না, কেননা তাদের কাছে ইনি বিপজ্জনক। এই কারণে, বেতালের ওপর এমনকী কোন মেয়ের ছায়া পড়াও নিষিদ্ধ এবং ভক্ত পূজারিরা সতর্ক থাকে যেন পূজোর দিন সকালে কোনো মেয়ের চুড়ির শব্দও তাদের কানে না যায়। স্পষ্টতই, পাহাড়ের ওপরের অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস উপত্যকার গড়পড়তা বাসিন্দাদের মতো একইরকম ছিল না। কিছু ক্ষেত্রে শেষোক্তদের ধর্মবিশ্বাসে পূর্বোক্তদের দেবতাদের নাম, লোকাচার এবং হয়ত এমনকী লিঙ্গেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে।







চিত্র ৩ : মূল বালিপাথর (৩ কারনেলিয়ান) যা থেকে ছোট হাতিয়ারগুলি কাটা হত।

একই পাহাড়ের সর্পিল অধিত্যকা-পথ ভেঙ্গে মাইল পাঁচেক দূরত্বের পরবর্তী শৃঙ্গটিতে (উচ্চতা ২৪০৪ ফুট) পৌঁছলে এ কথার প্রমাণ মিলবে। সেখানে সামন্তযুগে নির্মিত একটি ছোট

ভৈরব-মন্দির আছে। ভৈরবের প্রধান মন্দিরটি বানানো হয়েছে নীচের বর্তমান বাভাদান গ্রামে, যদিও স্বীকার করা হয় যে মূল দেবতা রয়েছেন পাহাড়ের ওপরে—প্রথম উপত্যকার 'ভাই' বেতালদের সমান্তরালে। আবার, পাহাড়ের ওপরে বা ভৈরব মন্দিরের চারপাশে ছড়ানো স্ফটিক পাথরের হাতিয়ারের রাশি থেকেও এ কথা প্রমাণ হয়—যা পাহাড়ের অন্যত্র নেই। হতে পারে, হাতিয়ারগুলি এখানেই তৈরি হত বা অন্য কোন জায়গা থেকে নিয়ে আসা হত বিনিময়ের জন্য—সম্ভবত বলিদানকারীদের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে। আরও একটা দিক, আগে হয়ত এখানে কোন আদিম বসতি ছিল—কৃষির উন্নতির ফলে যা পরবর্তীকালে উপত্যকায় সরে গেছে। যাই হোক না কেন, এই ধরনের ধর্মবিশ্বাসের অজস্র দৃষ্টান্ত কিন্তু গোটা মহারাষ্ট্র জুড়ে ছড়িয়ে আছে—যা সদৃশ পাহাড় অধিত্যকাগুলির তুলনামূলকভাবে বড় মন্দিরগুলির (প্রত্নতত্ত্বের প্রতিবন্ধক!) মধ্যে স্পষ্ট। পুনা শহরের সবচেয়ে কাছের পার্বতী-মন্দির এখন চটকদার ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের দখলে; কিন্তু আরও অনেক মন্দির আছে যেখানে আদিম দেবতারা কিঞ্চিত ব্রাহ্মণ্যবাদী পরিবর্তন সত্ত্বেও টিকে আছেন এবং তাঁদের কাছে হয় সরাসরি বা অধঃস্তন প্রতিনিধিস্থানীয় দেবতার মাধ্যমে বাৎসরিক রক্তোৎসর্গ করা হয়। এ বিষয়ে সব প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হলে আরও বেশি ক্ষেত্রানুসন্ধান প্রয়োজন। যে দুটি জায়গা নিয়ে এখানে আলোচনা হল সেখানে পাথরের ওপরের মাটির স্তরও পাতলা, সুতরাং খননের ফলে খুব বেশি কিছু পাওয়া যাবে না। পাহাড়ের ওপরে ঝর্ণা বা জলের সহজলভ্য কোন উৎস না থাকায় বাসস্থানের অবশেষও কিছু টিকে নেই। কোন মৃৎপাত্রের সন্ধানও পাওয়া যাবে না—অবশ্য হাল আমলের কিছু ছাড়া, যেগুলি মদের চোরাকারবারীরা এনেছে। তাদের কাছে এগুলি আদর্শ জায়গা। কখনও কখনও নোংরা গেরুয়া আলখাল্লায় ঢাকা, জটাজুটধারী, শুদ্ধচিত্ত সাধুবাবারাও এসব রাখে এবং সত্যি বলতে কী, বন্য দেবতার সেবা করার জন্য নয় বরং এই অবৈধ কারবারে অংশ নিয়েই দু-পয়সা কামায়। দেখলে মনে হবে, দেশের এই অংশ খুব সাম্প্রতিককালে প্রস্তরযুগ থেকে লাফ দিয়ে সরাসরি লৌহযুগে ঢুকে পড়েছে, তাম্র-প্রস্তরযুগকে আর ছোঁয়নি—কেননা এখানে তামার কোন হাতিয়ার খুঁজে পাওয়া যায় না। হাতের কাছের পাহাড়ের কঠিন স্তর পুড়িয়ে লোহা নিষ্কাষণ সম্ভব হয়ে থাকতে পারে—যে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু উদ্ধারযোগ্য তামার কোন খনি এখানে নেই। আবার, পুনার মধ্য দিয়ে যাওয়া প্রধান প্রধান যে বাণিজ্যপথগুলি তা-ও মনে হয় তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিককালের, সম্ভবত উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পরের।

২.৫ অন্যদিক থেকে, দেবতা ও ধর্মবিশ্বাসগুলি সম্পর্কে এই অনুসন্ধান আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দিকেই ঠেলে দেয়—যার সঙ্গে লিখিত নথিপত্রগুলির সম্পর্ক থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে এগুলির অধিকাংশই ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক। নিম্নবর্গের বিগ্রহগুলির একটিকে আরেকটির থেকে আলাদা করা যায় না—যদি না ভক্তদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। বেতাল, মাহ্‌সোবা (মঙ্গলকর উপদেবতা), কালুবাই (কৃষ্ণবর্ণা, সাধারণভাবে দেবীমাতৃকা—যিনি পরে শিবের স্ত্রী কালী-তে রূপান্তরিত), মারিয়াম্মা* (কলেরায় মৃত্যুর দেবী)—এঁরা প্রত্যেকেই

* একটা মজার গল্প আছে যা নিছক রটনা না হয়ে ইতিহাসসঙ্গতও হতে পারে। বলা হয়, কালিকটে ভাস্কো দা গামা ও তাঁর সঙ্গীরা এই দেবীর পুজো দিয়েছিলেন। তাঁরা যখন মারিয়াম্মা-র স্থানীয় মন্দিরে ঢোকেন পুরোহিতরা তাঁদের গায়ে পূতবারি ছেটান এবং তাঁরা বিগ্রহের সামনে নতজানু হয়ে বসেন এই ভেবে যে কুমারী মেরী-র পুজো হচ্ছে। দলের মধ্যে কেবলমাত্র জোয়াও দ্য সালা-রই এ বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ হয়েছিল। ('দি ইটিনেরারি অফ লুডোভিকো বার্থেমা অফ বোলোগনা' ১৫০২-১৫০৮, অনু. জে ডব্লিউ জোনস্, ১৮৬৩, বিশেষ সংস্করণ, লন্ডন, ১৯২৮, ভূমিকা-অষ্টাদশ পৃষ্ঠা)

লালরঙে রঞ্জিত এবং দেখতে একইরকম, এমনকী স্ত্রী না পুরুষ তা-ও বোঝা যায় না। মারিয়াম্মার পুজো দেয় অস্পৃশ্য মঙ (যারা ইতিহাসের মাতঙ্গ উপজাতির উত্তরসূরি বলে মনে করা হয়) জাতির লোকেরা; এরা এখনও নানা দিক থেকে আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে। একটিমাত্র থানই কেবল উচ্চবর্ণের গোপন ভক্তি ও ডালি পায়, যদিও পাঁচিল গাঁথার প্রয়োজনে থান-সংশ্লিষ্ট বাবলা গাছটি এক জমিদার কেটে দিয়েছিল—অবশ্য, ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেবীকে একটা ছোট ইঁটের মন্দির বানিয়ে দেওয়ার ফলে কোন কোপ পড়েনি। অন্য বৃক্ষ দেবতাদের উপস্থিতিও একটা সাধারণ ব্যাপার। পিপুল গাছ (*Ficus religiosa*) গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই নিরবচ্ছিন্ন পুজো পেয়ে আসছে—এর নীচে বুদ্ধের নির্বাণলাভেরও বহু আগে থেকে। পিপুল গাছের দেবতার স্থানীয় নাম মুনজাবা, বিশেষভাবে অভিষেক পূর্ববর্তী ছোট শিশুদের ইনি রক্ষক দেবতা। বটবৃক্ষের (*Ficus Bengalensis*) সঙ্গে যুক্ত সাবিত্রী, যিনি যমের কাছ থেকে তাঁর মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন; সুতরাং, এ গাছ সমস্ত সাধ্বী স্ত্রীর পূজ্য। এই দুটি গাছের বুনো ফলই এককালে খাদ্য হিসেবে গণ্য হত—অনেকটা একই শ্রেণীভুক্ত উদুম্বরা-র (*Ficus Glomerata*) মতো, যদিও তা অনেক বেশি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য। 'পৈপ্পালাডা' নামটি থেকেও এটা বোঝা যায়—যার অর্থ হল 'পিপুল-ভক্ষক'। এ বিষয়ে আরও বিশদ জানতে আগ্রহীরা *জাতক* (পৃ. ৩৩৪) থেকে এবং ভি. বল-এর বইতে (পৃ. ৬৯৫-৬৯৮) সূত্র সহকারে আদিম মানুষদের সংগ্রহযোগ্য বনজ খাদ্যতালিকার বিবরণ পাবেন। আউদুম্বরা (Audumbara), যারা উদুম্বরা টোটেম-জাত বলে বিশ্বাস, একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উপজাতি এবং তাদের নিজস্ব মুদ্রায় এই পবিত্র বৃক্ষের ছাপ থাকে। রোগনিবারক দেবীদের মধ্যে গৌরবা (*Gouraba*) হলেন হামের দেবী—প্রমাণ সাইজের অবয়বহীন চ্যাপটা পাথর, কোন এক সময় হলুদ ও সেইসঙ্গে লাল রঙ মাখানো হয়েছিল। শীতলা (যিনি ঠাণ্ডা করেন)—গুটিবসন্তের দেবী। (সাধারণত নদী-গর্ভের পাথর, আইসব্যাগ প্রচলনের আগে রোগীকে ঠাণ্ডা করার কাজে যা ব্যবহৃত হত।) প্রতিটি গ্রামেই এঁর মন্দির আছে এবং শুধু পুনা শহরেই এক কুড়ির বেশি। অবশ্য, এ শহরটা গড়ে উঠেছে অজস্র গ্রাম নিয়েই। যেহেতু, এই দেবী টিকা দেওয়ার দশ-বারোদিন পরে এখনও ভক্তিমতি মায়েদের পূজা পান সুতরাং, তিনি যে রোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই, বিশেষ করে তাদের কাছে যারা এডওয়ার্ড জেনার-এর নামও শোনেনি এবং মনে করে যে টিকা দেওয়াটা একটা আধুনিক রক্তোৎসর্গ প্রথা। পুনার প্রতিটি গলিতেই এই ধরনের অজস্র ধর্মবিশ্বাস আছে; পারিবারিক দেবতার অনেক মন্দিরও গড়ে উঠেছে এবং তা গড়িয়েছে ব্রাহ্মণরা—পেশোয়া রাজত্বের রমরমার টানে যারা একসময় এখানে এসেছিল। আদি দেবতারাও কিন্তু তখন পাশাপাশি থেকে গেছেন। কখনও কখনও স্থানিক ধর্মবিশ্বাস শাস্ত্রীয় দেবতাদের সঙ্গে মিশে গেছে আবার কখনও হয়ত তা থেকেই বিকাশলাভ করেছে; যেমন, মহারাষ্ট্রের প্রধান দেবতা 'বিথোরা'-কে মনে করা হয় বিষ্ণুরই এক রূপ হিসেবে এবং তাঁর স্ত্রী রুখমাই হলেন লক্ষ্মী।

বেতাল প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। সমগ্র ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য জুড়ে এঁর উল্লেখ আমরা দেখব এক অপদেবতা হিসেবে—এক ধরনের প্রেতাত্মা। বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান অনুসারে ইনি এক নিপুণ রঙ্গাবতার। শিব, যাঁর সঙ্গে বেতালের শিলাকারগত সাদৃশ্য আছে, হলেন যাবতীয় ভূত-প্রেতের দেবতা (ভূতেশ); যে কোন প্রবীণ বেতালের পরিচয়ও তাই। কিন্তু শিবের

কোন মূর্তি বা শৈলপ্রতীকে সাধারণভাবে সামান্যতম লাল রঙ*-ও লাগানো হয় না। বেতালের সমান্তরাল অবস্থানে যে ভৈরবের কথা আমরা আগেই বলেছি তিনিও শিবেরই অংশ এবং মূল শিব ও বেতালের মতোই সংহারেরও দেবতা। এঁর কাছেও বলি দেওয়া হয়। শিব অবশ্য বিবাহিত এবং তাঁর স্ত্রী মা কালী বা দুর্গা (পর্বত কন্যা)-ও স্বতন্ত্রভাবে পূজিতা হবার সাথে সাথে রক্তরঙ পরিহার করেছেন—যদিও এঁদের সামনে বলি দেওয়ার প্রথা এখনও চালু আছে। হনুমান, এখানে যিনি মারুতি (পবন পুত্র) নামে পরিচিত, আলাদাভাবে কৃষকদের পূজা পান এবং নিম্নবর্গের অন্য দেবতাদের মতই সিঁদুর প্রলেপে আবৃত থাকেন। তিনি কৌমার্য ব্রতধারী এক মৃত্যুদেবতা, সাধারণত শ্মশানের কাছাকাছি তাঁর অবস্থান (শিব বা ভৈরবের মতোই)। মৃতদেহ দাহ করার আগে তাঁর সামনে এক বিশেষ আচার পালনের রীতি আছে। এটা লক্ষ্যণীয় যে, বানরের মত মুখ ও লেজ বিশিষ্ট এই দেবতা এক টোটেম; যদিও বেতালের মতো ইনিও কুস্তিগীরদের (পেশাগতভাবে যারা একসময় যোদ্ধা ছিল) বিশেষ পূজ্য এবং উভয়ের জন্মদিনও একই। ভক্তদের কাছেও এই ব্যাপারটা গোলমেলে। তাই তারা হনুমানকে মূল বেতালের অংশ বা তাঁর ভাই বা অন্য আর এক রূপ—এইভাবে ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু শিব বা ভৈরবের নয়। বড় মন্দিরগুলিতে অবশ্য হনুমান রামের ভক্ত—যাঁর সামনে তিনি জোড়হস্তে নতজানু হয়ে থাকেন। এই উপস্থাপনার ব্যাখ্যা *রামায়ণ* মহাকাব্যের অনুসরণে—যেখানে তিনি হলেন বিষ্ণুর অবতার রামের অনুগত এক দাস বানর এবং অপহৃতা সীতাকে উদ্ধারে তাঁর সাহায্যকারী। কৃষকদের দেবতা এইভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন ভূস্বামীদের দেবতার সেবকে—অথচ তিনি (রামেরই মতো) আগে থেকেই পূজ্য ছিলেন উত্তরভারতের কৃষকদের কাছে; এবং এই রূপান্তরে, যেটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা হল, হনুমান তাঁর রক্ত-প্রলেপ খুইয়েছেন।

যখনই কোন দেবতার 'উন্নতি' ঘটেছে, ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়ে তখনই তাদের মূর্তিগুলির ভাস্কর্যগত উৎকর্ষতা বেড়েছে এবং রক্তবর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। প্রতিক্রিয়াটা এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে যে সচেতনভাবে অধিকাংশ গোঁড়া ব্রাহ্মণগোষ্ঠী দেবতার পূজায় লাল ফুলও ব্যবহার করে না। কিন্তু সংস্কৃত নাটক থেকে আমরা জানি যে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে লাল ফুলের মালা পরানো হত—যা ছিল বলির মালা বা বধ্যমালা। হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হস্তিমুন্ডবিশিষ্ট যে গণেশ—শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁরও গায়ের রঙ

* এখানকার পিমপ্লোলি ও বেদসা গ্রামের মধ্যবর্তী সীমানায় স্থানিক ব্যাঘ্রদেবতা বাঘোবা-র পূজা প্রচলন দেখতে পাওয়া যাবে। অবয়বহীন পূজ্য পাথরটি গোলাকৃতি এবং খাঁজ কাটা, অনেকটা শিবলিঙ্গের মতো, কিন্তু গায়ে কমবেশি পুরু লাল রঙের প্রলেপ লাগানো যার মধ্যে আবার দুটো চোখ আঁকা হয়েছে, দেবতার সামনে একটা ষাঁড় অর্থাৎ নন্দী দাঁড়িয়ে, যেমনটা শিবের থাকে। কিন্তু এখানে যেটা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল, ছোট পাথরের একগাদা ষাঁড় দেবতার দিকে মুখ করে সারিবদ্ধভাবে বসানো। স্পষ্ট বোঝা যায় যে মূল প্রথা ছিল, ব্যাঘ্রদেবতার সামনে নিয়মিতভাবে একটি করে ষাঁড় বলি দেওয়া। মানত করে বসানো এই ছোট পাথরের ষাঁড়গুলি হচ্ছে তারই বিকল্প। পরবর্তীকালে, বাঘের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় জঙ্গলে পশুচারণের বিপদ যখন কমে এল তখন ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে শিব এবং ব্যাঘ্র দেবতার কিছু সমীকরণ হল—এমনটা ভাবা যেতেই পারে। অন্যদিকে, ভোরঘাটে যাঁর পূজা হয় তিনি হচ্ছেন ব্যাঘ্রদেবী—বাঘজাই। (কোথাও কোথাও তিনি আবার 'সাত-বোন'-এর একজন)। খুবই সাম্প্রতিককালে কাছাকাছি জায়গায় তাঁর একটি মন্দির স্থাপিত হয়েছে; সেখানে তিনি ঘণ্টা, কেতাদুরস্ত অর্চনা এবং কাছের বোম্বে-পুনা সড়ক দিয়ে যাওয়া পর্যটকদের পূজার্ঘ্য লাভ করেন।

লাল। কলমজীবীদের পৃষ্ঠপোষক এই দেবতা নানাবিধ বিঘ্ন-বিপদ সৃষ্টি করেন আবার তা থেকে রক্ষাও করেন। ইনি দুর্গার পুত্র, কিন্তু শিবের নন; *গণেশ-পুরাণ* ভালভাবে ঘাঁটলে এ কথাটা জানা যাবে। শিবের পরিবারে তাঁর অন্তর্ভুক্তি বিশুদ্ধ সমন্বয় প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাসকে আত্মস্থ করে নেওয়া হয়েছে। সম্ভবত একই ঘটনা ঘটেছে শিবের ষাঁড় নন্দী-র ক্ষেত্রেও। কয়েক হাজার বছর আগে, অন্তত নব্যপ্রস্তরযুগের আদিম মানুষরা যখন শিবের নামই শোনেনি, তখনও নন্দীপূজার প্রচলন ছিল। *লিঙ্গ-পুরাণের* বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনুসারে, শিবের বাহন এই প্রাণীটিই তাঁর ধ্যানধারণার মূর্ত প্রতীক অর্থাৎ প্রকৃত অর্থেই তাঁর টোটেম। শিবের গলায় জড়ানো সাপ শিবলিঙ্গের ওপরে ফনাবিস্তার করে থাকে; আবার আর একটি আদিম বিগ্রহ অনুযায়ী, এই ফনার ওপরেই অনন্ত নিদ্রায় শায়িত থাকেন বিষ্ণু। এই সবই বিচিত্র ও জটিল ধর্মবিশ্বাসগুলির মিলে মিশে যাওয়ার উদাহরণ। গণেশের ক্ষেত্রে সিঁদুর মাখানোর কারণ আমরা জানি। তাঁর কাহিনীতেই বলা আছে যে, হস্তিমুন্ডসমন্বিত এই দেবতা সিন্দুর নামের এক অসুরকে বধ করে মহানন্দে তার রক্তে স্নান করেছিলেন; সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রে রক্তের বিকল্প হিসেবে সিঁদুর-লেপন অবশ্যকরণীয়। লাল রঙ যে জীবনধারণের মূল রহস্য রক্তেরই পরিবর্ত তা অন্য রক্তোৎসর্গ-পালন অনুষ্ঠান (গণেশের সামনে যা কখনও হয় না) থেকেই অনুমান করা যায়, কিন্তু এখানে সে কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে। পুনার প্রাচীন দেবতা কসবাপীঠের (শহরের আদি অংশ) গণেশের মূর্তি সিঁদুরের পুরু (সম্ভবত ১৫০ মি.মি.) প্রলেপের নীচে ঢাকা পড়ে গেছে এবং তারই ওপর দুটি রূপার অক্ষিগোলক, যেমনটা বেতাল বা নব্যপ্রস্তরযুগের অন্য আদিম মূর্তিগুলোয় থাকে, লাগিয়ে রাখা হয়েছে। পুনা শহরের যে কোন বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রথম নিমন্ত্রণটি করতে হয় এখানে। একই পরিবারসম্ভূত পুরোহিতকুল যদিও এখন পৃথগান্নে বিভক্ত তবু অজস্র ডালি, বহির্দেওয়ালের আতঙ্কজনক বিজ্ঞাপন (এই আধুনিক যুগে যা পুনা শহরের প্রায় প্রতিটি মন্দিরেই দেখা যায়), মন্দিরের জমিজমা ও চত্বরে বসানো দেকানঘরগুলির ভাড়া থেকে প্রত্যেকেরই মোটা টাকা আয় হয়। পুনার প্রাচীনা যে দেবী, যোগেশ্বরী—তাঁর পূজা-পদ্ধতিও একইরকম জাঁকজমকপূর্ণ এবং পুরোহিতদের উৎসাহবর্ধক; ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে পোষাক-পরিচ্ছদ পরা, খাওয়াদাওয়ার সময় থেকে শুরু করে মধ্যরাতে দেবী যখন নিয়মমতো শুতে যান—এই পুরো সময়টা জুড়ে অবিরাম পুণ্যার্থীর স্রোত তাঁর কাছে আসে ও পুজো দেয় (সাধারণত দক্ষিণা, ফুল ও নারকেল)। প্রতিদিনই কাপড়ের পোষাকের ফাঁক থেকে উঁকি দেওয়া একটা গম্ভীর রৌপ্যমুখোশই কেবল চোখে পড়ে ভক্তদের। কিন্তু অলঙঘ্য নিয়ম অনুযায়ী, অমাবস্যার দিন দেবী থাকবেন সজ্জাহীনা (যদিও উলঙ্গিনী নন)—যাতে তাঁর আসন-সমাহিতা, দীর্ঘবাহুসমন্বিতা, প্রস্তরখোদিত আসল মূর্তি নজরে আসে। যেটা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল, চান্দ্রমাসের এই নির্দিষ্ট দিনে আদিমূর্তির যে রক্তিম-প্রলেপ তা নতুন করে রাঙাতে হয় এবং এইভাবেই আদিম ধর্মবিশ্বাস থেকে আভিজাত্যে উন্নীত দেবীর কাছে রক্তদানের আদিপ্রথার স্মৃতিটুকুই শুধু রয়ে যায়! দেবী আজও সেই স্বামীসঙ্গহীনা, যদিও দিনকয়েকের জন্য মহাদেব (শিব)-এর এক মূর্তি এনে বসানো হয়েছিল তাঁর স্বামী হিসেবে এবং খুঁজলে এখনও হয়ত তাঁকে মন্দির চত্বরের কোন কোণে পূজাবিহীন উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যাবে! উন্নতপর্যায়ে উঠে আসা আরও দেবীমূর্তি রয়েছেন কসবা অঞ্চলে—যেগুলিকে সাধারণভাবে 'দেবী'-ই বলা হয়; আবার, কাঁসাশ্রমিকদের প্রতিষ্ঠা করা দুটি মূর্তি—কালিকা-ও আছেন। শেষোক্তদের ক্ষেত্রে মূর্তির

কপালেই শুধু লাল রঙ লাগানো, যা এয়োতিদের চিহ্ন—যদিও *কালিকা-পুরাণে* (৫০০-১০০০ খৃ. রচিত, পরিচ্ছেদ ৭১, পংক্তি ১৮-১৯, ১১৪-১৬ দ্রষ্টব্য) স্পষ্ট বলা আছে, রক্তোৎসর্গেই দেবী তৃপ্ত হন—বিশেষ করে, নররক্তে। অর্থাৎ, জটিল ব্রাহ্মণ্য সর্বেশ্বরবাদ তার অজস্র কুসংস্কারের নীচে ঢেকে নিয়েছে আদিম ও ক্রূর ধর্মবিশ্বাসগুলিকে ধ্বংস না করে[১৩] সংস্কার করে নেওয়ার গোপন প্রচেষ্টা—ঠিক যেভাবে সহিংস সংঘাত ব্যতিরেকেই মিশিয়ে নেওয়া গিয়েছিল আদিম মানুষগুলিকে। এমনকী আজও, পেশোয়া রাজত্বের গৌরবের দিনে নির্মিত জাঁকজমকপূর্ণ পার্বতী মন্দিরের নীচে দেখা যাবে আদিম মাহ্‌সোবা-র পূজা হচ্ছে। এই অন্তর্ভুক্তি এক অনুসন্ধিৎসু সহিষ্ণুতারই উদাহরণ—যা ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য; কেননা, মাহ্‌সোবা হলেন সেই দৈত্য মহিষাসুর—দুর্গা-পাবতী যাঁকে বধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের মধ্যে সমন্বয় আনার একটা পদ্ধতি ছিল তাদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা; কিন্তু মাহ্‌সোবা আজও পর্যন্ত হনুমান বা নারী-বিদ্বেষী বেতাল বা বাপুজী বাবার মতোই কঠোর কৌমার্যব্রতধারী। এ যেন অনেকটা মধ্য ইউরোপের কোন খ্রীষ্টীয় গির্জার সামনে সেখানকার নব্য প্রস্তরযুগের আদিম ধর্মবিশ্বাসের এখনও প্রচলন থেকে যাওয়া! ভারতীয় সমাজ বিকাশে এই সহিষ্ণুতা-বৈশিষ্ট্যের গভীর ভিত্তি নিহিত আছে ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলির মধ্যে—অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল। যখনই কোন অঞ্চল উৎপাদন বা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়েছে বা তেমন কোন কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়েছে তখনই সেই অঞ্চলের দেবতারা ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের আত্মীয়, অনুচর, অবতার বা ভিন্নরূপ হিসেবে গৃহীত হয়েছেন এবং বেনারস, মথুরা বা নাসিকের মতো তীর্থক্ষেত্রগুলি জন্ম নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে, তুষারযুগের ইউরোপীয় সাদৃশ্যগুলির কথা তোলা যেতে পারে। লসেল-ডারডোন-এর খোদাই নারীমূর্তির (*এ আই এ*, চিত্র ১০৯) মতোই তথ্যসমৃদ্ধ অ্যারিগ্‌নেশিয়ন যুগের শেষদিকের 'ভেনাস অফ উইলেনডর্ফ' (এ আই এ, চিত্র ১৯) যখন খুঁড়ে তোলা হয় তখন তাতেও যে কোন ভারতীয় গ্রামীণ দেবীমূর্তির মতোই 'লাল গিরিমাটির অস্তিত্ব বিদ্যমান' ছিল। সেখানকার নারী পুত্তলিকাগুলির আকৃতিও ঠিক মানুষের মতো নয়—যদিও ঐ যুগের জীবজন্তুর মূর্তি বা অন্যান্য চিত্রে পরিপূর্ণ শিল্পদক্ষতারই পরিচয় আছে। সম্ভবত অবিকল কোন মানুষের মুখ বানানোটা কারো বিরুদ্ধে তুকতাক হিসেবে গণ্য হত। বন্য জন্তুদের মধ্যে নৃত্যরত, জন্তুর মুখোশ পরা যে মনুষ্যদেহের ছবিগুলি গুহাগাত্রে আঁকা হয়েছে (*এ আই এ*, চিত্র ৩০, ৩১, ৭০)—যার মধ্যে লা ট্রয় ফ্রেরেস-এর 'জাদুকর' (*এ আই এ*, চিত্র ১৪২) বা গ্রীক বনদেবতার এক অগ্রদূত (*এ আই এ*, চিত্র ১৪৩) বিখ্যাত—সেগুলির ধ্যানধারণার সঙ্গে আমাদের গণেশ-এর ধ্যানধারণারও নিশ্চিত সাযুজ্য আছে। কিন্তু ধ্যানধারণাজাত কুসংস্কারগুলি ভারতবর্ষে আজও টিকে থাকার কারণ এখানকার খাদ্য সরবরাহ তুষার সংহননে সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি—ইউরোপে যা তীব্রভাবে হয়েছিল এবং তুষারযুগের সেই বিপর্যয় সেখানকার অজস্র উল্লেখযোগ্য লোকবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

২.৬ ১৯৪১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে বোম্বাই সরকার যে গ্রাম পরিচায়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল তা থেকে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি তুলে নেওয়া যেতে পারে। গ্রাম-নামের পাশে বন্ধনীতে তালুক ও জেলা, তারপর জনসংখ্যা, বাৎসরিক উৎসবের সম্ভাব্য মাস (সবসময়ই চান্দ্র তিথি অনুযায়ী) এবং উৎসবে উপস্থিতির আনুমানিক সংখ্যা দেওয়া হল ঃ

বিভালভেদে (দাহানু, থানা)	২৮৬	মহালক্ষ্মীদেবীর মেলা		৪৫,০০০
মাহ্সে (মুরবাদ, থানা)	৫৩৯	(উপজাতি ১৫৯)	জানু	৫০,০০০
সপ্তশৃঙ্গিগড় (কোলওয়ান, নাসিক)	১৫৫	(উপজাতি ৫৩)	এপ্রিল	৫০,০০০
নৈতেল (নিফাড়, নাসিক)	৭৭৮	'মালোলিয়া' লক্ষ্মীদেবীর মেলা	জানু	৫০,০০০
ওয়ারখেদ (নেওয়াসা, আহমেদনগর)	৬৪১		এপ্রিল	৫০,০০০
ইযেরাদ (পাটান, সাতারা)	৮৯৮	ইয়েরদোরা দেবতার	এপ্রিল	১০০,০০০

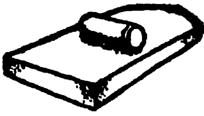
কোন কোন মেলার বাড়তি আকর্ষণ থাকে গবাদি পশু বা কৃষিপণ্যের প্রদর্শনী—যেমন, বিজাপুরের মহাল বাগায়াত-এ। অন্যগুলির ক্ষেত্রে এখন, মার্চ মাসে যামানুর (নাভালগুন্ড, ধারওয়ার) উরুস্-এর মতো সন্তের স্মৃতিতে, পীর রাজে বাকশার-এর সম্মানে মেলা বসে—যেখানে প্রায় এক লক্ষের মতো মানুষ যোগ দেয়। নভেম্বর মাসে, সম্ভবত সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানেশ্বরের স্মরণে পুনার কাছে আলান্দিতে যে মেলা হয় সেখানেও প্রায় এক লক্ষ মানুষ আসে। অথচ অনেকবেশি জনপ্রিয় সাধু তুকারামের স্মৃতিতে ছোট্টনদী 'দিহু' থেকে কয়েকমাইল দূরের দিহু গ্রামে নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারী মাসে যে দুটি মেলা বসে তার একেকটিতে হাজার বিশেকের বেশি লোক হয় না। সুতরাং এটা ভাবা যেতেই পারে যে, আলান্দি মেলার মাহাত্ম্য শুধু জ্ঞানেশ্বরের সঙ্গেই নয়, কোন আদিম ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গেও সম্পর্কিত। এই ধরনের মেলাগুলি থেকে আমরা কৃষি-বিকাশের মূল ধারাটির সন্ধান পেতে পারি—যখন খাদ্যশস্যই হয়ে উঠেছিল জীবনধারণের প্রধান উপকরণ এবং পাহাড়ের ওপর থেকে চাষবাস সরে আসছিল নদী উপত্যকায়। এই সমস্ত উৎসবগুলির উপজাতিক-উৎপত্তি বুঝে নেওয়া যায় মেলাগুলি যেখানে বসে সেখানকার স্থান-বৈশিষ্ট্য থেকেই; এগুলি আজও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল (কেবলমাত্র উপরোক্ত আধা-উপজাতিক গ্রাম মাহ্সে বাদে) ঃ

আকালকুয়া বুডরুখ (মেওয়াসি, প. খান্দেশ)	১৯৭		ফেব্রুয়ারী	১৫,০০০
মণিবেলি (ঐ)	১৯৮		এপ্রিল	১৬,০০০
মুলগি (ঐ)	৬৮১		মার্চ	১০,০০০
সারানঘেড়ে (শাহ্দা, পূ. খান্দেশ)	২০৯১	(উপজাতি ২৮৭)	ডিসেম্বর	৫০,০০০

কথাটা হল, কৃষির জন্য আদিম জীবনকে পরিত্যাগ করার অর্থই হচ্ছে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। পরিবর্তনটা যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে ঘটেছে সেখানে কোন স্বীকৃত ধর্মস্থানে বাৎসরিক উৎসবের মধ্যে দিয়ে আজও পুরনো দেবতাদের স্মৃতিরক্ষা ও পূজার্চনা হয়, যদিও সাধারণ পুজোআচ্চার জন্য প্রতিটি গ্রামেরই নিজস্ব রক্তবর্ণ-রঞ্জিত প্রস্তরবিগ্রহ আছেন। এটা নয় যে, প্রতিটি মেলার স্থানই এখনও তীর্থযাত্রীদের চরম দুর্ভোগে ফেলা সেই ছোট ছোট গন্ডগ্রাম রয়ে গেছে। পান্ধারপুর উন্নত হয়ে উঠেছে মহারাষ্ট্রের বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে—যদিও, আগেই বলেছি, আঞ্চলিক দেবতা বিথোবা-কে বিষ্ণুর অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়েছে বলেই মনে হয়। জায়গাটা পুরনো বাণিজ্যপথগুলির এক সংযোগস্থল। প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রগুলির কথা *মহাভারত* ও পুরাণগুলিতে সন্নিবিষ্ট হওয়ার কারণে সেগুলির মাহাত্ম্যও

স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে। তীর্থযাত্রীদের স্রোত ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যেমন, তেমনই বাকু অঞ্চল থেকেও প্রবাহিত হয়ে এসেছে পীঠস্থান ও বাণিজ্যের সন্ধানে।

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, কুসংস্কার বা লোকাচারগুলি সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা হয়ত আমাদের বিপথে নিয়ে যাবে, তার চেয়ে বরং আদিম সরঞ্জামগুলির আধুনিক অস্তিত্বটা দেখানো যেতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে জানা গেছে, বিদ্যুৎ বা কেরোসিনের এই যুগে ভারতীয় রান্নাঘরগুলিতে ব্যবহৃত হওয়া যে শিলনোড়া (চিত্র ৪)—প্রাগৈতিহাসিক যুগেও গোটা পৃথিবী জুড়ে তার অস্তিত্ব ছিল। হাতে ঘোরানো জাঁতা কিংবা মেশিনের চল হওয়ায় এতে এখন আর খাদ্যশস্য পেষাই হয় না। আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। আগে ছিল মাথার দিক থেকে ঢালু এবং কোলের দিকটা সরু (চিত্র ৫); সরু দিকটায় চেপে বসে দুই হাঁটুর জাঁক দিয়ে ব্যবহার করা হত। ঢালু হওয়ার জন্যে সর্বত্র সমান ও বেশি করে চাপ দেওয়া যেত। হাল আমলের চেটালো শিলনোড়ায় কঠিন কিছু ভাঙানো হয় না, বড়জোর সৈন্ধব লবণের বড় স্ফটিকগুলো—যা মাটিতে বা টেবিলে আছড়ে বা রান্নার বাটিতেও গুঁড়ো করে নেওয়া হয়। সাধারণত তরকারিতে দেবার শাকপাতা, নারকেল, আচার, মশলা—এ সব পিষতেই এগুলি ব্যবহার করা হয়। আবার এদেশে, বিশেষ করে অন্ধ্রের কিছু অঞ্চলে, এ কাজের উপযোগী আরও একটি সরঞ্জাম 'হাবন-দস্তহ্' (ফরাসী শব্দ, বাংলায় হামান-দিস্তা)-এর চল আছে। 'দস্তহ' বা মুষলটি উদুখল বা পাত্রের প্রায় পুরোপুরি মাপের হয়। এতে, ঠুকে ঠুকে থেঁতো করা হয় না বরং পাত্রের মধ্যে কোনাকুনি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢোকানো হয় এবং সবশেষে মন্ড হয়ে গেলে তা বের করে নেওয়া হয়। শিল-নোড়ার ক্ষেত্রে, পশ্চিম ভারতের উচ্চশ্রেণীর মহিলারা শিলের মাথার দিকটা (অর্থাৎ চৌকো দিক) ব্যবহার করে এবং নিম্নশ্রেণীর মহিলারা গোড়ার দিক (অর্থাৎ সরু দিক)—যেটা আরও শ্রমসাধ্য, কেননা বাটার সময় নোড়াটিকে প্রায় এক চতুর্থাংশ ঘুরিয়ে এগোতে পেছোতে হয়। ব্যবহার-রীতির এই শ্রেণী-পার্থক্যের মনে হয়, একটা ভৌগোলিক ভিত্তি আছে : চৌকো দিকটি ব্যবহার করা হয় উত্তর ভারতে, সরু দিক দক্ষিণে। এ থেকে পুঁথিগত সিদ্ধান্তটা দৃঢ় হয় যে স্থানীয় ব্রাহ্মণরা এসেছিল উত্তর থেকে। কিন্তু আরও একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, শক্ত জিনিষ পেষাই-এর কাজে দক্ষিণীরা উত্তর-ভারতীয়দের চেয়েও অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত শিল-নোড়ার ব্যবহার করে এসেছে—কেননা, সরু দিক ব্যবহার করে শক্ত জিনিষ পেষাই করাটা সহজসাধ্য। এই কারিগরি সরঞ্জাম (যা উদ্ভাবিত হয়েছে কৃষির প্রথম প্রচলনের সাথে সাথেই অর্থাৎ প্রস্তরযুগের সমাপ্তির আগে) সহযোগে একটি অনুষ্ঠান সম্পাদনের রীতি এমনকী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও চালু আছে—যদিও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে, যেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পালনীয় যাবতীয় আচারবিধি সম্বন্ধেই লেখা আছে, সেখানে তার কোন উল্লেখ নেই। শিশুর নামকরণের দিন (জন্মের বারোদিন পর) বা তার আগে, নোড়াটিকে সাজিয়ে শিশুর দোলনার চারপাশে গড়ানো হয় এবং সবশেষে সেটিকে দোলনায় শিশুর পায়ের কাছে রাখা হয়। বলা হয় যে, এই


চিত্র ৪ : আজকের ভারতীয় শিলনোড়া।


চিত্র ৫ : সিন্ধু উপত্যকার শিলনোড়া।

পালন-প্রক্রিয়ার ফলে শিশুটি পাথরের মতোই দৃঢ় ও নিষ্কলুষভাবে বেড়ে উঠবে এবং দীর্ঘায়ু ও জরামুক্ত হবে। নোড়াটিকে পরানো হয় শিশুর মতোই হাতা কাটা জামা (কুন্মি); সেই সঙ্গে লাল ও হলুদ রঙের ফোঁটা ও একটি হার পরিয়ে সাজানো হয়—যা শিশুর ক্ষেত্রে হয় না। আদিম মানুষদের অন্য অনেক অনুষ্ঠানের মতোই এখানেও প্রতীকের ব্যবহারের তাৎপর্য বহুমুখী এবং পাথরটি একইসঙ্গে দেবীমাতৃকা ও সেই শুভদা পরীর প্রতিনিধি—যার আশীর্বাদে শিশুটি পূত হবে। অনুষ্ঠানে *কেবলমাত্র মহিলারাই* যোগ দিতে পারে এবং তা পরিচালনা করে উপস্থিত সবচেয়ে বয়স্কা মহিলা—যে সধবা এবং সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এটা পরিষ্কার যে, এ হল এক প্রস্তরযুগীয় অনুষ্ঠান যা সরঞ্জামটির সাথেই যুগ যুগ ধরে চালু আছে এবং ব্রাহ্মণ পরিবারগুলি তাদের চারপাশের জনসমাজ থেকে তা গ্রহণ করেছে। বৈদিক যুগের সোমরস নিষ্কাশনেও এই ধরনের নোড়ার ব্যবহার হয়েছিল কিনা—তা অনুমানসাপেক্ষ; অবশ্য, দুটি চ্যাপটা পাথরের চাপেই তা করা হয়ে থাকতে পারে।

কুম্ভকারদের কৃৎকৌশলের মধ্যেও এক ধরনের প্রাচীনত্বের নিদর্শন আছে। পুনায় মৃৎপাত্রের পাইকারি উৎপাদনে বড় চাকা ব্যবহার করা হয়। যদিও, সবচেয়ে বড় পাত্রগুলি মেয়েরাই প্রাথমিকভাবে তৈরি করে ধীরগতির চাকতিতে—যে চাকতি *পুরুষরা কখনও ব্যবহার করে না।* অসম্পূর্ণ পাত্রাংশগুলিকে জোড়া ও আকার দেওয়ার কাজ পুরুষ কুমোরদের। পোড়ামাটির ছাঁচ দিয়ে পাত্রের ভিতরের দিক ও কাঠের দন্ড দিয়ে পিটে পিটে বাইরের দিকটা তারা তৈরি করে। খুবই দক্ষতার সঙ্গে, সাধারণত পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে অথবা যদি খুব বড় হয় তো নিজেরা ঘুরে ঘুরে এরা কাজ করে। বড় বড় পাত্রের গলা ঘিরে পেঁচানো নকশাটা আদিম যুগের, অন্য দেশে এগুলিকে দেবীমূর্তির গলার হারের সমার্থক বলে মনে করা হয়। বিশেষভাবে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল, পুনার বড়-চাকাওয়ালা কুমোরশালাগুলিতেও একইভাবে কাজ সম্পন্ন করা হয়—ছোট, পুরু ঘেরের পাত্রকে চাকায় ঘুরিয়ে হাতের কৌশলে বাড়িয়ে বাড়িয়ে (কুমোর চাকতিতে সেটা হয় না) মূল অংশটির চারগুণ আয়তনের পাতলা ঘেরের কিন্তু শক্ত পাত্র তৈরি হয়; মুখের কাছটাই শুধু কিছু করা হয় না। এর প্রযুক্তিগত কারণ হল, পুনার চারপাশে কুমোরের কাজের উপযোগী মাটির অভাব—এমনকী কয়েকমাইল দূর থেকে এনে বা স্থানীয় নদীমুখের জমা পলি ব্যবহার করা সত্ত্বেও। কুমোর-চাকতি ব্যবহারে মেয়েদের একচ্ছত্র অধিকারটাও কোন কৃৎকৌশলগত পশ্চাদগমন নয়—বরং এটা একটা প্রকৃত উত্তরাধিকার। উত্তরপ্রদেশে চাকা ঘুরিয়ে সুন্দর সুন্দর, শক্ত ও পাতলা পাত্র তৈরি করা হয় সেই মাটি থেকে যাতে ভাল পরিমাণ সিলিকেট মিশে থাকে। সেখানে পোড়ানোও হয় স্থায়ী চুল্লিতে; আর পুনায় সাধারণ মাটির গর্তের খোলামুখ ভাঁটিতে—যেখানে তাপ নিয়ন্ত্রণটা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবেই খড় ও তুষের স্তরের প্রাথমিক ব্যবস্থাপনার ওপর। খননের ফলে প্রমাণ হয়েছে যে, আজকের যুগে যেমনটা ব্যবহার করা হয় সেই ধরনের চাকতির অস্তিত্ব প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ছিল এবং এ থেকেও কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে পুনার কুমোররা এই পর্যায়েরও আগের এক আদিম কৌশলের অস্তিত্ব বহন করে চলেছে—যখন মেয়েরাই প্রথম হাতে মৃৎপাত্র তৈরি করত। আদিম কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উদযাপন এখন আর হয় না। কুমোররা মারুতি, বিথোবা, রাখুমাঈ ও অন্য স্থানিক দেবতাদের ভক্ত এবং হয় নিজেরাই পৌরোহিত্য করে সরাসরি পুজো দেয় অথবা উচ্চবর্ণের পুরোহিত (মারাঠা গুরব বা এমনকী ব্রাহ্মণ) ভাড়া করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গোটা দেশের অজস্র

গ্রামেই কুমোর জাতের লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলিতে (যেমন বিবাহে বা শ্রাদ্ধে) পুরোহিত বা তার সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে—বিশেষ করে, সমাধিস্থ করার সময়। কৃষক জাতগুলি তো এদের ডাকাটা অবশ্যকর্তব্য মনে করে, এমনকী ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের না ডাকলেও। গ্রামাঞ্চলে মাটির বদলে টিন ও সস্তা ধাতুর টেকসই বাসন চালু হওয়ায় ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ-অর্থনীতি কুমোর পরিবারগুলিকে তাড়িয়ে আনছে পুনা শহরে। সেখ সাল্লার দরগার রাস্তা পেরোলেই, পুরোন ধ্বংস হয়ে যাওয়া আরক্ষ-প্রাচীরের ওপর গড়ে ওঠা কুমোর পাড়া চোখে পড়বে; তাদের চাকার নীচে পুরানোকালের দরজা বা জানালার খিলান আজও দৃশ্যমান। অর্থনৈতিক চাপে এই শিল্পের সবচেয়ে সচ্ছল ধারাটিও শুকিয়ে গেছে—কেননা ম্যাঙ্গালোরের কারখানায় তৈরি টালি রেলে চেপে এসে তাদের টালির বাজার দখল করেছে। কিছু মজুর ভাড়া করে ইঁট তৈরি করাটাও এখন পুঁজিওলা ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত, যদিও দু-পুরুষ আগেও এটা ছিল কুমোরদেরই একটি শাখার একচেটিয়া পেশা।

এই সমস্ত উদাহরণ প্রমাণ করে যে, ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক আত্তীকরণটা হল যুগ যুগ ধরে চলে আসা এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যে কারণে তার সন-তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। যেহেতু, নতুন সমাজ গঠনকালে উন্নত ও পশ্চাদপদ উভয় অংশই এখানে পরস্পরের সাহায্য নিয়েছে তাই নীচের তলায় কোন হিংস্র সংঘাতও বাধেনি। এ বিষয়ে সব অনুপুঙ্খগুলিকে হয়ত যথাযথ ইতিহাস-সম্মত মাপকাঠিতে বিচার করা যাবে না—কিন্তু সেগুলিকে চিন্তাশীল ইতিহাস-অনুসন্ধানে মূল্যহীন ভেবে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা বা বাতিল করে দেওয়ার অর্থই হল আমাদের সংজ্ঞায়িত ইতিহাসের সূত্র ও উপাদানগুলিকে যুগপৎ আড়াল করা।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. উপজাতিদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে এন্‌থোভেন ও অন্যান্যদের লেখায়। দ্রষ্টব্য ঃ এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ১১ নম্বর টীকা।

২. ডাং-রা কাঠ কাটে, কাঠকারি-রা কাঠকয়লা পোড়ায় এবং মজুরি হিসেবে কুঁড়ো নিয়ে ধান ভানে। আসামের চা বাগানগুলোয় অধিকাংশ মজুরই নেওয়া হয় উপজাতিদের মধ্য থেকে; কেবল সংলগ্ন এলাকার উপজাতি-মজুরই নয়, ছোটনাগপুরের মতো দূরাঞ্চল থেকেও নিয়ে আসা হয়। এদের কেউই ধারাবাহিক শ্রমের কাজ পছন্দ করে না। যাদের এ কাজে নিয়ে আসা হয় অনেকপুরুষ আগে তারা কৃষি বা অন্য কোন পেশাগত জাতে নিজেদের রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু এমন সম্ভাবনাও প্রতিবছর কমে আসছে। বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষেতমজুরের পেশা নেওয়া ছাড়া এদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।

৩. বিভিন্ন স্মৃতিসৌধে ব্যবহৃত কাঠে গাঁটের যে গোল দাগ তার অনুক্রম নির্ণয়ের পদ্ধতিকেই বলে Dendrochronography। উইপোকা এবং আবহাওয়ার কারণে ভারতে এ কাজটা দুরূহ। কার্বন-১৪ পরীক্ষা কার্যকরী—কিন্তু তা যথেষ্ট নিখুঁত নয় এবং 'পরীক্ষামূলক' পরমাণু বিস্ফোরণগুলির কারণে করাটাও শক্ত।

৪. হেনরি ফ্র্যাংকফোর্ট ঃ 'স্টাডিজ ইন দি আরলি পটারি অফ দি নিয়ার ইস্ট' [আর অ্যানথ্রোপলজিকাল ইনস্‌টিটিউশন, লন্ডন, *অকেশনাল পেপার্স* ৬(১৯২৫), ৮(১৯২৭)]। এ

লেখায় মেসোপটেমিয়ার মৃৎপাত্র বিষয়ে যে নির্দেশিকা আছে তা এখনও পর্যন্ত অবিতর্কিত। আর ই এম হুইলার ১৯৪৫ সালে আরিকামেদুতে খনন কার্য চালিয়ে ভারতবর্ষে এই পদ্ধতির বিস্তার ঘটান এবং ভারতীয় স্তরে অ্যারেটাইন (ইতালীয়) মৃৎপাত্রের অস্তিত্ব নজরে আনেন। মেসোপটেমিয়ার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে দ্রষ্টব্য ঃ সিটন লয়েড ঃ *ফাউন্ডেশন ইন দি ডাস্ট* (পেলিকান বুকস, এ-৩৩৬)। জার্মো ও মেলেফাত-এ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলিকে সুপ্রাচীন হাসুনা মৃৎপাত্রের সঙ্গে মেলালে মেসোপটেমিয়ার মৃৎপাত্র-পূর্ব যুগ থেকে শিক্ষিত নগর সভ্যতার কালপরম্পরা ধরা পড়ে।

৫. ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত *আর্কিওলজি ইন ইন্ডিয়া* (১৯৫০) এবং *এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া*-৯-এ একটা ভাল সমীক্ষা করা হয়েছে। *এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া*-র (এখনও পর্যন্ত যার প্রথম ১১টি সংখ্যা আমি পেয়েছি) বিশেষ রচনাগুলিও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা বলে যথেষ্ট মূল্যবান। এফ আর আলচিন-এর (অনু. অল-ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স, ১৯৫৫) *নিওলিথিক কালচার ইন ইন্ডিয়া ঃ এ রি-সার্ভে অফ এভিডেন্স*-এ অধিকাংশ প্রাপ্ত তথ্যগুলির সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। শ্রী এবং শ্রীমতি আলচিন-এর সঙ্গে আলোচনাতেও আমি উৎসাহিত হয়েছি। প্রস্তরযুগের হাতিয়ারগুলি পরীক্ষার কাজে এবং পুরনো ধরনের পারিভাষিক শব্দগুলির সংশোধনেও এঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

৬. তুলনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ খাজা মুহম্মদ আহমেদ ঃ *প্রিলিমিনারি এক্সক্যাভেশনস অ্যাট প্রি-হিস্টোরিক সাইটস্ নিয়ার জানামপেট*; এটি একটি তারিখবিহীন, ভাসা ভাসা রিপোর্ট। বিভিন্ন কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে বেশ কিছু কাজ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সবই অগোছাল ধরনের। কোন পাঠক যদি তাঁর নিজের উদ্যোগে খননের কাজ চালাতে চান তাহলে তাঁর প্রথম পড়া উচিত এল উলি-র *ডিগিং আপ দি পাস্ট* (পেলিকান এ-৪) এবং হুইলার-এর *আর্কিওলজি ফ্রম দি আর্থ* (পেলিকান এ-৩৫৬)—ভারতের খননকাজে যেগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে। শুধু একটাই সতর্কতার বিষয় যে, আধুনিক ভারতীয় প্রকৌশলগুলি (যেমন, কুমোরশালার) সম্পর্কেও জানতে হবে।

৭. এ বিষয়ে সবচেয়ে ভাল বর্ণনা আছে—এইচ দ্য তেররা ও টি টি প্যাটারসন ঃ *স্টাডিজ ইন দি আইস এজ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড হিউম্যান কালচারস্*-এ, যেখানে প্রাচীনতম স্থানগুলিরও সমীক্ষা করা হয়েছে।

৮. বাঙ্গালোর থেকে মাগাদি যাওয়ার পথে, ১৯৩১ সালে মালিকানা পাওয়া জনৈক মিসাক্স-এর একটি ফার্মের কথা আমার ভালভাবেই জানা আছে।

৯. ড. সি ভি নটরাজন আমাকে শিলাখণ্ডটির কথা জানান। কিন্তু আমি গুহাটি পরীক্ষা করতে পারিনি। এ বিষয়ে কোন বর্ণনাও কোথাও পাইনি।

১০. ফ্রয়েডের *টোটেম অ্যান্ড টাবু*-র তত্ত্ব যে জাতিবিদ্যার আলোয় কতখানি অবৈজ্ঞানিক তা প্রমাণের জন্য শুধু এটাই যথেষ্ট। বি মালিনস্কি তাঁর *ডায়নামিকস অফ কালচারাল চেঞ্জ* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে 'অয়দিপাউস কমপ্লেক্স' এবং তৎসম্পর্কিত 'অজাচার-প্রবণতা' মাতৃকুল-সম্পর্কান্বিত (matrineal) বা পুত্রিকা-ভর্তা (matrilocal) সমাজে অন্য কিছুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, একসময় মামারা গৃহ ও শিশুদের ওপর কর্তৃত্ব করত,

এখন যেটা বাবারা করে।

১১. গোয়ার ঘনবসতিপূর্ণ বারডেজ্ অঞ্চলে মেয়েরা এখনও তাদের ছোট ছোট জমিগুলিকে ভাড়াটে লাঙ্গলের আওতায় না এনে কোদাল দিয়ে চাষ করে। এখানকার অধিকাংশ পুরুষই রোজগারের জন্য বাইরে চলে যায় এবং সেখান থেকে টাকা পাঠায়; অর্থাৎ কোদাল-সংস্কৃতিটা যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসছে তা নয়—বরং তার বিপরীত। অন্যদিকে, গোয়ার সংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চলে এখনও ঝুমপ্রথায় চাষ চলছে—জঙ্গল পুড়িয়ে সার বানানো এবং কোদাল দিয়ে মাটি উল্টে *ন্যাকনি* (*Eleusine coracana*) শস্য বোনা। এই পদ্ধতিতে জমি তৈরি ও বীজ বোনার কাজ এক বা দু বছর চলে, তারপর বন্ধ রাখা হয় জমির উর্বরতা হ্রাস পাওয়ার কারণে, যাকে বলে 'কুম্ভের' এবং এটা করে মূলত স্থানীয় *গাবাদাস*-রাই—যারা ক্ষেতমজুরির কাজও করে এবং লাঙ্গল-চাষ পদ্ধতিও জানে।

১২. মহারাষ্ট্রের ৮৫ শতাংশ মানুষের মধ্যে মনে হয়, কন্যাপণ দেওয়ার রীতি আছে—যেমন, বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিধবা বিবাহও চালু। উচ্চবর্ণ—বিশেষ করে, ব্রাহ্মণরা শেষোক্ত দুটি প্রথার বিরোধী এবং তারা বরপণ দেয়। আধুনিক আইন, মনে হয়, কন্যাপণ বা বরপন এই উভয় প্রথাকেই কিছুটা অশোভন করে তুলেছে।

১৩. বাস্তের অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় বহু শতাব্দী ধরে নরবলির প্রথা চলে আসছে আজ পর্যন্ত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোয় বিক্ষিপ্তভাবে নরবলির খবর এখনও প্রায় প্রতিবছর শোনা যায়। ঠগেরা এই ধর্মীয় প্রথার সুযোগ নিয়ে অবাধ লুঠপাটের কারবার চালিয়ে এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে দ্রুত ঠগী দমনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। স্যর জে উডরোফ তাঁর *শক্তি অ্যান্ড শাক্ত* (মাদ্রাজ ও লন্ডন, ১৯২০, পৃ ৬১) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "নরবলির ধর্মীয় প্রথা বিষয়ে অনুসন্ধানে দেখা যাবে তন্ত্রশাস্ত্রের 'কালিকল্পলতা' অনুসারে একমাত্র রাজাই পারে নরবলি দিতে (*রাজা নরবলিম দাদ্যন ন্যান্যোপি পরমেশ্বরী*), এবং তাতে, অন্তত 'তন্ত্রসার'-এর কথামতো, কোন ব্রাহ্মণ অংশ নিতে পারবে না (*ব্রাহ্মণম নর-বলি দানে নাধিকারঃ*)।" আবার, *স্কন্দপুরাণে*-র (সম্পা. জে গারসন দ্য কুন্হা, (বোম্বে, ১৮৭৭, পৃ. ৩০) সহ্যাদ্রিখন্ডে উল্লেখ আছে যে, কয়না-সঙ্গমের দক্ষিণে করহাডা ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেবীমাতৃকার কাছে ব্রাহ্মণ-বলি দেওয়ার প্রথা ছিল। এমনকী, গত শতাব্দী পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে এই সন্দেহ প্রচলিত ছিল (উইলস্ন ঃ *ইন্ডিয়ান কাস্টস্*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২; উব্লিউ ক্রুক ঃ *দি পপুলার রিলিজিয়ন অ্যান্ড ফোক্-লোর অফ নর্দার্ন ইন্ডিয়া*, লন্ডন, ১৮৯৬, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৯-১৭৯)। প্রথাগুলির এই সমস্ত অবশেষ থেকে বোঝা যায় যে পালনীয় উৎসব-অনুষ্ঠানগুলোয় ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রের কী অসাধারণ প্রভাব ছিল; আবার, একই সঙ্গে এক অদ্ভুত অন্যোন্যসাপেক্ষতা—যার ফলে কখনও কখনও উচ্চতর শ্রেণীও বিপরীতে হেঁটেছে। আসল কথাটা হল, উৎপাদনের পদ্ধতি যতদিন আদিম অবস্থায় ছিল ধ্যানধারণাগত উপরিকাঠামোয় কোন বৃহত্তর মৌলিক পরিবর্তন আনাও ততদিন দুরূহ ছিল। সুতরাং, ধ্যানধারণাগুলির যে আদান-প্রদান তা সামাজিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই অপরিহার্য ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

সিন্ধু উপত্যকায় সভ্যতা ও বর্বরতা

সুমেরীয় সভ্যতার উদ্ভব সিন্ধুনদের তীরে হয়ে থাকতে পারে—এইচ আর হল-এর এই ধারণার সমালোচনা করে এ বি কেইথ মন্তব্য করেছিলেন ঃ "সুমেরীয়রা যদি দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত হয় এবং সিন্ধু উপত্যকায় এক উন্নত সভ্যতা অর্জন করে থাকে—তাহলে মনে রাখতে হবে যে এই উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব ভারতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি; বরং, যতদূর জানা গেছে, সেখানে লিপিরই প্রচলন ঘটেছিল সেমাইটদের কাছ থেকে এবং তা-ও ৮০০ খ্রী. পূ.-এর আগে নয়। তাছাড়া, পাথরের ঘরবাড়ি তৈরি বা নগর পত্তনের কাজও তারা শিখেছিল ঋগবেদের যুগেরও বহু পরে।"[১] ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, বেহুঁশ সমালোচক যখন তাঁর এই বাক্যবন্ধগুলি রচনা করছিলেন, ঠিক তখনই, প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সিন্ধু উপত্যকায় সুমেরীয় সভ্যতার অনুরূপ এক উন্নত নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হল; এবং উল্লেখ্য, তা পাথরের নয়, ইঁটের।

৩.১ আবিস্কৃত প্রধান দুই নগরীর[২] পরিকল্পনা, বিন্যাস, আয়তন ও স্থাপত্যে লক্ষণীয় রকমের মিল আছে (অন্তত ইঁটচোরদের লুঠপাঠ ও এলোপাথাড়ি খননের পরও যেটুকু দেখা যায়)—যদিও আকাশপথে এ দুটির পারস্পরিক দূরত্ব প্রায় চারশ' মাইল। উত্তরের হরপ্পা নগরীটি হল পাঞ্জাবের মন্টগোমারি জেলায় এবং এর পাশ দিয়ে একসময় রাভি নদী বয়ে যেত। দক্ষিণের মোহেঞ্জোদারোর অবস্থান ডোক্‌রি থেকে সাতমাইল দূরে সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলায়; এক সময় এটা ছিল সিন্ধুনদের তীরে—যে নদ, সম্ভবত হিমালয়ের ক্রম উত্থানে সানুদেশে ঢাল সৃষ্টি হওয়ায়[৩], গতিপথ পাল্টেছিল। বিস্ময়কর এই ধ্বংসাবশেষ থেকে বোঝা যায় যে মূল দুটি নগরীরই আয়তন ছিল প্রায় এক বর্গমাইল করে—যদিও জলবায়ু, ও মনুষ্যকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরও যে স্তূপগুলি টিকে আছে তার সবকটির উদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। একশো বছর আগেও হরপ্পার প্রায় আধ বর্গমাইল এলাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল, অবশ্য প্রাচীরটি ছিল নিশ্চিতভাবেই মধ্যযুগীয় নির্মাণশৈলীর। মোহেঞ্জোদারোতেও প্রাচীর ও নদীবাঁধের ধ্বংসাবশেষ মিলেছে এবং

সম্ভবত তা আদি পত্তনের সময়কার। দু'টি নগরীই ছিল ঘন বসতিপূর্ণ, কিন্তু আধুনিক ফুসফুস বা পার্কের মত কোনকিছু দিয়ে বিঘ্নিত নয় বরং এক সযত্ন পরিকল্পনায় স্থাপিত। প্রধান রাস্তাগুলি ছিল যথাযথভাবেই পরস্পরের সমকৌণিক যা থেকে আবার সরল সরু শাখাগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেছে। যে বাড়িগুলির অস্তিত্বের কথা জানা গেছে—সাধারণভাবে সেগুলি ছিল বিশালাকার এবং পরস্পর সংলগ্ন সারিতে সাজানো (অবশ্য তা মোহেঞ্জোদারোতেই; হরপ্পায় ধ্বংসটা খুব বেশি হয়েছে)। ম্যাকে যেটিকে মোহেঞ্জোদারোর প্রাসাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (ডি কে অঞ্চলের ১নং ব্লক) ১৮০$'$ × ৭০$'$ আয়তনের সেই শ্রেষ্ঠীগৃহটি প্রকৃতপক্ষে চারপাশের অন্য শ্রেষ্ঠীগৃহগুলির তুলনায় খুব সামান্যই বড়। বাড়িটির উত্তরের দেওয়ালটি পুরোটাই পোড়া ইঁটের তৈরি এবং তার কোন কোন অংশ প্রায় সাতফুটের মত চওড়া। এই ধরনের চওড়া দেওয়াল এখানকার নির্মাণশৈলীর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ থেকে, এবং সিঁড়িগুলির ভগ্নাবশেষগুলির কথা ভাবলে দোতলা বা তার চেয়ে উঁচু বাড়ির অস্তিত্বের ব্যাপারটা বোঝা যায়। বাড়ির মেঝে (বা সমতল ছাদ)-র ভার রাখার জন্য যে মোটা কাঠের কড়ি-বরগা—তার জন্য দূরবর্তী হিমালয়ের গাছ কেটে আনা হত। প্রতিটি বড় বাড়িতেই সুন্দর বাঁধানো উঠোন, কূয়ো, স্নানাগার ও শৌচাগার ছিল। এসব ছাড়াও মেসোপটেমিয়ার নগরীগুলির তুলনায় এখানকার আরও একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তা হল—এক সুন্দর নিকাশি ব্যবস্থা, যার সাহায্যে বৃষ্টির, স্নানের বা নর্দমার ময়লা জল বাড়িগুলি থেকে জলাধারগুলিতে এনে ফেলা হত এবং সেগুলিও নিশ্চিতভাবেই নিয়মিত পরিষ্কার করা হত। বসতিকালে এখানকার ভূমিস্তর ৩০ থেকে ৫০ ফুট উঁচু হয়েছে—অর্থাৎ, এই পর্যায়কালটা অন্তত ৫০০ বছরের কম ছিল না এবং সম্ভবত তা ছিল প্রায় ১৫০০ বছর, কেননা সাধারণভাবে কাঁচা ইঁটের ব্যবহার হত না, হলে তা ধুয়ে গিয়ে ভূস্তরকে আরো উঁচু করে দিতে পারত। বাড়িগুলির গড়নের যদিও পরিবর্তন ঘটেছে—কুয়োগুলি কিন্তু একই ধরনের থেকে গেছে; কূয়োমুখের বেষ্টনীগুলি আবিষ্কৃত উঠোনে এখনও স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে। এত শতাব্দী পরেও রাস্তাগুলির সীমানায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি—যা মেসোপটেমিয়া, গ্রীস বা রোমের সঙ্গে তুলনায় আরও একটা স্বাতন্ত্র্য। অবশ্য, বড় যে বাড়িটির কথা বলা হল, সব বাড়িই যে সেরকম শৌখিন ছিল তা নয়, বরং পাল্লার বিপরীতে সার বাঁধা দু' কামরার বাড়ি ছিল—যেগুলির প্রতিটির আয়তন ১২$'$ × ২০$'$ এবং দেওয়ালগুলি এত সরু যে, বোঝা যায়, তাতে একতলার বেশি গাঁথা যেত না। খননকারীরা এ জায়গাটির নাম দেন 'কুলি লাইন' এবং এই আধুনিক নামকরণে তাঁদের উদ্ভাবন ক্ষমতারই পরিচয় মেলে—যদিও, এমন আর কিছু ব্যাখ্যা মেলে না যা কোন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের মগজ অতিক্রম করে যায়। তাঁরা আমাদের জানান যে, এই যমজ নগরীদুটি একই রাজ্য বা সাম্রাজ্যের অংশ—যেখানে আমলাতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, বুর্জোয়াশ্রেণী, বাজার এবং ইত্যাদি ইত্যাদি সবই ছিল এবং তার যাবতীয় প্রমাণ হিসেবে দেখান হয় যে, দুটি নগরীই দুটি বিচ্ছিন্ন দুর্গ এলাকা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হত—যে এলাকার সৌধগুলি প্রথমদিকে সম্ভবত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলেও পরে দুর্গে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং নগরীর পশ্চিমে প্রসারিত আনুমানিক ৫০ ফুট উঁচু বাকি এলাকা থেকে (মাটি ফেলে ও পোড়া ইঁট গেঁথে তৈরি সমতল) এগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা যেত। আদি ভূমিস্তরে পৌঁছানোটা কেবলমাত্র হরপ্পার একটি অঞ্চলেই সম্ভব হয়েছে। সেখান থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে নগরীদুটি তাদের জন্মলগ্ন থেকেই ছিল প্রায় পরিপূর্ণ এবং নগরসভ্যতার

যাবতীয় আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য তাদের সমগ্র অস্তিত্বকাল জুড়ে অপরিবর্তিতভাবেই ছিল—কেবলমাত্র কালানুবর্তী অন্তঃক্ষয় ছাড়া, যা ত্বরিত সমাপ্তিতে এসেছিল এক আকস্মিক হিংস্র বহিরাক্রমণে—রাস্তায় এবং কিছু কিছু বাড়িতে ছড়িয়ে থাকা গণনিহত বাসিন্দাদের কঙ্কাল যার সাক্ষ্য বলে মনে করা যায়।

আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি যাচাই করতে এই নগরী দুটি একটা ভাল ভূমিকা নিতে পারে। যদিও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ যা পাওয়া গেছে তা কোনক্রমেই সম্পূর্ণ নয়, সন্তোষজনকও নয়। কিছু কিছু নিদর্শন এই যুগের অব্যবহিত পরের 'হিন্দু' মূর্তিপ্রথা বা রীতিনীতির কথা মনে করিয়ে দেয়; স্পষ্ট বোঝা যায়, একটা ধারাবাহিকতা কোন সংঘাতময় বাধার মুখোমুখি হয়েছিল। ভারতবর্ষে প্রকৃত নগর পত্তন ছিল *ঋগবেদ*-উত্তর যুগের ঘটনা--কেইথ-এর এ মন্তব্যের সারমর্মটি সঠিক। সুতরাং, এর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য আমাদের অবশ্যই তৎকালীন মেসোপটেমিয়ার তুলনীয় দৃষ্টান্তগুলির দিকে, আবিষ্কৃত উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির দিকে এবং ধ্বংসোত্তীর্ণ উপসংহারগুলির দিকে তাকাতে হবে। সে যুগে লিপির প্রচলন ছিল। এটাও প্রমাণিত যে নগরীদুটির পত্তন মেসোপটেমিয়ার সারগন যুগের আগে হয়েছিল। জানা গেছে, সোনা, রূপা, অলঙ্কার—এসব ঘরের মেঝেয় পুঁতে রাখা হত (একটি ক্ষেত্রে অন্তত 'কুলি লাইনে'র এক বাসিন্দা চুরি করে রেখেছিল)। তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ব্যবহার করা হত, যদিও সুনির্মিত পাথরের সরঞ্জামেরও প্রচলন ছিল। প্রচুর পরিমাণ সূতিবস্ত্র তৈরি ও রঙ করা হত তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। বড় চাকার সাহায্যে (চাকতি-র সাহায্যে নয়) চমৎকারভাবে মাটির পাত্র তৈরি করা হত—যেগুলি ছিল ব্যবহারের দিক থেকে উপযোগী, প্রমাণাকার এবং সাধারণ নকশা বা একেবারেই নকশা ছাড়া গণ-উৎপাদন। বাসিন্দারা যব, গম, ধান এবং তিল (যা আজও উত্তরভারতে ভোজ্য তেলের বীজ হিসেবে প্রচলিত)-এর ব্যবহার জানত। আপাতভাবে মনে হয়, কুঁজবিশিষ্ট গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি পালন করা হত এবং প্রথমোক্ত প্রাণীটিকে ভারী চাকার গাড়ি টানার কাজে লাগানো হত—অন্তত মাটি বা ব্রোঞ্জের তৈরি মডেলগুলি থেকে এমনটা প্রমাণ করা যায়। অবশ্য, সীলমোহরে হাতি বা ষাঁড়ের ছাপও আছে—যা থেকে প্রমাণিত হয় না যে সেগুলি গৃহপালিত ছিল, কেননা তাহলে একই ধরনের প্রমাণ থেকে বাঘ বা গন্ডার সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠবে। সীলমোহরে অনেক হাঁসজারু গোছের প্রাণীরও খোদাই আছে, যেগুলি হাতি, ষাঁড়, ভেড়া, বাঘ, মাছ ইত্যাদির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিশিয়ে তৈরি—সুতরাং তা দিয়ে তৎকালীন বাস্তবতাটা বোঝাতে যাওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু নগরীর ব্যবসায়িক কাজকর্ম নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, কেননা এখানকার প্রতিটি খননেই নিখুঁতভাবে তৈরি একই ধরনের বাটখারার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। কতকগুলি বাটখারা এতই ছোট যে নিশ্চিতভাবে সেগুলি কোন মূল্যবান সামগ্রীর নিখুঁত পরিমাপের জন্যই ব্যবহৃত হত। দাঁড়িপাল্লাগুলি থেকে বোঝা যায় যে পরিমাপ পদ্ধতির মূল একক ছিল চার* এবং দশ—ব্যাবিলনের ক্ষেত্রে যেটা ছিল ছয় এবং দশ। স্থিতিশীল

* এই চতুর্গুণক প্রথা আজও টাকা, মন বা সের-এর বিভাগগুলির মধ্যে বর্তমান এবং তা গোনার জন্যে পরপর আনুভূমিক ও উল্লম্ব দাগ কেটে কেটে হিসেব রাখা হয়। হাতের চারটি আঙুল বা আঙুলের চারটি গাঁট গোনার প্রচলনও আছে এবং বুড়ো আঙুলটিকে কেবলমাত্র কতবার গোনা হল তার হিসেব রাখতে ব্যবহার করা হয়। ভারতের প্রত্যন্ত হাটগুলিতে এই প্রথায় লেনদেন এখনও টিকে আছে।

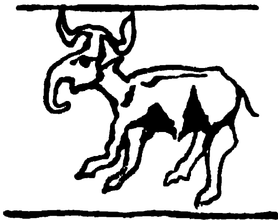
সিন্ধুসভ্যতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই ছিল তার সম্প্রসারণের অক্ষমতা। দাক্ষিণাত্যে বা গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাদের কোন বসতি ছিল না—কেননা সেখানে বসতি স্থাপনের জন্য জঙ্গল হাসিলের প্রয়োজন ছিল। এমনকী খোদ সিন্ধু উপত্যকাতেও অধিকাংশ বসতি ছিল ছোট ছোট গ্রামে, অর্থাৎ সেখানেও বিস্তারটা হয়ে পড়েছিল সীমিত।

৩.২ ভারতের মতো বর্ষানির্ভর দেশে যেখানে অক্টোবরের মাঝামাঝি শেষ হওয়া ১৮ সপ্তাহের বৃষ্টিপাতই প্রধান ভরসা সেখানে সম্বৎসর জলের প্রয়োজনে নদী-উপত্যকা অঞ্চলেই প্রথমদিকে জনবসতি কেন্দ্রীভূত হবে—এটাই স্বাভাবিক। প্রধান নদ-নদীগুলির মধ্যে—ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তিস্থল দেশের বাইরে অবস্থিত উত্তুঙ্গ পর্বতমালা; উত্তরভারত সিন্ধু ও গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চল; নর্মদা ও মহানদী বিধৌত করে দাক্ষিণাত্যের নিম্নাংশকে এবং ত্রিভুজাকৃতি এই অঞ্চলের মাঝ দিয়ে বয়ে যায় কৃষ্ণা-গোদাবরী; দক্ষিণের প্রান্ত এলাকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নদী হল কাবেরী। তা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র সিন্ধুর তীরেই এক অসামান্য নগরসভ্যতা বিকশিত হল—আর বাকি সারা দেশে বাস করল নগণ্য সংখ্যার বর্বর জনগোষ্ঠী—খাদ্য-সংগ্রাহক হয়েই যারা কায়ক্লেশে দিন কাটাত! এটাই ছিল অনিবার্য। নীলনদের তীর ও মেসোপটেমিয়ায় বিশিষ্ট সভ্যতাগুলির সমান্তরাল বিকাশ ঘটল—অথচ মিসিসিপির তীরে গত শতাব্দী পর্যন্ত কোন জনবসতি ছিল না, এমনকী আমাজনের তীরে আজও নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, সভ্যতার বিকাশের পক্ষে শুধুমাত্র নদীই যথেষ্ট নয়। প্রথমযুগের নদীতীরবর্তী নগর সভ্যতাগুলির একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল যে সংশ্লিষ্ট নদীগুলি ছিল মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। আমাজনের তীরের ঘন জঙ্গল উন্নত হাতিয়ার ছাড়া হাসিল করা সম্ভব নয়, মিসিসিপির তীরবর্তী ঘাসের ঘন ঝাড় ওপড়ানো সম্ভব হয়েছিল ভারি লাঙ্গলের সাহায্যেই—যা গত শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সেখানে পৌঁছয়নি। তাই, এই দুই নদীর তীরের আদিম মানুষ যে খাদ্য-সংগ্রহকারীর অনিশ্চিত জীবন থেকে সরে এসে চাহিদাপূরণের মতো খাদ্য উৎপাদন করবে—তেমনটা সম্ভব ছিল না। মরুভূমি অঞ্চলই ছিল উপযুক্ত, কেননা সেখানে জঙ্গল কাটতে হত না। এর বিকল্প হতে পারত উৎকৃষ্ট দো-আঁশ মাটির ভূখণ্ড—যেমনটা দানিয়ুব-এর ক্ষেত্রে হয়েছিল; সেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগে নগর সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ছাড়াই যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। নব্য প্রস্তরযুগের মানুষের পক্ষে পাথরের হাতিয়ার দিয়ে উষ্ণ অঞ্চলের ঘন জঙ্গল হাসিল করা সম্ভব ছিল না—বিশেষ করে গাঙ্গেয় উপত্যকার পলিমাটিতে। তাই, মরু অঞ্চলেই প্রকৃত অর্থে কৃষির বিকাশ ঘটেছিল এবং সম্ভবত চহিদা পূরণের পর কিছু উদ্বৃত্তও—যার ফলে কাঠ ও ধাতুর মতো বস্তুর সন্ধান শুরু হয়েছিল, যা বিনিময় প্রথায় নদীপথগুলির মধ্য দিয়ে আদান-প্রদান হত। এই মরুবাস একদিকে যেমন বন্য শ্বাপদের হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই বন্য মানুষদের আক্রমণের হাত থেকেও—অবশ্য যদি না শুষ্ক মরু পেরিয়ে আক্রমণ করার মতো যথেষ্ট উন্নত সামরিক কৃৎকৌশল তাদের কারো আয়ত্তে থাকত। সিন্ধু তীরের উন্মেষকালকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

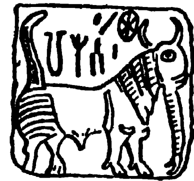
হতে পারে, নদীতীরস্থ এই উন্নত সভ্যতার বীজ উপ্ত হয়েছিল মরুমধ্যস্থ প্রাচীরবেষ্টিত গ্রামগুলিতে—যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ, আনুমানিক ৭০০০ খ্রী. পূ.-এর জেরিকো (ক্যাথলিন কেনিয়ন ঃ *ডিগিং আপ জেরিকো,* লন্ডন ১৯৭৭)। কিন্তু প্রাক্-মৃৎশিল্প যুগের এই সভ্যতার

কারিগরি ও সমাজ সংগঠনের সঙ্গে প্রথম যুগের সাধারণ নগরীগুলির বিস্তর ব্যবধান (*অ্যান্টিক্যুইটি*, ১৯৫৬, ১১৯, ১২৯, ১৩২-৬; ১২০, ১৮৮-৯৭, ২২৪-৫ এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

সিন্ধু ও মেসোপটেমিয়া—নদী উপত্যকার এই দুই সভ্যতার অন্তঃস্তরগুলির মধ্যে (সংস্কৃতি ও কারিগরির দিক থেকে) একটা সাধারণ সাদৃশ্য আছে[৪]—যা পরিমাপবিদ্যা ও খোদাই-এর


চিত্র ৬(ক)


চিত্র ৬(খ)

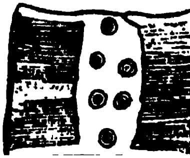

চিত্র ৬(গ)

চিত্র ৬ : ষণ্ড-হস্তী : (ক) জেমদেত-নাসর-এর সীলমোহরে এবং (খ,গ) সিন্ধু নগরীর যথাক্রমে তামার পাত ও ছাপমারা সীলমোহর।

বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন, গ্রীক হেরাক্লিসের অনুকরণে তৈরি নগ্ন, শ্মশ্রুমণ্ডিত, সিংহহন্তা বীর গিলগামেশ-এর খোদাই সিন্ধু উপত্যকাতেও পাওয়া গেছে—যদিও তা স্বতন্ত্র এক স্থানিক শিল্পরীতিতে; গিলগামেশের সহচর বৃষ-মানব এন্‌কিড (বা এয়া-বানি)-ও সিন্ধুর সীলমোহরে আঞ্চলিক শৈলীতে উপস্থিত। জেমদেত-নাসর যুগের ষণ্ড-হস্তী (চিত্র ৬ক) মিশ্ররূপের একটি খোদাই দেখলে বোঝা যায় যে তা নিশ্চিতভাবে কোন মেসোপটেমিয়ান শিল্পীর দ্বারা ভারতীয় বিষয় (চিত্র ৬খ, ৬গ) থেকে আহৃত হয়েছিল। সুমেরীয়দের আদি বাসভূমিতে সম্ভবত আরাট্টা নামে অভিহিত করা হত (*সায়েন্টিফিক আমেরিকান,* অক্টোবর ১৯৫৭-সংখ্যায় এস এন ক্রামার-এর লেখা দ্রষ্টব্য)—যার সঙ্গে হেরার্ট এর শব্দগত সাদৃশ্য আছে এবং সংস্কৃত আরাত্তা-র—যা দিয়ে রাওয়ালপিন্ডির নিকটস্থ পাঞ্জাবের একটি অঞ্চলকে বোঝানো হত। মিশ্ররূপ-সমন্বিত মূর্তি ভারতবর্ষে বহুযুগ ধরেই প্রচলিত; ঐতিহাসিক যুগে তান্ত্রিক গজপ্রস্‌ভ-র রহস্যময় অস্তিত্বের কথা আমরা জানি। বস্তুত, এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে সিন্ধু-র শিল্পকলা ও চিত্রলিপিগুলির একটা বড় অংশই হিন্দু ধর্মের তান্ত্রিক প্রকরণগুলির[৫] সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত—যে প্রকরণগুলি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি সময় থেকে প্রকাশযোগ্যভাবে নথিভুক্ত হতে শুরু করে, তার আগে পর্যন্ত সেগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবেই গুহ্য বিষয়। এমনকী, আজ পর্যন্ত এই গুহ্যতার পুরোপুরি বিলোপ হয়নি। সিন্ধুর সীলমোহরগুলিতে যে চতুর্হস্তবিশিষ্ট প্রতীক তা আজও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিতে স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও সুমেরীয় বা হিটটাইট সঙ্কেত লিপিগুলির সাহায্যে সিন্ধুর সীল-রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা সফল হয়নি[৬] এবং ইস্টার আইল্যান্ড বা মাওরিদের প্রতীকগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য সত্ত্বেও কোন সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। নথি হিসেবে যা পাওয়া গেছে তা হল সীলমোহরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সেগুলির পাঠোদ্ধার যদি সম্ভবও হয় তাহলেও খুব বেশি তথ্য পাওয়া যাবেনা। নথিপত্রের

এই স্বল্পতার কারণ হিসেবে একটা অভিমত হল যে সিন্ধুসভ্যতার মানুষেরা তালপাতায় লিখত। অন্য কোন ধরনের খোদাই[৭] বা কোন দ্বিভাষিক সীলমোহরের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। কেবলমাত্র একটি শিলালেখই পাওয়া গেছে যা সম্ভবত সিন্ধুলিপি ও অশোকের যুগের ব্রাহ্মীলিপির[৮] মধ্যবর্তী কোন এক পর্যায়ের। সুতরাং, প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে শিলালিপিকে মেলানোর অতিপ্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ এখানে নেই।

বিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগের এমন কোন নগর সভ্যতার কথা জানা যায়নি যেখানে শ্রেণীবিভাজন ছিল না। সুতরাং, সিন্ধুর নগরীগুলির শ্রেণীকাঠামোর (সেই সঙ্গে উৎপাদন কাঠামোরও) চরিত্র নির্ণয় আমাদের করতে হবে সরাসরি নিদর্শনগুলি থেকেই, কোন লিখিত বিবরণীর সাহায্য আমরা পাবোনা। হরপ্পা এবং মোহেঞ্জোদারোতে যে সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাজন ছিল তা সেখানকার আবিষ্কৃত বাসস্থানগুলি থেকেই প্রমাণ হয়। বিশেষ করে, সেখানে পৌরসঙ্ঘ বা মন্দিরের বিশাল বিশাল গুদামঘর ছিল—যার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল শস্য পেষাই-এর চাতাল। কাঠের ঢেঁকির যে অবশেষ পাওয়া গেছে—তা থেকেও প্রমাণ হয় যে সেখানে শস্য পেষাই হত। আবার ঘরে ঘরেও যে শস্য ভাঙানো হত তা বোঝা যায়, প্রতি বাড়িতেই শিল-নোড়ার অস্তিত্ব থেকে—বড় গুদামগুলিতে যা নেই। বড় গুদামগুলির সঙ্গে সংলগ্ন ছিল ঘিঞ্জি ব্যারাক-ধরনের বাসগৃহ—সমান্তরাল মেসোপটেমিয়ার আবিষ্কারগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় যে সেখানে দাস-রা থাকত। সিন্ধুর নগরীগুলিতে, মনে হয়, মন্দির-দাসদের চিহ্নিতও করা হত—মেসোপটেমিয়ার ফলকগুলিতে যেমনটা করা হয়েছে। এটাও নিশ্চিত যে, চাকায় একই ছাঁদের মৃৎপাত্রের গণ-উৎপাদন সম্ভব ছিল না—যদি না মৃৎশিল্পী শ্রেণীর ব্যাপক অস্তিত্ব থাকত; নগর পত্তনের প্রথমদিকে বহির্ভাগে এবং দীর্ঘ অবক্ষয়ের পর নগরীর ভিতরে তাদের



চিত্র ৭



চিত্র ৮

চিত্র ৭ : মোহেঞ্জোদারোর চিরুণী; ভারতে আজও একই ধরনের হাতির দাঁতের চিরুনী বানানো হয়।

চিত্র ৮ : তেল অগ্রব থেকে পাওয়া আনুমানিক ২৮০০-২৬০০ খ্রী. পূ.-এর একটি ধূসর মসৃন ধাতব পূজা পাত্রের অবশেষ—সিন্ধুর ধাঁচের কুঁজযুক্ত ষাঁড়, তত্ত্বাবধায়ক ও একধরনের পাখি সমেত।

ভাঁটিগুলির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে। হাতিয়ার বা সরঞ্জাম যে সব পাওয়া গেছে—তার কিছু পাথরের, কিন্তু তামা এবং ব্রোঞ্জেরও বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর নমুনা মিলেছে যা উন্নত কারিগরি

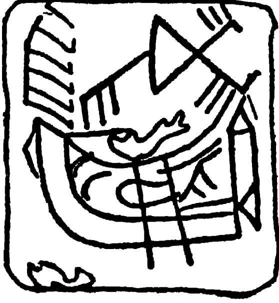
দক্ষতার পরিচয় দেয়। ইঁট তৈরি বা নির্মাণকাজে বহু মানুষ যুক্ত ছিল এবং সাধারণভাবে পৌর প্রয়োজনেও। দূরাঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যের স্পষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতীয় তামা বিনিময়ের জন্য সমুদ্রপথে বাহ্‌রিন (তিলমিউন) দ্বীপে নিয়ে যাওয়া বা অন্য পণ্য আমদানি করা হত এবং তা করত বণিকদের কোন বিশেষ গোষ্ঠী। প্রথমদিকে, পৃষ্ঠপোষকতাটা আসত বড় বড় মন্দির থেকে—যেমন, উর্-এর 'নাম্মু'; এদের ভান্ডার থেকেই বিপণন হত এবং অর্থের যোগানও আসত। ব্যাবিলনের সূত্রে এই বাণিজ্যের বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে[৯]—যেমন, বীমা, লোকসানের ঝুঁকি, ঋণ, লভ্যাংশ ভাগ এবং সেই সঙ্গে বাহরিনের একচেটিয়া বণিকগোষ্ঠী 'অ্যালিক তিলমিউন'-দের সম্পর্কেও। পরবর্তীকালে, আসিরিয়ার রাজা এই বণিক সম্প্রদায়ের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক বা প্রকৃত অর্থে প্রধান অংশীদার হয়েছিলেন। কিউনিফর্ম নথি থেকে জানা যায়, তাদের আমদানির তালিকায় ছিল তামা, হাতির দাঁত, বানর, মুক্তা ('মীনচক্ষু') ইত্যাদি অভিনব বস্তু এবং এ সবেরই একটা অংশ যেত ভারত থেকে। ব্যাবিলনের নথিতে যে হাতির দাঁতের চিরুনির উল্লেখ আছে—তা মোহেঞ্জোদারোতেও (চিত্র ৭) পাওয়া গেছে এবং এটাই সম্ভবত ব্যাবিলনীয় 'মেলউহা'। মেসোপটেমিয়ায় সিন্ধু-বণিক বা তাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিনিধিদের ছোট ছোট আস্তানা ছিল—যা তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মীয় বিগ্রহ (চিত্র ৮) এবং সীলমোহরগুলির অস্তিত্ব থেকে বোঝা গেছে। খুব সম্ভব এরা সুতিবস্ত্র রপ্তানি করত বা হয়ত সূক্ষ্ম ছাগ-লোমের পশম কাপড়; সুতিবস্ত্র নিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে সহজ কাজ ছিল এবং অ্যালিক তিলমিউন-দের কাছেও তা সবচেয়ে মূল্যবান বিনিময় পণ্য হিসেবে বিবেচিত হত। ভারতীয়রা কোন্ কোন্ জিনিষ আমদানি করত তা সঠিক বলা যায় না, কিন্তু সে তালিকায় রূপো যে ছিল তা নিয়ে বিতর্ক নেই। তুলনামূলকভাবে ভারতে ধাতু কম ছিল; এছাড়া মোহেঞ্জোদারোতে[১০] যে মাপের খণ্ডগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি স্থানীয় বলে মনে হয় না। এরই একটায়, যা কোন রূপোর বাট থেকে নিখুঁতভাবে কেটে নেওয়া (সম্ভবত নিয়মিত মূদ্রা প্রচলনের আগে বিনিময় হিসেবে), তার দু'পিঠেই কিউনিফর্ম লিপির ছাপ আছে। নৌ-চালনা পদ্ধতি বিষয়ে পরের দিকের যে প্রমাণ পাওয়া গেছে তা দূরবাহিত ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন—মৌসুমী বায়ু আবিষ্কার বা হিপ্পলন কর্তৃক তা পুনরাবিষ্কারেরও আগের; এ থেকে বোঝা যায়, লোহিত সাগর দিয়ে বছরে একবার দ্রুত ও সরাসরি যাতায়াত হত। *বাভেরু জাতক*[১১] থেকে জানা যায় যে ভারতীয় বণিকরা উপকূল বরাবর জাহাজ চালাত এবং কম্পাস হিসেবে কাক ব্যবহার করত—গভীর সমুদ্রে চলে গেলে যেটিকে উড়িয়ে দৃষ্টির অগোচর তীরভূমির দিক নির্দেশ নিয়ে নিত। এর সাহায্যে, একটি ফার সীলমোহরে[১২] অঙ্কিত জাহাজের ওপর ইতস্তত (চিত্র ৯) উড্ডীয়মান এক পাখির তাৎপর্য হয়ত ব্যাখ্যা করা যায়। সিন্ধু মুখে বন্দরের অস্তিত্বের বিষয়ে আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিকরা নিঃসন্দিগ্ধ নন কিন্তু খুব সম্ভবত মোহেঞ্জোদারোই ছিল একটা বন্দর; যেমন অন্যটা ছিল উর্—সে সময়কার ছোট জাহাজগুলির জন্যে। একজন মনুষ্যমূর্তির দাঁড় বাওয়া বা হাল ধরে থাকা এবং মধ্যস্থলে একধরনের কাঠামো সমন্বিত সিন্ধুযুগের একটি নৌকার চিত্র আমাদের সুপরিচিত। আর একটি বড় জাহাজ বা পোত-এর ছাপ অনেকের নজর এড়িয়ে গেছে—সম্ভবত সীলমোহরে ছবিটি



চিত্র ৯ : মেসোপটেমীয় নলাকৃতি সীলমোহরের অনুপুঙ্খ : দিকনির্দেশক পাখি সমন্বিত নৌকা।

উল্টোভাবে মুদ্রিত হয়েছে বলেই। কোন সীলমোহরের ভাবলেখটি সবসময়ই থাকে ওপরের দিকে এবং এক্ষেত্রে আলফা (α) ধাঁচের খোলা মুখটি সবসময়ই হবে ডানদিক—ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে (চিত্র ১০)।

বৈদেশিক বাণিজ্যের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও অবশ্যই ছিল। সিন্ধুর নগরীগুলিতে যে ধাতব যন্ত্রপাতি বা বাসনপত্র তৈরি হত, সেই ধাতু আনা হত দূরের খনি থেকে—যেগুলির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। হাতির দাঁত বা বানরও আসত দূর থেকে। বাণিজ্য যে শুধু সিন্ধুবাহিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সিন্ধু-সংস্কৃতির বেশ কিছু নিদর্শন রাজস্থান, কাথিয়াবাড় বা এই ধরনের সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং এমনকী আহমেদাবাদ জেলার লোথাল-এ পর্যন্ত (*ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি : এ রিভিউ,* ১৯৫৫, পৃ. ৯-১২)—যদিও এই বাণিজ্যের খুঁটিনাটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। আপাতত অনুমান করা যেতে পারে যে নব্য প্রস্তরযুগের দাক্ষিণাত্যে এই বাণিজ্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল—যদিও সিন্ধু বণিকেরা গিয়ে পৌঁছয়নি। আমরা জানি, দাক্ষিণাত্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একসময় স্বর্ণের উৎপাদন হত, কিন্তু এর ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পর্কে আদিম উৎপাদকরা খুব বেশি কিছু জানত না। দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্রপ্রস্তর যুগের শিল্পে ঘষা পাথর এবং সেইসঙ্গে বড় পাথরের চওড়া ফলার হাতিয়ারগুলি দেখলে মনে হয়, সেগুলি অনুকরণজাত। সম্ভবত সিন্ধুর মানুষদের ব্যবহৃত ব্রোঞ্জ ও তামার হাতিয়ারের অনুকরণে এগুলি তৈরি হয়েছিল—অনেকটা যেভাবে মধ্য ইউরোপের ঘষা-পাথরের কুঠারের প্রচলন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলে ঘটেছিল, যে অঞ্চল তখন ছিল নিকট প্রাচ্যের তামা বা ব্রোঞ্জ উৎপাদন-প্রভাবিত নব্যপ্রস্তর যুগের মধ্য পর্যায়ে। দাক্ষিণাত্যে বড় চওড়া ফলার পাথরের হাতিয়ার নিশ্চিতভাবেই সরাসরি সিন্ধুর নকলে তৈরি করা হয়েছিল। প্রাচীন বাণিজ্যপথগুলি চিহ্নিত হত মাথায় বোঝা নিয়ে সরাসরি বাহকদের যাতায়াতের পাউড়ি থেকে এবং আরও নিশ্চিতভাবে বুঝে নেওয়া হত দূরত্বজ্ঞাপক ফলক, পিলার বা পাহাড়ি খাঁজ থেকে—যেগুলির ওপর বোঝা নামিয়ে বাহকরা বিশ্রাম নিত; এগুলি ছিল রাস্তার প্রায় চার মাইল অন্তর অন্তর।



। ১০ : সিন্ধুর জাহাজ (Vats plate XC 223)।

৩.৩ অনুসন্ধানের আসল বিষয় হল—শ্রেণী কাঠামোটা কীভাবে রক্ষিত হত? কারা এত সব মানুষকে খাওয়াতো? প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী মেহনতি গণশক্তির বৈরিতা থেকে সম্পদের মালিকদের নিরাপদে রাখার পদ্ধতিটা কী ছিল? এ যাবৎ জ্ঞাত প্রতিটি শ্রেণী-বিভক্ত সমাজই, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, বলপ্রয়োগের শক্তির ওপরই নির্ভরশীল—যার দ্বারা সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণী উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকে উৎপাদক শ্রেণীকে বঞ্চিত করে। মেহনতি মানুষ যখন দেখে যে উচ্চ শ্রেণীর নির্দেশমতো না চললে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই—তখন, হিংসাত্মক সংঘাতের সম্ভাবনাও ন্যূনতম মাত্রায় সীমিত থাকে। প্রায়শই, ধর্ম হল সেই পদ্ধতি যার সাহায্যে মানুষকে বোঝানো হয় যে উদ্বৃত্তটা তাদের পরিত্যাগ করাই উচিত, তা না হলে দৈবশক্তি তার রহস্যময়

প্রতিভূদের দ্বারা তাদের ধ্বংস করে দেবে। শোষণ যত তীব্র, দমনমূলক শক্তির প্রয়োজনীয়তাও তত বেশি—কেননা ক্ষুধিত মানুষ চিরকাল প্রতিবাদহীন থাকতে পারে না। ঠিক এই পরিস্থিতিতে, অলঙ্ঘনীয় টাবুগুলি থেকে জাত কুসংস্কারগুলিকে কাজে লাগানো হয়। বলপ্রয়োগের উপকরণগুলি, অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের চোখ এড়াতে পারে না—অন্যদিকে কুসংস্কারগুলির অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় মূর্তি অথবা ধর্মীয় কাজের জন্য নির্মিত বিশেষ সদনগুলির মধ্য দিয়ে।

সিন্ধু সভ্যতার বৈভব নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। নগরীদুটি যদিও ধ্বংস হয়ে গেছে বহুদিন আগে এবং তারপর থেকে রত্নসন্ধানী লুঠেরা, ইঁট সংগ্রহকারী বা অপরিকল্পিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননের শিকার হয়েছে—তা সত্ত্বেও, সোনা, রূপা ও রত্নভাণ্ডারের সন্ধান মিলেছে। বড় বড় বাড়িগুলিতে চোরের হাত থেকে বাঁচার উপযোগী পোড়া ইঁটের চওড়া দেওয়াল ছিল। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই বাড়িগুলির প্রবেশপথ ছিল পাশের সরু গলিগুলির মধ্য দিয়ে এবং ভিতরে ঢুকলেই এক ধরনের দ্বাররক্ষী-ঘরের মুখোমুখি হতে হত। উঠোনে থাকত কুয়ো। সব মিলিয়ে বাড়িগুলি ছিল মালিকদের দুর্গবিশেষ। কিন্তু যে জিনিসগুলির লক্ষ্যণীয় রকমের অভাব ছিল তা হল—অলঙ্করণ, স্মৃতিস্তম্ভ, খোদাই-এর কাজ, বিশাল প্রতিমূর্তি, এবং এমনকী নকশাকাটা ইঁট, টালি, দেওয়ালের রঙ, অথবা এমন কোন কিছুর যা দিয়ে বিজেতার আত্মজাহির অথবা নব্য ধনী ব্যবসায়ীদের হর্ষোৎফুল্ল ইতরতার প্রকাশ ঘটে। সম্পদের মালিকানা ছিল কঠোরভাবেই ব্যক্তিগত। নগরীর সর্বত্রই যে ইঁট বা সুরকির বাঁধানো রাস্তা ছিল, তা নয়—ফলে সেখানকার অল্প বৃষ্টিপাতেই সেগুলি অগম্য হয়ে উঠত। সবশেষে, সহিংস হবার হাতিয়ারগুলি ছিল খুবই সাধারণ মানের, যদিও তাদের অস্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগমাধ্যম, অর্থাৎ যাকে আমরা রাষ্ট্র বলি—সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছুই জানা যায়নি। সিন্ধু নগরীর যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, সেগুলি খুবই দুর্বল; বিশেষ করে খাঁজহীন তামার বর্শাফলক—যা দেখলে মনে হয় প্রথম আঘাতেই ভেঙে পড়বে। সিন্ধুর প্রধান স্তরে তরবারির মতো কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। সীলমোহরের ছাপে তীরন্দাজরা আছে, পাথর ও তামার তৈরি তীরের ফলাও আবিষ্কৃত হয়েছে। ধনুকের প্রচলনটা, হতে পারে, শিকারের যুগ থেকেই চলে আসছিল। অবশ্য, লোহার ব্যবহার যেহেতু সাধারণের জানা ছিল না—তাই শাসকশ্রেণীর হাতে তার অল্প কিছু থাকাটাই যথেষ্ট হতে পারে। আবার, উৎকৃষ্ট ও শক্তপোক্ত অন্য সরঞ্জামগুলি—যদিও কিছুটা সরল ধরনের—দেখলে বোঝা যায় অস্ত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রযন্ত্র, যে ধরনেরই তা হোক না কেন, তার আনুষঙ্গিক হিসেবে শক্তিশালী এমন কিছু রেখেছিল যার সাহায্যে হিংসাকে ন্যূনতম মাত্রায় প্রশমিত রাখা যেত। নগরী দুটি নির্ভরশীল ছিল বাণিজ্যের ওপর, যুদ্ধের ওপর নয়; কিন্তু যদি সৈন্য বা রক্ষীবাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী না হয়ে থাকে তাহলে তারা মুনাফার অসম বন্টন ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করত কীভাবে?

এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর রয়েছে ধর্মের মধ্যে। যদিও সেখানে কোন বিশালাকার দেবমূর্তির সন্ধান মেলেনি, কিন্তু 'নগরদুর্গ' স্তূপ যেটি ছিল তার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই মেসোপটেমিয়ার 'জিক্কুরাত' মন্দির কাঠামোর মিল আছে। পুরো স্তূপটি ছিল অন্তত ৩০ ফুট উঁচু ইঁটের তৈরি চাতালের ওপর—যাতে বন্যায় কোন ক্ষতি না হয়। ইমারতের সারিগুলি ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, এমনকী শেষ পর্বে এসে সুরক্ষিত এলাকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এ সত্ত্বেও, প্রবেশের

জন্য প্রশস্ত জটিল সিঁড়িগুলি প্রতিরক্ষার পক্ষে অনুপযোগী ছিল— যেগুলি সম্পূর্ণই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয়। হরপ্পার জায়গাটি ইঁট চোরদের হাতে নষ্ট হয়ে গেছে; আর মোহেঞ্জোদারোর যে জায়গাটিকে নিশ্চিতই কোন ধর্মীয় চত্বরের মধ্যেকার প্রধান ভবনের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করা হয় তা ঢেকে গড়ে উঠেছে একটি কুষাণ-স্তূপ। কিন্তু এর সংলগ্ন 'বিখ্যাত স্নানাগার'টি নিশ্চিতভাবেই ছিল কোন মাঙ্গলিক পুষ্করিণী (পিচ দিয়ে ইঁট গেঁথে চমৎকার জল-নিরোধকভাবে তৈরি, সন্নিহিত বিশেষভাবে নির্মিত একটি কূয়ো থেকে হাতে জল টেনে এটি ভর্তি করা হত, জল-নিষ্কাষণের নালাও ছিল এবং তিনটি দিক ছিল ভূগর্ভস্থ কক্ষ দিয়ে ঘেরা); কেননা এখানকার প্রতিটি বাড়িতেই আলাদা আলাদা প্রকৃষ্ট এবং রীতিমত ব্যবহার করা স্নানঘরের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে—যে বৈশিষ্ট্য মোহেঞ্জোদারোকে মিশর, মেসোপটেমিয়া বা প্রাচীন ইতিহাসের যে কোন নগরীর থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে; এমনকী, নগরদুর্গের কোন বাসিন্দাও স্নানের জন্য দেওয়ালের সিঁড়ি বেয়ে সহজেই নদীতে নেমে আসতে পারত। এই স্নানাগারটিকে আমি, পরবর্তীকালেও যার প্রচলন ছিল সেই 'পদ্মপুকুর'-এর আদিরূপ হিসেবে অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছি ('পুষ্কর', *জার্নাল অফ দি বোম্বে ব্রাঞ্চ অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি*, ২৭ (১৯৫১, পৃ. ২৩-৩০)। আমাদের জানা ভারতীয় রাজাদের ক্ষেত্রে অভিষেকের সময় ইউরোপীয় ধরনের কোন কিছুর 'গাত্রলেপন' হত না, বরং এই সমস্ত পবিত্রস্থানের 'বারিসিঞ্চন' করা হত। আমি এ-ও দেখিয়েছিলাম যে এ স্থানটি ছিল দেবীমাতৃকার আরাধনার জন্যই উৎসর্গীত এবং সন্তান কামনায় পূজাকৃত্যের অঙ্গ হিসেবে দেবীর প্রাণবতী সেবাদাসীদের সঙ্গে এই পুষ্করে মিলিত হতে হত— অনেকটা মেসোপটেমিয়ার ইশতার মন্দিরের পবিত্র গণিকালয়ের সঙ্গে যা তুলনীয়। পাখির মাথা বিশিষ্ট পুতুলের মতো অজস্র নারীমূর্তি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে। এগুলি বিশেষ মুখোশ পরিহিতা নর্তকী বা দেবদাসীদের হওয়া সম্ভব—যার সমান্তরাল সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া গেছে কুল্লিতে, যদিও তা তুলনায় কম উন্নত। দীর্ঘলালিত ধর্মবিশ্বাসের জীবন্ত প্রতিরূপদের উপস্থিতি ধর্মীয় বিগ্রহের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যার সহায়ক হতে পারে। নিদর্শনগুলিও কিছুটা মিশ্র ধরনের, কেননা সীলমোহরের ওপর যে মূর্তির ছাপগুলি পাওয়া গেছে—তা পুরুষপ্রাণী ছাড়া আর কিছু নয়; যে কটি মনুষ্য মূর্তি পাওয়া গেছে, চিহ্নিতকরণের পর, সেগুলিও মনে হয়েছে পুরুষের। শেষোক্তগুলির মধ্যে শ্মশ্রুধারী ত্রিমস্তক বিশিষ্ট একটি মূর্তির সঙ্গে পরবর্তীকালের হিন্দু দেবতা শিবের কিছুটা মিল আছে। এই কারণে, সিন্ধু সভ্যতার মূর্তি সমন্বিত সীলমোহরগুলি থেকে পরবর্তীকালের হিন্দু ধর্মের অনেক কাহিনীর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে—যেমন, ত্রিশঙ্কু।[১৩] আজকের পূজ্য পিপুল গাছ-এর অস্তিত্ব সিন্ধুর সীলমোহরে অবিতর্কিতভাবেই বিদ্যমান (চিত্র ২০) (পাতা থেকে চিহ্নিত), অর্থাৎ পাঁচ হাজার বছর আগেও তা পূজনীয় ছিল। অবশ্য, পারস্পরিক সম্পর্কহীন দেবীমাতৃকার মূর্তি এবং পুরুষ প্রাণীর টোটেম বিশ্বাসের এই দ্বৈততার বিষয়টি এখনও ব্যাখ্যার

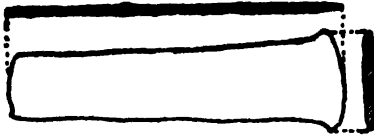


চিত্র ১১ : 'বলিদান' — সিন্ধুর একটি সীলমোহরে।

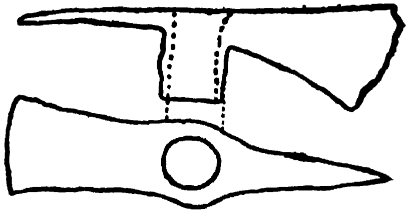
অপেক্ষায় আছে। সীলমোহরগুলির ধর্মীয় আরাধনার অতিরিক্ত আরও একটা ভূমিকা ছিল—তা হল, বাণিজ্যিক পণ্যের ওপর নিরাপত্তামূলক টাবুর আরোপন।[১৪] বণিকেরা যদি মন্দিরের দেবী বা মন্দির সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়িয়ে থাকে—তাহলে তা থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে নিরাপত্তার প্রয়োজনে কেন তাদের ভিন্ন ধরনের মূর্তির প্রয়োজন হয়েছিল।

এই সীলমোহরগুলির সঙ্গে তুষারযুগের শিল্পরীতির কিছুটা সম্পর্ক আছে; আদিম শিল্পীরা 'স্কেচ শীট' (সিন্ধুর সীলমোহরগুলির মাপের প্রায় সমানই হবে) ব্যবহার করত—যা থেকে প্রায় ২০০ মাইল ছাড়া ছাড়া ইউরোপীয় গুহাগুলির গায়ে জন্তু জানোয়ারের মূর্তি সযত্নে নকল করা হত (*আর্ট ইন দি আইস এজ,* চিত্র ১৩৮-৯)। স্কেচ নকল করার থেকে সরাসরি মাটির ছাঁচে ছাপ তোলা—এই পরিবর্তনটা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে একটা সরল অগ্রগতি। *আর্ট ইন দি আইস এজ* গ্রন্থের ১৪০ নং চিত্রে পাথর ফলকের 'স্কেচ শীটে' বিভিন্ন প্রাণীর যে ছবিগুলি দেখা যায়—ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সঙ্করজাতীয় কিম্ভূত প্রাণী ও রাক্ষসের প্রতিচ্ছবির আদিরূপ নির্মাণে সেগুলির ভূমিকা আছে বলে মনে করা যেতে পারে।

পাঁচশ' বছর বা সম্ভবত তার তিনগুণ বেশি সময়কাল ধরে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনহীনতার কারণ ব্যাখ্যায় ধর্মীয় আধিপত্যের দিকটাকে মাথায় রাখতে হবে। প্রাক্-সিন্ধু যুগের হরপ্পার গ্রাম বসতি থেকে শুরু করে, আক্রমণকারীদের হাতে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ গতিপথে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের চিহ্ন আছে, কিন্তু কোন বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। মেসোপটেমিয়া বা মিশরের তুলনায় সিন্ধু নগরীগুলির এটাও একটা স্বাতন্ত্র্য। বিদেশী



চিত্র ১২



চিত্র ১৩

চিত্র ১২ : মোহেঞ্জোদারোর নীচের স্তর থেকে পাওয়া ব্রোঞ্জের হাতিয়ার; মাপ চিত্র ১৩-র অনুরূপ।

চিত্র ১৩ : মোহেঞ্জোদারোর উপরের স্তর থেকে পাওয়া দণ্ড ছিদ্র যুক্ত ব্রোঞ্জের কুঠার-বাইস—যা বিদেশী দখলের সাক্ষ্য।

আক্রমণকারীদের হাতে বিজিত হবার আগে পর্যন্ত মৃৎপাত্রের আকার বা নির্মাণশৈলী ছিল অপরিবর্তিত। ব্রোঞ্জের হাতিয়ারগুলিরও আকৃতিগত পরিবর্তন কিছু ঘটেনি—যেমন কুঠার বা বাটালির দন্ড-ছিদ্রহীন মধ্য বা মস্তকভাগ (চিত্র ১২)। দন্ড-ছিদ্রযুক্ত কুঠার অনেকবেশি কার্যকরী এবং সমসাময়িক সুমেরীয়রা এর ব্যবহার জানত, কিন্তু এখানে তা পাওয়া গেছে উর্দ্ধস্তরে—অর্থাৎ, বিদেশী অধিকৃত হওয়ার পর (চিত্র ১৩)। পরবর্তীকালের ভারতবর্ষে প্রতিটি অঞ্চলেই

শুধু নয়, পরন্তু প্রতি শতাব্দীতেই লিপিগুলি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকশিত হয়েছে—অথচ আবিষ্কৃত সিন্ধুলিপির প্রথম ও শেষ স্তরে ফারাক বিশেষ কিছু নেই। মিশরীয় চিত্রলিপি বা হিয়ারোগ্লিফিকগুলি বহুদিন অপরিবর্তিত ছিল, কিন্তু যাজক বা লৌকিক উভয় স্তরেই এক ধরনের চলতি লিখনেরও বিকাশ ঘটেছিল। মেসোপটেমিয়ায় চিত্রলিপিগুলি কিউনিফর্ম লিপির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল অনেক আগেই এবং সেই লিপিতে আমরা বণিকদের দলিল, হাম্মুরাবিদের আইনের বিবরণ, মূর্তির উদ্দেশ্যে খোদিত গাথা, জমি-হস্তান্তরের নথি, দাস বিক্রয়ের বিবরণ, মন্দির গীতি, বা মহাকাব্য গাথা ইত্যাদি পেয়েছি। কিন্তু সিন্ধুতে সীলমোহরের গায়ের কয়েকটি ছোট রেখা বা পাত্রের গায়ের কিছু রেখাচিত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। হতে পারে যে, এখানকার বণিকরা লেখার কাজে নশ্বর জিনিস ব্যবহার করত—যেমন, মাড় দেওয়া কাপড়, চামড়া, তালপাতা বা বার্চগাছের বাকল; ফলে, প্রমাণ করার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই (কালো পিন্ডগুলি ছাড়া—যা কালি হলেও হতে পারে)। তা সত্ত্বেও, প্রশ্ন থেকে যায়—কেন তারা সুমেরীয় বণিকদের মতো পোড়ামাটির দলিল ব্যবহার করল না—যা দীর্ঘদিন টিকে থাকে? এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর স্থায়ী নথিভুক্তিকরণের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেনি; কেননা, একাধিপত্য বা মনোপলিটা ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং তার ধারাবাহিকতাটা সুনিশ্চিত রাখার পেছনে কাজ করেছিল এক অনড় ঐতিহ্য।

মুনাফায় শ্রেণী আধিপত্য এবং ধর্মের ওপর ভিত্তি করা এই রক্ষণশীলতা দিয়েই লিপির বা মন্দির-শাসিত নগর পরিকল্পনার অপরিবর্তনীয়তাকে বিশ্লেষণ করা যায়। এখানকার ছবিটা ছিল, দেবীমাতৃকার মন্দিরের অনুগত একটা স্থায়ী বণিকশ্রেণী—যারা আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ মন্দিরকে কর দিত, কিন্তু এই শর্তে যে, তাদের নিজস্ব সম্পদ বাড়ানোর বিরুদ্ধে মন্দির কোন ভূমিকা নেবে না। কিন্তু প্রশ্নটা হল, শ্রমজীবী জনসাধারণের বিশাল অংশেরও নিশ্চিতই পর্যাপ্ত কোন ধর্মীয় হেতু ছিল—যার ফলে তারা তাদের নির্দিষ্ট অবস্থানে নিয়ন্ত্রিত থাকত। মন্দিরকেন্দ্রিক ধর্মীয় অনুশাসনের মিল থাকা সত্ত্বেও চালদিস-এর উর্-এর মতো নগরীগুলির সমর-সম্ভার বা রাজ-স্মৃতিচিহ্নগুলি থেকে বোঝা যায় যে রাজারা দেবতাদের ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখত না। সিন্ধু উপত্যকার ক্ষেত্রে কিন্তু ছবিটা সেরকম নয়।

৩.৪ এখন আমরা মূল প্রশ্নে আসব যে, নাগরিকদের—তা সে মন্দির-দাস, কর্মচারী, কারিগর, বণিক, বা পুরোহিত যারাই হোক না কেন তাদের খাওয়ানোর জন্য কৃষকরা শস্যের উদ্বৃত্ত উৎপাদন করত কীভাবে? যদি ধরে নেওয়া যায় যে বাণিজ্য ও ধর্মীয় বিধানের দ্বারা তারা কৃষকদের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের ভাগ দিতে রাজি করাত, তাহলেও প্রশ্ন থাকে—খাদ্যশস্য উৎপাদন কীভাবে হত? প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সিন্ধু উপত্যকার জমি ছিল পলিমাটির-যা পৃথিবীর যে কোন অংশের উর্বর জমির মতোই। এ অনুমানের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না যে, সেকালে সিন্ধু তীরবর্তী অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টি হত—যার জন্যই ব্যাপক চাষ সম্ভব ছিল। আজকের দিনেও, বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে জঙ্গল হাসিলের পরিণতিতে বিধ্বংসী বন্যা এবং সেইসঙ্গে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা ও অনুর্বরতার সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করা হয়। অবশ্য, প্রচুর বৃষ্টিপাতের সপক্ষে যে প্রমাণগুলি আমাদের দেওয়া হয়েছে শেষবিচারে তা যথেষ্ট দুর্বল। প্রথমত মেসোপটেমিয়ার মতো রোদে শুকানো ইঁটের বদলে এখানে পোড়া ইঁটের ঘরবাড়ি তৈরির অর্থ

হল জ্বালানী কাঠের যোগান এখানে ভালই ছিল—পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আজকের ছোটখাটো গাছপালা দিয়ে যা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তবে, এই ইতিহাসবিদদের বক্তব্য, কড়ি-বরগার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ নিশ্চিতই হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নদীপথে আনা হত; অন্যদিকে ব্যাপক চুল্লি-দহনের[১৫] ফলশ্রুতি হিসেবে অপরিহার্য যে ইঁট-ভাঁটা বা ছাই-এর স্তূপ এখনও পর্যন্ত সিন্ধু নগরীগুলির আশেপাশে কোথাও তা পাওয়া যায়নি। এ ক্ষেত্রে, এই যুক্তিটা খতিয়ে দেখা হয়নি যে—হতে পারে, ইঁট পোড়ানো হত অনেকটা দূরে জ্বালানি কাঠের উৎসের কাছাকাছি এবং নদীপথে যেভাবে জ্বালানী কাঠ আসতে পারে সেভাবেই তা আনা যেতে পারত। আলেকজাণ্ডারের নৌবহর তো বিয়াস নদীবাহিত কাঠের গুঁড়ি থেকেই তৈরি হয়েছিল (*স্ট্রাবো,* ১৫.১.২৯)। দ্বিতীয় যুক্তিটা হল এই যে, সীলমোহরে খোদিত জন্তুগুলি—যেমন, গণ্ডার, বাঘ, জলহস্তী, হরিণ ইত্যাদি এ সবই জলসিক্ত বনাঞ্চলেই সুলভ; সুতরাং, সীলমোহরগুলি যেখানে প্রচলিত ছিল সে অঞ্চলটাও ছিল তেমনই। অবশ্য সীলমোহরের বকচ্ছপ জন্তুগুলি—যেমন, ষাঁড়-হস্তী বা ছাগল-মাছ ইত্যাদি সংকরগুলির কথা মাথায় রাখলে এই যুক্তিটাকে হাস্যকর মনে হতে পারে। অনেকসময় তিনটি বা চারটি জন্তুর অংশবিশেষ নিয়েও মেলানো হয়েছে; একটিতে অর্ধেক বাঘ অর্ধেক মানুষ—যা থেকেই হয়ত পরবর্তীকালে বিষ্ণুর অবতার নৃসিংহ (নর ও সিংহ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। এই ধারায় বিচার করলে কেউ হয়ত সিদ্ধান্তে আসবেন, যে এ অঞ্চলে এ ধরনের উদ্ভট জন্তু তখন সুলভ ছিল। আমাদের ব্যাখ্যায়, সীলমোহরে খোদিত প্রাণীগুলি হল প্রাক্-কৃষি পর্যায়ের আদি টোটেম—যখন এই অঞ্চল হয়ত কিংবা নিশ্চিতই শিকারের এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সংকর জন্তুগুলি হল যৌথ কৌমের মিশ্র টোটেম বা সংযুক্ত উপজাতিক ধর্মবিশ্বাস।

আমাদের প্রথম যেটা লক্ষ্য করার বিষয় তা হল, ভূমির উর্বরতা সত্ত্বেও আপাতভাবে এখানকার উদ্বৃত্ত মেসোপটেমিয়া বা এমনকী নীলনদের অপ্রশস্ত উপত্যকার চেয়ে অনেক কম ছিল। তার প্রমাণ, ছড়ানো-ছেটানো নামমাত্র বসতি অঞ্চল নিয়ে ন'শ মাইল দীর্ঘ ও তার প্রায় অর্ধেক প্রস্থবিশিষ্ট একটি এলাকায় আমরা সন্ধান পেয়েছি মাত্র দু'টি বৃহৎ নগরীর। খয়েরপুরের 'বৃহৎ গ্রাম' (কোট ডিজি ঃ ইল, *লন্ডন নিউজ,* মে, ২৪, ১৯৫৮, ৮৬৬-৭) সিন্ধু সভ্যতার উপরিস্তরেরই নিদর্শন—কিন্তু সেখানেও প্রকৃত অর্থে কোন নগরী গড়ে ওঠেনি। আহমেদাবাদ থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূরের লোথাল সম্পর্কে নানারকম বিভ্রান্তিকর বিবরণ সত্ত্বেও বলা যেতে



চিত্র ১৪ : বীজ বপনের খনক ও ছোট জোয়াল যুক্ত সুমেরীয় লাঙল।

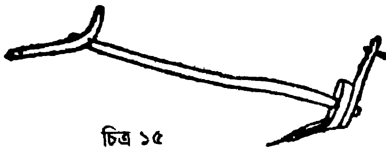
পারে যে সেটি ছিল বড়জোর একটা বাণিজ্যঘাঁটি এবং তা-ও শেষপর্যায়ে। বাদিন-এর কাছাকাছি বা কচ্ছের রান-এ মজে যাওয়া নদীর গতিপথ বরাবর (এখন যেখানে পরপর হ্রদগুলি আছে)

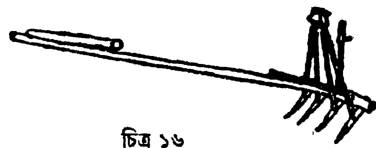
অনুসন্ধান চালালে একই ধরনের অন্য ঘাঁটিগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যাবে—যা সিন্ধু সভ্যতার কালনির্ণয়ের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু এ সবই, এখনও পর্যন্ত, হরপ্পা-মোহেঞ্জোদারোর তুলনায় নগণ্য সংযোজন। এ দুটির পরবর্তী বৃহত্তম বসতি হল চানহু-দারো—যার এলাকা ২৫ একরের কম। না-খোঁড়া স্তূপগুলিও কোন বৃহৎ নগরীর অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে না, কেননা এই ধরনের 'অনাবিষ্কৃত' স্তূপগুলির ভিত্তিমূলের পরিধি থেকেই বোঝা যায় যে তা যুগ যুগ ধরে বৃষ্টিবাহিত সুরকি ও আবর্জনা দিয়েই গড়ে উঠেছে। মেসোপটেমিয়ায় নিশ্চিতই আরও ছোট ভূখণ্ডে অনেক নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল—যারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বাণিজ্যের সম্পর্কে বাঁধা ছিল। এমনকী প্রাচীনতম নিদর্শন অনুসারেও, মেসোপটেমিয়ায় সাতটি নগরীর অস্তিত্ব ছিল যেগুলির প্রতিভূ হিসেবে সাত সন্তের কাহিনী প্রচলিত (এইচ জিমমার্ন ঃ (*জইট শ্রিফট আসিরিওলজি* ১৯২৩-৪, পৃ. ১৫১-৪)। হতে পারে, সিন্ধুর দু'টি সীলমোহরে এই সাত সন্তের প্রতিফলন ঘটেছে এবং সেইসঙ্গে পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সপ্ত গোত্রের ঐতিহ্যের মধ্যেও—কেননা কোনকালের গোত্রসংখ্যার সঙ্গেই তার কোন মিল নেই। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় নগরীর জনঘনত্ব আরও বেশি হল না কেন? এর একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর, মেসোপটেমিয়ার তুলনায় এখানকার কৃষি-পদ্ধতি কোন আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়নি।

আবার, এই ধরনের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমস্যাটা হল যে, তৎকালীন কৃষি-পদ্ধতি বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। তা সত্ত্বেও, আমি ঝুঁকি নিয়ে বলব যে সিন্ধুর মানুষেরা লাঙ্গলের ব্যবহার জানত না (যেমনটা মেসোপটেমিয়ার সীলমোহরে খোদিত আছে; দ্রষ্টব্য ঃ চিত্র ১৪)। তারা চাষ করত শুধুমাত্র খাঁজকাটা মইয়ের সাহায্যে—সিন্ধুর একটি ভাবলেখ নথিতে সম্ভবত যার নমুনা আছে। তাদের চাষবাস বৃষ্টিপাত (যা ঘন অরণ্য অঞ্চলের অস্তিত্বের আভাস দেয়)-এর ওপর খুব বেশি নিভরশীল ছিল না বরং অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিল সেচের ওপর। অবশ্য এই সেচব্যবস্থা হয়ত মেসোপটেমিয়া বা পরবর্তীকালের ভারতবর্ষ তথা আধুনিক পাঞ্জাবের মতো পরিকল্পিতভাবে খাল কেটে তৈরি নাও হতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থা ছাড়া এমনকী আজকের পাঞ্জাবেও—যেখানে সিন্ধুর চেয়ে অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হয়—সেখানকার সব মানুষের খাদ্য যোগানো যাবে না। জলোচ্ছ্বাসের ফলে নদীচরে জমা হওয়া উর্বর পলির ব্যবহার ছাড়াও, মনে হয়, সিন্ধুর সেচ-পদ্ধতিতে নদীর ছোট খাঁড়িতে বাঁধ বাঁধার প্রচলন ছিল। আজকের দিনেও, সিন্ধুপ্রদেশ বা পাঞ্জাবে প্রাকৃতিক বন্যাকবলিত* পলিজমা ক্ষেতগুলিই

* 'খালের কাছাকাছি এলাকা ছাড়াও, দেশের একটা বিরাট অঞ্চল—বিশেষ করে শিকারপুর জেলায় (সিন্ধুপ্রদেশ) চাষবাস সম্ভব হয় প্রাকৃতিক বন্যার কারণে। এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং উপকার যা করে তার চেয়ে ক্ষতি করে অনেক বেশি, কিন্তু তা যখন মোটের ওপর সয়ে যায় তখন এই সাময়িকভাবে ডুবে যাওয়া জমিই রবি বা খরিফ শস্য, বিশেষ করে গমের ফলনের পক্ষে দারুণ সহায়ক—যেমনটা করাচী জেলার মনচার লেক-এও ঘটে। এই কারণে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—স্রোত (মোকি), সেচ (চরকি) ও বন্যা (শৈলবি); এবং তারপরেও আবার বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়—যেমন, স্রোতের প্রাচুর্য ও ধারাবাহিকতা, জমিতে সেচবাহিত জল আনার খরচ এবং বন্যার নিশ্চয়তা ও সময়কাল বিষয়ে।" (ব্যাডেন-পাওয়েল, ৩.৩৩৮, ১৮৭৫ এর একটি রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত)। মন্টগোমারি জেলা সমেত (হরপ্পা যেখানে ছিল) পাঞ্জাবের দক্ষিণাংশ সম্পর্কে এই লেখক জানান যে, সেখানে বৃষ্টিপাত 'কদাচিৎ হত। ফলে এখানে কৃষিব্যবস্থা নদীর ওপরই নির্ভরশীল ছিল; জলোচ্ছ্বাস, খাঁড়ি বা খাঁড়ির কাছাকাছি আর্দ্র জমির কূপে জমে থাকা জল ব্যবহার করা হত। বৃষ্টিপাত থেকে ফসল উৎপাদন বহুদিন পরে পরে দৈবাৎ ঘটত...।' (ব্যাডেন-পাওয়েল, ২.৫৩৭)।

সবচেয়ে উর্বর (যা বিশেষ পারিভাষিক শব্দ শৈলবি দিয়ে বোঝানো হয়)। সিন্ধুযুগে এই ধরনের জমিতে বন্যার অনিশ্চয়তা বা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে জনবসতি তুলনামূলকভাবে অস্থায়ী হত। আলবাঁধের সাহায্যে তীরবর্তী জমিতে বন্যার জল ঢুকিয়ে নেওয়া সম্ভব হত এবং উভয়ক্ষেত্রেই সঞ্চিত পলিস্তরে মই-এর সাহায্যে কর্ষণ করা হত। এর ফলে হয়ত নিয়মিত শস্য ফলানো যেত—কিন্তু খালের জলসেচিত গভীরতর লাঙ্গল-কর্ষিত জমির তুলনায় তা সীমিত। মেসোপটেমিয়ায়, মনে হয়, সারগন যুগের অনেক আগেই খালের জল ব্যবহারের সূচনা হয়েছিল—যদিও তার আগে সুমেরীয়রাও বন্যাবাহিত পলিতেই শস্য ফলাত। মিশরের


চিত্র ১৫


চিত্র ১৬

চিত্র ১৫ : আজকের ভারতীয় লাঙল; কাঠের, সঙ্গে লোহার ফাল যুক্ত; বাঁধার দড়ি ছবিতে নেই।

চিত্র ১৬ : এ কালের ভারতীয় জমি চষার মই, সঙ্গে আলাদা করা যায় এমন ফাল। লোহার ফলা খুব অল্প ক্ষেত্রেই ফলে।

অধিবাসীরাও তাদের অপ্রতুল বৃষ্টিপাতের দেশে প্রাকৃতিক পদ্ধতিই অনুসরণ করত, সম্পূরক হিসেবে থাকত গভীর খাঁড়িগুলি। নীলনদের নিয়মিত বন্যা সিন্ধুর বাঁধগুলির চেয়ে অনেক বেশি উর্বরা পলির যোগান দিত। সিন্ধু নগরীদুটির অপরিবর্তনশীল বহিরঙ্গ ও ক্রম অবক্ষয়ের ব্যাখ্যায় এটাও একটা মূল কারণ হিসেবে গণ্য করতে হবে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর পূর্বের যুগের শুরুতে এই আদিম কৃষিপদ্ধতিই ছিল একমাত্র কার্যকর। সত্যিকারের কোন নতুন আবিষ্কার যখন নিশ্চিতভাবে অধিকতর উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হত তখনই জনজীবন ও নগর স্থাপত্যে আপনা থেকেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যেত। প্রকৃত লাঙ্গল (চিত্র ১৫)—যা দিয়ে যে কোন মাটি চষা যায়—তার প্রচলন ঘটেছিল লৌহযুগ চলাকালীন। আবার, ভারতীয় কৃষকরা নরম মাটিতে চাষের কাজে এখনও খাঁজকাটা মই (চিত্র ১৬) ব্যবহার করে—বিশেষ করে লাঙ্গল চষার পরেও যে চাপড়াগুলি থেকে যায় তা ভাঙতে। এই পদ্ধতি নরম ও উপরের স্তরের মাটিতেই কেবল চলে। পশ্চিম-উপকূলবর্তী খাজান-এর কাদা মাটিতে বর্ষার সময় এই ধরনের মই দিয়েই চাষ হয়—যদিও সেই একই জমিতে শুখা মরশুমে দ্বিতীয় ফসলের সময় লাঙ্গল চষতে হয় গভীরভাবে।

সিন্ধুর আবহাওয়া এবং বন্যাসেচিত জমির কৃষিকাজ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন বর্ণনা পাওয়া যায় আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের কাছ থেকে। এই বিবরণীগুলির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি—কেননা, উত্তর পাঞ্জাব ও নিম্ন সিন্ধুর আপাত বৈসাদৃশ্য স্ট্র্যাবো-কেও (১৫.১.১৭-১৮) বিস্মিত করেছিল ঃ

'(অ্যারিস্টোবোলাস বলেছেন) তাঁরা দশমাস জাহাজে কাটিয়েছেন (সিন্ধুনদের নিম্ন অববাহিকায়) কিন্তু কখনও বৃষ্টি দেখেননি, এমনকী যখন ভূমধ্যসাগরীয় বাতাস প্রবল বেগে জেগে উঠত তখনও নয়। কিন্তু নদীগুলি থাকত পূর্ণ এবং সমতলকে প্লাবিত করত। উল্টোপাল্টা ঝোড়ো হাওয়ায় সমুদ্রে জাহাজ চালানো ছিল দুরূহ, কিন্তু তীরের দিক থেকে কোন বাতাস আসত না। একই প্রসঙ্গে নিয়ারকোস

লিখেছেন, কিন্তু গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত সম্পর্কে অ্যারিস্টোবোলাস-এর বিবরণের সঙ্গে তার তফাৎ আছে। তিনি জানিয়েছেন, গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির জলে সমতলের মাটি সিক্ত হত, কিন্তু শীতকালে বৃষ্টি হত না। নদীর জলস্ফীতির কথা দুই লেখকই উল্লেখ করেছেন। নিয়ারকোস লিখেছেন যে, যখন তাঁরা আচেসিন (চেনার)-এ তাঁবু ফেলেন তখন নদীতে জলস্ফীতি দেখা দেওয়ায় আরো উঁচু জায়গায় তাঁদের তাঁবু সরিয়ে নিতে হয়েছিল। তাঁর কথায়, নদীর জল স্বাভাবিক স্তর থেকে চল্লিশ কিউবিট পর্যন্ত ওপরে উঠেছিল—যার মধ্যে কুড়ি কিউবিটে নদীর কিনার পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছিল এবং বাকি কুড়ি কিউবিটে সমতল প্লাবিত হয়েছিল। তাঁদের দু'জনের এ বক্তব্যেও মিল আছে যে স্তূপের ওপর গড়ে তোলা নগরীগুলিকে মিশর বা ইথিওপিয়ার দ্বীপগুলির মতোই দেখাত এবং এই প্লাবন থামত স্বাতি নক্ষত্র অন্তর্হিত হবার পর। তখন জল নেমে যেত। তাঁরা এও বলেছেন যে, জমি যখন আধশুকনো থাকত তখনই বীজ ছড়ানো হত এবং যদিও যে কোন সাধারণ মানুষ হালকাভাবে ফালি কেটে এই বীজ বুনত—কিন্তু ফসল নিখুঁতভাবে বপন করা বীজের ফসলের মতোই উৎকৃষ্ট মানের হত।'

'যে কোন সাধারণ মানুষ হালকাভাবে ফালি' কাটার একটাই অর্থ যে, জমিতে লাঙ্গল চষা বা গর্ত খোঁড়া হত না—শুধুই খাঁজকাটা মই দিয়ে চিরে দেওয়া হত। আবহমন্ডলের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে গ্রীকরা সৌর-পঞ্জিকার সাহায্য নিত, ভারতীয়রা চান্দ্র-পঞ্জিকার—যা এখনও চালু আছে। 'নগরী' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে টিলার ওপরকার প্রাচীর ঘেরা মূল গ্রামগুলিকে, সাধারণত যার চারপাশ ঘিরে থাকত সমষ্টিবদ্ধ ছাউনির অস্থায়ী উপনিবেশ—গ্রীকরা যেগুলিকে বলেছে 'গ্রাম'। সিন্ধুর বাঁধগুলির কথা উল্লেখ করা হয়নি, কেননা সেগুলি সম্ভবত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আর্যদের হাতে—যারা তখন স্বনামে সিন্ধুর পশ্চিম তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল, আফগানিস্থানের অংশবিশেষ এবং পূর্ব পারস্যে (যার নামটা তারা নিজেদের নামানুযায়ী করে নিয়েছিল—ইরান বা এরিয়ানা) প্রকৃত অর্থেই বসতি স্থাপন করেছিল (স্ট্র্যাবো ১৫.২.১, ১৫.২.৯)।

খাঁজকাটা মই ও বন্যার জলে কৃষিকাজের সপক্ষে আমাদের যুক্তিটা সে অর্থে খুবই সাধারণ। সিন্ধু সভ্যতার চিত্রলিপিতে এই ধরনের মই-এর প্রতীক খোদিত আছে, কিন্তু এমন কিছু পাওয়া যায়নি যাকে লাঙ্গল হিসেবে ব্যাখ্যা* করা যেতে পারে। প্রাপ্ত অনুকৃতিগুলির মধ্যে বলদ-টানা গাড়ী আছে অথচ লাঙ্গল বা জোয়ালের সন্ধান মেলেনি। সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তা সেই শত্রুদের সূত্র থেকেই—যারা সিন্ধু সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। এরাই হল আর্য এবং এদের নথিপত্র প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি হিসেবে টিকে আছে, বিশেষ করে *ঋগ্‌বেদ।* এই *ঋগ্‌বেদেই* আমরা পাই আর্যদের প্রধান যুদ্ধ-দেবতা ইন্দ্রকে—যিনি ব্রোঞ্জযুগের লুঠেরা সর্দারদেরই একটা মডেল। তাঁর অবিরাম কার্যক্রম হচ্ছে দেবতাহীন মানুষদের সঞ্চিত সম্পদ লুঠ করা। 'নিধিন অদেবান অমরনাদ আয়াস্য' (*ঋকবেদ,* ১০.১৩৮.৪)—এ কথাগুলি সম্ভবত সিন্ধু

* উল্লেখ্য যে, এস ল্যাংডন (মার্শাল ২৪৩৭, চিহ্ন-৬৮) একটি সিন্ধু প্রতীকের সন্ধান পেয়েছেন যা সুমেরীয় 'লাঙ্গল'-এর প্রতীকের মতোই—যদিও সেই ভাবলেখে এমন কিছু নেই যা আমরা ভারতীয় অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি। বোম্বের প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়ামে বর্তমানে একটি টেরাকোটার প্রত্নবস্তু রক্ষিত আছে—যা মোহেঞ্জোদারোর নীচের স্তরে পাওয়া গেছে। এটাকে কেউ চেয়ারের মডেল, আবার কেউ লাঙ্গলের অংশবিশেষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর লাঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম—কেননা তাতে কোন শক্ত জোয়াল বা হাতল লাগাবার ব্যবস্থা নেই. এর উপযোগী সম্পূরক অংশ যদি কাঠের হয় তবে তা ভেঙে যাবে, অথচ তখন লোহার প্রচলন ঘটেনি এবং ব্রোঞ্জও ছিল অত্যন্ত দুর্লভ।

উপত্যকার মানুষদের উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে, যাদের সম্পর্কে দুটি পরিভাষা ব্যবহার করা হত ঃ 'দস্যু' বা 'দাস', পরবর্তীকালে যার অর্থ 'বিজিত মানুষ' বোঝাত এবং 'পণি', যার অর্থ 'বাণিজ্যকারী'—যা থেকে 'বণিক' এবং আধুনিক কালে 'বানিয়া' শব্দ এসেছে। 'পণ' শব্দের মূল সংস্কৃত অর্থ 'মুদ্রা' এবং 'পণ্য' বলতে বোঝায় 'সওদা'। দাস এবং বণিক—এ দুটিই মনে হয়, সিন্ধু উপত্যকার জনগোষ্ঠীর প্রধান দুই শ্রেণী। আমাদের মুখ্য জিজ্ঞাস্য হল, এখানে কৃষির বিকাশ রুদ্ধ হয়েছিল কীভাবে? মেসোপটেমিয়ার ক্ষেত্রে, ধারাবাহিক আক্রমণকারীরা হয় বিতাড়িত হয়েছে, না হয় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে—কিন্তু নীচের দিকের উৎপাদক গোষ্ঠী যুগের পর যুগ তাদের কাজ চালিয়ে গেছে। অথচ সিন্ধু উপত্যকায়, আর্যদের আসার পর নগরজীবন ও নগরীগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। হরপ্পা উৎখননের সর্বোচ্চ স্তরে স্পষ্টতই বিদেশী ছাপ বিদ্যমান; যেমন সংলগ্ন 'H' চিহ্নিত সমাধিক্ষেত্রটি—যেটি আর্যদের নির্মিত বলে ভি জি চাইল্ড প্রথম অনুমান করেন। *ঋগ্‌বেদে* নগরীটিকে 'হরিউপিয়া' নামে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ 'স্বর্ণনির্মিত যূপস্তম্ভের নগরী'। স্পষ্টতই এটি একটি প্রাগার্য নামের সংস্কৃতায়ন এবং আদি ভারতীয় উচ্চারণ রীতির আরও একটি অক্ষম অনুকরণের দৃষ্টান্ত। *ঋকবেদে* এ কথাও বলা হয়েছে যে সেইস্থানে ইন্দ্র 'বরশিখা'দের অবশিষ্টাংশকে মাটির পাত্রের মত চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন এবং বর্মধারী 'বৃষিভট' যোদ্ধাদের একশ' তিরিশ জনের সম্মুখবাহিনীকে ধূলিসাৎ করেন। ফলে বাকিরা পালিয়ে যায় এবং রাজা অভয়বর্তিন কয়মিনা বিজয়ী হন। এ থেকে অবশ্য স্পষ্ট বোঝা যায় না যে যভ্যবতী (= রাভি) নদীর তীরের এই যুদ্ধ আর্যদের সঙ্গে প্রাগার্যদের হয়েছিল, না আর্যদেরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হয়েছিল। প্রথমটা হওয়াই বেশি সম্ভব, কেননা এর পর থেকে বৃষিভটদের সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি এবং অভয়বর্তিন কয়মিনার লোকজনই ঐ অঞ্চলে টিকে ছিল। এখানকার ক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবেই লিখিত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নথি মিলে গেছে। সুতরাং সে জায়গায় প্রাগার্য কৃষি ও বাণিজ্যকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল যার ফলে নগরীগুলি শুধুই স্মৃতি হয়ে রইল—তা আবিষ্কারের চেষ্টার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। হরপ্পায় পৌঁছলেও, এমন কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই যা থেকে বলা যায় যে আর্যরা মোহেঞ্জোদারোতেও পৌঁছেছিল। কিন্তু এ-ও হতে পারে যে নারমিনি নগরী, বহ্নির দেবতা অগ্নি যেটিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ (*ঋগ্‌বেদ,* ১.১৪৯.৩) করা হয়েছে (লাডউইগ-ও *ঋগ্‌বেদের* অনুবাদ এবং বিশ্লেষণে এ বিষয়টি তুলেছেন) সেটিই হয়ত মোহেঞ্জোদারো বা কোয়েটা-র দক্ষিণে সিবি-র নিকটস্থ তৃতীয় কোন সিন্ধু নগরী। সেই অর্থে *ঋগ্‌বেদে* নগরীগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনাই করা হয়নি এবং এই দুটিরও কেবলমাত্র নামোল্লেখই করা হয়েছে। কয়েক শতাব্দী পরে নতুন যে নগরীগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলি ছিল অপরিকল্পিতভাবে গ্রাম থেকে তৈরি—জলনিকাশি ব্যবস্থাহীন, অবিন্যস্ত এবং সম্পূর্ণ নতুন অঞ্চলে।

হরপ্পার 'H' চিহ্নিত সমাধিক্ষেত্রটির (মোহেঞ্জোদারোতে কোন সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়নি) উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—এখানে পূর্ণবয়স্ক মানুষদের হাড়গুলিই শুধু শবাধারে রাখা হত; তার আগে পক্ষী বা হিংস্র জন্তুদের দিয়ে মাংস (কিছু কিছু হাড় সমেত) ভক্ষণ করিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে (যার সম্ভাবনা কম) নেওয়া হত। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে, মনে হয় পুরো শবদেহ মাতৃজঠরের মত করে পাত্রের মধ্যে রেখে কবর দেওয়া হত। পাত্রের মধ্যে তাদের কঙ্কাল তাই পুরোপুরি পাওয়া গেছে এবং তাদের বয়োঃজ্যেষ্ঠদের শুধুই কিছু হাড়গোড়। পাথরের শবাধারে

গুটিসুটি করে শোয়ানো বা মস্তাবা-য় (মিশরীয় গঠন শৈলীর আয়তাকার সমতল ছাদবিশিষ্ট সমাধি কক্ষ) কবর দেওয়া বা লম্বাটে ঠেলাগাড়ির মত আধারে সমাধিস্থ করার মতোই পাত্রের মধ্যে কবর দেওয়াটা মাতৃজঠরে প্রত্যাবর্তন করার ধারণারই প্রতীক। হরপ্পার নীচের স্তরের সমাধিক্ষেত্র R-37-এ যে মৃৎপাত্রগুলি পাওয়া গেছে সেগুলির আকার ও গঠনশৈলী প্রায় একই ধরনের, কিন্তু একই স্থানের এই দুটি সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও লক্ষ্য করা গেছে। R-37 সমাধিক্ষেত্রে মৃতদেহগুলিকে অক্ষত অবস্থায় নিদ্রারত ভঙ্গিতে রাখা হয়েছে; অন্তত একটি ক্ষেত্রে আচ্ছাদন বা কফিনে রাখা হয়েছে। কিন্তু H সমাধিক্ষেত্রের শবাধারগুলি নতুন ধরনের কাল্পনিক পশুপাখির ছবি এঁকে লক্ষণীয় রকমের স্বাধীনভাবে সাজানো—যার তুলনায় R-37 সমাধিক্ষেত্রের মৃৎপাত্রগুলি নিতান্তই সাদামাটা। সমাধিক্ষেত্রের এই আমূল পরিবর্তন কোন অভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাক্ষ্য বলে মনে হয় না, বরং একটি দুর্বিনীত, লড়াকু, বর্বর বহিঃশত্রুগোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সপক্ষেই যথেষ্ট প্রমাণ আছে। হাতলের গর্তবিশিষ্ট কুঠার বা বাটালি কেবলমাত্র উপরের স্তরেই পাওয়া গেছে, অশ্ব (বা গাধার) অনুকৃতিও মিলেছে মোহেঞ্জোদারোর উপরের স্তরে। অনুমান করা যেতে পারে যে যমজ নগরীদুটির ক্রমক্ষয়িত স্বকীয়তা (মোহেঞ্জোদারোতে ইঁট ভাঁটাগুলি তৈরি হতে শুরু করেছিল পূর্বোক্ত বাসগৃহের অভ্যন্তরেই) ভেঙে পড়েছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণে। এদের প্রতিরোধার্থে বা এদের দ্বারাই শেষপর্যায়ে হরপ্পার নগরদুর্গের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এ কথা অবশ্য প্রমাণ করা যাবে না যে এই আক্রমণকারীরাই মোহেঞ্জোদারো বা চানহু-দারোর মধ্যে ঢুকেছিল বা দখল নিয়েছিল—কিন্তু প্রথমোক্ত নগরীটির ঘরগুলিতে, সিঁড়িতে বা রাস্তায় পড়ে থাকা বাসিন্দাদের কঙ্কাল, এবং দ্বিতীয়োক্ত নগরীটির শেষপর্বে কিছু নির্দিষ্ট অংশে বর্বর বিদেশী দখলদারীর সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হয় যে উভয়ক্ষেত্রেই অন্তুতপক্ষে একই ধরনের আগ্রাসন বা হানাদারি ঘটেছিল। উৎখনন থেকে এ-ও প্রমাণিত যে, এই নবাগতরা তাদের নিজস্ব কোন লিপি সঙ্গে আনেনি বা নগরীর নির্মাণকাজে নতুন কোন সংযোজনও করেনি (যদি না তা হরপ্পায় ইঁটচোরদের হাতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে থাকে) এবং হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকা সত্ত্বেও তাদের আসার অনতিপরেই নগরীগুলি ধ্বংস হয়। খাদ্য উৎপাদনের ভিত্তিও যদি না একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে থাকে—তাহলে এ ঘটনার অন্য কোন স্বাভাবিক ব্যাখ্যা নেই। পুরানো কৃষি-পদ্ধতির ধরন, যেমনই তা হোক না কেন, আক্রমণকারীরা অনুসরণ করেনি বা করতে পারেনি এবং তাদের নিজস্ব কোন উন্নত পদ্ধতিও ছিল না। সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার এটাই তফাত। মেসোপটেমিয়ায় একের পর এক আক্রমণকারীরা (যেমন, হামুরাবি বংশ) পুরনো নগরীগুলিকে ধ্বংস না করে নতুন নগরীর অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়েছিল এবং এভাবেই একইসঙ্গে প্রাচীন মেসোপটেমীয় নগরী তথা বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছে। সে নগরীগুলির বিলোপের (যেমন, উর্) কারণ হিসেবে পরবর্তী আসিরীয় বা পারসিক পর্বে সেচ-খাল ব্যবস্থার অবহেলাকে যথেষ্ট নিশ্চিত্ভাবেই দায়ী করা যায়।

বেদে ইন্দ্রকে জলস্রোতের বাধা অপসারণকারী রূপে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে। ম্যাক্সমুলার-এর সময়ে এই বর্ণনাকে একটা প্রকৃতি-পুরাণকথা হিসেবে গণ্য করা হত; বৃষ্টির দেবতা, যিনি মেঘের পিঞ্জর ভেঙে জলকে মুক্তি দেন—তাঁরই কাব্যিক উপস্থাপনা। উল্লেখই শুধু করা হয়েছে—কিন্তু কীভাবে তিনি তা করতেন তার আনুপূর্বিক বিবরণ না থাকায় এই ব্যাখ্যা

মেনে নিতে কষ্ট হয়। বৃত্র নামক এক অসুরের কবল থেকে ইন্দ্র নদীগুলিকে মুক্ত করেছিলেন। দুজন যোগ্য ভাষাতাত্ত্বিক[১৬] (যাঁদের ইরানী (আর্য) ও সংস্কৃত নথিপত্র সম্পর্কে পূর্ণ দখল আছে) এই 'বৃত্র' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। উৎপাদন-পদ্ধতির তাত্ত্বিক রূপ নিয়ে তারা অবশ্য বিশেষ মাথা ঘামাননি। তাঁদের সিদ্ধান্তটা ছিল বিশুদ্ধভাবেই ভাষাতত্ত্বের আলোয় এবং তাঁদের মতে, বৃত্র শব্দের অর্থ বাধা, বাঁধ বা অবরোধ—অসুর নয়। *ঋগ্বেদে* প্রকৃত যে বর্ণনা আছে তা থেকেও স্বতন্ত্রভাবে এমন অর্থ করা যায়। অসুরটি ছিল কালো সাপের মতো, নদীর ঢালের উপর শায়িত; নদীগুলিকে নিরুদ্ধ *তস্তভানাহ্* অবস্থায় রাখা হয়েছিল; ইন্দ্র যখন তাঁর বিধ্বংসী অস্ত্র (বজ্র) দিয়ে অসুরকে আঘাত হানলেন—ভূমির বাধা ভেঙে রথচক্রের মতো ঘূর্ণমান প্রস্তররাজি ও অবরুদ্ধ জলরাশি অসুরের নিপাতিত দেহের উপর দিয়ে ঢুকে পড়তে লাগল (দ্র. ঋগ্বেদ ৪.১৯.৪-৮; ২.১৫.৩)। নদীবাঁধ (পিগট কথিত জাঙ্গাল নয়) ভেঙে দেবার এটি একটি যথাযথ বর্ণনা। আবার, এই ধরনের প্রাগৈতিহাসিক বাঁধ আলোচ্য অঞ্চলের পশ্চিমাংশে অনেকটা ছোট নদীর ওপর এখনও খুঁজে পাওয়া যায়—যেগুলিকে বলা হয় গেব্‌র-বাঁধ। ইন্দ্র কর্তৃক নদীবাঁধ ধ্বংসের প্রমাণ যে শুধু বৃত্র-উপাখ্যানের যৌক্তিক ব্যাখ্যার মধ্যেই নিহিত—তা নয়। *ঋগ্বেদে* (২.১৫.৮) স্পষ্টই বলা হয়েছে ঃ 'রিনগ রোধামসি কৃত্রিমানঃ' অর্থাৎ, 'তিনি কৃত্রিম বাধা দূর করেছিলেন'। *ঋগ্বেদের* অন্যত্র এবং পরবর্তীকালের সংস্কৃতেও 'রোধ' শব্দের অর্থ 'বাঁধ'। কুলপ্লাবিনী বিভালি নদীর স্বাভাবিক স্রোতধারাকে রক্ষা করেছেন বলে ইন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাগার্য কৃষি-পদ্ধতি প্রাকৃতিক বন্যায় এবং ছোট নদীগুলির তীরবর্তী অঞ্চলে মরশুমি বাঁধ-এর (যা স্থায়ীভাবে নির্মাণ হত না) সাহায্যে জল ঢুকিয়ে জমানো পলিস্তরে মই চষার ওপর নির্ভরশীল ছিল। আর্যরা এই বাঁধ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এবং সেইসঙ্গে এখানকার কৃষি এবং নগরজীবনের স্থায়িত্ব তথা নাগরিকদের বসতিকে। ধ্বংস করে দেবার ঘটনাকে অস্বীকারের উপায় নেই, প্রাপ্ত উপাত্তগুলি থেকে কারণগুলিই শুধু নির্ধারণ করা বাকি—যে উপাত্তে-র মধ্যে রয়েছে, মোহেঞ্জোদারোর খননে পাওয়া অজস্র বন্যাজনিত পুরু পলিস্তর; নগর ও গ্রামকে বিপন্ন করা এই বন্যাগুলিই কৃষিকাজকে সম্ভব করে বাসিন্দাদের খাদ্য জোগাত। হেনরি ফ্র্যাঙ্কফোর্ট দেখিয়েছেন যে একই প্রযুক্তি থেকে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম যুগের মেসোপটেমিয়া ও মিশরীয় সভ্যতার মধ্যে অচিরেই প্রচুর পার্থক্য এসে গিয়েছিল (*বার্থ অফ সিভিলাইজেশন ইন দি নিয়ার ইস্ট*, নিউইয়র্ক, ১৯৫৬)। বিশেষ করে ফারাও-দের যে অসাধারণ ক্ষমতা তার ভিত্তি ছিল এটাই যে মিশরীয়দের "প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির যোগান ঘটত বাইরে থেকে, রাজন্যদের উদ্যোগে।" সেখানে সমস্ত পণ্যেরই সরবরাহ ছিল ওপর থেকে। মেসোপটেমিয়ায় বণিক এবং দেবস্থানের বৈশিষ্ট্য এমনই ছিল যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ফ্র্যাঙ্কফোর্ট-এর কোন কোন বক্তব্যকে চাইল্ড বা অন্যেরা সমালোচনা করেছেন এবং তা যথাযথ (দ্র. *অ্যান্টিক্যুইটি*-র আলোচনা)। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে সিন্ধু উপত্যকার বিষয়ে এই ধরনের কোন সমান্তরাল বিশ্লেষণ সম্ভব হয়নি, কেননা প্রামাণিক কিছু নেই।

উপরোক্ত টুকরো টুকরো যুক্তিগুলি থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় যা সংক্ষেপিত করলে দাঁড়ায় এইরকম ঃ সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা যদি হাতলওলা কুঠার, চওড়া ফলকযুক্ত বর্শা, তরবারি, সেচখাল, হাল-লাঙ্গল, নথিপত্রের জন্য মৃৎফলক (প্রকৃত অর্থে দীর্ঘস্থায়ী) ইত্যাদির প্রচলন ঘটাতে না পেরে থাকে তাহলে তার অর্থ হল এখানকার যে শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে

পৃথিবীর অন্য অংশের উন্নততর উৎপাদন-পদ্ধতির চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছিল—স্বভূমির উৎপাদকদের সঙ্গে কোনরকম সংযোগ বা সেখানকার পরিবর্তনে বাড়তি কোন ভূমিকা তাদের ছিল না। আবার এখানকার উৎপাদন থেকে যারাই লাভবান হোক না কেন দখলীকৃত উদ্বৃত্তে তাদের কর্তৃত্ব ছিল নিরাপদ; অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা ছিল নগণ্য বা প্রায় ছিলই না এবং দীর্ঘকাল ধরে নিজস্ব জনসাধারণ বা বহিঃশত্রুর দিক থেকে কোন বিপদ বা সহিংস বিরোধিতা ছিল না। সিন্ধু উপত্যকার সংস্কৃতির আদি বীজটি হয়ত পৃথিবীর অন্য কোন অংশ থেকে এসেছিল যার সঙ্গে সুমের-এর সংস্কৃতির (হতে পারে, সেটাই হয়ত আদিতে ছিল ভারতীয়) মৌলিক সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়; অথবা উচ্চ হিলমন্দ উপত্যকা থেকেও এসে থাকতে পারে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে, ভারতীয় ঐতিহ্যের যে যুগ শুরু হয়েছিল ৩১০১ খ্রী. পূ.-এ, যাকে কলিযুগের সূচনা বলে মনে করা হয়, তার সঙ্গে নগরীদুটির পত্তন ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা যুক্ত নয়। এই সমস্ত বসতিস্থাপনকারীরা ভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি মন্দির গঠন করে, খালের প্রচলন-পূর্ব বন্যানির্ভর মইচষা কৃষিপদ্ধতি অনুসরণ করে এবং তৃতীয় উর্ রাজবংশের অনেক আগেই সিলিন্ডারসীল-পূর্ব বাণিজ্যপদ্ধতি গ্রহণ করে। তাদের কর্মপদ্ধতি, মনে হয়, শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রিত ছিল মন্দিরের দ্বারা—যেখানে তীব্র প্রতিযোগিতার উত্তেজনা, বা এমনকী দীর্ঘদিন যাবৎ কোন ইতিবৃত্ত, নথি বা চুক্তি বলেও কিছু ছিল না। সামাজিক বদ্ধাবস্থার জন্য বাঁধগুলি কতখানি দায়ী না কী তারই লক্ষণ—তা অনুমানসাপেক্ষ। শেষ পর্যন্ত বর্বরেরা যখন সামরিক অভিযানের রাস্তা গ্রহণ করল এবং মরুভূমি পার হয়ে এসে হাজির হল—নগরীদুটি তখন ভেঙে পড়েছিল। যে সমাজব্যবস্থা সম্পদের অধিকারীদের বিরুদ্ধে হিংসাকে এতদিন নিষিদ্ধ রেখেছিল, প্রয়োজনের মুহূর্তে আত্মরক্ষাতেও তা অসমর্থ হল। এতদ্‌সত্ত্বেও বহিরাগত বর্বরেরা যেমন নগরীগুলিকে ধ্বংস করেছিল তেমনই ধ্বংস করেছিল বদ্ধাবস্থাকেও। নতুন নতুন এলাকা লাঙ্গল-এর ফলার আওতাভুক্ত হয়েছিল এবং পূর্বের অরণ্য অঞ্চল উন্মুক্ত হয়েছিল সাম্রাজ্য ও সম্পদের উৎস হিসেবে—যা আমরা পরে দেখব।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১. এ বি কেইথ ঃ *রিলিজিয়ন অ্যান্ড ফিলসফি অফ দি বেদ* (হারভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ ৩১-৩২) কেম্ব্রিজ, ১৯২৫, পৃ. ১০।

২. যথাযথ প্রত্নতত্ত্বের নিরিখে সিন্ধু উপত্যকার বৃত্তান্ত সবচেয়ে ভালো পাওয়া যায় গর্ডন চাইল্ড-এর *নিউ লাইট অন দি মোস্ট এনসিয়েন্ট ইস্ট* (লন্ডন, ১৯৩৫, ২য় সং. ১৯৫২) গ্রন্থে। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি-র প্রস্তাবনা খণ্ডে আর ই এম হুইলার-এর *দি ইন্ডাস সিভিলাইজেশন; ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া* ৩, (১৯৪৭), পৃ. ৮১-তে চমৎকার আলোচনা আছে। হুইলার আর্যদের হরপ্পা বিজয় এবং সেখানে বসতি স্থাপন বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী জে মার্শাল-এর *মোহেঞ্জোদারো অ্যান্ড দি ইন্ডাস কালচার,* ২য় খণ্ড (লন্ডন, ১৯৩১) বা ই জে এইচ ম্যাকে-র *ফারদার এক্সক্যাভেশনস অ্যাট মোহেঞ্জোদারো,* ২ খণ্ড (দিল্লি, ১৯৩৮) গ্রন্থগুলির দুঃখজনক সংক্ষিপ্ততা বিষয়ে সমালোচনাও করেছেন। হরপ্পা বিষয়ে দ্রষ্টব্য এম এস ভাটস-এর *এক্সক্যাভেশনস অ্যাট হরপ্পা* (দিল্লি, ১৯৪০)। এস পিগট-এর *প্রি-*

হিস্টরিক ইন্ডিয়া (পেলিকান বুকস, এ-২০৫, লন্ডন ১৯৫০) গ্রন্থটি সুপাঠ্য সংক্ষিপ্তসার, কিন্তু বৈদিক যুগ সম্বন্ধে ভাসা ভাসা। এই কাজগুলির কোনটিতেই সরঞ্জাম ও বাসনপত্র নির্মাণ বা ব্যবহারের কৌশল বিষয়ে কোন গভীর পর্যালোচনা নেই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি প্রথম স্তূপগুলি খনন করেন, তিনি অনুমান করেন যে রহস্যজনক সীলমোহরগুলি, যার কথা আগেই জানা ছিল, তার উৎসস্থল এখানেই। একইসঙ্গে কে এন দীক্ষিত, যিনি প্রথম মূল অংশের উৎখনন চালান, তাঁর অভিযোগ ছিল, সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার পূর্ববর্তীদের অলসতার কারণে বিলম্বিত হয়েছে। সিন্ধুর ভাঙা ইঁটের টুকরো (যেগুলি ছিল প্রায় ইংরেজ আমলের মাপের) পরীক্ষার জন্য এনে তাঁর কর্মীরা তাঁকে দেখালে এই যোগ্য গবেষক মন্তব্য করেন যে তিনি ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেছেন এই সিদ্ধান্ত টানার জন্যই যে এটি আধুনিক যুগের। গাঙ্গেয় উপত্যকায় ইঁটের মাপ যুগনির্দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক ; অশোক-পূর্ব যুগের অজস্র নির্মাণ কাজ থেকেই ইঁটের আয়তন ক্রমশ ছোট হতে থাকে এবং সবচেয়ে ছোট হয় মুঘল যুগে।

৩. আমি যতদূর জানি, এ অনুমান প্রথম করেছিলেন প্রয়াত বীরবল সাহনি—যিনি জোগি-লা গিরিবর্ত্মে প্রস্তরযুগের হাতিয়ারগুলি লক্ষ্য করেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই হাতিয়ারগুলি তুষার সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে অর্থাৎ এগুলি তৈরি হয়েছিল নিম্নাঞ্চলে। এ থেকে বোঝা যায় যে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর উত্থান ঘটেছিল ঐতিহাসিক কালেরও পূর্ববর্তী কোন সময়ে।

৪. সি জে গ্যাড ঃ Proc. Brit. Acad. 18, 1932, pp. 191-210; হেনরি ফ্র্যাঙ্কফোর্ট ঃ *সিলিন্ডার সিলস* (লণ্ডন, ১৯৩৯), পৃ. ৩০৪-৭; হেনরি ফ্র্যাঙ্কফোর্ট-এর *অ্যানৌটেটেড বিবলিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি* (লাইডেন, ১৯৩৪) পৃ. ১১-তে কিছুটা অনিচ্ছাকৃতভাবেই যেন যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তকে পরিহার করা হয়েছে। এখন থেকে কালনির্ণয়ের যে কোন প্রচেষ্টা ডব্লিউ এফ অলব্রাইট-এর কালপঞ্জিকা অনুসারে সংশোধিত করা প্রয়োজন—যেখানে হামুরাবি-র কাল ১৭২৮-১৬৮৬ খ্রী. পূ., অর্থাৎ প্রচলিত কালের ২০০ থেকে ৩০০ বছর পরবর্তী। দ্রষ্টব্য ঃ *বুলেটিন অফ আমেরিকান স্কুলস অফ ওরিয়েন্টাল রিসার্চ,* ১২৬, পৃ. ২০-২৬।

৫. প্রাণ নাথ ঃ *ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টারলি,* ৭ম, ১৯৩১, পৃ. ১-৫২; এখানে এ বিষয়ে প্রথম উল্লেখ করা হয়—তা ছাড়া লেখাটি যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর।

৬. এল এ ওয়াডেল : *ইন্দো সুমেরিয়ান সিলস্ ডেসিফারড়* (লন্ডন, ১৯২৫); বি হ্রোজ্‌নি : *Die ätteste Geschichie Vorderasiens and Idiens* (প্রাগ, মেলানট্রিখ, ১৯৪১-৩)। এইচ হেরাস-এর *স্টাডিজ ইন প্রোটো ইন্ডো-মেডিটেরানিয়ান কালচার,* খণ্ড-১ (বোম্বে, ১৯৫৩) গ্রন্থেও সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা আছে। (এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য : *অ্যামপুরিয়াস* (বার্সিলোনা, ১৯৪০), সংখ্যা-১, পৃ. ৫-৮১)। হেরাস-এর মতে চিহ্নগুলি আদি দ্রাবিড় যুগের। অন্যান্য সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ এ এল ব্যসম, *বুলেটিন অফ দি স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ,* ১৩, (১৯৫১), ১৪০-৫। এটি একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা। সমান্তরাল এট্রুসকান সম্পর্কে জি পিসিওলি, *ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুইটি* ৬২, ১৯৩৩, ২১৩-৫ দ্র.। ড. ব্যসম নিজেও জে কিউ ভিভস্-এর *Aportaciones a la interpretacion de la escritura proto-Indica* (মাদ্রিদ-বার্সিলোনা) ১৯৪৬ গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন।

৭. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বন্ধুদের কাছে বলতেন যে তিনি মোহেঞ্জোদারোতে একটি দ্বিভাষিক খোদাই আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু অন্যদের অযোগ্যতা প্রমাণের জন্য তা আবার চাপা দিয়ে রাখেন। কোন এক উপযুক্ত সময়ে তিনি তা পুনরাবিষ্কারের প্রস্তাবও দেন। কিন্তু যাঁরা শুনেছিলেন তাঁরা কেউই এ কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি।

৮. স্বামী জ্ঞানানন্দ আবিষ্কৃত বিক্রম-খোল খোদাই অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর; তুলনার জন্য দ্র. কে পি জয়সোয়াল, *ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি,* ৬২, ১৯৩৩, ৫৮-৬০। এখানে অনাবশ্যক মন্তব্যসহ প্লেটগুলি ছাপা হয়েছে।

৯. এ এল ওপেনহাইম : 'দি সিফেয়ারিং মার্চেন্টস অফ উর' (*জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি,* ৭৪, ১৯৫৪, পৃ. ৬-১৭)। এটি, এইচ এইচ ফিজুল্লা এবং ডব্লিউ জে মার্টিন-এর *লেটারস অ্যান্ড ডকুমেন্টস অফ দি ওল্ড ব্যাবিলনিয়ান পিরিয়ড* (লন্ডন, ১৯৫৩)-এর বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে লেখা। এই সূত্রগুলি এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ মিউজিয়মের আর ডি বারনেট প্রদত্ত তথ্যগুলি ও তাঁর মূল্যবান বিশ্লেষণের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এস এন ক্রামার-এর মতো স্বনামখ্যাত পণ্ডিত অনুমান করেন যে টিলুমিন হয়ত হরপ্পাই। সিন্ধুর ধাঁচের সীলমোহর এবং পি গ্লোলিও-র উৎখননের অন্য বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে একটু সন্দেহ হয় যে বালমেইন-ই ছিল সেই অঞ্চল।

১০. আমার নিবন্ধ 'অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ সিলভার কয়েনেজ ইন ইন্ডিয়া' (*কারেন্ট সায়েন্স,* সেপ্টেম্বর ১৯৪১, পৃ. ৩৯৬) দ্রষ্টব্য। ও নিউজিবাওয়ার কিউনিফর্ম চিহ্নগুলিকে ভিন্নভাবে পাঠ করেছিলেন যদিও অর্থোদ্ধার করতে পারেননি। সেগুলি আদৌ কিউনিফর্ম লিপি কিনা সে বিষয়ে বারনেট সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। কিন্তু এঁদের কেউই মূল রৌপ্যখণ্ডগুলি দেখতে সক্ষম হননি। আবার, যে ফোটোগ্রাফগুলি দেখানো হয় (আমার সমেত) সেগুলির কোনটিই যথেষ্ট উৎকৃষ্টমানের নয়।

১১. *ফাউসবোল* নং ৩৩৯; জার্মান ভাষায় এর সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন জে ডুটোয়েট (লাইপজিগ, ১৯২৫)। স্থানটির নাম ছিল বাভেরু (= বাবিরাস = ব্যাবিলন)। ভারতীয় বণিকরা দুর্লভ সামগ্রী হিসেবে প্রথমে কাক এনে এখানে বিক্রি করেছিল। বেশি লাভের আশায় দ্বিতীয় বাণিজ্যতরীতে তারা নিয়ে আসে ময়ূর। *জাতক* (৩৮৪) এবং *দিঘা-নিকায়*-১১ (*কেবত্ত সুত্ত,* সমাপ্ত)-তেও সমুদ্রযাত্রার এক স্বাভাবিক উপকরণ এবং এক প্রাচীন পদ্ধতি বা ঘটনা হিসেবে দিক নির্দেশক কাকের উল্লেখ আছে। সিংহলে নৌযাত্রায় দিকনির্দেশক পাখির উল্লেখ প্লিনি-ও (Hist. Nat. 6) করেছেন। অবশ্য, ইন্দো-ব্যাবিলনীয় বাণিজ্যের সূত্র হিসেবে জাতকের কাহিনী খুব বেশি নির্ভরযোগ্য নয়।

১২. এইচ ফ্র্যাঙ্কফোর্ট : *সিলিন্ডার সিলস্* (লন্ডন, ১৯৩৯), প্লেট XI. m; এই সীলমোহরে গিলগামেসের শ্বাসরুদ্ধ সিংহের ছবিও খোদিত আছে। এইচ হেরাস এটিকে নোয়ার নৌকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে ব্যাখ্যা করেছেন ('দি ক্রো অফ নোয়া', *ক্যাথলিক বিবলিক্যাল কোয়ার্টারলি* ১০, ১৯৪৮, পৃ. ১৩১-১৩৯); নিকটবর্তী তীরভূমির দিকনির্ণয়ের জন্য নোয়ার কাক ওড়ানো এবং সে ভূমিতে বৃক্ষাদি আছে কিনা জানার প্রয়োজনে কাকের পেছনে পোষা পায়রা—প্রাচীন সমুদ্রযাত্রার এটি একটি সুন্দর বর্ণনা।

১৩. সপ্তঋষি সমন্বিত 'বলি' সীলমোহর (চিত্র ১১)-তে একজন বিশিষ্ট ঋষি কোন আচার পালন করছেন; আর একজন স্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে ঝুলে আছেন। বিশ্বামিত্র কাহিনীর আদিরূপ

হিসেবে এটিকে সহজেই বোঝা যায়—যেখানে কৃতজ্ঞতাবশে এই ঋষি রাজা ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে উন্নীত করেছিলেন, কিন্তু দেবতারা তাঁকে নীচে ফেলে দেয়। শেষে একটা সমঝোতা অনুসারে হতভাগ্য নৃপতিটি আকাশে নক্ষত্র হয়ে ঝুলতে থাকেন। যে গাছের মধ্যে ত্রিচূড় মুকুট সহ মূর্তিটি ভাসমান তার পাতা দেখে বোঝা যায় যে সেটি পিপুল গাছ।

১৪. যেহেতু সিন্ধু উপত্যকার সীলমোহরের উল্টোদিকে গিঁট বাঁধার বা মোড়কের কোন চিহ্ন নেই, তাই এ বিষয়টি বরাবরই অস্বীকার করে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য, এটা জানা গেছে যে মেসোপটেমিয়ার ধর্মীয় স্মারকচিহ্ন সমন্বিত সীলমোহরগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িকলেনদেনের সীলমোহরগুলির তফাৎ ছিল শুধু আকারের, নকশার নয়। এই ছাপগুলি এমনকী ব্যবসায়িক দ্রব্যের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হত এবং প্রাচীনকালে সেটাও ছিল এক ধর্মীয় আচরণ। মোহেঞ্জোদারোর খননকার্যের প্রথম দিকের এক কর্মকর্তা আমাকে একটি ফোটোগ্রাফ দেখিয়েছিলেন যেটি, তাঁর মতে, কিছু দণ্ডগুচ্ছের অবশেষের ফোটো—যাতে সীলমোহরের ছাপ থাকতে পারে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক এবং তার পরবর্তীকাল থেকে বাণিজ্যিক মোড়ক বা সরকারি অনুমোদন সংক্রান্ত সীল নিয়মিতভাবে পরীক্ষিত হতে থাকে, যদিও এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে ঐ সময়কালেই তা হঠাৎ একটা রেওয়াজ হিসেবে চালু হয়েছিল।

১৫. ঝামা পাথরের পাহাড়, যা পরবর্তীকালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ছড়িয়ে পড়েছে, তা লক্ষ্য করলে আমার বক্তব্যের ব্যাখ্যা মিলবে। কাঁসারী পরিবারগুলি, যারা বংশানুক্রমিকভাবে এখানে কাঁসার পাত্র, কাপ, প্লেট ইত্যাদি তৈরি করত তাদের কর্মশালা থেকেই এগুলির উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী নবার এবং লঙ্কা নামের যে আধুনিক গ্রাম দুটি আছে সে দুটির স্বীকৃতি গোবিন্দ চন্দ্র গাহড়ওয়াল-এর কামাউলি সনদে (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ৪.১১৩) আছে, যদিও সম্পাদক তা চিহ্নিত করতে পারেননি। আবার, এমন কিছুও নেই যা থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে যে মূল বসতিটা তখন ছিল ধাতু শ্রমিকদের।

১৬. সি বেনভেনিস্‌তে এবং এল রেনোউ : বৃত্র *বৃথ্রগ্ন* (প্যারিস, ১৯৩৪)-এর বিশেষ করে পৃ. ১৯৬।

চতুর্থ অধ্যায়

সপ্তনদের দেশে আর্যরা

যে মানুষরা বেদকে প্রথম তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃতকে প্রথম কথ্য ভাষা এবং ইন্দ্রের নেতৃত্বাধীন একটি বিশেষ দেবগোষ্ঠীকে তাদের পূজ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল—তারা নিজেদের 'আর্য' নামে অভিহিত করে। এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালের সমগ্র সংস্কৃত এবং সংস্কৃত-উদ্ভূত ভাষাগুলি জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে এবং পরিশেষে এক সম্ভ্রমপূর্ণ সম্ভাষণে পর্যবসিত হয়। ইতিমধ্যে, 'মহান', 'সুজাত', 'মুক্ত' ইত্যাদি শব্দগুলিও আর্যশব্দটির অর্থগত পরিমণ্ডলের মধ্যে চলে আসে। উনবিংশ শতাব্দী থেকে পশ্চিমী পণ্ডিতরা আর্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত ভাষাগুলির বেশ কিছু গোষ্ঠীকে বোঝাতে,—যেমন, সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, জার্মান, শ্লাভ এবং রোমক ইত্যাদি। 'আর্য জাতি'-র ধারণাটা বেশ কিছু দিন 'ব্রেইকিসেফালিক গ্রামার'-এর মতোই একটা হাস্যকর ধারণা ছিল, এবং তা হয়ত আজও আছে—কিন্তু তার কারণ এই নয় যে প্রাচীন তথ্যসূত্রগুলির মধ্যে আর্যমানব বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি বরং এই কারণেই যে, জাতি সম্বন্ধীয় পুরো ধারণাটা—যা খুলির মাপ, চুল, ত্বক বা চোখের রঙের ওপর ভিত্তি করে করা হয়—জিনগত মূল্যায়নে সে পদ্ধতির বিষয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও, জানা গেছে যে প্রাচীন যুগে ভারতের বাইরের কিছু উপজাতি গোষ্ঠী নিজেদের আর্য বলে দাবি করত। পরিচিত আর্য ভাষাগুলির তালিকায় হিটটাইট ভাষা যুক্ত হবার পর ইতিহাসে আর্যদের সম্পর্কে আরও তথ্যের সংযোজন ঘটেছে। বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক বিচার থেকে দেবতা ও মানুষদের কিছু নাম বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা গেছে যেগুলি সেকালে আর্য ধর্মবিশ্বাস বা রাজন্য হিসেবে স্বীকৃত হত। সব মানুষই যে আর্য ভাষাগুলিতেই কথা বলত তা নয়—কিন্তু বৈদিক ও ইরানীয় আর্যদের মধ্যে এমন অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল যা থেকে তাদের একই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। আবার জ্ঞাতিত্বমূলক পরিভাষাগুলি থেকে কিছু ক্ষেত্রে, রোমান, গ্রীক, শ্লাভ ও জার্মানদের সম্প্রদায় বা উৎপত্তিগত মৌলিক সম্পর্ক বোঝা যায়। ইতিহাসে এই

জনগোষ্ঠীগুলির প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারতবর্ষ বা এমনকী অনেক অনুন্নত দানিয়ুব উপত্যকা বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার (যুদ্ধ কুঠার গাথা) বেশকিছু রাজনৈতিক আলোড়নের ঘটনা জড়িত। যেমন, ওল্ড টেস্টামেন্টের যে স্থাননাম 'গোশেন' (Goshen) তা হিব্রু নয়, বরং আর্যভাষাজাত 'গো' = গোরু বা গবাদিপশু থেকে। এটি নতুন ধরনের ভ্রাম্যমান পশুচারক আক্রমণকারীদের দ্বারা ক্যানান দখলেরই ইঙ্গিতবাহী।

৪.১ আর্যদের[১] যে দল সিন্ধু নগরীগুলিকে ধ্বংস করেছিল এখানে তাদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে সুমেরীয় ও সেমেটিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসেবে আর্যদের অজস্র ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভূখণ্ডে পাকাপাকি বসতি স্থাপন করেছিল। হিক্‌সোস—যারা তাদের ত্রয়োদশ রাজবংশের আমলে এশিয়া মাইনর থেকে মিশরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেখানে প্রায় ১৫৮০ খ্রী. পূ. পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল—তাদের নামের অর্থ করলে দাঁড়ায় 'মেষপালক রাজন্যকূল'; ভারতবিজয়ী আর্যদেরও এই নামে সঠিকভাবে বর্ণনা করা যেতে পারত। দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ রাজবংশের আমলে মিশরের (৯৪৫ খ্রী. পূ.-এর আগে) ফারাওদের মধ্যে বহুপ্রচলিত শশাংক নামটি নিশ্চিতভাবে আর্য ধ্বনিযুক্ত। এই রাজবংশের পূর্বপুরুষরা ছিল টিরহেনিয়ান, সার্ডিনিয়ান প্রভৃতি আর্যবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং বাইরে থেকে আসা। অবশ্য, প্রত্নতত্ত্বের নিরিখে বিচার করলে আর্যরা কোন একক 'সংস্কৃতি'-র নির্মাতা ছিল না—সুতরাং, তাদের বিষয়ে লিখতে হলে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার। আর্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মৃৎশিল্প, হাতিয়ার বা অস্ত্র সে অর্থে কিছু নেই। তারা যখন যাদের সংস্পর্শে এসেছে তাদের কাছ থেকেই সুবিধামতো গ্রহণ করেছে। জিনগত বা শারীরিক দিক থেকেও তারা সমশ্রেণীভূক্ত ছিল না। পোষ্য গ্রহণ ছিল সুপ্রচলিত—যেমন, কিছুক্ষেত্রে, বিজিত বা অন্য কোনভাবে সংস্পর্শে এসে আর্যীকৃত হওয়া ভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন। বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা সত্ত্বেও স্বতন্ত্র ধরনের কোন নিশ্চিত আর্য করোটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত অস্থির অবশেষগুলির ক্ষেত্রে নাসিকা-পরিমাপক পদ্ধতিও প্রয়োজ্য হয়। কিন্তু জীবনযাপন প্রণালীর পরিবর্তন ঘটলে স্বল্পকালীন বংশপরম্পরাতেই এ দুটির পরিবর্তন ঘটে এবং কোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীতে-শ্রেণীতেও পৃথক হয়ে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও, সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজের কিছু জনগোষ্ঠী জাতিগত অর্থে নিজেদের আর্যত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল। যেমন, পারস্যের প্রথম দারিয়ুস-এর সমাধিফলকে দাবি করা হয়েছিল যে, তিনি ছিলেন 'একজন পারসিক, পারসিকের পুত্র, আর্য বংশোদ্ভুত এক আর্য।' আলেকজান্ডারের অভিযানের সময় ইরান (= এরিয়ানা)-এর কিছু কিছু অঞ্চল এবং আফগানিস্থান থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত ভূ-ভাগ এরিওই-দের এবং সিন্ধুনদ তীরবর্তী অঞ্চল এরিয়ানোই-দের দখলে ছিল। ট্যাসিটাসের রচনাতে এরি-দের কথা উল্লেখ আছে জার্মানদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর উপজাতি হিসেবে। এরা দুর্জয় যোদ্ধা, কিন্তু নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে নিষ্ক্রিয়। এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী তথ্যগুলি থেকে অতঃপর সিদ্ধান্তে আসা যায় যে 'আর্য' বলতে আবশ্যিকভাবে যা বোঝাত তা হল এক নতুন জীবনযাপন রীতি ও ভাষা।

ঐতিহাসিক কালের অনেক আর্যগোষ্ঠীর কথাই জানা যায় যারা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মিশ্র জনগোষ্ঠীকে শাসন করত—যেমন, কাসাইট এবং হিটটাইট; অথবা গ্রীকদের মতো বহিরাগত

আক্রমণকারী বা বসতিস্থাপনকারী। ইতিহাস-পূর্ব কালেও এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে কিছুটা নিশ্চয়তার সঙ্গেই চিহ্নিত করা যায় যে—এরা ছিল অত্যন্ত রকমের ভ্রাম্যমান, যুদ্ধপ্রিয় ও লুণ্ঠনকারী এবং ব্রোঞ্জযুগে পিতৃতান্ত্রিক সমাজভুক্ত এই জাতিগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকাই ছিল গো-পালন। খুব তাড়াতাড়ি এরা লোহার ব্যবহার শিখে নিয়েছিল এবং তা ছড়িয়ে দিয়েছিল। ঘোড়ার সামরিক গুরুত্বের কথা এরাই প্রথম অনুধাবন করেছিল (বিশেষ করে কাসাইট-রা)—যদিও তা আর্যরথকে দ্রুতগামী করার জন্য জুতে দিয়ে, অশ্বারোহী হয়ে নয়। রাজরথ টানার কাজে সুমেরীয়রা গাধা ব্যবহার করত, কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। অবশ্য, রথের ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জামগুলি ছিল স্থুল ধরনের—দীর্ঘদিন ধরে শকট ও লাঙ্গলবাহী ষাঁড় বা বলদের জোয়ালেরই সরাসরি প্রয়োগ এবং তাতে ঘোড়ার দম আটকে যাবার উপক্রম হত। ঘোড়-সওয়ার সৈনিকের আবির্ভাব আরও কয়েক শতাব্দী পরের ঘটনা—আসিরীয় অশ্বারোহী বাহিনী যে যুগে সবচেয়ে বেশি খ্যাতিলাভ করেছিল। চাষের কাজে ঘোড়ার ব্যবহারটা ছিল একান্তভাবেই উত্তর-ইউরোপীয় আবিষ্কার। ঘোড়ার একচেটিয়া সামরিক ব্যবহার সমাজজীবনেও ছাপ রেখে গিয়েছিল; এক নতুন সামাজিক উচ্চবর্গের জন্ম হয়েছিল, অশ্বারোহী বর্গ—যারা ঘোড়ার মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকারী। ইংরাজি ক্যাভেলিয়ার (বীরপুরুষ) এবং শিভালরি (বীরত্ব) শব্দদুটি এই অশ্বযুগেরই অবদান, যেমন সিভিলাইজেশন (সভ্যতা) শব্দটি এসেছে সিটি লাইফ (শহরজীবন) থেকে।

নাম এবং ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বিশেষভাবে ইরান ও ভারতবর্ষের আর্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচুর মিল দেখা যায়। প্রাচীন যুগে একই ধরনের উৎপাদন-উপায়ের সাহায্যে যারা জীবনধারণ করত তাদের মধ্যে একই ধরনের আচার পালন রীতি জন্ম নিত কিন্তু নামের মিলের অর্থ হল কোন ধরনের সংযোগ থাকা। মৃতদেহ দাহ করার প্রচলন সম্ভবত আর্যদের মধ্যেই প্রথম ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ধাতুযুগের আগে যদি আদৌ এ প্রথার কথা জানাও থাকত তা হলেও তা সামাজিক অনুমোদন পায়নি। আকরিক আগুনে পোড়ালে যেমন বিশুদ্ধ ধাতুতে পরিণত হয়, মৃতদেহ দাহ করলেও তেমনি তার অপবিত্র অংশ বিলীন হয়ে যায়—এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। আগুন ছিল পবিত্র। প্রকৃতপক্ষে অগ্নি ছিলেন এক প্রধান বৈদিক দেবতা এবং ইরানীয়দেরও প্রধান পূজ্য। প্রাচীন ধারণায় অপবিত্র মৃতদেহে তার স্পর্শ পাওয়ার অর্থ এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ইরানীয়রা শেষপর্যন্ত শবভোজী পশুপাখিকে উৎসর্গ করে সৎকার করাটাই পছন্দ করেছিল, তা সত্ত্বেও ইরানী শবস্তম্ভ 'দখমা'-র আসল অর্থ 'দাহ স্থান'। ভারতবর্ষে, যাদের আর্য বলা হয়, তাদের মধ্যেও মৃতদেহ উন্মুক্ত স্থানে রেখে যাওয়ার প্রথা প্রায় দশম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত চালু ছিল। দাহপ্রথা মূলত সংরক্ষিত ছিল অগ্নিহোত্রী ও দলপতিদের মধ্যে—পরে যা ধীরে ধীরে নীচুতলার মানুষ গ্রহণ করে। দেহমাংস পুড়ে যাওয়ার পরে অস্থি ও ভস্মের অবশেষ আধারে স্থাপন করে দ্বিতীয় দফায় অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করার প্রথা এক সময় ভারতে চালু ছিল। এই প্রথারই পরবর্তী রূপ কোন পুণ্যতোয়া নদীতে সেগুলির বিসর্জন।

এ সব থেকে বোঝা যায় যে আর্যদের নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। অবশ্য এদের যে উপ-গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক আগমন ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছিল, নিশ্চিতভাবেই জানা যায়, তারা খোরেজ্‌ম অঞ্চলের পশুপালক জনজাতি থেকে উদ্ভূত হয়ে দুটি ভিন্ন স্রোতে এখানে এসেছিল। প্রথম স্রোতটি এসেছিল খৃ. পূ. দুই সহস্রাব্দের শুরুতে এবং দ্বিতীয়টি শেষের দিকে। ইরানের রাজা যিমা (ভারতীয় যম—পরবর্তীকালে মৃত্যুর দেবতা)-র যে বর, অর্থাৎ কল্পলোক—

যেখানে তাপ, শৈত্য, ক্ষুধা, মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে না (*ইয়াসনা,* ৯.৪.৫)—উৎখননের ফলে তার সন্ধান মিলেছে (এবং ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত আয়তনের সঙ্গে তার হুবহু মিল আছে)। জায়গাটি আসলে প্রস্তরবেষ্টিত এক উঁচু ভূখণ্ড, যেখানে গবাদি পশুগুলি মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াত এবং মানুষ থাকত দেওয়াল আঁটা ঘরে। এটি, গ্রীক পুরাণে বর্ণিত অগিয়ান-এর যে আস্তাবল হেরাক্লস্ সাফ করতেন—নিশ্চিতভাবে তারই অনুরূপ। দেশান্তর যে সঠিক কী কারণে শুরু হয়েছিল তা পরিষ্কার নয়—কেননা বড় ধরনের কোন অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সম্ভবত জনসংখ্যা বৃদ্ধিই যথেষ্ঠ কারণ। পশুপালক এই যাযাবরদের কোন কোন দল খোরেজম থেকে রাশিয়ায় স্তেপ অঞ্চলগুলি দখল করতেও গিয়েছিল। অন্যেরা কাস্পিয়ান সাগর ঘুরে এশিয়া মাইনরে ঢুকেছিল। আর একটি দল দানিয়ুব উপত্যকা ও উত্তর ইউরোপে যুদ্ধকুঠারধারী মানুষরূপে আবির্ভূত হয়। এদের দ্রুত উপযোগী হয়ে ওঠার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ—যার প্রমাণ, গ্রীক নৌ অভিযানগুলি। এমনকী *ঋগ্‌বেদ,* যার আলোচ্য স্থান মূলত উত্তর পাঞ্জাব, সেখানেও প্রসঙ্গক্রমে নৌবহরের (প্রায় একশ' দাঁড় সমন্বিত) সাহায্যে তিনদিনের পথ অতিক্রম করার কথা উল্লেখ আছে।

আর্যজনতার একক সত্ত্বা হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ তাদের ঐতিহাসিক সাফল্য—যা প্রাচীন হাতিয়ার ও বিশ্বাসগুলিকে আঁকড়ে থাকা আদিম, রক্ষণশীল কৃষক জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার ব্যবধানের প্রাচীরগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। দু'হাজার বছর পরে, সমাজবিকাশের অন্য এক স্তরে, আরবরাও একই কৃতিত্ব দেখিয়েছিল—এমনকী ভাষাগত পরিবর্তন সমেত। এটা প্রমাণিত যে এই সমস্ত জনগোষ্ঠীগুলির মানুষরা ধ্বংস হয়ে যায়, তবু তাদের রক্ষণশীলতা ছাড়ে না—যেমনটা ঘটেছে ঘাম্মুলিয়ান (ডেড সী-র কাছাকাছি অঞ্চলে) বা এইরকম ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে, যাদের চিনে নিতে হয় কেবলমাত্র বিচিত্র সাজসজ্জা থেকেই। আর একটু বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বৃটেন, আইবেরিয়া বা দক্ষিণ ভারতে বৃহৎ প্রস্তরযুগের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাতাদের কাজকর্মও ছিল একইরকম। তারা তাদের তুলনামূলকভাবে সামান্য উদ্বৃত্তটুকু বিনিয়োগ করত মৃতের জন্য আচার-অনুষ্ঠানের কাজে—সমাজের অগ্রগতিকে যা কোনভাবেই সাহায্য করত না। মাল্টা, প্রস্তরযুগের শেষে যা ছিল এক পবিত্র দ্বীপভূমি—বাণিজ্য ও ধর্মের অবদান হিসেবে সেখানে ছিল শুধু অজস্র সমাধি। প্রথমটি থেকে মানব প্রগতির সহায়ক যা কিছু অর্জিত হয়েছিল তাকে আচ্ছন্ন করে রইল শেষেরটি। মেসোপটেমিয়া বা সিন্ধু উপত্যকার জীবনচর্যা কিছুটা উন্নত পর্যায়ে পৌঁছলেও তা আবার বদ্ধাবস্থায় আটকে গিয়েছিল। আগেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে সিন্ধুর নাগরিকরা খাদ্য উৎপাদনের জন্য উন্নত হাতিয়ার বা তাদের পক্ষে সম্ভব এমন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেনি। মিশর তার প্রচুর উদ্বৃত্ত দিয়ে অদ্ভুত নিখুঁতত্বে বিশাল বিশাল পিরামিড গড়েছিল এবং গোটা দেশটাতে ছেয়ে গিয়েছিল মৃতের কবর আর পুরোহিতকুল। আর্যরা অজস্র বিচ্ছিন্ন আদিম জনগোষ্ঠী ও তাদের বিশ্বাসগুলিকে এমনভাবে চুরমার করে দিয়েছিল যে তার অবশেষ থেকে নতুন ধরনের সমাজ গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। তারা যে সচেতনভাবে বা মহানুভবতার প্রেরণায় নতুন সমাজ গঠনে ব্রতী হয়েছিল তা নয়, বরং আশু স্বার্থের তাগিদে ধ্বংসাত্মক লোলুপের আচরণই করেছিল। তাই, তাদের প্রধান অবদান হল এক নতুন উৎপাদন-সম্পর্কের প্রচলন এবং এমন ব্যাপকভাবে যে তা থেকে সৃষ্টি হল এক গুণগত পরিবর্তন। অজস্র জনগোষ্ঠী

যারা প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তাদের বাধ্য করা হল এই নতুন ধরনের সমাজ সংগঠনে যুক্ত হতে। ভিত্তিটা ছিল সমস্ত ধরনের দক্ষতা, হাতিয়ার, উৎপাদন কৌশল ইত্যাদির এক নতুন সহজলভ্যতা—যা এতদিন স্থানিক গুপ্তবিদ্যা হিসেবেই ছিল। এর অর্থ হল গ্রহণশীলতার ক্ষেত্রে এক নমনীয়তা তথা স্বচ্ছন্দ উদ্ভাবনক্ষমতা, নতুন বিনিময় প্রথা তথা নতুন পণ্য উৎপাদন। ফলে, নতুন নতুন অঞ্চলে কৃষিকাজ ছড়িয়ে পড়ল এবং এমন সব পদ্ধতির সাহায্যে যা এতদিন ভূমিজ মানুষদের কল্পনারও বাইরে ছিল। এ সবই বিস্তৃত পুরাতাত্ত্বিক নথি থেকে বুঝে নেওয়া যায়। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে যেখানে এই নতুন পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ ঘটেছে—পূর্ববর্তী বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ বা নরবলির যুগের চেয়ে—সেখানে তা অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছে। সারগন যুগ থেকে, শেষতম আসিরিয় নৃপতির রাজত্বকাল পর্যন্ত নিকট প্রাচ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং নৃশংসতাই শুধু বেড়েছিল—সে তুলনায় উন্নতি কিছু ঘটেনি। এই ধরনের বিজয়কে মেসোপটেমিয়ার সেচ বিনষ্টকারী প্রাকৃতিক খরার সঙ্গেই কেবল তুলনা করা যায়। আর, আর্য বিজয় ছিল ধ্বংসাত্মক বন্যার মতো—যা ভূমিকে উর্বরা করেছিল এক নতুন সৃষ্টিকে আবাহন করতে। প্রাগার্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী লোকাচার বা মৃতদেহ সৎকার প্রথাগুলির সামাজিক ভূমিকা হল কেবলমাত্র স্থিতাবস্থাকেই বজায় রাখা—যা নতুন উদ্ভাবনাকে নিরুৎসাহিত করে মানুষের মনোজগৎকে মোহাচ্ছন্ন রখে। আর্য অভিযান সেই অচলায়তন সমাজগুলিকে, তাদের লোকাচারগুলি সমেত, বিদায় দিয়েছিল।

বিচূর্ণ বাধার প্রাচীরগুলিকে কখনই আর সেভাবে খাড়া করা গেল না, কেননা সামাজিক আদানপ্রদানের প্রক্রিয়ায় আর্যরা যুক্ত করল এক অমূল্য অবদান—বিশাল অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে দিল একটা সহজ ভাষা। তাদের নিজস্ব কোন বর্ণমালা ছিল না— কিন্তু কিউনিফর্ম ও ফিনিশীয় লিপি থেকে যা কিছু তারা পেয়েছিল তাকেই সরলীকৃতভাবে গ্রহণ করে ছড়িয়ে দিল। পার্থক্যটা হয়ে গেল যে, অক্ষরজ্ঞান তখন আর শুধু পেশাদার ধর্মব্যাখ্যাতা অর্থাৎ পুরোহিতশ্রেণীর ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে বা সংকীর্ণ মুষ্টিমেয় বণিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে থাকল না। অন্যদিকে, পুরোনো নথিপত্র—যদি কিছু থেকে থাকে—বিলীন হতে লাগল এবং নির্দিষ্ট স্তরবিন্যাসে এসে পুরাতাত্ত্বিক তথ্যও কমে এল। আর্য বসতিগুলির প্রতিনিয়তই স্থান বদল ঘটত এবং অনড় সিন্ধু সভ্যতার তুলনায় অনেক কম জিনিসই তারা ফেলে যেত যেগুলি কালোত্তীর্ণ হতে পারে। বৈদিক কোন নথি থেকেই কোন কালপঞ্জি নির্ণয় করা যায় না, এমনকী মৃৎশিল্পের যে বিন্যস্ত ক্রম তা থেকে কোন আপেক্ষিক কালপঞ্জিও নয়। ভারতীয় সমাজের কোন নির্দিষ্ট উপাদান আর্যোদ্ভূত কী আর্যোদ্ভূত নয় তা নির্ণয় করা এই কারণেও কঠিন হয়েছে যে শব্দগুলির অর্থ যুগে যুগে পাল্টে গেছে এবং উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে আচার-অনুষ্ঠানও। কখনও কখনও ইরান ও ভারতীয় আর্যদের মধ্যেকার কোন সদৃশ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগে যে তারা উভয়েই পূর্ববর্তী কোন সমাজ থেকে তা গ্রহণ করেছিল কিনা, যেহেতু সেই পূর্ববর্তী সমাজগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল—যেমন সুমের ও সিন্ধুর নগর সংস্কৃতিতে। সবশেষে, অনার্য ভারতীয়দের আর্য জীবনধারা ও ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার প্রক্রিয়াটা ছিল শান্তিপূর্ণ, সে তুলনায় মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে উত্তরণের যে স্বাভাবিক ক্রম তা বিঘ্নিত হয়েছিল পূর্বোক্তটির দ্বারাই। স্ত্রী-ধন (ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা সামান্য অংশ মাতৃধারায় প্রদান)-এর মতো মাতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালের ভারতীয় সমাজে পুনঃপ্রচলিত হয়েছিল, যা পুরোনো

জীবনচর্যাকে নতুনের দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে আত্তীকৃত করারই দৃষ্টান্ত বলা ছাড়া অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ইতিহাসের যে সংজ্ঞার কথা আমরা আলোচনা করেছি তা মাথায় রেখে একটু সতর্কতা অবলম্বন করলে এই ধরনের জটিল বিষয়গুলিকে বুঝতে পারা যায়।

৪.২ আর্যদের অভিযান, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ এবং বিজয়লাভ পর্ব বিষয়ে প্রধান সূত্রই হল চতুর্বেদের মধ্যে প্রাচীনতম *ঋগ্‌বেদ*—কিন্তু এর সমর্থনে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ খুবই অল্প। এই ধরনের প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায় যখন দেখি সিন্ধু উপত্যকা আবিষ্কারের পর কীভাবে বৈদিক ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ পুনর্মূল্যায়ণ ঘটেছিল; *ঋগ্‌বেদ*-এ (৬.২৭.৫) বর্ণিত হরিউপিয়া-কে একসময় চিহ্নিত করা হয়েছিল, হরপ্পা নয়, কুরাম-এর শাখা হালিয়াব বা আরিয়োব নদী হিসেবে—ফলে যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনাস্থল হয়ে গিয়েছিল আফগানিস্থান। অলব্রাইট কৃত কালপঞ্জি অনুসারে, সিন্ধু সভ্যতার পতন হয়েছিল আনুমানিক ১৭৫০ খ্রী.পূ.। *ঋগ্‌বেদ*-এর ঘটনাবলীর সময়কাল অনুমান করা হয়েছে ১৫০০ খ্রী.পূ.[৩] (অভ্যন্তরীণ লক্ষণগুলির ওপর নির্ভর করে—যা আমার কাছে পরিষ্কার নয়)। *যজুর্বেদ* বর্ণিত স্থায়ী বসতি স্থাপনের সময়কালটা নিশ্চিতই শুরু হয়েছিল ৮০০ খ্রী.পূ. নাগাদ। সুতরাং, শুধু ভাষার ভিত্তি করেই *ঋগ্‌বেদ*-কে বিভিন্ন কালপর্যায়ে ভাগ করে নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়—যদিও সে ভাষাকে এখন অনেকটাই দুর্বোধ্য মনে হয়। পরবর্তীযুগের অনেক ব্যাখ্যাকার, যাঁরা বেদকে অতীন্দ্রিয় দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হিসেবে গণ্য করেন, তাঁরা এই ভাষার অনেক ভুল ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। একটি বিষয়েই শুধু গবেষকরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই সন্তুষ্ট যে, ধ্রুপদী সংস্কৃত রচনাগুলির তুলনায় *ঋগ্‌বেদ*-এর মূল পাঠকে অনেক বেশি নিশ্চয়তার সঙ্গে রক্ষা করা গেছে। *ঋগ্‌বেদ*-এর সূক্তগুলিকে বরাবর গণ্য করা হয়েছে অপরিবর্তনীয় হিসেবে—যা অনাদিকাল ধরে সৃষ্টিতে ছিল এবং এ কোন রচনা নয়, দ্রষ্টা যা 'দেখেছেন' তারই বিবরণ। কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় বিনা পরিবর্তনে বেদগুলিকে (বিশেষ করে *ঋগ্‌বেদ*) মূলানুগ রাখা হয়েছে—যার পরিচয় আমরা পরবর্তীকালের পুরোহিত শ্রেণী তথা ব্রাহ্মণদের কর্মপদ্ধতির মধ্যেও দেখেছি। নবশিক্ষার্থীকে বিদ্যালাভের জন্য কোন এক নির্দিষ্ট অরণ্যে কোন এক নির্দিষ্ট গুরুর কাছে যেতে হত। বারো বছর বা তারও বেশিকাল তাকে গুরুর গো-পালন, খাদ্য আহরণ (কিন্তু কখনই উৎপাদন নয়) ইত্যাদি কাজ করতে হত এবং গুরু তাকে শাস্ত্র শিক্ষা দিত। শিক্ষার প্রথম ধাপ ছিল পবিত্র শাস্ত্রগুলির শ্লোকের পর শ্লোক নির্ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি করতে শেখা। দীর্ঘ ব্যাখ্যার সাহায্যে অর্থগুলি পরে বোঝানো হত, কিন্তু তার আগে শিষ্যকে পুরো শাস্ত্রটি স্মৃতিতে ধরে রাখতে হত। ফলে, শাস্ত্রগুলি রয়ে গেল ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই অলিখিত (জুলিয়াস সিজার-এর সময় যেমন গলদেশের ড্রুইডদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল)। সুতরাং, ব্রাহ্মণরা সাধারণ মানুষের মধ্যে এক অতুলনীয় প্রতিপত্তি অর্জন করল এবং সেইসঙ্গে ক্রিয়াকর্মের একটা ঐক্য। সংক্ষেপে, এর ফলেই তারা একটা শ্রেণীতে পরিণত হল এবং সেই ক্ষমতাশালী শ্রেণী—যা পরবর্তীকালের ভারত ইতিহাসকে প্রভাবিত করল।

আর্যরা, খুব সম্ভব ছিল পুরুষতান্ত্রিক। দেবতাদের অধিকাংশই ছিল পুরুষ। প্রধান আরাধ্য দেবতা ছিলেন অগ্নি, অর্থাৎ পবিত্র আগুন (ইরানীয়দের ক্ষেত্রেও তা-ই) এবং ইন্দ্র—যে পদে উপযুক্ত কোন আর্যপ্রধানকে দেবত্বে ভূষিত করে বৃত করা হত। অপরাজেয় এই ইন্দ্র বজ্রের সাহায্যে (একটি গদা, পরে বাজ) যুদ্ধ করেন তাঁর দ্রুতগামী রথে চড়ে ; প্রমত্ত হন সেই পবিত্র

সোমরস (ইরানী হাওমা) পান করে যা এখনও চিহ্নিত করা যায়নি; নগরী এবং বাঁধগুলিকে ধ্বংস করে নদীগুলিকে মুক্ত করে দেন—যাতে তাঁর অনুগত মানুষরা জল পায়; অবিশ্রান্তভাবে দেবতাহীন শত্রুপক্ষের কোষগুলি লুণ্ঠন করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শক্তি ও ছলাকলা দুইই ব্যবহার করেন। ইন্দ্রের নীচেই যে দেবতা—তিনি বরুণ (গ্রীক অউরনোস); আকাশে থাকেন, অনেক বেশি দয়ালু, কিন্তু শাস্তি দেবার জন্য কোন মরণশীল প্রাণীকে রোগাক্রান্ত করে নিপাত ঘটাতেও সক্ষম। দেবিকাদের সংখ্যা খুবই কম, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইলা—যাঁকে সুরা সরবরাহকারিণী সাকি-র মতো মনে হয়। উষার দেবতা উষস (ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে যিনি হোমারের ইওস-এর সমার্থক, কিন্তু এখানে যেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, মেসোপটেমিয়ার ঈশতার-এরও ইনি প্রায় সদৃশ) দীর্ঘদিন ধরে পূজিতা এবং এমনকী ইন্দ্রের সঙ্গে এক সংঘাতে পরাজয়ের পরেও। দেবতারা সাধারণত অবিবাহিত, মহিলা সঙ্গি সহ তাঁদের কদাচিৎ দেখা যায়। দেবতাদের স্ত্রী-দের সম্মিলিতভাবে গ্নাস বলা হয়, যাদের আসলে কোন ভূমিকাই নেই। এটা সম্ভবত, সেই সময় এবং সমাজে আর্যদের যুগল বা বিবাহিত জীবনের অনুপস্থিতিরই প্রতিফলন। ত্বাস্ত্র নামের এক কারিগর দেবতার সন্ধান পাওয়া যায়, ভারতের বাইরে যাঁর অস্তিত্বের কথা জানা নেই; এঁকে এক সময় স্রষ্টা বলে মনে করা হত। এটা এমন এক ধারণা যা সেই আদিম সময়ের সঙ্গে খুব একটা খাপ খায় না—কেননা তখন যা কিছু তৈরি করা হত তার গুরুত্ব উর্বরা ধরিত্রীমাতার দানের চেয়ে অনেক কম হত। অন্যত্র আমি দেখিয়েছি যে, এই কারিগর দেবতা আর্যপূর্ব সমাজ থেকে গৃহীত, সম্ভবত সেই সমাজের কারিগরকুল সহ। যুদ্ধরথ—যার সমগ্র খুঁটিনাটি এবং মাপজোক বেদ থেকে নির্ভুলভাবে উদ্ধার করা যেতে পারে—তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজন ছিল নিখুঁত কারিগরি দক্ষতা। বলদটানা ভারী শকট (অনস্)-ও পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হত।

বেদে লাঙ্গলকে বলা হয়েছে 'সিরা'। প্রধান খাদ্যশস্য যব বলতে সাধারণভাবে সমস্ত খাদ্যশস্যকেই বোঝাত। গম (গোধূম, গ্রীকভাষায় বোসমোরোন) এবং চাল (বৃহি)-এর কথা প্রাচীন বেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। কাস্তে (দাত্র)-এবং খননের হাতিয়ার 'খনিত্র'-এর কথা বলা হয়েছে। বাসিন্দাদের বলা হয়েছে কৃষক (কৃষ্টি) এবং অকর্ষিত জমি হল 'অকৃষিবল'। জমির ভাগ বাঁটোয়ারা বা মালিকানা সম্পর্কে কোন কিছুই বলা হয়নি—তা বেচাকেনা বা অন্য কোন পণ্যের বিষয়েও কিছু নেই। সম্পদের প্রধান উৎস ও পরিমাপ ছিল গো-ধন এবং পরবর্তী পর্যায়ে অশ্ব। কোন অমাত্য ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত উটও দান করত। মহিষ ছিল 'শক্তিশালী পশু'—কিন্তু চাষের কাজের উপযোগী এই প্রাণীটিকে মনে হয়, তখনও পর্যন্ত পোষ মানানো যায়নি। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গবাদি পশু ও ঘোড়ার এমনকী, রঙের ভিন্নতা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ নামকরণ হত। স্বাভাবিকভাবেই, জলের জন্য লড়াইটা আলাদা গুরুত্ব পেত। ইন্দ্রকে বলা হয়েছে অপসু-জিৎ অর্থাৎ অপ (জল)-জয়ী (*ঋগ্বেদ*, ৮.১৩.২, ১.১০০.১১, ৬.৪৪.১৮ এবং অন্যত্র)। *ঋগ্বেদে* (২.২০.৮) এবং অন্যত্র বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র জলের জন্যই ইন্দ্র দস্যুদের উদ্ধত নগরীগুলিকে চূর্ণ করেছেন। শুধু ইন্দ্রই নয়, সব মানুষই জলের জন্য লড়াই চালাত (*ঋগবেদ*, ৪.২৪.৪)। অর্থাৎ, সিন্ধু অববাহিকার জলের ভাগ নিয়ে আজকের ভারত-পাকিস্তান যে বিরোধ তার উৎপত্তি ৩৫০০ বছর আগে। তখন লড়াই হত সন্তানের (তনয়) জন্য, গবাদি (গোসু) পশুর জন্য, জলের (অপসু) জন্য (*ঋগ্বেদ* ৬.২৫.৪)। যুযুধান দু'পক্ষই ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে জয়ের কামনায়—যা

স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ করে যে সংঘর্ষ ক্রমবর্ধিত হয়েছিল আর্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যেই। যাযাবর পশুপালক জীবনের মধ্যেকার বহুবিধ দ্বন্দ্ব বা নগর-অবরোধের সফল অতীত বিলীন হয়ে স্থিত কৃষিব্যবস্থার বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে শুরু করেছিল।

সিন্ধু উপত্যকার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনায় আসার আগে এটা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, আর্যজনতার সঙ্গে তাদের বর্হিভারতীয় ঐতিহ্যের সংযোগটা তখন ছিন্ন হয়ে যায়নি। প্রায় ১০০০ খ্রী.পূ. সময়কার কিছু সিরীয়-হিটটাইট সীলমোহরে কুঁজবিশিষ্ট ভারতীয় ষাঁড়ের (যা সাধারণভাবে অন্যত্র দেখা যায় না) ছাপ আছে (ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড : *সিল সিলিন্ডার্স অফ ওয়েস্টার্ন এশিয়া,* ওয়াশিংটন, ভি সি ১৯১০, নং ৯২২, ৯৩৩ ইত্যাদি)। এর হিটটাইট নাম ছিল সম্ভবত লেলওয়ানিয়া। *ঋগ্‌বেদ*-এর দেবী উষস, যিনি সাধারণের চোখের সামনেই প্রায়শ বক্ষ ও দেহ উন্মুক্ত করে থাকেন, এ অঞ্চলের সেই সময়কার সীলমোহরে তিনিও স্পষ্টভাবে উপস্থিত (ওয়ার্ড-এর উক্ত স্থান সম্বন্ধীয় অধ্যায়-এল্)। উভয়েই কখনও কখনও ডানাবিশিষ্ট। এর দ্বারা সঠিক যে কী বলা হয়েছে—তা বোঝা যায় না; হতে পারে, এটা হয়ত ভারত থেকে কিছু আর্যের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত। প্রাসঙ্গিকভাবে পারসিক নাম এবং সম্ভবত পারসিক ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির উল্লেখের মাধ্যমে আর্যদের দ্বিতীয় ধারাটির কথাও *ঋগ্‌বেদ*-এ, মনে হয়, বলা হয়েছে। *ঋগ্‌বেদ*-এর (১.৫৩.৯-১০) 'জ্ঞাতিশূন্য' নৃপতি সুশ্রভস, যিনি বিশজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং জয়ী হয়েছিলেন, তিনি এবং *আবেস্তা*-য় বর্ণিত পিতৃহত্যার প্রতিশোধগ্রহণকারী কবি হুশ্রভস যে একই—তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। 'তুরন্য' এবং 'তুরবায়ান্য' (দ্রুতগামী) শব্দদুটির দ্বারা তুরানীয়দের বোঝানো হতে পারে যারা প্রকৃত অর্থেই ছিল সেরকম। *ঋগ্‌বেদ*-এ (৮.৬.৪৬) তিরিন্দিরা-র মহিমাকীর্তন করা হয়েছে—যিনি জনৈক পারসু-র সঙ্গে সম্পর্কিত; এই পারসু, হতে পারেন, কোন পারসিক। *আবেস্তা*-য় সপ্তনদের তীরবর্তী অঞ্চলকে একটি আর্য অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূল সাতটি নদের দুটি শুকিয়ে গিয়েছিল: *ঋগ্‌বেদ*-এর দৃশ্যদ্বতী ঘঘ্‌ঘরেরই মরা খাত, আর সরস্বতী (যা তখন পূর্বোক্ত নদ ও সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ত) বেদের ব্যাখ্যামূলক *ব্রাহ্মণ* খণ্ডগুলি রচিত হবার সময় মরুপথে হারিয়ে যেতে শুরু করেছিল। বর্তমানে পূর্ব-পাঞ্জাবে এটি একটি ছোট নদী। সরস্বতী নামটি হয়ত ইরানের হড়বাইতি-রই পরিবর্তিত রূপ—টিগলায়-পিলেজারের (তৃতীয়) খোদাই-এ যা আরাকাট্টু। সেক্ষেত্রে, মূল সরস্বতী হল হিলমন্ড; মুন্ডিগাগে অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও, এ সম্ভাবনার কথা প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভবিষ্যতের জন্য মাথায় রাখলে ভাল করবেন। রাভি নামের থেকে ব্রহ্মদেশের প্রধান নদী ইরাবতীর নামের উৎপত্তি, এবং পূর্বতন পান্ধারপুরের মধ্য দিয়ে প্রবহিত ক্ষীণতোয়া চন্দ্রভাগা-র নাম এসেছে চেনার থেকে। এই ধরনের নাম পরিবর্তন খুবই সাধারণ ঘটনা।



চিত্র ১৭ : সূর্যদেবতা পর্বত বিদারণ করলেন, দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া হল।

ভারতের মধ্যেকার অথবা বাইরের প্রাচীনতর সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের সুস্পষ্ট আরও অনেক নিদর্শন আছে যেগুলি সহজে নজরে আসে না। যেমন, *ঋগ্বেদ*-এ (৫.৪৫.১-৩) বর্ণিত সূর্যদেবতা—যিনি পাহাড় ভেদ করে, দুয়ার ভেঙে আত্মপ্রকাশ করেন। এই দৃশ্যটিই হুবহু খোদিত আছে মেসোপটেমিয়ার সীলমোহরে (চিত্র ১৭)—যেখানে দেখা যায় দুটি দরজা (কোন দেওয়াল ছাড়াই) উন্মুক্ত করে ফেলা হচ্ছে এবং সূর্যদেব পাহাড় থেকে অর্ধ-উত্থিত হয়েছেন।

এই সমস্ত সীলমোহরগুলির সঙ্গে প্রচলিত কাহিনীগুলির যেগুলিকে মেলানো যায় তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ইন্দ্র কর্তৃক তাবস্তৃ-র ত্রিমস্তক বিশিষ্ট পুত্রের মুন্ডচ্ছেদ। *ঋগ্বেদ*-এ (১০.৮) এই কৃতিত্ব বর্ণিত হয়েছে 'পুত্রে'র নিজের মুখেই—যদিও বলা হয়েছে তিনি মৃত। তা সত্ত্বেও, মনে হয়, এই পুত্র ত্বাস্ত্র কোন প্রাচীন ঔপনিষদিক গুরু। তাঁর 'হত্যা' ব্রাহ্মণ্য অতিকথার ওপর এক অনপনেয় কলঙ্ক, যেমন এর আগে রাজা কর্তৃক তাঁর নিজস্ব যজ্ঞ-পুরোহিতের মুন্ডচ্ছেদ এক বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত। কর্তিত তিনটি মুন্ড থেকে তিন ধরনের তিত্তির পাখির জন্ম হয়—যার মধ্যে অন্তত দুটি থেকে সৃষ্টি হয় ব্রাহ্মণদের দুটি কৌম-নাম। সিন্ধুর সীলমোহরে ত্রিমুখ বিশিষ্ট দেবতা আবিষ্কারের পর এই উপকাহিনী[৪] গুরুত্ব পায় (চিত্র ১৮); ত্রিমুখ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে ইনি ছিলেন কোন চান্দ্র দেবতা—যেমন, পরবর্তীকালের শিব, যিনি তাঁর জটায় অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করতেন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই উপকথার উল্লেখ *আবেস্তা*-তেও আছে—যদিও জরথুষ্ট্রীয় সংস্কারের প্রভাবে ইন্দ্রকে সেখানে খাটো করে অসুর হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং *আবেস্তা*-র অন্যত্রও তিনি অসুর হিসেবেই চিহ্নিত। ত্রিমুন্ডধারী শত্রু বিশ্লিষ্ট হবার পর সেখানে নাম হয়েছে আজি দাহাকা—*শাহ্ নামেহ্*-তে যার উল্লেখ আছে জোহক নামে। তিনি মুণ্ডচ্ছেদনের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে অবতাররূপী জরথুষ্টকে প্রলুব্ধ করছেন। আজি দাহাকা-কে নিধন করলেন বীর থ্রেটোনা আথ্য—যিনি জন্মেছিলেন সেই 'চতুষ্কোণ বরেনা'-য় পারসিকরা যাকে কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণের বর্তমান গিলান বলে মনে করে। আবার, চতুষ্কোণ বরেনা বলতে 'আয়তাকার বর-এর ভূভাগ'—অথাৎ, যেখান থেকে আর্য অভিযান শুরু হয়েছিল সেই খোরেজ্‌ম—এমনটাও ভাবা যেতে পারে। জোহকের বর্ণনায় তার দুই কাঁধ থেকে দুটি সাপের মাথা উদ্গত হয়েছে বলে বলা হয়েছে, যাদের প্রতিটির জন্য দৈনিক একটি করে মানুষ উৎসর্গ করতে হত। 'অসি' শব্দটি সংস্কৃত 'অহি' বা 'সর্পেরই' সমার্থক। মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত সীলমোহরগুলির মধ্যে প্রথম যুগের নিন-গিস-জি-দা বা পরবর্তীযুগের তিসপক নামের যে দেবতা তাঁরও মাথা মানুষের, কিন্তু দু-কাঁধ থেকে দুটি সাপের মাথা উত্থিত। অর্থাৎ, এইভাবে ধর্মবিশ্বাসগুলির কোন সংঘাতকেই খোদিত করে রাখা হয়েছে। ভারতীয় বিশ্বাসে হন্তারক ফ্রেটোনা আথ্য নন, ত্রিতা আপ্ত—ইন্দ্র যাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। নাম দুটির শেষাক্ষর দুটি কাছাকাছি—কিন্তু ত্রিতা শব্দটি নিশ্চিতভাবে ইরানী সাম পরিবারের থ্রিতা (দ্র. *ইয়াস্না* ৯.৭-১১), যিনি কোন অসুর নিধন করেননি। *ঋগ্বেদ*-এ থ্রেটোনার কাছাকাছি ত্রৈতন বলে একজনের



চিত্র ১৮ : সিন্ধুর সীলমোহরে ত্রি-মুখ দেবতা।

নাম পাওয়া যায়—যিনি নিজেই ছিলেন একজন দাস (শত্রু) এবং দীর্ঘতমস নামের এক ব্রাহ্মণের মুন্ডচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর অস্ত্র ফিরে এসে তাঁরই বক্ষ ও স্কন্ধ বিদীর্ণ করেছিল। মনে হয়, উপকথাটি এখানে কিছু মাত্রায় বিপরীত পক্ষের অনুকূলে বিবৃত করা হয়েছিল, যদিও সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া হয়নি। *ঋগ্‌বেদ*-এর অজস্র বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এটা একটা মাত্র উদাহরণ।—যা থেকে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে সেইসময় বহির্ভারত এবং ভারতীয় প্রাগার্য উপাদানগুলির মধ্যে একটা আত্তীকরণ প্রক্রিয়া চলছিল অর্থাৎ জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যেও। সংক্ষিপ্ততম ভাবে বলা এই একটি কাহিনীরই বিস্তৃত আলোচনার জন্য একটা পুরো বই লেখা প্রয়োজন।

ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্যকূল (ভারতীয় দিওসকুরি) এবং আরও অনেক ইন্দো-আর্য দেবতাদের উল্লেখ *বোঘাজ-কোই*[৫] পুঁথিতে পাওয়া যায়। আনুমানিক ১৪০০ খ্রী.পূ.-এ ইউফ্রেটিসের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী মিতানিয়ানরা এঁদের উপাসনা করত। মীডিআ-র আর্য (বা আর্যসদৃশ) জনগোষ্ঠী ঐ সময়ই উরমিয়ে হ্রদের কাছাকাছি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে—যদিও সেই আধিপত্য তখন তাদের ছিল না যা তারা পরবর্তীকালে লড়াই-এর মধ্য দিয়ে অর্জন করেছিল। বিশেষ রকমের মন্থরগতি নাসত্যদের রথ টানত গর্দভে—যা কোন বিদেশী প্রাগার্য সংস্কৃতিরই পরিচয়বাহী। হিটটাইট রাজা আজ্জাওয়ানডাস নামটির মধ্যে বৈদিক প্রভাব আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু দানিউনা জনগোষ্ঠীর নাম সংস্কৃত দানব শব্দ থেকে আসতে পারে।

৪.৩ উপাখ্যানগুলির চর্চা এবং সেগুলিকে জটিলতামুক্ত করে দেখানোটা যদিও আকর্ষণীয়, কিন্তু এর ফলে হয়ত আমরা আমাদের লক্ষিত ইতিহাস থেকে অনেক দূরে সরে যাব। তবু সে কাজ আমাদের অবশ্যকরণীয় এই কারণেই যে, এই উপকথা বা অতিকথাগুলির মোড়কেই সুদূর অতীতের ঘটনাবলী *ঋগ্‌বেদ* বা যে কোন সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যক্ত করা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন ইন্দ্রের বীরত্ব বর্ণনা করা হয় তখন কী তিনি প্রকৃত এক আর্যদলপতি—না শুধুই অন্তরীক্ষ থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী? নিশ্চিতভাবে, প্রথম দিকে শত্রুকে সবসময়েই চিহ্নিত করা হত অসুর হিসেবে। সত্যের (ঋত) যে সপ্তমাতা—তা ঋগবৈদিক এবং বারবার তার উল্লেখ করা হয়েছে এক অদ্ভুত বিশেষণ সহ—যাহ্‌ভি (? 'অবিরত')। এর দ্বারা অবশ্যই সপ্তনদকেই বোঝানো হয়েছে। জল এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে *ঋগ্‌বেদ*-এ ঋত-র (সত্য, সুবিচার এবং যা যথার্থ) যে সুন্দর ধারণা তার সঙ্গে তা সম্পর্কযুক্ত। ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে (*ঋগ্‌বেদ* ৫.১২.২) 'ঋত-এর স্রোত' মুক্ত করে দিতে। বণিক শব্দটির একবারই উল্লেখ আছে এবং তা বাণিজ্যকারী অর্থেই। এই শব্দটির উৎপত্তি 'পণি' থেকে—যা ইন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি বৈরি মনোভাবাপন্ন এক জনগোষ্ঠীর নাম। *ঋগ্‌বেদ*-এ (১০.১০৮) আমরা একটি সুপরিচিত যদিও অপ্রাসঙ্গিক সংলাপ পাই যেখানে দেবী সরমা ইন্দ্রের দূতী হিসেবে পণিদের কাছে হাজির হয়েছেন। সরমা এক কুক্কুরী, কিন্তু শব্দান্তে-'মা' যুক্ত থাকায় তাঁকে দেবী হিসেবেই গণ্য করতে হয়—যেমন, পরবর্তীকালে উমা, রমা এবং অন্যেরা। তাঁর, অর্থাৎ ইন্দ্রের দাবি ছিল পণিদের গবাদি পশুগুলি সমর্পণ করতে হবে। পরবর্তীকালের ব্যাখ্যায় যোগ করা হয়েছে যে ইন্দ্র এবং দেবতাদের গো-সম্পদ অপহরণ করা হয়েছিল, কিন্তু মূল স্তোত্রে তেমন কিছুর ইঙ্গিত নেই। আমরা দেখলাম, মোটা দাগের সেই চূড়ান্ত শর্ত— বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর অথবা মুক্তিপণ এবং পণিরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। যথারীতি, ইন্দ্রের অন্য শত্রুদের মতো পণিদেরও চিহ্নিত করা হল অসুর হিসেবে। নিঃসন্দেহে

বলা যায়, এই স্তোত্রগুলি গাওয়া ও আলোচনা করা হত বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে—যেখানে অতীত দিনের বিখ্যাত অভিযান ও লুণ্ঠনের কাহিনীগুলি সগৌরবে স্মরণ করা হত। এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলি ইতিহাসেরই অনুকৃতি এবং সেইসঙ্গে তার পুনরাবৃত্তিরও সহায়ক। আজকের মহারাষ্ট্রের 'সীমোল্লঙ্ঘন' উৎসব এবং স্বর্ণলুণ্ঠন (কিছু বৃক্ষপত্র লুণ্ঠনের দ্বারা এখন প্রতিস্থাপিত)—তারই এক আধুনিক দৃষ্টান্ত; এর দ্বারা অষ্টাদশ শতকের মারাঠাদের বার্ষিক লুণ্ঠন প্রথাকেই স্মরণ করা হয়। শাস্ত্রাচারগুলি বিশেষ আঙ্গিক ও ভাব নিয়ে বেঁচে থাকে। *ঋগ্‌বেদ*-এ (৬.৪৫.৩১-৩৩) ঋষি ভরদ্বাজ পণিদের সর্বোচ্চ নেতা বৃবুকে তাঁর ঔদার্যের জন্য বন্দনা করেছেন, অথচ একজন ব্রাহ্মণ ও আর্য হিসেবে ভরদ্বাজের অবস্থান তাঁর বিপরীতেই। এর ফলে পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণরা কিছুটা বিব্রত হয়েছেন; তাঁরা স্বীকার করেন যে বৃবু নিশ্চিতই আর্য নন, একজন তক্ষন (সূত্রধর)—কিন্তু তাঁর দান গ্রহণ করে ঋষি কোন অন্যায় করেননি। *ঋগ্‌বেদ*—যা আসলে শাস্ত্রানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় মন্ত্রেরই সংকলন (গদ্য ব্যাখ্যা ছাড়াই)—তার মধ্যে উপহারের জন্য এই স্তুতিগুলিই (দানস্তুতি) সম্ভবত সবচেয়ে বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক তথ্য। এই দানস্তুতিগুলিতেই চেদির মতো জনগোষ্ঠীগুলির উল্লেখ আছে যাদের কথা *মহাভারত*-এ আরও স্পষ্টভাবে এসেছে। আপাতভাবে মনে হয়, পরবর্তীকালের কবি-ঋষিরা মহাকাব্যের শ্লোক আবৃত্তি শুরুর আগে বৈদিক মঙ্গলস্তোত্র পাঠ করতেন। দানস্তুতিগুলি অতীত ও বর্তমান ঐতিহ্যের যোগসূত্রের মতো ছিল—তাছাড়া তা সমকালের দানশীলতাকে উৎসাহ যোগাত; এই ধরনের অনুশাসনই এক অন্যতম কারণ যার ফলে ঐতিহ্যটা টিকে থাকত। ব্রাহ্মণকে দান করা একটি পূণ্যকর্ম—এই ধারণার যে বিস্তৃতি আমরা পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগে দেখতে পাই তার মূল নিহিত রয়েছে এই সব স্তুতিগুলির মধ্যে।

পণিদের সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, সাধারণভাবে তারা ভাড়াটে সৈনিক, ধনী, লোভী, বিশ্বাসঘাতক এবং আর্যদের শত্রু; *ঋগ্‌বেদ*-এ (২.২৪.৬-৭) তাদের কোষাগার লুণ্ঠনের বর্ণনাও পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে, এক ধরনের সাময়িক সমঝোতাও শেষপর্যন্ত স্থাপিত হয়েছিল—সম্ভবত এই কারণেই যে কিছু আর্য বণিকবৃত্তি গ্রহণ ক'রেছিল। প্রধান শত্রু পণি-রা ছিল না, বরং ছিল দস্যু বা দাস-রা। এই শব্দদুটির অর্থ পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছে ক্রীতদাস বা ভূমিদাসে—ঠিক যেভাবে ইংরাজি 'স্লেভ' বা 'হেলোট' শব্দদুটি জাতি বা স্থান নামেরই পরিবর্তিত রূপ। দস্যুদের নিজস্ব রাজা ছিল। ভাস অশ্ব নামের এক মুনি (*ঋগ্‌বেদ* ৮.৪৬.৩২) দুই দাস নৃপতি বালবুথা ও তারুক্ষ (অথবা বালবুথা তারুক্ষ নামের একজনই)-র কাছ থেকে একশ উট উপহার নিয়েছিলেন; ঐ একই স্তোত্রের প্রথমে কবি জনৈক কানিতা পৃথুশ্রবস-এর দানশীলতার প্রশংসা করেছেন—অন্তত নাম থেকে মনে হয় তিনি একজন আর্য। অর্থাৎ, এখানে আবার আমরা এক ব্রাহ্মণকে পাচ্ছি যিনি উভয়পক্ষেই সংযোগ রেখেছেন। তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে দাসেরা এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, কেননা তাদের প্রথম দিকের নৃপতিরা অসুর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ইন্দ্রের হাতে ধ্বংস হয়েছে। এদের মধ্যে বৃত্র হল বাধা বা শত্রুবর্গ—যে বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। *ঋগ্‌বেদ*-এর ১.৫১.৬ সূক্তে এবং অন্যত্র ইন্দ্র কর্তৃক অর্বুদকে পদপিষ্ট করে মারার ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই অর্বুদ একজন দাস ছিল—এ ছাড়া তার সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি। ১.১০৩.৮ এবং ১.১০৪.৩ সূক্তে কুযব বলে একটি নাম আছে যার আক্ষরিক অর্থ 'খারাপ যব' অর্থাৎ বুনো যব বা নিম্নমানের শস্য। এই কুযবের সঙ্গে নামুচির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে—যার

সঙ্গে ইন্দ্রকে একটা কঠিন লড়াই লড়তে হয়েছিল এবং যাকে কোনভাবেই প্রাকৃতিক বা শস্যের রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। *ঋগ্‌বেদ-এর* ৫.৩০ সূক্তে আমরা ইন্দ্র-নামুচি যুদ্ধের পুরো বর্ণনা পাই এবং শেষপর্যন্ত ইন্দ্রকে নামুচির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে হয়েছিল ঃ পরে ইন্দ্র কোনভাবে প্রতারণা করে তার শিরশ্ছেদ করেন। নামুচিকে বলা হয়েছে দুই নদীর অধিপতি। এই নদীদুটি সম্ভবত তার দুই স্ত্রী। তার সেনাবাহিনী (বা অস্ত্র) ছিল নারীদের নিয়ে—যা দেখে ইন্দ্র অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন। দানস্তুতিতে একটি উপজাতিক নাম রুসমা-র উল্লেখ আছে—যার সঙ্গে পরবর্তীকালের পাঞ্জাবের লবনখনি অঞ্চলের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। ২.২০.৬ সূক্তে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র 'অর্শসানস নামক দাসের মৃগ-শির ছেদন করেন;' অবশ্য শিরঃশ্ছেদনের কারণ জানা যায় না, শুধু দেখা যায় যে ঋষি গৃৎসমদ অসুরটির জন্য সমবেদনা প্রকাশ করছেন।[৬]

ঋগ্‌বেদ-এ ১.৫১.১১ এবং ৮.১.২৮ সূক্তে ইন্দ্র কর্তৃক সুষ্ণ-র শক্ত ঘাঁটি বিচূর্ণ করার বর্ণনা আছে। সুষ্ণ-কে প্রথমে মনে হতে পারে খরার দৈত্য—কিন্তু তারপর 'পুর' (অর্থাৎ পুরী বা দুর্গ) শব্দটি যুক্ত হওয়ায় অর্থ পাল্টে গেছে; তাই, আমরা ভাবতে বাধ্য হই যে এখানে একটি বসতি ও বাঁধ ছিল—জলকে মুক্ত করার জন্য যা ধ্বংস করা হয়েছিল। পিপরু নামক এক অসুরেরও এই রকম এক শক্ত ঘাঁটি বা পুর ছিল, আর্য ঋজিশবন-এর স্বার্থে ইন্দ্র যা ধ্বংস করেছিলেন এবং সেখানকার সম্পদ ঋজিশবনের করায়ত্ত হয়েছিল। এই সমস্ত শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শম্বর—যার সঙ্গে বরচিন-ও যুক্ত হয়েছিলেন। শম্বরের অনেকগুলি পুরঘাঁটির ওপর দখল ছিল এবং তাঁর বিরোধ ছিল দিবোদাসের সঙ্গে। দিবোদাস প্রসঙ্গ আমাদের কাছে *ঋগ্‌বেদ*-কে ইতিহাসের স্তরে উন্নীত করে, অর্থাৎ এখান থেকে আমরা দুই মানবিক প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বের বিবরণ পাই—দেব ও অসুরের দ্বন্দ্ব নয়। বৈদিক তথ্য অনুসারে, দিবোদাস বা তাঁর কোন বংশধরের অধীনে কোন নগরী ছিল না।

ইন্দ্র হচ্ছেন 'নগরধ্বংসকারী' (পুরন্দর), কিন্তু তাঁকে বা তাঁর কোন অনুগামীকে কোথাও কোন নগরীর নির্মাতা বা অধীশ্বর হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি। তাঁদের কেউই কোথাও কোন গৃহনির্মাণ পর্যন্ত করেননি। *ঋগ্‌বেদ*-এ ইষ্ট বা ইষ্টক (ইঁট) শব্দটির কোথাও উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র পরবর্তী একটি বেদে ইষ্টক ব্যবহারের কথা প্রথম বলা হয়েছে এবং তা-ও যজ্ঞবেদী নির্মাণের কাজে। আর্যদের আদর্শ বাসস্থান হচ্ছে গ্রাম—এমনকী কখনও কখনও রাতারাতি গজিয়ে ওঠা শিবিরকেও গ্রাম আখ্যা দেওয়া হয়। *ঋগ্‌বেদ*-এর মানুষেরা সিন্ধু নগরীগুলিকে ধ্বংস করেছিল, কিন্তু সেখানে কোন পুনর্নির্মাণ করেনি। যদি করত তাহলে তার আভাস তাদের পবিত্র পুঁথিগুলিতে থাকত। তারা নিজস্ব কোন নগরও নির্মাণ করেনি, কেননা তা পশুপালক অভিযানকারীদের জীবনে কোন কাজে আসত না। অর্থাৎ, আর্যদের অবদানের আলোচনায় এটা একটা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য। নতুন উৎপাদন-পদ্ধতি এবং নগরজীবনে পৌঁছতে আরও অন্তত অর্ধসহস্র বছর লেগেছিল এবং পূর্বতন সমাজের অর্জিত অনেককিছুই তখন হারিয়ে গিয়েছিল।

ঋগ্‌বেদ-এর শেষ পর্যায়ে আর্যদের সঙ্গে প্রাগার্য বা অনার্যদের সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। নতুন জনগোষ্ঠী তখন নিজেদের মধ্যেই প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত। দিবোদাস-এর অর্থ 'স্বর্গের দাস', কিন্তু 'দাস' তখন এক অনার্য জনগোষ্ঠীরও নাম। সুতরাং এই পারিভাষিক শব্দের দ্বারা যে কেবলমাত্র স্বর্গের কাছে আত্মসমর্পণই বোঝানো হয়েছে তা না-ও হতে পারে, বরং এক দাসকে আর্য সমাজভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে—এমনটাও হতে পারে। *ঋগ্‌বেদ*-এ একের অধিক

দিবোদাসও থাকতে পারেন—তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত অতিথিগ্ব, যাঁর গরুগুলিকে যেখানে খুশি চরতে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তাঁরই পরবর্তী রাজা সুদাস (পরবর্তীকালে সুদাস-অ লেখা হয়েছে; আগের সুদাস শব্দের অর্থ ভালো নদী) পয়যবন-এর আমলেই *ঋগ্‌বেদ*-এর শেষপর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোড়ন সংঘটিত হয়েছিল—'দশ রাজা'-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এই দশ রাজার নাম থেকেই তাদের জনগোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করা যায়—যাঁদের অনেকেই ছিলেন স্পষ্টত আর্য। সুদাসের জনগোষ্ঠী ছিল তৃৎসু—যা ভরতদেরই একটা উপগোষ্ঠীর নাম, যে ভরত থেকে ভারত তথা ভারতবর্ষ নামটির উদ্ভব। এই যুদ্ধের কথা বারবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে (যেমন ৭.৮৩.৬ সূক্তে), কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ আছে ৭.১৮ সূক্তে। যুদ্ধে পর্যুদস্ত রাজাদের নাম হল—সিম্যু, তুর্বসা, যক্ষু, মৎস্য, ভৃগু, দ্রুহ্যু, পাক্‌থ, ভলান, অলিন, বিষানিন। এদের মধ্যে মৎস (মাছ) এবং অলিন (মৌমাছি) হল টোটেম, বিষানিন অর্থাৎ শৃঙ্গ থেকে মনে আসে সিন্ধুর সীলমোহরের শৃঙ্গযুক্ত দেবতা বা মেসোপটেমিয়ার দেবতাদের শৃঙ্গ সমন্বিত মুকুটের কথা; এবং মিশরের মেডিনেট হাবু-র শিরস্ত্রাণ পরিহিত শার্ডিনা। মনে হয়, এরা অনার্য, তবু পবিত্র (সিবাসস) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋষি দাবি করেছেন যে 'আর্যদের আপ্যায়ন গ্রহণকারী' (ইন্দ্র) এগিয়ে এসেছিলেন তৃৎসুদের সাহায্যার্থে; *ঋগ্‌বেদ*-এর ৭.৮৩.১ সূক্তে দাস্ত এবং আর্যশত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুদাসকে সাহায্য করার জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করা হয়েছে। উপরোক্ত পাক্‌থ জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে ল্যাসেন ও অন্যরা অনুমান করেছেন যে এরা আলেকজান্ডারের সময় গ্রীকদের দেখা এই অঞ্চলের পাক্‌থেয়ি এবং আধুনিক কালের পাখতুন (পাঠান)। *ঋগ্‌বেদ*-এর ৭.১৮.১৩ সূক্তে তৃৎসু-রা দুর্মুখ (মৃধ্রবাকে) পুরুদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়কামনা করে প্রার্থনা করছে। পুরু জনগোষ্ঠীকে পুরোপুরিই আর্য বলে মনে করা হয় এবং এদের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে *মহাভারতের* কাহিনীতে বা আলেকজান্ডারের সময় (এবং সম্ভবত একালের পাঞ্জাবী পুরি পদবীতেও); ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি আলেকজান্ডার রাজা পুরুকে এবং একই নামধারী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে পরাজিত করেছিলেন। নামের এই অভিন্নতা থেকে বোঝা যায় যে গোষ্ঠীবহির্ভূত মানুষের কাছে গোষ্ঠী প্রধান তখনও গোষ্ঠী নামেই চিহ্নিত হতেন। পুরু নামের এক রাজা (স্ট্রাবো ১৫.১.৭৩; প্যানডিয়ন ১৫.১.৪) অগাস্টাস সিজারের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। উপরোক্ত দশটি নামের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হল ভৃগু—যা ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে 'ফ্রিজিয়ান' (Phrygian)-এর সমতুল। কিন্তু ভৃগু নামটি ভারতবর্ষে টিকে আছে কেবলমাত্র এক ব্রাহ্মণ্য গোত্রের* মধ্যে—যা *ঋগ্‌বেদ*-এর পর্বের অনেক পরে গুরুত্ব অর্জন

* *ঋগ্‌বেদ*-এ (৭.১৮.১৯) সিগ্রুরাও ছিল সুদাস এর শত্রু এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে তাদের একটি গোত্র টিকে আছে—যদিও খুব বেশি প্রচলিত নয়; যেমন, মথুগর মৈগ্রভ গোত্র (ল্যুডার্স নং-৮২)। সিগ্রুকে চিহ্নিত করা হয়েছে *Moringa Plerygosperma* হিসেবে অর্থাৎ এক ধরনের 'ঝাল স্বাদযুক্ত মূল এবং এই মূল, পাতা ও ফুল তিনটিই খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়।' কিন্তু এই চিহ্নিতকরণে যদি ভুল না থেকে থাকে তাহলে লাতিন নামটির দ্বারা ঢাকের কাঠির গাছও বোঝাতে পারে—যার শুঁটি রান্নার পরে এক সুস্বাদু খাদ্য। *মনু সংহিতা*-য় (৬.১৪) বানপ্রস্থকালীন অবস্থায় সন্ন্যাসীদের এটি খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ভূমিজ ছত্রাকও। কিন্তু কেন নিষিদ্ধ—তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। ছত্রাক বিষাক্ত হলেও হতে পারে, কিন্তু এটি বিষাক্ত নয়। টীকাকার মন্তব্য করেছেন যে সিগ্রুকম হল বলথ্ (হিমালয় অঞ্চল)-এর একটি অতি পরিচিত উদ্ভিদ। অর্থাৎ, নামের মধ্যে খাদ্য টোটেম চরিত্রটি স্পষ্ট—যা থেকে টাবুর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

করেছিল। *ঋগ্‌বেদ*-এ এদের রথের বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। আবার, এই নামের অর্থ কুম্ভকারও হতে পারে—যেমনটা কিছু সময় পালিভাষায় প্রচলিত ছিল। 'কুম্ভকার'-এর অর্থ *মহাভারত*(১.১৮২.১) ও *জাতক*-এ (৪০৮) পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। *জাতক-এ* (৪৭৫) এক ব্রাহ্মণ রথ তৈরি করছে (চাকার বেড় কাঁচা চামড়া দিয়ে বেঁধে—যাতে তা শুকনো হলে সঙ্কুচিত হয়ে কাঠের অংশগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে)—কিন্তু তার গোত্র হল ভরদ্বাজ এবং উল্লেখ্য যে *জাতকের* ব্রাহ্মণেরা সব ধরনের পেশাই গ্রহণ করত। একেবারে গোড়ায়, মনে হয়, আর্যদের পাঁচটি জনগোষ্ঠী ছিল। সমগ্র আর্য সমাজকে বোঝাতে 'পঞ্চজন' (পঞ্চজনাঃ, বা পঞ্চ কৃষ্ট্যাঃ)-এর কথা বারবার বলা হয়েছে (যদিও স্পষ্টভাবে কোথাও নামগুলি বলা হয়নি)।

দশ রাজা-র বিধ্বংশী যুদ্ধের কারণও আবার সেই জল। *ঋগ্‌বেদ*-এর ৭.১৮.৮ সূক্তে (এবং ৭.১৮.৫ সূক্তের সায়নকৃত টীকায়) বলা হয়েছে যে, সুদাস যে মুর্খদের নিধন করেন তারা পরুষ্ণি (বাভি-র একটি শাখা) নদীর গতিপথকে ঘোরাতে চেষ্টা করেছিল। যুদ্ধে বীরত্ব অর্জনের আদর্শকেই জীবনের চরম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে আর্যরা তাদের নিজেদের অস্তিত্বকেই ক্রমশ বিপন্নতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্যই পূর্বমুখী অভিযান শুরু হল। দশ রাজার যুদ্ধে বিজয়ী ভরতরা নিজে থেকেই এই পথ অনুসরণ করল; হতে পারে, তা পরবর্তীকালের আক্রমণকারীদের চাপে বা হরিৎ চারণক্ষেত্রের সন্ধানে। যে কারণেই হোক না কেন, বৈয়াকরণ পতঞ্জলি ২০০ খ্রী.পূ.-এর কাছাকাছি সময়কাল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে 'পূর্বদেশীয় ভরত' হল অতিশয়োক্তিরই নামান্তর, কেননা, 'পূর্বে ছাড়া অন্যত্র কোথাও কোন ভরত ছিল না।' পূর্ব বলতে যেহেতু তখন গাঙ্গেয় উপত্যকার কিছু অংশকেও বোঝাত সুতরাং ভরতরা তাদের বিখ্যাত যুদ্ধজয়ের ক্ষেত্র থেকে অনেকটা দূরেই সরে গিয়েছিল।

৪.৪ পাঞ্জাব থেকে যে আর্যরা পূর্ব দিকে সরে গিয়েছিল (১০০০ খ্রী.পূ.-এর পরে নয়) তাদের সঙ্গে আনুমানিক ১৭৫০ খ্রী.পূ.-এর সিন্ধু আক্রমণকারী আর্যদের অনেক দিক থেকেই পার্থক্য ছিল। এটা দূর্ভাগ্য যে, এখনও পর্যন্ত এদের এই সরণের কোন সালতামামি তৈরি করা যায়নি। ইতিমধ্যেই তারা হাতি ও মোষকে বাগে আনতে শিখেছিল বা শীঘ্রই শেখার অবস্থায় পৌঁছেছিল। তাদের রথ, অশ্ব, গবাদি পশু সবই প্রায় আগের মতোই রইল, শুধু সিন্ধুর কুঁজওয়ালা গরুগুলিই এখন থেকে সংখ্যাগুরু হয়ে উঠল যুথের মধ্যে। এই ভ্রাম্যমান খাদ্যভান্ডার প্রব্রজনের পক্ষে অপরিহার্য ছিল, যেমন অপরিহার্য ছিল সুলভ লোহা—১০০০ খ্রী.পূ.-এর আগেই যার ব্যবহার তারা নিশ্চিতভাবে শিখে গিয়েছিল। খাদ্য উৎপাদনে লাঙ্গল যুক্ত হল। অন্যদিকে, সিন্ধুর মানুষদের কাছ থেকে মাটির কাজ, তাঁতের কাজ, কাঠের কাজ বা অন্যান্য কাজও আর্যরা আয়ত্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু, পণ্যের জন্য উদ্বৃত্ত খাদ্যের বিনিময় এবং একটি নতুন সমাজ সংগঠন ছাড়া—এ সবই ছিল নিরর্থক। এই নতুন সমাজ সংগঠন প্রথম শ্রমের যোগান সৃষ্টি করল—যার উদ্বৃত্তকে খুব সহজেই দখলচ্যুত করা গিয়েছিল। এর সাহায্যেই নতুন নতুন এলাকায় সম্প্রসারণ সম্ভব হল—যা সিন্ধু সভ্যতার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই সমাজ পুনর্গঠন কোন অনুমিত বিষয় নয় বরং গ্রীক বিবরণীর (৩৩০ খ্রী.পূ.) দ্বারা প্রত্যয়িত যে, বাণিজ্য-সম্পর্ক ও উদ্বৃত্ত বিনিময় প্রথার অনুপস্থিতি এবং প্রাচীন জীবনচর্যাকে অনুসরণ করে আদি বৈদিক স্তরে আটকে থাকার ফলে পাঞ্জাবের কিছু আর্যজনগোষ্ঠী কীভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল।

'শোনা যায়, সোপেথিসের দেশে একটি নুনের পাহাড় আছে যা সারা ভারতের প্রয়োজন মেটাতে পারে (দ্র. *আইন-ই-আকবরি* ২.৩১৫)। এরই কাছাকাছি আরেক পাহাড়ে সোনা ও রূপার ভাল খনি আছে—যা খনি শ্রমিক গোর্গোস পরীক্ষা করেছে। ভারতীয়রা (পাঞ্জাবের) খনি এবং আকরিক গলানো বিষয়ে অজ্ঞ হওয়ায় নিজেদের সম্পদকেও চেনে না এবং তার ফলে খুব সাদামাটা বৃত্তিতেই যুক্ত থাকে।' (*স্ট্র্যাবো,* ১৫.১.৩০)। 'কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধে বিজয়ীকে কুমারী দানের প্রথা আছে, যদিও যৌতুক ছাড়াই। অন্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আবার যৌথভাবে জমি চাষের প্রথা আছে এবং যখন ফসল তোলা হয় প্রতিটি মানুষ একটি করে বোঝা নেয়—যা দিয়ে তার সারা বছর চলতে পারে। ফসলের অবশিষ্ট অংশটুকু পুড়িয়ে দেওয়া হয়।' (*স্ট্র্যাবো* ১৫.১.৬৬)।

একইসঙ্গে, আর্যসমাজের এই নতুন সংগঠন যে কোনো আদিম অধিবাসীদেরকেও অঙ্গীভূত হবার পথে নিয়ে আসাটা সম্ভব করেছিল। বহুবিবাহ প্রথাও এই আত্তীকরণকে সাহায্য করেছিল। এমন একটা সম্ভাবনা খুবই প্রবল যে, সিন্ধুর মানুষদের কিছু অংশ বনাঞ্চলে পালিয়ে এসেছিল এবং সেখানে তাদের উন্নত কৌশল ও সংস্কৃতির কিঞ্চিত বিস্তার ঘটিয়েছিল; কিন্তু আর্যরাই প্রথম সাধারণভাবে বসতি বিস্তারের মধ্য দিয়ে এই অবস্থানকে সংহত করেছিল। নতুন নতুন উপজাতিক নাম এবং ব্যক্তি নাম থেকে বোঝা যায় যে বিস্তারটা যতটা না আর্যদের ঘটেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটেছিল তাদের কৃৎ কৌশল ও জীবনযাপন প্রণালীর; এবং তা ভাষা সমেত—যে ভাষা আদিম মানুষদের কাছে অপরিহার্য বলে বিবেচিত আর্য লোকাচারগুলির জন্য প্রয়োজনীয় এবং নতুন উৎপাদন উপায় ও তার অনুষঙ্গী আচার-অনুষ্ঠান্ থেকে যাকে পৃথক করতে তারা অক্ষম। গঙ্গা ও যমুনার (= যমজ নদী) কথা *ঋগ্‌বেদ*-এ প্রায় নেই বললেই চলে—যদিও পরবর্তী আর্য সংস্কৃতিতে এ দুটির অবস্থান একেবারে প্রাণকেন্দ্রে; এবং ক্রমবিশীর্ণা সরস্বতীর তীরে যজ্ঞ ও বলি-র গুরুত্বও দীর্ঘকাল ব্যাপী বজায় থেকেছে।

উৎপাদন-সম্পর্কে মূল যে পরিবর্তনটা এল তা হল, বিজিত 'দাস' অধিবাসীদের মধ্য থেকে একটি 'সেবক শ্রেণী' গঠন—যা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে একধরনের ক্রীতদাসত্ব বুঝিয়েছে। জাতগতভাবে যারা দাস—তাদের দীক্ষাগ্রহণ বা অস্ত্রবহন করার অধিকার ছিল না; কোন সম্পত্তিও তাদের ছিল না, কেননা তারা নিজেরাই সামগ্রিকভাবে আর্যজনগোষ্ঠীর সম্পত্তি—অনেকটা গবাদি পশুর মতো। গবাদি পশু এবং অশ্বের মতো দাস দান করার জন্য *ঋগ্‌বেদ-এর* ঋষিরা নৃপতিদের স্তুতিগানও গেয়েছেন। পশু শব্দটি—যা সাধারণভাবে জন্তু এবং *ঋগ্‌বেদ-এ* নির্দিষ্টভাবে গরু (যেগুলিকে বাঁধা প্রয়োজন)—এক জায়গায় তা মানুষের উল্লেখেও ব্যবহার করা হয়েছে (৩.৬২.১৪); বলা হয়েছে, দুই পা বিশিষ্ট এবং চার পা বিশিষ্ট পশুগুলি; অনেকটা গ্রীকদের অ্যানড্রাপোডোন এবং টেট্রাপোডোন শব্দের মতো—যার প্রথমটির অর্থ ক্রীতদাস এবং দ্বিতীয়টির পশু। তা সত্ত্বেও, দাসরা অস্থাবর কোন সম্পত্তি ছিল না—কেননা আর্যদের মধ্যে তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ যথেষ্ট ঘটেনি; ব্যাপক পণ্য বা বাণিজ্যের জন্য উদ্বৃত্ত উৎপাদনও নয়। যেহেতু যূথবদ্ধ গবাদি পশুগুলি ছিল সাধারণ সম্পত্তি এবং জমিও প্রায়শ কর্ষিত হত যৌথভাবে সুতরাং দাস-রাও গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পদ—এমন গণ্য হওয়াটাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। গোষ্ঠী কর্তাদের দ্বারা এক বা একাধিক দাসকে কোন উপগোষ্ঠীর কাজে নিয়োগ করা থেকেই হয়ত এল ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিষয়টা অথবা কোন পারিবারিক গোষ্ঠীর কাজে—যারা

এদের সম্পত্তি হিসেবে গ্রহণ করত। কিন্তু এটা খুব প্রচলিত ছিল না। এমনটাও মনে করা যেতে পারে যে এই দাসরা ছিল সিন্ধুর সেই মানুষদেরই উত্তরসূরী—যারা সিন্ধু নগরীগুলির জন্য উদ্বৃত্ত উৎপাদন করত এবং সে কাজে তাদের প্রণোদিত করা হত এমন কোন পদ্ধতিতে যা বলপ্রয়োগ নয়, হতে পারে—ধর্ম। ভারতবর্ষে জাতপ্রথার এটাই হল উদ্ভবকাল। *ঋগ্‌বেদ*-এ যে বর্ণ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ রঙ এবং দাস বা দস্যুদের যে সাধারণভাবে কৃষ্ণবর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেটাও স্বাভাবিক। আর্যদের গায়ের রঙের একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল—সাদা অথবা হালকা

সিন্ধু উপত্যকার দাসত্বপ্রথা যদি মেসোপটেমিয়ার মতো হয় তাহলে আর্যবিজয়ের পর ভারতীয় ঘটনাক্রমগুলিকে স্বাভাবিক বলেই মনে হতে পারে। সেখানে, আমরা দেখি, দু'ধরনের দাস। প্রথম, 'যদি তারা (মূলত) যুদ্ধবন্দী হয়, ঋণশোধে অক্ষম হয় বা এমনকী পিতামাতার দাসত্বকালীন সন্তান হয় তাহলে তাদের অধীনতা এবং অস্থাবর সম্পত্তিসুলভ দশা থেকে পরিত্রাণের তিনটি উপায় ছিল ঃ তারা তাদের অর্জিত পারিশ্রমিক দিয়ে স্বাধীনতা কিনতে পারত; মুক্তিপণ দিয়ে তাদের আত্মীয়রা তাদের ছাড়িয়ে নিতে পারত; অথবা মালিক কর্তৃক পোষ্য হিসেবে গৃহীত হতে পারত।' নারী বা পুরুষ কোন দাস যদি কোন মুক্ত মানুষকে বিয়ে করত তাহলে তাদের সন্তান হত মুক্ত।* ঠিক এই রকমই বক্তব্য আমরা পাই *অর্থশাস্ত্র*-এ (৩.১০)। অন্যদিকে, শিরক্যুয়াটু মন্দির-দাসরা একটা জাত হিসেবে গণ্য হত—এমনকী যখন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত বা সম্পত্তির মালিক হত তখনও। শিরক্যুয়াটু বহির্ভূত কারো সঙ্গে বিবাহের ফলে যখন কোন সন্তানের জন্ম হত তখন সেই সন্তানও পুনরায় মন্দিরের সম্পত্তি হত। অবস্থাটা অনেকটা ভারতের শূদ্রদেরই মতো—তফাৎ শুধু মন্দিরের বদলে আর্যসমাজ বা পরবর্তীকালের তিন উচ্চবর্ণের আর্য।

সব দাসকেই যে ক্রীতদাসের স্তরে নামিয়ে আনা হত তা নয়। দেখা গেছে, কিছু দাস আর্যদের মধ্যের সম্ভ্রমপূর্ণ পদেও উন্নীত হত। বৈদিক ঋষিদের তালিকায় কৃষ্ণ (= কালো) নামধারী একজনের উল্লেখ আছে। সংস্কৃতে দখল থাকা সত্ত্বেও, মনে হয়, তিনি 'বংশগতভাবে বিশুদ্ধ আর্য' নন। ইন্দ্র কর্তৃক বিধ্বস্ত ঘাঁটিগুলির বর্ণনায় কখনও কখনও 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ 'গর্ভে কালো মানুষ ধারণকারিণী'। এটা আজও সন্দেহজনক যে *ঋগ্‌বেদ*-এর ৮.৯৬.১৩-১৫ সূক্তগুলি কোন কল্পিত উপাখ্যান, না কী ইন্দ্র ও কৃষ্ণের লড়াইয়েরই প্রত্যক্ষ বর্ণনা? পরবর্তীকালে, কৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুর অবতার হিসেবে স্বীকৃত কৃষ্ণবর্ণের হিন্দু দেবতা (*ঋগ্‌বেদ* অনুসারে ইন্দ্রের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক, মাঝে মাঝে বিরোধ সত্ত্বেও, মোটের উপর সৌহার্দ্যপূর্ণ—যদিও ভারতের বাইরে আর্যদেবতা হিসেবে তাঁর কোন পরিচিতি নেই), কিন্তু ইন্দ্র ও কৃষ্ণের দ্বন্দ্ব বিষয়ক কাহিনীগুলিও টিকে আছে।

এই ধরনের অকিঞ্চিতকর সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে কোন প্রশ্নের গভীরে যাওয়ার কারণ হল এই সাক্ষ্যের মধ্যেই নিহিত আছে সাধারণভাবে বর্ণপ্রথার এবং বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্যবর্ণের

---

* এই তথ্য এবং উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে I. Mendelsohn-এর *স্লেভারি ইন দি এনসিয়েন্ট নিয়ার ইস্ট* (নিউইয়র্ক) পৃ. ৫৬ ও পৃ. ১০৪ থেকে। শিরক্যুয়াটুদের বিষয়ে R. P. Dougherty-এর *দি শিরক্যুয়াটু অফ ব্যাবিলনিয়ান ডেইটিস* (নিউ হ্যাভেন, ১৯২৩) থেকে। দাসত্বের প্রেক্ষাপট বিষয়ে দ্রষ্টব্য ঃ আই মেন্ডেলসন, *বুলেটিন অফ দি আমেরিকান স্কুলস অব ওরিয়েন্টাল রিসার্চ*, ৮৯.২৫-২০।

গঠনের বিষয়টা। ব্রাহ্মণরা ছিল পেশাদার পুরোহিত—যার তুলনীয় কোন কিছু আর্য ঐতিহ্যে অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালের ভারতে এরা আক্ষরিক অর্থেই প্রায় সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের নিয়ামক হয়ে উঠেছিল। প্রয়োজনীয় যাগযজ্ঞ সম্পাদনের দায়িত্বটা প্রথমে ছিল পরিবার প্রধানের; গোষ্ঠী প্রধানের কঠিন দায়িত্ব ছিল জমি ও পশুপালের উর্বরতা বৃদ্ধি এবং তার গোষ্ঠীর মানুষদের কল্যাণসাধন। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অগ্নির পূজা করত এবং ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতা ছাড়াই ইন্দ্র, বরুণ বা যে কোন দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতে পারত। গ্রীস এবং রোমেও আমরা এমনটা পাই। লাতিনে অগ্নির পুরোহিত 'ফ্লামেন'কে যে 'ব্রাহ্মণ'-এরই সমার্থক বলে মনে করা হয় তা ঠিক নয় (তুলনীয়, কেইথ, *হারভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ* ৩১, পৃ. ৩৯ ও পৃ. ২৭৬)। মূল শব্দ ব্রাহ্মণ, তা পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ যাই হোক না কেন, বিশুদ্ধভাবেই ভারতীয়। আদি যারা বৈদিক অগ্নিহোত্রী তাদের বলা হত 'অথর্বন' অর্থাৎ ইরানীয় 'অথ্রবন'। অন্য যে সব যজ্ঞ-পুরোহিত, যেমন 'হোতৃ'—তাদেরও ইরানীয় প্রতিশব্দ আছে, নেই কেবল ব্রাহ্মণের; তাদের আবির্ভাব ঘটেছে কিছু পরে। প্রতিটি আর্যগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে শ্রেণী-বিভাজনের সূত্রপাতের এরা ঈঙ্গিতবাহী। যে কোন বলিদান অনুষ্ঠানে গোষ্ঠী নৃপতিদের উপহার প্রদান করাটা রীতি ছিল; *ঋগ্‌বেদ*-এর শেষপর্যায়ে এসে এই উপহারকে প্রথম উল্লেখ করা হল 'বলি কর' নামে—যা গোষ্ঠী প্রধানের বিশেষ পাওনা (১০.১৭৩.৬, বলি হৃতঃ)। সমস্ত অভ্যন্তরীণ নিয়মিত করের মধ্যে এটিই ছিল প্রথম এবং বেদ পরবর্তী যুগের ক্রমবর্ধমান করতালিকার মধ্যেও তা রয়ে গেল। পালিভাষায় লিখিত *জাতকে*-ও কর ও উৎসর্গ উভয় অর্থেই 'বলি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে—প্রসঙ্গের তফাৎ অনুযায়ী স্বতন্ত্র অর্থ বুঝে নিতে হয়। *যজুর্বেদ* (পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য)—যেখানে ভূমি বিজয়ের চেয়ে বরং আর্যদের নিয়মিত স্থায়ী জীবনযাত্রা নিয়েই মূলত আলোচনা রয়েছে—সেখানে আমরা দেখি, গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে চারটি বর্ণের[৭] পূর্ণ বিকাশ ঘটে গেছে : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বলিদান প্রথা তখন এত জটিল[৮] হয়ে পড়ে যে পেশাদার পুরোহিত শ্রেণী ছাড়া তা সংঘটন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আড়ম্বরপূর্ণ এই প্রথার প্রধান অভীষ্টই হয়ে ওঠে যুদ্ধজয়। কার্যত, এ দুটিই সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে যায়। আরও একটি অপ্রধান উদ্দেশ্য প্রবলতর হয়ে দেখা দেয়, তা হল—নতুন শ্রেণীগুলির অভ্যন্তরীণ বিবাদের দমন। শাসক যোদ্ধাশ্রেণী বা ক্ষত্রিয়দের স্বার্থের জন্য ব্রাহ্মণদেয় সাহায্য নিয়ে বৈশ্য (বসবাসকারী, কৃষক) ও শূদ্র (ভূমিদাস)-দের শোষণ করতে হবে। বৈশ্যদের সঙ্গে বিবাদ আগেও ছিল—*ঋগ্‌বেদ*-এ সমবেত মরুৎ ও ক্ষত্রিয় প্রধান ইন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে যা প্রতিফলিত। পরে আমাদের জানানো হয়েছে যে এই মরুৎরা কৃষক এবং রাজা যেমন কৃষকদের গ্রাস করে ইন্দ্রও এদের তা-ই করেছেন।[৯] যজ্ঞ করার একটা প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল অন্য তিন বর্ণকে শাসক ক্ষত্রিয়ের-অনুগত রাখা (কেইথ, *হারভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ,* ২.৫.১০)। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ (৭.২৯)[১০] বলা হয়েছে, 'একজন বৈশ্য যেমন ... অন্যকে করপ্রদানকারী, অন্যে তাকে গ্রাস করতে পারে, ইচ্ছে করলে দমন করতে পারে ... একজন শূদ্র যেমন ... অন্যের ভৃত্য, ইচ্ছে করলে তাকে ত্যাগ করা যেতে পারে, ইচ্ছে করলে নিধন করা যেতে পারে।' বলিদানের বহির্গমন ও প্রত্যাগমন—দুটি আচারের সময়ই নীচু জাত দুটিকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যবর্তী স্থানে আটকে রাখা হত যাতে তারা বিনম্রতার শিক্ষা পায় (*শতপত ব্রাহ্মণ*[১১] ৬.৪.৪.১৩)। যজ্ঞ বা হোম ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছিল। সেখানে ক্রমান্বয়ে প্রধান

বলিযোগ্য প্রাণী হয়ে উঠছিল—মানুষ, অশ্ব, বৃষ, মেষ ও ছাগ এবং তা এক উৎসবে পরিণত হয়ে দীর্ঘদিন টিকেছিল। এর কার্যকারিতা এবং কিছুটা সচেতন উদ্দেশ্যও (নিম্নবর্ণদের সম্পর্কে উল্লেখগুলি থেকে যার প্রমাণ মেলে) ছিল গোষ্ঠীর অভ্যন্তরের নবোদ্ভূত শ্রেণী কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করা। কখনও কখনও পুঞ্জীভূত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির বহিঃপ্রকাশ যুদ্ধের মধ্য দিয়েও ঘটেছে।

অনেকে দাবি করেন যে ইরানেও প্রাথমিক স্তরের বর্ণপ্রথা ছিল। এই দাবির ভিত্তি *হল ইয়াসনা* (১৯.১৭)—যেখানে চারটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ পুরোহিত, সারথি, কৃষক ও কারিগর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সঙ্গে বর্ণের কোন সম্পর্ক নেই, কেননা গোত্রবিবাহের কথা কোথাও কোন উল্লেখ নই। তাছাড়াও, মনে হয়, এই চারটি শ্রেণীই ছিল সমানভাবে সম্মানিত—কেননা কোন ন্যায়পরায়ণ মানুষের যাবতীয় পদক্ষেপ (কর্তব্য)-কে সবসময়ই নৈতিক সহযোগিতা যুগিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রীক লেখকরা ভারতীয় বর্ণপ্রথাকে অনন্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন—কখনই ইরানীয় শ্রেণীগুলির সঙ্গে তার তুলনা টানেননি। প্রাচীন *আবেস্তা*-য় তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ ছিল, কারিগর শ্রেণী পরে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এই কারিগরেরা ভারতীয় শূদ্রদের মতো নয়—যদিও সে যুগের পারসিকরা তাদের সাম্রাজ্যকারী পূর্বপুরুষদের সূত্রে দাসপ্রথার কথা জানত। ভারতীয় শূদ্ররা ছিল অশুদ্ধ, অন্যান্য দেশের অ-স্বাধীন শ্রেণীরই প্রতিকল্প। ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কিছুটা তুলনীয় ইরানের ম্যাজিয়ান-রা। হেরোডোটাসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে এরা ছিল ছটি পারসিক-মিডিআ জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি। গৌমাতা নামক এক ম্যাজিয়ান নিজেকে ক্যাম্বিসিক (কম্বুজীয়) বলে ভূয়ো পরিচয় দিয়ে ইরানের সিংহাসন দখল করে। দারিয়ুস তাকে হত্যা করার পর সামগ্রিকভাবে ম্যাজিয়ান-নিধন চলতে থাকে—যা ম্যাজোফোনিয়া নামের বাৎসরিক উৎসবের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হত। তা সত্ত্বেও, পারসিক পুরোহিত হিসেবে ম্যাজিয়ান টিকে থাকে, বিশেষ করে সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশে—এমনকী জরথুষ্ট্রীয় সংস্কারের প্রভাবে ধর্ম সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় পরেও। আর পূর্ব-অংশের অ-ম্যাজিয়ান পুরোহিতদের বলা হত 'অথ্রভন'। জরথুষ্ট্র 'ম্যাজাস' এবং 'ম্যাজোপট'—এই দুটি অভিধা বহাল রেখেছিলেন সম্মানসূচক অর্থে, যেগুলি ঋগ্‌বৈদিক 'ব্রাহ্মণ'- এর সদৃশ, কিন্তু অতটা উচ্চস্তরীয় নয়। একই ধরনের স্বাতন্ত্রীকরণ আদিম সাঁওতালদের মধ্যেও লক্ষ্য করা গেছে (*হান্টার*, ২০০-২০২) ঃ আদিবাসী পুরোহিতদের মূলত বেছে নেওয়া হত তাদের প্রধান দুটি কৌম থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর আগেই সুনির্দিষ্ট (= রাজা, পুরোহিত, সৈনিক কৃষক) পেশা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে বর্ণ-শ্রেণী বিশেষায়নের অভিমুখে একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, এই পেশাগুলি আবার মৌলিক সাত কৌমের কোনটির কাছেই দায়বদ্ধ ছিল না। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর উদ্ভবের এটাও একটা চমৎকার সমতুল দৃষ্টান্ত।

৪.৫ সবচেয়ে কালজয়ী যে সংস্কৃত সাহিত্য তা ব্রাহ্মণদের রচনা বা তাদের কুক্ষিগত বা কোন-না-কোনভাবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত। অন্য যে সাহিত্য, যেমন বৌদ্ধ বা জৈন—তা-ও অত্যন্ত রকমের রঞ্জিত ঃ প্রথমদিকে, অন্তিম বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এবং পরে ব্রাহ্মণ্য অন্তর্ভেদিতার রঙে। উৎপাদনের উপায় এবং বিশেষ করে উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অজস্র পরিবর্তন ঘটছিল ব্রাহ্মণ্য শ্রেণী তার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল—শুধুমাত্র তাদের

মতাদর্শগত কাঠামো থেকেই এ কথাটা ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বর্ণের গঠনের বিষয়টা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে এবং সেক্ষেত্রে যে ক্রমাগত পরিবর্তন কাজ করেছিল তা-ও সঠিকভাবে বিবেচনা করা দরকার।

এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ব্রাহ্মণদের প্রথম উদ্ভবটা ছিল আর্য পুরোহিততন্ত্র ও সিন্ধু সভ্যতার লোকাচারগতভাবে উন্নত পুরোহিততন্ত্রের মধ্যেকার আন্তঃক্রিয়ারই ফলশ্রুতি। ব্রাহ্মণদের মূল সাতটি বিভাগের মধ্যে অসংখ্য গোত্র আছে—যার প্রতিটির ক্ষেত্রেই স্বগোত্র বহির্ভূত বিবাহ বাধ্যতামূলক। এটা অনেকটা লাতিন জেনস-এরই মতো। 'গোত্র' একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ এবং সম্পূর্ণ *ঋগ্‌বৈদিক* অর্থে এ দিয়ে মূলত গোয়াল বা গোশালা বোঝায়। এটা জানা গেছে যে, প্রতিটি গোত্রেরই গবাদি পশুকে নির্দিষ্টকরণের জন্য নিজস্ব চিহ্ন ছিল, যা পরে সাধারণ্যে প্রচলিত হয়। পরবর্তীকালে যৌথ মালিকানার এককগুলি যখন যৌথ পরিবারে রূপান্তরিত হল, যা এখনও ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে বিদ্যমান, গোত্রের অর্থও সেই অনুযায়ী পাল্টে হল 'পরিবার' এবং 'কুল'। আসলে সম্পদের রূপই তার ঐক্য এবং যৌথ অধিকারী মানবগোষ্ঠীগুলির নাম এনে দিল।[১২] এমনকী যখন জমি সম্পদে রূপান্তরিত হল, গবাদি পশুগুলি তখনও, মালিকানাধীন জমির পরিমাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে, সম্পদের একটি পরিমাপক হিসেবে গণ্য হতে লাগল। শাস্ত্রগতভাবে সাতটি বড় গোষ্ঠী বা যে কোন উপগোষ্ঠী এর পর থেকে এক একজন ঋষির বংশধারা হিসেবে পরিচিত হল—যাঁদের নাম প্রতিটি গোত্রের সঙ্গে এখনও যুক্ত হয়ে আছে। অবশ্য, পরিণতিতে, কোন গণনা-পদ্ধতির সাহায্যেই পূর্বতন ঋষিদের সংখ্যা সাত করা যাচ্ছে না। 'সপ্ত' নাম সম্বলিত অন্তত দুটি স্বতন্ত্র তালিকা পাওয়া গেছে যার প্রাচীনটির সঙ্গে বিকশিত ও বিদ্যমান ব্রাহ্মণ্য গোত্রের সাযুজ্য সামান্যই। মনে করা যেতে পারে, 'সপ্ত অর্থে' এখানে সপ্তনদ বা হয়ত মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন 'সপ্তর্ষি'-র কথাই বলা হয়েছিল।

অনার্য ব্রাহ্মণদের লক্ষণ হল তাদের কয়েকজনের নামের সঙ্গে তাদের মায়ের নামও উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, ত্রৈতন-র হাতে পর্যুদস্ত হওয়া দীর্ঘতমস হলেন মমতা নাম্নী এক দাসীর পুত্র; পিতা কখনও উশিজ, কখনও উচথ্য। *ঋগ্‌বেদ*-এর আর্যরা জন্মগতভাবে পিতৃপরিচয়ই বহন করত, মায়ের নাম উল্লেখ হত না। সুতরাং, অন্ধ দীর্ঘতমস যে অচেনা মানুষদের কাছে সম্মানের প্রত্যাশায় নদীপথ ধরে পূর্বাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন—এ কাহিনীর মধ্যে অর্থবহও কিছু থাকতে পারে। হয়ত সিন্ধুর পুরোহিতরা এমনটাই করতে চেষ্টা করত। 'দাসীর পুত্র' অভিধাটি অন্য বৈদিক ঋষিদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। বিশিষ্ট দুটি গোত্রের জনক অগস্ত্য এবং বশিষ্টের জন্ম হয়েছিল দ্রোণি-তে। দ্রোণি হল গর্ভেরই প্রতীক, অন্তত বশিষ্ঠের ক্ষেত্রে কোন প্রাগার্য দেবীমাতৃকার গর্ভ। এই বশিষ্ঠ তাঁর পূর্ণ জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করেছেন *ঋগ্‌বেদ-এর* ৭.৩৩ সূক্তে। অন্যত্র, বশিষ্ঠ কুলগ্রন্থে আমরা দেখি যে, তিনি রাজা সুদাসের পুরোহিত পদে বৃত হয়েছিলেন,[১৩] অর্থাৎ ভরতদের প্রধান পুরোহিত। তাঁর আগে এই পদে ছিলেন জনৈক বিশ্বামিত্র—*ঋগ্‌বেদ*-এর তৃতীয় অংশ এখনও তার সাক্ষ্য দেয়। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধের কাহিনীর উল্লেখ পরবর্তী কালের সব শাস্ত্রেই রয়েছে। আবার, *ঋগ্‌বেদ*-এর ৩.৫৩ ২১-২৪ সূক্তগুলি পড়লে ক্ষতি হয় তাই বশিষ্ট গোত্রীয় মানুষদের পড়া নিষেধ—সেখানে তাদের ওপর বিশ্বামিত্রের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। এই একই শ্লোকে আমরা পাই, মূর্ছমান বিশ্বামিত্র জমদগ্নির কাছ থেকে রহস্যময়

'সসর্পরি' উপহার পেলেন—যা তাঁকে বশিষ্টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আবার সক্ষম করে তুলল (টীকাকার অনুসারে)। গোত্র-প্রতিষ্ঠাতা ঋষিদের মধ্যে বিশ্বামিত্রকেই মনে হয় সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ আর্যদের একজন—কেননা স্বীকার করা হয়েছে যে তিনি ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ শাসক যোদ্ধৃ শ্রেণীরই সদস্য। তাঁর গোত্র জাহ্নু এবং টোটেম পেচক (কুসিক)। জামদগ্নিদের আগমন স্পষ্টতই বৈদিক যুগের বিলম্বিত পর্যায়ে ঘটেছিল (যদিও বশিষ্টদের মতোই সুন্দর সুন্দর আর্যনাম এরা গ্রহণ করত)। তাদের নিজস্ব কোন কুলগ্রন্থও নেই এবং আরও পরবর্তীকালে আসা ভৃগুদেরই একটা শাখা হিসেবে এদের গণ্য কর. হয়—যে ভৃগু জনগোষ্ঠীর কথা আমরা সুদাসের বিরুদ্ধে দশ রাজা যুদ্ধে পেয়েছি।

ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্য বৈশিষ্টগুলি থেকেও প্রাগার্য সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার ঘটনার সপক্ষে প্রমাণ তুলে ধরা যায়। দেবী উষস-এর একুশটি গোপন নাম ছিল— যা জানত কেবল তাঁর উপাসক পুরোহিতরাই। তন্ত্রসাধন প্রণালীর মধ্যে সিন্ধুর উপাদানগুলির টিকে থাকা ও পুনঃপ্রচলনের কথা আমরা আলোচনা করেছি। এগুলির উদ্ভব হয়ত উর্বরতার কামনায় করা আচার অনুষ্ঠান থেকে ঘটেছিল—কিন্তু গোড়া থেকেই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এগুলির একটা নিবিড় সংযোগ ছিল। যদিও শিলালিপিতে উৎকীর্ণ প্রথম যে ভারতীয় বর্ণমালার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে তা অত্যন্ত সরল এবং খরোস্তি-র মতোই সেমেটিক উৎসজাত, কিন্তু এটা অনুধাবনযোগ্য যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবেই প্রথম ভারতীয় লেখায় সিল্যাব্‌ল (Syllable) এর প্রচলন ঘটে; অক্ষর যা সিল্যাব্‌লও তাই—যেমনটা মেসোপটেমিয়ায়(এবং চীনে) ছিল। আখ্যানগুলির কয়েকজন রাজার নাম ছিল দু'টি করে, সংস্কৃতে যা পরস্পর উপজাত নয়। এর ব্যাখ্যা মূল নথির ভিত্তিতে এইভাবে করা যেতে পারে যে, নামগুলি লেখা হয়েছে একভাবে এবং উচ্চারিত হয়েছে অন্যভাবে—যেমন কিউনিফর্মের ক্ষেত্রে ঘটেছে, 'শিস-পুর-লা' সিল্যাব্‌লগুলি একটি নগরীর নাম, উচ্চারিত হয় 'লাগাশ', 'পা-তে-সি'র উচ্চারণ 'ইশাকু', রাজা-রাজ্যপাল ইত্যাদি। এর কারণটা মনে হয়, অন্য ভাষার মানুষেরা মেসোপটেমিয়ার আদি বাসিন্দাদের উৎখাত করে দিয়েছিল—যদিও লিপিগুলি টিকেছিল।

নির্বাচিত গুরুর অধীনে চাষহীন অরণ্যে দীর্ঘ ও কঠোর অধ্যয়নের পদ্ধতি ছিল, আমরা আগেই বলেছি, পবিত্র গ্রন্থগুলির অপরিবর্তনীয়তাকে রক্ষা করার স্বার্থে। গোড়া থেকেই যদি এমনটা প্রচলিত থেকে থাকে তাহলে এই বিচ্ছিন্নতা—নগর জীবন, সেখানকার কর্মপ্রকরণ বা ইতিহাস সম্পর্কে কোন তথ্যই আমাদের যোগাতে পারে না। এই পদ্ধতি থেকে কোন বিপুল প্রজ্ঞা, পুরাণ বা অতীব জটিল ধরনের পরম্পরার উদ্ভব কল্পনা করাও শক্ত যদি না ব্রাহ্মণরা প্রাথমিকভাবে কিছুটা শিক্ষিত এবং সে কারণে কোন নাগরিক অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। কিন্তু বৈদিক আর্যদের ক্ষেত্রে তেমন কিছু ছিল বলে মনে হয় না। কেবলমাত্র অনার্যরাই ছিল বেদের যুগের প্রধান নগরবাসী। ব্রাহ্মণ্য গোত্রনামগুলির মধ্যে গোড়া থেকেই গোষ্ঠী নামগুলির স্পষ্ট ছাপ থেকে গেছে এবং তা ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত। পুরুকুৎসু হল দুই আর্য জনগোষ্ঠীর মিলিত নাম; *ঋগ্‌বেদ*-এর ৬.২০.১০ সূক্তে ঋষি ভরদ্বাজ ঐ নামের এক রাজার স্তুতি করছেন এবং তা কোন তাৎপর্যহীন ঘটনা নয়, কেননা ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণদের মধ্যে এখনও পুরুকুৎসু নামের একটি উপগোত্র বিদ্যমান। বিকর্ণ (সুদাস কর্তৃক পরাজিত)-এর মতো অন্য জনগোষ্ঠীগুলিও একাধিক উত্তরসূরি গোত্রের মধ্যে নিজেদের নাম রেখে গেছে। উদুম্বরারা হল বেদোত্তর যুগের জনগোষ্ঠী,

এদের মুদ্রারও সন্ধান পাওয়া গেছে (ত্রি-চিহ্ন বিশিষ্ট, যা সম্ভবত তাদের টোটেম)। কিন্তু উদুম্বরা ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব বিশ্বামিত্র বা কাশ্যপদের মধ্যে রয়েছে। কাশ্যপ ব্রাহ্মণরা পরবর্তীযুগের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে অত্যন্ত বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিল—বিশেষ করে গাঙ্গেয় উপত্যকায়; অবশ্য *ঋগ্‌বেদ*-এ এরা প্রায় গুরুত্বহীন। তাদের এবং কণ্বদেয় দীর্ঘদিন যাবৎ যজ্ঞদক্ষিণা গ্রহণে অনধিকারী বলে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এই অস্বস্তিকর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে পরে আলোচনা করতে হবে। একথা ঠিক যে কণ্বরা ছিল এক ধরনের দৈত্য এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য পরবর্তীকালে *অথর্ববেদ*-এ কিছু মন্ত্রও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও *ঋগ্‌বেদ*-এর অষ্টম অংশে কণ্ব ব্রাহ্মণদের একটি গোত্র পরিচিতি সন্নিবিষ্ট আছে।* *দিঘ নিকায়* (৩) গ্রন্থে বুদ্ধকে বলা হয়েছে কাহ্নায়ন গোত্রের—যার উদ্ভব কাহ্ন নামের এক ঋষি থেকে এবং এই নামকরণের কারণ অপদেবতাদের তখন কাহ্ন (কৃষ্ণবর্ণ) নামে ডাকা হত। কর্সিনায়ন বলে কোন গোত্রের কথা জানা যায় না, সুতরাং কাছাকাছি সঠিক সংস্কৃত শব্দটি ছিল সম্ভবত কাম্বায়ন—শুঙ্গ আমল থেকে যে গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এখনও আছে। মনে হয়, কিছু প্রাগার্য কণ্ব-র আত্মীকরণ বাকি ছিল। বশিষ্ঠদের মধ্যের বালশিখা গোত্রের শব্দগত উৎপত্তি বরশিখা থেকে—ইন্দ্র যাদের হরিউপিয়ায় ধ্বংস করেছিলেন।

একটিমাত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার বাধানিষেধের কঠিন নিগড় থেকে এই যে মুক্তি বা অন্য কোন জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে নিশ্চিন্তে দিনযাপনের ক্ষমতা—পরবর্তী যুগেও তা ব্রাহ্মণ্যবাদকে বাঁচাতে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিল। *ঋগ্‌বেদ*-এর ঋষিদের উভয় পক্ষ থেকেই দক্ষিণা গ্রহণ করতে আমরা দেখেছি। বশিষ্ঠরা—যারা ভরতদের পক্ষ নিয়ে পুরুদের অভিশাপ দিয়েছিল—তারাই আবার *ঋগ্‌বেদ*-এর ৭.৯৬.২ সূক্তে পুরুদের স্তুতি গাইছে। অন্যদিকে, কোন ক্ষত্রিয় সবসময়ই অভিহিত হয়েছে এক এক জনগোষ্ঠীর ক্ষত্রিয় হিসেবে। পোষ্য গ্রহণের অর্থ ছিল (জ্ঞাত পিতৃতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে) পূর্বতন গোত্র এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে—অন্তত পক্ষে উত্তরাধিকার ও আচার-অনুষ্ঠানগত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে। প্রাচীন ব্রাহ্মণদের বেলায় এর বিপরীত অজস্র দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পাই ঃ সুনহ্ সেপা ('সারমেয় পুচ্ছ'; এঁর দুই ভাই-এর নামের অর্থও একই—অর্থাৎ, সম্ভবত একটিই বিশ্লিষ্ট টোটেম)-কে তাঁর ক্ষুধিত পিতা অজিগর্ত নরবলির জন্য বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁকে বাঁচান এবং পোষ্য নিয়ে নাম পরিবর্তন করে রাখেন দেবারত। আজও দেবারত গোত্রের মানুষরা বিশ্বামিত্র বা জামদগ্নি গোত্রে বিয়ে করতে পারে না। মুন্ডাদের এক বীর যাঁকে মূল বানো (বিড়াল) কৌম থেকে হেরেঞ্জ কিলি-তে গ্রহণ করা হয়েছিল তাঁর উত্তরসূরিদের এই ধরনের যুগ্ম উপবীত ধারণ করতে হয়। দ্বৈতগোত্রের পরিচয়বাহী এরকম

* হিরণ্যকেশিন সত্যাসাধ-এর আচার পালনবিধি গ্রন্থে (১০.৪) কণ্ব ও কাশ্যপদের যজ্ঞদক্ষিণা প্রদানের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তার সমতুল আধুনিক একটি অধিকারহননের দৃষ্টান্ত আছে। বিহারের শাক্যদ্বীপ ব্রাহ্মণ, যাদের ঐতিহাসিক উদ্ভব সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই, শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণভোজন অনুষ্ঠানে তাদের খেতে দেওয়া হয় না—যদিও তাদের চেয়ে নিম্নস্তরের অনেকে খেতে পায়। (জি এ গ্রিয়ারসন, *ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুইটি*, ১৭.২৭৩)। এই বহিষ্কৃত ব্রাহ্মণরা হয়ত সিদিআর আমলে মুলতানে (পৃ. ৩১৫) নিয়ে আসা সেই বহির্দেশীয় ম্যাজিয়ান গোষ্ঠী (*শাম্ব পুরাণ* ২৬)—আসার পর যারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বা অন্যদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাসে আকৃষ্ট করেছিল। খুব সম্ভব, প্রখ্যাত বরাহমিহির এই ম্যাজিয়ান ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত, তা না হলে '-মিহির' শব্দাংশটির ব্যাখ্যা দেওয়া দুরূহ। ইন্দো-সিদিআন মুদ্রাগুলিতে ভগবান 'মিইরো' বা 'মিয়োরো' অজস্রবার দেখা দেন। আবার, বরাহমিহির তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন সূর্যদেবতাকে এবং সূর্যতাপস মাগস-কে আহ্বান করেছেন। (*বৃহৎসংহিতা*, ৬০.১৯)

আরও অনেক কৌম আছে: কিছু কিছু আবার দিনে বশিষ্ঠ, রাতে বিশ্বামিত্র। এ সব থেকে এটাই অনুমান করা যেতে পারে যে, কিছু মানুষ যারা মাতৃধারার দিক থেকে কোন ধরনের জ্ঞাতি সম্পর্কে আবদ্ধ—একটি পুরুষতন্ত্র অধিকৃত সমাজে এই ভাবেই তারা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল।

ঋগ্‌বেদ-এর ঋষি কবশ ঐলুশ-কে অভিযুক্ত হতে হয়েছে 'দাস্যঃ পুত্র', অর্থাৎ কোন দাস-নারীর পুত্র হিসেবে এবং অন্য ঋষিরা তাঁকে তাঁর বর্ণ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এই ঐলুশ-এর স্তোত্রের (*ঋগ্‌বেদ*, ১০.৩০) জোরেই পুণ্যতোয়া সরস্বতী তাঁকে অনুসরণ করে মরুভূমিতে গিয়েছিল। তাঁর পূর্বপুরুষ কবশকে ইন্দ্র (সুদাসের পক্ষ নিয়ে) দ্রুহ্যদের সঙ্গেই বিতাড়িত করেছিলেন। *ঋগ্‌বেদ*-এর অন্য দুজন ঋষি কন্বপুত্র বাৎস্য ও মেধাতিথি—যাঁরা ছিলেন পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভাই—তাঁদের মধ্যেও একই ধরনের বিবাদ ছিল। দ্বিতীয়জন প্রথম জনকে 'দাস নারীর পুত্র' বলে গাল পাড়তেন—যার জন্য তাঁকে আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে তাঁর জন্মের শুদ্ধতার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এই ধরনের বৃত্তান্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগুলিতে আরও রয়েছে—এমনকী *ঋগ্‌বেদ* পরবর্তী যুগেও। বিশ্লেষণের জন্য ছাড়া এগুলিকে উদ্ধার করার আর কোন যৌক্তিকতা নেই, অর্থাৎ, অন্তত কিছু ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে যে আদি দাস থেকে উদ্ভূত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে এই সত্যটা অনুধাবন করার জন্যই। এ থেকে তাদের আর্য পিতৃত্ব এবং আর্যগোষ্ঠী নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র পরিচয়গত ঐক্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। *ঋগ্‌বেদ*-এ স্বীকৃত মাতৃ-অধিকারের যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবশেষগুলির উল্লেখ আছে সেগুলিও মাথায় রাখা যেতে পারে—যেমন, এক দেবতার অনেক মাতা ছিল, কিন্তু জ্ঞাত কোন পিতা ছিল না।

আর্য জনগোষ্ঠীর কোন ব্রাহ্মণ সদস্যের অন্যদের মতোই সমান সম্পত্তির অধিকার ছিল—কেবলমাত্র দলপতি ছাড়া। কিন্তু, গোড়া থেকেই আমরা দেখছি, কিছু পুরোহিত তাঁদের হৃদয়-বিদারক দারিদ্র্যের জন্য বিলাপ করছেন। বামদেব (*ঋগ্‌বেদ*, ৪.১৯.১৩) কাঁদছেন: 'ক্ষুধার চরম তাড়নায় আমি কুকুরের নাড়িভুঁড়ি সিদ্ধ করে খেয়েছি; দেবতাদের মধ্যে কেউ আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি; আমার স্ত্রীকে আমি পতিতা হতে দেখেছি; তারপর তো শ্যেণপক্ষী (ইন্দ্র) আমাকে (অধিকার) দিলেন মিষ্ট সুরাপানে (একটি গোষ্ঠীভোজে)।' এটি ইন্দ্রের একটি দানস্তুতি যা পরবর্তীকালের যে কোন মানব প্রধানের সঙ্গে তুলনীয়। *ঋগ্‌বেদ*-এর ১.১০৫ সূক্তের ঋষি, যিনি রাত্রিকালে মনে হয় কোন কূপের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন, কূপতল থেকে সপ্তর্ষিমন্ডল ও ছায়াপথের নক্ষত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন: 'আমার (ভেঙে যাওয়া) পাঁজরগুলি সতীনদের মতো ঝগড়া লাগিয়েছে; ক্ষুধার্ত ইঁদুর যেভাবে নিজের লেজ (চিবোয়), অজস্র যন্ত্রণা আমাকে সেইভাবে চিবোচ্ছে।' ১০.১০৯ সূক্তে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর প্রত্যাগমন কামনা করা হয়েছে—যাকে কোন রাজা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। ৮.১০২.১৯-২১ সূক্তগুলির প্রার্থনা আরও করুণ; সেখানে বিনীত এক ব্রাহ্মণ অগ্নির কাছে ক্ষমা চাইছেন—কীটদ্রষ্ট সমিধ তাঁকে উৎসর্গ করেছেন বলে, যেহেতু তাঁর কোন গরু নেই, এমনকী একটি কুঠারও নেই।

এই স্তোত্রগুলি প্রমাণ করে যে কোন কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে কখনও কখনও নিঃসহায় একাকীত্বের শিকার হতে হয়েছে—যা কোন জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সদস্যের ক্ষেত্রে ঘটা সম্ভব ছিল না। প্রায়শই তারা ছিল প্রান্তবাসী। একাধিক জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রধানদের একজনই যৌথ পুরোহিত ছিল এমনটাও জানা গেছে (*রাড়*, ১২৩)। কিন্তু কাশী-কোশল-বিদেহ গোষ্ঠীগুলি মিলে গিয়েছিল এবং অচিরেই গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজত্ব স্থাপন করেছিল; এদের গোষ্ঠীগত

উপাদানগুলি তখন বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এরপর যখন তারা যোদ্ধৃশ্রেণীর সঙ্গে নতুন বোঝাপড়ায় আসতে সক্ষম হল তখন থেকেই সূচিত হল পরবর্তী জাতবিভক্ত পুনর্গঠন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত উৎপাদন, স্থায়ী বসবাস এবং এক নতুন ধরনের সম্পদের বিকাশের সাথে সাথে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজ-সংগঠনগুলির অনিবার্য বিলুপ্তি।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ :

১. ভি গর্ডন চাইল্ডের উল্লিখিত অন্যান্য বইগুলি ছাড়াও তাঁর *দি এরিয়ানস* (লন্ডন, ১৯২৬) বইতে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে—যদিও এর কিছু বিশ্লেষণের পুনর্মূল্যায়ন জরুরি। খোরেজ্ম থেকে দুটি ধারার উৎপত্তির বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার জন্য আমি এথনোগ্রাফিকাল ইনস্‌টিটিউট অফ দি ইউ এস এস আর (অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স)-এর অধ্যাপক সারগেই পাভলোভিচ টলস্টয়-এর কাছে ঋণী। তাঁর আবিষ্কৃত প্রকৃত 'যিমা-র বর' এর সময়কাল সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধ, কিন্তু এখানে আলোচিত আদিরূপটি অবিতর্কিতভাবেই অনেক প্রাচীন। এ বিষয়ে এবং ইরানীয় সূত্রগুলি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ই হারজ্‌ফেলড (E. Herzfeld) : *জরথুষ্ট অ্যান্ড হিজ ওয়ার্ল্ড* (প্রিন্সটন, ১৯৪৭)।

২. *ঋগ্‌বেদ*-এর উল্লেখগুলি নেওয়া হয়েছে পুনার বৈদিক সংশোধন মন্ডল কর্তৃক প্রকাশিত পুঁথির (সায়নের টীকাসহ) চারটি খণ্ড (১৯৩৩-৪৬) থেকে। কিছু প্রয়োজনীয় অর্থ উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন ছিল একটা ভাল অনুবাদের সতর্ক ব্যবহার এবং সেক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া হয়েছে *হারভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ* (এইচ ও এস) খণ্ড ৩৩-৩৪ (কেম্ব্রিজ, ১৯৫১)-এ কে এফ গেলড্‌নার-এর অনুবাদ থেকে। এইচ গ্রাসমান্-এর ঋগবৈদিক শব্দকোষ (Woerterbuck)-টির তৃতীয় মুদ্রণ এখন পাওয়া যায় এবং তার নির্দেশিকার জন্য বইটি অপরিহার্য—যদিও তিনি যে অর্থগুলি করেছেন সে বিষয়ে অনেকক্ষেত্রেই মতপার্থক্য থাকতে পারে। এ এ ম্যাকডোনেল এবং এ বি কেইথ-এর *বেদিক ইনডেক্স* (২ খণ্ড, লন্ডন, ১৯১২) গ্রন্থটির, প্রত্নতত্ত্বের আলোকে, বেশ কিছু পরিমার্জন প্রয়োজন—যদিও সূত্র নির্দেশের জন্য তা ব্যবহার করা যেতে পারে। *আবেস্তা*-র উল্লেখে আমি ব্যবহার করেছি জে ডার্মস্টেটার-এর অনুবাদ [*সেক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট,* (এস বি ই) খণ্ড ৪, ২৩; এল এইচ মিলস, এস বি ই ৩১ (ইয়াসনা বিষয়ে)]। জরথুষ্ট্রীয় সংস্কারের ফলে অধিকাংশ আর্য দেবতাই অসুরে পরিণত হয়েছিল (আবেস্তীয় দায়েব), অবশ্য অগ্নি ও সোমরস বেঁচে গিয়েছিল।

৩. এ বি কেইথ : *রিলিজিয়ন অ্যান্ড ফিলজফি অফ দি বেদস* (এইচ ও এস, ৩১-২, ১৯২৫)। এখানে বেদ-বিষয়ক পূর্বের সিদ্ধান্তগুলি দেওয়া হয়েছে এবং পাল্টা যুক্তিতে সেগুলি নস্যাৎও করা হয়েছে। অসাধারণভাবে পুঁথি বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে. সাম্প্রতিক সূত্র (ডি ই ম্যাককার্ডন, *জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি* (জে এ ও এস), ৭৪.১৭৬) অনুসারে, 'মেলুহ্‌য়া'-কে যদি সিন্ধু উপত্যকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাহলে তা ধ্বংসের সময়কাল প্রায় ১৭৫০ খ্রী.পূ. (ডব্লিউ এফ অলব্রাইট, *বুলেটিন অফ দি আমেরিকান স্কুলস অফ ওরিয়েন্টাল রিসার্চ,* ১৩৯.১৬)। আর্য আক্রমণের কালনির্ণয় সম্পর্কে ডব্লিউ ইউস্ট-এর আগের অভিমতের (ব্যাপক ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার পর) সঙ্গে এর চমৎকার মিল আছে। দ্র. *Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des*

Morgenlandes, 34, 1927, 165-215।

৪. *দি অরিজিন অফ ব্রাহ্মিন গোত্রস (জার্নাল অফ দি বোম্বে ব্র্যাঞ্চ অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি,* ২৬,১৯৫০, পৃ. ২১-৮০)। আইরিশ উপকথা বা অন্যত্রও ত্রিমস্তক বিশিষ্ট দৈত্যের উল্লেখ আছে—পরিশেষে যে গৌণ দৈত্যদের একজন হয়ে গিয়েছিল এবং দৈত্যহন্তা জ্যাক তাকে নিধন করেছিল।

৫. ই ফোররের অসাধারণ রিপোর্ট, *Zeitschrift der Deutchen Morgenlandischen Geselschaft,* ৭৬, ১৯২২, *পৃ.* ১৭৪-২৬৯। এ ছাড়াও দেখুন পি ই ডুমোঁ, *জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি,* ৬৭, ১৯৪৭, পৃ. ২৫১-২৫৩)।

৬. এই উপাখ্যানগুলির তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল যে, ইন্দ্র কর্তৃক তাঁর মিত্রদের মস্তক ছেদন—একবার অনার্য বিষ্ণুর, আর একবার তাঁর নিজেরই অগ্নিহোত্রী দাধ্যায়ংক অথর্বন-এর। দ্বিতীয় অশুভ ঘটনাটি ঘটার পর যমজ নাসত্য ভ্রাতৃদ্বয় বুদ্ধি খাটিয়ে একটি অশ্বের মাথা কেটে নিয়ে অথর্বনের দেহে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অশ্বের মাথাটিও একইভাবে কেটে সারণাবত নামে একটি হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা হয়—যেখান থেকে তা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য জেগে উঠত। এ ঘটনা মনে করিয়ে দেয় ডেনমার্কে উৎখননে পাওয়া সেই ছোট পুষ্করিণীর কথা যেখানে একটি অশ্বমুন্ড পাওয়া গিয়েছিল। আবার, ডেনমার্কের ওক কাঠের আস্তরণ দেওয়া গর্তগুলি, যেখানে অখন্ড অশ্বকঙ্কালগুলি সংরক্ষিত হত, তার সঙ্গে ভারতীয় অশ্বমেধের আবধ্য-গোহক গহ্বর (যেখানে ঘাসের আস্তরণের ওপর অশ্বগুলির দেহাবশেষ ও সযত্নে পুনর্যোজিত অস্থিখণ্ডগুলি রক্ষিত হত)-এর একটা সম্পর্ক আছে। ঘোড়া যেহেতু আর্যপালিত পশু তাই পরবর্তী কাহিনীগুলির মুন্ডচ্ছেদিত অসুরের সঙ্গে একে ঠিক মেলানো যায় না।

৭. পরবর্তীকালের যে চতুর্বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সম্বন্ধে *ঋগবেদ*-এর যাবতীয় ব্যাখ্যা রয়েছে কেবলমাত্র ১০.৯০ সূক্তে—যা সম্পূর্ণভাবে পরবর্তীকালেরই সংযোজন। সেখানে বলা হয়েছে, বর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল প্রাচীন দেবতা 'সাধ্য' কর্তৃক এক আদিমানব(পুরুষ)-কে বলিদানের পর। এই 'সাধ্য' মনে হয় প্রাগার্য দেবতা—যদিও তাঁর কথা বিশেষ উল্লেখ করা হয়নি। স্পষ্টতই এ স্তোত্রটির অভীষ্ট হল ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং তা এমন এক সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে যে ব্যবস্থায় বলপ্রয়োগ ও প্রথা ছাড়া আর কিছু নেই।

৮. *যজুর্বৈদিক* অশ্বমেধ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া গেছে খোদাই করা ইঁটগুলি আবিষ্কারের পর—যে ইঁট দিয়ে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করা হত। হরিদ্বারের কাছাকাছি প্রকৃত যে স্থান থেকে এগুলি উদ্ধার করা হয়েছে তা খ্রীষ্টযুগ শুরুর সময়কালের বলে মনে করা হয়—তা সত্ত্বেও এই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমোদন মূল্যবান।

৯. *ঋগবেদ*-এর ১.৬৫.৭ সূক্তে বর্ণনা করা হয়েছে যে অগ্নি—ইভ্যাস নামক এক রাজার বেশ ধরে অরণ্যগুলিকে ভক্ষণ করছেন। গেলড্‌নার 'ইভ্যা' শব্দটির অর্থ করেছেন রাজার অনুচরবর্গ-- যারা হস্তিযুথ পালনের মতো যথেষ্ট ধনী। কিন্তু এই ধরনের সামন্তপ্রথার কথা নিশ্চিতই *ঋগ্‌বেদ*-এ নেই। অশোকের শিলালিপিতে ইভ্যা-র উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণ-বিরোধী হিসেবে, অর্থাৎ একটি অত্যন্ত নীচ জাত। নীচ, অসভ্য, বর্বর বলে একই অর্থ করা হয়েছে অম্বাখ সূক্তে (*দিঘ নিকায়* ৩) এবং *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এর (১.১০.১-২) ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ উসস্তি চক্রায়ণের কাহিনীতেও। সুতরাং *ঋগ্‌বৈদিক* নৃপতিটি, ভক্ষণ করছিলেন তাঁর গোষ্ঠী বহির্ভূত

মানুষদেরই—তা ধনী দাসদের লুণ্ঠন করেই হোক বা হস্তি টোটেমভুক্ত আদিম অধিবাসী, পরবর্তীকালে যারা নীচু জাতের মাহুত হিসেবে পরিচিত ছিল, তাদের উৎপীড়ন করেই হোক। *মজ্ঝিম নিকায়*-৯৫ এর শেষেও 'ইভো' শব্দটি এই ধরনের নীচ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে; *দেশিনামমালা*-য় অর্থ করা হয়েছে বণিক, বাণিজ্যকারী। *জাতক*-এর টীকাতে পরোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সম্পন্ন 'গহপতিক', যদিও বুদ্ধঘোষের কাছে 'গহপতি' শব্দের অর্থ ছিল ক্ষুদ্র চাষী, যে নিজেই নিজের জমি চাষ করে। *জাতক* ৫৪৩ (*ফাউসবোয়েল,* ৬.২১৪) *জাতক* ৫৪৪ থেকে অর্থ হয় কেবলমাত্র নীচ এবং কোন ধনী ব্যক্তি।

১০. *ঋগবেদ*-এ সংযোজিত এই ব্যাখ্যার জন্য *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* (অনুবাদ-এ বি কেইথ, *এইচ ও এস,* ২৫, ১৯২০)-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কিন্তু *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এর এই নির্দিষ্ট অধ্যায়টি পরে যুক্ত হয়েছে বলে প্রমাণ হয়েছে—অর্থাৎ ঘটনাগুলি ঋগবৈদিক হতে পারে না।

১১. *শতপথ ব্রাহ্মণ* (যজুর্বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা)-এর এজ্‌জেলিং কৃত অনুবাদ, *এস বি ই,* খণ্ড ১২, ২৬, ৪১, ৪৩, ৪৪ (অক্সফোর্ড ১৮৮২-১৯০০)-র কথা উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে চমৎকার নির্দেশিকার জন্য।

১২. ৪নং সূত্র ছাড়াও আগ্রহী পাঠকরা আমার 'ব্রাহ্মিন ক্ল্যান' (*জে এ ও এস,* ৭৩, ১৯৫৩, পৃ. ২০২-২০৮) শীর্ষক সমালোচনামূলক নিবন্ধটি দেখতে পারেন। গোত্র প্রথা, আধুনিক ব্রাহ্মণরাও যা গ্রহণ করেছেন, তার সবচেয়ে ভাল বর্ণনা আছে জে ব্রাউ ঃ *দি আরলি ব্রাহমিনিকাল সিসটেম অফ গোত্র অ্যান্ড প্রবর* (কেম্ব্রিজ, ১৯৫৩)-তে। *মৎস্যপুরাণের* বর্তমানে প্রচলিত গোত্র তালিকার আদিরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করে আমি ভুল করেছিলাম। *জে এ ও এস,* ৭৪, ১৯৫৫, পৃ. ২৬৩-২৬৬-তে ব্রাউ-এর সংশোধনী যথার্থ।

১৩. যেহেতু আমার নিজের গোত্র বশিষ্ঠ সুতরাং এই ভুঁইফোঁড় পূর্বপুরুষটি সম্পর্কে আমার মনে কোন প্রতিকূল মনোভাব থাকার প্রশ্নই ওঠে না। নামটি যদিও আর্য শব্দ—যার অর্থ 'অতীব উত্তম'—তবু মনে হয় আরোপিত। পরবর্তীকালে প্রতিটি গোত্রই স্বতন্ত্র কেশবিন্যাস করত। ভৃগুরা ছিল মুন্ডিত মস্তক, গোতম এবং ভরদ্বাজরা রাখত পঞ্চচূড়া, আত্রেয়রা তিনটি বিনুনি এবং বশিষ্ঠরা ডানদিকে একটা। বশিষ্ঠদের ধরনের জটার ছাপ সিন্ধুর সীলমোহরে পাওয়া যায়নি, কিন্তু মিশরীয় মূর্তি খোনসু-তে এটা দেখা যায়। আরও স্পষ্ট মিশরীয় রিলিফে একদল হিটটাইট বন্দীর সঙ্গের এক ব্যক্তি (পুরোহিত)-র খোদাইয়ে (গুরান, *দি হিটটাইটস.* প্লেট-২)—যার সঙ্গে বর্ণিত বশিষ্ঠদের 'দক্ষিণাতস-কপরদাঃ'-র যথেষ্ট মিল।

পঞ্চম অধ্যায়

আর্য বিস্তার

এ অধ্যায়ের আলোচ্য পর্যায়কাল সম্পর্কিত পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাব, কালানুক্রমিক উপাত্তের অনুপস্থিতি এবং উপাখ্যান ও আচার-অনুষ্ঠান বিধি ব্যতীত অন্য সাক্ষ্যের অপ্রাপ্যতা ধ্রুপদী ইতিহাসবেত্তাদের কাজকে চরম নৈরাশ্যের দিকে ঠেলে দেয়। তা সত্ত্বেও, কিছু মূল বিষয় কিন্তু নির্ধারিত হয়ে গেছে। তুলনামূলকভাবে স্থায়ী বসতিস্থাপন, যা সিন্ধু উপত্যকার পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল—তা শুরু হয়েছিল এই পর্যায়েই। খাদ্যের চাহিদার কারণে, পশুপালনের তুলনায় লাঙ্গলচালিত কৃষি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রথম কোন পঞ্জিকার (যার গুরুত্ব পরবর্তীকালে বেড়েছে) প্রচলন ঘটেছিল। নব্য আর্য জনগোষ্ঠীর মধ্যের চারটি 'মূল' বর্ণ একটি শ্রেণী কাঠামোর রূপ নিয়েছিল—যা সমাগত যুগের আনুষ্ঠানিক সমাজ বিকাশকে দিকনির্দেশ করেছিল। গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ পার্থক্যগুলি থেকে জন্ম নিয়েছিল এক শ্রেণীসমাজ যা গোষ্ঠী-সমাজের চেয়ে ছিল অনেক বেশি বিভাজিত এবং সেখানে পুরোহিত ও যোদ্ধৃ বর্ণগুলি ছিল আর্য কৃষক (বৈশ্য) ও অনার্য ভূমিদাস (শূদ্র)-দের দমন-শোষণে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু সে অর্থে তা কোন দাস সমাজও ছিল না। উপজাতিক প্রভাবগুলি থেকে গিয়েছিল এবং উপজাতি রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহই ছিল প্রধান আদর্শ কাজ। বসতি ও সম্পদের রূপ পরিবর্তনটি ছিল অনিবার্য এবং তা থেকে প্রচলন ঘটেছিল এক নতুন বিবাহপ্রথার। পুরানো প্রথার প্রতিফলন রয়ে গিয়েছিল কেবলমাত্র কিছু মানুষের বহুবিবাহ এবং সম্ভবত অল্পবয়সে বিধবা নিঃসন্তান ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহের রীতির মধ্যে। পুরোহিতদের সঙ্গে রাজাদের বর্ণবৈরিতার অস্তিত্বও টিকে ছিল এই পর্বে

(ত্বাস্ত্র কাহিনীতে ব্যক্ত)। দুর্ভাগ্য হল, নিকৃষ্ট-বিশ্লেষিত সূত্রগুলির ক্লান্তিকর পর্যালোচনা ছাড়া এই বৈশিষ্ট্যগুলির কোনটিকেই প্রকাশ করা যাবে না। আমার পদ্ধতিতে অতৃপ্ত পাঠকের কাজ হল, প্রমাণভিত্তিক যে কোন উৎকৃষ্ট লেখার সঙ্গে একে মিলিয়ে নেওয়া—বিশুদ্ধ ধারণাভিত্তিক কোন লেখার সঙ্গে নয়। এখান থেকে বড়জোর একটি রূপরেখাই শুধু আশা করা যায়—যা পরবর্তী গবেষণার রাস্তা খুলবে।

আর্য ভাষা এবং সম্ভবত নার্থাস (বৈদিক নিরবৃতি), জার্মানরা যাঁকে ধরিত্রীমাতার সঙ্গে তুলনীয় মনে করে, তাঁর মতো কিছু অভিন্ন দেবদেবী ছাড়াও ঋগ্‌বৈদিক পর্বের আর্যদের সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা আছে ট্যাসিটাসের *জারমানিয়া* গ্রন্থে। নরবলি এবং পশুবলি প্রথা ছিল একই রকম। যুদ্ধ ছিল উপজাতিদের প্রধান কাজ। গোষ্ঠীগুলিকে পর্যায়ক্রমে জমি বিলি করা হত এবং গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে তা বিলি হত পদমর্যাদা অনুযায়ী। কিন্তু সে জমি চাষ করা এত কষ্টকর ছিল যে খুব অল্প মানুষই তা করতে চাইত। কৃষিকাজ এত অনুন্নত ছিল যে প্রতিবছর জমি পাল্টাতে হত। প্রধানরা তাদের কর নিত উপহার হিসেবে—স্বেচ্ছামূলক, কিন্তু নিয়মিত। প্রধানের অনুচররা (একটি ঐচ্ছিক বৃত্তি) মনোনীত হত বীরত্বের জন্য। তাদের চাহিদা ছিল অফুরান—গোষ্ঠী নেতা উদার হাতে সবসময়ই তা মেটাত। অতিথিপরায়ণতার জন্য সবাই দায়বদ্ধ ছিল এবং তা খাদ্যের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত দিয়ে; তারপর অতিথি ও তার সেবক উভয়েই বেরিয়ে পড়ত অন্য কোথাও উদ্বৃত্ত খাদ্যের সন্ধানে। সুরাপান ও পাশাখেলা ছিল আশ্চর্যরকমের জনপ্রিয়—যদিও ধনী রোমক সমাজের নিয়মানুগ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অতিরিক্ত স্বাধীনতার চল ছিল না। অন্যদিকে, যজুর্বৈদিক আর্যদের সিজারের সময়কার গলদেশীয়দের মতোই মনে হয়; তারাও আর্য ছিল এবং যোদ্ধার জীবন ছেড়ে তখন সবেমাত্র শান্তিপূর্ণ জীবনে এসেছে। *যজুর্বেদ*-এর আর্যরা স্থায়ী কৃষিকাজ এবং বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়েছিল, গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে একটা শ্রেণীকাঠামোও গড়ে তুলেছিল। 'সাধারণ মানুষকে মনে করা হত প্রায় ক্রীতদাসের মতো, তাদের নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করতে দেওয়া হত না বা কোন বিষয়েই তাদের কোন পরামর্শ নেওয়া হত না। অধিকাংশই ঋণ বা বিপুল কর বা ক্ষমতাশালী লোকেদের পীড়নের ফলে বিশিষ্টদের সেবাতেই নিজেদের নিয়োজিত রাখত।...' ঐ সময়কার বৈশ্যদের এটি একটি সমাজচিত্র—যদিও সান্ত্বনা যে তাদের চেয়েও নিম্নস্তরে ছিল শূদ্রদের জীবন। দুটি সুবিধাভোগী শ্রেণী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা ছিল ড্রুইড ও নাইটদের মতোই। ব্রাহ্মণরা তপোবনে শাস্ত্রীয় আচারবিধির শিক্ষা দিত, শাস্ত্রগুলিকে লিখিত রূপ দিতে চাইত না। সামরিক কাজ বা কর প্রদান থেকে তাদের রেহাই ছিল। যজ্ঞগুলি তারাই নিয়ন্ত্রণ করত। গলদের ক্ষেত্রে বলিদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করাই ছিল যেমন সবচেয়ে কঠোর শাস্তি, ভারতে, মনে হয়, তা ছিল সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়া।

৫.১ আর্যরা যেহেতু তাদের নিজস্ব ভাষা নিয়ে এদেশে এসেছিল, তাই ইন্দো-আর্য ভাষা অধ্যুষিত বর্তমান অঞ্চলগুলি—যেমন, উত্তরে বাঙলা, হিন্দি, পাঞ্জাবী বা পশ্চিমে রাজস্থানী, গুজরাটি, মারাঠী অঞ্চলগুলিতে আর্য সম্প্রসারণ ঘটেছিল বলে কখনও কখনও মনে করা হয়। এর বাইরে রয়ে গেছে বিশাল দাক্ষিণাত্য যেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীর মধ্যে প্রচলন আছে দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলির—তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কন্নড়, টুলু ইত্যাদি। বাকি এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন উপজাতিক ভাষা, আদিম অস্ট্রেলীয় ভাষার সঙ্গে কিছু মিলের দরুণ যেগুলিকে

সম্মিলিতভাবে অস্ট্রিক ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়—যেমন, মুন্ডারী, ওঁরাও ইত্যাদি।[১] জনগোষ্ঠীগুলির ভাষাভিত্তিক এই অবস্থানকে ব্যাখ্যা করা হয় এইভাবে যে, আর্যরা পূর্বতন একটি দ্রাবিড় জনবসতিকে দক্ষিণে ঠেলে দিয়েছিল এবং তারাও আবার একইভাবে একটি আদিম অস্ট্রিক গোষ্ঠীকে ঠেলে দিয়েছিল পাহাড়ে। প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয় আফগানিস্থানে টিকে থাকা একটি ব্রাহুই ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব—যা বিস্তীর্ণ আর্য মাধ্যমের মধ্যে এক দ্রাবিড়ীয় ভাষাদ্বীপ। জীবিত ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা সবচেয়ে সংস্কৃত শব্দভান্ডার সমন্বিত কথ্যভাষা হওয়া সত্ত্বেও তার গঠন কাঠামোর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা থেকে কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিকের মনে হয় এটি 'একটি দ্রাবিড়ীয় ভাষা, আর্য শব্দাবলীতে উচ্চারিত।' অন্যদিকে, দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে অস্ট্রিক উপাদানও অত্যন্ত ক্ষীণ। একটি অসমর্থিত ধারণা যে *অথর্ববেদ*-এর (৫.১৩.১০) অধুনা অর্থহীন 'টাবুবন' হল দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপবাসীদের 'টাবু'—সুতরাং অস্ট্রিক; এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে উল্লেখ করা দরকার, একই রকমের অর্থহীন 'টাবুকম' শব্দটির—যা কিছু পুঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লেখা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হল, *অথর্ববেদ*-এ টাবু-র কোন নিহিতার্থ প্রকাশ না করে নিছকই সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র দেওয়া হয়েছে। ভাষাতত্ত্বের পাশাপাশি নৃতত্ত্ব—যেখানে খুলির গঠন বা নাকের দৈর্ঘ্য পরিমাপের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসা হয় যে এদেশে মূলত তিন ধরনের[২] মানুষ ছিল ঃ ফর্সা-দীর্ঘমস্তক আর্য, কৃষ্ণবর্ণ দ্রাবিড় এবং চ্যাপটা-নাসা বন্য আদিবাসী। নিরুদ্যোগী পাঠকের কাছে এই ধরনের কাজগুলি বিপুল পরিসংখ্যানের বোঝার নীচে নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢেকে রাখে। প্রকাশিত লেখাগুলি থেকে যে নাসিকা-সূচক মেলে, এমনকী পঞ্চাশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়কালেই তা এক নয়। বংশগতির সঙ্গে এর সম্পর্কের দিকটা নিয়েও কিছু জানা যায় না—যদিও জাতিগোষ্ঠীগুলির পৃথকীকরণের জন্য এই ধরনের পরিমাপ-পদ্ধতি অনুসরণের আগে যে আলোচনা অবশ্যকরণীয়। খাদ্যের পরিবর্তন, দুর্ভিক্ষ-মহামারী প্রকোপিত দীর্ঘ কালপর্ব জুড়ে জীবনের অভ্যাসগুলির নির্বাচন—এ সব কিছুরই একটা প্রভাব থাকে, এ লেখাগুলিতে সম্পূর্ণভাবেই যা অগ্রাহ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে, অধিকাংশ নৃ-পরিমাপ বিজ্ঞানীই (Anthropometrist) তাঁদের নিজস্ব পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী নমুনা নির্বাচন করেন। বলা দরকার, মাত্র হাজারখানেক মানুষের মাপ নিয়ে ইউ পি-র কয়েক কোটি মানুষের বিশ্লেষণ বা এক কোটি থেকে পঞ্চাশটি নমুনা নিয়ে 'তেলুগু ব্রাহ্মণ'দের মতো মিশ্র, অসমপ্রকৃতির গোষ্ঠীগুলির বিশ্লেষণ—অত্যন্ত সন্দেহজনক পদ্ধতি যা থেকে এই ধরনের ভুল সিদ্ধান্তে আসাটাই সম্ভব।

সামগ্রিকভাবে এই ধরনের নৃ-পরিমাপ বিজ্ঞান গবেষণার সিদ্ধান্তগুলিকে এখানে ধাপে ধাপে পরীক্ষা করা যেতে পারে বা করা হয়েছে—কিন্তু এর ফলে আমরা আমাদের বিষয়বস্তু থেকে অনেকটা দূরে সরে যাব। এই পদ্ধতি সম্পর্কে আমার মূল আপত্তিটা হল, উন্নত খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতির ফলে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন, জন্মহার বা জনসংখ্যার অনুপাতে কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল—সে বিষয়ে এতে কোন আলোকপাত করা হয় না। আবার এই বিষয়গুলি ভাষার ওপরও প্রভাব ফেলে, যদিও পরোক্ষে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর 'স্থানান্তর'-এর অর্থই হল, এখন যেখানে মূল জনবসতি আছে বলে মনে হয় আগে তারা সেখানে বাস করত। এ ধারণা খুবই অবাস্তব, কেননা আজকের সবচেয়ে উৎপাদনশীল জমিগুলি গড়ে উঠেছে হয় উন্নত সেচ ব্যবস্থার ফলে, না হয় আগে সেখানে ঘন অরণ্য ছিল—শুখা মরশুমে যেখান থেকে শুধু কিছু

শিকারই মিলত। আদিবাসী বসতিগুলির পক্ষে উপযুক্ত জায়গা ছিল সেগুলিই—যেখানে তারা আজও টিকে আছে; যেমন, মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চল, দাক্ষিণাত্য, আসাম এবং নিম্ন হিমালয় সংলগ্ন ভূমি। ঝুম-চাষ পদ্ধতি এসব জায়গায় আগে চলত বা এখনও সফলতার সঙ্গে চলে আসছে, সেই সঙ্গে কিছুটা গো-চারণ। এ দুটির পাশাপাশি আছে শিকার বা শিকারজীবী উপজাতিদের সঙ্গে বিনিময়। আজকের উর্বরা সমতল ভূমি থেকে 'তাড়িয়ে দেওয়া'-র কোন প্রশ্নই ওঠে না, যদি না গাঁটে গোনা কেউ চলে যায়। সুতরাং, স্থানান্তরের কথা দূরে থাক, কোন বিশাল আদিবাসী জনবসতির সন্ধান পাওয়ার অভিজ্ঞতা যা উত্তর-ঋগবৈদিক আর্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল—সিন্ধু উপত্যকা ব্যতীত আর কোথাও তার কোন প্রমাণ নেই।

মানুষ যখন পূর্ববর্তী অনিয়মিত খাদ্য সংগ্রাহকের ভূমিকা থেকে নিয়মিত খাদ্য-উৎপাদকের ভূমিকায় চলে আসে তখন তাদের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। খাদ্য-সরবরাহের উন্নতির অর্থই হল অধিক শিশুর জন্ম, শিশু মৃত্যু হ্রাস, অধিক মানুষের পূর্ণবয়স্কতা লাভ। আলোচ্য পর্বে, 'আর্য' বলতে বোঝাত যুদ্ধপ্রিয় উপজাতির মানুষ—যারা পশুপালন করে বেঁচে থাকে, তার সঙ্গে লাঙ্গল-চালিত চাষ। তারা তখন সেই চূড়ান্ত স্তরে সমাসন্ন যখন শীঘ্রই গবাদি পশুর চেয়ে লাঙ্গলবাহিত উৎপাদন বাড়াতে হবে। সুতরাং, *যে জিনিসটা ছড়িয়ে পড়ছিল তা এক নতুন জীবনযাপন প্রণালী*—তার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে শারীরিক প্রব্রজনও যে ঘটেছিল এমনটা সবসময় আবশ্যিক নয়। মিশ্র ভ্রূণজাত স্বল্প কিছু মানুষ হয়ত কোথাও বন কেটে বসত গড়েছিল এবং তারপর ক্রমে ক্রমে পূর্বতন খাদ্য সংগ্রাহকরা যুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছিল এলাকার মূল জনবসতি। নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগানের ফলে জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের সাথে সাথে উচ্চতা, নাসিকা-সূচক এবং এমনকী গায়ের রঙেরও প্রায়শ পরিবর্তন ঘটে যায়। আমার ধারণা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অল্প কিছু আর্য পুনর্বাসিত হয়েছিল, কিন্তু প্রারম্ভিক বসতিস্থাপনের কঠিন সময়ে নতুন উপনিবেশগুলি গড়ে উঠেছিল আর্য এবং অনার্যদের মিশ্রণেই—পরে যা একান্তভাবে 'আর্য' জনগোষ্ঠী হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। প্রচলিত ভাষাটাও সম্ভবত ছিল আর্য ভাষা—কেননা নতুন হাতিয়ার ও সমাজ-সম্পর্কের সঙ্গে আদিবাসী মানুষদের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও ভাষার মূলগত তফাৎ ছিল। উল্লম্ফনটা ছিল আধুনিক যুগের ব্রিটিশ প্রবর্তিত প্রাগ্-বুর্জোয়া থেকে বুর্জোয়া স্তরে উল্লম্ফনের চেয়ে ঢের বেশি দীর্ঘ। এ পরিবর্তন যে স্বেচ্ছামূলক বা এমনকী কোন সচেতন পদক্ষেপ হিসেবে এসেছিল—তা না-ও হতে পারে। আকস্মিক জনবিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট অভিনব সামাজিক গোষ্ঠী বিভাগগুলির মধ্যে বৃহত্তর বাণিজ্যের হঠাৎ সুযোগ, নতুন উৎপাদনের বিনিময়, বিচিত্র জটিল ধারণাগুলির আদান-প্রদানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা এবং সবচেয়ে বড় কথা এক নতুন আচার-অনুষ্ঠান ও তার আবশ্যিক অনুষঙ্গ হিসেবে বিস্ময়কর মন্ত্রোচ্চারণ এ সবই কোন আদিম উপজাতিক ভাষা থেকে অনেক অগ্রবর্তী; যদিও কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী নিশ্চিতই নিজস্ব বিকাশের ধারায় স্থিত ছিল এবং উপযোগী হবার মন্থর প্রয়াসে সময় নিয়েছে প্রচুর। দ্রাবিড়ীয়রা (ব্রাহুই-এর মতো সম্ভাব্য অভিবাসিত ব্যতিক্রমগুলির কথা বাদ দিলে), আমার মনে হয়, সেই সমস্ত গোষ্ঠী যার অর্ন্তভুক্ত মানুষেরা নতুন প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল বাণিজ্যিক সংযোগের মধ্য দিয়ে; অভিবাসন অল্পই ঘটেছিল, যার জন্য সংস্কৃতায়ন পর্বে তারা সক্ষম হয়েছিল নিজস্ব ভাষার বিকাশ ঘটাতে। আদিবাসীরা যেখানে অনমনীয় জেদে অস্বীকার করেছে খাদ্য উৎপাদকের জীবন (হয়ত আলস্যের কারণে, বা অবিশ্বাস, বা কিছু আদিম সংস্কারের অনড় প্রভাবে), অথবা যেখানে পরবর্তী

বহিরাগত মানুষজন মিশে গেছে খাদ্য-সংগ্রাহকের জীবনে—সেখানকার সমাজ রয়ে গেছে আদিবাসী। সুতরাং, 'অস্ট্রিক' ভাষাও রক্ষিত থেকেছে আসাম থেকে নীলগিরি অঞ্চল পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত ভারতীয় আদিবাসী ভাষাসমূহে প্রতীয়মান অভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে—অর্থ তাদের যাই হোক না কেন। ভাষাতত্ত্বগত সমস্যাকে এই আলোকে বিচার করা হয়নি। মার-এর জাফেটিক তত্ত্বে[৩] এই বিষয়গুলিকে টোটেম হিসেবে গণ্য করে সে কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা এক ভাববাদী পর্যায়ভুক্ত হয়ে অন্যদেশের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যাখ্যা না করেই ককেশীয় কথ্যরীতি ও ভাষাকে এক অদ্ভুত ছাঁচের মধ্যে ফেলে বিশ্লেষণ করা ছাড়া পথ খুঁজে পায়নি। আজ পর্যন্ত, কেউ জানে না, ভাষার 'কাঠামো' কি থেকে গড়ে ওঠে (যেমন, মুন্ডারি-তে), অথবা চারপাশের উন্নত ভাষার তর্কাতীত প্রভাব থেকে কোন ভাষা কীভাবে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। একই সমস্যা প্রকট হয়েছে সেই সমস্ত ইউরোপীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে—আদিবাসী পর্যায়ের বাইরে যেগুলির বিকাশ ঘটেছে সবশেষে; যেমন, বাস্ক এবং ফিনিশীয় ও হাঙ্গেরিয়ান সমন্বিত ফিনো-ইউগ্রিয়ান গোষ্ঠী—যাদের জন্য একটি অভিন্ন ব্যাকরণ (মেইললেট-এর আর্য ব্যাকরণের অনুরূপ) প্রচলন এখনও অসম্ভব রয়ে গেছে। উৎপাদন-উপায়ের ক্ষেত্রে কোন বড় ধরনের বিপ্লব আদিম ভাষাগুলিরও অবশ্যই পরিবর্তন ঘটায়; পরিবর্তনের ধরনটা নির্ভর করে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক পটভূমির উপরেও। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আবার আলোচনায় যাব অশোকের শিলালিপিগুলির প্রসঙ্গে; কিন্তু, এখানে, আমার মনে হয়, প্রধান দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলির গঠন বাণিজ্য ও বসতির দ্বিতীয় পর্যায় থেকে সম্পন্ন হওয়াটাই ছিল নিদেনপক্ষে বাস্তব এবং সম্ভবত অনিবার্যও (যেমন মাগধীর হয়েছিল প্রথম পর্যায়ে)।

এখন যে কথাটার উল্লেখ প্রয়োজন তা হল, লাঙ্গলচালিত কৃষি খাদ্যের যোগানকে ব্যাপকভাবে বাড়াতে এবং নিয়মিত করতে পেরেছিল। এর অর্থ শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধিই নয়, উপরন্তু, সেই বৃহত্তর এককগুলির উদ্ভব যার মধ্যে ব্যক্তিমানুষ এক সঙ্গে বাস করে। লক্ষ্যণীয়, বেদেরা সাধারণত একসঙ্গে ছ-সাতজন দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাছাড়া, লাঙ্গলের প্রচলন মানেই বসতির স্থিরতা, স্থায়িত্ব। অন্যদিকে, আদিবাসী শিকার বা পশুচারণ খাদ্য সংগ্রহকারীদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়—যেমন ঝুম চাষও। এইভাবে পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন একই সঙ্গে ঘটে যায়। সেখানে যে শুধু অনেক বেশি মানুষ যুক্ত হয় তা-ই নয়, তারা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ, ভিন্ন তাদের সামাজিক আকাঙ্ক্ষা; সুতরাং, একটা ভিন্ন ভাষারও প্রয়োজন অনুভূত [।]

৫.২ পশুচারক বহিরাক্রমণকারী থেকে কৃষিজ খাদ্য উৎপাদনকারী—আর্য-অর্থনীতির রূপান্তরের এই যে প্রথম পর্যায়, এ সম্পর্কে সূত্র বলতে অধিকাংশই পরবর্তীকালের আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় কাহিনী, উপাখ্যান, নীতিগল্প বা হিতোপদেশ ; প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থন বা কালানুক্রমিকতা নিরূপণের কোন বালাই নেই। প্রথমোক্তগুলির বেশ কিছুরই আবার পরিবর্তন ঘটেছে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর দ্বারা—প্রচলনকারীদের পর থেকে যাদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েছে। নিজেদের গুরুত্ব প্রমাণ করতে বা এক বিশেষ বর্ণ-শ্রেণীর সুবিধা দাবি করতে এরা বাচনিক কাহিনী বা বিশ্বাসগুলির পুনর্লিখন করেছে—কেননা, আদি গ্রন্থগুলির কোন বিশেষ অংশ হয়ত প্রকৃত ঘটনাকে তুলে ধরে ব্রাহ্মণ্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে নস্যাৎ করে অথবা এমনই বিব্রতকর হয় যে তা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা জরুরি। জানা সত্ত্বেও, সে অংশগুলির সম্পূর্ণ পুনর্মূল্যায়ন আর

সম্ভব নয়—যেহেতু সেই সম্পূর্ণ সমাজ-কাঠামোর পুনরুদ্ধারই এখন দুঃসাধ্য বা অসম্ভব।

উত্তর-ঋগবৈদিক পর্বের নথিগুলিকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল, পরবর্তীকালের বৈদিক সাহিত্য, যার মধ্য থেকে *সামবেদ*-কে বিনাদ্বিধায় বাদ দেওয়া যায়—কেননা যজ্ঞে সুরেলা মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজনে *ঋগ্‌বেদ*-এর শব্দাবলীরই সামান্য রকমফের ঘটিয়ে এখানে প্রায় হুবহু তুলে নেওয়া হয়েছে। *যজুর্বেদ* আমাদের হাতে পৌঁছেছে বহুবার সংশোধিত হবার পর; এর প্রধান দুটি ধরনের একটি হল *কৃষ্ণ-যজুর্বেদ*—যার মধ্যে *তৈত্তিরিয় সংহিতা,* আচারপালন বিধি ও ব্যাখ্যাসহ অত্যন্ত কার্যকর পুঁথি! *শ্বেত-যজুর্বেদ* (*বাজসনেহি সংহিতা*)-এ আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়কে একইরকম রেখে সেগুলিকে ব্যাখ্যা থেকে পৃথক করা হয়েছে। ব্যাখ্যা অংশটি *শতপথ ব্রাহ্মণ*—যা এ ধরনের প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতে বিভিন্ন ধরনের সমাধিস্থলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—আপাতভাবে যা পবিত্র অস্থিগুলির কারণে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের দ্বারা ভবিষ্যতে এগুলি যাচাই হলে ভূখন্ডটি চিহ্নিতকরণ সম্ভব হবে। এগুলি ছাড়াও *ঋগ্‌বেদ*-এর ভাষ্যমূলক গ্রন্থ অজস্র আছে। এই সমস্ত গ্রন্থরাজি আমাদের নিয়ে আসে ঔপনিষদিক পর্বে ঃ বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এই ক্রম অনুযায়ী এক ধারাবাহিক বিকাশের পথ ধরে; সেখানে পরক ঐতিহ্যের উল্লেখ যতটা ন্যূন হওয়া সম্ভব ততটাই! তা সত্ত্বেও, তা পরোক্ষে ঢুকেছে। গ্রন্থগুলি আচারের মন্ত্র থেকে সরে সরে এসেছে আচারপালন বিধিতে, আচারের পেছনের পৌরাণিক কাহিনীতে, আচারকে অতিক্রম করা অতীন্দ্রিয়বাদে—অর্থাৎ উৎপাদন ভিত্তির নিয়ত বিকাশমান রূপের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে। এ গ্রন্থগুলির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে চতুর্থ বেদ তথা *অথর্ববেদ*-কে—যেটি পূর্বতন তিনটি বেদ বা এমনকী পরবর্তীকালের উপনিষদগুলিরও সমমানের বলে মনে করা হয় না। আচার বলতে এখানে শুধু সাদা এবং কালোর যাদু—অন্য বেদগুলির তুলনায় অনেক ছোট প্রেক্ষিতে; কেউ বলতেই পারে, এগুলি হল সাদামাটা জীবনের লোকাচার।

দুই মহাকাব্য *মহাভারত* ও *রামায়ণ*-কে আমাদের দ্বিতীয় যে সূত্র সমষ্টি তার নিবিড় পরম্পরার মধ্যে কোথাও খাপ খাওয়ানো শক্ত। এ দুটি 'উত্তর বৈদিক' এবং ইতিহাসের কিছু উপাদান সমন্বিত—যদিও সেগুলিকে অতিরঞ্জিত বা বাতিল করাটা ঐতিহাসিকদের নিজস্ব ঝোঁকের ওপর নির্ভর করে। *মহাভারত*-এর কেন্দ্রীয় ঘটনা হল এক বিরাট জ্ঞাতিযুদ্ধ—যা দিল্লির কাছে সংঘটিত হয়েছিল; কারণটা ছিল তক্ষশীলা থেকে বঙ্গ এবং সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত এক সাম্রাজ্য। এ ধরনের একটা সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগে বা আরও সুনির্দিষ্টভাবে ঐতিহাসিককালের মৌর্যদের আগে থাকা সম্ভব নয়। *মহাভারত*-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে সামগ্রিকভাবে পুরাণগুলির জটিল বুনন; সেখানে রাজ-তালিকাগুলিকে ব্যক্ত করা হয়েছে দৈববাণীর আকারে এবং অতীত থেকে আজ পর্যন্ত বারবার নতুন করে লেখা হয়েছে। এই পুরাণগুলিকে যদি বিশ্লেষণমূলক ভাবে সম্পাদনা করা যেত—অর্থাৎ প্রায় দ্বাদশ পুরাণকে একসঙ্গে পরীক্ষা করে সম্পাদনার কাজ সম্ভব হত—কেবলমাত্র তাহলেই হয়ত পর্বতপ্রমাণ অতিকথার আবর্জনা থেকে ইতিহাসের ছোট ছোট বীজগুলিকে পৃথক করার কাজটি *শুরু করা* যেত। *মহাভারত*-কেও একইভাবে ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু একটি গবেষণাধর্মী সংস্করণ এখনও রক্ষা করতে পারে এর সার অংশটুকু—যা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী সময়কালের বিষয়। আদিরূপটি অবশ্য কমবেশি চব্বিশ হাজার স্তবক বিশিষ্ট

প্রাচীন *ভারত* গ্রন্থ থেকে এসেছে—যা এখন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। আবার, তারও পেছনে আছে মুক্তভাবে গীত চারণ কবিদের গাথাগুলি। *রামায়ণ*-এর (কেবলমাত্র সম্প্রতিকালেই যার বিশ্লেষণমূলক সংস্করণ বেরিয়েছে) বর্ণিত বিষয় অযোধ্যার (ফৈজাবাদ) এক নির্বাসিত রাজার স্ত্রী সীতার অপহরণ ও উদ্ধার। খলনায়ক হল লঙ্কার (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) রাজা (দশমুণ্ডধারী এক দৈত্য) রাবণ—আমাদের আলোচ্য পর্বের আর্যরা নিশ্চিতই যার কথা জানত না। সবশেষে আমরা পাই সরল পালিভাষায় রচিত বিপুল বৌদ্ধ-অনুশাসন সাহিত্য, যা সম্ভবত অশোকের সময়কালে বিহারে প্রথম লেখা হয়েছিল—অর্থাৎ, বর্ণিত ঘটনাকালের আড়াই শতাব্দী পরে; এবং এ থেকেই জন্ম নেয় বিবরণীর আকারে রচিত সমগ্র উপাখ্যানমালা বা *জাতকের*—যা অত্যন্ত তথ্যবহুল। পালিসাহিত্য আমাদের নির্ণয়-সম্ভব ইতিহাসের কাছে নিয়ে আসে—কেননা প্রত্নতত্ত্বও নথিগুলিকে সমর্থন করে। জৈন সূত্রগুলিকেও এর সঙ্গে গণ্য করা উচিত, যদিও তাদের বর্তমান রূপটি পরবর্তীকালে দেওয়া হয়েছে এবং তা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই সমস্ত উপাদানগুলির, এমনকী নেতিবাচক বিশ্লেষণও কার্যকরী, কেননা প্রথমত তা সম্ভাব্য ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে যে কোন সন্দেহ দূর করে, এবং দ্বিতীয়ত, প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিকে চিনিয়ে দেয়—পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মাধ্যমে ভবিষ্যতে যেগুলি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হতে পারে। *যজুর্বেদীয়* আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে এই ধরনের সমর্থিত বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে (*ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি, এ রিভিউ,* ১৯৫৪, পৃঃ ১০-১১ এবং আগের রিপোর্টগুলি)। *মহাভারত*-এ বর্ণিত বা উল্লিখিত অলঙ্কারগুলিকে মেলানো যেতে পারে গুপ্তযুগের কিছু স্মৃতিস্তম্ভের ভাস্কর্য মূর্তির অলঙ্কারগুলির সঙ্গে। এই তুলনামূলক বিচারের প্রক্রিয়া নিহিত আছে ভবিষ্যতের গর্ভে এবং তা খননের সাহায্যে হোমার ও বাইবেলের তথ্যগুলির পুনরুদ্ধারের মতোই হয়ত হবে। বিশুদ্ধ সাহিত্য- বিশ্লেষণকেন্দ্রিক গবেষণার অবশ্য একটি অসাধারণ দিক আছে—তা হল, হয়ত এমনকী শেষতম সংস্করণেই এমন এক সুপ্রাচীন ঘটনার প্রথম উল্লেখ হয়েছে যা আগের কোথাও নেই বা থাকলেও শুধু ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে।

একটি ভাল উদাহরণ হল সেই চিত্তাকর্ষক কাহিনীটি যা *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এই (১.৮.১.১-৬) প্রথম বিধৃত হয়। ঋষি মনুকে একটি মহাপ্রাণ মৎস রক্ষা করেছিল; সে তাঁকে বলেছিল একটি নৌকা প্রস্তুত রাখতে। গোটা পৃথিবী যখন মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে গেল নৌকাটিকে তখন স্বাভাবিক কারণেই, আরারত পর্বতের পরিবর্তে হিমালয়ের একটি চূড়ায় বেঁধে রাখা হল। শাস্ত্রীয় কাহিনীতে এই মৎস্যটিই পরে মনুকে বিধি নির্দেশ দান করেছে এবং *মহাভারত-পুরাণ*-এর মিশ্রণে হয়ে উঠেছে বিষ্ণুর অবতারগুলির মধ্যে প্রথম। তিনটি স্বীকৃত জীব অবতারের মধ্যেও এটি সর্বাগ্রে; অন্য দুটি হল কূর্ম এবং বরাহ। শেষোক্তটি *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ (১৪.১.২১১) এসেছে স্রষ্টা হিসেবে, অবতার হিসেবে নয়। *মহাভারত*-এ (১.১৬.১০) দেবতা ও অসুররা মিলে যে সমুদ্রকে মন্থন করেছিল তার মন্থনদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত পর্বতটিকে রাখা হয়েছিল আদিযুগের এই কূর্মটির পিঠে। কেবলমাত্র পরবর্তীকালেই একে বিষ্ণুর অবতার বানানো হয়েছে। কচ্ছপের টোটেম সংক্রান্ত গুরুত্ব একটা আছে—যেহেতু যজ্ঞবেদিতে একে নির্মাণ করতে হয় (*শতপথ ব্রাহ্মণ,* ৭.৫.১.৫-৭, সৃষ্টি বিষয়ক গুরুত্বের জন্য), যদিও তা বলিযোগ্য প্রাণী নয়। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে এর সঙ্গে আবার ব্রাহ্মণদের কাশ্যপ গোত্রের একটা সম্বন্ধ আছে—যে গোত্রটি প্রথম থেকেই ব্রাহ্মণ হতে চাওয়া আদিবাসীদের দরাজভাবে গ্রহণ করার জন্য কুখ্যাত (যার দৃষ্টান্ত, মাতঙ্গ কাশ্যপ

নামটি); এবং এটা সেই সমস্ত মানুষদেরই গোত্র, যাদের কোন কূল-নাম নেই, বা কূল-নাম মনে করতে পারে না, বা যারা গোত্র-বহির্ভূত বিবাহের নিয়মের বিরুদ্ধতাজাত সন্তান। *ঋগ্বেদ*-এ কাশ্যপদের উল্লেখ নগণ্য, উপরোক্ত *মহাভারত-পুরাণ* পর্বে এদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার কোশল-মগধে বৌদ্ধ শাসনকালের প্রারম্ভে এরা সামনের সারিতে। পঞ্চ নখর যুক্ত প্রাণীদের যে তালিকা তার মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কচ্ছপের অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হয়েছে—অর্থাৎ তা নিষিদ্ধ খাদ্য (টাবু) নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণরা এটা খেত, হয়ত টোটেম সংক্রান্ত কোন আচার অনুষ্ঠানে—কেননা খাদ্য হিসেবে এর কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি বা কোন বিশেষ জনপ্রিয় বা রুচিকর খাদ্য হিসেবেও এর পরিচিতি নেই। মৎস্য অবতারের প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল সুমের-এ, সম্ভবত সিন্ধু সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে; ছাগ-মৎস্য হল 'ইয়া'-র প্রতীক, যিনি আবার 'এনকি' নামেও পরিচিত। ইনি নিদ্রা যান জলমধ্যের এক শয়নকক্ষে, যেমন বিষ্ণু-নারায়ণও জলের উপরেই ঘুমোন। নারায়ণ নামটি হতে পারে, কোন অনার্য শব্দ থেকে উদ্ভুত, কেননা 'নার' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে নির্দিষ্ট 'জলরাশি' হিসেবে। শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত ভাষায় আহরিত হয়েছে এবং তা হয়ত দ্রাবিড় বা এমনকী আসিরীয় ভাষা থেকেই।

জাতকে ব্যাবিলন-এর (= ব্যাবিরাস = বাভেরু) একটি বিবরণীর কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি—যদিও সে রাজত্ব বা রাজত্বের নাম *জাতক* লেখার আগেই বিলীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বোঝা যায় যে, এই ধরনের বিশ্লেষণ থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে—যদি না বল্গাহীন অনুমান বা পুঁথিগুলির বিকৃতি ঘটিয়ে বস্তুগত ভিত্তির অনুসন্ধানে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

৫.৩ *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক তুলে ধরে যে, সেগুলি সব আর্যের প্রতিনিধিত্বকারী নয়, কেবলমাত্র কিছু আর্যগোষ্ঠীর। কুলশাস্ত্রগুলিকে জোড়া লাগিয়ে ও কিছু সংযোজন ঘটিয়ে *ঋগ্বেদ* রচনা করা হয়েছিল এবং তা আমাদের হাতে পৌঁছেছে শাকল সংস্করণের মাধ্যমে—যা সাধারণভাবে স্বীকৃত। *যজুর্বেদ*-এর সংরক্ষণে বিভিন্ন সম্পূর্ণ পৃথক উপজাতি গোষ্ঠীও অংশ নিয়েছে। 'কথ'-র মতো শাস্ত্রীয় নামগুলির বিষয়ে গ্রীক সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে সেগুলি ছিল আলেকজান্ডারের সময় ভারতীয় উপজাতি গোষ্ঠীর নাম। *তৈত্তিরীয় সংহিতা* এই ধরনের সংস্করণগুলির মধ্যে একটিমাত্র—যদিও কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না; এটাই স্পষ্ট হয় যে আর্য জনগোষ্ঠীগুলি তখন বিশ্লিষ্ট হতে শুরু করেছিল। যেমন, পাঞ্জাবে বসবাসকারী পুরু জনগোষ্ঠীর গ্রন্থ এটি নয়, অথবা আদি যে পাঁচটি জনগোষ্ঠী, তারা যারাই হোক না কেন, তাদেরও কারোর নয়। নতুন নতুন এলাকা দখলের সাথে সাথে আর্যদের মধ্যে এই সময় নতুন নতুন গোষ্ঠী নামেরও উদ্ভব হতে শুরু করেছিল। এই নামগুলি যে বাইরে থেকে পুনরায় কোন আগমনের ফলেই এসেছে এমনটাও মনে করা কঠিন—কেননা পাঞ্জাবের অভ্যন্তরে *ঋগ্বেদ*-এর সময় থেকে যে ধারাবাহিকতা তা অক্ষুণ্ণ ছিল। নতুন জনগোষ্ঠীগুলি ছিল নিশ্চিতই অভ্যন্তরীণ বিকাশের ফল; অল্প কিছু অভিবাসী হয়ত অনার্য আদিবাসীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং এ এমন এক প্রক্রিয়া যা এমনকী *ঋগবেদ*-এর সময়েও চলেছিল। *তৈত্তিরীয় সংহিতা* নামটি এসেছে তিত্তিরি থেকে—যা একটি গোত্র টোটেম। আরও আগ্রহের বিষয়, এই গ্রন্থেই বলা হয়েছে (২.৫.১) যে, ইন্দ্র কর্তৃক ত্রিমস্তক বিশিষ্ট ত্বস্ত্রে-র একটি মস্তক ছেদন করলে তা তিত্তিরি পক্ষীতে পরিণত হয়। *মহাভারত* (৬.৮৬.৪) অনুসারে তিত্তিরি

দেশ সুন্দর অশ্বের জন্য বিখ্যাত। *তৈত্তিরীয় সংহিতায়* যজ্ঞ বিষয়ে অজস্র খুঁটিনাটি আলোচনা আছে এবং নিধনযোগ্য প্রাণীদের একটি দীর্ঘ তালিকাও (৫.৫.১১-২)—যার মধ্যে যজ্ঞের ঘোড়ারও উল্লেখ আছে। এতে (১.৮.২-৭) বৃষ্টির চারমাস সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচলিত বলিগুলির বিষয়েও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। সমগ্র গ্রন্থটিই আসলে গোষ্ঠীপতিদের পালনীয় আচার বিষয়ে, বলি সমেত। 'গৃহপতি' (= গৃহকর্তা) পরিভাষাটির উদ্ভব হয়েছে এক বিশেষ 'গার্হপত্য' হোমাগ্নি থেকে। *তৈত্তিরীয় সংহিতায়* যেভাবে এই দুরূহ হোমের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা কোন ছোট গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব—সুতরাং, নিশ্চিতই ইঙ্গিত করা হয়েছে কোন কুলপতি বা বৃহৎ পরিবারের কর্তার প্রতি—যে পরিবার আধুনিক ধারণার পরিবারগুলির এক ডজন বা তারও বেশি নিয়ে হয়ত গঠিত। একইভাবে, এই সংহিতায় (২.২.১) বলা হয়েছে, "যার কোনো জমি নিয়ে বিবাদ হচ্ছে বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিরোধ—সে যেন একাদশ ভগ্ন মৃৎপাত্রে ইন্দ্র ও অগ্নির পূজা দান করে।" এ কথাগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে জমির ব্যক্তি-মালিকানার প্রমাণের প্রেক্ষিতে নয় বরং প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নতুন জেগে ওঠা বিরোধগুলির আলোকে—যা কোন একক গোষ্ঠীর কাঠামোর মধ্যে সকলকে সমবেত করে মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না; সুতরাং, নিশ্চিতই তা বাধছিল সংলগ্ন এলাকার ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী এককগুলির মধ্যে। 'সে' অর্থে এখানে কোন এককের প্রধান, সেই এককের আয়তন যেমনই হোক না কেন। এই অনুযায়ী, উচ্চ শ্রেণীগুলির মধ্যে বৃহৎ সংসার সামন্তযুগ বা তারপরেও একটা রীতি হিসেবে থেকে গিয়েছিল। 'গোত্র' শব্দটি—যা দিয়ে কৌম বা কুল বোঝানো হত, তা-ও 'পরিবার' এর সমার্থক হয়ে উঠেছিল। এটাও একটা সমান্তরাল পরিবর্তন।

ঋগ্বেদ পাঠের পর *তৈত্তিরীয় সংহিতা* পাঠ অনেক সময় অবাক করে। যেমন সংহিতায় (৭.৪.৭) বলা হয়েছে, বশিষ্টের পুত্র নিধন হলেন *ঋগ্বেদ*-এর সেই সুদাসের পুত্রদের হাতে—যে সুদাস বশিষ্টর উপাসনার সাহায্যেই দশ রাজার যুদ্ধে জিতেছিলেন। *অথর্ববেদ*-এ (৫.১৮, ৫.১৯) সেই দুর্বৃত্ত ক্ষত্রিয়টির ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে যে ব্রাহ্মণের গরুগুলি খেয়ে নেয়, আবার তুষ্ট করতে অনুনয়ও করা হয়েছে, "হে রাজন, ব্রাহ্মণের (গরু খেও) না; অস্থি চর্মসার, খাওয়ার অযোগ্য এই গরুটি।" (৫.১৮.৩)। একই সুর পরশুরামের কাহিনীতে। ভৃগু বংশীয় এই মহাবীর একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। এই বাড়াবাড়ি রকমের স্ববিরোধী হত্যালীলা স্পষ্টতই ক্ষত্রিয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে অসহায় ব্রাহ্মণদের মানসিক ইচ্ছাপূরণেরই বিবৃতি মাত্র। ভৃগু মাহাত্ম্য-আপ্লুত *মহাভারত*-এ পরশুরামকে উন্নীত করা হয়েছে বিষ্ণুর অবতারের মর্যাদায়। পুরোহিত ও নৃপতিদের বিরোধ এরপর থেকে বৈদিক সাহিত্যে ফল্গু ধারার মতো বইতে থাকে, যদিও অন্য দুই বর্ণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ। চতুর্বর্ণীয় শ্রেণী কাঠামোটিও বজায় রাখা হয়। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, অনার্য শত্রু—যেমন পণি, দস্যু বা এইরকম—তাদের বিরুদ্ধে লড়াই সম্পর্কে এই সমস্ত আচারবিধিতে কোথাও কোন উল্লেখ নেই। তার অর্থ, নতুন অনার্য শত্রুগোষ্ঠীগুলি বসতি স্থাপনের এই পর্বের প্রারম্ভে তখনও হাজির হয়নি। অবশ্য, সদ্য প্রচলিত আচার ও বিশ্বাসগুলির কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ হয়েছে। *তৈত্তিরীয় সংহিতায়* (৭.৫.১০) 'মারজালিয়' যজ্ঞানুষ্ঠানে অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে দাসীকন্যাদের জলঘট মাথায় নিয়ে নৃত্যগীত করার কথা বলা হয়েছে। এটা কোন আর্য আচার হতে পারে না; জলপাত্রের মাঙ্গলিক হিসেবে ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টা অনেক পরের। *তৈত্তিরীয় সংহিতায়* আরও বলা

হয়েছে, "যদি কোন কৃষ্ণ পক্ষী (যজ্ঞে) ঘৃত কুম্ভ স্পর্শ করে তাহলে যজ্ঞকর্তার দাসেদের মৃত্যু হতে পারে; যদি কোন কুকুর স্পর্শ করে তাহলে তার চতুষ্পদ গবাদি পশুর মৃত্যু হতে পারে; যদি ভেঙে যায় তাহলে তার নিজেরই মৃত্যু হতে পারে।" এইভাবেই গৃহপালিত মনুষ্য-পশুদের অস্তিত্বের প্রমাণ তুচ্ছ অনুপুঙ্খ হিসেবে উঠে এসেছে। কী ধরনের দাসত্ব ছিল তা এখানে বলা না হলেও সাজসজ্জা, ভূমিদাসত্ব—এ সবগুলি অন্যভাবে দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে মূল্যবান হল শস্য তালিকা ঃ ধান, যব, সীম, তিল, ছোট সিম, কলাই, গম, মুসুর এবং বুনো ধান (*তৈত্তিরীয় সংহিতা*, ৪.৭.৪)—যার প্রচুর ফলনের জন্য যজ্ঞকর্তারা প্রার্থনা করত। ধাতুগুলি ছিল পরপর ঃ সোনা, ব্রোঞ্জ, সীসা, টিন, লোহা, তামা; এগুলির অধিকাংশই দূরবর্তী স্থান থেকে বাণিজ্যের মারফত আসত। সিন্ধু উপত্যকা বা গঙ্গা অববাহিকায় এর কোনটিই উৎপন্ন হত না। "লাঙ্গল কর্ষিত জমিতে যা জন্মেছে, লাঙ্গল অকর্ষিত জমিতে যা জন্মেছে"—সেই দু'য়েরই গুরুত্ব ছিল। এই সময়টা সম্পূর্ণভাবেই বসতি স্থাপনের সময়—যদিও তখনও নগর পত্তনের নয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বলিদান,সেই সঙ্গে সাতাশটি নক্ষত্রপুঞ্জের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে চান্দ্রমাসের হিসেবে ভারতীয় পঞ্জিকা তখন ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে; সৌর গণনা শুরু হয়েছে কিনা পরিষ্কার নয়, যদি না হয়ে থাকে তবে তা বেশি দূরেও নেই—কেননা শস্য উৎপাদন নির্ভর করছে সেই গণনার ওপর; বৃষ্টির মরশুমের আগে জমিতে লাঙ্গল চষতে হবে।

নিয়মিত বাণিজ্যের অস্তিত্বের পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায় সোনা সম্পর্কিত আলোচনা থেকে। আমরা বারবার উল্লেখ পাই, 'স্বর্ণ হল অমরত্ব' (৫.২.৭ ইত্যাদি); এর একটা শাস্ত্রাচারগত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। অবশ্য, *তৈত্তিরীয় সংহিতা* (২.৩.২) অনুসারে পুরোহিতদের দক্ষিণা ছিল চার কৃষ্ণলা স্বর্ণ—যা গৃহীত হত একশ' কৃষ্ণলা ওজনের স্বর্ণ খণ্ড থেকে। কৃষ্ণলা বা গুঞ্জা হল লাল-কালো দাগ বিশিষ্ট একটি ফলের দানা (Abrus precatorious)—যা এখনও অতি সুক্ষ্ম ওজনের কাজে ভারতীয় স্বর্ণকাররা ব্যবহার করে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে প্রচলিত প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রাগুলি ছিল ৩২ কৃষ্ণলা ওজনের, অর্থাৎ ঠিক ৫৪ গ্রেন। তাছাড়াও, মোহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পাতে পাওয়া 'ডি' শ্রেণীর বাটখারাগুলিও এই মাপ অনুযায়ী। সুতরাং *তৈত্তিরীয় সংহিতা* শুধু যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধানগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও কিছু প্রকৃত তথ্য আমাদের জোগায়। যজ্ঞে প্রধানত বলি দেওয়া হত অশ্ব—যার প্রচলন *ঋগ্বেদ*-এও (১.১৬২) দেখা গেছে; কিন্তু প্রাণীটিকে শুধুই হত্যা করা আর খেয়ে ফেলার প্রচলন খুব বেশি ছিল না। প্রধানা রানিকে মৃত অশ্বের সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে হত, সঙ্গে চলত অশ্লীল মন্ত্র পাঠ—যা নিশ্চিতই কোন গর্ভাধান কামনা ব্রত। মনে হয়, বলি প্রদত্ত অশ্ব ছিল মানুষেরই প্রতিকল্প (সম্ভবত রাজারই)। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে নরবলিরও প্রচলন ছিল। যুদ্ধে আর্যদের কাছে ঘোড়ার গুরুত্ব এবং অশ্ব বলি বৃদ্ধি পাওয়া—এ দুটিকে মেলানো যায় না। তাই নতুন উপাদানগুলি যুক্ত হল আবশ্যক হিসেবেই। যেমন, অশ্বত্থ, ন্যাগ্রোধ, প্লক্‌স, উদুম্বরা—এই চারটি বৃক্ষ *অথর্ববেদ-এ* (৮.১৬ এবং ৭.৩২) প্রথম উল্লিখিত হল পবিত্র হিসেবে (আজও এগুলির পূজা হয়)। উদুম্বরা কাষ্ঠের আসন এবং দক্ষিণ হস্তধৃত দূর্বা থেকে বারি সিঞ্চন, মনে হয়, রাজ্যাভিষেকের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল (*জাতক*, ৪৯২)। ত্রয়ী[৪] দেবীমাতৃকা এবং সেইসঙ্গে অপ্সরারাও পূজা পেতে শুরু করেছিলেন, যার অর্থ, আবারও সেই অনার্যদের সঙ্গে সংযোগবৃদ্ধি— যারা মাতৃতান্ত্রিক প্রথাগুলিকে রক্ষা করত। ঘৃতাচী বা অলম্বুসা-র মতো এমন অনেক অপ্সরার সন্তানই পুরাণের

রাজবংশগুলির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃত হন। সবচেয়ে বিখ্যাত ভরত ছিলেন শকুন্তলার এক পুত্র, এই শকুন্তলা আবার আরেক অপ্সরা মেনকার কন্যা। *ঋগ্‌বেদ*-এ ভরত ছিলেন ভরত জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদী জনক—যদিও এমন কাল্পনিক জন্মবৃত্তান্ত সেখানে ছিল না। *যজুর্বৈদিক* অশ্বমেধ যজ্ঞ আবার একটা লক্ষ্যণীয় নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করল। এ যজ্ঞে রাজ-অভিষেকের আগে ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হত। একটা নির্দিষ্ট সময়, প্রায়শই পুরো এক বছর, তাকে যেখানে ইচ্ছা ঘুরতে দেওয়া হত; এই সময় যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা ঘোড়ার পথ অবরোধ করে তবে তাকে যুদ্ধে হারাতে হবে। প্রকৃত যজ্ঞটি হবে বছরের শেষে যখন সব প্রতিদ্বন্দ্বী পরাস্ত এবং সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই ধরনের বিকশিত অশ্বমেধই মহাকাব্যিক পর্বে প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল, বিশেষ করে *মহাভারত*-এ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বা ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অবশ্য নানারকমের রাজ্যাভিষেকের (*অথর্ববেদ*-এ ৮.১৪) প্রচলনের কথা বলা আছে —যার প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য কোন উপায়ে রাজাকে গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণের বাইরে আনা। গোষ্ঠী সভায় সমবেত হবার কথা কোথাও উল্লেখ নেই—যদিও আমরা জানি, সেটার চল ছিল। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিকাশের অর্থই হল গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন এক শ্রেণী কাঠামোর বিকাশ। দেবতা ও অগ্নিহোত্রীদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের সহিংস আচরণ থেকে এমনটা সন্দেহ করা যেতে পারে এবং এমনকী তা *ঋগবেদ*-এও আছে—যেখানে সম্রাট, স্বরাট পদগুলির ব্যবহার দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের অভিষেকের মধ্য দিয়ে এই পদগুলিই পরবর্তীকালে রাজপদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৫.৪ আর্যদের অরণ্য-উচ্ছেদ পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে *শতপথ ব্রাহ্মণে* (১.৪.১. ১৪-১৭) ঃ

'সে কালে মাথব বা বিদেঘ ছিল সরস্বতী (নদী)-র তীরে। তিনি (অগ্নি) তখন এই ভূমি দহন করতে করতে পূর্বাভিমুখে চলেছিলেন; এবং গোতম রহুগণ (পুরোহিত) ও বিদেঘ মাথব (নৃপতি) তাঁর পশ্চাদানুগমন করছিলেন। তিনি এই সমস্ত নদীগুলিকে দহন (শুষ্ক) করেন। উত্তরের হিমালয় পর্বত থেকে প্রবাহিত যেটি (নদীটি) এখন সদানীর (সব সময়েই জলস্রোত থাকে) নামে পরিচিত সেটিকেই তিনি শুধু দহন করেননি। এটিকে আগে ব্রাহ্মণরা অতিক্রম করতেন না; ভাবতেন, 'অগ্নি বৈশ্বানর কর্তৃক এটি দহিত হয়নি।' (১৫) আজকাল অবশ্য এর পূর্বদিকে অনেক ব্রাহ্মণ থাকেন। সেকালে সেটি (সদানীর-এর পূর্বদিকস্থ ভূমি) ছিল অত্যন্ত অকর্ষিত, অত্যন্ত জলাভূমিপূর্ণ—যেহেতু, অগ্নি বৈশ্বানর কর্তৃক তা আস্বাদিত হয়নি। (১৬) আজকাল অবশ্য তা অত্যন্ত কর্ষিত কেননা ব্রাহ্মণরা যজ্ঞের মাধ্যমে (অগ্নিকে) আস্বাদন করিয়েছেন। এমনকী শেষ গ্রীষ্মেও এটি (নদীটি) পূর্ববৎই দুর্বার গতি থাকে : আর অগ্নি বৈশ্বানর কর্তৃক দহিত না হওয়ায় কী শীতল! (১৭) বিদেঘ মাথব তারপর বললেন (অগ্নিকে), 'আমি কোথায় বাস করব?' 'এর (নদীর) পূর্বদিকে তোমার বসতি হোক', তিনি বললেন। এমনকী আজও এটি (নদীটি) কোশল ও বিদেহ-র সীমানা বিভাজন করেছে—কেননা এঁরা হলেন মাথব (অথবা মাথব-এর বংশধর)।"

আর্যরা যেহেতু পূর্বদিকে এগিয়েছিল, তাই হিমালয়ের পাদভূমির অবণ্য পুড়িয়ে দিয়েছিল। অরণ্য উচ্ছেদিত ভূ-ভাগ শুকিয়ে গিয়েছিল। এক হিমবাহ নদীর কারণে অগ্রগতি একসময় রুদ্ধও হয়েছিল, কিন্তু একই পদ্ধতিতে অরণ্য ধবংস করে তারা পূর্বদিকে বসতি স্থাপন করে। এই পদ্ধতিটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় *ঋগ্‌বেদ*-এ অগ্নির বিভিন্ন বিশেষণ থেকে : অরণ্য ভক্ষক,

কুঠার, কৃষ্ণবর্ণ হলরেখা পরিত্যাগকারী ইত্যাদি। পরবর্তীকালে চিহ্নিত করতোয়া নদী যা একালের বঙ্গদেশে কুরাত্তী নামে পরিচিত, তা অবিতর্কিতভাবেই পূর্বদিকে সরে আসা। আসল করতোয়া নিশ্চিতই গন্ডোকের[৫] কাছাকাছি কোথাও ছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে উত্তরপ্রদেশের মূল ভূ-ভাগ অর্থাৎ হিমালয় ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে জঙ্গল হাসিল করার প্রশ্ন কখনও দেখা দেয়নি।

জঙ্গল পোড়ানোর পদ্ধতিটা ঐতিহাসিককালে জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার প্রধান পদ্ধতি ছিল না—যদিও মহাকাব্যে এর উল্লেখ পরিষ্কারভাবেই আছে। *মহাভারত*-এর (১.২১৪-২২৫) খাণ্ডবদাহন পর্বে অরণ্য পোড়ানোকে এক মহান আর্য রীতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রান্ত অগ্নি স্বয়ং অনুরোধ করেন যে পূর্ববর্তী যজ্ঞগুলিতে অত্যধিক ঘৃত উদরসাৎ করে অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হওয়ায় তিনি খাণ্ডব অরণ্য (দিল্লির নিকটবর্তী যমুনার তীরে) গ্রাস করতে পারছেন না; তাই কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবেরা নিজেরাই প্রস্তুতি নিলেন অগ্নির জীবনীশক্তি রক্ষার্থে খাণ্ডব দহনের। অরণ্যটি ছিল ইন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণে এবং সেখানে অন্যদের সঙ্গে আশ্রিত ছিল বিশাল সর্প—তক্ষক। চারদিক থেকে আগুন লাগানোর পর বীরেরা পলায়মান সমস্ত প্রাণীগুলিকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করেন। এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে ছ'টি প্রাণীই শুধু রক্ষা পায় ঃ অশ্বসেন, মাঘা (ইন্দ্রের হাতে নিহত নমুচির ভাই, একজন অসুর ও দক্ষ স্থপতি—যে পরে সেই সভাকক্ষটি নির্মাণ করেছিল যেখানে পাশা খেলতে গিয়ে পাণ্ডবরা তাঁদের রাজত্ব খুইয়েছিলেন) এবং চার সারঙ্গ পক্ষী। সমস্ত কিছুই, এমনকী জলাশয়ের মাছ পর্যন্ত অগ্নি ভক্ষণ করেন অথবা যজ্ঞসাধনকারীদের হাতে নিহত হয়। নাগ তক্ষক সেই সময় ঘটনাক্রমে দূরে থাকায় বেঁচে গিয়েছিল।

এ থেকে আমরা এক ভৌগোলিক আলোচনায় এসে পৌঁছই। আধুনিক বিহার ও ইউ-পি-তে বিদেহ ও কোশল রাজ্যদুটির অস্তিত্ব ঐতিহাসিক কালেও ছিল। মহাকাব্য দুটির সঙ্গে এদের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড় এবং তা সম্ভবত এই কারণে যে এখানকার নৃপতিদের তুষ্ট করতে সেগুলির পুনর্লিখন ঘটেছিল। এই নৃপতিরা নিজেদের সেই বংশধারারই সন্তান হিসেবে দাবি করত (ব্রাহ্মণ্য সহায়তায়) যাদের সম্মাননীয়তা মহাকাব্যিক কাহিনীর উপযুক্ত পুনর্লিখনের দ্বারা সুনিশ্চিত করার দরকার ছিল। বৈদিক কুলবৃত্তান্তগুলিও তখন প্রাচীন ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল; আদি বৈদিক জনগোষ্ঠীগুলিও তখন হয় বিলীন হয়ে গেছে, না হয় নব্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা বর্বর হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। রামচন্দ্রের মাতা ছিলেন কোশল রাজকন্যা—যদিও পরবর্তীকালে কোশল রাজ্য সরে এসেছিল আধুনিক মহানদীর দক্ষিণে। আবার, বৌদ্ধপর্বে উত্তর কোশল গড়ে উঠেছিল আধুনিক ইউ পি-র গোন্ডা ও বাহরিচ জেলায় এবং তখন থেকেই তা হিমালয় ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক সাম্রাজ্য হিসেবে বিস্তৃত হয়। অপহৃতা নায়িকা সীতা ছিলেন বিদেহরাজ জনকের কন্যা—যিনি হলকর্ষণকালে তাঁকে পেয়েছিলেন; সীতা-র অর্থই হল 'হলরেখা'। প্রায় সমস্ত আদি শাস্ত্রে যে গোষ্ঠীটি অনিবার্যভাবে উপস্থিত, তা হল কুরু। ঋগবৈদিক কালে এদের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে কুরুশ্রবণ (কুরুদের গৌরব) নাম থেকে (*ঋগবেদ*, ১০.৩২.৯, ১০, ৩৩.৪)। এই রাজা ছিলেন ত্রাস দস্যুর বংশধর মিত্রতিথির পুত্র এবং উপমাশ্রবসের পিতা। এই কুরুশ্রবণ আসলে ঋষি কবশ ঐলুসা ছাড়া আর কেউ নন—যাঁকে একসময় দাসনারীর পুত্র হিসেবে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল এবং যিনি সেই বিখ্যাত ও মর্মস্পর্শী জুয়ার স্তোত্রেরও (*ঋগবেদ* ১০.৩৪) রচয়িতা। তিনিই পরিতাপ করেছিলেন যে তাঁর পাঁজরগুলি সতীনদের মত পরস্পর

ঠোকাঠুকি বাধিয়েছে (ক্ষুধার তাড়নায়) এবং উপমাশ্রবসকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—"শ্রবণ কর, হে পুত্র (কুরুশ্রবণ-এর) উপমাশ্রবস, মিত্রতিথির পৌত্র আমি সেই পিতার চারণ।"

কুরুবংশীয়রা, মনে হয়, যমুনা তীরবর্তী দিল্লি মীরাট অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল এবং পাঞ্চাল-দের (সম্ভবত পঞ্চ-পাঁকাল) সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলেছিল। এক ক্ষুদ্র রাজাসহ কুরু রাজত্বের অস্তিত্ব বৌদ্ধ আমলেও ছিল। কুরুদেশে কুরুদের বাণিজ্যকেন্দ্র (নিগম) কাম্মাস দম্ম-তে স্বয়ং বুদ্ধদেবও গিয়েছিলেন, *দিঘ-নিকায়* (১৫, ২২) এবং *মজ্‌ঝিম-নিকায়* (১০, ১০৬)-এ তার উল্লেখ আছে। *মজ্‌ঝিম নিকায়* (৮২)-এ বলা হয়েছে, বুদ্ধশিষ্য বত্‌থপাল (রাষ্ট্রপাল) সেখানে বাস করতেন; তিনি ছিলেন স্থানীয় পরিবারগুলির এক বিশিষ্ট প্রধানের পুত্র। বুদ্ধ তাঁকে থুল্ল কোত্‌থিতা নামক স্থানে (কুরুদেশে যেখানে 'মিগাচিরা' নামে এক কুরু রাজোদ্যান ছিল) বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন।

কুরুদের উত্তরাঞ্চলীয় শাখা তথা 'উত্তরকুরু'রা এক অলৌকিক মহিমা অর্জন করেছিল। এরা থাকত সম্ভবত মেরু পর্বতের কাছাকাছি কোথাও—যা ছিল মর্তের স্বর্গভূমি। এখানে সব মানুষ ছিল জন্ম থেকেই দয়ালু এবং শুদ্ধ জীবনযাপন করত; কোন জমিতে হলকর্ষণ করা হত না, অকর্ষিত জমির বুনো চাল খেয়ে মানুষ জীবনধারণ করত; কেউ রথে চড়ত না। রথ ততদিনে সম্পদশালী ও সশস্ত্র শাসকদের এক বিশেষাধিকারে পর্যবসিত হয়ে গেছে—অর্থাৎ শ্রেণী-বিভাজনেরই এক প্রতীক। এই উত্তর-কুরুদের প্রসঙ্গেই *অথর্ববেদ*-এ (৮.১৪) বলা হয়েছে যে, হিমালয়ের পশ্চাদদেশস্থিত তাদের রাজ্যে রাজ-অভিষেকের এক স্বতন্ত্র প্রথা আছে। এই কল্প রাজ্যটিকে সেখানে (*অথর্ববেদ*, ৮.২৩) বলা হয়েছে দেবতাদের স্থান—যা কোন মরণশীল প্রাণী জয় করতে পারে না। রূপকথা বা উপকথার সঙ্গে বাস্তবের দূরত্ব ভারতবর্ষে কখনই খুব বেশি নয়—সেই সময়কালে ও সাহিত্যগুলিতে তো আরও কম ছিল। স্বর্গরাজ্য বিষয়ক অন্য রূপকথাগুলির সঙ্গে মেলালে বাস্তবতার যে আভাসটা পাওয়া যায় তা মনে হয়—এক মুক্ত, সুখী, শান্তিপূর্ণ গোষ্ঠীজীবনের ধারাবাহিকতা যেখানে কৃষি বা আগ্রাসন কোনটাই নেই।

৫.৫ আমাদের সূত্রগুলির মধ্যে যে নামগুলি বারবার এসেছে তার একটি হল ইক্ষাকু (*ঋগ্‌বেদ* ১০.৬০.৪-র এক বৈশিষ্ট্যহীন রাজা)—যিনি কোশল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে বলা হয়। শব্দটি এসেছে 'ইক্ষু' থেকে (*অথর্ববেদ* ১.৩৪.৫-এ প্রথম উল্লেখ হয়; এটি আবার এক ধরনের লাউ-ও বটে)—যা নিশ্চিতই টোটেম সম্বন্ধীয় এবং সম্ভবত প্রাগার্য। শর্করা অর্থাৎ চিনি—যা ভারত থেকে সারা পৃথিবীতে রপ্তানি হত—তা সংস্কৃত শব্দ নয়। রামচন্দ্র ছিলেন ইক্ষাকু বংশীয়, যদিও তাঁর পিতা দশরথ-এর নামটি মিতানিভাষার তুজরত্ত-র সদৃশ। আবার, একই বংশধারায় (দ্র. *মৈত্রী উপনিষদ*, ১.২) বৃহদ্রথ (= বৃহৎ রথ এর) বলতে সম্ভবত একাধিক নৃপতিকে বোঝাত।[৬] *মহাভারতের* কালে বিহারের প্রাচীন রাজধানী রাজগীর-এ রাজত্ব করতেন বৃহদ্রথের পুত্র—মন্ত্রপূত ফলের অর্ধাংশ করে খাওয়া দুই ভগিনীর গর্ভে যাঁর জন্ম। এই পুত্র জরাসন্ধ (= জরা কর্তৃক যুক্ত বা সন্ধিত) দুই অংশে বিভক্ত অবস্থায় জন্মেছিলেন এবং দুটি অংশই ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এরপর জরা নাম্নী এক রাক্ষসী অংশদুটিকে জোড়া লাগিয়ে এক পূর্ণ শিশুতে পরিণত করে তাঁর নামকরণ করে (*মহাভারত*, ২.১৬.৩১-৪০)। কৃষ্ণ এবং যদুবংশীয়দের মথুরা থেকে বিতাড়িত করায় ভীম আবার তাঁকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেন। পুরাতত্ত্বের সাহায্যে এ সবের

ইতিহাসগত ব্যাখ্যা আমরা পেতে পারি। রাজগীর এখনও পর্যন্ত বিশাল বিশাল পাথর বসানো প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত—যেগুলি অন্ততপক্ষে অজাতশত্রুর সময়কাল থেকে আছে। বলা হয় (*মজ্‌ঝিম নিকায়*, ১০৮), বুদ্ধের মৃত্যুর পর (অর্থাৎ প্রায় ৪৮০ খ্রী. পূ.) অজাতশত্রু রাজগীরের এই দুর্গ নির্মাণ করেন বা পুরানো দুর্গের সংস্কারসাধন করেন। যদি এই বিশাল প্রাচীরগুলি (যা কখনই ঠিকভাবে ভাঙা হয়নি) সত্যিই পুরানো হয়, তাহলে মনে রাখা দরকার, জরাসন্ধই হলেন প্রথম মগধাধিপতি যিনি পশ্চিমে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। ভৌগোলিক দিকনির্দেশগুলি কিছুটা আবছা ধরনের। ভগবান কৃষ্ণ—গ্রীকরা যাঁকে যমুনায় বহুমস্তকবিশিষ্ট সর্পের দমন বা অন্যান্য বৈরীভাবাপন্ন অশুভ শক্তিগুলিকে বিনাশের জন্য হেরাক্লেস-এর সমতুল বলে মনে করত—বলা হয়, তিনি তাঁর লোকজনদের নিয়ে মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন—যা বর্তমান কাথিয়াবাড়ে। প্রকৃতপক্ষে কাহিনীটিতে বলা হয়েছে যে, যদুবংশীয়রা মথুরা থেকে পশ্চিমাভিমুখে গমন করেছিলেন (*মহাভারত* ২.১৩.৪৯, ৬৫); অথচ দ্বারকা হল মথুরার দক্ষিণে—এক মরুভূমির মধ্য দিয়ে পথ। কৃষ্ণকাহিনীর এই অংশটির সত্যতা নিরূপণ করা যায় দ্বারকায় খনন চালিয়ে; কিন্তু সেই সঙ্গে খনন চালানো দরকার আফগানিস্থানের দারওয়াজ-এ—যে নামটিরও অর্থ একই এবং তা মথুরাত্যাগী শরণার্থীদের সবচেয়ে সম্ভাব্য গন্তব্যস্থল। প্রাচীন আর্য অভিবাসনের পথচিহ্ন খুঁজে নিয়ে যদুবংশীয়রা হয়ত উল্টো পথ ধরেছিল। *মহাভারত*-এ এক গোরথ[৭] পর্বতের উল্লেখ আছে যা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মী ধবনের নাম এবং রাজগীরের কাছে এই নামের এক পাহাড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে; সুতরাং, এক্ষেত্রে অন্তত কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজন আছে।

কুরুক্ষেত্রের (দিল্লির নিকটে) মহাযুদ্ধে কুরু-রা নির্বংশ হবার পর এবং পাণ্ডবরা যখন দেখলেন যে তাঁদের মহাপ্রস্থান আসন্ন তখন উত্তরাধিকারী পরিক্ষিৎ-কে বসানো হল তক্ষশীলার সিংহাসনে। ঠিক কী কারণে যে তাঁকে এত দূরে পাঠানো হল—তা পরিষ্কার নয়; যেমন বোঝা যায় না, বুদ্ধের আমল পর্যন্ত কুরুরা টিকে রইল কীভাবে! ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগুলিতে পরিক্ষিৎ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর যাগ-যজ্ঞ এবং পুরোহিতদের প্রতি দাক্ষিণ্যের কারণে ঃ

"সকল মানুষের অধীশ্বর, সমস্ত নশ্বরের উর্ধ্বে যিনি দেবতার মতো বিরাজমান সেই বৈশ্বানর পরিক্ষিতের মহান কীর্তির কথা শ্রবণ কর। 'অতুলনীয় নৃপতি পরিক্ষিৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের আরক্ষার জন্য নিরাপদ বাসস্থান নির্মাণ করিয়েছেন।' (একইভাবে) কুরুভূমিতে কোন গৃহস্বামী যখন গৃহে ফেরে তার স্ত্রীর সঙ্গে তার কথোপকথন হয় ঃ 'আমি এখন আপনাকে কি এনে দেব—দধি, ননী না মদ্য?' (এইভাবে) রাজা পরিক্ষিতের রাজত্বে স্ত্রী তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে। আলোকের মত পক্ক যব (পাত্রের) মুখ উপছে পড়ে। প্রজারা রাজা পরিক্ষিতের রাজত্বে সুখ ও সমৃদ্ধিতে আছে।" (*অথর্ববেদ* ২০.১২৭.৭-১০)।

কুরুভূমির এই উল্লেখের মধ্যে একটা স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় যে, এখানে এক মনুষ্য রাজাকে ঐশ্বরিক অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অগ্নিকে কোন মনুষ্য নামে পূজা করা হয়নি। শাস্ত্রানুসারে পরিক্ষিতের অভিষেককাল অর্থাৎ ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে শুরু হয়েছিল কলিযুগ; সুতরাং, এ সময়কার সিন্ধু উপত্যকার বাইরের কোন ঘটনা এটা হতে পারে না। আবার, *মহাভারত* যখন রচিত হয়েছিল বা কুরুরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল তার অনেক আগেই সিন্ধু-সভ্যতা

নিশ্চিতভাবে বিস্মৃতির অতলে সম্পূর্ণ তলিয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন হল—পরিক্ষিতের বংশধরদের কি হয়েছিল? উপনিষদগুলির মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর প্রহেলিকা হয়েই রয়ে গেছে।

আগেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যেকার পার্থক্যগুলির কারণ হল সেগুলি বিভিন্ন কুলের বিশেষ সম্পত্তি হিসেবে ছিল। *মহাভারত* ভৃগুদের দ্বারা পুনর্লিখিত হয়েছিল[৮]—যেমন, বৈদিক ভাষ্য এবং বৌদ্ধ পুঁথিগুলির পুনর্লিখন করেছিল কাশ্যপরা। *মহাভারত* সংস্করণকারীরা নতুন উপাখ্যান যুক্ত করে বা পুরনো উপাখ্যানে নতুন ঘটনা জুড়ে দিয়েই শুধু পরিতৃপ্ত হননি, অনেকখানি নব্য মতবাদও ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বিশাল শান্তিপর্বের পুরোটাই মূল মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের মুখনিঃসৃত উপদেশ। অন্য যে মহতী ধর্মীয় সংযোজন তা হল বিখ্যাত *ভাগবত গীতা*—সাংখ্য, ঔপনিষদিক এবং বৌদ্ধ দর্শনের সম্মিলিত পাকে এক অভিনব তত্ত্ব। এক ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস—যা সব পাপ স্খালন করে দেয়, এমনকী যুদ্ধে ভ্রাতৃহত্যারও। এই ব্যক্তি ঈশ্বর হলেন কৃষ্ণ—যিনি সবেমাত্র *মহাভারতের* যুগে বিষ্ণু-নারায়ণের অবতার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন, অন্য অবতাররা তখনও পাননি। প্রকৃত বীর কৃষ্ণ, যাঁকে *গীতার* উদ্গাতা বলে বলা হয় এবং এক ক্ষীণ পরিশিষ্ট *অনুগীতা*-রও—তিনি স্বাভাবিকভাবেই, তাঁর ইতিহাসগত বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থেকে থাকে তা হারিয়েছেন। মহাকাব্যে তিনি অর্জুনের রথের সারথি এবং পঞ্চ-পাণ্ডব ভ্রাতার উপদেষ্টা। তাঁর নিজস্ব লোকজন যদুরা লড়াই করল অন্য পক্ষে এবং পরে ধ্বংস হয়ে গেল এক জ্ঞাতিবিরোধে। যদুদের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ হয়েছে *ঋগ্‌বেদে*, আবার আজকের দিনেও অসংখ্য যাদব বিরাজমান—যারা সেই প্রাচীন জনগোষ্ঠীরই বংশধারা অথবা ব্রাহ্মণ্য অতিকথার অপরিহার্য সহায়তায় এই মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্যের দাবিদার। এ সব ক্ষেত্রে সম্বন্ধিত মৃৎপাত্র অনুক্রম বা ভূ-নিম্ন স্তরগুলির আন্তঃসম্পর্কের বিশ্লেষণ প্রত্নতাত্ত্বিকদের পক্ষে সহজ নয়—যদিও আলোচ্য ধরনের সূত্রগুলি থেকে যে কোন ইতিহাসে পৌঁছানোর আগে সে কাজ জরুরি। ধর্ম ও দর্শনকে মিশিয়ে দেবার কাজটা চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছিল ঃ *ভাগবদ্‌গীতা* আজও পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ভাবাদর্শগত পরিমণ্ডল —যেখানে তারা তাদের দ্বন্দ্বগুলির নিরসন ঘটায়—তাকে সুবিন্যস্ত করে চেতনা গঠনের এক অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। বালগঙ্গাধর তিলক—যিনি আর্যদের জন্য এক সুমেরুদেশ আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে নবোদ্ভূত, ক্ষীণ ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্যও লড়াই চালিয়েছিলেন—তাঁর প্রেরণার উৎস ছিল গীতা এবং তিনি তার এক নতুন ভাষ্যও রচনা করেন। মহাত্মা গান্ধী—যিনি প্রকৃত বুর্জোয়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সফলতার কাছে নিয়ে আসেন—তিনিও প্রগাঢ়ভাবে আস্থাশীল ছিলেন গীতার ওপর। অন্যদিকে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের অন্ধ ভক্তি এবং *জ্ঞানেশ্বরী*-র মতো পবিত্র অনুবাদগুলি হওয়া সত্ত্বেও এ গ্রন্থটি নিম্নশ্রেণীর সামাজিক চেতনা গঠনে কোন ভূমিকা নিল না। এর প্রকৃত মহিমার সঙ্গে যোগ রইল শুধু সামন্ত অধ্যায়ের—যা ব্যক্তি ভজনার ওপর গুরুত্ব দেয়।

৫.৬ *মহাভারতের* প্রধান কাহিনী এবং তার অপ্রধান ধর্মীয় উদ্দেশ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, এটি কথিত হয়েছিল এক যজ্ঞে—যা অনুষ্ঠান করেছিলেন পরিক্ষিতের পুত্র জন্মেঞ্জয়। এই যজ্ঞের অভীষ্ট—যা মোটের ওপর সফল হয়েছিল—তা ছিল নাগেদের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। নাগ-এর আক্ষরিক অর্থ হল সাপ বা হাতি এবং এই বহুল প্রচলিত লোকবিশ্বাস কিসের ইঙ্গিতবাহী তা কারো বুঝতে অসুবিধা নেই। মুণ্ডা উপজাতিদের মধ্যে নাগ এখনও এক

মুখ্য টোটেম (রায়, ৪০৬-১০)। আসাম এবং বার্মাতেও নাগ উপজাতি রয়েছে। তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি নতুন জাতীয় সরকারকেও যথেষ্ট বিব্রত করছে। ইতিহাসে অন্য নাগেদের অস্তিত্বের কথাও জানা যায় যারা মধ্যভারতের[৯] উত্তরাংশে ছোট ছোট রাজ্য শাসন করত এবং ১৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় স্বল্পকালের জন্য কিছু মুদ্রারও প্রচলন ঘটিয়েছিল। নাদসব, যিনি ভাজা-র কাছে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, তিনিও সম্ভবত একজন নাগ ছিলেন। বহুমস্তক বিশিষ্ট এক নাগকে সমুদ্রমন্থনের সময় রজ্জু হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। শিব বা বিষ্ণুর মস্তক আচ্ছাদন করা এই নাগের মূর্তি এবং তার পূজার জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ উৎসব নাগপঞ্চমী এখনও চালু আছে। নাগ-এর অপর একটি নাম তক্ষক—যা দিয়ে সূত্রধরও বোঝায়; শাস্ত্রানুসারে নাগ হল এক সর্পদৈত্য—যে ইচ্ছামতো মানবরূপ ধারণ করতে পারে। এ এক উন্নত চাতুরী! একইভাবে, তক্ষশীলা নামটিও এসেছে মূল 'তক্ষ' থেকে। আবার অজস্র স্থানিক নাগপীঠ প্রাচীন নির্দশন সমেত আজকের কাশ্মীরে বিদ্যমান—যেগুলিকে *নীলমাতা পুরাণ*-এর (কে দ্য ভ্রিজ সম্পা., লেইডেন, ১৯৪৯) সঙ্গে মেলালে বোঝা যায় যে এটিই ছিল কাশ্মীর উপত্যকার আসল ধর্মমত। শ্রীকান্ত নামক সর্প ছিল থানেশ্বরের মস্তক আচ্ছাদক (*হর্ষচরিত*, ৯৬, ১১১-১১৩)। নাগ নাম বা ধর্মবিশ্বাসটি আর্য নয়, যদিও *তৈত্তিরীয় সংহিতা* (৫.৫.১০)-য় পবিত্র অগ্নির রক্ষক দেবতা হিসেবে নাগেদের বিশেষ পূজা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শাক্য উপজাতির (বুদ্ধ যাদের মধ্যে জন্মেছিলেন) প্রতিবেশী কোলিয়ানদের সম্পর্কে প্রাচীন পালি গ্রন্থগুলি থেকে মনে হয় যে এরা ছিল আর্য সংস্কৃতির প্রান্তে অবস্থানকারী। পরবর্তীকালের *মহাবস্তু*-তে বলা হয়েছে যে কোলা নামক বারাণসী-র এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সাধু ছিলেন তাদের আদিপুরুষ। পালি নথিগুলিতে বলা হয়েছে যে শাক্যদের সঙ্গে কোলিয়ানদের একবার যুদ্ধ হয়েছিল (বাঁধ দিয়ে নদীর জল বিভাজনকে কেন্দ্র করে) এবং তাতে শাক্যরা কোলিয়ানদের জলে বিষ প্রয়োগ করেছিল—যা আর্য রীতিবিরুদ্ধ। কোলিয়ানদের উপজাতিক প্রধান কেন্দ্র 'রাম-গাম'-তে বুদ্ধের দেহভস্মের এক-অষ্টমাংশ জমা পড়েছিল (৪৮৩ বা ৫৪৩ খ্রী. পূ.); আবার, *দিঘ নিকায়*-১৬-র (গাথা, ২৮) শেষের এক প্রচলিত প্রাচীন স্তোত্রে বলা হয়েছে যে নাগ-এরা রামগাম-এ এই ভস্মাবশেষ পূজা করত। অর্থাৎ, কিছু কোলিয়ান ৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দেও নাগ* থেকে গিয়েছিল। বৌদ্ধ *বিনয়* পুঁথিতে একটি নিষেধাজ্ঞা আছে যে নাগেদের বৌদ্ধ ধর্মে নিয়ে আসা যাবে না।[১০]

নাগেদের বিলম্বিত আবির্ভাব বা ভৌগোলিক দিক থেকে এক বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকাটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে এরা ছিল বন্য উপজাতিমণ্ডলী—যাদের উল্লেখ করতে

* নাগেদের প্রাচীনতম যে রক্ষক দৈত্য সে কোন বীরেব কাছে পরাস্ত হয়েছিল। মনে হয়, এই বীর হল কালীয়—মথুরায় কৃষ্ণ যাকে মল্লযুদ্ধে হারান, কিন্তু প্রাণে মারেন না। ফা হিয়েন-এর বিবরণী অনুসারে, সংকাশ্য মঠে একটি বিশেষ কক্ষ আছে—যেখানে অনুষ্ঠান করে রক্ষক নাগকে খাদ্য উপচার দেওয়া হয়। কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম অভিঘাত থেকে পুনরুত্থানের জন্য ব্রাহ্মণরা ভিক্ষুদের প্রভাবে ক্ষীণ হয়ে আসা স্থানিক নাগ ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন শিলালিপিতে যে মনিনাগ-পীঠের উল্লেখ আছে (দ্র. ফ্লিট, ২৫)—তা এক নাগ ধর্মবিশ্বাস এবং এখনও তার অস্তিত্ব আছে (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ২৮.৩২৮-৩৩৪)। *নব সাহসাঙ্কচরিত*-এ বলা হয়েছে যে, ধারা রাজ্যে ভোজ রাজার পূর্বপুরুষেরা স্থানীয় নাগদেবতাদের পূজা দিতেন এবং নাগ রাজকন্যাদের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হতো।

আর্যরা এই মিলিত বর্গনামই ব্যবহার করত, কেননা সর্প লোকবিশ্বাস পরের দিকের আর্য আচার অনুষ্ঠানেও ঢুকেছিল। যে সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি টিকে আছে তা খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয়, এরা ছিল আর্য পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকা সেই সমস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠী যারা কোনভাবে আর্যদের সঙ্গে সংযোগের কারণে অন্যদের চেয়ে উন্নত হয়ে উঠেছিল। আর্য ক্রমঃপ্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে, সম্ভবত নাগেরা অপসৃত হচ্ছিল; এর অর্থ আবশ্যিকভাবে এই নয় যে তাদের শারীরিক অপসারণ ঘটছিল, বরং এমনও হতে পারে যে নতুন নতুন উপজাতিগোষ্ঠী নাগ স্তরে উন্নীত হচ্ছিল। এ হল আর্যবিস্তারের সহগামী এক সাংস্কৃতিক অগ্রগমন—যা এমন কিছু জনগোষ্ঠীকে অঙ্গীভূত করে নেয় যারা আগে নাগ ছিল—যেমন, কোলিয়ানরা। *মহাভারতের* শুরুতেই পূর্বতন নাগেদের এক দীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে—যারা মহাযুদ্ধের সময় রাজা হিসেবে পুনর্জন্ম নিয়েছিল। এদের মধ্যে কুরুদের অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র একজন—বৌদ্ধ সূত্র অনুযায়ী যিনি সাধারণভাবে একজন নাগ। পাণ্ডবরা সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে পেরেছিল তখনই যখন অশ্বত্থামার মাথা থেকে মণিটি বিচ্ছিন্ন করা গেল। এই অশ্বত্থামা ছিলেন পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণের পুত্র এবং এই দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রের শত কৌরবপুত্রের মতই স্বয়ং জন্ম নিয়েছিলেন একটি পাত্রে। *মহাভারত*-এর অশ্বত্থামা কোন রাজা নন, অবশ্য তাঁর পিতা দ্রোণকে পাণ্ডবরা কিছুদিনের জন্য উত্তর পাঞ্চালের রাজত্ব দক্ষিণা স্বরূপ দান করেছিলেন—যদিও পাঞ্চালের রাজা ছিলেন তাঁদের শ্বশুর। পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদী ছিলেন এই পঞ্চভ্রাতার যৌথ স্ত্রী। এই ধরনের বহুপতিত্ব আর্য প্রথা নয় বলে মনে করা হয়[১১]—যদিও বৈদিক কৃষিদেবতাদের (মরুৎদের) যৌথ স্ত্রী ছিলেন রোদসি, এবং নামত্য ভ্রাতারাও হয়ত একসময় সৌরদেবীর যৌথ পতি ছিলেন; ইনি পরে তাঁদের ভগ্নী হন। যৌথ বিবাহের এই অবশেষও বিলুপ্ত হয়েছিল, কিন্তু বহুবিবাহ প্রথা থেকে গিয়েছিল। কপালে একটি মণি থাকা নাগেদের ঐতিহ্যগত চিহ্ন। অশ্বত্থামাকে অমরত্বের অধিকারী (*চিরঞ্জীবিন*) সাতজনের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যদিও কারণটা আপাতভাবে পরিষ্কার নয়; এবং মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে তাঁকে স্পার্টেমবস-এর রাজা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র ভারত-যুদ্ধের বিপুল কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে হারিয়ে যাওয়া এক অনার্য বা প্রাগার্য জনজাতি এবং যুদ্ধটা ছিল সেই রাজধানী হস্তিনাপুরের (দিল্লি) জন্য—যার অর্থ নাগেদের নগর। নাগ শব্দটি হস্তী অর্থেও ব্যবহার করা হয়—সম্ভবত সাপের মতো শুঁড়টির জন্য। আবার, বৌদ্ধ শাস্ত্রানুযায়ী, নাগ অর্থে 'উন্নত চরিত্র'-ও বোঝায়। খোদাইলিপিগুলি (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ৯.১৭৪-৮১) থেকে জানা যায় যে পরের দিকে, যেমন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মতো সময়কালেও, রাজাদের পক্ষে নাগ বংশজাত বলে দাবি করাটা ছিল সম্মানের। এই ধরনের সংশ্লেষণের ফলে *মহাভারত* থেকে ইতিহাস নিষ্কাশন করার কাজটা দুরূহ হয়ে ওঠে। অন্য উপাত্তের সমর্থন সাপেক্ষে স্বল্প কিছু অংশ ছাড়া *মহাভারত-পুরাণের* জটিল সাংকর্যর ঐতিহাসিক মূল্য এখন গৌণ।[১২]

টোটেম তন্ত্রকে অনেকে (যাঁদের মধ্যে আমার দেশবাসীও কিছু আছেন) নীচ, বন্য, বর্বর, বা কোন উন্নত সভ্যতার অনুপযোগী কিছু বলে ভাবেন। আমরা এখানে কোন আদিম টোটেম সমাজের কথা বলছি না, বলছি অনেকখানি বিকশিত এক সমাজের কথা যেখানে কৌম-কে আর পদবী হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। অগ্রবর্তী এই গোষ্ঠী সমাজ অবশ্য তখনও বিদ্যমান প্রকৃত আদিম জনগোষ্ঠীগুলিকে আত্তীকৃত করে নিচ্ছিল। কিন্তু টোটেম-বিশ্বাসের স্পষ্ট অস্তিত্ব—যেমন, রোমের প্রাণী বা ভোজ্য-বৃক্ষ জাতীয় নাম—যথা, পোর্সিয়া (শূয়োর), আসিনিয়া (গাধা),

ফেবিয়া (বিন) ইত্যাদির মধ্যে সব পর্যায়েই ছিল। *তৈত্তিরীয়* (২.২) এবং *মৈত্রী* (৬.১১-১২) *উপনিষদের* খাদ্য-দর্শন—সেখানে বলা হয়েছে, সমস্ত প্রাণীই খাদ্য থেকে উৎপন্ন, খাদ্যের দ্বারা জীবিত এবং খাদ্যে রূপান্তরিত হয়—এ হল টোটেম-বিশ্বাসের এক চমৎকার ভাবগত প্রকাশ। অবশ্য, উপনিষদগুলির মধ্যে জন্মান্তরবাদ তত্ত্ব বিকশিত হয়নি (*মুন্ডক* ৩.২ এবং *ছান্দোগ্য* ৫.১০ উপনিষদের কিছু আলোচনা সত্ত্বেও) এবং ভাবগত এই দিকটি দীর্ঘকালীন খাদ্য-উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে খাদ্যাভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনের পুনর্জন্ম তত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত না যদি না মানুষকে চিহ্নিত করার জন্য বৈশিষ্ট্যসূচক প্রাণী টোটেম-এর সাধারণ ধারণার প্রচলন থাকত—যেমনটা আমরা নাগদের ক্ষেত্রে দেখেছি। কিন্তু বিশেষ ধরনের টোটেম কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠানও ছিল—যা বিলুপ্ত হবার আগে পর্যন্ত সাধারণভাবে কৌম-গুহ্য হিসেবে বিবেচিত হত। সংস্কৃত 'ব্রত' শব্দের অর্থ 'সাধনা' এবং এর একটি গৌণ অর্থ 'পুরোপুরি এই খাদ্য নির্ভর'—যার সঙ্গে টোটেমের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। বুদ্ধ অচিলা সোনিয়া নামক তাঁর এক ভক্তের সাক্ষাৎ পান যিনি সারমেয় ব্রতধারী (*দিঘ নিকায়*, ২৪; *মজ্ঝিম নিকায়*, ৫৭)। এই ব্যক্তি সমস্ত আচরণে কুকুরের নকল করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে এই ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই কুকুর জন্ম লাভ করবেন অথবা এই ব্রতধারীদের জন্য নির্দিষ্ট নিম্নস্থ স্বর্গের কোন বিশেষ অংশে স্থান পাবেন। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ (১১.১) কুক্কুর (= সারমেয়) জনগোষ্ঠীকে ভয়ংকর মানব শত্রু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত শব্দটি হল কুকুর—যার অর্থ একই। *মহাভারতে* এই জনগোষ্ঠীকে যদু বংশীয়দের শাখা হিসেবে মনে করা হয়—যাদের অভিন্ন পূর্বপুরুষ ছিলেন অন্ধক-এর পুত্র। 'অন্ধক' শব্দটি 'অন্ধ্র'-র পালিরূপ। বুদ্ধের অনুগামীদের মধ্যে সেই সময় একজন ষন্ড-ব্রতধারী আদিবাসী ছিলেন (কোলিয়ান—যাঁর নাম পান্না) এবং হয়ত একই পরিণতির আশঙ্কায় ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। *মহাভারত*-এ (৫.৯৭.১৩-১৪) ষণ্ডব্রতধারীদের জন্য স্বর্গের নিম্নস্তর সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং সন্নিবিষ্ট এক প্রক্ষিপ্ত স্তোত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এই ব্রতের অর্থ ষাঁড়ের মত শান্ত ও অন্যান্য উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন হওয়া। অচিলা-র সারমেয় ব্রতকে মনে হয় পাগলামি—কিন্তু যে নির্দিষ্ট রূপের মধ্য দিয়ে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা গুরুত্ব সহকারেই বিবেচিত, কেননা কৌম উৎসবগুলিতেও এর প্রচলন ছিল। পালি সাহিত্যে অন্য ব্রতগুলিরও পরিচয় পাওয়া যায়; বাদুড়, ছাগল, হাতি ইত্যাদি প্রাণীদের আচরণের নকল করে ঈশ্বর-আরাধনা করা হত—যেমন অচিলার ক্ষেত্রে কুকুরের। আবার, একই উল্লেখ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কবি বাণভট্টের রচনায় পাওয়া যায়—যিনি তাঁর পূর্বপুরুষকে বাৎসায়ণ গোত্রভুক্ত কুক্কুট (মোরগ) ব্রতধারী বলে বর্ণনা করেছেন;[১৩] জনৈক টীকাকার মন্তব্য করেছেন 'ব্রত' শব্দটির একটি অর্থ (শাস্ত্রাচার সম্মত) ভোজ্যবস্তু। এই দ্বৈত অর্থ বাণভট্টের অভিপ্রায়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল।

৫.৭ এই ধরনের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত ধর্মাচারগুলির সমান্তরাল আর এক ধারাকে খুঁজে পাই যেখানে উন্নত সমাজের পাশাপাশি আদিম উপাদানগুলির অস্তিত্বও টিকে ছিল। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকটি ভারতীয় সমাজে বরাবরই বিদ্যমান। বিকশিত হবার অজস্র ক্ষেত্র তথা পূর্ণ সভ্যতা অর্জনের অমিত সম্ভাবনা—অথচ সে তুলনায় অগ্রগতির অতি শ্লথ পদক্ষেপ। কাশ্যপ এবং ভৃগুদের মতো বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ্য গোত্রগুলি আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল—অবশ্য অন্য ব্রাহ্মণরাও সাধারণভাবে তা অনুসরণ

করেছিল। নিয়মমতো এদের অনেককেই উত্তরাপথ থেকে তক্ষশীলা[১৪] বা সীমান্ত অঞ্চলে যেতে হত তাদের মূল কাজ অর্থাৎ যজ্ঞাহুতি শিক্ষার জন্য (*ব্রাহ্মণ্য উপনিষদ* ৩.৩.১; ৩.৭.১)। *মহাভারতের* সংস্করণ কার্যের কালে যেখানে ব্রাহ্মণরা শিক্ষার জন্য গিয়েছিল সেই মদ্রদেশকে মনে হয়েছিল বর্বরোচিত। মদ্রের মানুষদের মধ্যে অনার্যসদৃশ কন্যাপণ রীতি কেন চালু আছে সে নিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনাও *মহাভারত*-এ যুক্ত হয়েছিল—যা পুঁথি মেলানোর সময় একালে বাদ দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণরা অসহায়ভাবে ছোট হয়ে যেত যখন ক্ষত্রিয়রা যজ্ঞ বা ব্রহ্ম (এক নতুন ঈশ্বর-তত্ত্ব)-র ব্যাখ্যা জানতে চাইত। তখন এরা সেই ক্ষত্রিয়দের কাছেই বিনয়াবনত শিষ্যের মতো শিক্ষা নিত—যেমন, প্রবাহন জৈবালি (*ছান্দোগ্য* ৫.৩; *ব্রাহ্মণ্য উপনিষদ* ৬.২) বা অশ্বপতি কৈকেয় (*ছান্দোগ্য* ৫.১১.১২) বা রাজা জনকের (*শতপথ ব্রাহ্মণ* ১১.৬.২) কাছে। এ থেকে বোঝা যায় যে গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র আর্য যজ্ঞ-কেন্দ্রিক ছিল না বরং স্বতন্ত্র কিছু; সম্ভবত কোন গুপ্তবিদ্যা—যা সিন্ধু উপত্যকা থেকে এসেছিল বা উপজাতিক ভিষজদের বা উভয়েরই কাছ থেকে।

অবশ্য, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম পালন থেকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের উপার্জন ভালই হত—যেমন, যজ্ঞদক্ষিণা হিসেবে পুরো গ্রামই দিয়ে দেওয়া হত। কোশলরাজ পসেনদি ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাদি-কে উক্কথ গ্রাম এবং ব্রাহ্মণ লোহিচ্চা-কে শালবটিকা গ্রাম (*দিঘ নিকায়* ৩, ১২) দান করেছিলেন। এই উভয় গোত্রই পরিচিত। পাসেনদি-র সমসাময়িক মগধের বিম্বিসার আর এক ব্রাহ্মণ কূটদন্তকে খানুমাতা গ্রামটি উপহার দিয়েছিলেন। *দিঘ নিকায়* গ্রন্থটি অবশ্য অশোকের সময় পুনর্লিখিত হয়েছিল, কিন্তু মূল শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা হয়নি—যদিও সেগুলি আবিষ্কারের তখন কোন কারণ ছিল না, কেননা ব্রাহ্মণদের উপহার দেওয়াটা বৌদ্ধ সমাজে ছিল মন্দ কাজ। ব্রাহ্মণরা নিজেরাই এই ধরনের রাজকীয় দানের বিষয়গুলিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করত। *অথর্ববেদ*-এ (৮.২০) নির্দেশ করা হয়েছে "অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রলেপদান কার্য সমাধার পর তাঁর (রাজার) উচিত প্রলেপদানকারী ব্রাহ্মণকে স্বর্ণমুদ্রা দান করা; সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, এক ভূমিখণ্ড ও কিছু চতুষ্পদ প্রাণী.....।" এটি পরবর্তীকালের সংযোজন। আগে অভিষেক-দক্ষিণা ছিল গবাদি পশু, বক্না বাছুর—যা ব্রাহ্মণরা খেতো, জই-এর মন্ড বা এই ধরনের কিছু। *অথর্ববেদ*-এ আরও বলা হয়েছে যে, রাজা অঙ্গ কর্তৃক 'দশ সহস্র দাস রমণী, দশ সহস্র হস্তী' উদময় আত্রেয়কে প্রদান করা হয়েছিল। অঙ্গ হল মগধের পূর্বদিকে প্রচলিত একটি উপজাতিক নাম, পুরোহিতের নামটি অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। এই অনুমিত দানের চমৎকারিত্ব অনুধাবন করতে পারবেন তিনিই যাঁকে অন্তত একটি হাতির খোরাক যোগাতে হয়, দশ সহস্রের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। দাসশ্রমিক নির্ভর কৃষি-অর্থনীতির ইঙ্গিত হিসেবেও একে প্রতিপন্ন করা ঠিক হবে না—কেননা বর্ণনাটিতে বলা হয়েছে কেবলমাত্র নানা রাজ্যের অভিজাত পরিবার থেকে আনা মণিহার ভূষিতা দাসরমণীদের কথাই; তাছাড়াও, প্রাপক ঐ উপহারগুলি শ'য়ে শ'য়ে বিতরণ করে দিচ্ছেন এবং উপহারের সংখ্যা এত বেশি যে তার তালিকা পাঠ করতেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। এইসব শাস্ত্রের প্রাচীন বলে কথিত এই অংশগুলির গুরুত্ব কতখানি—আজ তা বোঝা কঠিন। যেমন, *তৈত্তিরীয় সংহিতার* (২.৬.৯) অসুর এতাদু-র নাম থেকে মনে হতে পারে যে তিনি ইতিহাসের আসিরীয়।[১৫] কিন্তু *অথর্ববেদ*-এর (৪.৬.১) দশমুন্ডধারী ব্রাহ্মণ—যিনি প্রথম জন্মেছিলেন এবং প্রথম সোমরস পান করেছিলেন—তিনি কে?

এঁকে পুরোপুরি কাল্পনিক বলে বাতিল করে দেওয়াটাও ঠিক নয়—কেননা *ঋগ্বেদ*-এ নবগ্ব এবং দশগ্ব নামক দুই পুরোহিতের উল্লেখ আছে যার মধ্যে শেষোক্তজনই হয়ত *অথর্ববেদ*-এ এমন বিকট হয়ে উঠেছেন। রামের হাতে নিহত দশমুন্ডধারী রাজা রাবণ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ—এটা সব শাস্ত্রেরই অভিমত; প্রকৃতপক্ষে, কিছু বশিষ্ট তালিকায় রাবণ নামের একটি গোত্রই আছে। এসব থেকে আমরা বড়জোর মনে করতে পারি যে, যেহেতু পুরোহিত শ্রেণী ছিল দরিদ্র তাই পারিশ্রমিক পেলে শাস্ত্রগুলি পুনরায় লিখতে, বাড়াতে বা নতুন কিছু জুড়ে দিতে কখনই দ্বিধা করত না। এ প্রসঙ্গে, কুরুদেশের বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ উসস্তি চক্রায়নের দৃষ্টান্তটি নেওয়া যেতে পারে (*ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ১.১০-১১)। তাঁর ক্ষেতগুলি শিলাবৃষ্টি বা এই ধরনের কোন বিপর্যয়ে নষ্ট হবার পর তিনি নতুন কোন পৃষ্টপোষকের সন্ধানে স্ত্রী সমেত স্থানান্তরে বেরিয়ে পড়েন। পথে, নিম্নজাতির (ইভ্যা) এক লোকের কাছ থেকে কাদামাখা কড়াই-এর পিঠার উচ্ছিষ্ট—যা কখনই কোন ব্রাহ্মণের ভক্ষ হতে পারে না—তা-ই ভিক্ষা করে খান এবং বলসঞ্চার করে পরদিন রাজসভায় হাজির হয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করেন।

আর্য ও অনার্য জনগোষ্ঠী বহির্ভূত এক সমাজ গঠনে নব্য পুরোহিতশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এটা কোন সুচিন্তিত, সচেতন বা পরিকল্পিত কার্যক্রম ছিল না—বরং ক্ষুধার তাড়না থেকেই এসেছিল। সমগ্র লক্ষ্যটাই ছিল জীবনযাপন। দীর্ঘ ও কঠোর বেদ অনুশীলন গোষ্ঠী-উর্ধ্ব এক ব্রাহ্মণ্য সংহতির জন্ম দিয়েছিল—যা তাদের সাহায্য করেছিল গোষ্ঠী বাঁধনকে ছিন্ন করে এক নতুন সমাজ গঠনে এবং একইসঙ্গে অনুপযুক্ত করে তুলেছিল হলকর্ষণ বা অস্ত্রশিক্ষায়। উপজাতিক গোষ্ঠী ও কূল-প্রধানদের আচার-অনুষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল এই পুরোহিতদের সংখ্যা সচ্ছলভাবে বাঁচার পক্ষে অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাই দারিদ্র্য এদের অনেককেই দরিদ্রতর জাতিগুলির প্রতি সহমর্মী করে তুলেছিল। এরা সহায়ক হল এক সমাজ গঠনের—যা নতুন সম্পত্তি-ধারণা, অর্থাৎ কৃষি-সম্পত্তির ধারণার পক্ষে বেশি উপযোগী; যদিও সব গোষ্ঠী মানুষই এ ধারণার অংশীদার ছিল না—কেননা (পশু সম্পত্তির মতো) এটা তাদের কোন সমবেত উদ্যোগের ফলশ্রুতি নয়। বক দালভ্য অর্থাৎ গ্লাব মৈত্রেয়-র কাহিনীর (*ছান্দোগ্য* ১.১২) যদি কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা থাকে, তাহলে বোঝা যায়—ব্রাহ্মণরা কীভাবে অনার্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করত, তাদের নতুন ধর্মমতে নিয়ে আসত এবং এইভাবে পরিশেষে তাদের সাহায্য করত খাদ্য-সংগ্রাহক থেকে খাদ্য-উৎপাদকে পরিবর্তিত হতে। দুই নামধারী এই ব্রাহ্মণ (একটি নাম পিতৃপরিচয়জ্ঞাপক, অন্যটি সম্ভবত মাতৃপরিচয়ের) শিক্ষানবীশ হিসাবে ভ্রমণকালে এক রাত্রে গোপনে কিছু 'কুকুর'-কে নিরীক্ষণ করেছিলেন। এই কুকুররা তাদের দলপতি এক সাদা কুকুরকে বলছিল, 'প্রভু, মন্ত্রবলে আমাদের জন্য কিছু খাদ্য আহরণ কর।' প্রত্যুষে, সাদা কুকুরটি বিধানমত প্রদক্ষিণ ও ব্রাহ্মণ্য অনুপূরক 'হিং' উচ্চারণ সহ মন্ত্রপাঠ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল। এ কাহিনী নিশ্চিতই কুকুর টোটেমের কোন কৌমের কিছু লোকাচার সম্বন্ধীয়, কিন্তু নীরব ব্রাহ্মণ পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিটা ইঙ্গিতবাহী। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধরনের পর্যবেক্ষণগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার মতো উপাদান প্রায় নেই বললেই চলে।

ব্রাহ্মণ্য নমনীয়তা, যদিও লোভ থেকেই তা এসেছিল, তবু ন্যূনতম হিংসার মধ্য দিয়ে আত্তীকরণ প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করায় সহায়ক হয়েছিল—এটা আমরা পরে দেখব। জন্মগতির নিরিখে ব্রাহ্মণরা নিজেরাই একসময় মিশ্র ছিল, অন্তত পতঞ্জলি কৃত পানিনি (২,২,৬) ভাষ্যে

তাই বলা হয়েছে ঃ "যখন কেউ কোন কালো (মানুষ)-কে দেখেছে, সিমের গাদার মতো কালো, হাটে বসে আছে, কেউ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে পারে (অনুসন্ধান ছাড়াই) যে সেটি ব্রাহ্মণ নয়; এ থেকেই কারো (স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই) প্রত্যয় হবে।" এর বিপরীতে *ব্রাহ্মণ্য উপনিষদ*-এ (৬.৪.১৬) ব্রাহ্মণের কৃষ্ণবর্ণপুত্র জন্মানো সম্পর্কে পরিষ্কার বিধান দেওয়া আছে ঃ "এখন যদি কেউ কামনা করে যে, আমার একটি লোহিতচক্ষু শ্যামবর্ণ পুত্রলাভ হোক, সেই পুত্র যেন তিনবেদে পারঙ্গম হয় এবং যেন পূর্ণজীবন লাভ কবে তাহলে তাদের দু'জনের (পিতামাতার) উচিত জলে সিদ্ধ ভাত ঘৃতপক্ক করে ভোজন করা; তাহলে তারা তা (এমন এক পুত্র) লাভ করবে।" শ্বেতকায় পুত্র (বা কন্যারও) প্রাপ্তিব অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে সেই পর্বের পূর্বদেশীয় ব্রাহ্মণরা আজকের মতোই অসমশ্রেণীভূক্ত ছিল। তাদের দারিদ্র্য, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য দীর্ঘ কঠোর শিক্ষানবিশী, এমনকী অন্য জাতের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের যে অসার দাবি (তাদের আচরণের সঙ্গে যার কোন সামঞ্জস্য ছিল না)—এ সব কিছুই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার কবা হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীগুলির কাছে সম্মানীয় হবার প্রয়োজনেই শাসকশ্রেণীর মতাদর্শকে উচ্চ শ্রেণীগুলি নিজে থেকেই কিছু কঠোর বাধ্যবাধকতা সমেত ঐকান্তিকভাবে মেনে চলত। এর ফলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র একধরনের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল—যে বৈশিষ্ট্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রকৃত ভূমিকা নিরূপণের চেষ্টাকে বিপথগামী করে। পরের দিকে সমাজ স্পষ্টভাবেই শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং জাতপ্রথা সেই বিভাজনেরই বহিঃপ্রকাশ—যদিও তার প্রকৃতিতে ঐতিহ্যগত লক্ষণগুলি ফুটে ছিল।

৫.৮ এইভাবে পুঁথিপত্রগুলির পরোক্ষ বিশ্লেষণ থেকে কিছু তথ্য আমরা অর্জন করতে পারি। কিন্তু এই সমস্ত পুঁথিপত্রের বিশুদ্ধ কল্পকাহিনী ও ইতিহাস-বাস্তবতাকে পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন—এমনই কঠিন যে এগুলির ওপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে অনেক ঐতিহাসিককেই পদে পদে হোঁচট খেতে হয়েছে, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পারজিটার। পারজিটার সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে *ঋগ্‌বেদ*-এর যুগের ঠিক আগে এক গাঙ্গেয় সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল; তিনি এই বিষয়টি উপেক্ষা করেছিলেন যে ধাতুর প্রচলন না হওয়ায় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সময়কালে গাঙ্গেয় উপত্যকার জঙ্গল হাসিল করাটাই সম্ভব ছিল না। এমনকী বুদ্ধের সময়ও এ অঞ্চল ছিল গহন অরণ্য। ৬৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিউয়েন সাং-কে এই বিশাল অরণ্য পেরিয়ে বেনারসে আসতে ৭০ মাইল হাঁটতে হয়েছিল (স্যামুয়েল বিল, ২.৪৩)। মোটের ওপর, আমরা সন্ধান পাই, এই সময়কার অজস্র জনগোষ্ঠীর—যাদের মধ্যে কিছু থেকে গিয়েছিল অত্যন্ত আদিম, কিন্তু আর্যদের কাছ থেকে শিক্ষা নিচ্ছিল। কোন কোন জনগোষ্ঠী তীর ধনুকের সাহায্যে আত্মরক্ষা করছিল, কখনও বা পরিণতিতে আর্যত্ব গ্রহণও করছিল। কেউ কেউ উপজাতিক মূল কেন্দ্রগুলিকে রাজধানী নগরী বানিয়ে রাজত্ব স্থাপনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। অন্যেরা, যেমন ভাজ্জি (লিচ্ছবি-ও বলা হয়) ও মল্ল-রা তাদের যাযাবর অতীতসহ মুষ্টিমেয় ব্যক্তিশাসনের অধীনে থেকে গিয়েছিল। এই ব্রাত্যদের মধ্যে তখনও পর্যন্ত চতুঃশ্রেণী-বর্ণ প্রথা সহ ব্রাহ্মণ্য প্রাতিষ্ঠানিক ধারণাগুলির অনুপ্রবেশ ঘটেনি, তাই তাদের উপজাতিক গঠন বিশুদ্ধভাবেই রক্ষিত ছিল। ব্রাত্য[১৬] প্রতিষ্ঠানগুলির, বিশেষ করে *অথর্ববেদ*-এ (১৫) যেমন আছে, উর্বরতা সংক্রান্ত লোকাচারগুলির ব্রাহ্মণ্যকরণের চেষ্টা সফল হয়নি। ব্রাত্য কথাটার সংজ্ঞাই রয়ে গেল—যে ব্রাহ্মণ্য আচার মানে না। বুদ্ধ তাঁর পরিব্রজ্যার শেষ পর্যায়ে লিচ্ছবিদের সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা

করেছিলেন। এই মহান শিক্ষক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যতদিন লিচ্ছবিরা তাদের উপজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অনুগত থাকবে ততদিন তারা অপরাজেয়—এবং তারা তা-ই ছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মীয় অনুশাসনগুলি স্বাভাবিক কারণেই গড়ে উঠেছিল এই ধরনের উপজাতিক বিধানগুলির ওপর ভিত্তি করে—কেননা বুদ্ধ এসেছিলেন উপজাতিক শাক্যগোষ্ঠী থেকে এবং জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লিচ্ছবি। এ দেশের এই উপজাতিক ছাপ চার্চের ওপর রোমক সাম্রাজ্যের প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয়। এক ভ্রাম্যমান পশুচারক জীবন—যা থেকে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থান সম্ভব নয়, তার বিরুদ্ধে জাগ্রত প্রতিবাদ এবং সেই সঙ্গে লাঙ্গলচালিত কৃষির অস্তিত্বের কথা এমনকী ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগুলিতেও রয়ে গেছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এর একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদে (৩.১.২.২১) প্রমাণ করা হয়েছে যে গো-মাংস ভক্ষণ পাপ কেননা দেবতারা সমগ্র বিশ্বের কর্মশক্তিকে ভরে দিয়েছেন গরু ও ষাঁড়ের মধ্যে। অনুচ্ছেদের সমাপ্তিতে উপনিষদের প্রভাবশালী ঋষি যাজ্ঞবল্কের স্পষ্ট ঘোষণা: 'তা ভালই, কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি সেটা নরম হয়, আমি খাবো।' সেকালে গোমাংস ছিল ব্রাহ্মণদের এক স্বাভাবিক খাদ্য; *অথর্ববেদ*-এ (১২.৪) বন্ধ্যা গরুগুলি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদের দিয়ে দিতে বলা হয়েছে—কেবলমাত্র তারাই সেগুলি খেতে পারে। যদি কোন (অব্রাহ্মণ) মালিক 'বন্ধ্যা গরু বাড়ীতে রান্না করে, তা উৎসর্গ করা হোক বা না হোক, সে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে পাপকাজ করল এবং একজন প্রতারক হিসেবে স্বর্গ থেকে তার পতন হবে।' অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা তাদের খাদ্যের প্রধান উৎসটিকে সংরক্ষিত করতে চাইছিল এবং সেই অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করছিল ধর্মতত্ত্বকে। অথচ পশুচারক জীবনের অর্থনীতি—যার ওপর ভিত্তি করে খাদ্যাভ্যাস ও লোকাচারগুলি গড়ে উঠেছিল—তা তখন অচল হয়ে পড়েছিল। উপজাতিক ক্ষত্রিয়দের মধ্য থেকে একই কালে একই স্থানে মহান ধর্মীয় শিক্ষকদের আবির্ভাব ঘটছিল; আবার, সঞ্জয় বেলাথ্থিপুত্ত, মক্খালি গোশাল প্রমুখের মতো অজস্র সমতুল সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতারাও তখন ছিলেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে উপজাতিকরা তখন এক বিযুক্তির স্তরে এসে পৌছেঁছিল। সমাজকে পুনর্গঠিত করতে বাধ্য হতে হয়েছিল এই কারণে যে উপজাতিক গোষ্ঠীজীবনকে আর উন্নত করা যাচ্ছিল না। তাই, সবচেয়ে অগ্রবর্তী অংশগুলির কাছে বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সমন্বিত করার জন্য গোষ্ঠী নিরপেক্ষ এক দর্শন এবং ধর্ম (লোকাচার থেকে স্বতন্ত্র)—অর্থাৎ, একটি উপরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল।

খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলি কিভাবে ভাষা ও লোকাচারগুলির ওপর ছাপ ফেলছিল তার একটি উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাধারণভাবে তেল বোঝাতে তৈল শব্দটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত এবং অধিকাংশ ভারতীয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়—যদিও এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'তিল হইতে'। ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত প্রথম উদ্ভিজ্জ ভোজ্য তেল নিষ্কাশন করা হত তিল থেকেই। শেষ পর্বের বৈদিক সূত্রে (*অথর্ববেদ*, ১.৭.২) তিলের (প্রাগার্যদের কাছে পরিচিত) বিচ্ছিন্ন উল্লেখ সন্দেহজনক (তৈলস্য বা তৌলস্য)—যদিও সিন্ধু সভ্যতায় এই শস্যটি পরিচিত ছিল। বৈদিক সমাজে এবং সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে পশুজাত খাদ্যের গুরুত্ব ছিল সমধিক, স্নেহজাতীয় খাদ্য ব্যবহৃত হত কেবলমাত্র আচার-অনুষ্ঠানে। সেই অনুযায়ী পানিনি তিল শব্দটি ব্যবহার করেছেন তিনবার—কিন্তু সরাসরি তৈল নয়। এই পুষ্টিকর দানাটি মনে হয়, প্রথমদিকে চাল ও জই-এর কড়া মন্ডের সঙ্গে ফুটিয়ে খাওয়া হত। অন্যদিকে, *অর্থশাস্ত্র*-এ তৈল শব্দটি ৪১ বারেরও বেশি উল্লেখ আছে, তিল-এর উল্লেখ ৪ বারের বেশি নেই। এ থেকে

বোঝা যায়, অর্থনীতি কিভাবে পশুচারণ থেকে কৃষিতে সরে আসছিল। একইভাবে আমরা পাই, তিলোত্তমা ('তিলের মত সুন্দরী') নামটি; এটি হল স্বর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরীর নাম—যার রূপে দেবতা ও অসুরদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল (*মহাভারত* ১.২৩৩-৪; নামকরণের কারণ ১.২০৩.১৭)। শ্রাদ্ধের তিলাঞ্জলি অনুষ্ঠানে কৃষ্ণতিল এখনও ব্যবহার হয়। এই তিল বীজ (বনজ ও কৃষিজ দুইই হয় (দ্র. *শতপথ ব্রাহ্মণ* ৯.১.১.৩), এক প্রাচীন ধর্মীয় উপচার। সূর্যের উত্তরায়ণের শুরুতে অর্থাৎ বিখ্যাত মকর সংক্রান্তি অনুষ্ঠানে তিলোৎসর্গ হল এক আবশ্যিক প্রথা; ঘটনাচক্রে দেশের শুখা অঞ্চলে এই সময়টাতেই তিলের দ্বিতীয় ফসল ওঠে। এর সঙ্গে পশ্চিমভারতে সুগদ নামে প্রচলিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের সম্পর্ক আছে। এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে নির্মিত ছোট মাটির পাত্রগুলিতে (সু-ঘট) তিল এবং সমস্ত রকমের ঋতুকালীন ফল ভর্তি করা হয়; ঘটগুলির বাইরের দিকে হলুদ এবং লালেব প্রলেপ দিয়ে সজ্জিত করা হয় এবং মেয়েরা সেগুলি পূজা করে। সধবা মেয়েরা নিজেদের মধ্যে এই ঘট উপহার হিসেবে বিনিময় করে। অর্থাৎ, আমরা আবারও আভাস পাচ্ছি সন্তান কামনা সংক্রান্ত প্রাচীন পূর্ণ-কুম্ভ লোকাচারের—যা সেই অর্থে *পুরাণ* বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারবিধিতে ছিল না। আবার, রাশিচক্রের দ্বাদশ বিভাগ (এবং নির্দিষ্ট চিহ্ন) পুরাতন ভারতীয় পঞ্জিকায় অনুপস্থিত—যা থেকে বোঝা যায় উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদক মানসিকতার উপযোগী হয়ে উঠলে কীভাবে নতুন লোকাচার প্রতিষ্ঠা পায়। পরের দিকে, নারকেল সমস্ত ধরনের অনুষ্ঠানে তার জায়গা করে নিয়েছে এবং পশ্চিমভারত—যেখানকার দীর্ঘ সমুদ্রোপকূল থেকে অন্তত দুই শতাব্দী আগে এটির উদ্ভব ঘটেছে—সেখানে এর জন্য একটি উৎসবের দিনই নির্দিষ্ট আছে (আগস্টের পূর্ণিমায়)। লক্ষ্যণীয় যে, পর্যায়ক্রমিক ফসল বা মোটা দানার শস্য (যেমন, জোয়ার)-এর মতো কৃষিক্ষেত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলি লোকাচারের ওপর বিশেষ ছাপ রাখেনি। পর্যায়ক্রমিক শস্য বপন ছিল খুব সম্ভবত প্রোটিনের যোগানের আনুষঙ্গিক। অস্ত্র ব্যবহার বা গোমাংস ভক্ষণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জমিতে কড়াইশুঁটি, ছোলা, সিম, বরবটি ইত্যাদি প্রোটিনযুক্ত ফসলের উৎপাদনকে জরুরি করে তুলেছিল। শুঁটিওয়ালা এই সমস্ত ফসলগুলি জমিতে নাইট্রোজেন জমা করে এবং খেতের ধান উঠে যাওয়ার পর চাষ করা যায় (দ্র. *অর্থশাস্ত্র* ২.২৪)। মূল খাদ্যশস্যটির চাষ হয় বর্ষায় এবং সম্পূরক অন্য অধিকাংশ শস্যই শীতের; চমৎকার আবহাওয়ার জন্যই এটা সম্ভব (সেচের সাহায্যে এমনকী তৃতীয় ফসলও)। পর্যায়ক্রমিক চাষ দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ বা পূর্বপরিকল্পনা থেকে আসেনি—বরং তা নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস ও অর্থনীতিরই ফলশ্রুতি, বিশেষ করে যেখানে চালই ছিল প্রথম মুখ্য শস্য এবং যার সঙ্গে কেবলমাত্র মাছ, মাংস বা শুঁটি শস্যগুলি যুক্ত হলেই সুষম খাদ্য হয়। মোটা দানার খাদ্যশস্যগুলি স্থানিক উৎপাদন এবং প্রধান শস্যের সম্পূরক হিসেবে আদিবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।

জায়মান সমাজ আর্যদের সমস্ত হাতিয়ার ও কৌশলকে অধিগত রেখেছিল এবং সেই সঙ্গে চলার পথের অর্জনগুলিকেও। *অথর্ববেদ*-এ (৩.১২) খাল কেটে নদীর জল প্রবাহিত করা সংক্রান্ত আচারের কথা বলা হয়েছে; ছয় বা আট বলদ জোয়ালে জুতে হাল করার কথাও (৬.৯১.১) বলা আছে। কৃষিকাজের জন্যে মহিষকে পোষ মানানো হয়েছিল। এই কার্যকর এবং একান্তভাবেই ভারতীয় প্রাণীটি ছাড়া গাঙ্গেয় উপত্যকাকে কৃষিকাজের আওতায় আনা সম্ভব ছিল না—কেননা সেখানকার অধিকাংশ জমিই তখন ছিল নিশ্চিতই জলাভূমি। তা সত্ত্বেও, এই

প্রাণীটি আমাদের শাস্ত্রগুলিতে স্থান পেল না—কেবলমাত্র মৃত্যুর দেবতা যমরাজার বাহন এবং রক্তপিপাসু দেবী কালীমাতার হাতে নিহত অসুরের এক ছদ্মরূপের মধ্যে ছাড়া। ঘোড়ার ব্যবহার ছিল ব্যক্তিগত পরিবহন এবং যুদ্ধে—যদিও ঐতিহ্যবাহী রথ ছিল অনেক বেশি অভিজাত; অশ্বমেধের গুরুত্বের কথা আমরা আগেই বলেছি। যুদ্ধের জন্য হাতিকেও পোষ মানানো হয়েছিল—যদিও শাস্ত্রে তার ছাপ নেই। হাঁস, মুরগী, শূকর—এসব ছিল গৃহপালিত, অবশ্য অর্থনীতিতে এগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। ঘরবাড়ি অধিকাংশই ছিল কাঠ এবং উলুখড়ের—ফলে ব্রাহ্মণকে কোন গৃহদান করলে স্থানান্তরের সময় সেগুলি খুলে নিয়ে যাওয়া যেতে পারত (*অথর্ববেদ* ৯.৩)। তা সত্ত্বেও, যজ্ঞবেদী নির্মাণের কাজে ইঁটের ব্যবহার দীর্ঘদিন আগে থেকেই চলে আসছিল এবং এ সময়ও মজবুত গঠনের জন্য পাথরের সঙ্গে সাধারণভাবে তা ব্যবহৃত হত। মানুষ চাষ করত তার পারিবারিক জমিতে—যা ছিল উপজাতিক বা অন্য কোন সম্প্রদায় গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তার অচ্ছেদ্য অধিকার এবং এই ধরনের গোষ্ঠী সদস্য হওয়ার এক স্বীকৃতিও বটে। অবশ্য এক নতুন ধরনের ভূমি মালিকানাও জন্ম নিচ্ছিল—কেননা ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কোন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, যদিও তারা নিজেরাই চিরকাল একটা জাতগোষ্ঠী। তাদের যজ্ঞার্জিত উপহার, একবার পাওয়া হয়ে গেলে, আর গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকত না; বসতিস্থাপনকারীদের প্রদেয় বশ্যতা-করও তাদের দিতে হত না। ফলত তাদের সম্পত্তি, এমনকী যখন অন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যৌথও হত তখনও গোষ্ঠী সম্পত্তির চেয়ে ভিন্ন ধরনের হত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তার এক শতাব্দী আগেই নিয়মিত রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ঘটেছিল—যা মগধ থেকে তক্ষশীলা এবং পারস্য, এই সমস্ত গতিপথ জুড়ে এক নতুন ধরনের বাণিজ্য-সম্পর্কের অস্তিত্বেরই ইঙ্গিতবাহী। সমাজ অবশ্য নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যাপক পণ্য উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যায়নি; তার প্রথম কারণ, অদ্ভুত স্বনির্ভর ভারতীয় গ্রাম—পরে যেটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সব যুগেই অজস্র অনুন্নত অঞ্চল থেকে গিয়েছিল—যদিও গোষ্ঠী-উদ্যোগ ছাড়া কোন ব্যক্তি মানুষের পক্ষে সেখানে উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা বন্য পশু ও আদিবাসী মানুষদের বাধায় দুরূহ ছিল। এটা অবধারিতই ছিল যে উৎপাদনের নতুন বিকাশ নতুন মতাদর্শের সন্ধান করবে—যা ব্যক্ত হয়েছিল ধর্মের মধ্য দিয়ে। এটাও অবধারিত ছিল, রাষ্ট্র—যা নদীর গতিপথ এবং ধাতুর মতো একমাত্র পণ্য সরবরাহের পথকে নিয়ন্ত্রণ করবে—হয়ে উঠবে অন্য সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। ধাতু চেনাটাই শুধু যথেষ্ট ছিল না,সমস্যাটা ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে তা পাওয়া, তার নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগিয়ে লোকজনকে শাসনাধীন রাখা, ধাতব হাতিয়ারের সাহায্যে ইউ পি-বিহারের জঙ্গল হাসিল করা এবং এইভাবে ভারতবর্ষের সর্বোৎকৃষ্ট জমি থেকে এক নতুন ও অধিকতর উদ্বৃত্ত উৎপাদন করানো।

বিখ্যাত পূর্ব-বাণিজ্যপথটি গিয়েছিল রাজগীর থেকে উত্তরে গঙ্গার দিকে এবং পাটনার উত্তরে তা গঙ্গার সঙ্গে মিলেছিল। আর একটি শাখা গিয়েছিল বিপরীত দিকে গয়ায়। নদীকে পিছনে ফেলে মল্ল অধ্যুষিত (এবং যেখানে শেষ প্রব্রজ্যার কালে বুদ্ধের দেহান্তর ঘটে) কুশিনারা (কাশিয়া)-র ভিতর দিয়ে, লিচ্ছবিদের সদরঘাঁটি বৈশালীকে (বাসারা) ছুঁয়ে চলে গিয়েছিল বুদ্ধের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত অশোকের রুম্মিনদেই স্তম্ভের কাছাকাছি নেপালের তরাই অঞ্চলে; শাক্যদের রাজধানী কপিলাবস্তু এই স্থান থেকে খুব দূরে নয়। সেখান থেকে রাস্তাটি ঘুরে গিয়েছিল পশ্চিমে, সে যুগের অগ্রণী রাজ্য কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী হয়ে দিল্লি-মথুরা

অঞ্চলের দিকে। এই বাণিজ্যপথটি পাঞ্জাব পেরিয়ে তক্ষশীলায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা নিশ্চিতই দক্ষিণে গিয়েছিল—সম্ভবত শ্রাবস্তী থেকে কোশাম্বী (সংস্কৃত কৌশাম্বী, যমুনা নদীর তীরে এ কালের কোশাম)-র মধ্য দিয়ে উজ্জয়িনীর দিকে—যে উজ্জয়িনী বন্য দক্ষিণী উপজাতিদের মধ্যে বাণিজ্যকে সামান্য প্রসারিত করার এক যথার্থ কেন্দ্র ছিল। শাস্ত্রোল্লিখিত দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বাণিজ্যপথটি গিয়েছিল ভিলসা এবং মহেশ্বরের ভিতর দিয়ে পাইথনে (*সুত্ত নিপাত* ১০৪.৩)। এ বিষয়েও প্রণালীবদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন দরকার। সতর্কতার সঙ্গে বেছে নিয়ে মাত্র গোটা বারো খননস্থল থেকে মাটির মূল স্তরে পৌঁছলে এমন অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব যা লিখিত শাস্ত্রগুলিকে কল্পকাহিনীর কবল থেকে বাঁচাবে। নিবিড় আকাশ পর্যবেক্ষণ থেকে, মাঝে মঝে কিছু ফাঁক সমেত, পুরো পথটি নজরে আসবে। জলপথ—যা স্থলপথের সম্পূরক হিসেবেই প্রথমে এসেছিল তা-ই শেষে পূর্বতনের পুরোপুরি অবসান ঘটায়; গঙ্গাতীরের বেনারস হয়ে ওঠে প্রথম যুগের বন্দর। বৌদ্ধযুগের আগেই সমুদ্র পরিবহণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। অধিকতর উদ্যোগী বণিকরা নদীপথ বেয়ে মোহানায় আসত এবং সেখান থেকে এগিয়ে যেত উপকূল বরাবর।

৫.৯ সমগ্র *তৈত্তিরীয় সংহিতা,* যা এখন শুধুই অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিপুল বাড়বাড়ন্তের নিদর্শন হিসেবে প্রতীয়মান তা আসলে ছিল এক যন্ত্রণাদায়ক মূলগত প্রয়োজনীয়তারই প্রতিফলন—অপ্রতুল উৎপাদন ব্যবস্থাজাত খাদ্যাভাব। ইউরোপে, এমনকী পাথরের কুঠার ঠিকভাবে ব্যবহারের কালেও ঝুমচাষ পদ্ধতির প্রচলন থেকেছে (জে ইভারসেন, *সায়েন্টিফিক আমেরিকান,* মার্চ ১৯৫৬, ৩৬-৪১); মৌসুমী বৃষ্টিভেজা ভারতের মাটিতে কাটা গাছের গোড়া থেকে নতুন শাখা গজিয়ে ওঠে, নিম্ন উপত্যকার জমিও জঙ্গলমুক্ত করা যায় না। নিউ গিনি বা দক্ষিণ আমেরিকার অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে উচ্চভূমি হয়ত পাথরের হাতিয়ার দিয়ে হাসিল করা যায়, কিন্তু ভূমিক্ষয় রোধ করা যায় না। যজুর্বৈদিক ভারতে খাদ্য-সংগ্রহটা গুরুত্বপূর্ণই থেকে গিয়েছিল (*রাউ,* ২১.৪)। 'গ্রাম' কথাটি তখনও মুখ্যত ভ্রাম্যমান পশুপালকদের সাময়িক বাসভূমি হিসেবেই প্রযুক্ত হত (*রাউ,* ৫১.৪)—যেখানে তারা বছরের কয়েকটা মাস থাকত; এবং সেখানকার অধিকাংশ জমিই ব্যবহৃত হত এই মরশুমি মানুষ ও পশুপালের থাকার জন্য—যারা পূবদিকে চলে যেত, আবার ফিরে আসত। যখনই ভ্রাম্যমান কোন দুটি গোষ্ঠী মুখোমুখি হত, তিক্ত লড়াই বেধে যেত। 'সংগ্রাম' শব্দটির অর্থ, এমনকী পরবর্তীকালের সংস্কৃত ভাষাতেও হল 'যুদ্ধ'। মনে হয়, তখন কোন নগরী গড়ে ওঠেনি, সজাত জ্ঞাতিগোষ্ঠী মিলে তাদের নিজস্ব নেতার (*গ্রামীণ*) অধীনে গ্রাম পত্তন করত। এই নেতা অধীনস্থ থাকত মূল রাজার (*রাউ,* ৫৫.৭)। সে ছাড়াও, কোন স্থায়ী বসতিতে রাজা সাধারণত একজন 'গ্রামীণ' (*রাউ,* ৫৭) নিয়োগ করত—যে ছিল সজাতদের নিজস্ব সরকারের প্রতিনিধি. এই গ্রামীণরা হত হয় ক্ষত্রিয়, না হয় ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ গোষ্ঠীর অভ্যন্তরের শ্রেণী বিভাজনের বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল জাতের মধ্যে দিয়ে—যেখানে শূদ্রদের সমূহ শোষণ এবং প্রায় একইভাবে বৈশ্যদের সম্পূর্ণ দমিত রাখা হত। যে অর্থেই হোক না কেন, জাতনিরপেক্ষভাবে গোষ্ঠীর মধ্যেকার উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীকে বোঝাতে 'শ্রেয়স' ও 'পাপিয়স' শব্দদুটি ব্যবহৃত হত (*রাউ,* ৩২-৩৪) এবং পৃথক জাতের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে তখনও একটা নমনীয়তা ছিল বা জাত পরিবর্তনও সম্ভব হত। দলপতি কোনভাবেই একচ্ছত্র শাসনকর্তা হতে পারত না বরং প্রায়শই তাদের নির্বাসনে যেতে হত (*রাউ,* ১২৮)। 'দরবার'-এর

একটি পদের নাম ছিল ভা-গদুঘ—যার কথা পরে পুরোপুরিই ভুলে যাওয়া হয়েছে; কিন্তু অর্থটা বোধগম্য থেকে গেছে যে এই ব্যক্তি উপজাতিক প্রথা অনুযায়ী বলির উৎসর্গ থেকে দলপতিকে প্রদেয় উপহার ভাগ করে দিত। 'সভা' বলতে বোঝাত জমায়েতের স্থান, দ্যুতকক্ষ ইত্যাদি—যদিও গণতান্ত্রিক সমাবেশ (পরিষদ)-এর কার্যকারিতা ক্রমশই কমে আসছিল (*রাউ,* ৭৫-৮৩)। '*জনপদ*' বলতে তখন কোন স্থায়ী গোষ্ঠী অঞ্চলের চেয়ে সঠিকভাবে গোষ্ঠীকেই বোঝাত (*রাউ,* ৬৫-৬)—যা নিয়ত ভ্রাম্যমানতারই লক্ষণ। সশস্ত্র ক্ষত্রিয় প্রহরায় পশুর কাঁধে মাল চাপিয়ে দল বেঁধে বর্বর গোষ্ঠী অধ্যুষিত বনাঞ্চল পার হয়ে বাণিজ্যে যাওয়া হত (*রাউ,* ৩০)। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলির দুরূহতা সন্দেহাতীতভাবে এই সাক্ষ্যই বহন করে যে আরও বেশি উৎপাদনক্ষম এক নতুন সমাজ পুনর্গঠনের তাগিদটা অনুভূত হচ্ছিল।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ :

১. জাতিবিদ্যা এবং একটি পরিচ্ছন্ন ভাষাগত সমীক্ষার জন্য দেখুন Renou-Filliozat-এর *লা ইন্ডে ক্লাসিক*-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পি মেইলি-র রিপোর্ট।

২. *সেনসাস অফ ইন্ডিয়া,* ১৯৩১, ভল্যুম-১, পার্ট-৩-এ বি এস গুহ সবচেয়ে সাম্প্রতিক বিন্যাসটি দেখিয়েছেন। পি সি মহলানবীশ, ডি এন মজুমদার, সি আর রাও-দের করা ইউ পি বিশ্লেষণেও তিনটি গোষ্ঠীই বিদ্যমান। ১৯৪১-এর মাপগুলি দেওয়া আছে *সংখ্যা,* ভল্যুম-৯, ১৯৪৮-৪৯, পৃ. ৯০-৩২৪-এ। আমার সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল *সোভিয়েটস্কায়া এথনোগ্রাফিয়া,* ১৯৫৮, সংখ্যা-১, পৃ. ৩৯-৫৭ (ইন্ডো-আরিস্কিট নোসোভয় উকাজাটেল)। সেখানে আমি দেখিয়েছিলাম যে উপাত্তগুলির পক্ষপাতিত্ব বা অপর্যাপ্ততার কথা বাদ দিলেও এই পর্যবেক্ষকদের অনুসৃত জাতিবিদ্যার যে পদ্ধতি তা দিয়ে অর্থনৈতিক গোষ্ঠী এবং জাতগোষ্ঠীকে পৃথক করা যায় না।

৩. *ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ ইন অনার অফ কারসেটজি এরাচজি পরভি* , লন্ডন, ১৯৩৩, পৃ. ৩০৫-৩৩৫-এ বি নিকিতিন-এর 'নোটস্ সুর লে কুর্দে' শীর্ষক লেখাটিতে মার পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে।

৪. অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা—এর প্রতিটিরই অর্থ 'মা'। এই ত্রয়ীর উল্লেখ আছে *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ৭.৪.১৯-এ। অম্বিকার একক উল্লেখে *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-র ১.৮.৬-এ বলা হয়েছে যে তিনি হলেন রুদ্রের ভগিনী। একই স্তোত্রে ঠিক এর পরেই এসেছে দেবতা ত্রিয়ম্বক-এর উল্লেখ।

৫. 'শালিগ্রাম'—যা একধরনের প্রস্তরীভূত শম্বুক এবং বিষ্ণুর প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহদেবতার পূজারী ব্রাহ্মণদের কাছে রক্ষিত হয়—যথার্থ পবিত্রতার জন্য সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে তা গন্ডক নদীতেই মেলে। সংস্কারটি হয়ত *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এর অনুচ্ছেদটির মতই প্রাচীন।

৬. নববাস্ত্ব বৃহদ্রথ নামটি একজন রাজার না দু'জন আলাদা রাজার—তা স্পষ্ট নয়। আবার, এই ব্যক্তি (দ্বয়) ইন্দ্র বৈকুণ্ঠের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন না ধ্বংস হয়েছিলেন (*ঋগ্বেদ,* ১০.৪৯.৬) তা-ও পরিষ্কার জানা যায় না।

৭. *মহাভারত* (২.১৮.৩০) অনুসারে ভীম এবং কৃষ্ণ গোরথ-গিরি থেকে পুরাতন রাজগীর (= গিরিব্রজ) দর্শন করেছিলেন। বরাবর পাহাড়ের শিলালিপির সঙ্গে নামটি অপ্রত্যাশিতভাবে মিলে গেছে। দ্রষ্টব্য ঃ ভি এইচ জ্যাকসনের রিপোর্ট, *জার্নাল অফ বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি,* খণ্ড-১, পৃ. ১৫৯-১৭২।

৮. এটি ভি এস সুক্‌থাঙ্কর-এর একটি মহৎ আবিষ্কার। প্রকাশিত হয়েছিল *অ্যানালস অফ দি ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট,* খণ্ড-১৮, পৃ. ১-৭৬-এ 'এপিক স্টাডিজ VI' (নির্বাচিত সংকলন, সুক্‌থাঙ্কর স্মারক সংস্করণ, পৃ. ২৭৮-৩৩৭) শিরোনামে। মূল গ্রন্থে অনাবশ্যকভাবে বারবার পরশুরামের উল্লেখ এসেছে, কমবেশি গর্বস্ফীতির অনুপাতেই। সুক্‌থাঙ্কর তাঁর নল উপাখ্যান (*ফেস্টসখ্রিফট,* এফ ডব্লিউ টমাস, ২৯৪-৩০৩, স্মারক সংস্করণ ৪০৬-৪১৫) গবেষণাতেও দেখিয়েছেন যে *রামায়ণ* রচিত হয়েছিল খুব সম্ভব, *ভারত* থেকে মহাকাব্য *মহাভারত*-এ রূপান্তরণের মধ্যবর্তী বিরতি পর্বে।

৯. কে পি জয়সোয়াল তাঁর *হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া ১৫০ এ ডি টু ৩৫০ এ ডি* (লাহোর, ১৯৩৩) গ্রন্থে বলেছেন যে নাগ শাসন এতই বিরল ছিল যে কার্যত তা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বিন্ধ্য অঞ্চলে এবং সম্ভবত ঐ সময়েই মথুরা অঞ্চলে কিছু নাগ রাজা ছিল (প্রথম ও শেষজন সম্পর্কে জানা গেছে)। পারজিটার এদের শাসনের কথাই শুধু উল্লেখ করেছেন।

১০. *মহাভাগ* ১.৬৩ (*স্যাক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট* ১৩, পৃ. ২১৭-৯)। প্রকৃত প্রশ্নটা হল, 'তুমি কী মনুষ্য'—যার অর্থ কোন শিক্ষানবিশের নাগ হওয়া উচিত নয়; ভাষ্য থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

১১. পান্ডবদের বহুপতিত্ব প্রথা থেকে মনে হয় যে তারা ছিল তিব্বতীয় আক্রমণকারী। অবশ্য অত্যন্ত অনুমাননির্ভর এই ধারণার সপক্ষে জানা নেই যে মহাভারতের কথিত যুদ্ধের সময়কাল অর্থাৎ ৩১০১ খ্রী.পূ. এবং ১০০০ খ্রী.পূ.-এর মধ্যবর্তীকালে তিব্বতীয়রা অন্যদেশ আক্রমণ করার মতো অবস্থায় আদৌ পৌঁছেছিল কিনা। বহুপতিত্ব এবং বহুবিবাহ এ দুটি প্রথাই আসলে গোষ্ঠী বিবাহেরই পুনর্জীবন; নিঃসন্তান বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বাধ্যতামূলকভাবে বিবাহ করার প্রথা, *ঋগ্বেদ*-এ ১০.৪০.২ যার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—সেটিও একই ধরনের। 'স্ত্রী'-র একটি সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল 'দারা'; এটি বহুবচন, এমনকী যখন এক ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় তখনও।

১২. এফ ই পারজিটার-এর *ডাইনাস্টিস অফ দি কলি এজ*-ই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকরী বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ—যেখানে রাজতালিকা সমন্বিত সমস্ত পুরাণের সংগ্রহ থেকে ইতিহাসের কেন্দ্রীয় বিষয়টি পাওয়া যায়। তবু, এর যতটুকু অংশ ব্যবহার করা হয়েছে তা কেবলমাত্র এই কারণেই যে সেগুলি মুদ্রা ও খোদাই-এর দ্বারা সমর্থিত।

১৩. সপ্তম *নির্ণয়সাগর* সংস্করণ, পৃ. ৩৯, বোম্বে, ১৯৪৬। ব্যাখ্যাকার নিশ্চিত যে 'ব্রত' শব্দটি খাওয়া অর্থেই ব্যবহৃত হত ঃ 'কুক্কুটানাম ব্রতম ভক্ষণম যেন কৃতম...' এবং সেইসঙ্গে কুক্কুটব্রতম নিয়মাবিশেষঃ; ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচরণসম্মত আহার বলতে যা বোঝাত তা তখন বৈদিক পর্বের গোমাংস ভক্ষণ থেকে অনেকখানি সরে এসেছে।

১৪. তক্ষশীলা ছিল সংস্কৃত চর্চার এক প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন কেন্দ্র। কথিত হয়েছে যে, পসেনাদি-র মতো রাজপুত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য সেখানে পাঠানো হত; এমনকী, *জাতক* ৪৯৮ অনুসারে, কোন চন্ডালও সেখানে গিয়ে নিজেকে ব্রাহ্মণ করে নিতে পারত। এর নিহিতার্থ, মনে হয়,

ছাত্রদের তখন জাতপ্রশ্নে বিব্রত না করেই গ্রহণ করা হত। জাতের বিষয়টা তখন খুব একটা অনড় ছিল না—যদিও ব্রাহ্মণরা মাঝে মাঝে তেমনটা চাইত। সত্যকাম জবালাকে হরিদ্রুমত গোতম শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছিলেন (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৪.৪)—যদিও তাঁর মা, গোত্র তো দূরের কথা, সত্যকামের প্রকৃত পিতা কে তাই জানতেন না। উপনিষদগুলিতে ব্রাহ্মণ গুরুদের পরিচিতিতে মাতৃপরিচয় জানানো হয়েছে—যা থেকে আবারও প্রমাণ হয় যে ঐতিহ্যগুলো তখনও দানা বাঁধেনি। পিতৃতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু উপাদানকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করাও হয়নি—যার অর্থ, ব্রাহ্মণরা এমনকী এই পর্বেও সবে আর্যরীতির মধ্যে প্রবেশ করছিল। আবার, এই অব্যবহার যখনই সম্ভব হয়েছে তখনই করা হয়েছে— এমনকী পরবর্তীকালেও।

১৫. *ঋগ্বেদ*-এর প্রথম উক্তি ছিল ঃ অগ্নিম ইলে পুরোহিতম; এর ক্রিয়াপদ 'ইল' শব্দটি মনে হয় আর্যদের নয় এবং হতে পারে, এর সঙ্গে আসিরীয় 'ইলু' (দেবতা বা রাজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সম্মানসূচক পদবী) শব্দটির সম্পর্ক আছে। আসিরীয় দনু = বীরত্বব্যঞ্জক—যা থেকে দানব শব্দটি এসেছে। কথা হল, আসিরীয় ভাষার বিষয়টা আগে কেন খতিয়ে দেখা হয়নি? হার্ভার্ড-এর অধ্যাপক লিও উইনার-এর ১৯১৩ বা তার আগের লেখা অপ্রকাশিত নোটগুলি থেকে জানা যায় যে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়-র সঙ্গে সংস্কৃত ও দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলির যথেষ্ট মিল আছে. যদিও এই মিল থেকে বিশেষ কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায় না, কিন্তু তা একটা প্রণালীবদ্ধ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র হতে পারে—অবশ্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করার পর বিপরীত ফল পেলেও যাঁরা ভেঙে পড়বেন না কেবলমাত্র তাঁদের কাছেই। কিন্তু এই মিল থেকে যে মুখ্য প্রশ্নটা জেগে ওঠে তা হল ঃ কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, কীভাবে নির্ণয় করা যাবে যে অভিবাসন পর্বে বহির্ভারতীয় (ধরা যাক, মেসোপটেমিয়ার) কোন প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য সংযোগকালে আর্যদের কিছু জনগোষ্ঠী 'আর্য নয়' এমন কোন উপাদান গ্রহণ করেছিল কি না? না কি সে উপাদান আসলে ভারতীয় কোন প্রাচীন সভ্যতার (সিন্ধু উপত্যকার) প্রাণস্পন্দন? বর্তমানে আমাদের হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার মতো যথেষ্ট তথ্য নেই। প্রচলিত মনোহর অনুমানগুলিও প্রকৃত সত্যটাকে গোপন করে যে উৎপাদন-উপায়গুলির কারণেই এই ধরনের ব্যতিক্রমী শব্দ, বৈশিষ্ট্য বা সংস্কারগুলির গ্রহণ ও পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছিল। যেমন, অনুমান করা হয় যে বিখ্যাত আক্কাডিয়াম বিজেতা সায়গন (২৪০০ খ্রী.পূ. নাগাদ) এবং পৌরাণিক 'বিশ্ব সম্রাট' সাগর অভিন্ন; কিন্তু এ অনুমান অর্থহীনই থেকে যায় যদি না এর সমর্থনে কোন লিখিত বংশবৃত্তান্ত উদ্ধার করা যায় অথবা দেখানো যায় যে কেন সারগন যুগের উৎকৃষ্ট প্রয়োগগত অর্জনগুলির প্রচলন ভারতবর্ষে ঘটল না।

১৬. জে ডব্লিউ হাউয়ের-এর *দার ব্রাত্য* (খণ্ড-১, স্টুটগার্ট, ১৯২৭। অন্য কোন খন্ড যদি প্রকাশিত হয়েও থাকে আমি পাইনি) গ্রন্থের 'die vratya als nichtbrahmanische Kultgenossenschaften arischer Herkunft' শিরোনামাঙ্কিত লেখাটিতে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। যদিও সূত্রগুলি রীতিসম্মতভাবেই সংগৃহীত হয়েছে,কিন্তু লেখক 'আর্য' বা 'ব্রাত্য'-র মতো শব্দগুলির অর্থের ক্রমপরিবর্তনীয়তার দিকটি লক্ষ্য করেননি। পতঞ্জলি-র সময়ে মনে হয়, 'ব্রাত' বলতে বোঝাত অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম বা সমবেত কৌশল-এর সাহায্যে জীবনযাপনকারী গোষ্ঠী—যারা গোষ্ঠীপতি ও গোষ্ঠীকাঠামোকে রক্ষা করে চলত (দ্রষ্টব্য, পতঞ্জলি-র ব্যাখ্যা ৫.২.২১)। 'ভ্রাম্যমান' বা 'যাযাবর'-এর আসল অর্থ বলতে, যতদূর জানা যায়, বোঝাত কেবলমাত্র সেই গোষ্ঠীদের যারা কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে কোন জমিতে স্থায়ী বসতি গড়ত না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মগধের উত্থান

৬.১ নতুন প্রতিষ্ঠান ও সূত্রসমূহ
৬.২ উপজাতি এবং রাজতন্ত্র
৬.৩ কোশল ও মগধ
৬.৪ উপজাতিক ক্ষমতার ধ্বংসসাধন
৬.৫ নতুন ধর্মমতসমূহ
৬.৬ বৌদ্ধধর্ম
৬.৭ পরিশিষ্ট : ছাপ-চিহ্নিত মুদ্রা

যে সংগঠনের সাহায্যে আর্যরা সিন্ধুর প্রাচীন নগর সভ্যতাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল সেই সংগঠনই সম্ভব করেছিল উষর জনশূন্য অঞ্চল ভেদ করে তাদের পূর্বাভিমুখী অগ্রসরণ। প্রধান দুই বর্ণ নিয়ে গঠিত তাদের নবীন, পুনর্বিন্যস্ত সমাজের অধিগত ছিল শূদ্রদের শ্রমশক্তি—যা না থাকলে পশুচারণ ও কৃষির জন্য জঙ্গল হাসিলে আসল লাভ কিছুই হত না। আবার, উচ্চবর্ণের মধ্যেকার বর্ণ-শ্রেণী বিভাজন, কোন ক্রীতদাস-সমন্বিত সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় বাহুবল ও সতর্ক প্রহরা ছাড়াই, উদ্বৃত্ত-উৎপাদনকে বাড়াতে পেরেছিল—গ্রীস বা রোমে যা হয়নি। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই পাঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত দীর্ঘ বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূখণ্ডে ভারতীয় বসতিগুলি ছড়িয়ে পড়েছিল; যদিও বসতিস্থাপনকারীদের ধরন ও অগ্রগতির মাত্রার মধ্যে পার্থক্য ছিল স্পষ্ট—তবু, এক সাধারণ ভাষা ও ঐতিহ্যের কারণে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আন্তঃক্রিয়াও সম্ভব হয়েছিল অনেকটাই। এতদ্‌সত্ত্বেও জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরের সেই সমাজ-সম্পর্কগুলি—যা একদা সম্ভব করেছিল প্রথম বসতিস্থাপন—এই স্তরে এসে দেখা গেল নতুন অগ্রগতির পথে সেগুলিই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা ভাঙতে হবে। এক দৃষ্টান্তমূলক অভিনব সমাজ-রূপের আকাঙ্ক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হল ৫২০ (বিম্বিসার কর্তৃক অঙ্গ বিজয়ের কাল) থেকে ৩৬০ (মহাপদ্ম নন্দ কর্তৃক আর্য জনগোষ্ঠীগুলির ধ্বংসসাধন) খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে—যদিও এই উভয় সনই আনুমানিক। সেই আলোড়ন থেকে সবচেয়ে বেশি অগ্রগমন ঘটল মগধের (বিহার)—পরিণতিতে যা গোটা দেশ জুড়ে বিস্তার করল মাগধী ধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) এবং মগধ সাম্রাজ্য। এ দু'য়েরই প্রভাব অনুভূত হয়েছিল সীমান্তের বাইরেও; দেশের ভিতরে, ধর্মীয় পদ্ধতি (যা কিছুটা সচেতনভাবেই প্রযুক্ত) ও সাম্রাজ্য রেখে গিয়েছিল এক অনপনেয় ছাপ।

৬.১ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে দেখা গেল ইতিহাসের ভরকেন্দ্র ইতিমধ্যেই পাঞ্জাব থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সরে এসেছে। কোন গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ পরিবর্তন পাঞ্জাবে আর ঘটছিল না। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর দারিয়ুস কর্তৃক বিজিত হয়ে সপ্তনদের (ততদিনে অবশ্য পঞ্চনদ) দেশ পরম্পরাগত ইতিহাসের ধারায় চলে এসেছিল। তাঁর শিলালেখ তালিকায় কম্বুজীয়, গান্ধার, হিন্দুশ নামগুলি রয়েছে—অর্থাৎ পূর্বতন আর্য-বসতিগুলিকে কুক্ষিগত করে তাঁর সাম্রাজ্য আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দারিয়ুস ও জেরেক্স-এর সেনাদলে পশ্চিম পাঞ্জাব (হিন্দুশ) থেকে সৈন্য সংগ্রহ ও নিয়োগ করা হত। এর ঠিক প্রান্তেই ছিল তক্ষশীলা নগরী—যেখানে সম্ভবত পারসিকরা বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ নামমাত্র কর দিত (যখন শাসকরা তা আদায় করতে পারত)। এই তক্ষশীলা ছিল স্থিত পারসিক সাম্রাজ্য ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিকাশমান রাজত্বের মতো দুই সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অঞ্চলের আন্তর্বাণিজ্যের বিখ্যাত কেন্দ্র। পাঞ্জাবের বাকি অংশ পড়েছিল বৈদিক স্তরে—শুধু পুরুদের মতো কিছু উপজাতি ছাড়া; তারা কিছুটা প্রসার ঘটিয়েছিল, যার ফলে আলেকজান্ডারের সময়ের আগেই রাজ্যস্থাপন সম্ভব হয়েছিল। তক্ষশীলা এবং অপেক্ষাকৃত ছোট পিউকেলাওটিস (পুষ্করবতী, পদ্ম-পুষ্করের নগরী, আধুনিক চারসাড্ডা)-এর মতো কেন্দ্রগুলির কথা বাদ দিলে বাকি নগরীগুলি ছিল উপজাতিক সদরকেন্দ্র বা বড় মাপের গ্রাম। এদের কোনটিকেই আয়তন ও পরিকল্পনার দিক থেকে মোহেঞ্জোদারো বা হরপ্পার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা এই সময় পশুচারণ ও কৃষি-উৎপাদন (লাঙ্গল ও ছোট ছোট সেচ খালের সাহায্যে), এবং সম্পূরক বাণিজ্যের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আগের চেয়ে অনেক উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত।

এ সময়কার দক্ষিণ উপদ্বীপ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সেখানে তখন শেষ প্রস্তরযুগের বন্যতা; কাল-অনির্ণীত কিছু ক্ষেত্রে ইতস্তত ধাতুর ব্যবহার সবে মাত্র শুরু হয়েছে। অন্তত অন্ধ্র উপকূলের কিছু নদী উপত্যকায় পশুচারক জীবন নিশ্চিতই বিস্তারলাভ করেছিল। কিছু উদ্যমী বণিক বা ক্বচিৎ কোন অভাবী ব্রাহ্মণ হয়ত বিহার থেকে দক্ষিণে চলে গেছে—কিন্তু তা-ও বড়জোর মধ্য গোদাবরী নদী অঞ্চল পর্যন্তই। সুতরাং, আমাদের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত রাখতে হবে গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রবর্তনাগুলির প্রতিই—যেগুলি সম্পর্কে পাঞ্জাব বা দক্ষিণের চেয়ে অনেক বেশি জানা গেছে। এই প্রবর্তনাগুলিই, বিকাশের স্বাভাবিক গতিপথ বেয়ে, পৌঁছে দিয়েছিল এক যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে—যার ফলে, এই অঞ্চলেই, মৌর্য্য রাজাদের অধীনে, প্রথম জেগে উঠেছিল এক বিশাল 'সর্বব্যাপী রাজতন্ত্র'।

এই পর্ব সম্পর্কে আমাদের প্রধান সূত্র হল বৌদ্ধ পুঁথিগুলি এবং সেগুলির পরিপূরক *পুরাণের* রাজবংশতালিকা ও কিছু জৈন নথি। বৌদ্ধ কালানুক্রমিক বিবরণী *মহাবংশ-কে* সিংহলে বারবার সর্বাধুনিক রূপ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর কালপঞ্জিতে প্রায় ৬০ বছরের মতো একটা ব্যাখ্যাহীন ফাঁক থেকে গেছে—যার ফলে বুদ্ধের নির্বাণলাভের কালটি ৫৪৪ খ্রী.পূ. না ৪৮৫ খ্রী.পূ. তা নির্ণয় করাই শক্ত হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত জ্ঞাত সবচেয়ে প্রাচীন নথি হল ৪৮৯ খ্রী.পূ.-এ রচিত বুদ্ধভদ্রের *সুদর্শন-বিনয়-বিভাস-র* চীনা অনুবাদ—যেখানে কালটিকে উল্লেখ করা হয়েছে ৯৭৪ খ্রী.পূ.। ৪৮৫ খ্রী.পূ.-কেই বুদ্ধের মহানির্বাণের সঠিক সময়কাল ধরে নিয়ে আমি আলোচনা করব। জৈন মহাবীর (নিগন্থ নাটপুত্ত) ছিলেন বুদ্ধের চেয়ে সামান্য কনিষ্ঠ সমসাময়িক—উভয় সম্প্রদায়ের বিবরণী থেকেই এ কথা জানা যায়। ব্রাহ্মণ্য পুরাণগুলিকে গুপ্ত

শাসনের শুরুতে (৩২০ খ্রী.পূ. নাগাদ) ব্যাপকভাবে সম্পাদনা করা হয়েছিল। এই পুনঃসম্পাদনার একটি দৃষ্টান্ত হল 'মধ্য দেশ'-এর ইক্ষাকুবংশীয় অযোধ্যারাজ দিবাকরকে বর্ণনা করা হয়েছে রচনার সমসাময়িক চরিত্র হিসেবে (পারজিটার, ১০) এবং সেই সঙ্গে 'নাগেদের নগরী' (দিল্লি-মীরাট অঞ্চলের প্রাচীন হস্তিনাপুর)-র পুরু অধিসিমকৃষ্ণ (পারজিটার, ৪) এবং গিরিব্রজের (প্রাচীন রাজগীর) বৃহদ্রথ সেনাজিৎ-কেও (পারজিটার, ১৫)। পারজিটার একে পুরাণগুলিকে সম্মিলিতভাবে সম্পাদনার প্রথম প্রয়াস হিসেবে গণ্য করেছিলেন এবং তা সঠিক হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ঐতিহ্যমন্ডিত বংশপরম্পরায় গুঁজে দেওয়ার ব্রাহ্মণ্য বদভ্যাসের দ্বারাও পুরাণগুলি আক্রান্ত হয়েছিল। যেমন (পারজিটার ৬৬-৭), সিদ্ধার্থ, রাহুল, প্রসেনজিৎ-কে বলা হয়েছে যথাক্রমিক ইক্ষাকু নৃপতি—যদিও সিদ্ধার্থ (বুদ্ধের বোধিলাভের আগের নাম বলে মনে করা হয়) কখনও, এমনকী তাঁর স্ববংশীয় শাক্যদেরই শাসন করেননি। তাঁর পুত্র রাহুলকে বাল্যাবস্থাতেই শ্রমণ করে নেওয়া হয়েছিল। আর প্রসেনজিৎ, বুদ্ধের প্রায় সমকালেই যাঁর দেহান্তর ঘটে, ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কোশল নৃপতি—ইক্ষাকু নন। এ অনুসারে, বাক্যের বর্তমান ক্রিয়াপদের অর্থ প্রথম সম্পাদনা না-ও হতে পারে—বরং, হয়ত পৃথক তিনটি স্থানিক নথিকে একত্রিত করার চেষ্টা। বলা হয় (পারজিটার, ৫), অধিসিমকৃষ্ণের পুত্র নিক্ষাকু গঙ্গার বন্যার কারণে তাঁর রাজধানী সরিয়ে নিয়েছিলেন কৌশাম্বি (= কোশম্বি, যমুনাতীরবর্তী কোশম)-তে। এটা ছিল যুক্তিসঙ্গত স্থান নির্বাচন—কেননা জায়গাটার অবস্থান ছিল বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। অর্থহীন নাম-তালিকায় এমন হঠাৎ হঠাৎ সংযোজন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে—যেমন, হস্তিনাপুরে তা চালিয়ে মনে হয়েছে (সাংবাদিকতাসুলভ প্রাথমিক বিবরণ অনুসারে) যে এই ধরনের বন্যার লক্ষণ আছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত কোশম্বি-র উৎখনন থেকে কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ এখনও মেলেনি—যদিও হয়ত যে কোন ধূসর মৃৎপাত্রের সন্ধান পেলেই তাকে এক অভিন্ন সংস্কৃতির প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করে দেওয়া হবে (তুলনীয়, *এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া* ১০-১১.৪, ১৫০-৫১)। সেক্ষেত্রে, সেই ধূসর মৃৎপাত্রকে শুধুমাত্র 'আর্য' হিসেবে চিহ্নিত করাটাই উচিত হবে না, বরং পুরুদের মতো কোন নির্দিষ্ট উপজাতি-র সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখানোটাই সঙ্গত—কেননা আর্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার পার্থক্য তখন অনেকখানিই গভীর হয়ে উঠেছে। সবশেষে আসে, *জাতক—যার* ৫৪৭টি দ্বৈত-কাহিনী, রূপকথা ও উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। প্রতিটি বর্ণনাকে মনে হয়, যেন বুদ্ধ সমকালীন কোন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছেন প্রাচীন এক ঘটনার আলোকে—যার চরিত্রগুলি পুনরাবির্ভূত হয়েছে 'বর্তমান' কাহিনীটির মধ্যে। সন্তোষজনক অনুবাদ (ডুটয়েট) এবং মূল্যবান বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এই উপাখ্যানগুলির এক সুন্দর সংস্করণ (ফাউসবয়েল) এখন পাওয়া যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও, বুদ্ধের সময়কার সমাজ-সম্পর্কের প্রকৃত চিত্রটি বুঝতে *জাতক*-কে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না—যদিও, হতে পারে, কাহিনীগুলি প্রাচীন। এর কারণ, *জাতক* লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল অনেক পরে, বণিক-প্রভাবিত এক পরিমন্ডলে। তা ছাড়া, সেগুলির ওপর বুদ্ধ-কাহিনীর বিলুপ্ত সিংহলী ভাষ্যগুলিরও প্রভাব পড়েছে—যেখান থেকে আবার বর্তমান পাঠগুলি পুনরায় পালিতে ভাষান্তরিত হয়েছে। বৌদ্ধ অনুশাসনগুলিরও অধিকাংশই রচিত হয়েছিল অশোকের সময়কাল নাগাদ, কিছু অংশ আরও পরে। ঘটনাটা হল, যেহেতু সমাজ ও তার উৎপাদন-উপায়গুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে

গিয়েছিল এবং এ ধরনের বিস্তারিত বিবরণ রচনার তখন আর বিশেষ কারণই ছিল না—তাই অনুশাসনের অংশবিশেষকে বুদ্ধের প্রয়াণের সময়কার অবস্থার সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্যই শুধু গ্রহণ করা যায়।

সমাজে পরিবর্তনের চিত্রটি ফুটে উঠেছিল কিছু নতুন প্রথার মধ্য দিয়েঃ বন্ধকি, তেজারতি, সুদ। ঋণের কথা বৈদিক আমল থেকেই জানা ছিল। 'ঋণ' শব্দটির প্রকৃত অর্থই ছিল 'অধর্ম' বা পাপ। *ঋগ্‌বেদ*-এর ঋণগ্রস্ত জুয়াড়ি 'রাত্রে ধনের সন্ধানে ভয়ে ভয়ে অপরের বাড়ি যায়'—লুকিয়ে ঋণ অথবা চুরির উদ্দেশ্যে। মৃত উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করার পর ঋণমুক্ত অধমর্ণকে যে মন্ত্র পাঠ করতে হবে তার উল্লেখ *অথর্ববেদে* (৬.১১৭-৯) আছে; সম্ভবত প্রথমোক্তের প্রেতাত্মার হাত থেকে নিস্তারের এটা একটা উপায়। সুদের কথা কোথাও কোন উল্লেখ নেই। যদিও সুদের পরিবর্তে 'বৃদ্ধি' শব্দটির উল্লেখ আছে যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ফসলের অংশদ্বারা বীজধানের ঋণ পরিশোধ করা হত। ফসলে ঋণ দাতা ও গ্রহীতা-র সমান ভাগ এবং অজন্মায় ঋণদাতার ঝুঁকি—এ থেকেই ক্রমে 'অর্ধেক ভাগ-চাষ' প্রথা চালু হতে পারে, যা পরে 'অর্ধসিতিকস' হিসেবে পরিচিত হয়। ঐতিহাসিক পর্বের গোড়ায় নিয়মটা ছিল (*অর্থশাস্ত্র* ৩.১১)ঃ

'সুদের মাসিক হার শতকরা ১¼ পণ (বার্ষিক ১৫ শতাংশ) হওয়াটা সঙ্গত ও ন্যায্য; ব্যবসার ক্ষেত্রে ৫ পণ (৬০ শতাংশ) স্বাভাবিক; যে সব বাণিজ্যের কাজে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের ঝুঁকি আছে সেক্ষেত্রে ১০ পণ (১২০ শতাংশ); সমুদ্রপথের বাণিজ্যে ২০ পণ (২৪০ শতাংশ)। কোন ব্যক্তি যদি এর চেয়ে বেশি হারে সুদ নেয় বা নেবার কারণ ঘটায় তাহলে তাকে প্রথমেই 'সাহস' জরিমানা (৯৬ পণ পর্যন্ত) দিতে হবে; লেনদেনের কোন সাক্ষীর ক্ষেত্রে জরিমানা হবে তার অর্ধেক। রাজা যদি এ ব্যাপারে ন্যায়বিচার না করে, মহাজন ও খাতক উভয়ের আচরণই তাহলে নিয়মবহির্ভূত পথের আশ্রয় নেবে।

'শস্যের প্রদেয় সুদ ফসল তোলার সময় প্রাপ্য। (ঋণ দেওয়ার ও আদায়ের সময়কার ফসলের) দাম ধরে মূল ঋণের দেড়গুণ পর্যন্ত একে বাড়তে দেওয়া যেতে পারে।... ব্যবসার ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠান যদি কাছাকাছি এবং স্থায়ী হয় তাহলে সুদ বার্ষিক হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি তার ভালোর জন্য অন্যত্র উঠে যায় অথবা তার ব্যবসা খুইয়ে ফেলে তাহলে তাকে অবশ্যই গৃহীত ঋণের (মোট) দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হবে (মূল এবং সুদ হিসাবে; ভারতবর্ষের কিছু অংশে এ প্রথা এখনও চালু আছে)। কোন ঋণগ্রাহক যদি দীর্ঘদিন ধরে কৃচ্ছ্রসাধনরত, অথবা গুরুগৃহে অধ্যয়নরত, অথবা শিশু, অথবা নিরুপায় হয়—তাহলে তাকে কোন সুদ দিতে হবে না। ... ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে তার পুত্র, বা উত্তরাধিকারী আত্মীয়বর্গ, বা সহঋণী, বা জামিনদারকে অবশ্যই আসল ও সুদ পরিশোধ করতে হবে।'

দু'শ বা তারও বেশি বছর ধরে প্রচলিত এই সমস্ত রীতি ৩০০ খ্রী.পূ.-এর কাছাকাছি সময়ে নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল—কেননা ঋণ ও সুদের উল্লেখ প্রথম যুগের বৌদ্ধ পুঁথিগুলিতেও আছে। মগধে উৎপাদনের নতুন যে রূপগুলি—বাণিজ্যের, পণ্য-উৎপাদনের, বাণিজ্যিক মূলধনের—এগুলি ছিল একইসঙ্গে সে সবের কারণ ও কার্য। চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের প্রচলন ছিল না, কিংবা মোট ঋণ কোন পূর্বস্থিরীকৃত স্তরে—সাধারণভাবে যা দ্বিগুণ—পৌঁছলে আর সুদ ধার্য

করা হত না। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ছিল খুবই ব্যতিক্রম। স্থল-বাণিজ্যযাত্রীদল বা সমুদ্র বণিকদের দেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার চড়া হওয়ার কারণ ছিল আর্থিক ঝুঁকি—কেননা ক্ষতি হলে তা আর কোনভাবেই পূরণ করা যাবে না। এই হার থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে এ ধরনের বাণিজ্যগুলি ছিল অত্যন্ত লাভজনক। সেই অনুসারে, মহাজনদের ভূমিকাটা ছিল অনেকটা বীমা প্রতিনিধি বা ব্যবসায়িক অংশীদারের মতো—কোন সতর্ক সুদখোরের মতো নয়।

৬.২ ৬০০ খ্রী.পূ. নাগাদ গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থানকারী স্বতন্ত্র সব সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। বঙ্গ ছিল তখন নিবিড় জলাভূমির অরণ্যে ঢাকা। বিহার ও ইউ পি-র বহু বিচ্ছিন্ন জায়গা জুড়ে তখনও বাস করছে স্বল্পসংখ্যক উপজাতিক মানুষ—যারা কোন আর্য ভাষায় কথা বলতে জানে না, বা আর্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ যাদের অত্যন্ত কম। এদের উপরে ছিল সেই সমস্ত উন্নত উপজাতি যারা সাধারণভাবে আর্যদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত। তারা তখনও তাদের নিজস্ব ভাষাকে রক্ষা করে চলেছে। এই উন্নত অনার্যদের গোষ্ঠীগতভাবে নাগ বর্গনামে অভিহিত করা যেতে পারে। এই উভয় ধরনের উপজাতিক মানুষরাই তখন গোটা অঞ্চল জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং খাদ্য-উৎপাদনের দ্বারা তখনও স্থিত নয়। নাগেদের উপরিস্তরে ছিল আর্য জনগোষ্ঠীগুলি—যারা তখন নদীতীরে ও স্থল-বাণিজ্যপথ সংলগ্ন এলাকায় বসতি গড়েছিল। এই জনগোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকটিই তখন আর্য ভাষায় কথা বলত এবং তাদের অনেকগুলির মধ্যেই বর্ণ-শ্রেণী বিভাজন এসে গিয়েছিল। এর ফলে, তারা দুই প্রধান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যার মধ্যের অপেক্ষাকৃত সরল অংশটি তখনও ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। আর্যরা নির্দিষ্ট অল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে একটা শাসকগোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল—যারা শূদ্র ভূমিদাসদের শোষণ করত। কোন আর্য জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তির নাম থেকে অনতি অতীতে তারা অনার্য ছিল কি-না, তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। নতুন ভাষা (আর্য) এবং গবাদি পশু ও লাঙ্গলের সাহায্যে খাদ্য-উৎপাদকের জীবন যে কিছু গোষ্ঠী গ্রহণ করেছিল এটা বোঝা যায়। বিতর্কটা হল, এই সমস্ত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বেদ বা *ব্রাহ্মণ*গুলিতে কোন উল্লেখ নেই; তাদের কেউই বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান মানত বলেও মনে হয় না। বাকি, ব্রাহ্মণ্যায়িত জনগোষ্ঠীগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ চতুর্বর্ণভিত্তিক শ্রেণী বিভাজনের কারণে ভাঙনের মুখে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল; সেখানে বৈশ্যরাও প্রায় শূদ্রদের মতোই শোষিত হচ্ছিল। এই ধরনের চতুর্বর্ণ বিভক্ত জনগোষ্ঠীর প্রধানরা প্রকৃত অর্থেই অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিল, যার প্রয়োগ ঘটত আক্রমণে। অপরিহার্য বাণিজ্যের সূত্রে যদিও পরস্পর বাঁধা ছিল, তবুও স্বতন্ত্র এই সম্প্রদায়গুলি কোন সময়েই শান্তিতে থাকেনি। এমনকী, আর্য রাজ্যগুলিও নিজেদের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল।

আধিপত্যকারী কোন একটি গোষ্ঠীর বাহুবল অন্যগুলিকে দাসত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনলেও তার ফলে দ্বন্দ্বগুলির নিরসন হত না। ব্যাপক দাসত্ব থেকে মুনাফা করার মতো যথেষ্ট উদ্বৃত্ত বা পর্যাপ্ত পণ্য-উৎপাদন ছিল অনুপস্থিত। বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগটি তখনও ছিল দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা স্বল্প বসতিপূর্ণ ও দুর্গম। উপজাতি মানুষদের পক্ষে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো প্রচুর জায়গা পড়েছিল এবং সেইসঙ্গে লাঙ্গলচালিত কৃষির সম্প্রসারণেরও—সীমিত উপযোগী ভূখণ্ডসম্পন্ন গ্রীস বা ইতালির যা বিপরীত।

অঙ্গুত্তর নিকায়[১]-তে উপজাতি-মানুষদের ষোলটি বৃহৎ অঞ্চলের (মহা-জনপদ) নাম উল্লেখ করা হয়েছে—যেগুলি প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে বিদ্যমান ছিল। মগধ থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী ছিল কম্বোজ ও গান্ধার—যা দারিয়ুসের বিজিত রাজ্য তালিকায় হিন্দুশ-এর সঙ্গেই কম্বুজীয় ও গান্ধার স্থান-নামে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি ছিল আফগানিস্থানে। গান্ধার বিস্তৃত ছিল কান্দাহার উপত্যকার ভিতর পর্যন্ত। সীমান্ত অঞ্চলের বিখ্যাত নগরী তক্ষশীলা ছিল বাণিজ্য ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। কম্বোজের মানুষদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পোকামাকড়, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি বলি দিত; *আবেস্তা* শাস্ত্রেও এর সমর্থন রয়েছে। কম্বোজের নিকটস্থ, অথবা হয়ত কাশ্মীরে মহা-কপ্‌ফিনা নামক এক রাজার অধীনে কুক্কুটবতী নামে এক নগরী ছিল—যেটিকে এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। তক্ষশীলার এক গান্ধার রাজা পুক্কুসাতি মগধ-রাজ বিম্বিসারের সঙ্গে দুর্মূল্য বাণিজ্য-দ্রব্য উপহার হিসেবে আদান-প্রদান করেছিলেন এবং পায়ে হেঁটে বুদ্ধ দর্শনে গিয়েছিলেন। এই সীমান্ত-রাজা এবং মগধ-আচার্যর সাক্ষাৎ ঘটেছিল সম্ভবত কোন কুম্ভকারের গৃহে (*মজ্‌ঝিম নিকায়,* ১৪০)। এর কিছুদিন পরেই এক গরুর গুঁতোয় রাজার মৃত্যু হয়। দক্ষিণে গোদাবরী নদীর কাছাকাছি অস্‌সক (অশ্মক) নামের এক 'রাজ্য'-র কথা জানা যায়। এরই সংলগ্ন ছিল অলকাদেশ। এ দুটিই ছিল অন্ধ্রে (অন্ধক) এবং এদের বিষয়ে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি। বাভরি নামের এক ব্রাহ্মণ, বুদ্ধ পরে যাঁকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন, এই রাজ্যদুটির কাছাকাছি আশ্রম স্থাপন করে খাদ্য-সংগ্রাহক হিসেবে 'উঞ্ছ' (ফসল তোলার পর মাঠে পড়ে থাকা শস্যের দানাগুলি কুড়ানো—যা এক উচ্চ ব্রাহ্মণ্য ব্রত বলে বিধান আছে) বৃত্তি ও ফলমূলের (সম্ভবত বুনো) সাহায্যে জীবনধারণ করতেন। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, অশ্মক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল অবন্তী রাজ্য ও তার রাজধানী উজ্জয়িনী। এখানকার রাজা পজ্জোৎ (প্রদ্যোৎ) প্রথমে উদয়নের শত্রু ও পরে শ্বশুর হয়ে ওঠা নিয়ে রচিত রোমান্টিক কাহিনীমালা বিখ্যাত। রাজা উদয়ন শাসন করতেন বংশ (বৎস) রাজ্য, যার রাজধানী ছিল যমুনা-তীরবর্তী কোশাম্বি। একটি প্রধান বাণিজ্যপথ কোশাম্বির মধ্য দিয়ে উজ্জয়িনী পর্যন্ত গিয়েছিল। পুরাণগুলির এক অসমর্থিত বক্তব্য অনুসারে, প্রদ্যোৎ-রা ১৩৮ বছর ধরে মগধের সিংহাসন দখল করে ছিলেন। *মজ্‌ঝিম নিকায়* (১০৮)-এ বলা হয়েছে যে বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মগধের রাজা অজাতশত্রু পজ্জোত-এর আক্রমণের আশঙ্কায় রাজগীর দুর্গের সংস্কার-সাধান ক রেন। দুই রাজধানীর মধ্যেকার দূরত্ব ও ভূখণ্ডের কথা মাথায় রাখলে এ ধরনের বিবরণীর সত্যতা যাচাই কঠিন হয়ে পড়ে। ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত মগধ বৈদ্য জীবক কোমারভক্ষ এক প্রদ্যোৎ রাজার চিকিৎসার জন্য উজ্জয়িনী গিয়েছিলেন; রাজা তাঁকে উপহার পাঠিয়েছিলেন অতীব মূল্যবান পরিচ্ছদ শিবেয়্যক—যার অর্থ শিবি[২] দেশে উৎপন্ন, অর্থাৎ বর্তমান পাঞ্জাবের শোরকোর্ট-এ। কোশাম্বিতে ঘোশিত, কুক্কুট ও পাবারিকা নামের তিনটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ ছিল; এগুলির নামকরণ সম্ভবত দাতাদের নামানুসারে হয়েছিল। কোশাম্বির প্রথম সারির সন্ন্যাসী পিন্ডোলা ভরদ্বাজের কথা বৌদ্ধ মূল কাহিনীগুলিতে উল্লেখ নেই। তাই তাঁর কাহিনী আসল, না কোশাম্বির বণিকদের কারণে পরবর্তীকালের অনুশাসনগুলির মধ্যে সন্নিবেশিত তা নিয়ে সন্দেহ আছে। বাকিগুলির মধ্যে, সুরসেন রাজ্য, যার রাজধানী ছিল মথুরা, তার কথা গ্রীকদের জানা ছিল। বুদ্ধ কদাচিৎ সেখানে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছেও এ জায়গাটি পাঁচটি কারণে জনপ্রিয় ছিল না ঃ 'বন্ধুর পথ, অত্যধিক ধূলা, হিংস্র কুকুর, নিষ্ঠুর যক্ষ (দৈত্য) এবং ভিক্ষার অমিল।'

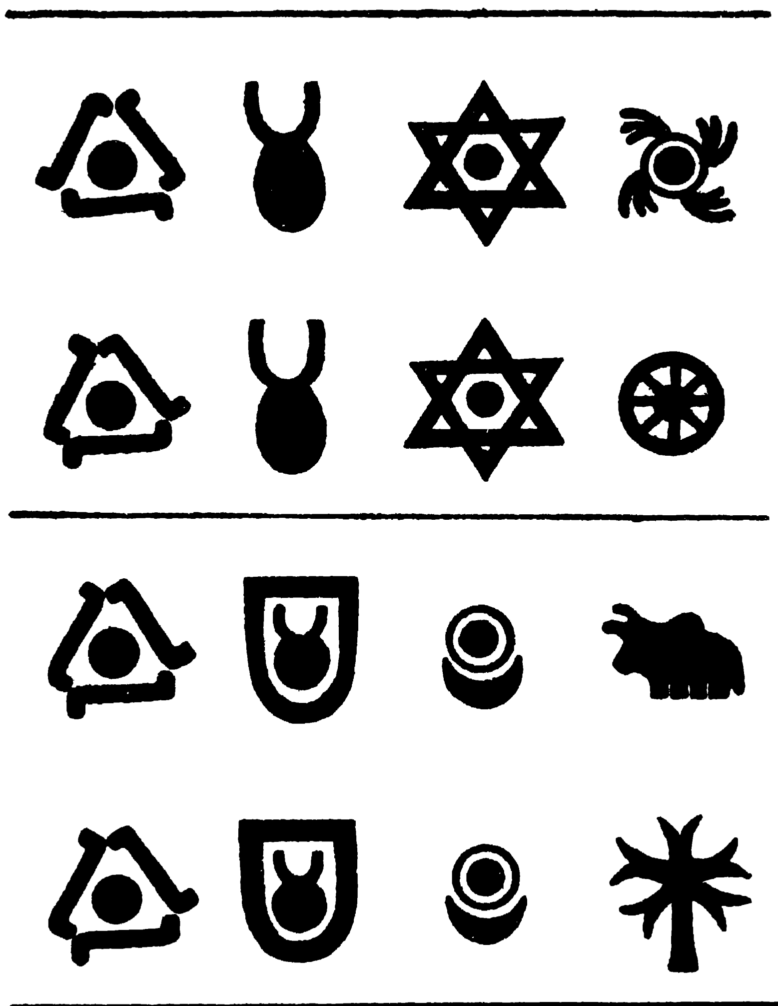
নিয়েছিলেন; কাননের গোটা ভূমি ঢেকে দেওয়া হয়েছিল (স্বর্ণ) মুদ্রায়। এরপর কাননটি বৌদ্ধ সংঘকে উপহার হিসেবে দান করা হয়। নগদ অর্থের বিনিময়ে জমির স্বত্ব হস্তান্তরের বিষয়টি ভারতীয় ইতিহাসে সবসময়ই নির্ভর করেছে নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমকালীন বাণিজ্যিক ও আর্থিক লেনদেনের সাধারণ পরিস্থিতির উপর। চাষযোগ্য জমি থাকাটা যখন এক বিশেষ অধিকার এবং কোন সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি—সামন্ততন্ত্রের শেষ যুগেও যেমনটা ছিল—তখন জমি ক্রয় করাটা বর্ণ বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির মতোই এক দুর্লভ ঘটনা। একথা বলা যেতে পারে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ নগর বা নগর-সংলগ্ন অঞ্চলে গৃহের জমি ও উদ্যানগুলির ব্যক্তি মালিকানা ছিল এক স্বীকৃত বিষয়। সাধারণভাবে কৃষি জমির এই ধরনের কোন ব্যক্তিমালিকানা ছিল না।

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাজ্যগুলি সংযুক্ত হতে শুরু করেছিল বিজয় বা দখলের দ্বারা। বিদেহ (রাজধানী মিথিলা) লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এর শেষ রাজা সুমিত্র-র সঙ্গেই সমাপ্তি ঘটেছিল প্রকৃত ঈক্ষাকু বংশের (পারজিটার, ১২); বুদ্ধের তখন শৈশবকাল। এর পর থেকে আমরা কেবল পরম্পরাগতভাবে এই অঞ্চলের (দ্বারভাঙ্গা) লিচ্ছবিদের দ্বারা শাসিত কোশলের কথাই জানতে পারি—অন্তত মগধ বিজয়ের আগে পর্যন্ত। বিহার (রাজধানী চম্পা)-এর পূর্বদিকস্থ অঙ্গ বিজিত হয়েছিল বুদ্ধের বয়োঃজ্যেষ্ঠ-সমসাময়িক বিম্বিসার বা তাঁর পূর্বতন মগধ (আধুনিক গয়া ও পাটনা জেলা) অধিপতির দ্বারা। নামটিও সেই থেকে সংযুক্ত হয়ে হয়েছিল অঙ্গ-মগধ। বেনারস ছিল কাশী জনপদের এক সদর কেন্দ্র; উত্তরের কোশল রাজ্য কর্তৃক কাশী অধিকৃত হবার পর একইভাবে যৌথ নাম হয় কাশী-কোশল। বেনারসের গুরুত্ব ছিল এর গঙ্গাতীরবর্তী অবস্থানের জন্য এবং সেই সঙ্গে এখানকার শিল্পোৎপাদনের জন্যও। 'কাশিকা' বিশেষণটি যে শুধুমাত্র সূক্ষ্ম বেনারসী বস্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হত তা নয়, বরং এখানকার যে কোন উৎকৃষ্টমানের পোষাককে ভূষিত করতেই ব্যবহৃত হত। দুই নদীর সংযোগস্থলে প্রয়াগ (এলাহাবাদ) এখন বেনারসের মতোই পুণ্যস্থান, কিন্তু পরিবহন কেন্দ্র হিসেবে বর্তমানে তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ; আপাতভাবে মনে হয়, আগে এটি ছিল অনুন্নত। আলোচ্য কালপর্বের বৃহত্তম রাজ্য ছিল কোশল, যার রাজধানী ছিল অচিরবতী (রাপ্তি) নদীতীরবর্তী শ্রাবস্তী (শাবতথি)-তে। শাবতথি-র ধ্বংসাবশেষ এখন গোন্ডা ও বাহ্‌রিচ জেলার সীমান্তের কাছাকাছি শেত ও মহেত নামের গ্রামদুটির মাটির স্তূপগুলির নীচে ঢাকা পড়ে আছে। কোশলের ঐতিহ্যাগত আদি রাজধানী ছিল শাকেত (ফৈজাবাদ)—যা মহাকাব্যের অযোধ্যা। মনে হয়, এই শাকেত ছিল দক্ষিণ-কোশলের কেন্দ্র, সম্ভবত একটি দ্বিতীয় রাজধানী। হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর কোশল ছিল প্রথম দিকের একটি আর্য-উপনিবেশ এবং সেখানকার নিশ্চিতই কোন নির্গমপথ ছিল—যা তৎকালীন বৃহত্তম পরিবহন পথ গঙ্গায় এসে মিশেছিল। এই সমস্ত ক্ষেত্রে, দেশের নামের উদ্ভব ঘটেছিল কোন জনগোষ্ঠীর নাম থেকে। উপজাতিক উৎপত্তির লক্ষণ সমন্বিত প্রথম দিকের বর্ণ-সংঘ এবং পেশাগুলির নামের মধ্যেও এই পদ্ধতির বিস্তার ঘটত। 'বৈদেহিক' নামের অর্থ, *অর্থশাস্ত্র* অনুযায়ী 'বণিক'। 'মগধ'-এর অর্থ ছিল পেশাদার 'চারণকবি', কিন্তু *মনুস্মৃতি* (১০.৪৭)-তে বলা হয়েছে 'বণিক'। মগধ এবং বৈদেহিকদের ক্ষেত্রে উপজাতি থেকে সঙ্ঘ এবং পরে বর্ণ-এ রূপান্তরণের এটাই ছিল স্বাভাবিক ধারা—কেননা ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বে উভয়কেই উৎপত্তিগতভাবে মিশ্রবর্ণ বলা হয়েছে। বিদেহরা যদি তখনও পর্যন্ত একটি উপজাতি হিসেবে বিদ্যমান থাকত,

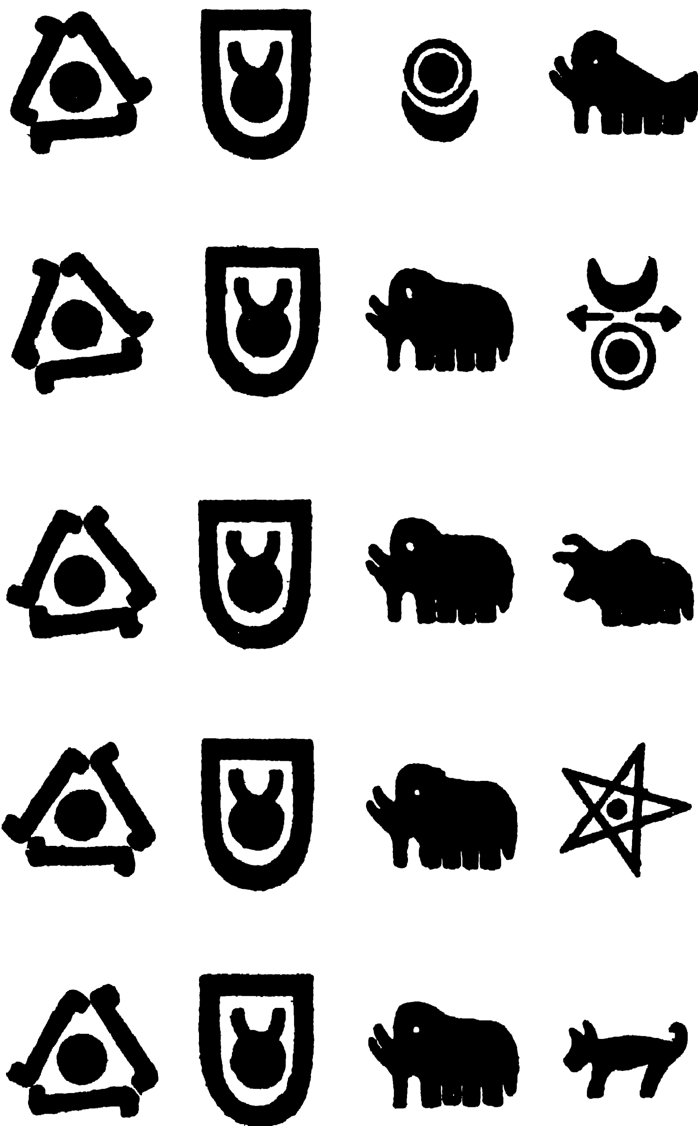
তাহলে সুমিত্র-র সঙ্গে ঐ রাজ্যটিরও বিলুপ্তি ঘটত না। *মনুস্মৃতি*-র বিধান থেকে শুধু মনে হয় যে, মগধের নাগরিকরা তখন ছিল দলবদ্ধভাবে বাণিজ্যে যাওয়া স্থলবণিকদের মুখ্য অংশ।

মূল লড়াইটা অবধারিতভাবেই ছিল কোশল ও মগধের মধ্যে; কিন্তু একইসঙ্গে তারা উভয়েই লড়াই চালাত উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গেও। আপাতদৃষ্টিতে কোশল—তার বিশাল সাম্রাজ্য, দীর্ঘ ইতিহাসগত ঐতিহ্য, গ্রামদক্ষিণা পাওয়া পুরোহিতদের সমর্থন, এবং পায়াসি রাজন্ন-র মতো স্থানীয় ক্ষত্রিয় প্রশাসক (*দিঘ নিকায়,* ২৩) সমন্বিত আদি সামন্তযুগীয় মহানুভবতা নিয়ে ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। সব জমি তখনও কৃষির আওতায় আসেনি, এবং শাক্যদের মতো উন্নত জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি অজস্র বন্য আদিম মানুষও তখনও পর্যন্ত টিকে ছিল। অপরপক্ষে, মগধের ছিল এমন কিছু যা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঃ ধাতু এবং নদী সান্নিধ্য। প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন রাজধানীগুলির দিকে তাকালে, নদীর অপর তীরে রাজগীর (= রাজগৃহ অর্থাৎ রাজার প্রাসাদ)-এর বিচ্ছিন্ন অবস্থান বিস্ময়কর মনে হয়—যখন সারবন্দী আর্য বসতিগুলির যাবতীয় সংযোগসূত্র ছিল হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর সুদূর উত্তরের দিকে। আজকের দিনেও, রাজগীরের চারপাশের তুলনামূলক বন্য পরিবেশ নজর কাড়ে। স্বাভাবিক স্থান থেকে এতদূরে সরে এসে, সবচেয়ে উর্বরাও নয় এমন এক ভূমিতে রাজধানী স্থাপনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন নজরে আসে বরাবর-পর্বতমালার উত্তর প্রান্তের পর্বতশাখা ধারওয়ার—যেখানকার লৌহ আকরিকের আস্তরণ খুব সহজেই উদ্ধারযোগ্য। সরাসরি লোহার উৎস রাজগীরেরই প্রথম দখলে আসে। দ্বিতীয়ত এটির অবস্থান ছিল (গয়ার সঙ্গেই, যা ছিল তখন ঘন জঙ্গলে আবৃত) দক্ষিণ-পূর্বের ধলভূম ও সিংভূম জেলায় যাওয়ার মূল পথের উপর—যে অঞ্চলগুলিতে ছিল লোহা ও তামা উভয়েরই বৃহত্তম ভারতীয় উৎস। আজকের দিনেও প্রাচীন কিন্তু বিস্মৃত তাম্রখনির ছোট ছোট শাখাগুলি খুঁজে পাওয়া যায় সেই সমস্ত গ্রামে—যেগুলির নাম শুরু হয় 'তাম' (= তামা) দিয়ে, যেমন 'তামর'। এর এক, বা দুই শতাব্দী পরে তমলুক ছিল প্রাচীন তাম্রবন্দর। সিন্ধু উপত্যকায় তামা আসত রাজস্থান অথবা দক্ষিণ থেকে, যার পরিমাণ ছিল কম। সেই অর্থে, সমকালে ক্ষমতার প্রধান উৎস ধাতুর ওপর মগধেরই ছিল প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। মগধের বিখ্যাত কূটনীতিক চাণক্য খনির গুরুত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন ঃ 'রাজকোষ খনির ওপর নির্ভরশীল, সেনাবাহিনী রাজকোষের ওপর' (*অর্থশাস্ত্র,* ২.১২); বা 'যুদ্ধাস্ত্রের গর্ভ হল খনি' (*অর্থশাস্ত্র,* ৭.১৪)।

ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আনুপূর্বিক বিবরণ আমাদের নথিগুলি থেকেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। কোশলদের দক্ষিণমুখী বেনারস অভিযান এক বিশ্রুত কাহিনীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বেনারসের কিংবদন্তী রাজা ব্রহ্মদত্ত কোশলদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ কিছুটা সাফল্যও লাভ করেন, অন্তত রাজা দিঘিতিকে তাঁর রানি সমেত বন্দী ও প্রাণদণ্ডের মধ্য দিয়ে (*মহাভাগ,* ১০.২; *জাতক,* ৪২৮)। পলাতক কোশল রাজপুত্র দিঘাভু তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং সম্ভবত ব্রহ্মদত্তের জামাতা হয়ে কাশীও অধিকার করে নেন (*জাতক,* ৩৭১)। একই কাহিনী বলা হয়েছে আর এক কোশল রাজকুমার দৃত্ত সম্পর্কে (*জাতক,* ১১৮, ৩৩৬)—যিনি তাঁর পিতার পরাজয়ের পর ব্রহ্মদত্তের কাছ থেকে কোশল পুনরুদ্ধার করেন এবং শাবত্তি-তে দুর্গ পুনর্নির্মাণ করিয়ে তাকে দুর্ভেদ্য করে তোলেন। এই রাজপুত্র তক্ষশীলায় গিয়েছিলেন তিন বেদ-এর শিক্ষা নিতে। *জাতক,* ৩০৩ অনুসারে কোশলের রাজা দব্বসেন কাশী অধিকার করেন; *জাতক* ৩৫৫ অনুসারে স্থানটি হল বংক। *জাতক* ৫৩২-এ বলা হয়েছে যে বেনারসের রাজা মনোজের কাছে কোশল বশ্যতা স্বীকার



চিত্র ১৯ : কোশল রাজাদের ৩/৪ কর্শপণ রৌপ্যমুদ্রার ছাপ-চিহ্ন। বিভাজন রেখাগুলি রাজবংশের ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করে। উপরেরটা ঈক্ষ্বাকুদেরও হতে পারে।



চিত্র ২০ : শেষ দিককার কালানুক্রমিক কোশল-মুদ্রা, পরিবর্তনটা মাতঙ্গ রাজবংশের কারণে, পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে যা এসেছিল। শেষটি বিদুদভ-এর হওয়া উচিত। তার আগেরটি পসেনদি-র।

করেছিল। এই সমস্ত নামগুলির তেমন কোন গুরুত্ব না থাকলেও, বৈরিতা—যা তুঙ্গে উঠেছিল কাশীর ওপর কোশল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে—তা ঐতিহাসিক ঘটনা বলেই মনে হয়।

কোশলরাজ পসেনদি (প্রসেনজিৎ)-র নামটি যদিও এক প্রাচীন ইক্ষাকু বংশীয় রাজার নামানুসারী, কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ্য বিচারে তিনি প্রকৃত ক্ষত্রিয় ছিলেন না, ছিলেন এক নীচ উপজাতি বংশীয়। তাঁর পরিবারকে মাতঙ্গকুল বলে অভিহিত করা হয়েছে—যা বর্তমানের অস্পৃশ্য মঙ জাত-এরই সমতুল, কিন্তু সেই সময় ছিল হস্তী ধর্মবিশ্বাস বা টোটেম-এর উপজাতি থেকে সদ্য উন্নীত। তাঁর প্রধানা মহিষী মল্লিকা ছিলেন এক মালাকারের কন্যা—যাঁকে যোদ্ধা বা অন্য কোন উচ্চবর্ণীয় বলে মনে হয় না। এ থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রতি এই রাজার বিশেষ যে বদান্যতা তার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ নিজ জাতের উর্দ্ধে রাজপদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক সামাজিক মর্যাদা অর্জনের প্রয়াস হিসেবে। এতদসত্ত্বেও, তাঁর ভগিনী ছিলেন রাজা বিম্বিসারের স্ত্রী, মগধ রাজপুত্র অজাতশত্রুর মা। এই কোশল (বা বিদেহ) রাজকন্যার বিবাহের যৌতুক হিসেবে বেনারস এলাকার একটি গ্রাম দিয়ে দিতে হয়েছিল। বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রু তাঁর নিজ পিতাকে বন্দী করেন ও পরে অভুক্ত রেখে প্রাণনাশ করেন। রাজা ও যুবরাজের মধ্যেকার বিরোধকে *অর্থশাস্ত্র*-এ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাজাকে সেখানে (*অর্থশাস্ত্র,* ১.১৭) পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কীভাবে যুবরাজের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়, আবার যুবরাজকেও উপদেশ দেওয়া হয়েছে (*অর্থশাস্ত্র,* ১.১৮) কীভাবে সন্দেহগ্রস্ত পিতার মন জয় করতে হবে। পসেনদিকে তাঁর পিতা নিজেই উদ্যোগী হয়ে শিক্ষা সমাপনান্তে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। বিম্বিসারকেও তাঁর পিতা সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে পনের বছর বয়সে অভিষিক্ত করেন। এই উভয় রাজাই সামগ্রিকভাবে পূর্বতন সশস্ত্র উপজাতি-র বদলে উপজাতি-ভিত্তি বর্জিত এক নতুন ধরনের সেনাবাহিনী গঠন করেন—যা অনুগত ছিল শুধু রাজার প্রতিই। বংশানুক্রমিক শাসনের লক্ষ্যে একটি নতুন পদও সৃষ্টি করা হয় ঃ সেনাপতি বা সেনাধ্যক্ষ। এই পদটি প্রায়শ যুবরাজের অধিকারেই থাকত। নিয়মিত কর ও ব্যাপক রাজস্ব আদায় ছাড়া এই ধরনের সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব ছিল না। রাজার সর্বময় কর্তৃত্বেরও এটাই ছিল মূল ভিত্তি। বলা হয় (*মহাভাগ,* ৫.১), বিম্বিসার ৮০,০০০ গ্রাম শাসন করতেন। প্রাচীনতর রীতিগুলির বিগঠন আরও স্পষ্ট হয়, তুলনামূলকভাবে কম মর্যাদাপূর্ণ বিশেষণগুলির ব্যবহার থেকে—যেমন, মগধ ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মবন্ধু বা মগধ ক্ষত্রিয় রাজাদের ক্ষেত্রে ক্ষাত্রবন্ধু ইত্যাদি। শব্দের অন্তে-*বন্ধু* যুক্ত থাকাটা ইতালীয় -accio-র মতোই অর্থবহ; এটা প্রমাণ করে যে দুই বর্ণের কোনটিই বৈদিক ঐতিহ্যে খাপ খায়নি।

প্রত্যক্ষ হিংসার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এই নতুন প্রক্রিয়া এক গভীর পরিবর্তনকে সূচিত করেছিল। উপজাতিক নির্বাচন বা গোষ্ঠী অনুমতির যে প্রয়োজনীয়তা আগে ছিল, বা তখনও পাঞ্জাবে আছে, গাঙ্গেয় উপত্যকার বৃহৎ রাজ্যগুলিতে তার বিলোপ ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে, উপজাতিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই রাজ্যগুলি বিস্তারলাভ করতে পারত না। অন্যদিকে, উপজাতির বয়োঃজ্যেষ্ঠদের পরিবর্ত হিসেবে কোন স্থায়ী দরবারী অভিজাতদের উল্লেখও পাওয়া যায় না। প্রকৃত ঘটনাটা হল, সামগ্রিকভাবে এক নতুন শ্রেণীর মানুষ—যারা বাণিজ্য, পণ্য উৎপাদন, বা পরিবারের অধিকারে থাকা জমিতে উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদন, অর্থাৎ, এক কথায়, ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টিতে নিয়োজিত ছিল—তাদের প্রয়োজন হয়েছিল উপজাতিক

বাধানিষেধ এবং উপজাতির মধ্যে মুনাফা ভাগাভাগির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া। পথঘাটের নিরাপত্তা এবং সম্পত্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত রাখতে পারে এমন একজন রাজার অস্তিত্ব তাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি ছিল; কোন নির্দিষ্ট রাজা নয়, বরং যে কোন রাজা—যে উপজাতিক আইন বা সম্পত্তিতে সর্বসাধারণের অধিকারের কাছে প্রত্যাবর্তনকে প্রতিরোধ করতে পারে। এটা খুবই সহজলভ্য হয়েছিল, কেননা রাজকর্মচারীদের মাধ্যমে মগধের রাজ পরিবারও খাজনার শস্য ও পণ্যের ব্যাপক বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়েছিল (যে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব)। তাছাড়াও, রাজারা পূর্বতন উপজাতিক প্রধানদের সমস্ত বিশেষাধিকারগুলি করায়ত্ত করেছিল—অথচ তাদের নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতাগুলি যতটা সম্ভব পরিহার করা হয়েছিল।

পসেনদি তাঁর ভগিনীর বিবাহে যৌতুক হিসেবে দেওয়া কাশীগ্রাম উপহার বাতিল করে তা উদ্ধারের চেষ্টা করেন—কিন্তু ভাগিনেয়র সঙ্গে যুদ্ধে বারবার পরাস্ত হন। এই গ্রামটি সামরিক কৌশলগত কারণে নদীবক্ষে অস্থায়ী গড় নির্মাণের জন্য এবং নদী ও তার বৃহত্তম বন্দরকে নিয়ন্ত্রণ করতে এলাকার অভ্যন্তরে পা ফেলার জায়গা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাজা পসেনদি শেষপর্যন্ত মল্লগোষ্ঠীজাত দিঘ কারায়ন নামক এক মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন—যাঁর পিতৃব্য মল্ল বন্ধুল-কে উচ্চপদে উন্নীত করার পর তিনি সন্দেহবশে হত্যা করেছিলেন। পসেনদি যখন শেষবারের মতো বুদ্ধ সন্দর্শনে যান তখন তাঁর পুত্র তথা সেনাধ্যক্ষ বিদুদভকে দিয়ে কারায়ন রাজ সিংহাসন দখল করান। বৃদ্ধ পসেনদি এক দাসীকে সঙ্গে নিয়ে রাজগীর পালিয়ে যান। কিন্তু রাত্রে মগধ রাজধানীতে তাঁরা যখন পৌছোন তখন নগরীর সিংহদুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। নির্বাসিত অশীতিপর কোশলরাজ সেই রাত্রেই পথশ্রমে ক্লান্ত হয় প্রাণত্যাগ করেন। ভাগিনেয় অজাতশত্রু রাজকীয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টি করান। এর কিছুদিন পরেই বিদুদভ রাপ্তি-র শুষ্ক নদীখাতে তাঁবু বেঁধে থাকা তাঁর সৈন্যদলসহ অকালবন্যায় ভেসে যান। সুতরাং, পসেনদির ভাগিনেয় হিসেবে অজাতশত্রু যখন এক উৎকৃষ্ট সেনাবাহিনী সমভিব্যাহারে কোশল রাজ্যের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন তখন কোশলের রাজা বা সশস্ত্র সেনাবাহিনী কিছুই ছিল না। এই প্রাচীন রাজ্যটি মনে হয়, বিনাযুদ্ধেই মগধের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়—যদিও পরে, মধ্যযুগে মধ্যভারতের এক রাজ্য এই নামে অভিহিত হত। বুদ্ধ তাঁর উপদেশমালার অধিকাংশই দিয়েছিলেন শ্রাবস্তীতে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রথম পরিষদ আহুত হয় রাজগীরে। এ ঘটনাও প্রমাণ করে যে ৪৮৫ খ্রী.পূ. সময়কালে কোশল তার আগের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছে।

৬.৪ উপজাতিগুলির সঙ্গে তিক্ত লড়াইটাও সে সময় একই সঙ্গে অব্যাহত ছিল—এমনকী, যদিও তারা তখন জমির ওপর বৃহৎ পরিবারগুলির স্থায়ীসত্ত্ব কায়েম হবার কারণে ভিতর থেকেই ভেঙে পড়ার মুখে। তৎকালীন উপজাতিক জীবন কোন বুদ্ধিমান মানুষকে পথ বা তৃপ্তি দিতে পারত না—যদি শাক্য গৌতম (বুদ্ধ) বা লিচ্ছবি মহাবীর মহৎ ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে ভিক্ষুদের নিবৃত্ত করতেন; কিংবা বন্ধুল-র মতো কোন মল্লকে দেখা যেত কোন বিদেশী রাজার সেবায় নিয়োজিত থাকতে। একধরনের অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুষ্ঠান পালন না করে গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ করাটা ছিল উপজাতি আইনের বিরোধী। তা সত্ত্বেও, আমরা পাই বিম্বিসারের লিচ্ছবি রানি চেল্লানা-র কথা—জৈন বিবরণ অনুসারে যিনি অজাতশত্রুর মাতা; অবশ্য, পুরনো নিয়মানুযায়ী বিম্বিসারের সব রানিই কোন না কোন রাজপুত্রের জননী। পসেনদি-ও এক শাক্য স্ত্রীর সন্ধানে ছিলেন। তিনি শাক্যদের

অধীশ্বর ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বংশমর্যাদার বিচারে তাঁর স্থান ছিল নীচুতে। তাই, রাজার এ ধরনের ইচ্ছা শাক্যদের ভীষণভাবে বিব্রত করেছিল। কৌশলে নাগ-মুন্ডা নাম্নী (এঁর নামটি দুই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংযুক্ত নাম অথবা কোন মুন্ডা উপজাতির কৌম) এক দাসীর গর্ভজাত মহানাম শাক্যের সুন্দরী কন্যা বাসব-ক্ষত্তিয়াকে বিশুদ্ধ শাক্য বংশজাত বলে তাঁকে প্রদান করা হয়। এই বিবাহেরই সন্তান সেনাপতি বিদুদভ, যিনি রাজ সিংহাসন দখল করেছিলেন। শাক্যদের এই প্রতারণা অবশ্য পরে ধরা পড়েছিল, কিন্তু পসেনদি শেষপর্যন্ত তাদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু বিদুদভ এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাদের আক্রমণ করেন এবং আক্ষরিক অর্থেই তাঁর সিংহাসন শাক্য রক্তে ধৌত করে নেন। তা সত্ত্বেও স্বল্প কিছু শাক্য সেই গণহত্যার হাত থেকে বেঁচে যায়। অশোকের পূর্বে, পিপ্রহ্ব আধারটি (*জার্নাল অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ লন্ডন* ১৯০৬, ১৪৯-৮০) প্রশ্নাতীতভাবেই শাক্যদের দ্বারা উৎসর্গিত; এবং তা বুদ্ধের মৃত্যুর পরই, কেননা এতে তাঁর দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। পরে সিংহলী রাজারা (যাঁরা বুদ্ধের বংশের কোন কন্যাকে বিবাহে ইচ্ছুক ছিলেন) এক বা একাধিক শাক্য পাত্রীর সন্ধান পান। বস্তুতপক্ষে, শাক্যরা একটি উপজাতি হিসেবে টিকে থাকার শর্তই পালন করেছিল। সামরিক অভিযানের প্রকৃত কারণটা ছিল, রাজতন্ত্র ও উৎপাদনের নতুন রূপের পক্ষে এমনকী আধা-স্বাধীন উপজাতিক অস্তিত্বও ছিল বিপজ্জনক এবং তা মেনে নেওয়া যেত না।

লিচ্ছবিদের বিরুদ্ধে অজাতশত্রুর সামরিক অভিযানের কারণও ছিল একই, যদিও তা ছিল অনেক বেশি কঠিন। লিচ্ছবিরা মল্লদের সঙ্গে একধরনের জোট গঠন করেছিল। নদী ও স্থলপথের সংযোগস্থলের বণিকরা অভিযোগ করছিল যে দু'বার করে শুল্ক দিতে হচ্ছে—একবার নিচ্ছে মগধের রাজার লোকরা, অন্যবার লিচ্ছবিরা। প্রতিকারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্থাপিত হল



চিত্র ২১ : অজাতশত্রুর ছাপ-চিহ্ন (?)।

পাটলিপুত্র—যা পরে মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। আসলে এটি ছিল একটি বেড়া ঘেরা জায়গা, নগর পরিকল্পনাটা গৃহীত হয়েছিল বুদ্ধের জীবনের শেষ বছরে। যেহেতু, এটি ছিল স্থলপথের সঙ্গে নদীর সংযোগস্থল এবং শোন নদীও তখন সেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছিল—তাই একটা সম্পূর্ণ অবরোধ গড়ে তোলা গিয়েছিল। পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল লিচ্ছবিদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধের বীজ বপন করা এবং (প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী) সে কাজটা করা হয়েছিল এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর দ্বারা—যাঁকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য বস্‌সকার নাম দেওয়া হয়েছিল। তিনি, হেরোডোটাস-এর জোপিরাস কাহিনীর মতোই, মগধ রাজদরবারে অপমানিত হয়েছেন এমন ভান করে লিচ্ছবিদের কাছে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তারা তাঁকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে—যার প্রতিদানে তিনি গোপনে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের কাছে কুৎসা রটান। ফলে, খুব তাড়াতাড়িই উপজাতিক সভার কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে, অজাতশত্রুকে বৈশালীতে শুধু সৈন্যই পাঠাতে হয়েছিল। জৈন বিবরণ অনুযায়ী, একটা প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। এই

অনুপুঙ্খগুলি সত্য হোক বা না হোক, পাবা বা কুশিনারার মতো মল্ল অঞ্চলগুলি দেখলে মনে হয় না যে বৈশালী তেমন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল। মল্ল সহযোগীদেরও নিশ্চিতই একই সময়ে পরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। *চুল্লভাগ্‌* (১২.১.১)-তে বৈশালীর ভাজ্জিন (লিচ্ছবি) ভিক্ষু ও সাধারণ অনুগামীদের কথা বলা হয়েছে—কিন্তু তা অজাতশত্রুর একশ' বছর পরের। মগধ শক্তি সংহত হয়ে ওঠায় মল্ল বা লিচ্ছবি—কোনটিই আর জনগোষ্ঠী হিসেবে অস্তিত্ব ফিরে পায়নি (সম্ভবত নেপালের কিছু পার্শ্বশাখা ছাড়া)। অজাতশত্রুর পুত্র অথবা পৌত্র উদয়ন পাটনায় রাজধানীর অবধারিত স্থানান্তরণ সম্পন্ন করেন এবং তা প্রায় আটশ' বছর ধরে ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ নগরী হিসেবে টিকে থাকে।

আনুমানিক ৩৫০ খ্রী.পূ. নাগাদ মগধরাজ মহাপদ্ম নন্দ টিকে থাকা মুষ্টিমেয় ঐতিহ্যশালী ক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীকে (কুরু অথবা পাঞ্চালদের মতো) ধারাবাহিকভাবে নির্মূল করার কাজ সম্পূর্ণ করেন—যা শুরু করেছিলেন বিদুদভ এবং অজাতশত্রু। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে তাদের ধ্বংস হওয়াটা অনিবার্যই ছিল, তবু উপজাতিহীন নতুন রাজাদের পক্ষে সাধারণতন্ত্রের এমন বিপজ্জনক দৃষ্টান্তকে পুনরুজ্জীবিত হতে দেওয়াটাও ছিল অসম্ভব। পুরাণগুলিতে বিলাপ করা হয়েছে যে এর পরের সমস্ত রাজাই ছিল 'শূদ্রসম' এবং প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রমতেও তা সর্বৈব সত্য। অবশ্য এই নিজস্ব শাস্ত্রবিধি ব্রাহ্মণদের পক্ষে জাত নির্বিশেষে সমস্ত রাজার (যেমন, পসেনদি-র) কাছ থেকে দান গ্রহণের পথে বা ক্ষত্রিয় হিসেবে তাদের ভুঁইফোড়ত্বকে শাস্ত্রসম্মত করে দেবার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু মূলগত পরিবর্তন যা ঘটেছিল তা হল, যে কোন গোষ্ঠী-নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র ও ব্যাপক এক চতুর্বর্ণশ্রেণী ব্যবস্থা চরম রূপ পেল। বশ্শকার হলেন জ্ঞাত প্রথম ব্রাহ্মণ মন্ত্রী (ব্রাহ্মণদের পক্ষে এক নতুন পদ)—তাঁর তুলনাহীন কূটনৈতিক ধূর্ততার পুরস্কারস্বরূপ। এই চরিত্রটিকে পুরোপুরি কাল্পনিক বলে বাতিল করাটা শক্ত, কেননা পরবর্তীকালের এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চাণক্য এই বিরোধনীতিকে একটা বিশেষ কৌশল হিসেবে গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন (*অর্থশাস্ত্র,* ১১.১) এবং বিখ্যাত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র *পঞ্চতন্ত্র,* যেখানে রূপকের মধ্য দিয়ে নীতির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তারও তৃতীয় অংশের উপজীব্য বিষয় এটাই।

৬.৫ কাহিনী ও রূপকের পাহাড়গুলি ঝাড়াই-বাছাই করার কষ্টকর কাজের শেষে যা পাওয়া যাবে তার মধ্যে কিন্তু সেই সময়কার সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘটনাগুলিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাহিনীগুলি সবই সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে রচিত—ধর্মের প্রসার। এদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য যে বৌদ্ধ ধর্ম—তা মগধের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। কোটি কোটি এশীয়বাসীর কাছে ভারত এক পুণ্যভূমি হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল কেননা বৌদ্ধ শিক্ষার উদ্ভব ঘটেছিল এখানেই। দীর্ঘযুগ পরেও চীন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া থেকে তীর্থযাত্রীরা উত্তুঙ্গ পর্বত, তপ্ত মরু বা ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পেরিয়ে এ দেশের মাটিতে বারবার এসেছে সারনাথের প্রধান স্তূপের ছায়ায় বসে জটিল ভাষায় তাদের সরল প্রার্থনাগুলি ব্যক্ত করতে; জীর্ণ কাঠামো থেকে খসে পড়া ইঁটের বিপদের কথা মাথায়ও রাখেনি। মঙ্গোলিয়া-তে বৌদ্ধধর্ম পৌঁছেছিল এক মহান সভ্যতার আলোক হিসেবে, চীনে তা ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রধান অবলম্বন (অবশ্য সামন্ত প্রভুদের মধ্যে শান্তিস্থাপনই তার মূল কাজ হয়ে গিয়েছিল)। দুর্গম ও বিরল জনবসতিসম্পন্ন তিব্বতে ধর্ম ও রাষ্ট্র দুই-ই গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ অনুশাসনের ওপর ভিত্তি করে। এই ধর্ম আমাদের জন্য রেখে গেল তান হুয়ান থেকে অজন্তার অপূর্ব গুহাচিত্র, থাইল্যান্ড-বার্মা-ইন্দোচীনের অতুলনীয় মন্দির, আফগানিস্থানের বামিয়ান পর্বতশৃঙ্গের

বিশাল খোদিত মূর্তি। এর কাহিনীগুলি প্রভাবিত করল যীশুখ্রীষ্টের জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বা বারলাম ও জোসাফটের খ্রীষ্টান সাধু-র গল্পকে। কুমরান (ডেড সী) পুঁথি থেকে গবেষকরা যে এসেনীয় 'ন্যায়ধর্মের শিক্ষক'-এর কথা উদ্ধার করেছেন তিনি হুবহু বুদ্ধেরই সমরূপ (*শান্ত* বা *ধম্ম-চক্ক-পবর্ত্তক*) এবং এটা নিশ্চিতই কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ম্যাসিসিয়বাদ (Manicheism)-এর শিক্ষাও নিশ্চিতই বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত এবং ইসলাম ধর্মের লুকমান হয়ত বুদ্ধ স্বয়ং। বার্মেসাইড মন্ত্রী—আরব্য রজনীতে যার কাল্পনিক ভোজ নামটিকে এক বিশেষণের রূপ দিয়েছে—আপাতভাবে তাকে মনে হয় পারস্যের এক বৌদ্ধ শ্রমণ (*পরমক*) পরিবার থেকে আসা।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ধর্মটি কোন বিচ্ছিন্ন উদ্ভব নয়, বরং মগধে জেগে ওঠা প্রায় সমসময়ের অজস্র সদৃশ আন্দোলনেরই তা একটি। সেগুলিরই আর একটি হল জৈনধর্ম—যা আজও ভারতবর্ষে টিকে আছে সেই কারণেই, যে কারণে দেশের বাইরে তার বিস্তার ঘটেনি। অর্থাৎ, অচিরেই তা জাত ও লোকাচারের আবর্তে বাঁধা পড়েছিল—বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে যেটা হয়নি। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক, বা তাঁর পৌত্র দশরথ নিভৃতে ধর্মচিন্তার জন্য আজীবকদের গুহাদান করেছিলেন। এই ধর্মমতটি মগধের বাইরে তুলনামূলকভাবে অপরিচিত ছিল, যদিও খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এর কিছু অনুগামী সুদূর দক্ষিণের কনড়-তেলেগু রাজ্যের কোলার-এ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা,* ১০)। আজীবকরা বহুকাল আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এমনকী তাদের নামও। আরও কিছু ধর্মীয় মতবাদ ছিল—যেগুলির কথা কেবলমাত্র বৌদ্ধ ও জৈন পুঁথিগুলিতে সেগুলির খন্ডন থেকে বা একইরকম বিরুদ্ধবাদিতাপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য *সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ* থেকে আবছাভাবে জানা যায়। *দিঘ নিকায়*-র প্রারম্ভিক সূত্তে বিদ্বেষপূর্ণভাবে এই ধরনের বাষট্টিটি মতের কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। পরবর্তী সূত্তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কীভাবে পিতৃহন্তা অজাতশত্রু আটটি মুখ্য মতবাদকে পর্যালোচনার পর শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রতিই অনুকূল মনোভাব দেখান। তৎকালীন রাজারা যে ধর্মীয় বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষা করতেন তার প্রমাণ বিম্বিসারের সঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিবরণ। 'কাশী'-র অজাতশত্রু ছিলেন ঔপনিষদিক ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষক রাজা জনকের সঙ্গে তুলনীয় (*ব্রাহ্মণ্য উপনিষদ* ২.১)। পসেনদি শুধুমাত্র বুদ্ধেরই ভক্ত ছিলেন না, সেইসঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানও করতেন। এ থেকে বোঝা যায় যে নতুন বিশ্বাসগুলি ছিল কোন আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তারই অভিব্যক্তি, উৎপাদন ভিত্তিতে কোন পরিবর্তনের আভাস।

আলার কালাম ছিলেন এক কোশল ক্ষত্রিয়—যিনি সমাধি (গভীর ধ্যান ও চিন্তার নিবৃত্তি)-র সাতটি স্তর সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন; উদ্দক রামপুত্ত দিতেন আটটি স্তরের। কাশ্যপ পুরান প্রচার করতেন—পাপ বা পুণ্য কর্ম বলে আলাদা কিছু নেই। মক্খালি গোসাল আজীবক ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করলেন এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে যে—কিছুতেই কিছু লাভ নেই, প্রতিটি জীবকেই ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে চুরাশি লক্ষ জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ করতে হবে, যারপব আপনা থেকেই তার দুঃখের অবসান ঘটবে। একটি সুতোর গোলককে ছুঁড়ে দিলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেমন তা খুলতে থাকে, জীবনকেও তেমনি এইসব জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। পুরান ও গোসাল-র ধর্মমত দুটি ছিল প্রায় একই রকম এবং সম্ভবত পরে এ দুটি মিলে যায়। আজীবক ধর্মমতটি দক্ষিণের জৈনদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল, অন্যটির সঙ্গে মিল ছিল সাংখ্য দর্শনের। জৈনধর্মের আরও কাছাকাছি ছিল সঞ্জয় বেলাত্তিপুত্তের অজ্ঞেয়বাদ—যেখানে পাপ বা পুণ্য কর্মের শুভ বা অশুভ

ফল সম্পর্কে পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলতে অস্বীকার করা হয়েছে, অথবা পরলোক আছে কী নেই সে সম্পর্কেও। সঞ্জয়ের প্রধান দুই শিষ্য, ব্রাহ্মণ সারিপুত্ত ও মোগগল্লান (যাঁর স্মৃতিচিহ্নগুলি নিয়ে পৃথিবী পরিক্রমান্তে সম্প্রতি সাঁচিতে জমা দেওয়া হয়েছে) বুদ্ধের মতবাদ গ্রহণ করেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের অন্যতম হিসেবে গণ্য হন। আদি বস্তুবাদী অজিত কেশকম্বল বিশ্বাস করতেন যে দান, পূজার্চ্চনা, ঈশ্বর, পাপপুণ্য প্রভৃতি ধারনার কোন মূল্য নেই—মানুষ যা দিয়ে গঠিত মৃত্যুর পর সেই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ-এই তাকে মিশে যেতে হবে; তার গুণ, আত্মা বা ব্যক্তিসত্ত্বার কিছুই অবশেষ থাকবে না। পকুড় কচ্চায়ন-এর মতবাদ পরবর্তীকালের বৈশেষিকদের মতবাদেরই সমরূপ; তাতে উপরোক্ত চারটি উপাদানের সঙ্গে আরও তিনটি যোগ করা হয়েছে ঃ সুখ, দুঃখ ও জীবন। এগুলিকে ধ্বংস করা, জানা, ব্যাখ্যা করা বা প্রভাবিত করা কোন উপায়ে কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়; যে তীক্ষ্ণ অস্ত্র মস্তক ছেদন করে তা আর কিছুই করে না, শুধু ঘন সন্নিবদ্ধ এই উপাদানগুলির মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে চলে যায়। আরও সুপ্রাচীন জৈন শাস্ত্রগুলি থেকে দু'শতাব্দী আগের পার্শ্ব তীর্থংকর-এর কথা জানা যায়, যিনি অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও ত্যাগের শিক্ষা প্রচার করেছিলেন; এগুলির সঙ্গে মহাবীর যোগ করেন যৌন সংযম। এই সমস্ত ব্রত পালন এবং কঠোর তপশ্চর্যার মধ্য দিয়ে পূর্বজন্মের কৃত পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। বৌদ্ধধর্ম ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ চরিতার্থতা এবং তপস্বীর চরম আত্মনিগ্রহ—এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথ বেছে নিয়েছিল; উর্বরতা কামনা ব্রতের আদিম প্রমত্ত যৌনতা এবং যাদুবিশ্বাসী ওঝার আত্মনির্যাতন উভয়ই নতুন সমাজে অচল বলে পরিগণিত হল। বৌদ্ধধর্মের মূল বাণীই হল মহৎ (আর্য) অষ্টপন্থা ঃ দেহের যথোচিত আচরণ (জীবহত্যা, চৌর্য, অবৈধ যৌন সহবাস থেকে নিবৃত্ত থাকা); যথোচিত বাক্য (সত্যবাদিতা, গুজব প্রচার না করা, কটুক্তি, শাপশাপান্ত বা অলস আলাপ পরিহার করা); যথোচিত লক্ষ্য ও চিন্তা (অন্যের সম্পদে লোভ না করা, ঘৃণা না করা, ভাল ও মন্দ কর্মের ফল অনুযায়ী পুনর্জন্মে বিশ্বাস রাখা)। এগুলির সাথে আরো চারটি যুক্ত ছিল ঃ ন্যায়পথে জীবিকা নির্বাহ, যথোচিত শ্রম, আত্ম-সংযম এবং উন্নত চিন্তার সক্রিয় অনুশীলন। সে যুগের সমস্ত ধর্মমতগুলির মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে কার্যকরী ও সমাজমুখী যেখানে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি ঈশ্বর বা কোন ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্বাস জড়িত ছিল না।

বুদ্ধ, সেই অর্থে, কখনই কোন নূতন ধর্মপ্রতিষ্ঠার দাবি করেননি, বরং সমস্ত প্রকৃতির (অর্থাৎ সমাজের) মধ্যে অন্তর্নিহিত যে মৌল নিয়মকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই ব্যাখ্যা দিয়েছেন; এই নিয়ম, তাঁর মতে, যে কোন গোষ্ঠী আচরিত ক্রিয়াকর্ম—যাকে 'ধম্ম' নামেও অভিহিত করা হয়—তার অতীত। এই তত্ত্ব ছিল এক যুক্তিসিদ্ধ প্রাগ্রসরতা, কেননা সামাজিক দুঃখদুর্দশার কারণগুলিকে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল এবং দেখানো হয়েছিল তা থেকে মুক্তির পথও। যতদূর সম্ভব সঠিক বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রয়োজনকে বুঝে নিতে পারলে প্রয়োজনের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৬.৬ এই সমস্ত ধর্মপ্রচারকদের মধ্যেকার কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল অভিন্ন। এঁদের প্রত্যেকেই প্রথম করণীয় হিসেবে যথেষ্ট মাত্রায় মানসিক ও শারীরিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে গেছেন। এমনকী, যাঁরা বলতেন যে কর্ম থেকে শুধুমাত্র আপতিক ফলই লাভ হয়, তাঁদের জীবনযাত্রাও ছিল লক্ষ্যণীয় রকমের সাধারণ। গোসাল-এর মতো মহাবীরও সমস্ত ধরনের পরিধেয় বর্জন করেছিলেন (যদিও পার্শ্ব তিনটি বস্ত্র গ্রহণ অনুমোদন করেছিলেন)। লিচ্ছবি দেশের এক প্রান্তরে প্রখর রৌদ্রে গোড়ালীর

উপর উপবেশন করে দীর্ঘ এক বছরের যন্ত্রণাদায়ক তপশ্চর্যার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী বুদ্ধ স্ত্রী-পুত্র সহ শাক্য শাসকের জীবন বা কোন জমকালো দরবারের সৈন্যপত্য বা মন্ত্রীত্বের ভবিষ্যৎ ত্যাগ করে পথসন্ধানের তাগিদে বছরের পর বছর ধ্যান, অধ্যয়ন ও আত্মশুদ্ধির পথ বেছে নেন। এই তপশ্চর্যা তাঁদের নিজস্ব কোন আবিষ্কার ছিল না, কেননা এমনকী ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যেও অরণ্যবাসী অহিংস খাদ্যসংগ্রাহকের সরল জীবন বিশেষ উৎকৃষ্ট হিসেবে গণ্য হত। সেই সরল জীবনের অনুকরণীয় শিক্ষাগুলিকে এই ধর্মগুরুরা খাদ্য-উৎপাদক, গোষ্ঠী নিরপেক্ষ এক সামগ্রিক সমাজের জন্য উপস্থাপন করলেন। তাঁরা হিন্দু ছিলেন কী ছিলেন না—এ নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই; এই ধর্মমতগুলিরই অনপনেয় চিহ্নগুলিকে বহন করে হিন্দুধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল অনেক শতাব্দী পরে—কেবলমাত্র তখনই, যখন সেগুলি ম্লান হয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তা থেকে বোঝা যায়, কেন এই ধর্মমতগুলির উদ্ভব ঘটেছিল বা কেন এগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। ব্যতিক্রমহীনভাবে, এমনকী যখন পুরাণ বা সঞ্জয়ের মতো ব্রাহ্মণরাও তা প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন তাঁরাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈদিক রীতি ও অনুষ্ঠানগুলির যুক্তিসিদ্ধতার বিরোধিতা করেছেন। এই সমস্ত ধর্মমতগুলির বিশ্লেষণে অধিবিদ্যাগত সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যের আলোচনার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল পটভূমির উপজাতিক বাহ্য জীবন এবং উপজাতি রাজ্যগুলিতে বলিপ্রথার ক্রমবর্ধমানতার বিষয়গুলি। এগুলির ফলশ্রুতিতেই এবং এদের সমাজবিরোধী বৈশিষ্ট্যের প্রতিবাদ হিসেবেই প্রতিটি ধর্মমত সৃষ্ট হয়েছিল। যজ্ঞে বলিদানের প্রধান লক্ষ্যই ছিল যুদ্ধে জয়লাভ; ক্ষত্রিয় জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে যুদ্ধকে যুদ্ধের কারণেই মর্যাদা দেওয়া হত, অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের কর্তব্য ও জীবিকাই ছিল বৈদিক যজ্ঞবলি সম্পাদন। অন্য দুটি বর্ণের কাজ ছিল উদ্বৃত্ত উৎপাদন করা—যা পুরোহিত ও যোদ্ধারা তাদের স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে নিয়ে নিত; আদিতে এটা ছিল গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য, কিন্তু অচিরেই তা হয়ে উঠেছিল উচ্চবর্ণের মঙ্গল। বৈদিক প্রথাগুলির জন্ম হয়েছিল পশুপালন যুগে, যখন গোষ্ঠী মালিকানাধীন বৃহৎ পশুপাল-ই ছিল সম্পত্তির প্রধান রূপ। নতুন সমাজ চলে এসেছিল কৃষিতে, যেখানে ক্রমবর্ধমান বলিপ্রথায় বেশি বেশি করে পশুহত্যার অর্থই হল উৎপাদন ও উৎপাদক-শ্রেণীর ধ্বংসসাধন। জনসংখ্যার হিসেবে মাথা পিছু গবাদি পশুর সংখ্যা যে শুধু কমে এসেছিল তা-ই নয়—সেগুলি তখন গোষ্ঠীর বদলে কুল বা পরিবারের মালিকানাধীন হয়ে গিয়েছিল এবং পশুপালকদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কৃষিজীবীদের কাছে। আগে যে, বিনিময়ে কিছু না দিয়েই, বলির জন্য সেগুলি নিয়ে নেওয়া হত তার ফলে বৈশ্য শ্রেণীর ওপর এক ধরনের করের বোঝা চাপত। এই বোঝার ফলে ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি অবিরাম ছোটোখাটো যুদ্ধের জন্য বাণিজ্য ও উৎপাদন উভয়ই মার খেত। উপরোক্ত, এমনকী নিষ্ক্রিয় ধর্মমতগুলিও যজ্ঞে পশুবলির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করত, অন্যদিকে জৈন ও বৌদ্ধ-র মতো সক্রিয় ধর্মমতগুলির ভিত্তিই ছিল অহিংসা অর্থাৎ 'হত্যা-নিবারণ'; যুদ্ধেরও যেমন তারা প্রবল বিরোধী ছিল, তেমন যজ্ঞবলিরও।*

* এমনকী বৃষশাবক হত্যাও ছিল অলাভজনক—কেননা চাষের কাজের পাশাপাশি পরিবহনের জন্য ষাঁড়গুলিকে দু'চাকার গাড়ীতে বা ঢাকা শকটে জুতে দেওয়া হত। এগুলির হত্যা পাপ—এই তত্ত্ব সৃষ্টির পেছনে এটা ছিল এক অর্থনৈতিক ভিত্তি। পুরুষ মহিষগুলি এমনই মন্থর যে দীর্ঘ পরিবহনের পক্ষে অনুপযোগী।

সত্য, ন্যায়, অ-চৌর্য, অন্যের অধিকৃত সম্পদ দখল না করা ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় যে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ব্যক্তি-মালিকানাধীন নিজস্ব সম্পত্তির ধারণা বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী গোষ্ঠীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ (গবাদিপশু) ছিল সর্বসাধারণের—যা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কুল বা পরিবারের মধ্যে বন্টন করা হত; বহিরাগতের সম্পদের অধিকার স্বীকৃত হত না। অগম্যাগমন (অবৈধ যৌন সহবাস) বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থেকে পরিবার সম্পর্কিত কঠোর ধারণা এবং গোষ্ঠী বিবাহের ক্রমাবসানের ইঙ্গিত মেলে। এই ধরনের নৈতিকতা ছাড়া, যা এখন স্বতঃসিদ্ধ, বাণিজ্যের কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ে। বুদ্ধের গৃহী ভক্তদের মধ্যে সবচেয়ে একনিষ্ঠ ছিল বণিকরা; একালেও জৈনদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল ব্যবসায়ী। অহিংসার উপদেশ প্রথম ব্যক্ত হবার পেছনেও মৌলিক কারণটা ছিল এই যে, পশুপালন অর্থনীতির তুলনায় কৃষিকাজ প্রতি বর্গমাইলে অন্তত পক্ষে দশগুণ বেশি মানুষের ভরণপোষণ করতে পারে। এর প্রভাব গিয়ে পড়ল, বলিপ্রথার ওপর নির্ভর করেই যাদের জীবিকা নির্বাহ হত সেই বর্ণের ওপর—অন্তত *মহাভারত*-এ স্পষ্টভাবে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে সেই হিসাবে; যদিও এই পবিত্র মহাকাব্যটি যজ্ঞ, সসাগরা মেদিনী জয় এবং পরস্পরকে ধ্বংসের লক্ষ্যে সহিংস গৃহযুদ্ধের মাহাত্ম্য কীর্তনেই পুরোপুরি নিবেদিত রইল। এরপর থেকে শুরু করতে হয়েছিল নতুন দেবতাদের সন্ধান—কেননা ইন্দ্র ও তাঁর অনুগামী দেবতারা বৈদিক যজ্ঞপ্রথার মতোই কলঙ্কিত ও অচল হয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে, এই নতুন মতাদর্শ একইভাবে উপজাতিক সংকীর্ণতারও বিরোধী ছিল। কেননা বলা হয়েছিল, জীবিত প্রাণীর কৃত ভাল ও মন্দ *কর্ম* অনুযায়ী পুনর্জন্ম লাভ হবে; কোন বিশেষ টোটেম হয়ে নয়, বরং কাজের মাপ ও গুণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট যে কোন প্রাণী হয়ে—ইতর পোকামাকড় থেকে দেবতা। ইন্দ্র—তাঁর কাজের বিচারে—স্বার্থপর, আদর্শহীন—তাই দুষ্কর্মের জন্য শেষপর্যন্ত তাঁকে দেবলোক থেকে পতিত হয়ে পশু হয়ে জন্মাতে হবে; বিভিন্ন জন্মের পুণ্যকর্মের মধ্য দিয়ে পতঙ্গও পারে মানবজন্ম লাভ করতে এবং তারপর দেবলোকে উত্তরিত হতে—যদিও সেখানেও সে পুনরায় তার কর্মফলের নিয়মেই বাঁধা থাকবে।

সুতরাং কর্ম হল সেখানে বিমূর্ত মূল্যের* মৌলিক ধারণারই পরিবর্ধিত এক ধর্মীয় রূপ—যা ব্যক্তি, বর্ণ বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ : 'প্রত্যেকেই তার কাজ অনুযায়ী ফল পাবে।' পূর্ববর্তী ঋতুতে বোনা ফসলের বীজ যেমন অঙ্কুরিত ও পরিপক্ক হয় বা ঠিকভাবে শুধে গেলে ঋণ যেমন মিটে যায়—এ-ও তেমনি। কৃষক ও বণিকের কাছে এই তত্ত্ব কত আকর্ষণীয় হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়; এমনকী শূদ্রের কাছেও—যে হয়ত এর সাহায্যে পরজন্মে রাজা হবার আশা পোষণ করতে পারত। আরও একটা কথা, প্রথমদিকে এই সমস্ত ধর্মের অধিকাংশেরই পালন ছিল বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম

* 'মূল্য' শব্দটি এখানে বিমূর্ত অর্থে ব্যবহৃত হল অর্থনীতিবিদদের সংজ্ঞা অনুযায়ী, যাঁরা এখন বলছেন যে, মূল্য পরিমাপ করা হয় সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম সময়ের দ্বারা—কিন্তু সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্য, ব্যবহার-মূল্য, বিনিময় মূল্য এবং বিমূর্ত অর্থে মূল্য-র মধ্যে পার্থক্যও টানছেন। এই ধরনের বিশ্লেষণ খাদ্য উৎপাদনের সেই শৈশবাবস্থায় আশা করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিকৃত কোন সামাজিক কাজ (ভাল বা মন্দ)-এর পরিণতি হিসেবে এক বিমূর্ত (তার পক্ষে) শুভ বা অশুভ ফলের যে ধারণা—তা নিশ্চিতই কোন খাদ্য উৎপাদনকারী সমাজে অনুভূত হয়েছিল। এ থেকেই 'কর্মে'র ব্যাখ্যা মেলে।

পালনের চেয়ে অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ। শ্রমণ ভিক্ষু ও তপস্বীরা উৎপাদনে কোন অংশ নিত না— কেননা তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী শ্রম করাটা ছিল নিষিদ্ধ, কিন্তু উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামান্যতম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও তারা করত না। গৃহ, জমি বা গবাদি পশুর মালিকানা, স্বর্ণ বা রৌপ্যের স্পর্শ, বাণিজ্য—এ সবই ছিল তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ভিক্ষুদের প্রাণধারণ করতে হত ভিক্ষান্নের ওপর—যার ফলে হয়ত দিনে একবার যে কোন দাতার হাত থেকে নোংরা খাবার জুটত, না জুটলে উপবাস। ফলত ভিক্ষুরা গোষ্ঠী বা বর্ণ আচরিত ভোজন সংক্রান্ত যে নিষেধ—তা ভেঙে ফেলল। এই ভিক্ষু জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বানপ্রস্থ জীবনের তফাত ছিল। এমনকী অরণ্যেও ব্রাহ্মণদের নির্জনবাসী হতে হত না—কেননা তাদের সঙ্গে থাকত এক বা একাধিক স্ত্রী এবং একদল শিষ্য। তাছাড়াও, বনে তারা জীবিকা নির্বাহ করত পশুপালন ও খাদ্য সংগ্রহ করে (প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী, কোন প্রাণী হত্যা ছাড়াই)। ভিক্ষুদের ক্ষেত্রে দীক্ষাগ্রহণের সময় শুধুমাত্র পরিবারই নয় সেই সঙ্গে বর্ণ ও গোষ্ঠীও ত্যাগ করতে হত—যার অর্থ গোষ্ঠী-প্রতিম এক সংঘের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তার নিজস্ব বলে বড়জোর থাকত তিনখণ্ড পরিধেয় বস্ত্র (ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে নেওয়া হলে ভাল হয়), ভিক্ষাপাত্র, সূঁচ-সুতো এবং ক্ষুর; সম্ভবত একটা তেলের শিশি এবং পা যদি নরম হয়, একজোড়া পাদুকা। বর্ষার চারমাস তাকে শক্তপোক্ত কোন আশ্রয়ে বাস করতে দেওয়া হত বটে, কিন্তু বাকি সারাবছর ঘুরে বেড়াতে হত নতুন নতুন মানুষদের কাছে বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজে। বুদ্ধ নিজেও তাঁর অশীতিবৎসরের জীবনান্ত পর্যন্ত এই নিয়ম অনুসরণ করে গেছেন। তাঁর শিষ্যেরা নবসৃষ্ট বাণিজ্যপথগুলি ধরে এমনকী আদিম উপজাতি মানুষদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল শান্তির বাণী বহন করে, কিন্তু সেইসঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল মগধ বাণিজ্যের প্রভাবও। তারা বাস করত সাধারণ মানুষের কাছাকাছি, উপদেশ দিত সাধারণ মানুষের ভাষায়—সে তুলনায় ব্রাহ্মণরা একচেটিয়াভাবে ব্যবহার করত অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু কৌমার্যব্রত এবং কঠোর জীবনযাপনের কারণে বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল সীমিত। প্রাচীন সুত্তগুলির বিবরণ অনুযায়ী বুদ্ধ যখন মারা যান তখনও সংঘ সন্ন্যাসীর সংখ্যা ৫০০-র বেশি হয়নি; কেবলমাত্র *সমন্ন-ফল-সুত্ত*-তেই আরও বেশি সংখ্যার (১২৫০ জন) কথা বলা হয়েছে।

একই অর্থনৈতিক কার্যকারণ সূত্রে নতুন ধর্মমতের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও 'সর্বব্যাপী রাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল—অজস্রের বিরতিহীন যদৃচ্ছ পীড়নের পরিবর্তে একের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমতা। চতুর্বর্ণ ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগজাত 'স্বাভাবিক অধিকার'-এর ফলে সৃষ্ট সামাজিক সংঘাতগুলিও নিচের দিকে নিশ্চিতই কমে এসেছিল; তার একটি কারণ, সর্বোচ্চ স্তরে সমস্ত বর্ণ-উর্দ্ধ অতি-সম্ভ্রান্ত এক নতুন শ্রেণীর উপস্থিতি, এবং আর একটি কারণ, ভিক্ষুদের দ্বারা সফলভাবে ব্রাহ্মণ্য সহজাত-উৎকৃষ্টতার দাবির বিরোধিতা। অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, ব্রাহ্মণ্য প্রথা তখন কেবলমাত্র রাজা, অভিজাতবর্গ,দলপতি বা সবচেয়ে ধনী বণিকদের দ্বারাই অনুসৃত হত—কিন্তু সাধারণ মানুষদের কাছে তার কোন গুরুত্ব ছিল না। সে তুলনায় পরবর্তীকালের পূর্ণ বিকশিত ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে যে কোন মানুষের এমনকী তুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করে দিত। বৌদ্ধরা নিজেদের ধর্মকে 'আর্য' বলে অভিহিত করেছিল এবং এইভাবে ভূমিজ উপজাতি ও নিম্নবর্ণের মানুষদের যথাযথ কর্মের মধ্য দিয়ে উন্নীত হবার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এটা ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিপরীত।

মজ্ঝিম নিকায় (৯৩)-এর বিবরণ অনুসারে বুদ্ধ তরুণ ব্রাহ্মণ অস্সলায়ন-কে বলেছেন, 'তোমরা শুনেছ যে যোন, কম্বোজ এবং অন্য (সন্নিহিত) সীমান্ত অঞ্চলে দুটি মাত্র বর্ণ আছে ঃ আর্য এবং দাস। কেউ আর্য থেকে দাস হয়ে যেতে পারে, আবার কেউ দাস থেকে আর্যও হতে পারে।' যোন (আইওনিয়া) নামটি আফগানিস্থানের অংশবিশেষের—যা থেকে বোঝা যায় যে এই রচনাংশটি আলেকজান্ডারের পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ের আগে লেখা হতে পারে না। বুদ্ধ *ঋগবেদের* দুই-বর্ণ প্রথার কথাও বোঝাতে চাননি, কেননা সেখানে আর্য দাসে রূপান্তরিত হতে পারত না। নিশ্চিতই গ্রীক দাসত্বের কথাই তিনি বলেছেন। যেহেতু উল্লেখ করার মতো দাস-মালিকানার প্রচলন ভারতবর্ষে ছিল না, তাই যিনি সুত্ত রচনা করেছেন তাঁর কাছে গ্রীকদের 'মুক্ত' এবং 'দাস'-কে আর্য ও দাস বর্ণের সমার্থক বলে মনে হয়েছে; কিন্তু, চতুর্বর্ণ প্রথাকে এক ধরনের প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে খাড়া করার যে তত্ত্ব তাকে নস্যাৎ করার জন্য এটাই ছিল যথেষ্ট। জৈনধর্মে জাতপ্রথার স্বীকৃতি ছিল, এমনকী আদি চারটি বর্ণকে মিশ্রিত করে একটি নতুন তত্ত্বও সেখানে খাড়া করা হয়েছিল। মহাবীরকে সেখানে ভ্রূণের অদলবদল ঘটিয়ে এক ব্রাহ্মণের বংশজাত বলে বর্ণনার চেষ্টা করা হয়েছে; তিনি ছিলেন কাশ্যপ গোত্রীয়, তৎকালীন ইউ.পি-তে যারা ছিল উল্লেখযোগ্য অংশ এবং তারপর থেকে 'নব্য ব্রাহ্মণ'দের মধ্যেও।

দিঘ নিকায় (৫) গ্রন্থে বুদ্ধ মহাবিজিত নামের এক রাজার কাহিনী বর্ণনা করেছেন—যাঁকে তাঁর অগ্নিহোত্রী বৈদিক যজ্ঞ নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরিবর্তে, প্রজাদের সমৃদ্ধি ও চুরি-ডাকাতি বন্ধের জন্য পুরোহিতের পরামর্শ ছিল যে, রাজা যেন কৃষকদের বীজ, বণিকদের মূলধন, এবং রাজকর্মচারী হতে যারা ইচ্ছুক তাদের জন্য উপযুক্ত নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, বিদ্রোহ দেখা দেবে না এবং রাজস্ব ঠিকভাবে আদায় হয়ে রাজকোষ পূর্ণ হবে। এটা নিশ্চিতই সমস্যা সমাধানের এক আধুনিক পদ্ধতি। আরেকটি সুত্ত (*দিঘ নিকায়* ২৬) অনুযায়ী রাজা, দারিদ্র্যের কারণে বেড়ে ওঠা ছিঁচকে চুরি বন্ধের জন্য দয়া-দাক্ষিণ্য করেও ব্যর্থ হন। এতে চোরেরাই উৎসাহিত হয়। এরপর কঠোর শাস্তি প্রদান করার ফলে শুরু হল সশস্ত্র ডাকাতি, বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা। সুতরাং, 'পিতা-মাতা বা অন্য আত্মীয়দের মতোই গবাদিপশু হল আমাদের বন্ধু; চাষের জন্য তাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। তারা খাদ্য, শক্তি, সৌন্দর্য ও সুখের উৎস—এটা জেনেই আগেকার ব্রাহ্মণরা গবাদি পশু হত্যা করত না।'—প্রাচীন পালিভাষ্যের এই বক্তব্য কোন কুসংস্কার-প্রসূত নয়, বরং সমকালীন অর্থনৈতিক বাস্তবতারই বহিঃপ্রকাশ। সে তুলনায় ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্কের স্থূল ঘোষণা যে তিনি গোমাংস ভক্ষণ করে যাবেন বা ঔপনিষদিক অতীন্দ্রিয়বাদ—যেখানে আচার-অনুষ্ঠান ও পশুবলির অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে—তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। খাদ্যের যোগানে কৃষির গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম থাকা যুগের জীবনযাপন পদ্ধতিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণরা আঁকড়ে পড়ে ছিল। কিন্তু সে পদ্ধতি বেশিদিন অনুসরণ করা গেল না যখন উন্মুক্ত বাধাহীন প্রান্তরের জায়গায় জায়গায় ঘন চাষের খেত গড়ে উঠল—যেখানে নিষ্ফলার সময় ছাড়া গবাদি পশুর পালকে আর চরতে দেওয়া যায় না।

শ্রমণ-রা যদিও নিজেরা বর্ণত্যাগ করেছিল, কিন্তু সমাজ থেকে বর্ণপ্রথা উচ্ছেদের লড়াইটা কোন ধর্মই চালায়নি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘ পরিচালিত হত অনেকটা উপজাতিক 'সভা'-র ধাঁচে, কিন্তু বৌদ্ধ কর্মবিধির লক্ষ্য ছিল উপজাতি, বর্ণ বা ধর্মবিশ্বাসের অনেক উর্দ্ধের এক শ্রেণী-

সমাজ। এ কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, আমরা এমন একটা সময়ের কথা আলোচনা করছি যেটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের *প্রারম্ভিক* কাল এবং এই শ্রেণীবিভাগ উৎপাদনের নতুন রূপের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত যে তার অবসান সমগ্র মানব অস্তিত্বকে সেই চরম সংকটের মধ্যে ঠেলে না দিলে সম্ভব ছিল না—যার কথা বৌদ্ধ উপদেশের মধ্যে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। একটি বিখ্যাত গাথায় বৌদ্ধধর্মের মর্মার্থকে ব্যক্ত করা হয়েছে এইভাবে যে, তা 'সেই সমস্ত প্রপঞ্চের কারণ নির্ধারক যা এক কারণ থেকেই উদ্ভূত, এবং তার নেতিকারক।' দ্বন্দ্বতত্ত্বে সমস্ত কার্য-কারণ সম্বন্ধের প্রথম ধাপই হল নেতি। উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছনোর জন্য ('নেতির নেতিকরণ' দ্বারা) অপরিহার্য হল অধিক উৎপাদনশীল সমাজ-রূপের মধ্য দিয়ে অধিক প্রগতি—যা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর উৎপাদন সংগঠনের প্রাথমিক কাঠামোর মধ্যে আশা করা যায় না। অগভীর পাঠকের কাছে এখন বৌদ্ধ 'নির্বাণ'-কে মনে হতে পারে যেন সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। কিন্তু প্রথম যখন ব্যক্ত হয়েছিল, তা ছিল এক নেতিকরণ—চিহ্নহীন অপৃথকীকরণযোগ্য অবস্থায় ব্যক্তিসত্ত্বার প্রত্যাবর্তন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হতে হলে কেবলমাত্র বহুজন্মের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত পূর্ণতা অর্জন করে যেতে হবে, যতক্ষণ না ব্যক্তি সত্ত্বা নিজ প্রয়াসে কর্মের দাসত্ব বা পুনর্জন্মের প্রয়োজনীয়তার হাত থেকে মুক্তি পায়। শ্রেণীহীন, পার্থক্যহীন সমাজের স্মৃতি এক স্বর্ণযুগের কাহিনী হয়েই রয়ে গেল (*দিঘ নিকায়* ২৭; তুলনীয় *স্ট্র্যাবো* ১৫.১.৬৪-র কলনোস) যখন সুন্দর পৃথিবী শ্রম না নিয়ে আপনা থেকেই প্রভূত খাদ্যের যোগান দিত—কেননা মানুষের তখন সম্পত্তিও ছিল না, লোভও ছিল না। ব্যক্তির বদলে সমষ্টি, সমাজ, সম্মিলিত প্রয়াস, সামগ্রিকভাবে সমাজের শ্রেণীহীন অবস্থায় ফিরে আসা, উৎপাদনের এক অতি উচ্চস্তরে উত্তরণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক শক্তির মতো নীরব ন্যূনতম মানবিক প্রয়াসে সকলের প্রয়োজন পূরণ—গত শতাব্দীর আগে পর্যন্ত তার কথা কল্পনা করা হয়নি।

৬.৭ (এই অংশটিকে কঠিন প্রায়োগিক চরিত্রের কারণে পরিশিষ্ট হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং প্রথম পাঠের সময় বাদ-ও দেওয়া যেতে পারে।) অজাতশত্রুর পর থেকে মগধ ক্রমশই অপ্রতিরোধ্যভাবে বিস্তারলাভ করতে থাকে। অবন্তী জয় করা হয়েছিল কোন এক অজ্ঞাতকালে; তক্ষশীলা, পেশোয়ার অঞ্চল এবং আফগানিস্থানের একটি বড় অংশ জয় করেন মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত। মুদ্রা তৈরির উপযোগী ভাল পরিমাণ রূপো তক্ষশীলার মধ্য দিয়ে ভারতে এসেছিল এবং গ্রীক কৃষ্ণ মৃৎপাত্রও সম্ভবত প্রথম এখানে এসেছিল তক্ষশীলা থেকেই—যার ভারতীয় পরিবর্ত পাঠানো শাতবাহন পর্বে একসময় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই পরিবর্তটি ছিল নিশ্চিতই বাণিজ্যিক মৃৎপাত্র—যা স্থায়ী চুল্লিতে জটিল প্রক্রিয়ায় পোড়ানো হত; এবং সেইসঙ্গে, সম্ভবত দূরবর্তী দেশে ব্যবহারের উপযোগী এক উৎকৃষ্ট মদের উৎপাদনও করা হত। নথিপত্র থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃত শিক্ষা ইত্যাদির মতো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তক্ষশীলার উচ্চ খ্যাতির কথা জানা যায়। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের মতো মগধ রাজবৈদ্য জীবকও তক্ষশীলায় পাঠগ্রহণ করেছিলেন; চন্দ্রগুপ্ত (গ্রীক নথিতে যিনি সান্ড্রাকোট্টস বা আন্ড্রাকোট্টস নামে অভিহিত) নিজেও সম্ভবত বাল্যাবস্থায় ঐ অঞ্চলে আলেকজান্ডারকে দেখেন। তক্ষশীলা রাজ্যের আরেক অবদান পানিনির ব্যাকরণ। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে ক্ষমতাশালী এক সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিবর্তিত হওয়াটাই শেষপর্যন্ত তক্ষশীলার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটনায় কিন্তু তক্ষশীলার ওপর তার

নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজপ্রতিনিধির মাধ্যমে। এ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল ৩০৫ খ্রী. পূ.-এর আগে, সম্ভবত দশ বছর আগে। তা সত্ত্বেও, মুদ্রাগুলিকে নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বিজয়ের অনেক আগে থেকেই তক্ষশীলায় মগধের একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল।

এই বিশ্লেষণ[৪] অবশ্য করতে হবে এক নতুন ও কঠিন যুক্তি এবং অঙ্কশাস্ত্রীয় জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে—কিন্তু তা হবে বিশুদ্ধভাবেই বস্তুগত, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কোন মুদ্রাকে তার গঠন, ধাতু এবং প্রচলিত কাহিনীর সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়; এর মধ্যে শেষোক্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা মুদ্রাতত্ত্বকে লিপি খোদাই বিদ্যার একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কাল উল্লেখহীন মুদ্রাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয় নঞর্থক প্রমাণের দ্বারা, অর্থাৎ প্রত্নতাত্ত্বিকদের ক্রম অনুসারে এই স্তরের আগে পর্যন্ত তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু আলোচ্য অঞ্চল ও কালপর্বের লিপিহীন মুদ্রাগুলিকে বিশ্লেষণের পক্ষে এই পদ্ধতির কোনটিই উপযুক্ত নয়। চিহ্নগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে পাঞ্চ-এর সাহায্যে মুদ্রার ওপর মারা হত, যার ফলে একটি অপরটির ওপর পড়ে যেত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কোন একটি মুদ্রার ছাপের সামান্য অংশই শুধু বোঝা যায়—অর্থাৎ, অনেক নমুনার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে, ছাপ-চিহ্নিত মুদ্রা বিশ্লেষণের জন্য ধৈর্য, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি, দীর্ঘ অনুশীলন এবং দুর্লভ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রখর কল্পনাশক্তির দরকার। এসবের পরেও, মুদ্রাগুলিকে কেবলমাত্র রাজ-ঘোষণার বক্তব্য অনুসারে বিভক্ত করা যেতে পারে—যার লিপি-বর্ণমালা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। তারপরের সমস্যা হল বিভাগগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো। মুদ্রাতত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসেবে নিলে তবেই তা করা যেতে পারে। কোন মুদ্রার আসল কাজ—কাহিনী, ছবি বা ধর্মীয় চিহ্ন বহন করা নয় বরং একটা নির্দিষ্ট ওজনে কাটা ধাতুখণ্ডকে বাজারে চালু করা। মুদ্রার প্রতিটি সেট-কে এমনভাবে ছাপতে হয় যাতে ওজনের পার্থক্য থাকে এবং এটাই মুদ্রা ছাপার কারিগরি বৈশিষ্ট্য। যত নিখুঁত তৌলযন্ত্রই হোক না কেন, কোন দুটি নমুনা—এমনকী নতুন অবস্থাতে মাপলেও—ঠিক একই ওজন আসবে না। চালু থাকার সময় প্রতিটি লেনদেনে মুদ্রার ধাতুও অল্প অল্প ক্ষয় হতে থাকে। আবার, কোন দুটি মুদ্রা ঠিক একইভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মুদ্রার বর্গের ক্ষেত্রে, অবশ্য গড় ওজন কমে যায় এবং তফাত বাড়ে; উভয়ক্ষেত্রেই চালু থাকার সময়কালের সঠিক অনুপাতে এটা ঘটে—যদি কী-না ক্ষয়টা যুক্তিসঙ্গতভাবে একইরকম হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর সঠিক প্রচলনকাল জানা মুদ্রাগুলির ওপর এটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। অবশ্য বলা যতটা—কাজটা ততটা সহজ নয়, কেননা এমনকী আধুনিক পরিমাপ যন্ত্রেও এক একটি নমুনাকে ঠিকভাবে ওজন করতে অন্তত তিন মিনিট করে সময় লাগবে। এখানে যে সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে তা সমস্ত পর্বের ১২০০০ মুদ্রার এইভাবে ওজনের ওপর ভিত্তি করে বলা (আমি নিজে করেছি); এর মধ্যে, প্রায় ৪০০০ মুদ্রার ওপর ছাপ মারা। উপাত্তগুলির মূল্যায়ন করা হয়েছে আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে। সরলরেখা—যা গড় ওজন কমে যাওয়ারই সূচক—প্রাচীন মুদ্রাগুলির ক্ষেত্রে তা আসেনি। অর্থাৎ, প্রাপ্ত প্রাচীনতম কোন শ্রেণীর মুদ্রাগুলি সাধারণভাবে বেশি ওজনের। কারণটা হল, বেশি ক্ষয়ে যাওয়া মুদ্রাগুলি বেশি হাতে ঘুরেছে এবং বেশি তাড়াতাড়ি; ফলে হয় অচল হয়ে গেছে, অথবা এতটাই ক্ষয়েছে যে সেগুলির জন্য নির্দিষ্ট বর্গে সরিয়ে নিতে হবে; বর্গান্তরণযোগ্য এমন প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি অবশ্য তাদের সময়ের অনুপাতে প্রচলিত থাকেনি।

এই নীতিগুলি অনুসরণের জন্য কয়েকটি শর্তের পূরণ আবশ্যিক। শুরুতেই, মুদ্রাগুলি যথেষ্ট নির্ভুল ওজনে কাটা দরকার যাতে তাদের প্রাথমিক তফাতটা প্রচলনের কারণে পরিবর্তনের চেয়ে

বেশি না হয়। প্রাচীন পর্বের তামা, দস্তা, বা এমনকী বিলোন-এর মুদ্রাগুলির কথা স্বতন্ত্র; মেশিনে নির্মিত ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পাইগুলিকে (সাধারণভাবে প্রচলিত নয়) বাদ দেওয়া দরকার। আবার, প্রচলনটাও অবশ্যই যথেষ্ট নিয়মিত হওয়া দরকার—যাতে প্রকৃত প্রভাব পড়ে; এক্ষেত্রে সাধারণভাবে স্বর্ণমুদ্রাগুলিকে বাদ দিতে হয়, কেননা সেগুলি প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশি হাত না ঘুরে সঞ্চিত হয়, আবার সেই সঙ্গে ফুটো করা বা ভারতে পরশপাথরে ঘষার সম্ভাবনাও থাকে। সবশেষে, বর্গগুলিকে হতে হবে যথেষ্ট বেশি সংখ্যক মুদ্রা সমন্বিত এবং তুলনীয় ইতিহাস সমেত অর্থাৎ মুদ্রাগুলিকে একই ভাণ্ডারের হতে হবে। যেমন, ১৯৪২-এ মিনান্দার একটি মুদ্রা পুনার বাজারে প্রচলিত ছিল; এটির ইতিহাস এখানকার সঙ্গে তুলনীয় নয়। হয়ত, মিনান্দার মুদ্রাটি পাওয়া গিয়েছিল ওয়েলসে (*ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুইটি,* ৩৪, ১৯০৫, পৃ. ২৫২) রোমক নমুনাগুলির সঙ্গে, বা পাঞ্জাবে—কোন খননের সময়। এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সমস্ত দেশের সব ধরনের মুদ্রা একই রকম দেখতে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যে প্রত্যন্ত গ্রামেও গ্রহণ করা হত। তাছাড়া, ব্রিটিশ-পূর্ব পুরু ছাঁচে ঢালা মুদ্রা ও কড়ির প্রচলনও ছিল—যদিও তা আইনত স্বীকৃত ছিল না। ভাণ্ডারটিকেও অবশ্যই যথাযথভাবে সংরক্ষিত হতে হবে, তা না হলে মুদ্রার ওপর কঠিন প্রলেপ পড়ে এমন এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসবে যে প্রচলনজনিত ক্ষতিটাকে ধরা যাবে না। মাটি যদি স্যাঁতসেঁতে হয়, যা ভারতবর্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটে, তাহলে শতাব্দীর পর শতাব্দী মাটির নীচে থাকার ফলে সংকর ধাতুর মুদ্রার তামা মুদ্রার উপরিস্তরে উঠে আসবে, নীচে থাকবে নরম রূপা। এই 'তাম্র-বিয়োজন' অন্য দেশেও পরিচিত। ভারতীয় মুদ্রাবিদরা এই গলিত তামার অংশটিকে আলাদা করে নিতে চান—যাতে তা অবশিষ্ট রূপোর মধ্যে পুরে ওজন করা যায়; কিন্তু প্রায়োগিক দিক থেকে এটা অসম্ভব পদ্ধতি। অনেকগুলি ভাণ্ডারের সন্ধান পেলে একাধিক ভাণ্ডারের সাধারণ মুদ্রাগুলির আপাত তুলনা করা যেতে পারে। ভারতবর্ষে এ কাজটা এখনও কঠিন—কেননা এগুলি যাঁদের কর্তৃত্বাধীন তাঁরা যথাযথ বর্ণনা ও ওজন উল্লেখ করে প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে পারেন না, বা অপরকেও গবেষণা করতে দেন না। এই প্রেক্ষিতে, সমস্ত ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এক নতুন পদ্ধতি বিষয়ে দীর্ঘ অবতারণা নিশ্চয়ই পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে না।

এই ভাণ্ডারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তক্ষশীলার ভির স্তূপেরটি—যা ১৯২৪ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল। শুকনো মাটি, তাছাড়া প্রায় এক লিটার আয়তনের ব্রোঞ্জের জারের মধ্যে মুদ্রাগুলি থাকার জন্য তা অত্যন্ত ভালভাবে রক্ষিত আছে। আলেকজান্ডারের দুটি এবং তাঁর উন্মাদ বৈমাত্রেয় ভাই ও স্বল্পকালের উত্তরসূরি ফিলিপ আরহিদাইওস-এর একটি মুদ্রা থেকে ভাণ্ডারটির আনুমানিক কালনির্ণয় সম্ভব হয়েছে। শেষোক্তজন যেহেতু অল্প মুদ্রারই প্রচলন করেছিলেন বা তক্ষশীলা তাঁর প্রকৃত শাসনাধীন এলাকা থেকে অনেক দূরবর্তী ছিল এবং নমুনাগুলিও টাঁকশালের অবস্থাতেই রয়ে গেছে—তাই সবচেয়ে বিপজ্জনক যে অনুমান, অর্থাৎ মুদ্রাগুলি প্রচলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চিত করা হয়েছিল—তা যুক্তিসঙ্গতই হতে পারে। ভাণ্ডারটির কালনির্ণয় করা হয়েছে ৩১৭ খ্রী.পূ.—যখন আরহিদাইওস-কে বন্দী করে হত্যা করা হয়েছিল। সেখানে পারস্য সাম্রাজ্যের একটি দারিক (যা তক্ষশীলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, অন্তত নামে), স্থানীয় ছোটোখাটো বিনিময়ের উপযোগী ৭৯টি টুকরো এবং স্থানীয় মান ও চিহ্ন সম্বলিত ৩৩-টি বাঁকানো পাত-এর মুদ্রাও পাওয়া গেছে। এগুলি যখন উদ্ধার করা হয় তখনও সেখানে

১০৫৯টি ছাপমারা মুদ্রা থেকে গিয়েছিল—সেগুলির ধরণ মগধ ও মগধ প্রভাবিত সমস্ত জায়গায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া মুদ্রাগুলিরই মতো। এগুলি হল মোহেঞ্জোদারোর 'ডি' শ্রেণীভুক্ত ওজনের (প্রায় ৫৪ গ্রেন); অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকার খননে পাওয়া, নিখুঁতভাবে কাটা ও অত্যন্ত সুরক্ষিত 'ডি' শ্রেণীর পাথরের বাটখারাগুলির ওজন পার্থক্যের যে বিন্যাস এখানকার ৯৫ শতাংশ মুদ্রাই তার অন্তর্ভুক্ত। এই মানটি ঐতিহ্যগত 'কার্ষাপণ'-এর ৩২-রক্তিকা ওজনের সঙ্গে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বারবার নিজস্ব পৃথক পৃথক চিহ্নের ছাপ মারার কারণে কার্ষপণগুলিকে দেখতে যদিও এবড়োখেবড়ো কিন্তু সেগুলি উল্লেখযোগ্য রকমের উন্নত প্রস্তুতি এবং পরবর্তীকালে প্রচলিত যে কোন মুদ্রার চেয়ে উৎকৃষ্ট। এগুলির ধাতুমিশ্রণ চমৎকার; তাছাড়া, ওজনও যুদ্ধপূর্ব ব্রিটিশ-ভারতীয় টাঁকশালের টাকার মতোই নিখুঁতভাবে নিরূপিত। এর ফলে প্রচলনকালীন-প্রভাব নির্ণয় অনেক সহজ হয় এবং কাল অনুযায়ী সাজানোও যায়। আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই কালানুক্রমিক বিন্যাসের সহায়ক। মুদ্রার 'হেড' ও 'টেল'-এর চিহ্ন ছাপ-এর পদ্ধতি আলাদা। প্রতিক্ষেত্রেই, মুদ্রার প্রধান দিকে (হেড) থাকে পাঁচটি চিহ্ন—যার প্রত্যেক চার চিহ্নসমষ্টি হল কোন রাজার প্রতিনিধিত্বকারী এবং পঞ্চম চিহ্নটি প্রচলনকারী কর্তৃত্বের—অর্থাৎ, যুবরাজ, মন্ত্রী, প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা এই রকম কারো। চারটি চিহ্নের মধ্যে প্রথমটি হবে 'সূর্য-প্রতীক'—যা এই ধরনের সমস্ত মুদ্রাতেই থাকে। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ছয় অর বিশিষ্ট চাকা—যদিও অরগুলি বেড়ের মধ্যে না থেকে বেরিয়ে এসে শুধু বাইরের ছটি 'বিন্দু'-তে লেগে আছে; ছয়-বিন্দু বিশিষ্ট এই নির্দিষ্ট আকারটি মনে হয় কোন রাজবংশের বৈশিষ্ট্যসূচক। তৃতীয় চিহ্নটিও প্রায়শই ঐ ছয়-বিন্দু সমন্বিত চাকা, সুতরাং চতুর্থটিই হল রাজার প্রকৃত সিল। অশোকের ক্ষেত্রে এটি ছিল 'রাজদণ্ড'। মুদ্রাগুলির মধ্যে সেগুলিই ছিল একমাত্র যা সেই মহান সম্রাটের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করেছে বা করতে পারে। এই মুদ্রাগুলি থেকে ঘটনাক্রমে বৌদ্ধ শাস্ত্রোল্লিখিত দু'জন অশোকের ব্যাখ্যা মেলে—কেননা একই রকমের চিহ্ন সম্বলিত প্রথম জনের মুদ্রাও তক্ষশীলার ভাণ্ডারে পাওয়া গেছে, কিন্তু তাঁর শাসন ছিল নিশ্চিতভাবেই খুব অল্পদিনের (চিত্র-২৩)। পালি নথিগুলিকে যখন প্রথম একত্রিত করা হচ্ছিল—সেই অশোক-যুগের মানুষেরা উভয় মুদ্রাকেই নিয়মিত প্রচলিত থাকতে দেখেছে, কিন্তু তারা জানত যে প্রাচীনটি তাদের বর্তমান শাসক ধর্মপ্রাণ অশোকের (ধম্মাশোক) নয়; সুতরাং সেই রাজাকে কালাশোক ['প্রাচীন অশোক' বা 'কালো' (বৌদ্ধ নয়) অশোক] নামে উল্লেখ করা হত এবং সেভাবেই তাঁর নাম নথিবদ্ধ হয়। পঞ্চম চিহ্নটি প্রায়শই দেখতে হয় অন্য আর একটি বর্গের 'চতুর্থ' চিহ্নটির মতো—যেমনটা আমরা কোন পিতা-পুত্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে আশা করতে পারি। দুটি অথবা তিনটি ক্ষেত্রে পুরাতন কোন বর্গের মুদ্রাগুলির ওপর শুধুমাত্র প্রধান চিহ্নটির ছাপ মেরে পরবর্তী রাজারা পুনঃপ্রচলন করেছেন। এটা সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে শাসক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী এবং ঐতিহাসিক কালে জোঘলতেম্ভি ভাণ্ডারের নহপাণ মুদ্রাই তার প্রমাণ; এই মুদ্রাগুলির অন্য পিঠে বিজেতা রাজা শাতকর্নি-র ছাপ মেরে পুনঃপ্রচলন করা হয়েছিল।

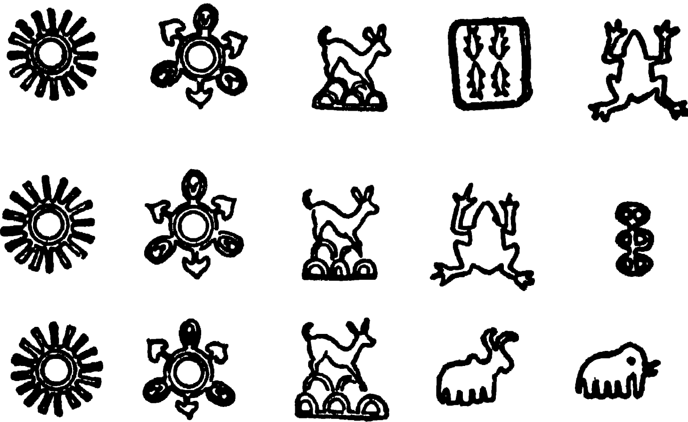
মনে করা হতে পারে যে এই ধরনের বিন্যাসের ফলে মুদ্রাগুলিকে (ক্রম অনুযায়ী) রাজ বংশলতিকার নামের সঙ্গে যুক্ত করে মুদ্রা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে অসুবিধাটা হল নথিগুলির চরিত্রের জটিলতা। ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ নথিগুলিতে একই রাজার ভিন্ন ভিন্ন

নাম উল্লেখ করা হয়েছে বা ভিন্ন বংশলতিকা। বৌদ্ধ হীনযান এবং মহাযান পুঁথিগুলির নিজেদের মধ্যেও তফাত আছে। তিনটি সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব থেকে আশা করা যায় যে



চিত্র ২২ : শিশুনাগ-এর ছাপ-চিহ্ন (?)।

সাধারণভাবে পালি বৌদ্ধ ইতিবৃত্তগুলির সঙ্গে মুদ্রাগুলির যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে—যদিও তা সন্তোষজনক নয়। যাই হোক না কেন, নামগুলিকে যে অনুমান নির্ভরভাবে মুদ্রাগুলির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে—এইভাবেই দেখা উচিত। পুরাণগুলিতে সমগ্র মগধ রাজবংশকে (বিম্বিসারের পর থেকে) শিশুনাগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যগুলির সাথে, এ নামটির



চিত্র ২৩ : প্রধান শিশুনাগ রাজ মুদ্রা। প্রথম দুটি পিতা-পুত্রের সম্পর্ক সূচক। শেষটি বহুলপ্রচলিত একমাত্র মৌর্যপূর্ব মুদ্রা (? মহানন্দিন)।

একটা অর্থ হল শিলীন্ধ্রী [কেঁচো], যে চিহ্নটি মুদ্রায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। নামের '-নাগ' শব্দাংশটি সম্পর্কেও কোন মন্তব্য করা হয়নি; সেই আদি যুগে, এটা নিশ্চিতই বৈদিক আর্য ঐতিহ্য-বাহিত ছিল না—সুতরাং, হতে পারে তা কোন উপজাতিক সংযোগেরই বহিঃপ্রকাশ, যেমনটা কোশলে মাতঙ্গদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। বৌদ্ধরা বিম্বিসারের পিতা হিসেবে শিশুনাগ-এর সম্পর্কে কিছুই জানত না, কিন্তু পিতৃহত্যার পর অজাতশত্রুকে প্রজারা যখন সিংহাসন থেকে অপসারিত করে এবং তাদের এই বিদ্রোহের ফলে যে অমাত্য (রাজ্যপাল) পঞ্চম রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসেন তাঁর নাম শুশুনাগ—যা শিশুনাগ-এরই পালিরূপ। এই ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে প্রচলিত মুদ্রার ওপর রাজচিহ্ন হিসেবে একটি সদ্যোজাত শিশু-র চিহ্ন পুনরায় ছাপার মধ্য দিয়ে। শিশুর ছাপটি

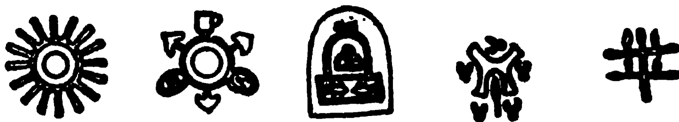
মারা হয়েছে ধনুকাকৃতি পাঁচটি খিলানের ওপর—যে খিলান প্রায় প্রতিটি রাজচিহ্নতেই পর্বতের প্রতীক এবং সেই সঙ্গে এখানে 'স্বর্গ'ও হতে পারে। খিলানের উপর আরও নানা পশু ও গাছের চিহ্ন আছে—যা নিশ্চিতই কৌম-চিহ্ন ('টোটেম') বা বংশের মূল-এর প্রতীক; রাজবংশটি ছিল সম্ভবত 'শিশু বংশজাত'। মৌর্যদের ক্ষেত্রে একসময় খিলানের ওপর ছিল একটি ময়ূর; তাঁদের মৌর্য নামের অর্থ 'ময়ূর থেকে'। সাধারণভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতীক হল খিলানের উপর অর্ধচন্দ্র। এর সঙ্গে পুরাণ-এ মৌর্যদের চান্দ্রজাতি হিসেবে যে উল্লেখ—তার মিল আছে এবং সোহ্গৌড়-এর তামার পাতগুলিতেও তা মিলেছে (চিত্র ৩৪)। জনৈক শিশুনাগ রাজা, যাঁর নাম (তাঁর নিজস্ব কুঁজওলা ষাঁড়ের সিল থেকে মনে হয়) নন্দিন হতে পারে—তাঁর ভাণ্ডারে প্রায়



চিত্র ২৪ : শিশুনাগ বংশের শান্তিপূর্ণ উত্তরাধিকারী নন্দিন বা নন্দ-র ছাপ-চিহ্ন।

৩৯১টি মুদ্রা ছিল (চিত্র ২৩-এর শেষেরটি), যা যে-কোন রাজার চেয়ে বেশি। নন্দী বংশজাত তাঁর পরের এক রাজা ১০২-টি মুদ্রায় কৌম-চিহ্নের পরিবর্তন ঘটান (চিত্র ২৪), কিন্তু একই রাজবংশীয় চক্র-চিহ্নটি রেখে দিয়েছিলেন। এরপর একজন মাত্র শাসকেরই সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁর প্রায় ১৫০টির মতো মুদ্রায় এক ভিন্ন চক্র ছিল (চিত্র ২৫); ইনি সম্ভবত মহাপদ্ম নন্দ। 'নব নন্দ'-এর যে কাহিনী, মনে হয় তার ব্যাখ্যা মেলে যদি আমরা জয়সোয়াল-এঁর কথামতো 'নব' অর্থে 'নয়'-এর পরিবর্তে 'নতুন' ধরি। মহাপদ্ম ছিলেন নীচ বংশীয়। মৌর্যরা সম্ভবত তাঁর ঠিক পরেই সিংহাসন দখল করেছিল, কেননা ভাণ্ডারে তাঁর এবং মৌর্য মুদ্রাগুলির মধ্যবর্তী পর্যায়ে প্রচলিত আর কোন মুদ্রার সন্ধান মেলেনি। তাঁর ঠিক পরের মুদ্রাগুলি নিশ্চিতই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের। পেশোয়ার ভাণ্ডারে প্রাপ্ত মহাপদ্ম-র মুদ্রাগুলিতে দেখা গেছে যে সেগুলি পুনঃপ্রচলনের জন্য মৌর্যদের খিলানের ওপর অর্ধচন্দ্র চিহ্নটির ছাপ মারা হয়েছে—যা এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে যে, হিংসাত্মক পন্থায় রাজবংশ পরিবর্তনের সঙ্গেই মুদ্রারও পরিবর্তন ঘটেছিল।

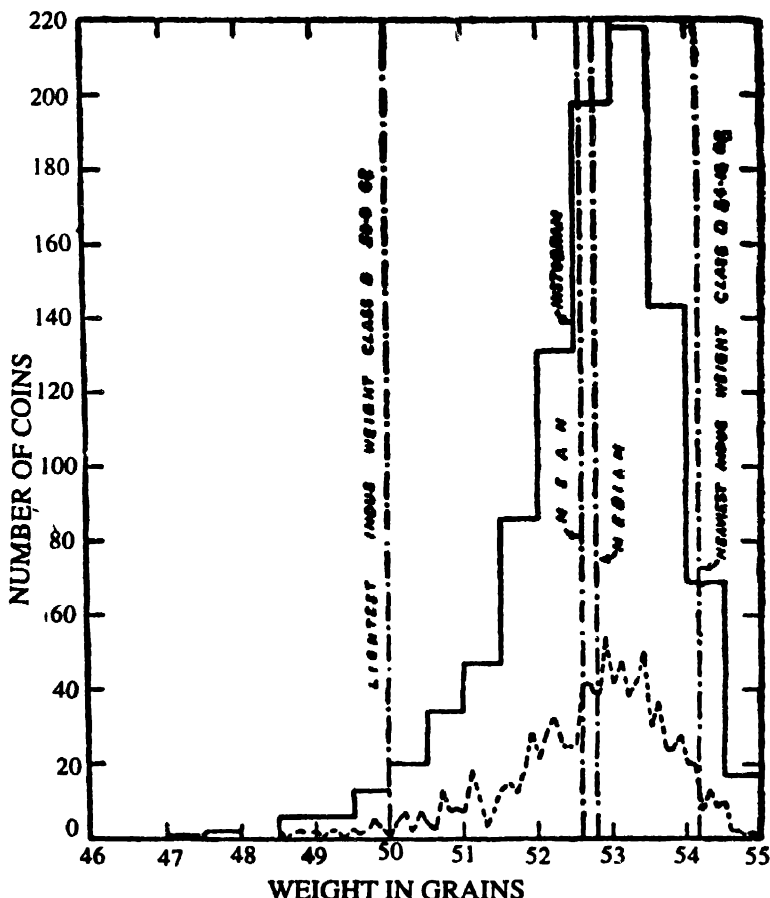
নন্দদের সম্পদ ছিল কিংবদন্তীর মতো। এ সম্পর্কিত বর্ণনার সত্যতা প্রমাণিত হয় তাদের



চিত্র ২৫ : মহাপদ্ম (= নব নন্দ)।

মুদ্রার উৎকৃষ্ট ধাতু-সংকর এবং পাতলা ও সূক্ষ্ম গঠনশৈলী থেকে। মৌর্য মুদ্রাগুলিতে (প্রথম রাজার পর থেকে) দেখা যায় অত্যধিক চাপ-এর চিহ্ন—যার অর্থ খুব বেশি খাদ মেশানো

হয়েছিল (ধাতু-সংকরে অর্ধেকের বেশি তামা!) এবং প্রাথমিক ওজনও নিখুঁত ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় ব্রিটিশ-ভারতীয় মুদ্রাগুলির ক্ষেত্রে, যেগুলি ক্রমাগতই সস্তা ধাতু দিয়ে তৈরি হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে সন্দেহাতীতভাবে প্রস্তুতকালীন ওজনেরও তফাত হচ্ছিল—যদিও অভাব পূরণের জন্য কাগজের নোটের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছিল। মৌর্য ও মৌর্য-পূর্ব মুদ্রাগুলির তফাত বোঝা যায় মৌর্য ছাপ মারা ১৮৩-টি মুদ্রার অন্য



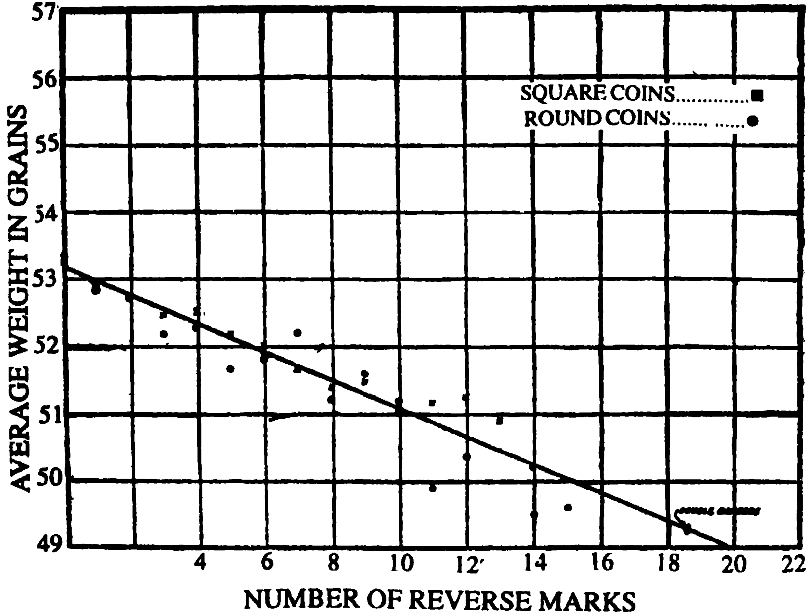
চিত্র ২৬ : তক্ষশীলা ভাণ্ডার থেকে পাওয়া ছাপ-চিহ্নিত রৌপ্য মুদ্রার ওজন বিন্যাস, এবং সিন্ধু 'ডি' শ্রেণীভুক্ত পাথরের বাটখারার সঙ্গে তুলনা।

ভাণ্ডারটির সঙ্গে তুলনা করলে—যার সন্ধান ভির স্তূপেও পাওয়া গেছে। ডায়োডোটোস-এর একটি পরিচ্ছন্ন মুদ্রা থেকে এর আনুমানিক কালনির্ণয় করা হয়েছে ২৪৮ খ্রী.পূ.।

মুদ্রার বিপরীত দিকের (টেল) চিহ্নগুলি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য অনেক বেশি আকর্ষণীয় (মৌর্য-পূর্ব মুদ্রাগুলিব বিপরীতে কোন চিহ্ন ছাড়াই বাজারে ছাড়া হত; ছাপহীন এমন

অনেক মুদ্রাই খুঁজে পাওয়া গেছে।) এই চিহ্নগুলি প্রধান দিকের তুলনায় এত ছোট যে নির্দিষ্ট সেট-এ বর্গীকরণ সম্ভব হয় না এবং প্রধান দিকের তুলনায় সংখ্যায়-ও অনেক বেশি হয়। যদি কেউ 'হেড' কে ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র 'টেল'-এর চিহ্ন-সংখ্যার ভিত্তিতে মুদ্রাগুলির বর্গীকরণ করে তাহলে যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠে তা হল, বিপরীত দিকের চিহ্ন-সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় ওজন নিয়মিত ভাবে কমতে থাকে (চিত্র-২৭)। এই আন্তঃসম্পর্কটি যুদ্ধ-পূর্ব ব্রিটিশ-ভারতীয় টাকা ও সেগুলির প্রকাশনের হুবহু প্রতিতুল্য। বর্তমানে এই রকম উল্টোপিঠে চিহ্নের সন্ধান এমনকী লেভান্ট থেকে পাওয়া পারসিক মুদ্রাগুলিতেও মিলেছে, সুতরাং তা শুধুই মগধের বা রাজপরিবারের নিজস্ব ছিল না। মনে হয়, বণিকদের মধ্যেও তার প্রচলন ছিল—যারা সেই সময় মূলধন বিনিয়োগকারী, ব্যাঙ্কার, বা মূল্যবান ধাতুগুলির প্রধান সরবরাহকারী ছিল। এখনও এই ধরনের ভারতীয় 'পোদ্দার'-দের নিজস্ব চিহ্ন আছে—যা চিহ্নদানকারীদের কাছেই শুধু পরিচিত; এই চিহ্নগুলি তারা পরীক্ষিত ধাতুর খন্ডের ওপর পরীক্ষার প্রমাণ হিসেবে এঁকে দেয়। আমাদের ক্ষেত্রে, এই চিহ্নগুলি হল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে লেনদেনের বিল বা চেকের প্রতিস্বাক্ষর এরই সমার্থক। আকার ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সেগুলি আমেরিকার ট্রেন কনডাকটরদের টিকিট পাঞ্চ-এরই মতো। এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে মুদ্রাগুলি প্রায়শই ব্যক্তি উদ্যোগে তৈরি হত এবং রাজকীয় চিহ্ন মেরে প্রচলন করতে দেওয়া হত। তাছাড়া, যে কোন ধাতুখণ্ডতে যদি সঠিক পরিমাণ রূপো থাকত তাহলে তা মুদ্রারই মতো গণ্য হত। মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত খণ্ডগুলিতে এটা দেখা গেছে—যেখানে চিহ্ন বলে কিছু নেই, শুধু তামার পাত থেকে আন্দাজ মতো 'ডি' শ্রেণীর ওজনের (৫৪ গ্রেণ) টুকরো কেটে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এর চেয়ে একটু বেশি ওজনের টুকরো কেটে নিয়ে ঘষে ঘষে সঠিক ওজনে নিয়ে আসা হয়েছে—যা চিহ্ন-ব্যতিরেকেই যে কোন মুদ্রার সমতুল। এই ধরনের মুদ্রার প্রচলন যে বণিকরা করেছিল তা শুধু শব্দতত্ত্বের দিক থেকেই বোঝা যায় তা নয় [*পণ* = *পণি* (= বণিক) দের মুদ্রা], বরং দ্বৈতমানের একটি মুদ্রা থেকেও প্রমাণ করা যায়—যেটিতে বিপরীত দিকে ১৩টি ছোট ছোট চিহ্ন আছে, কিন্তু প্রধান দিক ফাঁকা। এই চিহ্নগুলি দেওয়া শুরু করেছিল বণিকরা। প্রচলনকর্তা হিসেবে রাজার অভ্যাগমন ঘটে পরবর্তী পর্যায়ে; উৎকৃষ্টতা ও ওজনের নিশ্চয়তা হিসেবে তাদের চিহ্ন দেওয়া হত। কিন্তু, এর ফলে আমরা ওজন কম পেয়েছি এবং সেই সঙ্গে বিপরীত দিকের চিহ্ন—যা যুগেরও চিহ্ন—তা হারিয়েছি। কোশল রাজধানীর কাছাকাছি পৈলা-য় আবিষ্কৃত একটি কোশল ভান্ডারের (বাস্তবিকই ভালভাবে পরিষ্কার করা হয়নি) মুদ্রাগুলির (চিত্র ১৯, ২০) ক্ষেত্রে গড় ওজন এবং উল্টোদিকের চিহ্ন উভয়কেই ব্যবহার করা হয়েছিল এক নতুন সরলরৈখিক সূচক প্রস্তুতিতে—যা কালানুক্রমিক বিন্যাস বোঝাতে এর কোন একটির চেয়ে অনেক বেশি সহায়ক। প্রদত্ত চিত্রগুলিতে (চিত্র ১৯.২৫) কোশল ও মগধের নমুনা মুদ্রাগুলির প্রধান কালবিভাগ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম চিহ্নগুলির জন্য মগধের মুদ্রাগুলির বৈচিত্র্য অনেক বেশি ছিল; কোশলের ছিল $^{৩}/_{৪}$ 'ডি' মানের (৪০$^{১}/_{২}$ গ্রেণ) সাধারণ চারটি চিহ্ন সমন্বিত মুদ্রা। এগুলি থেকে শাসন ক্ষমতায় একটি সহিংস ও একটি শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের কথাও বোঝা যায়। মনে হয়, মগধের প্রত্যেক রাজারই প্রধান মুদ্রায় পঞ্চম চিহ্নটি থাকত একটি হাতি। শেষের দিকে, মৌর্য আমলের মুদ্রায় আমরা সম্রাটের নিজস্ব এবং পঞ্চম চিহ্নগুলি দেখি, কিন্তু মৌর্যরাজবংশের প্রথম তিনটি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হয় তিনটি ক্ষুদ্র সম-চিহ্ন দ্বারা। প্রথম যুগের তক্ষশীলার ভান্ডারে

এইরকম কোন মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়নি, যদিও আলেকজান্ডার কর্তৃক পরাভূত শক্তিশালী উপজাতি গোষ্ঠীগুলি বিস্তারমান মগধের পক্ষে বর্ম-রাজ্য হিসেবে কাজ করেছিল। এই

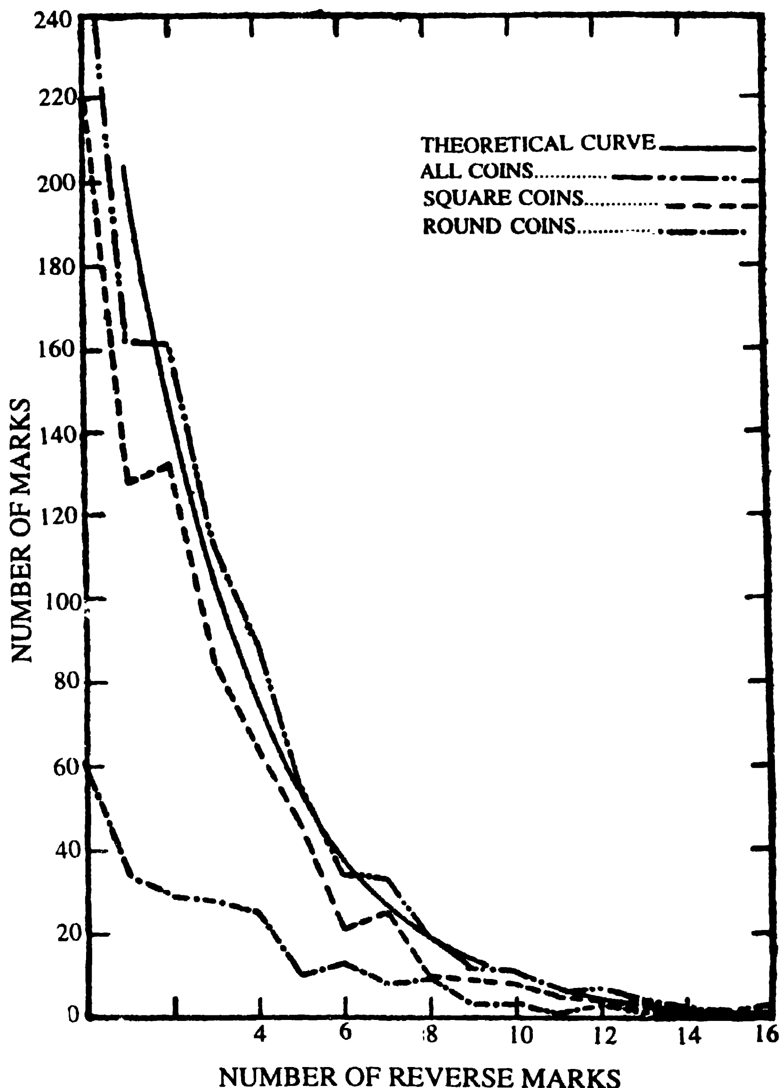


চিত্র ২৭ : বিপরীত দিকের চিহ্ন প্রতি ওজন হ্রাস।

মুদ্রাগুলিকে সম্রাটের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে প্রচলিত উপজাতিক মুদ্রা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। মৌর্যযুগে মুদ্রার উল্টোপিঠে ছাপের প্রথা উঠে যায় এবং সে পিঠে একটিমাত্র রাজ-চিহ্ন মেরে বাজারে ছাড়া হত। অন্য কোন চিহ্নের এই ধারাবাহিক অনুপস্থিতিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, দক্ষিণের দিকে উন্মুক্ত নতুন অঞ্চলে এক নতুন ধরনের বিশাল বাণিজ্যের উত্থান ঘটেছিল—যা, মগধ থেকে লেভান্ট পর্যন্ত সমস্ত জায়গার প্রাচীন ও নিয়মিত পণ্য বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণকারী উত্তরের বণিক-সঙ্ঘগুলির সংযোগ সূত্রের দ্বারা প্রতিহত হত না। নতুন রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের সাহায্যে মগধের রাজারা পুরনো বণিক-শ্রেণীর সুযোগসুবিধাগুলিকে স্থগিত অথবা বাতিল করেছিল।

প্রাচীন তক্ষশীলা ভান্ডারের আরও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল ধারাবাহিক সাঙ্গীকরণের হার (চিত্র ২৮)। অঞ্চলে প্রচলিত মুদ্রাগুলির মধ্যে প্রায় ৭/১০ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা ছিল বিপরীত দিকে ছাপ মারার; একবার সেগুলির প্রচলন ঘটলে তুলে নেওয়া বা গলিয়ে ফেলা হত না। অর্থাৎ ছাপ মারা প্রতি চারটি মুদ্রার মধ্যে তিনটিতে পরের বার মেলানোর সময় আবার ছাপ মারা হত। এ থেকে মনে হয়, সাধারণ চুক্তিমতো ব্যাঙ্কারদের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মুদ্রা পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল—যা না থাকলে নিয়মিত ওজন ক্ষয় বা ক্ষয়ের হার বোঝা শক্ত ছিল। স্পষ্টতই

বাণিজ্য-ব্যবস্থাটা ছিল তক্ষশীলার অনুকূলে—কেননা মগধের মুদ্রার এখানে আধিপত্য ছিল বলে মনে হয়। অন্যদিকে, মগধ বা দক্ষিণের ভান্ডারগুলিতে তক্ষশীলার বাঁকানো পাতের ধরনের মুদ্রার (১০০ রক্তিকা ওজন মানের) অস্তিত্বের কথা জানা যায়নি। আবার, কোশলের ছাপ মারা বা ৩/৪ কার্ষপণ মানের ওজনের মুদ্রার সন্ধান তক্ষশীলায় না পাওয়াটা (অপর্যাপ্ত খননের পাশাপাশি) সমগ্র প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ কোশলের অনুপস্থিতির কথাই প্রমাণ করে। গাঙ্গেয় উপত্যকায়



চিত্র ২৮ · তক্ষশীলায় প্রাক্ মৌর্য মুদ্রার বিশেষণ হার।

বসতি স্থাপনের ফলে, মূলত নদীতীরবর্তী জঙ্গল একবার হাসিল হয়ে যাবার পর, হিমালয়ের পাদদেশের নিকটবর্তী পুরনো বাণিজ্যপথ তার গুরুত্ব হারায়; অন্য কথায়, কোশল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল এমনকী কোন যুদ্ধ ছাড়াই—অন্তত তার তুলনামূলক নিকৃষ্টমানের মুদ্রাগুলি থেকে এমন কথাই প্রমাণিত হয়।

মগধের মুদ্রা নিয়ে যাওয়া বণিকদের সঙ্গী হয়ে নিশ্চিতই ভিক্ষুদেরও একটা ক্ষীণধারা বয়ে গিয়েছিল—যারা শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের নতুন বাণীকে বপন করছিল। 'কাষায়' (লাল আলখাল্লা—বেনারসী কাষ্টায় নামে যা এখনও প্রসিদ্ধ) পরিহিত 'শাক্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়'-এর সেই কয়েকজনই বুদ্ধের নাম ও বাণীকে প্রথম সেখানে বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের মগধ-সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পূর্ব-পাঞ্জাবে টিকে থাকা স্বল্প কিছু উপজাতিক বর্ম-রাজ্য, আলেকজান্ডারের রেখে যাওয়া সেনাবাহিনী ও সীমান্ত রাজ্যগুলিকে অধীনস্থ করা সেলুকাস নিকাতারের প্রতি-আক্রমণকে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত এই নতুন বাণী গভীরভাবে প্রোথিত হতে পারেনি। পাটনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নতুন সম্রাট তক্ষশীলার জন্য এক শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন এবং এমন এক কঠোর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিলেন যা এখানকার দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যের প্রায় শ্বাসরোধ করে ছেড়েছিল—যে বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। আলেকজান্ডারের আক্রমণ পরবর্তী এক প্রজন্মের মধ্যেই তক্ষশীলার অর্থনৈতিক অবস্থা এমন সর্বাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হল যে তা আর কখনই সম্পূর্ণ পূরণ করা যায়নি। এমনটা হওয়া খুবই সম্ভব যে, মগধের বিধ্বংসী আক্রমণের আশঙ্কায় তক্ষশীলার পুরাতন ভান্ডারগুলি পুঁতে দেওয়া হয়েছিল মাটির নীচে। আমাদের কাছে এর যে শিক্ষণীয় দিক তা হল, ইতিহাস সেই সমস্ত অসার আত্মগর্বী রাজপুরুষদের দ্বারা রচিত হল না—যারা মুদ্রার ওপর ছাপ মেরেছিল; সেই ধর্মবেত্তারাও তা রচনা করেনি—যারা তান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের রহস্যময় প্রতীকগুলির নকশা আঁকত; বা সেই বণিকদের দ্বারাও নয়—যাদের সঙ্ঘগুলির কাছে এই গূঢ় ধর্মীয় প্রতীকগুলি গৃহীত হত। প্রকৃত ইতিহাস, যা মুদ্রা থেকে যে কেউই পড়ে নিতে পারে, তা রচনা করল সামগ্রিকভাবে সমকালীন সমাজ—যে সমাজ নিখুঁত ওজন মানে সেগুলি তৈরি করিয়েছে এবং সংখ্যাতীত আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অবক্ষয় ঘটিয়েছে তার ধাতুর। প্রতিটি মুদ্রাভান্ডারই বহন করে রইল তার সমাজের স্বাক্ষর।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ :

১. বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এখানে যে আলোচনা করেছি তার অনেকটাই আমার বাবার মারাঠী লেখাগুলি থেকে নেওয়া—যেগুলিতে, ১৯১৩ নাগাদ তিনি বৌদ্ধধর্মের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্ধারণ করেছিলেন (*বুদ্ধ, ধর্ম, আনি সংঘ*)। এ বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ গ্রন্থ হল *ভগবান বুদ্ধ* (২ খণ্ড, নাগপুর, ১৯৪০-১; এখন হিন্দী অনুবাদেও পাওয়া যায়)। যদিও পৌরাণিক কাহিনীকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তাঁর বৌদ্ধ-পূর্ব ইতিহাস ব্যাখ্য তৃপ্তি দেয় না, তবু আমার প্রথম ভারত-ইতিহাস গবেষণা তাঁর শিক্ষার কাছে ঋণী। সূত্রের জন্য, পালি টেক্সট সোসাইটির সংস্করণগুলি মোটের ওপর চলতে পারে, কিন্তু তাঁদের অনুবাদগুলি ততটা ভাল নয়। *জাতক*-এর জন্য জে ডুটোয়েট (১৯০৬-১৯২১)-এর সাত খণ্ডের জার্মান অনুবাদ কাওয়েল বা অন্যদের ইংরেজি অনুবাদের

চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। এর সঙ্গে বলা দরকার, ই এস বার্লিনগেম-এর তিন খণ্ডের *বুদ্ধিষ্ট লেজেন্ডস্* (হারভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ ২৮-৩০)-এর কথাও—যা *ধম্মপাদ-অত্থকথা*-র অনুবাদ। বৌদ্ধ *বিনয়* পুঁথিগুলি *স্যাক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট,* খণ্ড-১৩, ১৭, ২০-তে অনূদিত হয়েছে—যা *মহাভগ্গ* ও কুল্লভগ্গ ব্যাখ্যায় সাহায্য করেছে। জি পি মালাশেখরের *ডিকসনারি অফ পালি নেমস্* (২ খণ্ড, লন্ডন ১৯৩৮) পালি পুঁথিগুলির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। যাঁরা কাহিনীগুলির প্রামাণিকতার বিষয়ে সন্দিহান তাঁরা পছন্দ করবেন J. Przyluski-র *Legenda de l'empereur Asoka* (*অশোকাবদান,* চীন-তিব্বতীয় শাস্ত্র থেকে), প্যারিস, ১৯২৩ গ্রন্থখানি। L. Liuder-এর মৃত্যুর পর প্রকাশিত *Beobachtungen uber die Sparche des Buddhistischen Urkanons* (বার্লিন ১৯৫৪, E. Waldschmidt সম্পাদিত) গ্রন্থটিতে মূল বৌদ্ধ অনুশাসনগুলি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এ এল বাসম-এর *হিস্টরি অ্যান্ড ডকট্রিনস অফ দি আজিবকস্* গ্রন্থটি এই ধর্মমত সম্পর্কিত সবচেয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা। এই পর্বের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে সম্ভবত আমিই প্রথম আলোচনা করি আমার 'এনশিয়েন্ট কোশল অ্যান্ড মগধ', (*জে বি বি আর এ এস*) ২৭(১৯৫২) ১৮০-২১৩-তে—যা পরের অধ্যায়ের আলোচনারও বিষয়বস্তু।

২. স্থানীয় অনুসন্ধান থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জে পি ভোজেল, *এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ১৯(১৯২১) ১৫-১৭-তে শিবিদের শোরকোট হিসেবে চিহ্নিত করেন।

৩. কোশল ও মগধের ওপর আমার পূর্বোল্লেখিত রচনাটিতে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। শাক্য গোত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে 'ব্রাহ্মিন ক্ল্যানস্' (*জে এ ও এস,* খণ্ড ৭৩, সংখ্যা ৪, ১৯৫৩)-তে।

৪. ছাপ-চিহ্নিত মুদ্রা সম্পর্কে আমার মূল গবেষণাপত্রটি হল 'স্টাডি অ্যান্ড মেট্রোলজি অফ সিলভার পাঞ্চ-মার্কড কয়েনস্' [*নিউ ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুয়ারি* ৪, (১৯৪১), ১-৩৫; ৪৯-৭৬]। মগধ ও কোশলের (পৈলা ভান্ডার) মুদ্রা সম্পর্কে পরবর্তীকালের তথ্য সমেত সারসংক্ষেপ *জে বি বি আর এ এস* ২৪-৫ (১৯৪৮-৯) ৩৩-৪৭; ২৭, (১৯৫২) ২৬১-২৭২-এ যথাক্রমে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি। গাণিতিক তত্ত্বের পরীক্ষা ও তার সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমার 'দি এফেক্ট অফ সারকুলেশন আপন দি ওয়েট অফ মেটালিক কারেন্সি' (*কারেন্ট সায়েন্স,* বাঙ্গালোর, ১৯৪২; খণ্ড ২, পৃ. ২২৭-৩০) লেখাটিতে—যেখানে মুদ্রাতত্ত্বের পদ্ধতিকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রথম-উল্লিখিত গবেষণা পত্রটি লেখার পর কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* সম্পর্কে আমি আমার মূল্যায়নের পরিবর্তন করেছি।

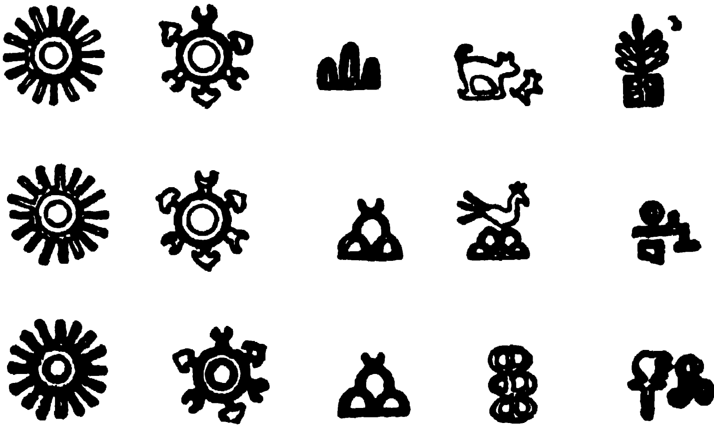
সপ্তম অধ্যায়

গ্রাম-অর্থনীতির উদ্ভব

এ গ্রন্থের শুরুতে ইতিহাসের সে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল আগের তিনটি অধ্যায় তা থেকে সরে এসেছে। প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখে সংক্ষেপিত লোক-কাহিনীর উপাদানের সাহায্যে উপস্থাপিত পুঁথি-সমালোচনার এই জলাভূমিতে পাঠক হয়ত পথ হারিয়ে ফেলতে পারেন। একই চরিত্রের ক্ষুদ্র বৈদিক রাজ্যগুলি, বেদের অজ্ঞাত এবং বেদ-অনুসারী নয় এমন আর্য জনগোষ্ঠীসমূহ এবং তখনও পর্যন্ত আর্যত্বে রূপান্তরিত না হওয়া আদিবাসীদের ধ্বংস করে মগধ যে এক আধিপত্যকারী গাঙ্গেয় রাজ্য হিসেবে জেগে উঠেছিল—এ ঘটনা স্পষ্ট। যা স্পষ্ট করে বোঝা প্রয়োজন তা হল, এর সঙ্গে জড়িত ব্যবস্থা—অর্থাৎ, সদ্য অরণ্য উৎসাদিত জমিতে জনসংখ্যার অসাধারণ বৃদ্ধির তাৎপর্য। উৎপাদনের মূল একক হিসেবে প্রকৃত অর্থেই স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সর্বপ্রথম এখানেই অঙ্কুরিত হয়েছিল—যা পরে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে তাকে এক বিশিষ্টতা এনে দেয়। প্রথম যে বৃহৎ গ্রাম-বসতি—তার বিকাশ ঘটেছিল প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে; ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে লিপ্ত হতে হয়েছিল এক মরণপণ সংগ্রামে—বিশেষ করে বণিকদের সঙ্গে। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসে ভারতীয় বণিকদের যে প্রতিভাত নীরবতা—তা এই কারণেই। কিন্তু একইভাবে এই নতুন অর্থনীতি কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্রক্ষমতার ভিত্তিতেও ফাটল ধরিয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কালানুক্রমিক কাঠামোর মধ্যে সাজানো প্রয়োজন। তার অর্থ, প্রচলিত ইতিহাস-পদ্ধতিকে কিছুটা অনুসরণ, এবং আকস্মিকই মৌর্যদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রথম পাঠযোগ্য খোদিত লিপি, অজস্র পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ, *অর্থশাস্ত্র*, আলেকজান্ডারের আক্রমণ-সঞ্জাত গ্রীক বিবরণ—এ সবই ইতিহাসের উপাদান হিসেবে রেখে দিয়েছে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। কিন্তু পণ্ডিত ঐতিহাসিকদের মতো পরম তৃপ্তিতে সেই একই জিনিসের জাবর না কেটে আসুন, আমরা প্রধান প্রধান ঘটনা ও

সূত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করে তালাশ করি মগধের বিস্তারের পেছনের প্রধান চালিকাশক্তির, সন্ধান নিই কোন্ আবশ্যিকতা অশোককে বাধ্য করেছিল বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে, কেনই বা কেন্দ্রীয় শাসনের পতন হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। মৌর্য সাম্রাজ্যই দেশকে দিয়েছিল পরবর্তীকালের রাজনৈতিক সংহতি, আর তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রকে দিয়েছিল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এই সাম্রাজ্য ছিল ইউরোপীয় রোমান সাম্রাজ্যেরই সমতুল।

৭.১ তক্ষশীলার রাজা[১] আলেজান্ডারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। পরের বছর পরাজিত হলেন রাজা পুরু এবং তারপরই বিয়াসের তীরে আলেকজান্ডারের সৈন্যরা বিদ্রোহ করল। ম্যাসিডোনীয় সৈন্যবাহিনী হটে গেল পশ্চিমমুখে, তারপর নিম্ন সিন্ধুতে। ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাদের নেতা মারা গেলেন ব্যবিলনে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটে ৩২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে। তাঁর পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ পিপ্‌ফলিবন ('পবিত্র ডুমুর বন')-এর মৌর্যরা বুদ্ধদেবের চিতার অঙ্গার গ্রহণ করেছিলেন। হতে পারে, রাজ পরিবারকে তুষ্ট করার জন্য বৌদ্ধ বিবরণীগুলি রচনার সময় এ গল্পটি বানানো হয়েছে, কেননা এই জনগোষ্ঠীটির

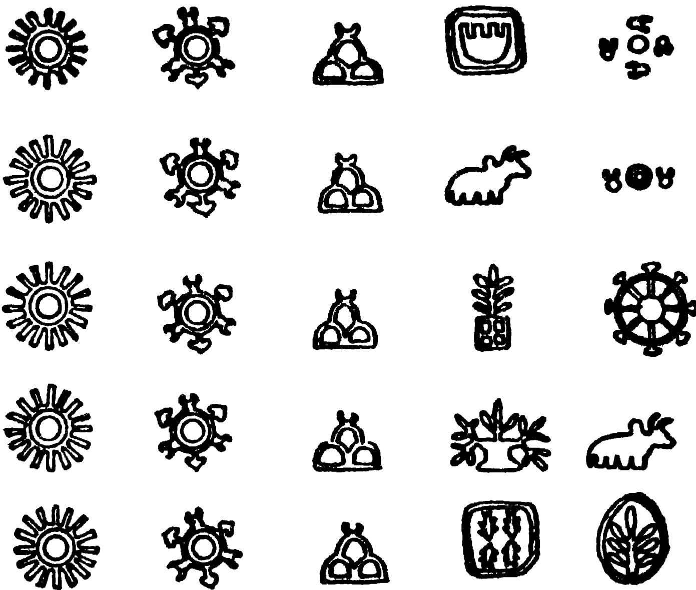


চিত্র ২৯ : চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক।

আর কোন পরিচিতি ছিল না। ৩০৫-৩০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সেলুকাস নিকাতার হারানো সীমান্ত রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে প্রতিহত হন ও চন্দ্রগুপ্তের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। তাঁদের মধ্যে এক ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল বলে মনে হয় এবং সেইসঙ্গে চুক্তিও; সেলুকাসকে প্রদত্ত ৫০০ হাতি পরের বছর ইপসাসের যুদ্ধে তাঁর জয়লাভের সহায়ক হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে আরোহণ করেন আনুমানিক ২৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে; ২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শেষ হওয়া তাঁর এই রাজত্বকাল সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। গ্রীক বিবরণে অ্যামিট্রোকেটিস নামের এক রাজার কথা বলা হয়েছে—হতে পারেন তিনিই বিন্দুসার। অন্যদিকে ভারতীয়দের অভিমত, চন্দ্রগুপ্তকে যিনি সিংহাসনে বসিয়েছিলেন সেই বিখ্যাত ব্রাহ্মণ

মন্ত্রী চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের পুত্রের শাসনকালে অবসর নেন। বিন্দুসারের পর আসেন অশোক; পিতার মৃত্যুর চারবছর পর তিনি অভিষিক্ত হন এবং তাঁর অজস্র অনন্যসাধারণ শিলালিপির সাহায্যে হঠাৎই আমাদের নিয়ে আসেন প্রকৃত ভারত-ইতিহাসের কাছে। ২২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ শেষ হওয়া তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকাল গোটা দেশ জুড়ে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে—যার প্রকাশ ঘটেছিল বৌদ্ধ মতবাদের প্রতি অশোকের সমর্থনে এবং একই সঙ্গে মগধের অন্যান্য ধর্মমতগুলির প্রতিও।

চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনী দাক্ষিণাত্যের অনেক ভিতরে ঢুকে পড়েছিল—মহীশূরে তো বটেই, কেননা তা অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি বা তাঁর পিতা সেখানে কোন সেনা



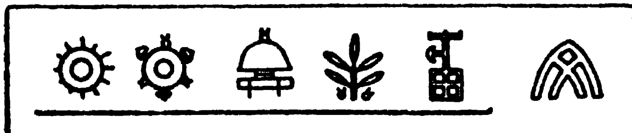
চিত্র ৩০ : অশোক-পরবর্তী মৌর্য রাজাদের।

অভিযান করেছিলেন বলে জানা যায়নি। প্রাচীন তামিল কাব্য *ভাম্ব মোরিয়ার*-এ[২] হয়ত মৌর্য সেনাবাহিনীর কথাই বলা হয়েছে—যারা প্রকৃতপক্ষে মাদুরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল; তারপর পিছু হটে, অথবা এক পর্বতের জন্য থেমে যায়—যা অতিক্রম করা তাদের রথের পক্ষে সম্ভব ছিল না। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে এসব ঘটেছিল বলে অনিশ্চিত ও অসতর্ক উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, মৌর্য সাম্রাজ্যই ছিল সারা দেশে প্রথম 'সর্বব্যাপী রাজতন্ত্র'। অশোক একবারই মাত্র যুদ্ধাভিযানে বেরিয়েছিলেন। কলিঙ্গের (উড়িষ্যা) বিরুদ্ধে সেটি ছিল এক অত্যন্ত রক্তাক্ত অভিযান—যার পর থেকে তাঁর প্রভাব সীমান্ত ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিনা অস্ত্রেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর রাজত্বকালেই দাক্ষিণাত্যে নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। তাঁর পৌত্র ও

উত্তরাধিকারী দশরথই হলেন সেই গরিমালুপ্ত মৌর্যরাজাদের মধ্যে প্রথম যাঁরা মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিলেন। নথি অনুসারে, চন্দ্রগুপ্ত থেকে শুরু করে মৌর্যসম্রাটদের সংখ্যা ছিল দশ, যদিও শেষের দিকের সম্রাটদের নাম নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ আছে। মৌর্য ছাপ-চিহ্নিত মুদ্রাগুলিতে পাঁচটি করে চিহ্ন সমন্বিত বর্গগুলির সন্ধান দশটির বেশি পাওয়া যায়নি। শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনের কালে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্রের হাতে নিহত হন। অশোকের শেষ বংশধর তথা মগধের সামন্তরাজা পূর্ণবর্মন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমদিকে বুদ্ধগয়ায় পবিত্র বোধিবৃক্ষটির পুনঃরোপন করেন (*বিল* ২.১১৮)। মৌর্য পদবীটি পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে অনেক ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে[৩] স্থানীয়ভাবে টিকেছিল—যেখানকার ক্ষুদ্র শাসকরা নিজেদের এই সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলে দাবি করত। এমনও দাবি করা হয়েছে যে, মহারাষ্ট্রের চন্দ্ররাও মোরে-ও হয়ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেরই বংশধর (নামানুযায়ী)। আমাদের আলোচনার জন্য যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি সত্ত্বেও বা সেই কারণেই, অন্তত অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত মুদ্রাগুলিতে খাদের পরিমাণ ছিল অত্যধিক; রূপার চেয়ে তামা অনেক বেশি। পুষ্যমিত্র—যাঁর বংশজাত শুঙ্গ-রা ('ডুমুর গাছ') 'সেনাপতি' পদবীটি ব্যবহার করতেন—তাঁর আমলেই প্রথম ভারতীয় ছাঁচে ঢালা মুদ্রার প্রচলন ঘটে। ছাপ-মারা মুদ্রা প্রচলনের চল উঠে যায়, যদিও মুদ্রাগুলি আরো কয়েক শতাব্দী ধরে চালু ছিল—বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে। গ্রীক সমেত অজস্র বহিরাক্রমণকারীদের চাপে শুঙ্গ সাম্রাজ্য পিছু হঠেছিল। তাঁদের রাজধানীটি ছিল সম্ভবত বিদিশা (বেশনগর)-য়, যদিও উজ্জয়িনী তার গুরুত্ব হারায়নি। ৩২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ গুপ্তযুগের সূচনার আগে পর্যন্ত এমন আর কোন সাম্রাজ্যই ছিল না যার সঙ্গে মৌর্যদের তুলনা করা যেতে পারে—যদিও তমসাচ্ছন্ন সেই অন্তর্বর্তী পর্বে কুষাণ ও শাতবাহন রাজবংশ সমৃদ্ধির এক উজ্জ্বল রেখা হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

এক বিশাল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের পর তুলনীয় আর কোন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় না ঘটার অর্থই হল—ভিত্তিতে কোন সুগভীর পরিবর্তন। আমাদের অনুসৃত পদ্ধতির উপযোগিতা প্রমাণে এই উপলব্ধিটিকে অবশ্যই বিস্তারিত করতে হবে।

৭.২ প্লুটার্কের *আলেকজান্ডার*[৪] গ্রন্থটিকে একটি নমুনা হিসেবে নেওয়া যায়, যার ওপর আমাদের পদ্ধতি কিছুটা অন্যরকম আলো ফেলবে। 'মনে করা হত, ভারতে তক্ষশীলার রাজার রাজত্বের



চিত্র ৩১ : বোদেনায়কনিয়ুর ভাণ্ডার থেকে পাওয়া শেষ দক্ষিণী 'মৌর্য' রৌপ্যমুদ্রার ৫টি সোজা ও উল্টোদিকের ছাপ-চিহ্ন।

পরিসীমা মিশরের মতোই বিশাল—অজস্র উৎকৃষ্ট চারণভূমিতে পূর্ণ, এবং উৎপন্ন হয় সুন্দর সুন্দর সব ফল।' আয়তনটিকে হাস্যকর রকমে বাড়ানো হয়েছে; তক্ষশীলা এমনই ছোট এক অঞ্চল যে তা পুরুর আক্রমণকেও প্রতিহত করতে পারেনি। চারণভূমির বিশেষ উল্লেখ

প্রণিধানযোগ্য। তক্ষশীলা জয়ের আগে পর্যন্ত গ্রীকদের যুদ্ধার্জিত সামগ্রীর মধ্যে ছিল বিশাল গবাদি পশুর পাল—বৈদিক যুগ থেকে যা সম্পদের মাপকাঠি হিসেবে চলে আসছিল। তক্ষশীলার কৃষি সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। আলেকজান্ডারকে রাজা এমন কথাও বলেছিলেন যে, 'আমাদের জল ও আবশ্যক খাদ্যসামগ্রী লুণ্ঠন করাই যদি আপনাদের এদেশে আসার উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তাহলে আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব কেন ...।' জল এখানে নিছক কথার কথা নয়, যেহেতু আর্যরা *ঋগ্‌বেদ*-এর আমল থেকেই জলের জন্য যুদ্ধ করে আসছে। জলের গতিপথ পরিবর্তনের কোন অভিপ্রায় যদি আলেকজান্ডারের না থেকে থাকে তাহলে যুদ্ধের কোন কারণ নেই। তক্ষশীলার রাজার প্রতি আলেকজান্ডারের যে বদান্যতা তা কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, বরং সামরিক দিক থকে গুরুত্বহীন সমস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র সম্পর্কে গৃহীত নীতি।

'কিন্তু ভারতীয়দের সেরা সৈনিকরা এখন (তক্ষশীলার আশপাশের) অনেকগুলি নগরীর কাছ থেকে বেতন নিয়ে তাদের রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল এবং সে কাজ তারা এত সাহসের সঙ্গে করছিল যে আলেকজান্ডার খুবই বিপদগ্রস্ত ছিলেন, কেননা শেষ পর্যন্ত এক নগরীতে চলে যেতে দেওয়ার শর্তে আত্মসমর্পণের পর তারা যখন সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল তিনি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাইকে কচুকাটা করেন। কথার খেলাপের এই একটি ঘটনা যুদ্ধে তাঁর সাফল্যের ইতিহাসে কলঙ্ক হিসেবে রয়ে গেছে।'

এই সমস্ত পেশাদার যোদ্ধাদের পিছনে ফেলে রেখে যাওয়াটা আলেকজান্ডারের পক্ষে সম্ভব ছিল না—কেননা তারা কোন প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলতে পারত। ঋগবৈদিক কিছু কিছু উপজাতি যেখানে তখনও তাদের মূল রীতি ও এলাকাকে রক্ষা করে চলেছে সেখানে যে-কোন নগরের সৈন্যবাহিনীতে কাজ নিতে পারা এই জনগোষ্ঠীহীন ক্ষত্রিয়েরা ছিল কোন অঞ্চলের ক্ষেত্রে এক নতুন উপাদান। উপজাতিক রাজ্যশাসন প্রণালী অচল হয়ে পড়া—মধ্যযুগের রাজপুতদের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল—একে একে তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলিকে কুক্ষিগত করতে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু সেখানে জনপদগুলি সংহত হয়ে উঠেছিল আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে। অন্যদিকে, উপজাতি-বহির্ভূত যোদ্ধারা ছিল এক স্থায়ী বিপদ। 'ভারতীয় দার্শনিকরাও তাঁকে (আলেকজান্ডার) কম বিপদে ফেলেনি। তাঁর পক্ষে যোগ দেওয়া রাজাদের সম্পর্কে তারা উচ্চকণ্ঠে নিন্দা করত এবং স্বাধীন জাতিগুলিকে আহ্বান জানাত তাঁর বিরোধিতা করতে। তিনি এদের অনেককেই ধরে ফেলেন এবং ফাঁসি দেবার নির্দেশ দেন।' দার্শনিক বলতে এখানে সাধু-সন্ন্যাসী নয়, ব্রাহ্মণদের কথাই বলা হয়েছে—যাদের প্রায়শ একই শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করা হত। সব মিলিয়ে সঙ্গত কারণেই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা কুসংস্কার ছড়াত—কেননা এর ওপরই নির্ভর করত তাদের অন্ন। কিন্তু তারাই ছিল বিভিন্ন উপজাতির মধ্যেকার এক সংযোগসূত্র এবং একটি শ্রেণী—যে হয়ত উপজাতি-উর্দ্ধ এক সমাজের কথা ভাবতে পারে। এই পর্যায়ে, পাঞ্জাবে ব্রাহ্মণরা উপজাতি-ভুক্ত হিসেবেই তখনও ছিল—অন্যদিকে, পূর্বে তারা ইতিমধ্যেই উপজাতিহীন এক বর্ণে পরিণত হয়েছিল। সাধু-সন্ন্যাসীদের পরিবার ও সম্পত্তির মতোই উপজাতি এবং বর্ণও ত্যাগ করতে হত।

শেষ পুরু রাজের সঙ্গে যুদ্ধের যে বর্ণনা (যা আলেকজান্ডারের নিজের চিঠিতে পড়েছেন বলে প্লুটার্ক দাবি করেছেন) তা এর আকর্ষণীয় পরিণতির থেকে মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেয় ঃ

'কিন্তু পুরুর সঙ্গে এই সংঘর্ষ ম্যাসিডোনীয়দের সাহসের ধাব ভোঁতা করে দিয়েছিল এবং ভারতবর্ষে তাদের পুনরায় অগ্রগতিকে রুখে দিয়েছিল। রণক্ষেত্রে কুড়ি হাজার পদাতিক ও দু'হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আসা শত্রুকে পরাস্ত করা শক্ত দেখে তারা বত্রিশ ফার্লং চওড়া, একশ ফ্যাদম গভীর এবং বিপরীত তীর শত্রু অধ্যুষিত বলে কথিত গঙ্গানদী অতিক্রম করে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার আলেকজান্ডারের যে পরিকল্পনা—তার বিরোধিতা করাই সঙ্গত মনে করেছিল। কেননা তারা শুনেছিল গঙ্গারিডি ও প্রায়েশিয়ান (প্রাচ্য, 'পূর্বদেশবাসী')-দের রাজারা সেখানে আশি হাজার অশ্বারোহী সেনা, দু'লক্ষ পদাতিক, আট হাজার অস্ত্রসজ্জিত রথ ও দু'হাজার যুদ্ধের হাতি নিয়ে তাদের মোকাবিলাব জন্য অপেক্ষা করে আছে। এসব তাদের নিরুৎসাহিত করার জন্য নিছক মিথ্যা বিবরণ ছিল না। কেননা, আন্ড্রোকোট্রোস (চন্দ্রগুপ্ত)—যিনি এর অনতিপরেই ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করেন—তিনি সেলুকাসকে একসঙ্গে পাঁচশ হাতি উপহার দেন এবং ছ'লক্ষ সৈন্যের সাহায্যে সারা ভারতবর্ষকে নিজের বশে আনেন।'

গঙ্গার প্রস্থ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অতিরঞ্জন নয়—কেননা বর্ষাকালে এমনটাই হতে পারে এবং তখন বর্ষা শুরুও হয়ে গিয়েছিল। বর্ষায় ভ্রমণ বা যুদ্ধাভিযানের ব্যাপারে ভারতীয় চিরাচরিত ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণেও গ্রীক বিজয় অংশত সম্ভব হয়েছিল। এমনকী বাধা না থাকলেও সৈন্য নিয়ে ভারতীয় নদী পেরনো যে কতটা শক্ত তা দু'হাজার বছর পরে আহমদ শা দুরানি বুঝেছিলেন—যমুনায় তাঁর অর্ধেক সৈন্য হারিয়ে; পথ আটকানোর বিষয়টিকে উপেক্ষা করে মারাঠারা পাণিপথের যুদ্ধ তথা তাদের সাম্রাজ্যের শেষ সুযোগটা হাতছাড়া করেছিল। পুরুর রথীবাহিনী গ্রীক অশ্বারোহীদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছিল—কেননা তারা ছিল ভারতীয় অশ্বারোহীদের চেয়ে উন্নত। হাতিগুলিকে ঠিকভাবে ব্যবহার করলে হয়ত যুদ্ধ জেতা যেত, কিন্তু অত গতিশীল ও অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযান চালানোর জন্য যে গভীর রণকৌশলগত জ্ঞান দরকার উপজাতি পাঞ্জাবে তখনও তা বিকশিত হয়নি। একমাত্র যে বাহিনী দিয়ে গ্রীক আক্রমণ প্রতিহত করা যেত—তা হল তীরন্দাজ। কিন্তু তা-ও ঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়নি (যেমনটা পার্থিয়ান-রা ক্রেসাস-এর বিরুদ্ধে করেছিল); তাছাড়া বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় এদের কার্যকারিতা-ও কম। ভারতীয় ধনুক ছিল দু-ফুট লম্বা; 'ধনু' শব্দটি জলের গভীরতা মাপার একক হিসেবেও ব্যবহার করা হত। আরিয়ান লক্ষ্য করেছেন (*ইন্ডিকা* ১৬; *মেগাস্থিনিস* ২৫৫), ভারতীয় তীরন্দাজদের নিক্ষিপ্ত শরকে কিছুই আটকাতে পারে না—লম্বা তীর একইসঙ্গে ঢাল ও বর্ম ভেদ করে ঢুকে যায়। এ অভিজ্ঞতা আলেকজান্ডারেরও হয়েছিল; একটা তিন আঙ্গুল চওড়া, চার আঙ্গুল লম্বা মল্ল তীর-এর ফলা এই বিজয়ীর বর্ম ভেদ করে পাঁজরে ঢুকে যায় এবং তা বের করাটা খুবই কষ্টকর হয়েছিল। এটাই ছিল যুদ্ধে তাঁর সবচেয়ে বড় আঘাত। গঙ্গারিডির বৃহদাকার সৈন্যদল আর ছোট্ট নদী গ্রানিকাসের তীরের বিশাল পারসিক বাহিনী মোটেই তুল্যমূল্য নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে এদের পাঠানো যায় কেবলমাত্র নদীপথেই, সুতরাং গঙ্গাকে সুরক্ষিত রাখার দরকার থাকে।

আলেকজান্ডার আরও একদল ভারতীয়র সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন যাঁদের 'দার্শনিক' শ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; এঁরা হলেন ব্রাহ্মণ এবং 'নগ্নদেহ' শ্রমণভিক্ষু। এরকম আটজনের সঙ্গে একটি সম্মিলিত প্রশ্নোত্তর প্লুটার্ক লিপিবদ্ধ করেছেন, যার মধ্যে দুটি উত্তর প্রণিধানযোগ্য ঃ

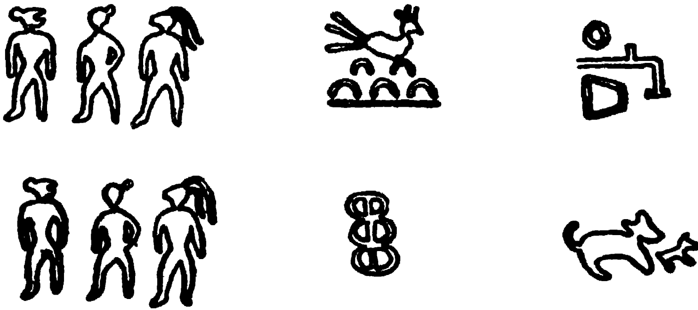
"চতুর্থ জনের কাছে তিনি জানতে চাইলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য অনুগামীদের (Sabbas) কাছে তিনি কোন্ কোন্ যুক্তি ব্যবহার করতেন। 'অন্য কিছু নয়', তিনি বললেন, 'শুধু এটাই যে—তাদের সম্ভ্রমের সঙ্গেই বাঁচা অথবা মরা উচিত।" এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং এই মানসিকতার পরিচয় *ভাগবদ্গীতা*-তেও পরে পাওয়া যায় (২.৩৭)। মগধের রাজা বা চারণকবি ও পুরোহিতরা যুদ্ধের আগে সৈন্যদের এইভাবেই উদ্বুদ্ধ করতেন (*অর্থশাস্ত্র* ১০.৩)। অষ্টমজন তাঁকে বললেন, "জীবন মৃত্যুর চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী—কেননা তাকে অনেক বেশি দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়।" সমসাময়িক গাঙ্গেয় দর্শনের এটাই ছিল প্রকৃত সাধনবাণী; সেখানে জীবনের অর্থ হল দুঃখভোগ এবং অধিকাংশ মানুষের জীবন নিঃসন্দেহে তা-ই ছিল। সারমেয়-মানব ডায়োজেনিস (ধনসম্পদ, শিক্ষাদীক্ষা, আমোদ-আহ্লাদকে ঘৃণা করা প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত—কিন্তু ডায়োজেনিসের আচরণ সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তা যথেষ্ট অদ্ভুত ধরনের হলেও একে কুক্কুর-ব্রত বলা যায় না)-এর শিষ্য ওনেসিক্রিটাসকে এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদেরই একজন তাঁকে নির্দেশ দেন যে, দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক হলে তাঁকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে তাঁর কাছে আসতে হবে। এই নির্দেশকে চরম অপমানজনক বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে ঐ আচার্য ছিলেন নগ্নদেহী আজীবক বা নতুন জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত। এটা ধরেই নেওয়া যায় যে আলেকজান্ডার সাধারণ ফকিরদের ছাড়া আর কাউকেই দেখেননি; তাঁর পরবর্তীকালের আক্রমণকারীরাও এঁদেরই দেখেছেন। তা সত্ত্বেও, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর খুব বেশি আগে এই সব ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটতে পারে না এবং এটাও মেনে নেওয়া কঠিন যে পাঞ্জাবে সেগুলির উদ্ভব স্বতন্ত্রভাবে ঘটেছিল। তক্ষশীলায় আলেকজান্ডার যে দর্শনের মুখোমুখি হয়েছিলেন তাতে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ তক্ষশীলার রাজার কাছ থেকে পাওয়া রৌপ্যমুদ্রার মতোই মগধের ছাপ নিশ্চিতই যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল। যাদের মুখোমুখি তিনি হননি, তা হল মগধের সেনাবাহিনী।

ভারত সম্পর্কিত সমস্ত গ্রীক বিবরণেই এমন সব অদ্ভুত উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যে পরিপ্রেক্ষিতটা জানা না থাকলে তার মর্মার্থ উপলব্ধি করা কঠিন। গ্রীকদের চোখে ভারত ছিল বিচিত্র এক দেশ; এখানকার চমৎকার মাটিতে বছরে দুটো, এমনকী তিনটে পর্যন্ত ফসল পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলে। এখানকার নদীগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে তাদের দেশেরগুলিকে মনে হয় যেন ক্ষীণস্রোতা খাল। তার ওপর, হাতি তো এমনকী ভারতীয়দের কাছেই ছিল এক বিস্ময়কর জন্তু। গাছে পশম জন্মায়—যদিও ভারতীয়রা কার্পাস তুলোর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু দেখে না। যখন বলা হয়, ভারতীয় নলখাগড়ার রস মধুর মতো মিষ্টি—বোঝা যায়, আখের কথা বলা হচ্ছে; মিছরির সঙ্গে এর যে কোন সম্পর্ক আছে তা তারা ভাবেনি। তাদের প্রথম অভিজ্ঞতায় তা ছিল 'ডুমুর বা মধুর চেয়ে মিষ্ট ধূপ-রঙা পাথর' (*স্ট্র্যাবো* ১৫.১৩৭; *মেগাস্থিনিস* ৫৪)। ভারতীয়রা চুক্তি করত মুখের কথায় এবং তা মেনেও চলত সততার সঙ্গে, 'এবং তা সত্ত্বেও কোন ভারতীয় (এখনও) মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত হয়নি' (*মেগাস্থিনিস* ২১৭)। গ্রীসের জ্ঞাত ইতিহাসে কোন রাষ্ট্র বা গাঁটেগোনা কিছু ব্যক্তি ছাড়া এমন সততা কেউ দাবি করতে পারে না। হেলেনীয় নগর-রাষ্ট্রে আইনী মারপ্যাঁচের মোকাবিলাই ছিল বিচারকদের দৈনন্দিন কাজ; প্রাচীন ধ্রুপদী রচনাগুলিতে 'গ্রীকৌলাস এসুরিয়েন' (ধূর্ত গ্রীক)-দের সম্পর্কে যে ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সঙ্গত।

ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে মেগাস্থিনিস যে বিবরণ দিয়েছেন—তারও কারণ, গ্রীকদের চোখে তা ছিল এক অভিনব ব্যাপার। তখন সাতটি স্বতন্ত্র শ্রেণী (জিনিয়া, বা মেরোস) ছিল, যাদের মধ্যে রীতি ও আইন অনুসারে আন্তঃবিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। এগুলি হল যথাক্রমে ঃ (১) দার্শনিক, ব্রাহ্মণ এবং কঠোর তপশ্চারী নাঙ্গা সন্ন্যাসী; (২) *গেয়োরগোই* নামে পরিচিত কৃষক; (৩) পশুপালক শিকারী; (৪) কারিগর ও খুচরো ব্যবসায়ী (৫) সৈনিক (৬) তত্ত্বাবধায়ক বা পরিদর্শক—যারা জনসাধারণের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে রাজাকে বা মুক্ত নগরীগুলির শাসকদের অবহিত করত; (৭) খাজনা নির্ধারক ও পরিষদ—যারা নীতি নির্ধারণ, সৈন্যবাহিনীর কর্মকর্তা নিয়োগ, বিচারের ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের সব ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করত। ভারতীয় সনাতনী চতুর্বর্ণ প্রথার সঙ্গে এটা মেলে না এবং সে কারণে মেগাস্থিনিসকে সমালোচিত হতে হয়—যদিও এই সমালোচনা বাস্তব পরিস্থিতির দিকে না তাকিয়েই করা হয়। এটা স্পষ্ট যে, এই দূত মাগধী সংগঠনেরই বর্ণনা দিয়েছেন—যা গোটা দেশ শাসন করত। পাঞ্জাবে আলেকজান্ডার এই ধরনের কোন বর্ণ-শ্রেণীর সন্ধান পাননি, দেখেছেন শুধু পুরোহিত, সন্ন্যাসী এবং যোদ্ধাদেরই। মেগাস্থিনিস তাঁর বিবরণী-কে ভারতীয় শাস্ত্রগুলি থেকে ধার নিয়ে রঞ্জিত করেননি (যেমন তাঁর ১৩০০ বছর পরে আলবিরুনি করেছিলেন), বরং তিনি যা দেখেছেন তা-ই বর্ণনা করেছেন। প্রথমোক্ত শ্রেণী (একমাত্র শ্রেণী—যাতে অন্য যে কোন শ্রেণী থেকে লোক আসার দরজা বন্ধ ছিল না) সম্পর্কে প্রশ্ন আছে; শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণরা একই শ্রেণীভুক্ত বলে এমনকী অশোকের অনুশাসনে পর্যন্ত উল্লেখ আছে, উভয়েই সমমর্যাদা ভোগ করত। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুযায়ী, শ্রমণ-রা ছিল কুমারব্রতী—তারা নিজেদের বংশ বিস্তার করত না; অন্যদিকে, ব্রাহ্মণদের পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত অধিকাংশ সন্ন্যাসীর মতোই কঠোর শিক্ষানবিশীর মধ্য দিয়ে যেতে হত। তার ওপর, ধার্মিকতা বিষয়ে উভয়েরই ছিল এক বিশেষ দাবি। সুতরাং এদের একই বর্ণভুক্ত করাটা অযৌক্তিক কিছু নয়। তৃতীয়োক্ত শ্রেণীটিকে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁবুবাসী যাযাবর হিসেবে; এরা ছিল আর্য অথবা আর্যত্বে রূপান্তরিত টিকে থাকা ব্রাত্য উপজাতিসমূহ—যারা বিচ্ছিন্ন বন্য হয়ে না থেকে সমাজ বা শ্রেণী সংঘে মিশে যাচ্ছিল। ভারতের অনেক অঞ্চলেই মেষপালকরা এখনও এই জীবনই অনুসরণ করে, বর্ষার চারমাস ছাড়া বাকি সময় ঘুরে বেড়ায়। 'জন' উপজাতিটি এখন প্রায় এক সম্প্রদায়ের ('গণ') মতো হয়ে উঠেছে। পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত যোদ্ধারা ছিল নিশ্চিতই ক্ষত্রিয়। প্রশ্ন থেকে যায় বাকি শ্রেণীগুলি সম্পর্কে। কারুশিল্পের উৎপাদন গ্রামে তখনও চালু হয়নি, এটা আমরা পরে দেখব। একটা শ্রেণী (চতুর্থটি) নগরে পণ্য উৎপাদন করত এবং বিক্রির জন্য গ্রামগুলিতে তা সরবরাহ করত। সুতরাং, তারা যে একটা বর্ণ (বৈশ্য) হয়ে উঠেছিল বা হয়ে উঠছে বলে মনে করা হত—এমনটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ষষ্ঠ ও সপ্তমের দুটি আমলা গোষ্ঠীর মধ্যে শেষোক্তটিতে নিয়োগ করা হত বিশেষভাবে নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে। যে দেশে সমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে বিভিন্ন বর্গভুক্ত কবার নতুন পদ্ধতি হিসেবে বর্ণের আচরণের মধ্য দিয়ে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল—সেখানে এরাও আবার নতুন বর্ণ হিসেবে জেগে উঠল। পরবর্তীকালের কায়স্থ বর্ণটি (দ্রষ্টব্য, পি..ভি কানে, *হিস্টরি অফ দি ধর্মশাস্ত্র* ২.৭৫-৭৭) প্রকৃত অর্থে বিভিন্ন উৎপত্তির মানুষদের নিয়ে এভাবেই গড়ে উঠেছিল। আদিতে কায়স্থরা ছিল রাজ্যের নথি রক্ষক। বর্ণটি সম্ভবত জন্ম নিতে শুরু করেছিল মৌর্যযুগে, যখন এই কাজের চল শুরু হয়—যদিও খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে শব্দটি ছিল অপরিচিত। উচ্চপদস্থ পারিষদরা

নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করত এবং স্বতন্ত্র একটা জাত গড়ে তোলার মতো পর্যাপ্ত সংখ্যাও তাদের ছিল। বেতনভোগী বিপুল সংখ্যক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও *অর্থশাস্ত্র* থেকে; এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে উভয়ের বর্ণনা প্রায় একরকম। রজ্জুক, মহামাত্য, দূত—এরা তাদের পেশাগত স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে এই দুটি (৬ ও ৭) বর্ণ সৃষ্টি করেছিল। এই বর্ণগুলির বিলুপ্তিই প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের একটা নির্দিষ্ট রূপের সঙ্গে তারা কত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল।

বাকি রইল দ্বিতীয় শ্রেণীটি—গেয়োরগোই; এদের বৈশ্য বলে মনে করা যেতে পারে যেহেতু, গেয়োরগোই শব্দটির প্রচলিত সংস্কৃত প্রতিশব্দ হল 'কৃষক'; দুর্ভাগ্যবশত, মেগাস্থিনিসের কাজ প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অভিধান তৈরি করা ছিল না। এই শ্রেণীটিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। এরা ছিল জনসংখ্যার সবচেয়ে বৃহত্তম অংশ। উদ্বৃত্ত খাদ্যের প্রায় সবটাই এরা উৎপাদন করত, বাকি সামান্য কিছু অংশ উৎপাদন করত পশুপালক-শিকারীরা; অন্য কোন বর্ণ কোন খাদ্য উৎপাদন করত না। এরা কখনও নগরে ঢুকত না, অস্ত্র বহন করত না, 'সামরিক



চিত্র ৩২ : বিন্দুসার ও অশোকের আংশিক নিয়ন্ত্রণের কালে জনপদ মুদ্রার ছাপ-চিহ্ন।

কর্তব্য থেকে রেহাই দেওয়া' হয়েছিল তাদের; সেনাবাহিনীর নজরদারিতে এরা জমিতে চাষ করত, আর সেনাবাহিনী লড়াই করত জমি ও কৃষকের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে। এই বর্ণনার সঙ্গে বৈশ্যদের কিন্তু মিল নেই (কেননা তাদের তখনও অস্ত্র বহন করার ও রাজকার্যে অংশ *নেওয়ার অধিকার ছিল*), *বরং শূদ্রদেরই সতর্কতার সঙ্গে নিরস্ত্র রাখা হত, সেনাবাহিনী বা রাষ্ট্রযন্ত্রে* তাদের কোন অংশগ্রহণ ছিল না; ছিল না, উৎপাদনের উপকরণের ওপর কোন অধিকার। মেগাস্থিনিস-বর্ণিত ব্যবস্থায় বৈশ্যরা যদি কোথাও মানানসই হয় তাহলে তা চতুর্থ শ্রেণীটিতে। বলা হয়েছে যে, রাজা বা স্বাধীন নগরীগুলিই ছিল সমস্ত জমির মালিক; সরল শান্ত গেয়োরগোই-রা তাদের উৎপাদিত ফসলের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ কর হিসেবে রাজকর্মচারী বা নগরপালদের দিত—যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে তারা ছিল শূদ্র। আলেকজান্ডারের বর্ণনায় জমির মালিকানা বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। অন্যদিকে, প্লুটার্ক-এর *আলেকজান্ডার* গ্রন্থে স্বাধীন নগরীর উল্লেখ আছে। সেগুলি সাধারণভাবে আগের বা তৎকালীন উপজাতিক বসতিগুলির সদরকেন্দ্র—*অর্থশাস্ত্র* বা মহাকাব্যগুলিতে যেখানকার নাগরিকদের '*পৌর-জানপদ*'-দের মতো

বলে মনে করা হয়েছে। গুপ্তযুগের আগেই দেশ থেকে এদের বিলোপ ঘটে—যদিও রুদ্রদামন-এর গিরনার খোদাইয়ে (১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) এর উপস্থিতি এখনও দৃশ্যমান। মনে করা যেতে পারে যে, মৌর্যদের সময়কার সম-চিহ্ন সম্বলিত মুদ্রাগুলি (চিত্র ৩২) ছিল সম্রাটের অধীনস্থ উপজাতীয় 'মুক্ত-নগরী'গুলির। মৌর্যদের আগে, মগধের রাজারা যখন পরিকল্পিতভাবে নগরীগুলিকে অধীনস্থ ও উপজাতীয় সৈন্যবাহিনীগুলিকে ধ্বংস করছিলেন তখন পৌর জানপদদের এই ধরনের মুদ্রা প্রচলনের অধিকার বা সম্ভবত সম্পদও ছিল না। অনেকটা একই ধরনের ধ্বংসলীলা চালিয়েছিলেন আলেকজান্ডারও। এর ফলে, শ্রেণী-সমাজের অগ্রগতি উপজাতিক অধিকার বা উপজাতিক বাধ্যবাধকতার (বাহ্যিক কিছু রূপের আড়ালে) দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারেনি এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণরাও মুক্তভাবে নব নব উপজাতির সন্ধান বা নব নব জীবিকা গ্রহণ করতে পেরেছিল। বস্তুত তারা দুটো-ই করেছিল, অন্তত নথি তা-ই প্রমাণ করে।

মেগাস্থিনিসের সময় পাটনা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম নগরী—গ্রীকরা যা নির্মাণ করেছিল বা নির্মাণ করতে পারত তার চেয়ে অনেক অনেক বড়। যেসব প্রাকার ও মিনারের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সেগুলির সন্ধান মিলেছে পাটনা-বাঁকিপুর শহরতলির জলাভূমিতে। এমন এক রাজধানী ও তার সাম্রাজ্য যে বিনা দাসে গড়ে তোলা যায়—তা স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমী পর্যবেক্ষকদের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছিল। আরিয়ান (*ইন্ডিকা* ১০ : *মেগাস্থিনিস* ২১০) মেগাস্থিনিসকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

'ভারতীয়রা সবাই স্বাধীন, কেউ দাস নয়। লেকডেমোনিয়ান ও ভারতীয়রা এ বিষয়ে অনেকটা একই রকম। লেকডেমোনিয়ানরা অবশ্য হেলোটদের ক্রীতদাস হিসেবে রাখে এবং এই হেলোটরা নীচ কাজ করে; কিন্তু ভারতীয়রা পরদেশীকে পর্যন্ত দাস হিসেবে ব্যবহার করে না, আর স্বদেশী কোন লোককে তো নয়ই।'

পরোক্ষভাবে হলেও, হেলোট দাসত্বের উল্লেখ এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—কেননা তা শূদ্রবর্ণের খুবই কাছাকাছি ছিল। দাসপ্রথা সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য তা নিছক কল্পনাপ্রসূত হতে পারে না—কারণ, মেগাস্থিনিস এমন এক রাজার প্রতিনিধি ছিলেন যিনি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে সদ্য পরাজিত হয়েছেন এবং গ্রীক ধাঁচের কোন দাসপ্রথা যদি থেকে থাকে তাহলে বিজেতার কাছে দাস হিসেবে তাঁর বহু মানুষকে খুইয়েছেন। কয়েকবছর আগেই আলেকজান্ডার সীমান্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের একাংশে সত্তর হাজারেরও বেশি দাস নিয়ে এসেছিলেন। গ্রীসে এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক রীতি—কেননা জেনোফেনের প্রতিটি দশ হাজারী বাহিনীর অভিযানের সময় একজন বা দু'জন করে দাস নিয়ে যাওয়া হত। গ্রীকদের সাংস্কৃতিক নেতা তথা সক্রেটিসের এক শিষ্য একটি দাস-অপহরণ অভিযান ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে পরিশেষে নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছিলেন। আসল সমস্যাটা দেখা দেয় ডায়োডোরাস সিক্যুলাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা থেকে—যিনি মেগাস্থিনিস-বর্ণিত অবস্থাকেই আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করেছিলেন ঃ

'ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত নানা উল্লেখযোগ্য প্রথার মধ্যে তাদের প্রাচীন দার্শনিকদের দেওয়া একটি বিধানকে সত্যিই প্রশংসনীয় বলে মনে করা যায় : কারণ, আইনে নির্দেশ আছে যে তাদের কেউই, কোন পরিস্থিতিতেই দাস হবে না—বরং স্বাধীনতা ভোগ করবে, স্বাধীনতা ভোগে

সকলের সমানাধিকার মেনে চলবে; কেননা যারা (তারা মনে করে) অন্যদের ওপর আধিপত্য বা অন্যের কাছে গোলামের মতো বশ্যতা স্বীকার না করতে শিখেছে তারাই কেবল ভাগ্যের সমস্ত উত্থান-পতনের সঙ্গে মানিয়ে চলার উপযোগী সর্বোত্তম জীবন-যাপন করতে পারে। তাই সেই আইনকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই *ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত* (*fair* and *resonable*) যা সকলকেই সমানভাবে বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়ে আসে, কিন্তু *সম্পদের অসম বন্টনকে* (*property to be unevenly distributed*) অনুমোদন করে। (*মেগাস্থিনিস* ৩৮; ডায়োডোরাস সিক্যুলাস, ২য়, ৩৯, মূলপাঠ ই. শোয়েনবেক, বন ১৮৪৬)।

ডায়োডোরাসের ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা বিশুদ্ধ আদর্শকে তুলে ধরা—তিনি নিজে ছিলেন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে বর্ণপ্রথার ভিতর দিয়ে তাদের সমাজে যা সৃষ্টি হয়েছিল সেই সামাজিক অসাম্য বিষয়ে কোনদিনই কোন মাথাব্যথা ছিল না; খুব অল্প কিছু ব্যক্তিই কেবল শ্রমণিক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে একে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। নিকৃষ্ট অনুবাদ বা খারাপ ছাপার জন্য বিষয়টি আরো ঘোলাটে হয়ে গেছে কারণ গ্রীক 'ইউথেস' (*euthes*) এবং 'এক্সৌসিয়াস অ্যানোমালোয়াস' (*Exousias anomalous*) বাক্যাংশগুলি উপরের উদ্ধৃতিটির শেষ বাক্যে বাঁকা হরফে ছাপা ইংরেজি উক্তিগুলির চেয়ে অনেক ভালভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে লাতিন অনুবাদের 'স্ট্যাট্রাম' (*stuttum*) ও 'ইনাইকোয়ালিটাটেম ফ্যাকালটেটাম' (*inaequalitatum facultatum*) শব্দগুলির দ্বারা। সুতরাং শেষ বাক্যটি শেষ হওয়া উচিত এইভাবে ঃ 'যে আইন সকলকে সমানভাবে বেঁধে রাখে অথচ সুযোগের অসম বন্টন অনুমোদন করে তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া মুর্খামি।' ঠিক যেমন দাসত্বপ্রথার সমস্যা বিষয়ে ডায়োডোরাসের সমাধান গ্রীকরা গ্রহণ করতে পারেনি, তেমনি ভারতীয়রাও পারেনি স্বাভাবিক বিষয়গুলি সম্পর্কে হেলেনীয় যুক্তি বিচারপদ্ধতি গ্রহণ করতে—বরং আঁকড়ে ছিল সেই 'স্থুল' মানসিকতা, যা বিজ্ঞানমনস্ক গ্রীকরা ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিল। কারণটা উভয়ক্ষেত্রে ছিল একই : পরিবর্তন থেকে মালিকশ্রেণীর লাভ করার কিছু ছিল না; অন্যদিকে, দুটি সমাজে পণ্য উৎপাদনের স্তরও ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

৭.৩ চন্দ্রগুপ্ত ও বিম্বিসারের সেনাবহিনীর উত্তরাধিকারী তাঁর নিজের কথাগুলি আমাদের জন্য পাথরে উৎকীর্ণ করে গেছেন। অশোকের অনুশাসনগুলি যে কোন দেশের লিপি-খোদাইবিদ্যার প্রথম ধাপ হিসেবে অসাধারণ। তাঁর আমলের বেশ কিছু অট্টালিকার নিদর্শনের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর পূর্ববর্তী যুগের স্বল্প কিছু আবিষ্কৃত স্তুপ ও কাঠামোকে (যেগুলির বৈশিষ্ট্য হল বড় বড় ইঁট দিয়ে তৈরি) নগণ্য মনে হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাটনা (কুমরাহর)-র মৌর্য প্রাসাদ চীনা তীর্থযাত্রীদের প্রশংসা অর্জন করেছিল—কিন্তু পরবর্তী দুশো বছরের মধ্যেই তা আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। মনে করা হত যে, বিশাল পাথরের স্তম্ভগুলি একসময় কাঠের বিম দিয়ে তৈরি ভিতের ওপর নরম ভিজে মাটিতে বসানো হয়েছিল—পরে যা একশ' ফুট বা তারও বেশি গভীরে নেমে যায়। সাম্প্রতিক প্রত্নতত্ত্ব এই অনুমানকে ভুল প্রমাণ করেছে (*ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি-এ রিভিউ* ১৯৫৫, পৃ. ১৯)। চীনাদের বর্ণিত অশোক-যুগের গ্রানাইট স্তম্ভের উজ্জ্বল পালিশের বিবরণ অবাস্তব বলে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা হেসে উড়িয়ে গিয়েছিলেন—কিন্তু সারনাথে কানিংহামের প্রথম খননকার্যে তা যথার্থ বলে প্রমাণিত

হয়েছে। সিংহমুন্ডটি (যদিও সার্বভৌমত্বের যে চক্রটি একসময় সেটি বহন করত—তা সময়, নির্মাণ সামগ্রী, বৈরী পরিদর্শক ও বর্বরদের ক্রিয়াকলাপে নষ্ট হয়ে গেছে) আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্প নিদর্শনগুলির একটি এবং ভারতের জাতীয় প্রতীক হওয়ার যথার্থই যোগ্য। তা সত্ত্বেও, অশোকস্তম্ভগুলির মধ্যে সম্রাটের উদ্দেশ্য এবং আধুনিক পর্যবেক্ষকদের কাজের সহায়ক—উভয় বিচারেই সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল তাঁর শিলালিপিগুলি। এই লিপির পাঠোদ্ধার[৫] এক অসাধারণ কৃতিত্ব—এমনকী যে প্রজন্ম মিশরীয় চিত্রলিপি বা প্রথম কিউনিফর্ম লিপিকে পুনরায় মানবজ্ঞানের অধীত হতে দেখেছে তাদের কাছেও। এগুলির সঙ্গে আলেকজান্ডার সম্পর্কিত অন্যান্য রচনার বা মেগাস্থিনিসের বিবরণীর প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত অংশ থেকে মগধের শাসক সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা তৈরি হয় তার বৈপরীত্য এত বেশি যে সেগুলির পুনরায় পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[৬]

(অশোকের শিলাপিপি-১) : 'দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দসি-র নির্দেশে ধম্ম (নৈতিকতা) বিষয়ে এই অনুশাসন লিখিত হয়েছে। এখানে (আমার রাজ্যে) কোন জীবহত্যা, বা বলিদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এবং কোন *সমাজ,* উৎসব-সমাবেশ করা যাবে না। কেননা দেবগণের প্রিয় রাজা পিয়দসি উৎসব-সমাবেশগুলিকে ক্ষতিকর মনে করেন। তথাপি, এমন কিছু (ধরনের) উৎসব-অনুষ্ঠান আছে যেগুলিকে অবশ্য রাজা পিয়দসি প্রশংসনীয় মনে করেন ...। আগে রাজা পিয়দসি-র রন্ধনশালায় ভোজের জন্য প্রতিদিন অজস্র পশু বধ করা হত। কিন্তু এখন, ... রান্নার জন্য মাত্র তিনটি প্রাণী বধ করা হয় : দুটি ময়ূর এবং একটি হরিণ—তা-ও হরিণটি আবার নিয়মিতভাবে নয়। ভবিষ্যতে এই তিনটি প্রাণীও হত্যা করা হবে না।'

এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আমাদের সবসময়ই ভাবতে হবে যে, কেন অশোক এই ধরনের কথাগুলিকে এমন প্রকাশ্যে, চিরস্থায়ী ভাবে রেখে দেওয়াটা প্রয়োজন মনে করলেন—যা তিনি অন্যভাবেও বলতে পারতেন? তাঁর খোদাইলিপি, সিংহমুন্ড, বিলুপ্ত প্রাসাদ—সবকিছুরই গঠনশৈলী আজকের ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের অনুমানে, দারিয়ুসের খোদিতলিপি ও প্রাসাদের অনুকরণ। দারিয়ুসের লিপি দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আর প্রাসাদটি ভস্মীভূত হয়েছিল আলেকজান্ডারের এক পানোৎসবের সময়। নিশ্চিতভাবেই অশোকের ভাস্কর্য ছিল কাঠের ওপর ভারতীয় কারুকার্য রীতিরই অনুকরণ। এই সমস্ত সাধারণ মন্তব্যে সচেতনভাবেই পরিহার করা হয় দারিয়ুসের দাম্ভিক মনোভাব ও উচ্চ বাগাড়ম্বরপূর্ণ বাক্যগুলির কথা। দারিয়ুস নিজেকে গোষণা করেছিলেন 'গ্রীক রাজা, রাজাধিরাজ, বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত প্রদেশগুলির রাজা, বিপুলা এই পৃথিবীর এমনকী সুদূর অঞ্চলের পর্যন্ত অধীশ্বর।...আহুরমজ্‌দ এই পৃথিবীকে যুদ্ধক্ষেত্র বলে মনে করতেন, তাই আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, আমাকে এর রাজা করেছিলেন এবং আমি রাজা ছিলাম। আহুরমজ্‌দ-র ইচ্ছানুসারে আমি (আন্দোলিত পৃথিবীকে) যথাস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিয়েছি।' অশোক কখনও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে দাবি করেননি, নিজের বংশগরিমা বা যুদ্ধজয় নিয়ে দম্ভও নয়। ভাবাবেগটা ছিল যথেষ্টই স্পষ্ট। মগধের ধর্মমতগুলি উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক বলিদান প্রথা নিষিদ্ধকরণের যে আন্দোলন শুরু হয়—তা সম্পূর্ণ হয়েছিল এই পর্বে এসে। স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে যখন উৎসাদন করা হয়ে গেল—পশুচারণ অর্থনীতির সাথে পশুবলিও তখন সেকেলে হয়ে পড়ল।

এখানে বাকিটুকু, অর্থাৎ একধরনের উন্মত্ত উৎসব অনুষ্ঠানেও (*অর্থশাস্ত্র* ১.২১, ২.২৫, ৫.২; স্পষ্টতই ধর্মীয়, ১৩.৫*; রাজগীরের ক্ষেত্রে স্থানিক উৎপত্তি সম্পর্কিত এক কষ্টকল্পিত তত্ত্বের জন্য আরো দ্রষ্টব্য ঃ *জাতক* ১৫৪, ৪৩৮, ৫৪৫ এবং *অ্যালবাম কের্ন*-এ ই. জে. হার্ডির প্রবন্ধ, পৃ. ৬১-৬৬) পশুবলি নিষিদ্ধ হল, যেমন সৈন্যদের ক্ষেত্রে তা আগেই হয়েছিল (*অর্থশাস্ত্র* ১০.১)। সমাজ অনুমতি দিলে পশুবলি হয়ত আবার চালু হতে পারত। বিশেষ কোন উপলক্ষে সমাজ তা দিত-ও, যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেতালের কাছে বলিদানের উল্লেখ হয়েছে। বার্ষিক 'হোলি' মহোৎসব ছিল (যাতে পশুবলি হয় না, কিন্তু বিকট চিৎকার, মদ্যপান, গান, কুস্তি ও বহুৎসব চলে) উর্বরতা-কামনার উৎসব—যার সন্ধান শেষ প্রস্তরযুগেও পাওয়া যেতে পারে। আদি ও নব্য প্রস্তরযুগের মধ্যবর্তী সময়ের বৃষ্টিতে জমাট বাঁধা ভূস্তরের প্রচুর ছাই ও কিছু কিছু পশুর হাড় (বলিসম্ভূত) থেকে বোঝা যায় যে 'হোলি' উপলক্ষে বিশাল বহুৎসবের সময় একই অঞ্চলে[৭] প্রতিবছর বা মাঝে মাঝে পশুবলি হত। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি যে শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে পশুচারণভিত্তিক জীবন ও লোকাচারের অবসান ঘটিয়েছিল—এটা তারই প্রমাণ।

(অশোকের শিলালিপি-২) : 'দেবগণের প্রিয় রাজা পিয়দসি-র রাজ্যের সর্বত্র এবং অনুরূপভাবে কোড়, পান্ড্য, সতিয়পুত, কেরলপুতের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে, এমনকী তাম্রপর্ণী, যোন-রাজ অন্তিয়ক এবং এই অন্তিয়কের প্রতিবেশী রাজাদের রাজত্বে পর্যন্ত—সর্বত্র দেবপ্রিয় রাজা পিয়দসি দুই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন : মানুষের চিকিৎসা এবং পশু চিকিৎসা। মানুষের বা গবাদি পশুর উপকারে লাগে এমন কোন ওষধি বৃক্ষ যদি কোন জায়গায় পাওয়া না যেত—তাহলে তা অন্য জায়গা থেকে আমদানি করা হত এবং সেখানে রোপন করা হত। গবাদি পশু ও মানুষের ব্যবহারের জন্য রাস্তার দুই ধারে কূপ খনন এবং বৃক্ষরোপণ করা হয়েছিল।'

এই মহতী কাজের পিছনের উদ্দেশ্যগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ভারতের অন্য কোন রাজার সঙ্গেই মগধের সার্বভৌম সম্রাটের মর্যাদার কোন তুলনা হয় না; সব ভারতীয় রাজার নামই আসলে হল তাদের নিজ নিজ উপজাতি বা অঞ্চলের নাম। ধরে নেওয়া হয়েছে যে 'সেখানে নিশ্চিতই রাজারা ছিল'। আলেকজান্ডারের বিরোধী উপজাতিদের আধুনিক ইতিহাসবিদরা সবসময়েই 'রাজা' বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও এই উপজাতি-প্রধানরা কখনই সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন না—এমনকী যদি উত্তরাধিকার সূত্রেও পদ পেয়ে থাকেন তাহলেও নয়; তাছাড়া উপজাতি প্রধানের পদটি নির্বাচিত পদও হত। বিপরীতে অশোক যে গ্রীক রাজাদের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—তা উপেক্ষা করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে, অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপির অন্তর্ভুক্ত গ্রীক নামগুলি এই অনুশাসনের কালনির্ণয়ের পক্ষে সহায়ক হয়—এবং তা ২৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যে বছর সাইরেন-এর ম্যাগাস গত হন, তার পরে নয়। অ্যান্টিওকাস (দ্বিতীয়, থেওস)-এর নামের ক্ষেত্রে 'সামন্ত' শব্দটি 'প্রতিবেশী শাসক' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে—কিন্তু অশোকের ভারতীয় প্রতিবেশীদের ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত নয়; হাজার বছর পরে এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় 'অধীনস্থ' বা 'করদ' রাজা (*অর্থশাস্ত্র*-র অনুবাদ

---

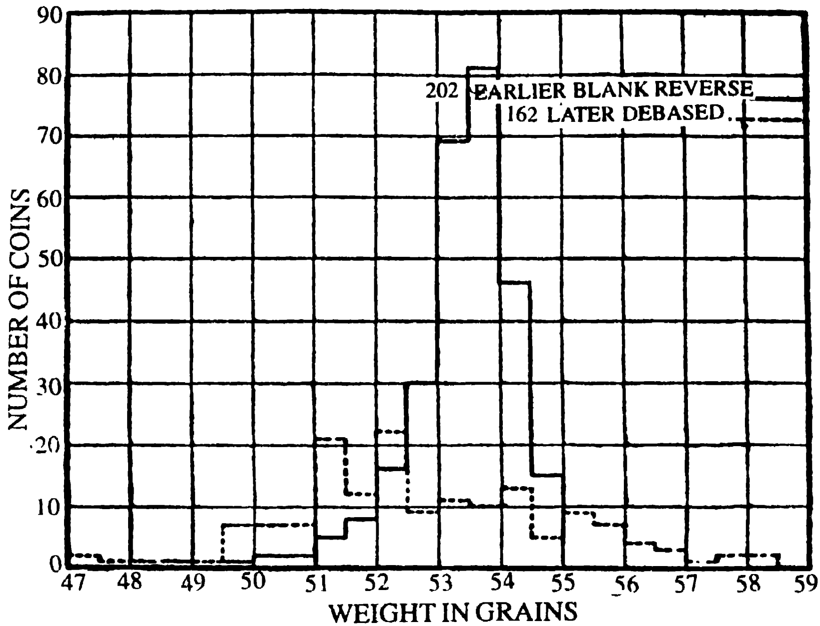
* *অর্থশাস্ত্র*-এ (১৩.৫) রাজাকে 'স্থানীয় দেবদেবী, সমাজ ও বিহারগুলিকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানিয়ে (*দেশ-দৈবত-সমাজোৎসব—বিহারেষু চ ভক্তিম অনুবর্তিতা*) সদ্য বিজিত মানুষদের শান্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ 'সমাজ'-কে সম্মান জানাতেই হবে, অশোক কর্তৃক এই রীতির বিলোপ তাঁর পূর্ববর্তী এবং অতীতের সকল রাজ ক্ষমতানুশীলনের বিপরীত।

করতে গিয়ে জে. জে. মেয়ার কখনো কখনো এরকম ভুল করেছেন)। শেষ বিচারে, ভাল ভাল কাজকর্ম সবই করা হয়েছে 'পথের', অর্থাৎ বড় বড় বাণিজ্যপথের দু'পাশে এবং তা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হয়েছে—যদিও এই ধরনের সাহায্য ছাড়াই মগধ থেকে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল অনেক আগে। অশোকের স্তম্ভলিপি-৭-এ বর্ণনা করা হয়েছে যে পথপার্শ্বস্থ এই সব কূপ, থাম ও অন্যান্য ছায়াদানকারী গাছের বাগান তৈরি করা হয়েছিল এক যোজন অন্তর অন্তর। এটা খুবই যুক্তিযুক্ত। যোজন বলতে বোঝাত, বলদবাহিত গাড়ি নিয়ে কোন বণিকদল একটানা যতটা পথ অতিক্রম করতে পারে সেই দূরত্বকে। শ্রাবস্তী থেকে তক্ষশীলার দূরত্ব ১৪৭ যোজন বলে মাপা হয়েছিল। আজকের একক অনুযায়ী, এক যোজন হল সাড়ে চার থেকে নয় মাইলের মধ্যে। যাত্রীদলের বিশ্রামস্থলের যে ব্যবস্থা অশোক করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে বাণিজ্যপথগুলির সন্ধান যোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিকরা এখনও করতে পারেন। অশোকের প্রভাব বিস্তারের ফলে ভারতীয় উপজাতিগুলির মধ্যে রাজপদগুলি সৃষ্টি হয় বা সেগুলির রূপান্তর ঘটে, অন্যদিকে গ্রীক রাজারা তাঁর শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু করে দেন।

(অশোকের শিলালিপি-৩) : 'আমার বারো বৎসর রাজত্বকাল সম্পন্ন হবার পর নিম্নলিখিত নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম। এই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত আমার রাজত্বের সর্বত্র *যুক্ত*, *রজুক* ও *প্রাদেশিক* গণ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর (তাঁদের দায়িত্বাধীন সমগ্র অঞ্চলে) পূর্ণাঙ্গ সফরে বের হবেন—নৈতিকতা বিষয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশ ও অন্যান্য কাজের জন্য : 'মাতা-পিতাকে মান্য করা প্রশংসনীয়। বন্ধু, পরিচিত ব্যক্তি, এবং আত্মীয়স্বজন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের প্রতি সদাশয়তা প্রশংসনীয়। পরিমিত ব্যয় ও পরিমিত সম্পত্তি প্রশংসনীয়'। (মন্ত্রী) পরিষদ *যুক্ত*-দের নির্দেশ দেবে যে তাঁরা যেন (এ ছাড়াও) বিচারবোধ ও পত্র উভয় অনুসারেই (এই আইনগুলিকে) নথিভুক্ত করেন।'

অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করাটাকে কনস্তান্তিনের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করা হয়। এই তুলনাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যেতে পারে সেই কাহিনীটির সাহায্যে যে, এক অসূয়াপরায়ণা সম্রাজ্ঞীর প্ররোচনায় তিনি তাঁর পুত্র কুণালের প্রতি সেই আচরণ করেছিলেন—ঠিক যেমনটি এই খ্রীষ্টান করেছিলেন তাঁর পুত্র ক্রিসপাসের প্রতি। তা সত্ত্বেও, কনস্তান্তিনের খোদিত লিপিতে আমরা নৈতিকতা বিষয়ে এই মনোযোগ দেখতে পাই না। বস্তুত, অশোককে কখনো কখনো যেভাবে চিত্রিত করা হয়, তিনি যদি নিছক তেমন ধর্মগত প্রাণ-ই হতেন তাহলে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে অনুসৃত রীতি অনুযায়ী তাঁকে স্বেচ্ছায় বা জোর করে সিংহাসন ত্যাগ করানোটা হত পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ। তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর, বৃহদ্রথকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য হত্যা করেছিলেন তাঁরই সেনাপতি পুষ্যমিত্র, আর পুষ্যমিত্রের শুঙ্গ বংশীয় শেষ প্রতিনিধিকে হত্যা করেছিলেন তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী—যিনি আবার সমস্ত বৈদিক বিধান ও ঐতিহ্যের বিরোধিতা করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। এটা লক্ষ্যণীয় যে, অশোকের ক্ষমতাবান গ্রীক প্রতিবেশীরা আলেকজান্ডারকে অনুকরণ করে ভারত আক্রমণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃসাহস দেখায়নি—যেমন দেখিয়েছিল দুই প্রজন্ম পরের তুলনামূলকভাবে দুর্বল যবনরা। সুতরাং, এই সমস্ত অনুশাসন ধর্মের অতিরিক্ত কিছু বিষয়কেও ব্যক্ত করে; তাছাড়া, সেগুলিতে বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত তেমন কিছু নেই। একথা বলা যেতে পারে যে,

সম্রাটের ব্যক্তিগত ধর্মান্তরণের চেয়েও বেশি কিছু ঘটেছিল, নতুন শ্রেণী-কাঠামো ও সমাজ-রূপের উপযোগী হয়ে ওঠার জন্য পূর্বতন সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রেরই এক গভীরতর পরিবর্তন ঘটছিল।



চিত্র ৩৩ : তক্ষশীলা থেকে পাওয়া প্রাক্-মৌর্য ও অশোকের মুদ্রার ওজনের তুলনামূলক পার্থক্য।

ন্যূনতম ব্যয় ও ন্যূনতম সম্পত্তি বিষয়ে যে পরামর্শ—তা তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা অর্থনীতিতে যে প্রচণ্ড টানাপোড়েন চলছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল অত্যধিক খাদ মেশানো ও দ্রুত নির্মিত মুদ্রাগুলির মধ্যে (চিত্র ৩৩)। বণিক বা গৃহস্থরা যদি মজুত করায় অভ্যস্থ হত তাহলে সেকারণে সৃষ্ট অভাবে বণিকদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা চলে যাওয়া সম্ভব ছিল। দক্ষিণের দিকে নতুন নতুন অঞ্চল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল যেগুলিতে সম্ভবত পণ্য-উৎপাদনের পুরনো কেন্দ্রগুলি থেকে সরবরাহ করা যাচ্ছিল না। মেগাস্থিনিসের উল্লেখ অনুযায়ী রাজকর্মচারীদের মধ্যে দুটি বর্ণ গড়ে উঠেছিল; এদের উপাধি, মনে হয়, জানা যেতে পারে *অর্থশাস্ত্র* থেকে।[৮]

(অশোকের শিলালিপি-৪) : 'যেহেতু, বহুশত বৎসর ধরে এই সমস্ত অনুশাসন ছিল না তাই দেবগণের প্রিয় রাজা পিয়দসির পক্ষ থেকে ধম্মের (নৈতিকতা) নির্দেশবলে এখন থেকে জীবিত প্রাণীদের আক্রমণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকা, আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের প্রতি শিষ্টাচার, মাতা-পিতাকে মান্য করা, বয়স্কদের মান্য করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।' (শিলালিপি-৫) : 'অতীতে (আমার) রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে আমা কর্তৃক নৈতিকতার মহামাত্রদের নিয়োগ করার আগে পর্যন্ত *ধম্ম-মহামাত্র* (নৈতিকতার মহামন্ত্রী)-নামে অভিহিত ব্যক্তিদের অস্তিত্বই ছিল না। তাঁরা সব ধর্মমতের মানুষদের মধ্যে *ধম্ম* প্রতিষ্ঠার, *ধম্মের* উন্নতি

ঘটানোর, এবং (এমনকী) যোন, কম্বোজ ও গান্ধার এবং পশ্চিম-সীমান্তের (যার মধ্যে আমার সীমান্ত-ও থাকতে পারে) মানুষদের মধ্যে (পর্যন্ত) যারা *ধম্মের* প্রতি অনুরক্ত তাদের কল্যাণ ও সুখের জন্য কাজ করেন। তাঁরা কাজ করেন ভৃত্য ও গৃহকর্তাদের সঙ্গে, (সর্বোচ্চ) ব্রাহ্মণ ও (সর্বনিম্ন) *ইভ্যদের* সঙ্গে, নিঃস্বদের সঙ্গে, বৃদ্ধদের সঙ্গে। ... তাঁরা নিযুক্ত থাকেন বন্দীদের (অর্থ) সাহায্য করায়; যদি তাদের কারো শিশুসন্তান থাকে বা কেউ বশে এসে যায় বা বৃদ্ধ হয় তাহলে তাদের শৃঙ্খলমোচন করিয়ে মুক্ত করার কাজে।' শিলালিপি-৬) : 'অতীতে কর্ম-বন্টনের কিংবা সংবাদ সংগ্রহ করে জানানোর ব্যবস্থা ছিল না। আমি নিম্নোল্লিখিত (ব্যবস্থাদি) গ্রহণ করেছি। সংবাদ-সংগ্রাহকরা (অবিলম্বে) জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংবাদ যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে—আমি আহাররত অবস্থায়, হারেমে, অন্দরমহলে,গুপ্তকক্ষে, পাল্কিতে (বাহিত হবার সময়), উদ্যানে—যেখানেই থাকি না কেন সেখানে জানাবে। আর সর্বত্রই আমি জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির মীমাংসা করব। উপরন্তু, (মন্ত্রী) পরিষদে যদি কোন বিরোধ দেখা দেয়, কিংবা কোন দান বা আমার কোন মৌখিক ঘোষণা সম্পর্কে, কিংবা মহামাত্রদের দায়িত্বাধীন কোন জরুরী বিষয়ে যদি কোন সংশোধনী আনা হয় তাহলে তা অবশ্যই আমাকে বিনা বিলম্বে, যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে জানাতে হবে।'

অর্থাৎ, রাজা নিছকই নব্য-ধর্মান্তরিতের উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নৈতিকতার প্রচার করছিলেন না, বরং আমূল পরিবর্তনকামী নতুন প্রশাসনিক পদক্ষেপগুলির কথাও জনগণের কাছে তুলে ধরছিলেন। পরে, এই ভাবপ্রবণতা এতই ব্যাপক হয়ে ওঠে যে, তার সমস্ত শক্তিই নিঃশেষিত হয়ে যায়; তখন আমরা পাই, একদা বৈপ্লবিক সেই শাসন পদ্ধতিকে ব্যবহারকারী এক সাম্রাজ্যিক প্রশাসন। (শিলালিপি-৭) 'দেবগণের প্রিয় রাজা পিয়দসি-র অভিপ্রায় যে, সকল ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষ সর্বত্র বসবাস করতে পারবে।' এটা মামুলি বলে মনে হতে পারে, বড়জোর একে জনগণের অবাধ ভ্রমণের অনুমতি বলে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ধম্মের 'নৈতিকতা'-র সাহায্যে শাসনের নতুন পদ্ধতিতে এটাই সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী বিশেষাধিকার। 'ধম্মক' শব্দটি (যার বর্তমান অর্থ হতে পারে ধার্মিক) মেনান্দার-এর মুদ্রায় অনূদিত হয়েছিল 'দিকাইওস'—যা 'ন্যায্য'-র গ্রীক প্রতিশব্দ। ধর্মান্তরিত করতে পারেন এমন ধর্মগুরুদের রাজ-গ্রামগুলিতে প্রবেশ আগে নিষিদ্ধ ছিল, অথচ সেগুলিই ছিল সমগ্র গ্রামাঞ্চলের বৃহত্তম অংশ। এই সময় ধর্মমত নির্বিশেষে তাঁদের উৎসাহিত করা হয়। অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেননি, সাধারণভাবে নৈতিকতাও নয়, বরং তিনি স্বেচ্ছাচারী আইনকানুনের পৃষ্ঠপোষক নগ্ন শক্তিগুলির চেয়ে সুবিচার, সামাজিক ন্যায়নীতির শ্রেষ্ঠত্বই ঘোষণা করেছিলেন। শিকারের পরিবর্তে তিনি পরিদর্শনে বের হতেন (শিলালিপি-৮) এবং নতুনতর 'নৈতিকতার' প্রয়োগ থেকে আনন্দলাভ করতেন—কেননা সর্বত্রই তিনি ব্রাহ্মণ বা সকল ধর্মমতের সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের উপহার দিতেন।

'স্তম্ভলিপি-৭'-এ অশোক ঘোষণা করছেন ঃ

'কয়েকজন মহামাত্রকে আমি নির্দেশ দিয়েছি (বৌদ্ধ) সংঘগুলির বিষয়ে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে। অনুরূপভাবে, আর কয়েকজনকে নির্দেশ দিয়েছি ব্রাহ্মণ ও আজীবকদের বিষয় দেখতে; কয়েকজনকে নিগন্থদের (জৈন) বিষয়গুলি দেখার নির্দেশ দিয়েছি; অন্যদের নির্দেশ দিয়েছি অন্যসব ধর্মমতের মানুষদের বিষয়গুলি দেখতে।'

এটার প্রয়োজন ছিল, কেননা বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে ইতিমধ্যেই যে উত্তপ্ত ধর্মতাত্ত্বিক বাদানুবাদ শুরু হয়েছিল তা যদি রাষ্ট্রীয় মদত পেয়ে একবার রেওয়াজে পরিণত হত—তাহলে শান্তি ও কল্যাণ বৃদ্ধির কর্তব্যটা ব্যাহত হত। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অনুরাগ প্রমাণিত হয় সাঁচি ও সারনাথের স্তম্ভ থেকে, এবং বিশেষভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ কলকাতা-বৈরাট শিলালিপি থেকে। রুম্মিনদেই গ্রামে তিনি 'স্বয়ং এসেছিলেন এবং প্রার্থনায় যোগ দিয়েছিলেন—কেননা বুদ্ধ শাক্যমুনি এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ... একটি প্রস্তরস্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন (কারণ) পরম আশীর্বাদধন্য একজন এখানে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি লুম্মিনি গ্রামকে 'বলি' করমুক্ত করেছিলেন, এবং (গ্রামটিকে) এক-অষ্টমাংশ কর দিতে হত।' সেনার্ট ও অন্যান্যরা বুদ্ধকে যে সূর্যতুল্য অতিকথায় পরিণত করেছিলেন এটা তাঁকে সেখান থেকে টেনে এনে পার্থিব মানুষে পরিণত করেছে, প্রমাণ করেছে পালিভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির বর্ণনার সঠিকত্ব; অতি সাধারণ একটি গ্রামের স্থান-নাম আড়াই হাজারেরও বেশি বছর ধরে টিকে থাকাটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। *অর্থশাস্ত্র* (২.৬)-তে বলি করের উল্লেখ আছে, আর প্রত্যক্ষভাবে রাজার মালিকানাধীন নয় এমন জমিতে উৎপাদিত ফসলের যে এক-ষষ্ঠমাংশ কর হিসেবে দিতে হত সেটাকে এখানে কমিয়ে এক-অষ্টমাংশ করা হয়েছে বলে মনে হয়। মনে রাখতে হবে, অশোক *অর্থশাস্ত্র*-র পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, পালিভাষায় লিখিত *জাতক*-এর নয়—যেখানে সব করই বলি কর।

যাই হোক, যে সমস্ত কারণ 'সর্বব্যাপী সাম্রাজ্য' গড়ে তোলার দিকে নিয়ে গিয়েছিল বৌদ্ধধর্মের উপরও সেগুলির প্রভাব স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল। নিগলি সাগর অশোকস্তম্ভ প্রমাণ করে যে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বর্ণিত সাত বা ততোধিক 'পূর্বতন বুদ্ধ'-এর মধ্যে অন্তত একজনের (কোনাকমন) নামে একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল—পরে অশোক যেটিকে সম্প্রসারিত করে মূল আকারের দ্বিগুণ করেন। এইসব কল্পিত 'পূর্বতন' বুদ্ধরা জৈন পূর্বতন তীর্থঙ্করদের প্রতিপক্ষই শুধু নন, সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যিক উত্তরাধিকারের আদর্শ অনুসরণকারীও বটেন। বর্তমানে, *ত্রিপিটক*-এর ('তিন গোছা', 'তিন ঝুড়ি' নয়) অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির বৌদ্ধ অনুশাসনে বার বার জোর দিয়ে চক্রবর্তিন (= 'চক্র-চিহ্নধারী সম্রাট')-এর সঙ্গে চক্র (= আইনের চক্র') নিয়ন্ত্রণকারী বুদ্ধের তুলনা করা হয়েছে। এরপর মূর্তিবিদ্যার দিক থেকে চক্র হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্রাট ও বুদ্ধ উভয়েরই বৈশিষ্ট্যসূচক। সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে আচার্যেরও রূপান্তরণ ঘটেছে; একজন সাধারণ উপজাতি-প্রধানের সঙ্গে তুলনীয় এক স্বেচ্ছা সংঘের প্রধান হয়ে দাঁড়ালেন আগের চেয়ে অনেক বেশি মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব, সম্রাটের দ্বিতীয় প্রতীক। সম্রাটের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বৌদ্ধধর্মের উপর সম্রাটের প্রভাবের চেয়ে বেশি ছিল না। ঐতিহ্যটা হয়ে গিয়েছিল, রাজবাড়ির রাজকুমার ও রাজকুমারী পবিত্র ধর্ম গ্রহণ করছেন—স্বাভাবিকভাবে যে নিয়ে তর্কবিতর্কও ছিল। অশোকের রাজত্বকালে, রাজকুমার মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম এবং শাক্য ধর্মগুরু যে পবিত্র পিপুল বৃক্ষের তলায় বসে বোধিলাভ করেছিলেন তার একটি শাখা নিয়ে সিংহলে গিয়েছিলেন। মোগ্গলিপুত্ত তিসার অধ্যক্ষতায় একটি তৃতীয় বৌদ্ধ পরিষদ (সম্ভবত) আহ্বান করা হয়েছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুযায়ী, প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধের মৃত্যুর ঠিক পরে রাজগৃহে এবং দ্বিতীয়টি একশ বছর পরে বৈশালীতে—কালাশোকের রাজত্বকালে। বলা হয় রাজা অজাতশত্রুই প্রথম বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষগুলির উপর স্তূপ নির্মাণ করেন, এবং অশোক

সেগুলির সম্প্রসারণ ও অগণিত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটান। এটা লক্ষ্যণীয় যে, অজাতশত্রু ও অশোকের মধ্যবর্তী পর্বে এই ধর্মমতগুলির কোনটির প্রতি পৃষ্ঠপোষণা তো দূরের কথা মগধের রাজ পরিবারের কোন সহানুভুতিসম্পন্ন শ্রোতার কথাও কোথাও দাবি করা হয়নি। সেই কারণেই মগধের শিশুনাগ বংশ— যাঁরা নাগ ছিলেন কি ছিলেন না তা নিয়ে ঘৃণা ও রাগের বশে পুরাণে 'ক্ষাত্রবন্ধভ' বলে বর্ণিত হয়েছেন—তাঁরা বৈদিক রীতি অনুযায়ী কোন পশুবলি দিয়েছিলেন বলেও কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। জৈনরা আনুকূল্য পেয়েছিল আরো কম, যদিও তারা দাবি করে যে একজন চন্দ্রগুপ্ত—কখনও কখনও অনুমান করা হয় প্রথম মৌর্যসম্রাট—জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জৈন সূত্র 'তিলয়পান্নাত্তি'-তে আবার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে চন্দ্রগুপ্তের জনৈক বংশধর জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর (আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) অনুগামী বেশ কিছু মানুষ দক্ষিণে কনরিসি অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এঁদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল সম্ভবত মগধের বণিকরা—যাঁরা প্রস্তর যুগের শেষ দিক থেকেই হায়দ্রাবাদ-মহীশূরের সোনা ও অন্যান্য উৎপাদনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। অশোকের অনুশাসনগুলি সেখানে দেখেছিল প্রস্তর যুগের শেষ ও লৌহযুগের শুরুর দিকের মানুষরা—যারা ব্রহ্মগিরির মানুষদের মতোই পরের দিকে কিছু সময়ের জন্য গোষ্ঠীপতি কিংবা 'সন্ত' বা কৌম-প্রতিষ্ঠাতাদের স্মৃতিতে তাদের বিশাল সমাধি-মন্দিরগুলির নির্মাণ চালু রেখেছিল।

সহিংস পন্থা আগেই গ্রহণ করে দেখা হয়েছিল :

(শিলালিপি-১৩) : 'দেবগণের প্রিয় রাজা পিয়দসির রাজত্বকালের যখন অষ্টম বর্ষ তখন তিনি কলিঙ্গদেশ জয় করেন; ১৫০,০০০ সংখ্যক মানুষকে সেইসময় বন্দী করে (*অপবুধে*) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১০০,০০০ সংখ্যক জনকে সেখানে হত্যা করা হয়েছিল এবং মৃতের সংখ্যা তারও চেয়ে অনেকগুণ বেশি।'

এই লোকদের বন্দী করে (অপবুধে) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দাসে পরিণত করার জন্য নয়, বরং রাজার জমিতে বসতি স্থাপনের জন্য—যা আমরা প্রাচীন *অর্থশাস্ত্র*-র নীতি থেকে জানতে পারি; সুনির্দিষ্টভাবে, *অর্থশাস্ত্রে* (২.১, ৭.১, ৭.১৬, ৯.৪, ১১.১, ১৩.৫) ক্রিয়াপদটিকে সেইভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। কলিঙ্গের কোন বাজা বা রাজকুমারের উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে নিশ্চিতই বোঝা যায় যে কোন শক্তিশালী রাজা বা রাজতন্ত্র[৯] না থাকা সত্ত্বেও কলিঙ্গবাসীরা আদিম উপজাতীয় স্তর থেকে অনেকখানি উন্নত হয়ে এক বিপুল সংখ্যক মানুষকে প্রতিপালন করার মতো অবস্থায় পৌঁছেছিল। এই ধরনের বিকাশ প্রতিবেশী মৌর্যদের উদ্দীপক প্রভাবে ঘটেছিল বলে আশা করা যায়; এর একটি ভাল দৃষ্টান্ত, ব্রহ্মগিরি-চন্দ্রবল্লি-র বৃহৎ প্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি, যা মৌর্য যোগাযোগ ও বাণিজ্যের ফলে এর চেয়ে অনেক বেশি আদিম স্তর থেকে উন্নীত হয়েছিল—যদিও নিয়মিত কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল শাতবাহনদের সময়ে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, শাতবাহনরাই কৃষিকাজ চালু করেছিল—কেননা উত্তরাঞ্চলের লাঙ্গলের সাথে সাথে কৃষির কথা সেখানে অনেক আগে থেকেই জানা ছিল। কিন্তু লাঙ্গলচালিত কৃষিই তাদের গোষ্ঠী শাসনতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব করেছিল এবং তারা গ্রাম বসতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। অশোকের পরামর্শ ছিল, নৈতিকতার সাহায্যে শান্তিপূর্ণ বিজয়ই একমাত্র সত্যিকারের বিজয়।

'যোন-দের মধ্যে ছাড়া এমন কোন দেশই নেই যেখানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ—এই শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব নেই; এবং যখন কলিঙ্গ জয় করা হয়েছিল সেই সময় কোন দেশে এমন কোন (স্থান) ছিল না যেখানে মানুষ বাস্তবিকই (অপবুধে) কিছু চালান করার কাজে যুক্ত ছিল না; (হয়ত) আজ দেবগণের প্রিয়র কাজটি নিন্দনীয় মনে হতে পারে। ... এমনকী বনবাসীরা পর্যন্ত, যারা দেবগণের প্রিয়র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, এমনকী তাদেরও তিনি শান্ত করেছিলেন ও ধর্মান্তরিত করেছিলেন। এবং (তাঁর) অনুশোচনা সত্ত্বেও, তাদের সেই ক্ষমতার কথা বলা হয়েছিল দেবগণের প্রিয় যার (অধিকারী)—যাতে তারা লজ্জিত হতে পারে (তাদের অপরাধের জন্য) এবং তাদের হত্যা করতে না হয়।'

হত্যালীলা চালানো ছাড়া অন্য কোনভাবে 'আতবিক'আদিম বনবাসীদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা তাঁর আগে কখনও হয়নি। *অর্থশাস্ত্র* শুধু সামরিক রাজনীতি ও ষড়যন্ত্রের কাজেই এই আদিম বনবাসীদের ব্যবহার করতে চেয়েছে। লক্ষ্যণীয়, যখন এই অনুশাসনের প্রচার করা হয়েছিল, তখন রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে বিজিত মানুষদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়াটা আর জরুরি মনে হয়নি।

'আর এই (নৈতিকতার সাহায্যে বিজয়) দেবগণের প্রিয় বার বার অর্জন করেছেন উভয়ক্ষেত্রেই—এখানে এবং সীমান্তের ওপারের রাজ্যগুলিতেও, এমনকী ৬০০ যোজন দূরে যেখানে যোন রাজ অ্যান্টিওকাস (শাসন করেন) এবং এই অ্যান্টিওকাস-এর সীমানা ছাড়িয়ে যেখানে প্টোলেমাইওস, অ্যান্টিগোনাস, ম্যাগাস, ও আলেকজান্ডার নামক চার রাজা শাসন করেন এবং দক্ষিণের দিকে কোড় ও পান্ড্যদের (মধ্যে) থেকে শুরু করে সুদূর তাম্রপর্ণী (সিংহল অথবা উপদ্বীপের প্রান্তের নিকটবর্তী কোন নদী) পর্যন্ত। একইভাবে এখানে রাজার রাজ্যে, যোন ও কম্বোজদের মধ্যে, নভাক ও নভিতিদের মধ্যে, ভোজ ও পিটিনিকদের মধ্যে, আন্ধ্র ও পুলিন্দদের মধ্যে—সর্বত্র (জনসাধারণ) নৈতিকতা সম্পর্কে দেবগণের প্রিয়র নির্দেশাবলী মেনে চলছে।'

নামগুলিকে ঈষৎ আধুনিক করে নেওয়া হয়েছে। নতুন পদ্ধতির বিরাট সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নেই—যেহেতু তার সাথে বাণিজ্যপথ বরাবর কার্যকর জনপরিষেবা এবং সেই সঙ্গে নতুন বাণিজ্য যুক্ত হয়েছিল। শিলালিপি-৪ থেকে হয়ত ইঙ্গিত পাওয়া যাবে যে, এরপর থেকে সেনাবাহিনীকে মূলত ব্যবহার করা হয়েছিল কুচকাওয়াজ ও উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনের কাজে।

অশোকের অজস্র স্তম্ভ অনুশাসন ও গৌণ খোদাইগুলিতে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি দেখা যায়—যা থেকে আমরা সাম্রাজ্যের রাজকর্মচারী ও বিভাগগুলি সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা পাই। উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা, তোসালি-তে ছিলেন রাজপ্রতিনিধিরা, আর ব্রহ্মগিরির কাছে দক্ষিণাত্যে ছিলেন একজন 'আর্যপুত্র' (প্রধান রাজ্যপাল)। যুবরাজ হিসেবে অশোক নিজে, মনে হয়, তক্ষশীলায় রাজপ্রতিনিধি ছিলেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের (সম্ভবত খাশ-দের কেউ) বিদ্রোহ—যা গ্রীক ও মৌর্যবিজয়ের পর তক্ষশীলার অবনমিত অবস্থা দেখলে অস্বাভাবিক মনে হয় না—তা দমন করেছিলেন। তিনি নিজেকে 'সম্রাট' বলতেন না, বলতেন 'মগধের রাজা'; মগধ ও গাঙ্গেয় উপত্যকা ছিল প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। অশোকের নামটি পাওয়া গেছে শুধুমাত্র মাসকি শিলালিপিতে (এবং সম্প্রতি গুজার্‌রা-তে, *ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি : এ রিভিউ,* ১৯৫৫, পৃ. ২; *এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা,* ৩১.১৯৫৬.২০৫-১০; ২১২-১৮), সঙ্গে প্রচলিত উপাধি দেবানং পিয় =

দেবগণের প্রিয়। তিনি প্রথম রাজকার্য সম্পর্কে এক নতুন ও প্রেরণাদায়ক আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন ঃ (ধউলি-১) 'সব মানুষই আমার সন্তান'... (ধউলি-২) 'নিম্নোক্ত কারণেই আমি আপনাদের (আমার রাজকর্মচারীদের) নির্দেশ দিচ্ছি যে তাদের কাছে আমার যে ঋণ তা যেন আমি পরিশোধ করতে পারি।' স্তম্ভলিপি-৫ এ পশুহত্যা নিবারণ বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শ দেওয়া আছে। গোমাংসের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না, রাস্তার চৌমাথাগুলিতে তা বিক্রি হত; কিন্তু অবধ্য প্রাণীদের মধ্যে ছিল ষন্ডক অর্থাৎ 'ধর্মের ষাঁড়', কেননা আজও পর্যন্ত এগুলি শিবকেই উৎসর্গ করা। 'অপ্রয়োজনে কিংবা (জীবন্ত প্রাণীদের) ধ্বংস করার জন্য অরণ্য পোড়ানো চলবে না'—এই নীতি অরণ্য-উচ্ছেদের সমাদৃত আর্য-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটায়; যেমন রাজার দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অশোকের আদর্শ বিলুপ্ত করে সেই সমস্ত যর্জুর্বৈদিক রাজাকে—যারা পশুবলির প্রতিই শুধুমাত্র নিবিষ্ট ছিল। তাঁর প্রথম ছাব্বিশ বছরের রাজত্বকালে পঁচিশবার বন্দীদের সাধারণভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য, রাজকীয় ক্ষমতাশীলতা যে প্রাণীটির হত্যা কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ করতে পারত সেই প্রাণীটিকে তখনও হত্যা করা হচ্ছিল—পালকহীন দ্বিপদ অপরাধী ঃ

(স্তম্ভলিপি-৪) 'এটাই কামনীয় যে আদালতের বিচারপর্ব ও শাস্তিদান এই উভয়ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষতা বজায় থাকা উচিত। এবং আমার নির্দেশের লক্ষ্য এটাই যে দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত যে সব বন্দী কারাগারে রয়েছে, যাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে (দন্ডাদেশ কার্যকর করার আগে) তাদের দন্ডদান তিনদিনের জন্য মুলতুবি রাখা আমি মঞ্জুর করেছি। (এর ফলে) হয় (তাদের) আত্মীয়রা সেইসমস্ত ('লজুক' রাজকর্মচারীদের) বুঝিয়ে তাদের জীবনভিক্ষা করবে অথবা যদি বোঝানোর কেউ না থাকে তাহলে উপহার প্রদান ও উপবাস পালন করতে পারবে—যাতে পরলোকে (সুখ-শান্তি অর্জন) করে।'

রাজাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে মানবিক, তিনিও একজন রাজা-ই—মৃত্যুদন্ড দিয়েই তাকে সকলকে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাতে হয়।

প্রস্তর ও স্তম্ভে খোদিত এইসব লিপিগুলি কাদের উদ্দেশ্যে?

(স্তম্ভলিপি-৭) 'নিম্নোক্ত বিষয়টি আমার মনে হয়েছে। নৈতিকতা সম্পর্কে আমি ঘোষণা জারি করব, নৈতিকতা বিষয়ে (প্রদেয়) নির্দেশ জারি করব। তা শুনে মানুষ (তা) মেনে চলবে। ... *লজুক* (প্রশাসক)-রাও—যারা লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে যুক্ত—তাদের প্রতিও আমার এই নির্দেশ : 'এই এই ভাবে আপনারা মানুষকে প্রণোদিত করুন' ... ঠিক এই (বিষয়টি) লক্ষ্যে রেখে, আমি ধম্ম (নৈতিকতা) স্তম্ভগুলি স্থাপন করেছি, ধম্ম মহামাত্রদের (মন্ত্রী) নিয়োগ করেছি, ধম্ম সংক্রান্ত ঘোষণাগুলি প্রচার করেছি। (ধউলি-১,২) তিষ্য নক্ষত্র (বছরে তিনবার) যখন দেখা যায় সেই সময় প্রত্যেক দিন (পূর্ণাঙ্গ জনসমাবেশে) এই অনুশাসন অবশ্যই (পাঠ করতে হবে ও) শুনতে হবে এবং প্রায়শই যেসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সেগুলিতে মানুষ আলাদাভাবেও তা শুনতে পারবে। .. নিম্নোক্ত কারণে এখানে এই অনুশাসন লিখিত হয়েছে : যাতে (মানুষদের) সঙ্গত কারণ ছাড়া পায়ে বেড়ি পরতে বা কঠোর শাস্তি পেতে না হয় (তার জন্য) নগরের বিচার বিভাগের রাজকর্মচারীদের সব সময় প্রয়াস চালাতে হবে।'

অর্থাৎ, শুধু জনসাধারণকেই নয়, সর্ব-ক্ষমতাসম্পন্ন *রজ্জুক* রাজকর্মচারীদেরও নতুন পথ অনুসরণ করতে হবে। প্রত্যেক নাগরিককেই নতুন অধিকার ও নতুন রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। সঙ্গত বা অসঙ্গত যে কারণেই হোক না কেন পায়ে বেড়ি পরানোটা নিছক বন্দীত্ব নয় বরং তা দন্ড-দাসত্ব। সঙ্গত কারণ ছাড়া পায়ে বেড়ি পরানোর অর্থ লোকটিকে শাস্তি দেওয়ার পরেও কাজ করানো (দন্ডপ্রাপ্ত দাস হিসেবে), এবং তা নিরপরাধীকে শাস্তি দানও বটে। ন্যায়বিচার সংক্রান্ত এইসব নির্দেশ ঠিকমতো পালন করা হচ্ছে কি-না তা দেখার জন্য মহামন্ত্রীদের প্রতি পাঁচ বছরে একবার করে প্রদেশগুলিতে পরিদর্শনে যেতে হত। ধউলি অনুশাসনগুলি ছিল সদ্য-বিজিত অঞ্চলগুলির জন্য, কিন্তু উজ্জয়িনী ও তক্ষশীলার রাজপ্রতিনিধিদেরও একই নির্দেশ পাঠানো হত। সুতরাং এই সহজ কথাগুলি ছিল এক নতুন 'অধিকার সনদ'—শৈলী ও ভাষার দিক থেকে যা বিচার্য। অবশ্য, প্রতিটি অনুশাসন স্থানিক কথ্যরীতিতে রচিত বলে ভাষাতাত্ত্বিকদের যে যুক্তি আমার কাছে তা পরিষ্কার নয়। মাস্‌কি (রাইচূড়-র দক্ষিণে) ও ব্রহ্মগিরি (মহীশূর)-র আদিবাসীরা ভিন্ন ধরনের এক মাগধী ভাষায় কথা বলতে পারত বা আলেকজান্ডারের প্রথম দিকের চিঠির প্রতিলিপি পড়তে পারে সীমান্তবর্তী এমন কোন গ্রীকের কাছে হয়ত অশোকের ভাষাও বোধগম্য ছিল—এমন কথা বিশ্বাস করা শক্ত। নিশ্চিতই অনুশাসনগুলির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল স্থানীয় আমলাতন্ত্র—যাদের, অধিকাংশকেই বণিকদের মতো, মাগধী ভাষা জানতে হত এবং উত্তরে তা জনসাধারণের ভাষার চেয়ে খুব বেশি পৃথক ছিল না। অনুশাসনগুলির মধ্যেকার যে ভাষাগত তারতম্য, তা এক কথায়, ব্যাপক সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে সমমানসম্পন্ন না হয়ে ওঠার কারণেই বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আরো বেশি তারতম্য আজও দেখা যায় গ্রাম্য হিন্দী বা কোঙ্কনী ভাষায়; শেষেরটির ক্ষেত্রে ৬০ মাইল পরিসরের মধ্যেও তা ঘটে। সমমানসম্পন্ন হয়ে ওঠে পালি অনুশাসনের পর—যা অশোকের আমলের মাগধী ভাষার উজ্জয়িনী-রূপেরই কাছাকাছি। অবশ্য বুদ্ধ নিজে হয়ত এই ভাষায় কথা বলতে পারতেন না—যেমন কোন ইতালীয় পারত না তাদের বাইবেলের উপদেশাবলীর সিসিলীয় কথ্যরীতিকে আয়ত্ত করতে। সাম্রাজ্যের কর্মচারী ও নাগরিকদের কাছে এই অনুশাসনগুলির কি অপরিসীম গুরুত্ব ছিল তা অনুধাবন করা যায় এই ঘটনা থেকে যে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ভারতে সর্বপ্রথম রাজ-নির্দেশগুলির লিখিত রূপ দেওয়া হত এবং তা অক্ষয় পাথরে খোদাই করে প্রায়শই বহুদূর থেকে পরিশ্রম করে নিয়ে আসা হত কার্যসাধনের লক্ষ্যে।

কান্দাহারে গ্রীক ও আরামাইক ভাষায় খোদিত অশোকের অনুশাসন পূর্ববর্ণিত ধারণাকে জোরালো করে। সেখানে কোন মাগধী ভাষ্য না থাকাটা প্রমাণ করে যে প্রতিটি প্রদেশের কথ্য ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্যদিকে, এই অনুশাসনে ধম্ম শব্দটির (সম্পর্কিত) ভাষান্তর করা হয়েছে আলগাভাবে—যাতে বৌদ্ধধর্মের প্রচারটাই মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়ে দাঁড়ায়। এটা স্পষ্ট যে অশোকের ব্যবহৃত ধম্ম শব্দটিকে এখনও বিভিন্ন উপজাতি ও কৌম আইনগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে গণ্য করা হয় (যার প্রতিটির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট রয়েছে কোন লোকাচার)—যেগুলিকে এক নিয়মিত সামাজিক ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসাটা ছিল তাঁর কর্মচারীদের কাজ। তাছাড়া, ভারতীয় অনুশাসনগুলিতে মাগধী ভাষার একান্ত ব্যবহার প্রমাণ করে না যে তখন অন্য কোন ভাষা ছিল না বরং বোঝা যায় যে, আরও অজস্র ভাষা ছিল যার প্রতিটিই সীমাবদ্ধ ছিল স্থানিক ছোট ছোট গোষ্ঠীর লিখনহীন কথ্যরূপের মধ্যে। বাণিজ্যপথ বরাবর মগধের বণিক ও

সন্ন্যাসীরাই প্রথম এক লিপি ও ব্যাপক বোধগম্য ভাষার প্রচলন করে; মগধের রাজা, এমনকী যখন কলিঙ্গের মানুষদের জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করলেন তখনও সর্বজনবোধ্য আর কোনও ভাষার সন্ধান পাননি। এরপর থেকে কয়েক শতাব্দী ধরে সম্পূর্ণ ভিন্ন বংশোদ্ভুত রাজাদেরও তাদের খোদাইয়ের জন্য এই লিপি ও ভাষাই ব্যবহার করে যেতে হয়েছিল।

৭.৪ অশোকের আগের মৌর্য প্রশাসন সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় কৌটল্য (ভুলভাবে কৌটিল্য) রচিত *অর্থশাস্ত্র* থেকে। তাছাড়াও তিনি, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মহামন্ত্রী চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তাঁর অসাধারণ এবং অদ্যপি দুর্বোধ্য গ্রন্থটির প্রামাণিকতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে অস্বাভাবিক রকমের কটু, এমনকী ক্ষিপ্ত বিতর্কের মাধ্যমে। এই গ্রন্থ থেকে আমরা যেসব সিদ্ধান্ত টেনেছি সেগুলিকে বৈধ করতে হলে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। সবচেয়ে তিক্ত সমালোচনাটা করেছিলেন কেইথ ঃ

'*অর্থশাস্ত্র* এবং মেগাস্থিনিসের রচনাংশগুলির বিবরণের মধ্যে অন্তত চোখে পড়ার মতো সাদৃশ্য খোঁজার প্রয়াস স্বাভাবিক কারণেই নেওয়া হয়েছে—কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। সংখ্যার বিচারে মিল দেখা যায় অজস্র, কিন্তু বিষয়গতভাবে তা সাধারণ অর্থে খ্রীষ্ট জন্মের আগের ও পরের ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রযোজ্য। গ্রীক লেখকের যে সব বক্তব্যের ভ্রান্তি সন্দেহাতীত কিংবা বর্ণনা অস্পষ্ট সেগুলিকে যদি আমরা বাদও দিই এমনকী তাহলেও গুরুত্বপূর্ণ অনুপুঙ্খগুলির মধ্যের যে মিল অপরিহার্য—তার অভাব রয়েছে। পাটলিপুত্রের কাঠের দুর্গপ্রাকারের কথা *অর্থশাস্ত্র*-এর একেবারেই অজ্ঞাত, উল্টে পাথরের কাজের কথা বলা হয়েছে। নগরের রাজকর্মচারীদের পরিষদগুলির কোন প্রধান না থাকলেও সেগুলি যে সহযোগিতা করত *অর্থশাস্ত্র* তা উপেক্ষা করেছে, অথচ মেগাস্থিনিস সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। নৌবাহিনীর সৈনাধ্যক্ষ বা এমন এক নৌবহর যা চন্দ্রগুপ্ত অবশ্যই কাজে লাগাতেন এবং তা হয়ত অনেক রাজ্যেই নামে মাত্র ছিল, সে সম্পর্কেও *অর্থশাস্ত্র*-র কিছুই জানা ছিল না। বিদেশীদের প্রতি যত্ন নেওয়া, সীমান্ত পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দেওয়া, মারা গেলে তাদের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ—এসবও *অর্থশাস্ত্র*-র কাছে অজানা ছিল; জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্ত করার কথাও সেখানে নেই। আবার, অত্যন্ত উন্নত বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের যে বর্ণনা *অর্থশাস্ত্রে* দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে মেগাস্থিনিস বর্ণিত পুরানো ও নতুন শিল্পজাত পণ্যের বিক্রির ব্যাপারে পরিষদের কাজকর্মের লক্ষ্যণীয় রকমের পার্থক্য আছে। রাজাই জমির মালিক বলে মেগাস্থিনিসের যে বক্তব্য তার সমর্থন মেলে অন্যান্য প্রামাণিক ভারতীয় দলিলপত্র থেকেও; *অর্থশাস্ত্র-র* বক্তব্য কিন্তু তা নয়; মূল গ্রন্থে যে অসংখ্য শুল্কের কথা বলা হয়েছে তার তুলনায় মেগাস্থিনিস কথিত, কর ব্যবস্থা অনেক সরল। আবার, মেগাস্থিনিস যেখানে খোদিত লিপিগুলিকে উপেক্ষা করেছেন *অর্থশাস্ত্র* সেখানে নথিভুক্ত, রাজসরকারী দলিল তৈরি সংক্রান্ত নিয়মকানুনে ভরা এবং পাশপোর্টের স্বীকৃতিও আছে। ... *অর্থশাস্ত্র* যে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল এবং এর রচয়িতা যে রাজসভার সঙ্গে যুক্ত কোন রাজকর্মচারী ছিলেন—তা প্রমাণ করা যদি নাও যায়—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত।' (*হিস্টরি অফ স্যানস্ক্রিট লিটারেচার*, লন্ডন, ১৯৪০, পৃ. ৪৫৯-৬১)।

এই একই লেখক আগে (*জার্নাল অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ লন্ডন*, ১৯১৬, ১৩০) বলেছিলেন যে সঠিক অনুমানে এটি 'একটি প্রাচীন রচনা এবং হতে পারে যে তা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত হয়েছিল, যদিও এর বিষয়বস্তু খুব সম্ভবত আরো অনেক

পুরানো।' 'সম্ভাব্য' কাল পরিবর্তনের কারণের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না বরং এক তীব্র প্রতিকূলতা স্পষ্ট—যা থেকে অনেক হাস্যকর আপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। মেগাস্থিনিসের প্রাপ্ত বিবরণে যদি লিপির উল্লেখ না থাকে তাহলে কী আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে অশোক এক প্রজন্ম পরে হঠাৎ তা আবিষ্কার করেছিলেন? অথবা অশোকের অনুশাসনগুলির প্রামাণ্যতা বিষয়েও সন্দিহান হতে হবে? নিয়ারকোসের প্রশ্নের উত্তরে স্ট্র্যাবো (১৫.১.৬৭) জানিয়েছিলেন যে ভারতীয়রা সূক্ষ্মভাবে বোনা কাপড়ের ওপর লেখে। যতদূর জানা যায় *অর্থশাস্ত্রে* রাষ্ট্রীয় মালিকানার উল্লেখ নেই, মূলত রাষ্ট্রীয় 'সীতা' জমি কাজে লাগানোর কথাই বলা হয়েছে। জিনিসপত্র বিক্রির জন্য মেগাস্থিনিস কথিত রাষ্ট্রীয় পরিষদ (*মেগাস্থিনিস* ৮৭ = স্ট্র্যাবো ১৫.১.৫০-৫২)-এর সম্পূর্ণ সমর্থন আছে (*অর্থশাস্ত্র* ৪.২)। রাজকর্মচারীদের প্রতিনিয়ত বদলি করা হত এবং প্রতিটি দলের বেশ কয়েকজন প্রধান ছিল (*বহুমুখ্যম* ; *অর্থশস্ত্র* ২.৯)—এই বিবরণও গ্রীক প্রতিবেদনের প্রশাসনিক পরিষদগুলির উল্লেখকে সমর্থন করে। শুধু জন্ম-মৃত্যুই নয়, প্রতিটি মানুষ ও তার সমস্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য সতর্কতার সঙ্গে নথিভুক্ত করত 'গোপ' নিয়ামকরা (*অর্থশাস্ত্র,* ২.৩৫-৩৬) এবং শহরেই হোক বা গ্রামে, নিজেদের এলাকার বাইরে থেকে আসা প্রতিটি লোক সম্পর্কে তাদের খবরাখবর জানাতে হত। প্রতিটি বাণিজ্যযাত্রী দলের সঙ্গে এবং সবধরনের পেশার মানুষদের মধ্যে গুপ্তচর রাখা হত; বহিরাগতদের ওপর বিশেষ নজর রাখা হত। নৌবাহিনী ও বাণিজ্যপোত সম্পর্কে সেখানে একটা অধ্যায়ই আছে। অবশ্য, সে অধ্যায়ের বেশিরভাগটাই ব্যয়িত হয়েছে ফেরি-শুল্ক বা এই ধরনের আলোচনায়; এবং তা এই কারণেই যে প্রতিটি জনপদেরই নিজস্ব নৌ-পরিবহন দপ্তর ছিল—সে দপ্তরের একজন তত্ত্বাবধায়ক ছিল, যার মূল কাজ ছিল পরিবহনের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ রাখা, যাত্রী চলাচলের ওপর নজরদারী এবং পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ। পাথরের দুর্গপ্রাকারগুলি পাটলিপুত্রের জন্য ছিল না (কোথাও বিশেষভাবে উল্লেখ নেই), ছিল নব-প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন জেলা (জনপদ) সদরের দুর্গগুলির জন্য। রাজার বিশেষ সশস্ত্র নারী দেহরক্ষীর যে উল্লেখ মেগাস্থিনিস করেছেন (স্ট্র্যাবো ১৫.১৫৫-৬; *মেগাস্থিনিস* ৭০-৭১), তা প্রকৃত অর্থে *অর্থশাস্ত্র* (১.২১) বর্ণিত সেই বাহিনী—যারা শয্যাত্যাগের মূহূর্তে রাজার নিরাপত্তা দেখত। মেগাস্থিনিসের সেই সমস্ত বিবরণকে যদি আমরা পাশে সরিয়ে রাখি—যেগুলিকে কেউ হয়ত 'অস্পষ্টভাবে বর্ণিত' বা ভুলধারণার ওপর ভিত্তি করে লেখা বলে মনে করেন—তাহলে অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না; সুতরাং *অর্থশাস্ত্রের* সঙ্গে তার মিল থাকার প্রশ্নও ওঠে না—তা সে খামখেয়ালী পাণ্ডিত্যের বশে *অর্থশাস্ত্র*-র চারিত্রিক অস্পষ্টতা নিয়ে যতই বাড়িয়ে বলা হোক না কেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে, 'যা খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্বে সাধারণভাবে ভারতবর্ষে অজস্র ছিল' (এ কথার অর্থ যাই হোক না কেন), বিশেষ কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না—কেবলমাত্র এইটুকু ছাড়া যে, ভারতীয়রা বাতাসে নিঃশ্বাস নিত এবং মাটির ওপর দিয়ে হাঁটত; উৎপাদন-সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক সত্তাগুলি ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অজানিতভাবেই পাল্টে গেছে। ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন কোন আয়তনের কোন ভারতীয় রাজত্ব বা রাষ্ট্র নেই তখন সামান্য এক রাজকর্মচারী আদৌ কল্পস্বর্গ নয় এমনভাবে তা পুনর্গঠিত করছেন—এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। ব্যাখ্যাহীন পরিভাষায় ভরা একটা নথিতে তা করা বা অশোকের আমলের

(কিন্তু 'খ্রীষ্টজন্মের পরবর্তী' কোন আমলের নয়) সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে এমন সব কর্মীপদ উদ্ভাবন করাটা খুবই বিস্ময়কর হলেও কোন কাজে লাগত না। ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রচিত জ্ঞাত সমস্ত রচনারই স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের—সেগুলিতে পবিত্র নীতি বা নৈতিকতার ওপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এই একটি দোষ চূড়ান্ত বকমের বাস্তববাদী *অর্থশাস্ত্র*-র ওপর আরোপ করা যায় না। খ্রীষ্টজন্ম-পরবর্তী রাজনৈতিক-অর্থনীতি সংক্রান্ত লেখালেখি ধর্মীয় নীতিকথায় ভরা এবং যে কোন তত্ত্ব রচয়িতার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক, কেননা অশোকের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ভারতীয় রাজাদের জন্য একটা আদর্শ স্থির করে দিয়েছিল। পরিশেষে, চাণক্য, অন্তত সম্ভাব্য জাল গ্রন্থটিতে যেমনটা তাঁকে আমরা দেখেছি—নিশ্চিতই ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ব্রাহ্মণ্য আচার ও ব্রাহ্মণদের জন্য বিশেষ আর্থিক সুযোগসুবিধার বিরোধী—যা ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে কল্পনাও করা যেত না। এর ফলে নিশ্চিতই গ্রন্থটি এত বেশি অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে তার প্রতিলিপিও করা হয়নি, অথচ দন্ডিন, কামনদকি ও রাজশেখর-এর (১০ম শতাব্দী) কাছে তা পরিচিত ছিল আত্যন্তিক প্রামাণ্যতার কারণে। দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তরভারতে তালপাতায় লেখা একটি পুঁথির অংশবিশেষ এখনও রয়েছে। গ্রন্থটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল শুধুমাত্র এই কারণেই যে এতে রাষ্ট্র কাঠামো ও ধনসমৃদ্ধি সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া আছে তা আর সম্ভব ছিল না। *অর্থশাস্ত্র*-র সমাজ—তার আপেক্ষিক উচ্চ পণ্য উৎপাদন, অসংখ্য চুক্তি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নিয়ে ছিল অনন্যসাধারণ।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি থেকে গেছে। *অর্থশাস্ত্র* (২.১১)-তে একটি প্রবাল 'আলকন্দক'-এর উল্লেখ আছে এবং বলা হয়েছে (ভারতীয় তসর সিল্ককে 'পত্রোর্ণা' বলে উল্লেখ করার পর) যে "রেশম ও 'সিনপত্ত' কাপড়ের উদ্ভব ঘটেছে চীনে (সিন)"। সিলভ্যাঁ লেভির সরল সমীকরণ আলকন্দক = আলেকজান্দ্রিয়ার—মানা যেতে পারে, (মিলিন্দাপানহো-র মতে আলেকজান্দ্রিয়া হল আলাসান্দা) কিন্তু এ থেকে গ্রন্থটির নিকটবর্তী সময়কাল সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আলেকজান্ডার নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে অনেক আলেকজান্দ্রিয়াই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠটি অনতিবিলম্বেই তার অবস্থানগত কারণের জন্য একটি বৃহৎ বিক্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আর্হিডায়োস ও ডায়োডোটোস-এর মুদ্রা যদি টাঁকশাল থেকে বেরিয়ে ভারতে আসতে পারে তাহলে সমকালীন আলেকজান্দ্রিয় পণ্য না আসার কোন কারণ নেই। ভূমধ্যসাগরীয় প্রবাল ভারতে বরাবরই অতি মূল্যবান বলে গণ্য—পরে যা রোমক-প্রবাল নামে পরিচিতি লাভ করে। সুতরাং, আলেকজান্দ্রিয় বস্তুসামগ্রী যে নীলনদের মোহানা থেকেই সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হত তার কোন মানে নেই, বরং ঐ অঞ্চল থেকেই রপ্তানি করা হত। একই ধরনের যুক্তি *অর্থশাস্ত্রের* (১৩.৪) 'সুরুঙ্গ' (নালা বা সুড়ঙ্গ) শব্দটির প্রতিও প্রযোজ্য যা সম্ভবত গ্রীক 'সিরিনক্স' (syrinx) থেকে আহরিত। এটিও এমন কোন ইঙ্গিত দেয় না যা ৩০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরবর্তী কোন সময়ের সপক্ষে এবং ততদিনে বিন্দুসারের সেনাবাহিনী গ্রীক গুপ্তপথ কৌশল (Poliorcetics) সম্পর্কে পরিচিত হয়ে উঠেছে। অপর একটি যুক্তি হল, ২২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চিন শি হোয়াং তি নিজের রাজত্বকালে চীনকে ঐক্যবদ্ধ করার আগে পর্যন্ত সমগ্র চীনের নাম সিন হতে পারে না। অবশ্য, এর কয়েক শতাব্দী আগেও চিন (chin) নামে একটি রাজ্য ছিল এবং সেই রাজ্য ভারতের সঙ্গে স্থল বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণ ও রেশম রপ্তানি করত। 'সমগ্র চীন'-এর নাম সিন (cina) ছিল কি-না তা নিয়ে কিছুই বলা হয়নি অথচ সেই অধ্যায়ে একথাও

বলা হয়েছে যে 'সিনসি ফার আসে বাল্‌খ্ থেকে'—একই বাণিজ্য পথ দিয়ে, যে পথে একই ধরনের ফার এখনও আসে।

এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে খুঁটিনাটি কিছু বিষয়কে যুগোপযোগী করে তোলার জন্যে *অর্থশাস্ত্রে* পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্তভাবে কিছু অংশ ঢোকানো হয়েছে; ঠিক যেমন এ গ্রন্থের একটা বড় অংশই সম্পূর্ণ লেখা হয়েছে পূর্বতন প্রশাসনিক প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং রাষ্ট্র-শাসনের এক তত্ত্ব নিয়ে—যা কেবলমাত্র মৌর্য-পূর্বই হতে পারে। *অর্থশাস্ত্র* (১.৩)-এ *অথর্ববেদ*-কে যে অন্য তিনটি থেকে পৃথক করা হয়েছে তা সম্ভবত চারটি বেদের সবকটিকে সমষ্টিকরণের যে ব্রাহ্মণ্য প্রচলন—তার আগের। *অর্থশাস্ত্র* (৫.৫)-এ পূর্ববর্তী সমবিষয়ের লেখকদের মধ্য থেকে প্রতীক সম্পর্কে জনৈক দীর্ঘ চারায়নের মত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে রাজার অসন্তুষ্টি হল 'শুকনো খড়কুটোর (বাতাস) মতো' এটি বিশেষ করে মনে করিয়ে দেয় কোশলরাজ পসেনদি-র মন্ত্রী এক দীর্ঘ কারায়নের কথা যিনি তাঁর কাকা মল্লরাজ বন্ধুলের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। রাজ অধীনস্থ গ্রামগুলিতে ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করাটা অশোক-পরবর্তী আমলের হতে পারে না।

অর্থশাস্ত্র-র গ্রন্থ-১১তে একটি অধ্যায় রয়েছে উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে (*সংঘ*) ভাঙার কৌশল বিষয়ে।

'কম্বোজ, সৌরাষ্ট্রের মতো স্থানগুলিতে ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীগুলি (*শ্রেণী*) কৃষিকাজ ও অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। লিচ্ছবিক, ব্রজিক, মল্লক, মদ্রক, কুকুর, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতিরা জীবনধারণ করে *রাজন* (ছোট ছোট নির্দিষ্ট শাসকমন্ডলী) হিসেবে। প্ররোচক গুপ্তচরদের উচিত এই সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করা, তাদের মধ্যেকার ঈর্ষা, ঘৃণা, বিবাদের সম্ভাব্য উৎসগুলির সন্ধান করা এবং ক্রমবর্ধমান বিরোধের বীজগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া। ... (গোষ্ঠীগুলির ভিতরকার) উচ্চপদস্থদের নিরুৎসাহিত করতে হবে নিম্নপদস্থদের সঙ্গে একই পংক্তিতে বসে খেতে বা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে। অন্যদিকে, নিম্নপদস্থদের উস্কে দিতে হবে উচ্চপদস্থদের সঙ্গে সহভোজ ও বিবাহের জিদ ধরতে। গৌণ মানুষদের প্ররোচনা দিতে হবে পরিবারে সমান মর্যাদা দাবি করতে, সাহস দেখাতে এবং স্থান পরিবর্তন করতে (? উপজাতীয় পদাধিকার বা উপজাতীয় জমি বিলি উভয়ই পালাক্রমে দেওয়া যেতে পারত)। জনসাধারণের সিদ্ধান্ত ও উপজাতীয় প্রথাগুলিকে শিথিল করে দিতে বিরোধিতার ওপর আকর্ষণ বাড়াতে হবে। মকদ্দমাকে লড়াইয়ে পরিণত করতে হবে (রাজার ভাড়াটে)গুন্ডা দিয়ে—যারা (অপর পক্ষের ওপর দোষ চাপিয়ে ঝগড়া বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এক পক্ষের) সম্পত্তি, পশু ও লোকজনের উপর রাতে আক্রমণ চালাবে। (এই ধরনের গোষ্ঠী-অভ্যন্তরস্থ) সব লড়াইয়ের ক্ষেত্রেই রাজা (নিজের) অর্থ ও সৈন্য দিয়ে দুর্বলতর পক্ষকে সমর্থন ও উৎসাহিত করবেন তাদের বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে; অথবা তিনি (রাজা) দলত্যাগী গোষ্ঠীগুলিকে প্রেরণ করবেন। তা না হলে তিনি বিবদমান সবাইকে একই অঞ্চলের জমির ওপর বসতি স্থাপন করিয়ে পাঁচ থেকে দশটি পরিবার নিয়ে এক একটি বিচ্ছিন্ন কৃষিজীবী একক গঠন করতে পারেন। তারা সবাই যদি একসঙ্গে একস্থানে থাকে তাহলে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে সমর্থ হতে পারে। (সুতরাং) তাদের পুনর্মিলনের বিরুদ্ধে (রাজাকে) জরিমানা চালু করতে হবে। ... এইভাবেই তিনি গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে পারেন (তাদের এবং সেইসঙ্গে বাকি অংশের) একচ্ছত্র শাসক (হবার জন্য); এবং অন্যদিকে, উপজাতি গোষ্ঠীগুলিও যাতে (বাইরের)

একচ্ছত্র অধিপতিদের দ্বারা এইভাবে পদানত হতে না হয় তার জন্য নিজেদের রক্ষা করতে পারে।' (*অর্থশাস্ত্র* ১১.১)।

এ উদ্ধৃতিটির প্রামাণিকতা অন্য সূত্রের দ্বারাও সমর্থিত। কুকুর বলতে বোঝানো হয়েছে কুকুর-টোটেম—যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।* ঐতিহাসিক যুগে কুকুর দেশ বলতে সম্ভবত রাঁচির আশপাশের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বোঝানো হত (*রায়,* ১৫১)। গিরনারে রুদ্রদমন (*এপিগ্রাফিকা ইনডিকা,* ৮.৪৪) এবং নাসিকে বাসিথিপুত সিরি-পুলুমাই—উভয়েই খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কুকুর অঞ্চলের অধিরাজত্ব দাবি করেছিলেন; কিন্তু মগধের রাজাদের কাছে তা নিশ্চিতই ঐ নামে পরিচিত ছিল না। মগধের রাজা অজাতশত্রুর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বশ্শকার শ্রেণীবিভাজন ও কুৎসা রটনার মাধ্যমে কোন উপজাতিকে ভিতর থেকে ভেঙ্গে দেওয়ার কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন লিচ্ছবিদের বিরুদ্ধে। চাণক্য এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন গোপনে অতর্কিত আক্রমণ, বিষপ্রয়োগ, গুপ্তহত্যা, মদ্যপান, নারী (রাজনর্তকী, সন্ন্যাসিনী, রক্ষিতা, সম্ভাব্য ধনী বিধবা), অভিনেত্রী, নটী, দৈবজ্ঞ এবং গোষ্ঠী সম্পত্তির বদলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রলোভন দেখিয়ে দুর্নীতির ব্যবহার।

সুনির্দিষ্ট উপজাতিক নামগুলি প্রমাণ করে যে ঐ বিশেষ উপজাতিগুলি ছিল শক্তিশালী এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা ছিল তখনও পর্যন্ত সমান বিপজ্জনক। মহাপদ্ম নন্দ (মৌর্যদের ঠিক আগে) এই সমস্ত চিরাচরিত ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীগুলির শেষটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে এবং সেই আলোকে প্রথম যুগের (কিন্তু শেষ দিকের নয়) কোন মৌর্য নথি-প্রণেতার কাছে তা বোধগম্য ছিল। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করা, 'উচ্চ ও নিম্ন' পদস্থদের মধ্যে অবাধ বিবাহ নিষিদ্ধ করা — এ সবই উপজাতি গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভবের লক্ষণ এবং একই সঙ্গে নানা স্বতন্ত্র বর্ণ গঠনেরও প্রথম পদক্ষেপ। অধ্যায়টিতে স্পষ্টভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে সেনাদলে যোগ দেওয়া তুলনামূলকভবে অগ্রবর্তী উপজাতিদের মতোই একইভাবে 'আতবিক' বন্য আদিবাসীদের মধ্যেও বিভাজন আনতে হবে। বন্দী-পাচার অর্থে 'অপবহ্' ক্রিয়াপদটি, যা নির্দিষ্টভাবে কলিঙ্গযুদ্ধের ধ্বংসলীলা বর্ণনার কালে অশোক ব্যবহার করেছিলেন—*অর্থশাস্ত্রে* (১১.১) তা দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। যোন বাদ দিয়ে কম্বোজ-এর উল্লেখ (পালি সূত্রগুলিতে এবং অশোকের শিলালিপিগুলিতে এই দুটি নাম একইসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে) আবার ইঙ্গিত দেয় যে পশ্চিম আফগানিস্থানে গ্রীক আধিপত্য (বিন্দুসার কর্তৃক) চূড়ান্তভাবে মেনে নেওয়ার আগে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছিল। বিবরণটি থেকে রাজ্য শাসননীতির এক মূল্যবান রূপরেখা হাজির হয়, যা দিয়ে, প্রণালীবদ্ধভাবে উপজাতি জীবন ও উৎপাদনকে—তা সে আর্য হোক বা না হোক—অস্ত্র বহন না করা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হবার শর্তাধীনে বর্ণবিভক্ত কৃষকসমাজে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

---

* বরাহমিহির তাঁর *বৃহৎসংহিতা*-য় কুকুর (৫.৭১; ১৪.৪; ৩২.২২) উপজাতি ও অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেছেন — সুতরাং হতে পারে যে সেই সময়কালেও তারা টিকে ছিল। তিনি অবশ্য উত্তরাঞ্চলের কাল্পনিক কুরু বংশ সমেত, কুরু উপজাতিরও উল্লেখ করেছেন — সুতরাং তাঁর আমলে এই উপজাতিগুলিরও প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে, তা ধরে নেওয়া যায় না। যে কারণেই হোক না কেন, তিনি লিচ্ছবিদের কথা জানতেন না — অথচ গুপ্ত বংশের রানি ছিলেন লিচ্ছবি (পৃ. ২৯০)।

সংহত, অতিরঞ্জনহীন এবং তীক্ষ্ণ গদ্যে লেখা সংস্কৃত সাহিত্যের এই অনন্যসাধারণ আকরগ্রন্থটিতে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় রীতি এবং সম্ভবত অধুনালুপ্ত 'পঞ্চম বেদ' ইতিহাস (*ইতিহাসবেদ*) থেকে নির্যাস নিয়ে কর্মবিধিগুলির উপস্থাপন করা হয়েছে। একেবারে শুরুতেই গ্রন্থটির প্রধান উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া আছে : 'পূর্বতন আচার্যদের রচিত বিভিন্ন অর্থশাস্ত্রকে একত্রিত করে, সমগ্র পৃথিবী জয় করার (শাসন করার) ও রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই একক *অর্থশাস্ত্র*টি রচনা করা হয়েছে।' সমগ্র পৃথিবী বলতে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষকেই বোঝানো হয়েছে। 'পৃথিবী হল (বিজয়ীর) স্থান. সুতরাং 'চক্রবর্তিন' সম্রাটের এলাকা আসমুদ্র-হিমাচল (বিস্তৃত), এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সহস্র যোজন।' গ্রন্থটির ষষ্ঠ খন্ড থেকে গ্রন্থকার নিবিষ্ট হয়েছেন আগ্রাসনের সামরিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিগুলির বিষয়ে। উপযোগিতা-সর্বস্বতার কারণে সেখানে নৈতিকতা বা রাজনৈতিক নীতিবোধের প্রতি শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র নেই। শুধুমাত্র সঠিক রণনীতি, কৌশল, সামরিক শক্তি, সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ বা রাজনৈতিক জোটই নয়, অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে যেখানে ভাল ফল দেবে সেখানে পুরোদস্তুর বিশ্বাসঘাতকতা ও গুপ্তহত্যার সুপারিশ পর্যন্ত করা হয়েছে। প্রথম পাঁচটি খণ্ড ব্যয়িত হয়েছে 'জনপদ' এককগুলিতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন বিষয়ে—যেগুলির প্রত্যেকটিতে সকল বিভাগের জন্য মন্ত্রী তত্ত্বাবধায়করা ছিল। এর ফলে রাজ্য সম্প্রসারণ ও বিজয়ের একটা নিরাপদ ভিত্তি তৈরি ছিল। বাকি অংশের চেয়ে এই অংশগুলির প্রতিই আমরা বেশি নিবিষ্ট হব—কেননা, তা অশোক-পূর্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামোটিকে প্রকাশ করতে এবং পূর্বতন ব্যবস্থার কার্যকারিতা যখন নিঃশেষিত হয়েছিল তখন অশোকের পরিবর্তনগুলি কেন অবশ্যম্ভাবী ছিল তার ব্যাখ্যা দেবে। 'আদর্শবাদে'র চিহ্নমাত্র এখানে নেই : 'বৈষয়িক লাভ (*অর্থ*)-ই একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য', কৌটল্য বলেছেন (পূর্বতন আচার্যদেব বিরোধিতা করে), 'কেননা নৈতিকতা (*ধর্ম*) ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি (*কাম*)—উভয়ের মূলই রয়েছে বৈষয়িক প্রাপ্তির মধ্যে (*অর্থমূলৌ*)।' নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই পরবর্তীকালে তাঁর নাম কৌটল্য থেকে কৌটিল্যে (*কুটিল = শঠ*) রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ্য *নীতি*-র দৃষ্টিকোণ থেকে এই রচনাটি নিঃসন্দেহে '*শঠ*', যদিও সুযোগ বুঝলে এই জঘন্য পন্থা অনুসরণে এমনকী ব্রাহ্মণরাও পিছ-পা হত না। রচনাকার, অপসারণের হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে স্মৃতিকথা লেখায় ব্যাপৃত কোন প্রাক-বুর্জোয়া বিসমার্ক নন কিংবা রেনেসাঁ-উত্তর ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এক মহত্তর সিজার বোর্জিয়াকে পরামর্শদানকারী কোন মেকিয়াভেলিও নন। তাঁর পিছনে রয়েছে এক ফলপ্রসূ প্রশাসনিক ঐতিহ্য—যার সাহায্যে স্পষ্টতই সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়েছে এবং 'সর্বব্যাপী সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠাকে সম্পূর্ণ বা সংহত করতে প্রয়োজন শুধু তার সামান্য কয়েকটি আগ্রাসী পদক্ষেপ।

যে সমাজে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল তা ছিল বৃহৎ-মাত্রায় পণ্য উৎপাদন ও দূর-বাণিজ্যে নিযুক্ত। অবশ্য, পণ্য উৎপাদকদের কোন অবস্থা-বর্ণনা গ্রন্থটিতে নেই। তার কারণ, অজস্র ভিন্ন উপজাতি-প্রধানদের উত্তরসূরী হিসেবে এবং উৎপাদিত শস্য ও স্থানীয় কারিগরদের উৎপাদন থেকে দ্রব্যে পাওয়া বিপুল রাজস্বের প্রাপক হিসেবে রাজাকে তার প্রাপ্তের একটা বড় অংশকেই পণ্যে পরিণত করতে হত—সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের বেতন দেওয়ার জন্য। সুতরাং, রাষ্ট্র নিজেই ছিল সবচেয়ে বড় বণিক, সর্বোচ্চ একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত। পণ্য উৎপাদনের পক্ষে বাধা হয়ে ওঠা উপজাতিক প্রথাগুলিকে নির্মূল করার পর সে ঘোরতর সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে

তাকিয়েছিল ব্যক্তিগত বাণিজ্যের দিকে। কারিগর, সংঘ-কর্তা (*কুশীলব*), ভিখারী এবং হাতের কারসাজি করা বাজিকরদের সাথে বণিকদেরও তালিকাভুক্ত করা হল 'সেই সমস্ত চোর—যাদের চোর নামে ডাকা হয় না' বলে (*অর্থশাস্ত্র*, ৪.১) এবং সেই অনুযায়ীই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হত। এইভাবে, রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব এসে গিয়েছিল এবং তা থেকে *অর্থশাস্ত্র*-র প্রশাসনিক নীতিতেও—যার ফলে, পুনরায় অগ্রগতির রাস্তা রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

৭.৫ অর্থশাস্ত্র-র রাষ্ট্র খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করত এবং তা থেকে মুনাফা লুঠত। অন্য ধরনের শাস্তির কথা বাদ দিলেও শ্যামশাস্ত্রী-র ইংরাজি অনুবাদের নির্দেশিকার নয়টি পুরো সারণি জুড়ে শুধু জরিমানার কথাই বলা আছে। সব মানুষই আইনের অধীন ছিল, যদিও নিম্ন-বর্ণের তুলনায় উচ্চবর্ণের মানুষরা কিছু শ্রেণী-সুবিধা ভোগ করত। কেবলমাত্র উত্তরাধিকারের প্রশ্নগুলিতেই স্থানীয় প্রথার প্রতি কিছুটা শৈথিল্য দেখানো হতঃ 'উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনগুলিকে বর্ণগোষ্ঠী বা গ্রামের রীতিনীতির সঙ্গে মানানসই করে নিতে হবে।' সম্ভবত এখানেই প্রথম (*অর্থশাস্ত্র*, ৩.৪) পুনর্বিবাহ এবং তাদের নিজস্ব সম্পত্তি (*স্ত্রীধন*) সমেত মেয়েদের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছিল—যদিও তা সতর্কতার সঙ্গে প্রযুক্ত হতো। অসংখ্য নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকায় *অর্থশাস্ত্র*-কে অনেকটা হাম্মুরাবি-র গ্রন্থের মতো এক আইনগ্রন্থ বলে মনে হয়—যদিও গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্থক্যও আছে। মেসোপটেমিয়ার আইন গ্রন্থটিতে নিয়মকানুনগুলিকে সংকলিত করা হয়েছিল বণিক বা সম্পত্তি-মালিকদের মধ্যেকার লেনদেনে সমতা আনার প্রয়োজনে; অন্যদিকে. এক্ষেত্রে নিজস্ব মৌলিক একচেটিয়া অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্র—নিজেই একক বৃহত্তম আন্তেপ্রেনর। চিন শিহ্ হুয়াং তি-র আমলে চীনারা অনেক বেশি শক্তিশালী এক বণিকশ্রেণীকে নিয়ে শুরু করেছিল। কিন্তু ৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই সেখানে বণিকরা রাজ-আমলাতন্ত্রের প্রচন্ড কোপের মুখে পড়ে এবং শীঘ্রই দুর্বহ করের বোঝা ও সেই সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ ব্যয়সংকোচন আইনগুলির দ্বারা দমিত হয়। অবশ্য, তারা কখনই কোন বর্ণ গঠন করেনি এবং পেশাটিও কোনকালে ঘৃণ্য ছিল না। আমলা, বণিক, তেজারতির কারবারি, ভূস্বামী—এরা সকলেই পারিবারিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মধ্য থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে রাজকর্মচারী নিয়োগ করা যেত। চীনা আমলাতন্ত্র অবশ্য পরিচিত পুঁথিগত পরীক্ষার মাধ্যমে তেমনভাবে গঠিত হত না —কেননা আসল কাজটা ছিল জল সরবরাহ ব্যবস্থার দেখভাল এবং তার জন্য কোন একক সামন্তপ্রভুর মহালের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত কাজকর্ম চালাতে হত। রাজকর্মচারীদের নিয়মিত বেতন না দেওয়া ও দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে চীনে আমলাতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যিক সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত তা টিকে ছিল। এটা সম্ভবত মৌর্যদের বিপরীত।

কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা 'স্বাভাবিক' ছিল বলেই মনে হয়; করদাতারা অন্য করদাতাদের কাছে ছাড়া তাদের জমি বিক্রি করতে বা বন্ধক দিতে পারত না। ব্রাহ্মণ' বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান বা শিক্ষাদানের আশ্রমের জন্য ব্যবহৃত—এমন করমুক্ত জমি কেবলমাত্র একই পর্যায়ভুক্ত অন্য কারো কাছে বিক্রি বা বন্ধক দেওয়া যেত (*অর্থশাস্ত্র*, ৩.১০)। এটা প্রমাণ করে যে জমির ওপর সীমিত ব্যক্তিগত অধিকার অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরযোগ্য ছিল। এই ধরনের হস্তান্তর—যা শীঘ্রই বিরল হয়ে ওঠে—কিন্তু যখনই ঘটত, তার অর্থ ছিল কেবলমাত্র এই যে, পণ্য উৎপাদন ও

বাণিজ্য সঙ্ঘটনের পক্ষে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে অনেকখানি অনুকূল হয়ে উঠেছিল। *অর্থশাস্ত্র* (৪.২) অনুযায়ী স্বাধীন বণিকরা গণ্য হত কাঁটা (*কন্টক*) হিসেবে—কোন জাতীয় দুর্দৈব-এর মতোই গণস্বার্থবিরোধী। ততখানি দোষবহ নয় এমন অপকর্মের জন্যও তাদের কর ও জরিমানা দিতে হত। জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা হত এবং সেই সঙ্গে মান-ও। 'বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের যোগানে যখনই আধিক্য আসবে, ব্যবসা তত্ত্বাবধায়ক তখন সেগুলি একটি (কেন্দ্রীয়) স্থানে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। যতক্ষণ সেগুলি অবিক্রীত থাকবে অন্যত্র কেউ তা বিক্রয় করতে পারবে না। বিক্রয় করাতে হবে সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের দ্বারা যাদের দৈনিক বেতন দেওয়া হয় এবং যারা জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল' (*অর্থশাস্ত্র*, ৪.২)। গ্রীক রাজদূত এটা পালিত হতে দেখেছেন (*মেগাস্থিনিস*, ৮৭)। রাষ্ট্রীয় শস্যাগার, কোষাগার, বনজ দ্রব্যের ভাণ্ডার ও জেলখানার সঙ্গে 'সন্নিধাতৃ'-কে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যভবনও নির্মাণ করতে হত (*অর্থশাস্ত্র*, ২.৫)। ওজন ও মাপের নিয়মবিধি মান্য করার পাশাপাশি বণিকদের এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে বাণিজ্যদ্রব্য পাঠানোর সময় উভয়ক্ষেত্রেই শুল্ক দিতে হত। 'কোন পণ্যই তার উৎপাদনস্থলে (ব্যক্তিগত বাণিজ্যকারীর দ্বারা) বিক্রয় করা যাবে না' (অর্থশাস্ত্র, ২.২২)। বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্যের ওপর বণিকদের পরিবহণ ব্যয়ও যুক্ত করতে হত; এই পরিবহণ আজকের ভারতবর্ষের মতোই, তখনও এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। আইনসম্মত মুনাফা নির্দিষ্ট ছিল—দেশজ পণ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় দরের উপর ৫ শতাংশ এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ (*অর্থশাস্ত্র*, ৪.২)। আমদানিকারকদের উৎসাহিত করার জন্য আরও কিছু ছাড় দেওয়া হত। রাষ্ট্রের নিজস্ব বাণিজ্য আধিকারিক ছিল (*অর্থশাস্ত্র*, ২.১৬)—যার কাজ ছিল রাজার মালপত্র বিক্রি করা। এগুলির অধিকাংশই প্রায়শ ছিল স্থানীয় এবং কিছু কর হিসেবে পাওয়া সামগ্রী।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং লাভজনক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একাধিপত্য ছিল। এগুলির মধ্যে ছিল কসাইখানা (*অর্থশাস্ত্র*, ২.২৬) ও জুয়ার *ঠেক* (*অর্থশাস্ত্র*, ৩.২০)। শেষোক্তটির ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক আসল জুয়ার ঘুঁটি সরবরাহ করত এবং প্রতি লাভের ওপর ৫ শতাংশ করে নিত। মদ (*অর্থশাস্ত্র*, ২.২৫) এবং গণিকাবৃত্তির (*অর্থশাস্ত্র* ২.২৭) জন্য আলাদা আলাদা মন্ত্রক ছিল। পণ্যোৎপাদন, বাণিজ্য ও শোষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নাগরিক জীবনে জুয়াখেলা, গণিকাবৃত্তি ও মদ্যপান ছিল এক নিদারুণ অনুষঙ্গ—মুনাফাকারী সমস্ত শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই তা আজ পর্যন্ত টিকে আছে। অবশ্য এ সবের উদ্ভব ঘটেছে উপজাতি প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেই—যেগুলি উপজাতি-উত্তর নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে এ সবকে বিধিবদ্ধ করা বা এ থেকে মুনাফা করার কাজকে সহজ করে দিয়েছিল। *ঋগ্বেদ* (১০.৩৪)-এর জুয়ার স্তোত্র এবং *সোম* গ্রন্থের (*ঋগ্বেদ* ৯) কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 'গণিকা' (এবং এমনকী 'বেশ্যা') শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে বোঝা যায় যে গণিকাবৃত্তিটা ছিল পূর্বতন উপজাতি গোষ্ঠী-বিবাহেরই এক পরিবর্তিত রূপ। আকরিক থেকে শুরু করে নির্মিত-সামগ্রী—সমস্ত ধাতুই ছিল রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকানায় (*অর্থশাস্ত্র*, ২.১২) এবং এক স্বতন্ত্র খনি মন্ত্রকের অধীন। এই মন্ত্রক অন্যান্য খনিজ পদার্থ, লবণ এবং মুদ্রা ও অর্থ সঞ্চালন ও নিয়ন্ত্রণ করত। ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুদ্রা তৈরি করা যেত—কিন্তু কেবলমাত্র এই শর্তে যে বিধিবদ্ধ মুদ্রা-মান বজায় রাখতে হবে এবং রাজাকে নির্ধারিত স্বত্ব দিতে হবে। মুদ্রা জাল করলে বা তা বাজারে ছড়ালে বিপুল জরিমানা ও কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল (*অর্থশাস্ত্র*, ৪.১)। 'খনি-ই জন্ম দেয় রাজকোষের, রাজকোষ থেকে জন্ম

নেয় সৈন্যদল; রাজকোষের মাধ্যম দিয়েই জয় করা যেতে পারে সম্পদে ভরা পৃথিবী।' রচয়িতা ভারী শিল্পের গুরুত্বের কথা জানতেন, অথচ বর্তমান শতকের আগে পর্যন্ত ভারতে খুব অল্প মানুষই তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। মগধের রাষ্ট্রশাসকরা, মৌর্যদের অনেক আগেই, সুস্পষ্টভাবে ধাতুর উপর নিয়ন্ত্রণকে এক স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত করেছিলেন।

এমনকী, বিদেশনীতির মধ্যেও এই ধরনের মুনাফার কথা মাথায় রাখা হত। *অর্থশাস্ত্র*-এ যুদ্ধ নিয়ে যে কোন আলোচনার আগেই, পতিত জমি, খনি ও প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের জন্য পারস্পরিক সন্ধি ও সহমত চুক্তির মাধ্যমে অন্য রাজার ভূখন্ডে অনুপ্রবেশের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

'এ থেকে বাণিজ্যপথ নির্বাচনের ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায় ঃ আমার শিক্ষক দুটি বাণিজ্যপথের কথা বলেন—একটি জলপথ এবং অন্যটি স্থলপথ; এ দুটির মধ্যে প্রথমটিই বেশি ভাল কেননা তা কম খরচসাপেক্ষ এবং বিপুল লাভদায়ক। কৌটল্য বলেন, তা নয়—কেননা, জলপথে বাধার সম্ভাবনা থাকে, তা অস্থায়ী, আকস্মিক বিপদে পূর্ণ এবং আত্মরক্ষার পক্ষে অনুপযোগী; অন্যদিকে, স্থলপথ ঠিক তার বিপরীত চরিত্রের। জলপথগুলির মধ্যে একটি উপকূল বরাবর, অন্যটি সমুদ্র পার হয়ে—এর মধ্যে উপকূল বরাবর পথটি বেশি ভাল; কেননা তা অনেকগুলি বাণিজ্য বন্দর-নগরী ছুঁয়ে যায়; একইভাবে, নদী পরিবহণ অপেক্ষাকৃত ভাল—কেননা তা পরিহারযোগ্য বা ছোটখাটো বিপদ সত্ত্বেও অবাধ। আমার শিক্ষক বলেন যে স্থলপথগুলির মধ্যে যেগুলি হিমালয়ের দিকে গিয়েছে সেগুলি দক্ষিণগামী পথগুলির চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভাল। কৌটল্য বলেন, ঠিক তা নয়, কেননা কম্বল, পশুচর্ম ও ঘোড়া বাদ দিলে শঙ্খ, হীরা, মূল্যবান পাথর, মুক্তা ও সোনার মতো সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় দক্ষিণেই। দক্ষিণগামী পথগুলির মধ্যে যে বাণিজ্যপথ অনেক সংখ্যক খনিকে ছুঁয়ে গেছে, যে পথে হামেশাই লোকজনের দেখা মেলে এবং যে পথে ঝঞ্ঝাট ও খরচ কম অথবা যে পথে গেলে নানা ধরনের বাণিজ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে মেলে—সেই পথই বেশি ভাল। ...পশুটানা গাড়ি চলার পথ ও কাঁধে বয়ে মাল নিয়ে যাবার পথ (*অংশপথ*)-এর মধ্যে পশুটানা গাড়ি চলার পথই বেশি ভাল—কেননা এতে বেশি পরিমাণে মাল পরিবহণের সুবিধা থাকে।' (*অর্থশাস্ত্র,* ৭.১২)।

এ থেকে মৌর্য বিজয়ের প্রধান গতিমুখ, বাণিজ্যপথ বরাবর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অশোকের নতুন নীতি এবং মাস্‌কি ও ব্রহ্মগিরির মতো অধুনা নির্জন অঞ্চলগুলিতে অনুশাসনস্তম্ভগুলির অবস্থানের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়।

এই নীতির সাথে যুক্ত হয়েছিল মানুষ সমেত সমস্ত সম্পদের খুঁটিনাটি বিবরণ নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা। দেশের প্রতি পাঁচ বা দশটি গ্রাম পিছু ছিল একজন করে *গোপ* (*অর্থশাস্ত্র,* ২.৩৫-৩৬) নিবন্ধক; নগরে ছিল প্রতি দশ, কুড়ি বা চল্লিশটি পরিবার পিছু একজন। এদের খেত, কর, সমস্ত ধরনের উৎপাদন সামগ্রী, পশু, দাস, শ্রমিক ও খরচপত্র সম্পর্কে সবকিছু জানতে হত। 'তাকে একটি নথিও রাখতে হবে যাতে প্রতিটি বাড়িতে বসবাসকারী যুবা ও বৃদ্ধের সংখ্যা, তাদের বিবরণ (চরিত্র), পেশা (আজীব), আয় ও ব্যয় লিপিবদ্ধ থাকবে। ...' গুপ্তচরদের কাজ ছিল সেগুলি খতিয়ে দেখা, কোন লোক দেশান্তরী এবং অভিবাসিত হলে তার কারণ অনুসন্ধান করা এবং অবাঞ্ছিত লোকেদের সমস্ত গতিবিধি নজরে রাখা। নগর-নিবন্ধক-এর ক্ষেত্রেও একই

ব্যাপার। এই ধরনের নথিভুক্তির সঙ্গে (মেগাস্থিনিস লক্ষ্য করেছিলেন) আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—যা গ্রীকদের ক্ষেত্রে না হলেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ছিল অস্বাভাবিক। কাজ অনুযায়ী প্রত্যেক রাজকর্মচারীকে নগদ* অর্থ দেওয়া হত (*অর্থশাস্ত্র,* ৫.৩)। প্রধান পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ, রাজমাতা ও (প্রধানা) রানি প্রত্যেকে পেতেন বছরে ৪৮,০০০ পণ। অশোক তাঁর রানির আলাদা দানধ্যানের কথা কেন ঘোষণা করেছিলেন তার ব্যাখ্যা এ থেকে পাওয়া যায়। খেত ও গ্রাম দিয়ে দেওয়া চলবে না; সবচেয়ে অভাবী রাজাই শুধু রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির এই প্রধান ভিত্তিটাকে দান করতে পারেন। ব্রাহ্মণদেরকে দেওয়া পসেনাদির উপহার বা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কোশল ছাপমারা মুদ্রাগুলির কথা সম্ভবত এক্ষেত্রে গণ্য করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পদাতিক সৈন্যের বেতন হার ছিল ৫০০ পণ; মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে শান্তির সময়ে তারা খুব ভালভাবে জীবনযাপন করত। অবশ্য, তাদের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতেন রাজা এবং কোন সৈনিক নগরে প্রবেশ করার সময় তাঁকে সেগুলি সমর্পণ করতে হত। বিশেষ চাকরবাকররা হাতি, ঘোড়া ও সাজসরঞ্জাম দেখাশোনা করত। অদক্ষ কাজের জন্য ক্রীতদাসদের, সেনাবাহিনী বা রাজত্বের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করা হত এবং তাদের বেতনও দেওয়া হত; কিন্তু অত্যন্ত নিম্নহারে—বাৎসরিক ৬০ পণ। এটা আরো বেশি উল্লেখযোগ্য কেননা ব্যবহৃত 'ভিস্তি' শব্দটির একটা অর্থ হল বাধ্যতামূলক শ্রমদানকারী এবং পরবর্তীকালে বোঝাত সামন্ততান্ত্রিক বেগার। *অর্থশাস্ত্র* (২.১৫) অনুযায়ী (স্থানীয়) রাষ্ট্রীয় শস্যভান্ডারগুলির প্রধানদের ধান ভাঙা, পেষাই, শস্যচূর্ণ করা, তৈলবীজ ও আখপেষাই, চিনি তৈরি, পশম ছাঁটা ইত্যাদি পেশায় যুক্ত লোকদের শ্রম নিতে হত। ভাষ্যকার যদি *অর্থশাস্ত্র*-এ ব্যবহৃত 'সংহনিকা' (বা 'সিংহনিকা')-র অর্থ ভুল না বুঝে থাকেন তাহলে, এটা মনে হয়, করের পরিবর্তে বিধিসম্মত শ্রমদানের ব্যাপার; এ ছাড়া অন্যভাবে পরিভাষাটি অচেনা। এমনকী এক্ষেত্রেও, শস্যভান্ডারগুলির তত্ত্বাবধায়করা শ্রমিকদের খাদ্যের ব্যবস্থা করত এবং তার অতিরিক্ত ন্যূনপক্ষে সোয়া এক রৌপ্য পণ প্রতি মাসে দিত—সুতরাং একে বেগার শ্রমও বলা যাবে না। রাষ্ট্র যাতে সুবিধাজনকভাবে বিনিময় করতে পারে তার জন্য আগেই শস্য, পশম, আখ ও অন্যান্য উৎপাদনগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হত। রাজার গুপ্তচরদের ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে

* বেতন যে পণ্য সামগ্রীতেও দেওয়া হতে পারে তার একমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া যায় শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদে (পৃ. ২৭৮): '৬০ পণ বেতনের পবিবর্তে এক 'আধক' দেওয়া যায়, দ্রব্যেব বদলে সোনা দেওয়া যেতে পারে।' এর পুনরুল্লেখ করেছেন ভি এস আগরওয়ালা (তাঁর *ইন্ডিয়া অ্যাজ নোন টু পানিনি,* লক্ষ্ণৌ ১৯৬৩ গ্রন্থেব পৃ. ২৩৭-এ)। ৬০ পণ বেতন (বছরে) ছিল সর্বনিম্ন, পেত ভিস্তি-বাহকরা। মনে করা যেতে পারে যে একজন মানুষ এক 'আধক' শস্যে, এখানে সম্ভবত চাল-এ, এক বছর চালিয়ে নিতে পারত। এখন,সবচেয়ে বড় যে 'আধক'-এর কথা জানা আছে তা প্রায় ১৬৪ পাউন্ড, কিন্তু তা ব্যবহৃত হত চাণক্যের বহু শতাব্দী পরে; এমনকী, কায়িক শ্রমে যুক্ত কোন লোকেবও সাবা বছব এতে চলবে না—চালের অনুষঙ্গী আর কিছুই যে থাকবে না সেকথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। *অর্থশাস্ত্রে-ব* 'আধক', মনে হয়, ৮ পাউন্ডের সামান্য কম—যা অবস্থাকে আবও সঙ্গিন কবে তুলছে। বাস্তবিক পক্ষে, গ্রন্থটির এই অংশের বিষয়বস্তু (সেইসঙ্গে গণপতি শাস্ত্রী-র ভাষ্য) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রশ্নটা বেতনের নয়, বরং দীর্ঘ চাকবি জীবন বা দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য কর্মচারীদের বোনাস। রাজা যে কারো কাজের প্রশংসা করছেন তা দেখানোব জন্য প্রকৃত বেতন-হার অপরিবর্তিত রেখে প্রতি ৬০ পণ বেতনের জন্য এক 'আধক' পুরস্কার বা বেতন বৃদ্ধিই ছিল নিয়ম।

পাঠিয়ে যুদ্ধের সময় সৈন্যদের কাছে দ্বিগুণমূল্যে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে বেশ ভাল পরিমাণ অর্থ চুপিসাড়ে ফিরিয়ে আনা হত। যারা বৃদ্ধ হত, বা রাজকার্যে থাকাকালীন পঙ্গু হয়ে পড়ত এবং নিহতদের পোষ্যবর্গকে পেনসন দেওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা চালু ছিল। খনির কাজকর্মের ওপর যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত তার আরও একটা প্রমাণ খনি শ্রমিকদের বেতন —যা মাথা পিছু ছিল ৫০০ থেকে ১০০০ পণ। সর্বত্র বিরাজমান গুপ্তচরেরাও এর চেয়ে বেশি পেত না বা রাজার নিজস্ব রথীরাও নয়।

মেগাস্থিনিস জানিয়েছিলেন যে চন্দ্রগুপ্তের একটি শিবিরেই সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০০,০০০। মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশের বেশি বেতন হিসেবে ব্যয় না করা সম্পর্কে চাণক্যের নিষেধাজ্ঞা এবং তাঁর নির্ধারিত বেতন-হার থেকে বোঝা যায় যে প্রচুর নগদ রাজস্ব বাঁচত। পণ্য উৎপাদন, মুদ্রা-অর্থনীতি এবং তার সঙ্গে নিহিত আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব—পরবর্তীকালে মুঘল আমল পর্যন্ত জ্ঞাত যে কোন পর্বের সঙ্গে তুলনায় প্রকৃত অর্থেই নির্ধারণ-অসাধ্য হয়ে পড়ে। 'পণ' তখন তৈরি করা হত রূপার (*অর্থশাস্ত্র,* ২.১২); চারভাগের একভাগ তামা এবং ষোলভাগের এক ভাগ শক্ত কোন ধাতু মিশিয়ে সংকর তৈরি করে নেওয়া হত—যা অশোক-পূর্ব প্রকৃত মৌর্য ছাপ চিহ্নিত মুদ্রাগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এতদ্‌সত্ত্বেও, অর্থনীতির ওপর চাপ এমনকী *অর্থশাস্ত্র*-এ ও প্রতীয়মান হয়, যেখানে, রাজকোষকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা গ্রহণের (*অর্থশাস্ত্র,* ৫.২) সুপারিশও করা হয়েছে; 'এই ধরনের দাবি কেবলমাত্র একবারই করা যেতে পারে, দ্বিতীয়বার কখনই নয়।' কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের ¼ অংশ কর হিসেবে নিয়ে নেওয়া হত; প্রত্যেক জহুরি এবং ব্যবসায়ী-কারিগরদের নির্দিষ্ট কর দিতে হত। 'অভিনেতা ও গণিকাদের দিতে হবে তাদের আয়ের অর্ধেক। স্বর্ণকারদের [সাধারণত যারা কুসিদজীবীও বটে] সমস্ত সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত যোগ্য।' হাঁস-মুরগী ও শূকরের অর্ধেক এবং গবাদি পশুর দশভাগের এক ভাগ নিয়ে নেওয়া যেত। তাছাড়া, মুখ্য রাজস্ব আদায়কারীকে স্বেচ্ছাদানও চাইতে হত। তাকে সাহায্য করত গুপ্তচরেরা—যারা উৎসাহী ব্যক্তির ছদ্মবেশে এগিয়ে আসত বিপুল দানের ভান করে—দানপত্র পূর্ণ করার জন্য ঠিক যে নীতি আজও অনুসরণ করা হয়। খেতাব ও তকমা (ছাতা, উষ্ণীষ ইত্যাদি) বিক্রি করে দেওয়া যেত—কিন্তু তার জন্য অন্য কোন সুবিধা, পদ বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দেওয়া হত না। নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের অছিলায় মন্দির, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মঠের সম্পত্তির ভার নিত দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী (*দেবতাধ্যক্ষ*); একই পদ্ধতি নেওয়া হত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষেত্রেও। সরল বিশ্বাসী মানুষদের ঠকিয়ে লাভ করতে নানা অলীক ব্যাপার-স্যাপার উদ্ভাবন করা হত, রাষ্ট্রীয় খরচে চরেরা নতুন নতুন বিগ্রহ বা পূজার স্থান প্রতিষ্ঠা করত। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পতঞ্জলির (পানিনি সম্পর্কে ৫.৩.৯৯) একটি বিবৃতিতে; তিনি বলেছিলেন, 'মৌর্যরা পূজার বিগ্রহ (*অর্কাঃ*) স্থাপন করেছিলেন আর্থিক লাভের আশায় (*হিরণ্যার্থিভিঃ*)।' গুপ্তচররা প্রকৃত বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায় লিপ্ত হত এবং লেনদেন থেকে যখনই একটা ভাল পরিমাণ অর্থ তাদের হাতে আসত পরিকল্পনা মাফিক অন্য সহকর্মীরা তা ছিনিয়ে নিত। সমাজে মদ্যপ হওয়ার সময় ব্যবসায়ীর মালপত্র ও পয়সাকড়ি সরিয়ে ফেলা হত। উভয়েই রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক ধ্যানধারণা পোষণ করে এমন সন্দেহভাজন দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া হত। একজনকে হয়ত গুপ্তচরেরা বিষপ্রয়োগ করত, দোষী সাব্যস্ত করা হত অন্যজনকে—তারপর উভয়ের সম্পত্তিই রাজকোষের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হত। মিথ্যা অভিযোগ আনা হত

'কেবলমাত্র বিদ্রোহী ও দুর্নীতিপরায়ণদের বিরুদ্ধে, অন্যদের বিরুদ্ধে কখনই নয়'; রাজকোষে টানাটানি দেখা দিলে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ডাকাতি বা খুনও করা হত। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ঋণের কোন উল্লেখ নেই। ক্রমবর্ধমান খাদ মেশানো ও স্থূলভাবে নির্মিত (চিত্র ২৩) মৌর্য ছাপ-চিহ্নিত মুদ্রাগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, স্বাভাবিক করের অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। মধ্যযুগের সিংহলী বৌদ্ধ ভাষ্যকার ধম্মপাল চাণক্যকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন—প্রচুর তামা মিশিয়ে একটি থেকে আটটি 'কার্ষাপণ' তৈরির জন্য। আধুনিক রাসায়নিক বিশ্লেষণ অনুসারে, অশোকের মুদ্রায় তামার ভাগ দুই-তৃতীয়াংশ বা তারও বেশি। পালি ভাষ্যকারদের এবং মনু ও যাজ্ঞবল্কের *স্মৃতি*-র মতো ব্রাহ্মণ্য পুঁথিগুলির মতে 'কার্ষাপণ'-এর অর্থ হল তাম্রমুদ্রা; এটা ঘটনাক্রমে প্রমাণ করে যে ঐ সমস্ত পবিত্র গ্রন্থগুলি *অর্থশাস্ত্র*-র পরে রচিত, যদিও ধরে নেওয়া হয় যে ঐ গ্রন্থগুলি থেকে *অর্থশাস্ত্র* অনেক তথ্য আহরণ করেছে। *অর্থশাস্ত্রে*-র তত্ত্ব কেবলমাত্র প্রসার্যমান বাণিজ্য ও উৎপাদনের যুগেই কার্যকর, সুতরাং এই ধরনের প্রসারণ যখন কোন কৈবল্যধামে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা দেখেছি যে, মহৎ ও ধর্মপ্রাণ অশোক পর্যন্ত শাক্য গুরুর জন্মস্থান লুম্মিনি গ্রামকে সম্পূর্ণ করমুক্ত করতে পারেননি। সবচেয়ে অন্ধ ভক্তও যেটিকে নৈতিক বলে অভিযুক্ত করতে পারবেন না তেমন এক গ্রন্থের বিধান থেকে সরে এসে তিনি যে নৈতিকতার সাহায্যে শাসন চালিয়েছিলেন তার পেছনে যথেষ্ঠ স্পষ্ট অর্থনৈতিক কারণ ছিল।

৭.৬ *অর্থশাস্ত্র*-এ বর্ণকে শ্রেণীর প্রাথমিক ভিত্তি ধরা হয়নি। একটি স্পষ্ট উচ্চ শ্রেণীকে নির্দিষ্ট কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত না করে পৌর-জানপদ, এই দ্বিবাচনিক পরিভাষার সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম শব্দটির অর্থ 'নগরবাসী', দ্বিতীয়টি 'জেলার অধিবাসী'। এ দুটি নগর ও গ্রামের বাসিন্দাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই আখ্যা নয়—কেননা প্রতিটি জনপদ জেলারই ছিল সদর নগরী এবং প্রতিটি নগরীরই পশ্চাৎভূমিতে ছিল তার জনপদ। এই প্রেক্ষিত থেকে স্পষ্ট হয় যে এরা নিছকই কোন বাসিন্দা ছিল না—বরং সম্পদবান নাগরিক, যাদের ছিল শক্তিশালী অনুগামীর দল (সম্ভবত উপজাতি গোষ্ঠী থেকে ছিটকে আসা মানুষরা); এরা রাষ্ট্রের সমীহ আদায় করে বিশেষ অধিকার ভোগ করত এবং জনমত গঠন করত। গণভোট বা নির্বাচনের মাধ্যমে এই জনমত ব্যক্ত হত না, কিন্তু গুপ্তচর ও সন্ধানীরা তা যাচাই করত (*অর্থশাস্ত্র*, ১.১৩); একদিক থেকে তারা প্রশ্নোত্তর, গণ-পর্যবেক্ষণ ও নমুনা পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে জনমত যাচাইয়ের আধুনিক ব্যবস্থায় অবদান রেখে গেছে। শ্রেণী হিসেবে পৌর-জানপদ-রা যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে মর্যাদা ও গুরুত্ব পেত তা বোঝা যায় *অর্থশাস্ত্র*-এর (১.৯) এই নির্দেশে যে, মন্ত্রী বাছতে হবে জানপদদের মধ্যে থেকে, অর্থাৎ অন্য কোন জেলা থেকে নয়। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, প্রতিটি জানপদদের প্রশাসনিক এককের নিজস্ব পর্ষদ বা মন্ত্রী-পরিষদ ছিল—যা মেগাস্থিনিস উল্লেখ করেছেন। পরাশরের মত হল, গ্রামীণ 'জানপদ'দের সমর্থন পাওয়ার জন্য আগ্রহশীল হতে হবে কেননা তারা নগর 'পৌর'দের চেয়ে শক্তিশালী; কিন্তু *অর্থশাস্ত্র* (৮.১)-এ কৌটিল্য এই যুক্তি খন্ডন করেছেন। রাজাকে পুরো দিনের এক-অষ্টমাংশ সময় আলাদা করে রাখতে হবে দরবারে বিশেষ করে পৌর-জানপদদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য (*অর্থশাস্ত্র*, ১.১৯)। বিক্ষুব্ধ হলে তারা কোন নতুন শাসককে ধ্বংস করে ফেলতে পারে (*অর্থশাস্ত্র*, ১৩.৫)। *অর্থশাস্ত্র* (১.১৩) থেকে স্পষ্ট যে এই সমস্ত বিত্তশালী নাগরিকরা তাদের উৎপন্ন সামগ্রীর ছয়ভাগের এক

ভাগ নির্দিষ্ট কর হিসেবে দিত; অন্যদিকে, 'সীতা' জমিতে চাষ করে এমন কোন কৃষক যদি তার উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক নিজের জন্য রাখতে পারত তাহলে সে ভাগ্যবান—কেননা মূল কর হিসেবে চার ভাগের এক ভাগ তো দিতে হতই, তাছাড়াও ছিল নানা ধরনের বিশেষ আদায়। সমাজের উচ্চকোটির মানুষদের উদ্ভব হয়েছিল নিঃসন্দেহে পূর্বতন 'শ্রেয়'দের মধ্য থেকেই। সুতরাং অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে : এইসব নাগরিকরা অর্থ উপার্জন করত কীভাবে? যারা নগরে বাস করত তাদের আয়ের উৎস হতে পারে ব্যবসায় বা দ্রব্য উৎপাদনে লগ্নি। কিন্তু বৃহত্তর অংশের ক্ষেত্রে আয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করত জমিতে উৎপাদিত ফসলের উদ্বৃত্তের উপর। এ বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার।

উৎপাদনের এক-ষষ্ঠমাংশ প্রদান প্রমাণ করে যে জানপদরা রাষ্ট্র পরিকল্পনা অনুযায়ীই কর দিত। *অর্থশাস্ত্র*-এ (২.১৫) রাজ-গুদামঘরের প্রত্যেক (স্থানীয়) রক্ষকের (*কোষাগারধ্যক্ষ*) কাজের জন্য এই বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এরা স্বাভাবিকভাবেই কর হিসেবে প্রদেয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করত, শস্য-ঋণের ব্যবস্থা, ঝাড়াই-বাছাই, পেষাই ইত্যাদি করত এবং সংগৃহীত দ্রব্যগুলি নিয়ে এক জোরদার ব্যবসা চালাত। *অর্থশাস্ত্র*-এর অন্যত্র এবং ধ্রুপদী অন্য সংস্কৃত সাহিত্যগুলিতেও 'রাষ্ট্র' বলতে শব্দটির উভয় অর্থেই 'দেশ' বোঝানো হয়েছে; কখনো কখনো তুলনা করা হয়েছে 'দুর্গ'-এর সঙ্গে—যার অর্থ সুরক্ষিত নগরী। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-এ (১.৬.১০) 'রাষ্ট্র' শব্দটির সাহায্যে সেই সমস্ত মানুষদের বোঝানো হয়েছে যারা বলির 'ঋক' অংশের দ্বারা লাভবান হত। যেমন, বিপরীতে, 'সামন্' অংশ সংরক্ষিত থাকত রাজন্যদের জন্য। দশটি স্বতন্ত্র খাতে 'রাষ্ট্র' কর সংগ্রহ করা হত (*অর্থশাস্ত্র* ২.১৫) ঃ যৌথ গ্রামগুলির জন্য সম্মিলিত কর 'পিন্ডকর'; সমস্ত উৎপাদিত শস্যের এক ষষ্ঠমাংশ 'ষড়ভাগ'; সেনাবাহিনীর জন্য 'সেনাভক্তম'; পশুবলি কর 'বলি'—যা সবচেয়ে প্রাচীন কর এবং *ঋগ্‌বেদ* (১০.১৭৩.৬) অনুসারে সম্প্রদায়গত মঙ্গলের জন্য বলিদান উপলক্ষে গোষ্ঠী প্রধানদের দেয় উপহার থেকেই এর উৎপত্তি—কিন্তু বলিদান হোক বা না হোক রীতি (যেমন, রুম্মিনদেই) হিসেবেই তা আদায় করা হত; বার্ষিক নগদ কর, অথবা ফল প্রভৃতি বারোমেসে উৎপাদনের জন্য কোন কর—যা 'কর' নামেই আদায় করা হত, এবং পরবর্তীকালেও সাধারণভাবে তার অর্থ দাঁড়ায় কর। 'উৎসঙ্গ' = পুত্রের জন্ম বা এই ধরনের কোন কিছু উপলক্ষে অনুষ্ঠানে রাজাকে প্রদেয় উপহার অর্থাৎ একটি অতিরিক্ত কর (Uebersteuer, মেয়ার); একটি সম্পূরক কর, 'পার্শ্বম' (Nebengaben, মেয়ার); ক্ষতিপূরণ কর (গবাদি পশুর যাতায়াতের ফলে শস্যের ক্ষতির জন্য), 'পারিহিনকম্'; বস্ত্র প্রভৃতি উপহার 'উপায়নিকম্'; এবং গুদামঘরের জন্য ধার্য অথবা রাজার পুষ্করিনী, উপবন ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় এক বিশেষ কর, 'কৌস্থেয়কম্'।

এই সমস্ত করগুলি সাধারণভাবে আর্য গোষ্ঠীগত প্রথাগুলির প্রভাবকেই তুলে ধরে—শুধু গোষ্ঠী প্রধান বা গোষ্ঠী কর্তৃত্বের বদলে এসেছিল সার্বভৌম নৃপতি ও তার আমলাতন্ত্র। পৌর-জানপদদের এক উপজাতীয় অনতি অতীত ছিল। পাঠককে আবারও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে 'জনপদ' কথাটির অর্থ 'কোন উপজাতি অঞ্চল'। এই ধরনের উপজাতিগুলি বড় বড় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার-গোষ্ঠীতে বিভাজিত হয়ে 'রাষ্ট্র' অঞ্চল গঠন করেছিল এবং এই বিভাজনের যে হেতু সেই নব্য কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সত্ত্বেও বহু প্রাচীন প্রথাকে তখনও তারা বাঁচিয়ে রেখেছিল। প্রভাবশালী 'জানপদ'-রা কোন জায়গীরদার বা একান্ত ভূস্বামী ছিল না, বরং তারা

ছিল এই ধরনের কোন বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রধান। স্থানীয় প্রথা এবং গোষ্ঠী-ঐতিহ্যই তাদের ক্ষমতা দিয়েছিল শূদ্র ভূমিদাসদের সাহায্যে বা সাহায্য ছাড়া গোষ্ঠী সদস্যরা যে উৎপাদন করত তার উদ্বৃত্তকে নিয়ন্ত্রণ করার। কিন্তু তারা এই উদ্বৃত্ত নিয়ে বাণিজ্য শুরু করেছিল এবং তার মুনাফা ক্রমে ক্রমে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল—যা থেকে অনুগামীরা কতটা উপকৃত হবে তা নির্ভর করত তাদেরই মর্জির ওপর, অনুগামীদের নয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে জমিদারী প্রথা এবং 'এশীয়' উৎপাদনরীতির বীজগুলি নিশ্চিতই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালের পূর্ণ বিকশিত রূপটি ছিল না। পূর্বতন বাধ্যতামূলক সামরিক যোগদানের পরিবর্তে এসেছিল 'সৈন্য সংস্থান কর'—যার একটা অর্থ সাধারণ মানুষের ক্রম নিরস্ত্রীকরণ। এই ধরনের পৌর-জানপদ-রা মেগাস্থিনিসের 'মুক্ত নগরীগুলি'তে ছিল উচ্চশ্রেণী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যাপারগুলি তারা নিজেরাই সামলাত; এটা বেশি হত এই কারণে যে স্থানীয় মন্ত্রী এবং আমলা নিয়োগ করা হত এদের মধ্য থেকেই। সম্ভাব্য সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে এই সমস্ত নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের (*মুখিয়া*) এবং অত্যন্ত শক্তিশালী জেলা সমাহর্তাদের (*মহামাত্র*) আনুগত্য অর্জনের পরামর্শ *অর্থশাস্ত্র*-এ (৫.১) রাজাকে দেওয়া হয়েছে। বিপজ্জনক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কোন দুর্বল বাহিনীর নেতৃত্বে বসিয়ে গুরুত্বহীন যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়ে গুপ্তহত্যা, বিষপ্রয়োগ, অতর্কিতে আক্রমণ কিংবা খুন করা যেতে পারত অথবা গুপ্তচরদের মাধ্যমে মিথ্যা অভিযোগ আনা যেত। উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে তার ছেলে বা ভাইকে দিয়ে খুন করানোও যেত—পরে সে প্রতিশ্রুতি রাখার কোন দরকার ছিল না। দুই বিপজ্জনক নাগরিককে একইসঙ্গে সরিয়ে ফেলা যায়—একজনের বিরুদ্ধে অপরজনকে হত্যার অভিযোগ এনে, যদিও আসল কাজটা করবে গুপ্তচররা। এ সব থেকে বোঝা যায় যে অশোকের নৈতিকতার শাসনে পরিবর্তিত হওয়াটা ছিল বৈপ্লবিক, কেননা তা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শ্রেণীকে নিরন্তর চাপের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং তার প্রসারণকে মেনে নিয়েছিল।

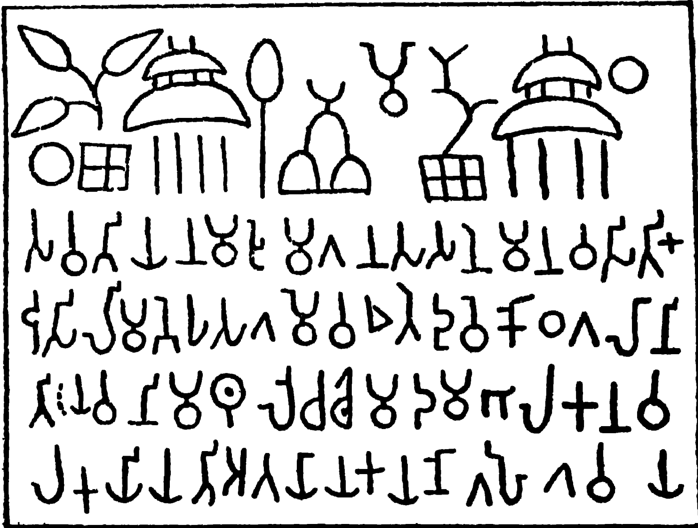
এই উচ্চ নাগরিকশ্রেণীর বিপরীতে ছিল জমির উপর দাবিবিহীন এক মুক্ত শ্রমজীবী শ্রেণী। খাস জমির ব্যবস্থাপকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অকর্ষিত জমি ফসলের অর্ধেক ভাগের ভিত্তিতে বর্গাদারদের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার জন্য। কোন কোন পৌর-জানপদদের ঠেলে দেওয়া হত পতিত জমি নিজেদের খরচে পরিষ্কার করতে—যেখানে শ্রমের জন্য তারা কিছু বর্গাদার নিয়োগ করতে পারত। ব্যক্তিগত উদ্যোগে জমি হাসিল করার এই ধরনটির পথিকৃৎ ছিলেন *জাতক* (৪৬৭)-বর্ণিত এক ব্রাহ্মণ—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যাওয়া হয়েছে। কখনও কখনও রাষ্ট্র এ কাজে উৎসাহ যোগাত—যেমন, *অর্থশাস্ত্র* (২.২৪, 'অর্ধসিতিক'-এর উল্লেখের ঠিক পরেই)-এ সুপারিশ করা হয়েছে এক-চতুর্থাংশ, এক-পঞ্চমাংশ বা সুবিধাজনক কোন কম ভাগের ভিত্তিতে জমি *স্ব-বীরোপজীবিনাঃ* দের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার জন্য। শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে 'নিজেদের দৈহিক শ্রম ছাড়া আর কিছুই দেবার নেই এমন লোকদের' বোঝাতে, কিন্তু আরও সঠিক অর্থ হয় 'যারা বীরত্বের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত' অর্থাৎ কর্মহীন পেশাদার সৈনিক প্রভৃতি (দ্রষ্টব্য : ই. এইচ জনস্টন, *জার্নাল অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ লন্ডন,* ১৯২৯, পৃ. ৭৭-১০২)। রাজস্ব-কর্মকর্তাদের পর্ষদে অবসরপ্রাপ্ত সেনা-কর্তাদের যুক্ত করা হত আত্মসাৎ ঠেকাতে (*অর্থশাস্ত্র,*

২.৯)। জমিদারি প্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক রীতিগুলির অস্তিত্বের কোন প্রশ্নই তখন থাকতে পারে না। উপজাতি প্রথা অনুযায়ী, জমি ছিল কাজের ক্ষেত্র—যা সর্দার বা বয়োঃজ্যেষ্ঠদের নিয়ে গঠিত পরিষদ ভাগ করে দিত; এখন তার কর্তৃত্ব বর্তালো সম্রাট ও তার 'জানপদ' শাসকদের। *অর্থশাস্ত্র*-এর ৩.৫-৭) যে অংশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে জমির কোন উল্লেখই নেই, কিংবা ঘরবাড়ির; পুরুষানুক্রমিকভাবে বাস করা জমিতে যৌথ পরিবার থাকাটাই ছিল নিয়ম। সমস্ত জমিই রাষ্ট্রের বা রাজার—গ্রীকদের এমত ভাবনাটা সঙ্গতই ছিল। তা সত্ত্বেও, *অর্থশাস্ত্র -এ* (৩.৯) ভূমিখণ্ড বিক্রির কথা বলা হয়েছে—যার মালিকানা আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করতে হবে এবং সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা করতে হবে গ্রাম্য বয়োঃজ্যেষ্ঠদের উপস্থিতিতে। সম্পত্তি, এমনকী ঘরবাড়িও সবসময় নিলামে তুলতে হত; রাজ-নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি এবং সেইসঙ্গে প্রদেয় বিক্রয় কর রাজকোষে জমা পড়ার পরই সর্বোচ্চ ডাক দেওয়া লোককে তা দেওয়া হত। এই ধরনের হস্তান্তর জিনিসপত্র বিক্রির মতো স্তরের ব্যাপার ছিল না এবং খুব বেশি হলে, মনে হয়, বাড়ির জমি ও বাগানের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটত। একইভাবে, কর দেওয়া গ্রামের অধিবাসীদের কর-না-দেওয়া গ্রামে উঠে যাওয়া সংক্রান্ত যে নিষেধাজ্ঞা (*অর্থশাস্ত্র,* ২.১ এবং অন্যত্র) তা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে উপজাতীয় ও 'সীতা' অঞ্চলের বাইরে জমিতে একধরনের ব্যক্তিগত উদ্যোগের উদ্ভব ঘটেছিল। *অর্থশাস্ত্র*-এ রাষ্ট্রের প্রধান কাজই ছিল 'সীতা' জমি বিলি-বন্দোবস্তের মতো উদ্যোগ গ্রহণ; তার কারণও, স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল, পৌর-জানপদদের উপর থেকে অতিরিক্ত চাপ কমানো।

'অর্ধ-সীতিক' বা অর্ধেক-ভাগের চাষীরা শুধুমাত্র অকর্ষিত রাষ্ট্রীয় জমির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারত না। এটা প্রমাণিত হয় এই ঘটনা থেকে যে তাদের স্ত্রীদের স্বামীকৃত ঋণের জন্য দায়ী করা হত (*অর্থশাস্ত্র,* ৩.১১)—যেমনটা রাখালদের ক্ষেত্রেও ঘটত। অথচ অন্য কোন অপরাধেই, সম্মতি না থাকলে, স্ত্রীরা এইভাবে দায়ী হত না। 'অর্ধ-সীতিক'দের এই স্ত্রীদের দিয়ে যদি নীচ ধরনের কিছু কাজ করানো হত তাহলে তারা আপনা থেকেই দাসত্বের বাধ্যবাধকতা থেকে (অন্য দাস-দের মতই) মুক্ত হয়ে যেত (*অর্থশাস্ত্র,* ৩.১৩)। এ থেকে বোঝা যায়, কিছু কিছু 'অর্ধ-সীতিক' ব্যক্তিগত দখলাধীন জমিতে কাজ করত, আর তাদের স্ত্রীরা যুক্ত ছিল আগাছা নিড়ানো, শস্য পেষাই, জল বওয়া ইত্যাদি ধরনের কাজে। আজকের দিনে পর্যন্ত বিহারে ভূ-স্বামীদের জন্য নিম্নশ্রেণীর ভাগচাষীদের যে সব কাজ করতে হয়—অবস্থাটা ছিল সেই রকমই; এই ব্যবস্থার সূচনা নিঃসন্দেহে *অর্থশাস্ত্র*-র আমলেই। অন্যদিকে, অর্ধেক-ভাগ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হয়েছিল সামন্ত পর্বে—বিশেষ করে মুসলমান শাসকদের আমলে, যারা তাদের সৈন্যদের মধ্যে নিয়মিতভাবে জমি বিলি শুরু করেছিল। সুতরাং রাজাকে প্রদত্ত 'রাষ্ট্র' কর এবং রায়তের কাছ থেকে আদায়ীকৃত অর্ধেক ভাগ (এমনকি চাষের খরচ, সম্পূরক বিভিন্ন কর ও শুল্ক কেটে নেওয়ার পর)-এর মধ্যের এক চমৎকার ফারাক 'জানপদ'দের হাতে থেকে যেত। কিন্তু, ভোগদখল ছাড়া জমিতে আর কোন অধিকার তাদের ছিল না এবং তখনও পর্যন্ত কোন অবাধ মালিকানা বর্তানোর প্রতিকূলে প্রথার বাঁধনে অত্যন্ত শক্তভাবেই বাঁধা ছিল (পুরনো বসতি এলাকাগুলিতে)। *অর্থশাস্ত্র*-এর কৃষকরা বণিকদের মতোই সমাজ বা সংঘে গোষ্ঠীবদ্ধ থাকত। এর সঙ্গে আরও একটা বিষয় অবশ্যই যুক্ত করতে হবে যে, স্বল্প কিছু ছাড়া খুব বেশি 'অর্ধ-

সীতিক' যোগান দেবার মতো পর্যাপ্ত জনসংখ্যা ছিল না—বিশেষ করে যেহেতু নব-উন্মুক্ত 'সীতা' জমিতে প্রকৃত কৃষকরা আরো ভাল শর্তে স্থায়ীভাবে বাস করতে পারছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে আমরা জেনেছি যে 'মুক্ত নগরী'গুলিতেও সেখানকার 'জানপদ' জমি নির্দিষ্ট খাজনায় শূদ্র গেয়োরগোইদের দেওয়া হত—অর্থাৎ অশোকের আগে জমির ওপর অসহনীয় কোন চাপ ছিল না। সর্ব-ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র এবং পতিত জমিতে নব্য ব্যক্তিগত বন্দোবস্তের মধ্যেকার অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বই ছিল অশোকের সংস্কারের অন্যতম প্রধান কারণ।

ভারতীয় গ্রাম-অর্থনীতির উত্তরকালীন ইতিহাস ভূমিহীন বা সীমিত ভূমি ভোগকারী কৃষি-শ্রমিকদের অস্তিত্বের ফলশ্রুতিতে সমানে বেড়ে যাওয়া শ্রম-যোগান-এর দ্বারাই প্রভাবিত। বসতিস্থাপনকারী 'সজাত' আত্মীয়গোষ্ঠীর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে অনেক পরের মুঘল আমলের 'বিরাদরি' বা ব্রিটিশ আমলের 'ভইয়া-কার'-এর মতো ভূমিকরের রূপের মধ্যে। আধা-ভাগের চাষ ব্যবস্থা শুধু বিহারেই টিকে থাকেনি বরং তা এমন সব এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল যেখানে *অর্থশাস্ত্র*-এর শাসনপ্রণালী কখনই আধিপত্য বিস্তার করেনি (যেমন, থানা জেলার বারলিসে; *বোম্বে গেজেটিয়ার,* ১৮৮২, খণ্ড-১৩, অংশ-১, পৃ. ১৮৪)।



চিত্র ৩৪ : ওপরে দেখানো দুটি রাষ্ট্রীয় শস্যভাণ্ডার বিষয়ে মৌর্য তাম্রফলকে (সোগৌর) মহামাত্রদের নির্দেশ দান।

৭.৭ এ থেকে আমরা উপনীত হই মৌর্য উৎপাদন-ভিত্তিগুলির কাছে—*অর্থশাস্ত্র*-এ (২.১) যা নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে ; যেমন, হাসিল না-করা জমিগুলির বিলি-বন্দোবস্ত ও রাজকর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে সেগুলির প্রত্যক্ষ শোষণ। সমস্ত জমিই পরিমাপ করা হত; মাটির

বৈশিষ্ট্য, সেচের ধরন, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি থেকে প্রতিটি শস্যের সম্ভাব্য ফলন হিসেব করা হত। প্রতিটি রাজভান্ডার ও রাষ্ট্রীয় শস্যাগারে* বৃষ্টি পরিমাপক রাখা হত (*অর্থশাস্ত্র,* ২.৫)—যা বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক ছিল (*অর্থশাস্ত্র,* ২.২৪)। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সদর নগরীসহ বিভিন্ন উপজাতি অঞ্চল থেকে সৃষ্ট পুরনো ভূমিগুলিকে পৌর-জানপদদের 'রাষ্ট্র' হিসেবে গণ্য করা হত—যেখানে করের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম এবং আগে তা সর্দারকে দিতে হত, এখন সম্রাটকে। 'কোষাগারে টান পড়লে কোন রাজা শুধু পৌর-জানপদদেরই গ্রাস করবে' (*অর্থশাস্ত্র,* ২.১)—এ কথা থেকে প্রমাণ হয় যে তাদের কর ঐ সময়কার ও *অর্থশাস্ত্র*-এর মডেলের রাষ্ট্র চালানোর পক্ষে অপর্যাপ্ত ছিল। নতুন রাজ্য জয়ও প্রত্যক্ষভাবে কাজে আসত না—কেননা একথা জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে কোন বিজিত শাসক ও তার কর্মচারীদের যখনই সম্ভব, তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে; জয়লাভের প্রথম উল্লাসের চোটে যা কিছু লুঠ করা হত তার বাইরে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কোন বিশেষ কর দেওয়ার কথা বলা হয়নি। রাজাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সম্ভব হলে বিনা যুদ্ধে প্রতিবেশী শাসকের পতিত জমির ব্যাপারটা ফয়সালা করে নিতে। সুতরাং এমনকী বিজয়ের উদ্দেশ্যও ছিল তখনও পর্যন্ত দখলীকৃত হয়নি এমন নতুন অঞ্চলগুলিকে দখল করা।

এক থেকে দুই লীগ** ব্যাসের এলাকা জুড়ে একশো থেকে পাঁচশো শূদ্র কৃষক পরিবারকে নিয়ে গ্রাম গঠন করা হত। বসতির পর্যাপ্ত ঘনত্ব রাখা হত পারস্পরিক নিরাপত্তা দানের লক্ষ্যে। সীমানা চিহ্নিত করে দেওয়া হত সতর্কতার সঙ্গে। দশ, দু'শো, চারশো এবং আটশো গ্রাম নিয়ে প্রশাসনিক একক গঠন করা হত; শেষোক্তটির ক্ষেত্রে থাকত একটি সুরক্ষিত সদর-নগরী। এই নতুন 'জনপদ'গুলির সীমান্ত (বন্য উপজাতি ও হানাদারদের আক্রমণের হাত থেকে) রক্ষা করত সেনাবাহিনী—কেননা শূদ্র গ্রামবাসীদের অস্ত্র বহনের অধিকার ছিল না। সামান্য কিছু অকর্ষিত জমি পুরোহিতদের দান করা হত বিনা খাজনায়। বাকি জমি বিলি করা হত খাজনা দাতাদের—কেবলমাত্র তাদের জীবৎকালের জন্যই। যদি কেউ প্রাপ্ত জমি চাষ না করে ফেলে রাখে তবে তা কেড়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেওয়া হত—অবশ্য যদি সে জঙ্গল সাফাই করে সবেমাত্র জমিকে চাষোপযোগী করে তুলে থাকে তাহলে রেহাই পেত। সদ্য বিলি-বন্দোবস্ত করা জমিতে অল্প কিছুদিনের জন্য কর ছাড় দেওয়া হত, কিন্তু চাষবাস ভাল হতে শুরু করলে নিশ্চিতভাবেই করের পরিমাণ খুব বেশি হত। রাজার অংশ ছিল উৎপাদিত ফসলের অন্তত এক-চতুর্থাংশ, সাধারণভাবে তার সঙ্গে যুক্ত হত জল কর। গোটা ব্যাপারটা দেখাশুনা করত রাজ কর্মচারীরা ঃ

* মৌর্যযুগের শস্যাগারের প্রমাণ পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলিতে মিলেছে—যেমন সোহ্গৌর তাম্রপত্র (চিত্র ৩৪), যেখানে সাবত্তি-র নিকটবর্তী এই রকম দুটি শস্যাগারের রাজ কর্মচারীদের জন্য নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে; দ্রষ্টব্য : জে এফ ফ্লিট, *জার্নাল অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ লন্ডন,* ১৯০৭, ৫০৯-৫৩২; *পূর্বোক্ত,* জি এ গ্রিয়ারসন, ৬৮৩-৫; ভিন্ন পাঠ ও ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য : বি বি বরুয়া, *অ্যানালস্ অফ দি ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনসটিটিউট,* ১১(১৯৩০), ৩২-৪৮। ভারতে খাদ্য রেশন ব্যবস্থা চালুর সময় আধুনিক সরকারী শস্যাগারগুলিকে মৌর্যযুগের এই শস্যাগারগুলির চেয়ে ভালভাবে শস্য সরবরাহ বা পরিচালনা করা হয়নি। ৩৪নং চিত্রে মৌর্য চূড়ার অর্ধচন্দ্রাকার খিলান এবং খোদ শস্যাগার দুটি লক্ষ্যণীয়।

** [১লীগ = প্রায় ৩½ মাইল]।

হিসাবরক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ামক, পশু ও সাধারণ চিকিৎসক প্রমুখেরা; এদের কোন জমির স্বত্ব দেওয়া হলে তা কেবলমাত্র প্রত্যেকে যতদিন বাঁচবে তত দিনের জন্যই—সে জমি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কিংবা বন্ধক বা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করা যেত না। পরিশেষে, এই ব্যবস্থার অতিরিক্ত যে জমি তা গ্রামের শ্রমজীবীদের ('গ্রামভৃতক') বা ব্যবসায়ীদের ইজারা দেওয়া যেতে পারত। এই সমস্ত জমি প্রাপকদের কাছে রাজা ছিলেন পুরোপুরি পিতৃপ্রতিম এক সার্বভৌম শাসক। ভারত-ইতিহাসের পরবর্তী সকল পর্বের ক্ষেত্রেই একথা প্রয়োজ্য এবং তা 'সীতা' জমি চাষের উপর নির্ভর করত না। পিতৃতান্ত্রিকতা হল ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনেরই অভিব্যক্তি, সার্বভৌমত্ব হল নিষ্ক্রিয়, অপ্রতিরোধী গ্রামবাসীদের মধ্যেকার নিহিত সামাজিক স্তরের। অবশ্য, পিতৃসুলভ মনোভাবের কথাটা যখন জোর দিয়ে বলা হত তখন আচরণে সার্বভৌম শাসক হওয়াটা ছিল অনেক বেশি সহজ। মাছের ভেড়ি, জলাধার, উদ্ভিজ্জ উৎপাদনের ব্যবসার মতোই খনিজ, কাঠ, বনের হাতির উপরও ছিল রাজার একচেটিয়া অধিকার; বাণিজ্যপথ ও বিপনন কেন্দ্র স্থাপনও তিনি করতে পারতেন।

এই সমস্ত শূদ্র বসতি স্থাপনকারীদের লোভ দেখিয়ে অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসা হত অথবা রাজার নিজস্ব জনাকীর্ণ নগরী থেকে নির্বাসিত করা হত। এ থেকে অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধের সময় ১৫০,০০০ লোককে 'অপবুধে' করার ব্যাখা পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতির উদ্ভব মৌর্যদের দ্বারা হতে পারে না বরং শিশুনাগ বংশের শেষের দিকে ও নন্দ আমলে অবশ্যই ছিল এবং তা হিমালয়ের পাদদেশ ছুঁয়ে যাওয়া প্রাচীন পথের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ছিল নদীতীরবর্তী অঞ্চল বরাবর। তাই, মেগাস্থিনিস যদি স্বাভাবিক পথে অর্থাৎ গঙ্গা দিয়ে নেমে পাটনায় এসে থাকেন তাহলে বেশির ভাগই রাজার 'সীতা' জমি তাঁর চোখে পড়েছে; 'শূদ্র কর্ষক'রাই ছিল তাঁর বর্ণনার নিরীহ 'গেয়োরগোই'। ব্যয়বহুল পাশপোর্ট (*অর্থশাস্ত্র*, ২.৩৪) এবং প্রতিটি 'জনপদ'-এ সীমান্তরক্ষার কঠোর ব্যবস্থার কারণে কৃষকদের পক্ষে নিজের জেলা ছেড়ে যাওয়াটা ছিল অসম্ভব এবং এই ধরনের দেশান্তর ঘটলে, যদি না সেই মানুষটি কর-প্রদানকারী অন্য এক গ্রামে গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য গ্রামপ্রধান ও নিবন্ধকরা দায়ী থাকত।

প্রকৃতপক্ষে, রাজার গ্রাম থেকে শ্রমজীবী মানুষের কোন রেহাই ছিল না। সন্তান উৎপাদনের বয়ঃসীমা পার হওয়ার এবং নিজের সম্পত্তি অন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার পরই শুধু কেউ সাধু হয়ে যেতে পারত; তা না হলে তাকে জরিমানা করা হত। স্ত্রী ও পোষ্যদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করে কেউ সন্ন্যাস নিলে তাকে শাস্তি পেতে হত—তেমনি কেউ যদি কোন নারীকে সন্ন্যাসিনী বানায় তাকেও। এটা কেবলমাত্র 'সীতা' গ্রামগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—অন্যথায় সন্ন্যাসিনীদের অস্তিত্ব বুদ্ধের আমল থেকেই ছিল। ব্যক্তিগতভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন (কিন্তু ধর্মান্তরিত নন) এমন লোক ছাড়া আর কোন সন্ন্যাসীকে রাজার গ্রামগুলিতে থাকতে দেওয়া হত না। *যজুর্বেদ*-এর যুগের আধা-যাযাবর 'গ্রাম' থেকে উদ্ভূত 'সজাত' আত্মীয়গোষ্ঠী বা জনপরিষেবামূলক কাজের জন্য (পরিখা, দিঘি খনন বা প্রাচীর নির্মাণ ইত্যাদি) গঠিত অস্থায়ী কর্মীদল ছাড়া কোন ধরনের সমিতি বা গোষ্ঠী গঠনের অনুমতি দেওয়া হত না। চিত্ত বিনোদনের জন্য সমাবেশ-স্থল বা আমোদ প্রমোদের জন্য ভবন নির্মাণও ছিল নিষিদ্ধ। 'অভিনেতা-অভিনেত্রী, নর্তক-নর্তকী, বাদ্যযন্ত্রী, কথক বা চারণ কবিরা যেন কাজকর্মে বিঘ্ন না ঘটায়। গ্রামীণ নিরাবলম্বিতা নিরাশ্রয়তা থেকেই মানুষ তার ক্ষেত্রের প্রতি নিবিষ্ট হয়—ফলে খাজনা, মজুরের

যোগান, সম্পদ ও ফসল বাড়ে' (*অর্থশাস্ত্র,* ২.১)। গ্রামীণ কূপমণ্ডুকতাকে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই সযত্নে লালন করা হত; কেননা বর্ধিত সম্পদ পারতপক্ষে গ্রামবাসীদের কোন কাজে না লেগে চলে যেত রাষ্ট্রের হাতে এবং রাষ্ট্র তার নিজের শর্তে তাদের সরবরাহ করত গবাদি পশু, যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র ইত্যাদি; সেচ বা যে কোন বিশেষ পরিষেবার জন্য বিপুল পাওনা ধার্য করা হত। এক্ষেত্রে একান্ত 'রাষ্ট্র' গ্রামগুলি ছিল বেশি সুখী। সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে যে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা—অশোকের অনুশাসনগুলি ছিল খোলাখুলি ভাবেই ঠিক তার বিপরীত।

মূল উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় একাধিপত্য বজায় রাখার একটা উপায় ছিল অস্থাবর দাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন নিষিদ্ধ করা। *অর্থশাস্ত্র*-এর আমলে মানুষ বিক্রি হত—তবে খুবই নগণ্য অনুপাতে; এদের অধিকাংশই হত বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত গৃহদাস। রাষ্ট্র তার অপরাধীদের দিয়ে কাজ করাত এবং মনে হয়, দণ্ডপ্রাপ্ত দাস হিসেবে ব্যক্তিগত মালিকদের কাছে সীমিত সময়ের জন্য ভাড়া খাটাত। *অর্থশাস্ত্র*-এর (৩.১৩) নিয়ম অনুযায়ী, মূল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অস্থাবর দাসপ্রথা ছিল সম্পূর্ণ পরিহার যোগ্য। একমাত্র 'ম্লেচ্ছ' বর্বররা (এদের মধ্যে গ্রীকরাও ছিল) যদি তাদের প্রজাদের ('সন্তানদের' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে) দাস হিসেবে রাখত বা বিক্রি করে দিত তাহলে তাদের অপরাধী বলে গণ্য করা হত না। বিনোদনকারী হিসেবে এই ধরনের 'ম্লেচ্ছ'দের চাহিদা ছিল এবং রাজার অন্দরমহলে পর্যন্ত তাদের প্রবেশাধিকার ছিল। 'কিন্তু কোন আর্যকে কখনও দাস হিসেবে বিক্রি করা চলবে না', এমনকী আর্যদের মতো মুক্তভাবে বসবাসকারী কোন শূদ্রকেও নয়। দণ্ডপ্রাপ্ত দাস সহ প্রতিটি দাসকে তার মুক্তিপণের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখতে দেওয়া হত। দাসদের নোংরা কাজ (সবিস্তারে নির্দিষ্ট করা ছিল) করতে বলা যেত না; এ ধরনের কাজ করতে জোর-জবরদস্তি করলে অবিলম্বে সেই দাস মুক্ত হয়ে যেত। মালিক ধর্ষণ করলে তা হত কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তাছাড়া এমন হলে দাসও আপনা থেকেই মুক্তি পেয়ে যেত। দাসদের নিজস্ব সম্পত্তি থাকত—যার উত্তরাধিকারী হত তাদের আত্মীয়রা, মালিকরা নয়। তাদের সন্তানরা ছিল জন্ম থেকেই মুক্ত। শূদ্র ভূমিদাসরা তাদের স্ব-ইচ্ছাতেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল—ফলে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃহৎমাত্রায় অস্থাবর দাসত্বপ্রথা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল।

অর্থশাস্ত্র-এ ব্যক্তিগত মালিকানায় পণ্য উৎপাদনকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়নি; সেখানে, তিনটি পূর্ব-পশ্চিম ও তিনটি উত্তর-দক্ষিণ রাস্তার দ্বারা ন'ভাগে' বিভক্ত প্রতিটি নতুন জনপদ সদর নগরীর পশ্চিমদিকস্থ অংশে শিল্পী ও কারিগরদের বাসস্থানের জন্য জায়গা রাখার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, অন্যান্য ইমারতের মধ্যবর্তী জমিতে বণিকসঙ্ঘ-ভবন নির্মাণ করতে হবে (*অর্থশাস্ত্র,* ২.৪)। 'যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে পারে, কর্মীদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে, অন্যদের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে পারে, নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে এবং নিজেদের সংঘের উপর যাদের নিয়ন্ত্রণ আছে এমন লোকেরাই ঠিকাদারির কাজ নেবে। সমস্যায় পড়লে খরচ হওয়া অগ্রিম (মালপত্রের)-এর জন্য সংঘ দায়ী থাকবে।' এখান 'সংঘ' কথাটির সমার্থক শব্দ হল 'শ্রেণী' (তুলনীয় ১১.১, একইসঙ্গে কম্বোজ ও সুরাষ্ট্রের 'ক্ষত্রিয়শ্রেণী')—যা উপজাতিরই উত্তরসূরী, কিন্তু তার চেয়ে ছোট ও কম বিপজ্জনক। অন্যদিকে, এগুলি নিছকই শ্রমিকদের সংঘ ছিল না, কেননা সেনাবাহিনীতে 'শ্রেণী' সৈন্যদলের

অস্তিত্বের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কোন 'শ্রেণী'র প্রধান তার গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলে (*অর্থশাস্ত্র,* ৮.৪) একজন সেনাপতির সমান, অর্থাৎ ৮০০০ রৌপ্য পণ বেতন পেত (*অর্থশাস্ত্র,* ৫.৩)। পুরুষানুক্রমিকভাবে সৈনিকদের নিয়ে গঠিত স্থায়ী বাহিনী ও পেশাদার ভাড়াটে সৈন্যদের কথা বাদ দিলে, এই 'শ্রেণী' সৈনিকরাই ছিল সবচেয়ে সেরা (*অর্থশাস্ত্র,* ৯.২)। 'শ্রেণী'-র নবনিযুক্ত সৈনিকদের (*অর্থশাস্ত্র,* ৭.৮; ৭.১৪) পুরস্কার হিসেবে এমন জমি দেওয়া হত যেগুলিতে স্থায়ীভাবে বিরোধী লোকজন বাস করে (*অর্থশাস্ত্র,* ৭.১৬); এটা দুই বিপদকে পারস্পরিক বিরোধে জড়িয়ে দেবার প্রচলিত নীতিরই অনুসারী। অর্থাৎ, ঐ সময়কার 'শ্রেণী' ছিল উপজাতি ও বর্ণের এক মধ্যবর্তী গোষ্ঠী—যার সদস্যরা কোন সাধারণ পেশায় যুক্ত থাকলেও অস্ত্র বহন করার অধিকারী ছিল। এরা সামাজিক উৎপাদনেও অংশ নিত, কিন্তু শূদ্র শ্রমিকদের মতো এদের শুধু সেই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্তের স্তরে নামিয়ে আনা হয়নি বা চতুর্বর্ণের কোনটির মধ্যেও ঠেলে দেওয়া হয়নি। *অর্থশাস্ত্র*-এ (৭.১) স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে 'শ্রেণী' গোষ্ঠী বসবাস করছে এমন কোন ভূমি—প্রাকৃতিক বাধা ও দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত কোন অঞ্চলের মতোই এক কঠিন সামরিক সমস্যা।

'কোন্‌টা ভাল (উপনিবেশ গড়ার জমি হিসেবে), যেখানে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরা বসবাস করে, না *শ্রেণী* গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা? যেখানকার মানুষেরা স্বতন্ত্র সেটি অপেক্ষাকৃত ভাল; কেননা ঐক্যহীন মানুষ সহ কোন (ভূমি) শোষণ করা যায় এবং সেখানে কোন শত্রুর তোষামোদ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বিপরীত ধরনটি (রাজার পক্ষে ক্ষতিকর) কোন বিপর্যয়ে (দ্রুত) ভেঙে পড়ে; 'শ্রেণী' বসতি (ভূমির) সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বিদ্রোহ।' (*অর্থশাস্ত্র,* ৭.১১)

অর্থাৎ, গ্রামবাসী বা খাদ্য-সংগ্রাহক আদিম মানুষ না হয়েও অস্ত্রের জোরে পতিত জমিগুলিতে 'শ্রেণী'গুলির নিজস্ব কিছু বসতি ছিল। গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে : 'কোন জমি চার বর্ণের মানুষদের মধ্যে বিলি সম্পর্কে বলা যায়, যেখানে সবচেয়ে নিচু বর্ণের সংখ্যাধিক্য সেটি বেশি ভাল—কেননা সেখানে সব রকম শোষণ চালানো যায়।' যদিও পরবর্তী শত শত বৎসর ধরে 'শ্রেণী'গুলি সক্রিয় থেকেছে, কিন্তু মুখ্যত শূদ্র বসতির গ্রামগুলিতে তাদের জন্য স্থান বা জীবিকা কিছু ছিল না। চুক্তির ভিত্তিতে অন্যদের জন্য কাজ করে এমন কারিগরদের 'শ্রেণী' গঠন না করে কর্মীসংঘ হিসেবে মাঝে মধ্যে ভাড়া করা হত; কেননা *অর্থশাস্ত্র-এ* (৩.১৪) গোষ্ঠী-কর্মীদের (*সংঘভৃত্যঃ*) কথা উল্লেখ আছে—যারা চুক্তিরূপায়ণের জন্য যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকত। সম্ভবত বাধ্যতামূলকভাবে আন্তঃগোষ্ঠীবিবাহে যুক্ত এবং সেইসঙ্গে নিজেদের মধ্যে মুনাফা ভাগ করে নেওয়া এই 'শ্রেণী'র কথা মেগাস্থিনিসের বিক্ষিপ্ত বিবরণে এসেছে বলে মনে হয় না—যদি না পশুপালক-শিকারী বা কারিগর-ব্যবসায়ী, বা উভয়ের অস্তিত্বের আভাসে থেকে থাকে। পালি নথিগুলিতে 'শ্রেণী' এবং 'শেন্নী' শব্দদুটি 'বণিক সংঘ' ও 'সেনাবাহিনী' এই দ্বৈত অর্থের কারণে গুলিয়ে যায়, কিন্তু *অর্থশাস্ত্র*-এ 'শ্রেণী' শব্দের দুটি ব্যবহারের সঙ্গে তা সাযুজ্যপূর্ণ।

বিপুল-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান দূরত্বের সাথে সাথে এই সমস্ত বাধা-নিষেধগুলিও নগরের উৎপাদিত পণ্যগুলির গ্রামাঞ্চলে সরবরাহ অসম্ভব করে তুলছিল। নদীপথের সাহায্যে পরিবহণ সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছিল না—কেননা গঙ্গা ও সিন্ধুর পরিবহণ ব্যবস্থা অন্যত্র প্রযোজ্য হতে পারত না। সবচেয়ে হীন কাজের জন্য রাষ্ট্র যদি নগদ মজুরী দেয়,

ইচ্ছামতো শূদ্রদের রাজার 'সীতা' গ্রামে বসতিস্থাপনের জন্য পাঠানো হয়, আর দাস মজুরদেরও সস্তায় নিয়ে আসা যায় না—তখন কারিগর-ব্যবসায়ীদের পক্ষে লাভজনক হারে পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া সম্ভব ছিল না। অশোক-পূর্ব রাষ্ট্রের (যা বাণিজ্য পথগুলির ধারে কোন বিশ্রাম স্থল তৈরি করেনি) বণিক-বৈরিতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বাণিজ্য-বিজ্ঞান বিষয়ে নিজের শিক্ষকদের বিরোধিতা করে কৌটিল্য বলেন : 'না, (রাজার) সীমান্তরক্ষী (তাঁর মতোই কম ক্ষতিকর) তার জীবিকার জন্য বণিকের ব্যবসার লাভের উপর নির্ভরশীল। বণিকেরা অবশ্য এক পণের বিনিময়ে একশ পণ, এক জারের বিনিময়ে একশ জার (ফেরতের) নীতিতে বাড়ায় এবং কমায় (বিক্রয়দর ও ক্রয়দর)। এই ভাবেই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।' (*অর্থশাস্ত্র*, ৮.৪)। সুতরাং গ্রামের চাহিদা পূরণের একমাত্র উপায় হল গ্রামীণ উৎপাদনগুলির চলাচলটা বজায় রাখা। তাহলেই বাদবাকি গ্রামগুলি কার্যত স্বনির্ভর অর্থনীতিসম্পন্ন নির্দিষ্ট এক ধরনের উৎপাদনশীল গ্রামে দ্রুত রূপান্তরিত হতে পারে। উৎপাদন বিপুলভাবে বেড়েছিল, কিন্তু সেগুলি আর বেশিদিন বিনিময়-উপযোগী পণ্য হিসেবে ছিল না। ধাতুর ওপর মগধের নিয়ন্ত্রণ আলগা হয়ে পড়েছিল, কেননা জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থাবিহীন দক্ষিণ বিহারের খনিগুলি সম্ভবত এই সময়কালে কোন কোন জায়গায় জলস্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল।[১০] দক্ষিণ ভারতীয় ধাতুগুলির ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করাটা সহজ ছিল না, কারণ সেগুলি উৎপাদিত হত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এবং তাদের চেয়ে বেশি দুঃসাহসী ও বণিকেরাই তা নিয়ে আসত। যে মুহূর্ত থেকে গ্রামগুলিতে উৎপাদন শুরু হল, আমদানি-রপ্তানি ও ব্যবসা থেকে আসা রাজস্ব এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় একাধিপত্যও অন্তর্হিত হল। স্বনির্ভর, নিরস্ত্র গ্রামগুলি তখন এবং তারপর থেকেই ভারতের বৈশিষ্ট্যসূচক স্বাভাবিক উৎপাদন এককে পরিণত হল। এর অর্থ সৈনিক, আমলা ও গুপ্তচরদের তিন বিশাল স্বতন্ত্র বাহিনী নিয়ে গঠিত যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনযন্ত্র তার আর প্রয়োজন রইল না এবং বজায় রাখাও ছিল অসম্ভব। *অর্থশাস্ত্র*-এর যে সর্বব্যাপী গুপ্তচর-ব্যবস্থা—যা যুবরাজ থেকে শুরু করে অতি সাধারণ গ্রামবাসী পর্যন্ত সবার উপর নজর রাখার বিধান দিত—তা প্রমাণ করে যে আমলাতন্ত্র ছাড়া সেই রাষ্ট্রের আর কোন নিরাপদ শ্রেণীভিত্তি ছিল না। আমলাদের অর্থ আত্মসাৎ করাটাও উত্তরোত্তর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। 'অর্থ-সমাহর্তা প্রথমে তার নিজের লাভ দেখে, তারপর রাজার, কিংবা রাজার লাভ সম্পূর্ণ নষ্টও করে দেয়। (কর হিসেবে) অন্যের সম্পদ গ্রহণের সময় যে নিজের খুশিমতো আত্মসাৎ করে।' (*অর্থশাস্ত্র* ৮.৪)। পুরো তিনটি অধ্যায় জুড়ে (২.৭-১০) দুর্নীতিপরায়ণ রাজকর্মচারীদের খুঁজে বের করা ও শাস্তি দেওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অসহায়ের মতো স্বীকার করা হয়েছে যে জলের মাছ কখন জল খেয়েছে তা আবিষ্কারের মতোই এই তছরূপের সন্ধান পাওয়া কঠিন।

এ সব কিছুরই মূলে ছিল এক অর্থনৈতিক কারণ; মগধের শাসন তখন বিস্তৃত হয়েছিল অনেক কম লাভজনক এলাকায়—কেননা গাঙ্গেয় উপত্যকার মাটির, বিশেষ করে প্রথম যখন বন কেটে চাষবাষ শুরু হয়েছিল—তেমন উর্বরতা আর কোথাও ছিল না। আদর্শ জানপদ-ভূমির বর্ণনা *অর্থশাস্ত্র*-এ (৬.১) দেওয়া হয়েছে এই রকম ঃ

'মাঝখানে ও সীমান্তে দুর্গ তৈরির উপযোগী পাহাড় থাকবে : নিজের চাহিদা পূরণ করবে, প্রয়োজনে অন্যদের (জেলাগুলির) চাহিদাও মেটাবে। সহজেই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে, জীবন-যাপনের

জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু যোগাবে, (রাজার) শত্রুদের ঘৃণা করবে এবং প্রতিবেশীরা তেমন শক্তিশালী হবে না। কর্দমাক্ত, পাথুরে বা লবণাক্ত জমি থাকবে না; এবড়োখেবড়ো জমি, ঘন ঝোপজঙ্গল, বন্য পশু ও বন্য আদিবাসী মুক্ত হবে। রাজার 'সীতা' জমি, খনিজ সম্পদ, হস্তীবন নিয়ে তা হবে এক মনোরম ভূখণ্ড। গবাদি পশু ও মানুষের বসবাসের উপযোগী হবে। থাকবে সুরক্ষিত পশুর পাল, প্রচুর পশু; বৃষ্টির জল ছাড়াও অন্য জলের ব্যবস্থা থাকবে। সুপরিকল্পিত জলপথ ও রাস্তাঘাট, মূল্যবান ও নানা ধরনের বাণিজ্যিক দ্রব্য সমন্বিত এবং সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভিন্ন করদানে সক্ষম হবে। কৃষকরা হবে কর্তব্যপরায়ণ, প্রভুরা হবে শিশুর মতো, বসবাসকারীদের অধিকাংশই হবে নীচু জাতের, আর মানুষেরা হবে অনুগত ও নিষ্পাপ। —জনপদকে হতে হবে এরকমই নিখুঁত।'

হতে পারে, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সম্ভবত বঙ্গের পশ্চিমভাগ এবং উপকূলবর্তী গুজরাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট অংশগুলির ক্ষেত্রেই এমনটা প্রয়োজ্য ছিল, কিন্তু দেশের অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রে তা ছিল না। প্রাক্-মৌর্য রাজাদের সামনে হয়ত এই ধরনের অঞ্চল জয় করার ও বসতিস্থাপন করার সুযোগ ছিল, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনী নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট অঞ্চলগুলিতেই পা ফেলেছিল। পূর্বতন পৌর-জানপদদের দ্বারা অধিকৃত উর্বরা কিন্তু জলবিহীন পাঞ্জাবকে ব্যয়বহুল সেচব্যবস্থা ছাড়া আর দোহন করা যেত না। দক্ষিণ ছিল অরণ্য আচ্ছাদিত প্রস্তরভূমি—যেখানে সীতা গ্রামগুলির মাথাভারী মাগধি প্রশাসন হত অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ। দীর্ঘপথ অতিক্রমণের উপযোগী পরিবহণের অভাবই ছিল (এবং এখনও আছে) ভারতের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বাধা।

পরিশেষে, এমন এক বিশাল ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এর যে প্রধান ব্যক্তিত্ব বা প্রতীক অর্থাৎ সার্বভৌম অধীশ্বরকে চরম কায়িক শ্রম ও অসম্ভব মানসিক একাগ্রতা দান করতে হত—যা কার্যবিবরণী সংক্রান্ত অশোকের ঘোষণা থেকে প্রমাণ হয়।

'(রাজার)দিন ও রাত্রি উভয়কেই *নালিকা* ঘড়ির (সম্ভবত ফাঁপা নল দিয়ে তৈরি সূর্যঘড়ির কাঁটা—যা রাতে জল-ঘড়ি হিসেবে কাজ করত) সাহায্যে আটটি করে ভাগ করতে হবে।... তারপর দিনের আট ভাগের প্রথম ভাগে (রাজা) প্রতিরক্ষা এবং আয়-ব্যয় সম্পর্কিত খবরাখবর শুনবেন। দ্বিতীয় ভাগে তিনি *পৌর-জানপদদের* সম্পর্কিত বিষয়গুলি অনুধাবন করবেন। তৃতীয় ভাগে তিনি স্নানাহার ও (বেদ) অধ্যয়নে মনোনিবেশ করবেন। চতুর্থ ভাগে, স্বর্ণগ্রহণ করবেন ও প্রশাসকদের সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবেন। পঞ্চম ভাগে, তিনি তার মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন (এবং নির্দেশ পাঠাবেন) চিঠি মারফৎ [এর অর্থ, দূরবর্তী *জানপদ* মন্ত্রীদের] এবং গুপ্তচর ও গোপন সংবাদগুলির প্রতি মনোযোগ দেবেন। ষষ্ঠ ভাগটি তিনি অবশ্যই ব্যয় করবেন বিনোদনে, অথবা নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনায়। সপ্তম ভাগে তিনি পরিদর্শন করবেন হস্তী, অশ্ব বা (অস্ত্রসজ্জিত) রথারূঢ় এবং পদাতিক সৈন্যবাহিনী। অষ্টম ভাগে তিনি প্রধান সেনাপতির সঙ্গে আলোচনা করবেন দেশ জয় (আগ্রাসন) নিয়ে। সন্ধ্যায় বসবেন প্রার্থনায়। রাত্রির (আট ভাগের) প্রথম ভাগে তিনি গুপ্তচরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। দ্বিতীয় ভাগে, স্নান, আহার এবং *পাঠ* [বেদ বা অনুরূপ কিছু]। তৃতীয় ভাগে, যন্ত্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে নিদ্রা যাবেন এবং চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ নিদ্রায় কাটাবেন। ষষ্ঠ ভাগে সংগীতের ধ্বনিতে ঘুম ভাঙার পর তিনি মনসংযোগ করবেন বিজ্ঞানে [এখানে খুব সম্ভবত

অর্থশাস্ত্র] এবং তাঁর আশু করণীয়গুলি সারবেন। সপ্তম ভাগে, তিনি অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবেন (অথবা সাফল্যের সূত্রগুলির পাঠে যত্ন নেবেন) এবং নির্দেশসহ গুপ্তচরদের নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত করবেন। অষ্টম ভাগে তিনি অগ্নিহোত্রী, আচার্য ও পুরোহিতদের অভ্যার্থনা জানাবেন, ধর্মীয় ক্রিয়াচার সেরে আশীর্বাদ নেবেন এবং চিকিৎসক, প্রধান পাচক ও জ্যোতিষীর সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। তারপর (দক্ষিণ পার্শ্বস্থ) একটি সবৎস গাভী ও যণ্ডকে প্রদক্ষিণের পর প্রবেশ করবেন দরবার কক্ষে। অথবা, নিজের সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অন্যভাবেও তিনি দিন ও রাত্রিকে ভাগ করে নিতে পাবেন।' (*অর্থশাস্ত্র,* ১.১০)।

এর সঙ্গে যুক্ত হবে বিষপ্রয়োগ, গুপ্তহত্যা ও জবর দখলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় নিয়ত সতর্কতার বিষয়টি (*অর্থশাস্ত্র* ১.২০, ১২১, ১.১৭-১৮ প্রভৃতি)। কিছু জরুরি খবর, বিশেষ করে জনহীন অঞ্চলে সন্দেহজনক লোকদের ঘোরাফেরা কিংবা সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কিত খবর পাঠানো হত পায়রার সাহায্যে (*অর্থশাস্ত্র,* ২.৩৪ ও ১৩.১)। বোঝা যায়, রাজ্য ঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে রাজার জীবন হয়ে উঠত দুঃসহ। পরবর্তীকালের রাজারা তুলনামূলকভাবে ছোট রাজত্ব ও কম ক্ষমতা নিয়ে আত্মতৃপ্ত থাকাটাই বেশি পছন্দ করতেন। দণ্ডিন-এর *দশকুমারচরিতম্*-এর যে শেষ অংশটুকু পাওয়া গেছে তাতে বৈশিষ্ট্যহীন চরিত্রের বিহারভদ্রকে নিন্দার্হ রূপে চিহ্নিত করা হলেও সম্পূর্ণ দোষী করা হয়নি। আত্মস্বার্থ চরিতার্থকারী এক আমলাতন্ত্রের সম্মিলিত সক্রিয়তার প্রতিকূলে যথাযথ শাসন চালানোর অসাধ্যতা এবং সকলের প্রতিই সীমাহীন অবিশ্বাস—এই ছিল চাণক্য অনুগামী সম্রাটদের কঠোর নিয়মানুবর্তী জীবনের সার্বিক পুরস্কার। একটা আদর্শ চরিত্র খুঁজে পাওয়াটা ছিল দুরূহ এবং প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন এক পুরো বংশের আবিষ্কার ছিল অসম্ভব। দণ্ডিন-এর সামনে নিশ্চিতই ছিল চাণক্যের মূলগ্রন্থ এবং তা এই রচনাংশকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

অশোকের প্রকৃত রূপান্তরণ নিছকই রাজার নয় বরং গোটা ব্যবস্থার। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পণ্য উৎপাদনের স্থান নিয়েছিল গ্রামগুলি—যেখানে তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ খাদ্য ও অত্যাবশ্যক শিল্প সামগ্রীর চাহিদা তারা নিজেরাই মেটাত। ধর্মের সাহায্য নিয়ে বলপ্রয়োগের ব্যয়বহুল রাষ্ট্রযন্ত্রকে ছেঁটে ফেলা হয়েছিল। *অর্থশাস্ত্র*-এ ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; যজ্ঞদক্ষিণা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে (৩.১৪) এবং পুরোহিত যদি চুক্তি পূরণ না করে তাহলে অন্য যে কোন ধর্ম নিরপেক্ষ চুক্তি লঙ্ঘনের মতোই সেটাও ছিল জরিমানাযোগ্য। 'সাধু'-দের মূলত গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহার করা হত কেননা এই ছদ্মবেশে সবশ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছনো সহজ ছিল এবং এরাই ছিল একমাত্র গুপ্তচর যারা বিপজ্জনক 'আতবিক' বর্বরজাতি অধ্যুষিত বনাঞ্চলে প্রবেশ করতে পারত। পরলোকগত পূর্বপুরুষদের আত্মার তৃপ্তির জন্য আয়োজিত ভোজে শাক্য, আজীবক বা অনুরূপ সাধুদের খাওয়ালে ১০০ রৌপ্যখণ্ড জরিমানা দিতে হত (*অর্থশাস্ত্র,* ২.২০)। এই সমস্ত পদক্ষেপ (যেমন নারীদের সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করলে জরিমানা দিতে হত) পরম্পরা বিচারে *অর্থশাস্ত্র*-এর কালকে অশোক-পূর্ব হিসেবেই চিহ্নিত করে—কেননা এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁর বদান্যতা প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়েছে এবং তাঁর পরবর্তী অনেক বংশধরই তা মেনে চলেছেন। রীতি অনুসারে, অশোকের দরবারের রাজকুমারীরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হয়েছিলেন। সন্ন্যাসব্রতের ব্যাপারে সাধুবেশে গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়া *অর্থশাস্ত্র*-র এ

বিষয়ে আর কোন আগ্রহ ছিল না। সাধুদের বাসস্থান, সবচেয়ে নিম্নবর্ণের (চন্ডাল) মানুষদের মতোই হত রাজনগরের বাইরে (২.৪)। এই ধরনের 'আশ্রমে' বিরোধ দেখা দিলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে ন্যায্যভাবে ঘর ভাগ করে দেওয়ার সুনির্দিষ্ট আইন ছিল। সুতরাং, অশোকের পদক্ষেপগুলি ছিল আমূল সংস্কারধর্মী, এমনকী বৈপ্লবিকও, এক নবজীবনের আবাহন। তত্ত্বগতভাবে কখনই পরিত্যাজ্য না হওয়া এক অত্যধিক কেন্দ্রায়িত শাসনের চূড়ান্তভাবে ভেঙে পড়ার এটা ছিল একটা লক্ষণ এবং সেই সঙ্গে কারণও বটে। সেনাবাহিনীও আর অত্যাবশ্যক ছিল না, কেননা ভারত-জয় কার্যত তার যুক্তিসম্মত সীমান্ত পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল—জয়ের পক্ষে লাভজনক যেখানে যা কিছু ছিল। দস্যু হানা থেকে বাঁচানো বা গ্রামবাসীদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া প্রতিরোধ, জানপদদের সুরক্ষায় স্থানীয় রক্ষীবাহিনীগুলিই ছিল যথেষ্ঠ। এই বাহিনীগুলি অবশ্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে পৌছতে চাওয়া বিদেশী অভিযানকারীদের ঝটিকা আক্রমণ রোধ করতে পারেনি—অশোকের মৃত্যুর বছর ষাটেকের মধ্যেই যেমনটা ঘটেছিল। প্রবেশ সংক্রান্ত *বিনয়* আইনগুলি প্রমাণ করে যে বৌদ্ধ বিধান খুব বেশিদিন বর্ণ বা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করেনি। পলাতক দাস বা ভূমিদাস সম্পর্কিত নির্দেশগুলিকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সন্ন্যাসীদের রাজগ্রামগুলিতে নিরাপদে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল। অপরাধীদেরও সংঘে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবু, সবচেয়ে নিচু জাতের ('কুকুর-ভক্ষণকারী' চন্ডাল) সোপক ছিলেন স্বয়ং বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের অন্যতম, আর খুনী দস্যু অঙ্গুলিমাল-এর আশ্চর্য রূপান্তরণ বিস্মিত রাজা পসেনাদির প্রশংসা পেয়েছিল। সর্বশক্তিমান বেতনভুক রাজকর্মচারী এবং তাদের সাহায্যকারী উচ্চবেতনের সৈনিক ও নিয়ন্ত্রণকারী আরো বেশি বেতনের গুপ্তচরদের তুলনায় ধর্মপ্রচারকরাই তখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় অনেক সুলভ শক্তি। অশোক যে ভিত্তিগুলি স্থাপন করেছিলেন তা অমিত ফলদায়ী হয়ে উঠল, যেমন সাঁচীতে; অশোক-পূর্ববর্তী রাষ্ট্র তার সমস্ত সম্পদ ও শক্তি দিয়ে যে ব্যবসায়ীদের উপর তীক্ষ্ণ নজরদারী, শোষণ ও নির্যাতন চালাত—তাদের কাছ থেকেই। রাজা ও তাঁর প্রজারা 'ধম্মে'-র মধ্যে এক অভিন্ন ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল, এক নবোদ্ভূত শ্রেণীভিত্তি—যার জন্যই ছিল রাষ্ট্রের বাকি আর সবকিছু। অশোকের সংস্কার *অর্থশাস্ত্র* কথিত রাষ্ট্র পরিচালন নীতির একটি মৌলিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছিল অর্থাৎ নীতিনিষ্ঠ, আইন-মান্যকারী জনসাধারণের ওপর সম্পূর্ণ অনৈতিক এক রাজ্বার শাসন চাপানো, যিনি কূটনীতির নামে প্রজা ও প্রতিবশীদের বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্ম চালাবার অধিকার ভোগ করেন।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১. তক্ষশীলার বশ্যতা স্বীকার, আলেকজান্ডারের বিজয় এবং বিদেশী বিবরণীগুলি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে *দি কেম্ব্রিজ হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া,* খণ্ড-১, 'এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া', ই জে র‍্যাপসন সম্পা., কেম্ব্রিজ ১৯২২, ১৯৩৫-এ; এবং L. de la Vallee Ponsain : "L 'Inde aux temps des Mauryas et des barbares, Grecs, Sythes, Parthes et Yne-Tchi" (Paris, 1930) (এরপর আই. টি. এম)-তে।

২. এস. কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার : *বিগিনিংস অফ সাউথ ইন্ডিয়ান হিস্টরি* (মাদ্রাজ ১৯১৮), পৃ. ৮১-১০৩; এখানে অবশ্য খুব অল্প প্রমাণই নথিভুক্ত হয়েছে এবং তাঁর আগে ছিল আরও অল্প প্রমাণ। এছাড়াও দ্রষ্টব্য : সোম সুন্দর দেসিকর, *ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টারলি,* ৪, ১৯২৮, ১৩৫-৪৫। এই সমস্ত রচনা থেকে বা ভি. আর. দীক্ষিত কৃত *শিলাপ্পাদিকারম*-এর অনুবাদ (অক্সফোর্ড, ১৯৩৯) বা তাঁর *স্টাডিজ ইন তামিল লিটারেচার অ্যান্ড হিস্টরি* (লন্ডন) থেকে দক্ষিণ ভারতে কবে প্রথম লাঙ্গল ব্যবহার করা হয়েছিল তা বের করা সম্ভব নয়।

৩. মৌর্য অধ্যুষিত ছোট ছোট অঞ্চলগুলি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : *ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুইটি,* ১৯.৫৫-৬২ এবং *অ্যানালস্ অব ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট* (পুনা) ২৩.৫১০-১৪। গুজরাটে শেষ মৌর্যদের ধ্বংস করে দিয়েছিল আরবরা ৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ (*সি আই আই*) ৪র্থ, পৃ. ১৪৪)।

৪. গ্রন্থটির ড্রাইডন কৃত অনুবাদের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন এ. এইচ. ক্লাউ ১৮৬৪ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় মডার্ন লাইব্রেরিতে (নিউইয়র্ক, সনবিহীন); পৃ. ৮০১-৫৪ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটিতে ভুলক্রমে 'গাণ্ডারিটার্ন' লেখা হয়েছে, আমি সংশোধন করে 'গঙ্গারিডান' (গন্দারিডি) লিখেছি।

৫. জে. প্রিন্সেপ নিজের আবিষ্কারের সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছিলেন দুটি প্রবন্ধে (*জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল,* ১৯৩৭-৮)। এগুলির পাঠ আজও জরুরি।

৬. অশোকের অনুশাসনগুলির জন্য দ্রষ্টব্য ঃ *সি আই আই,* আই ই হাল্ৎজেশ্চ (অক্সফোর্ড ১৯২৫; ভারত সরকারের পক্ষে). ই. সেনার্ট; *Les inscriptions de Piyadasi* (২ খণ্ড, প্যারিস ১৮৮১-৬); *এফ ডব্লিউ টমাস, জার্নাল অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ লণ্ডন* ১৯১৪, ৩৮৩-৩৯৫; *পূর্বোক্ত,* ১৯১৬, ৬৭৭-৬৯৮। ধর্মানন্দ কোসাম্বি, *ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুইটি,* ৪১, ১৯১২, ৩৭-৪০; আমার মনে হয়, 'বিনয়সমুকিসে' বলতে 'ধম্ম-চক্ক-পবত্তন সুত্ত'-র মতো কোন উপদেশ বা বিশেষ রচনাংশকে নয় বরং 'সমগ্র বিনয়'-কেই বোঝানো হয়েছে। এই একটি বিষয়ে বিধুশেখর ভট্টাচার্য তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত অশোকের অনুশাসনগুলির মূল পাঠ সংক্রান্ত গ্রন্থে কোন ব্যাখ্যা দেননি। জে ব্লক-ও তাঁর *Less incription d' Asoka* (প্যারিস ১৯৫০) গ্রন্থে বিশ্লেষণমূলক কোন যুক্তি পেশ করেননি—কেননা তা হলে এই অনুশাসনগুলি বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মোপদেশ বলে তিনি যে তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তা ক্ষতিগ্রস্ত হত। এইভাবে, গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি অনুবাদ-বহির্ভূত থেকে গেছে ('ইভ্য'), কিংবা সেগুলির উপর 'গৌণ ও দুর্বোধ্য' ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে; 'ভতময়েসু বম্ভ নিভেসু'-এর ভাষ্য করা হয়েছে 'serfs et nobles, brahmanes et bourgeois : en somme, les quatres castes'। শিলালিপি-১৩ তে 'আয়াত্রাপেয়ু ন চ হন্যেয়সু'-র অনুবাদ হয়েছে 'qu'ils se repentent et cessent de tuer'—যা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন পেশাদারী অসতর্কতা. ধৌলি-জৌগড় অনুশাসনের 'পলিকিলেসম' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'La torture' (পীড়ন), যদিও পালি অভিধানে এর যথাযথ প্রতিশব্দ দেওয়া আছে, 'শাস্তি'। পি. এইচ. এল. এগরমোন -এর *ক্রোনোলজি অব দি রেইন অব অশোক মৌর্য* (লাইডেন, ১৯৫৬)-তে কাল নির্ণয়ের এক সাহসী প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সঠিক ক্যান্টন নথি অনুযায়ী বুদ্ধের মৃত্যু ধরা হয়েছে ৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এবং অশোকের রাজ্যাভিষেক ২৬৮

৭. *জার্নাল অফ দি আর্কিওলজিকাল সার্ভে*, হায়দ্রাবাদ, খণ্ড-২।

৮. *অর্থশাস্ত্র*-র মূল পাঠের জন্য আমি আর. শ্যামশাস্ত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণ মহীশূর, ১৯২৪ খোঁজার পরিবর্তে মূলত নির্ভর করেছি টি. গণপতি শাস্ত্রী-র ত্রিবান্দ্রম থেকে প্রকাশিত ১৯২৩ ও তার পরবর্তী তিন খণ্ডের সংস্করণের ওপর (ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত সিরিজ নং ৭৯, ৮০, ৮২)। *অর্থশাস্ত্র*-র (মহীশূর, ১৯২৫) শব্দ-সূচির জন্য শ্যামশাস্ত্রীর খণ্ড তিনটি অপরিহার্য। অত্যন্ত মূল্যবান ২.১ অংশের জন্য ব্যবহার করেছি যোগ্নহম-এর ভাষ্যসহ পাতন জৈন ভাণ্ডার-এর তালপাতার পুঁথির অংশবিশেষের মুনি জিনবিজয় কর্তৃক সম্পাদিত ও মুদ্রিত (কিন্তু আপাতভাবে এখনও প্রকাশিত নয়) রচনা। মুনি জিনবিজয় অনুগ্রহ করে আমাকে মুদ্রিত ফর্মাগুলি উপহার দিয়েছেন। জে. জে. মেয়ার-এর প্রচলিত অনুবাদ *Das altindische Buch vom Welt-und Staatsleben* (লাইপজিগ ১৯২৬) গ্রন্থটিও অপরিহার্য বলে মনে হয়, যদিও সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়; তবে আর শ্যামশাস্ত্রীর (৩য় সংস্করণ, মহীশূর ১৯২৯) ইংরাজি অনুবাদের চেয়ে ভাল। এফ. ব্রেলোয়ের এর *Kautailya-Studien* (বন ১৯২৬, ১৯২৮)-র আরোপিত ও দুর্বোধ্য বিশ্লেষণগুলি আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় ও বিভ্রান্তিকর মনে হয়েছে—কেননা আইনের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সামাজিক উৎপাদনের প্রেক্ষিত পরিবর্তনের ওপর সেখানে কোন নজর দেওয়া হয়নি। অসতর্কতায় বাদ যেতে যেতে *অর্থশাস্ত্র*-র যে মূল পাঠ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সে সম্পর্কে আমার *জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি* ৭৮, ১৯৫৮, পৃ. ১৬৯-৭৩-এর লেখাটি দ্রষ্টব্য।

৯. ভারতের অন্যান্য বৃহৎ সেনাবাহিনী সম্পর্কে আই. টি. এম. ৩৪-এ প্লিনি-র যে উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্ভবত মেগাস্থিনিস থেকে উদ্ধৃত এবং নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না—যদিও প্লিনির সময় রাজত্বের সাথে সাথে এই ধরনের সেনাবাহিনীও সন্দেহাতীতভাবেই গড়ে উঠেছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী, পাণ্ড্যদের সঙ্গে গ্রীকরা সম্পর্কিত হয়েছিল কৃষ্ণ হেরাক্লেস-এর কন্যা পান্ডাইয়া-র সাহায্য—যাঁর গর্ভে তাঁর পিতা সন্তান এনেছিলেন দক্ষিণে বসবাস ও শাসন করার জন্য; অর্থাৎ, তা ছিল মাতৃতান্ত্রিক —যেমনটা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরেই ছিল।

১০. অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে খনির কাজ করা এবং আকরিক থেকে প্রাচীন নিদর্শনগুলি (এখনও কাল নির্ণয় করা যায়নি) তৈরির প্রমাণের জন্য দ্রষ্টব্য জে. এ. দুন : *মেমোয়ারস্ অফ দি জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া,* LXIX, পার্ট-১, ১৯৩৭ (পৃ. ৩, ৫৪-৫)।

অষ্টম অধ্যায়

বাণিজ্য ও আগ্রাসনের অন্তঃকাল

মৌর্য সাম্রাজ্য যখন অস্তগত, দেশের উত্তরাঞ্চল (দুই বৃহৎ নদীর অববাহিকা অঞ্চল, বঙ্গ বাদে) তখন বিদেশী আক্রমণকারীদের হাতে বিজিত ও ধারাবাহিক ভাবে শাসিত হতে লাগল; অন্যদিকে দক্ষিণের অধিকাংশ অঞ্চলই রয়ে গেল দেশীয় রাজাদের অধীন। এই পার্থক্যের মূল কারণ, বিদেশী অধিকৃত অংশগুলির অর্থনীতিতে ছিল লাঙ্গল-ব্যবহারকারী গ্রামগুলির প্রাধান্য। পূর্বতন শাসকদের আমলে সঞ্চিত উদ্বৃত্তই প্রধানত তারা লুঠ করেছিল। দক্ষিণে (মোটামুটিভাবে নর্মদা নদীর দক্ষিণাঞ্চলে) তখনও এই ধরনের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধহীন গ্রামের আবির্ভাব ঘটেনি। সেখানে প্রভাবশালী বণিক সঙ্ঘ ছিল এবং উদ্যোগী বনবাসীদের সঙ্গে বাণিজ্যও ছিল বেশ লাভজনক, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের কৃষি ব্যবস্থা মনে হয় প্রাক্ মৌর্যযুগের স্তরেই থেকে গিয়েছিল। বদ্ধ কোন গ্রাম-অর্থনীতিতে উৎপাদন পণ্য-উৎপাদন নয়। কার্যত স্বনির্ভর গ্রাম সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ হল মাথাপিছু পণ্য-উৎপাদন, অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের *ঘনত্ব* হ্রাস—যদিও সামগ্রিক উৎপাদনের বৃদ্ধি। এই সাধারণ তথ্যটিই সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণকে ব্যাখ্যা করতে পারে—যার বৈভব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভারতীয় গ্রাম বসতির বিকাশের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল।

৮.১ মৌর্য সেনাবাহিনী পদানত করেছিলে গোটা দেশকে। তাদের জাহাজগুলি গঙ্গামুখ থেকে সিন্ধুমুখ পর্যন্ত সমস্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছিল। ধর্ম প্রচারকরা এবং বাণিজ্য পৌঁছেছিল সিংহল, এশিয়া মাইনরে; এবং চীনে যাওয়ার অবস্থাতেও পৌঁছেছিল শীঘ্রই। এই সমস্ত সাফল্যের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল মূল উৎপাদন ক্ষমতার একক হিসেবে উত্তরে গ্রামগুলির বিকশিত হয়ে ওঠা। মুক্ত শ্রমের চেয়ে গ্রীক বা রোমান ব্যবস্থার মতো কোন দাসত্বপ্রথা ভারতীয় উৎপাদনে কখনই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। পিতৃতান্ত্রিক বৃহৎ পরিবারগুলি রোমান ভিলা অর্থাৎ সামন্ত মহাল বা ব্রাজিলীয় 'কাসা গ্রান্ডে এ সেঞ্জালা'-র মতো

উপনিবেশ ধরনের ছিল না। মৌর্যযুগে সবচেয়ে বেশি বসতি স্থাপিত হয়েছিল গঙ্গা ও সিন্ধু তীরবর্তী পাললিক সমভূমিতে। ঘন অরণ্য আচ্ছাদিত বঙ্গ ও আসাম এবং সমুদ্র উপকূল বরাবর দীর্ঘ ভূখণ্ড তখনও উন্মুক্ত হয়নি। এই অঞ্চলগুলিতে তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হত এবং মগধ থেকে যে লোহা আসত তা ছিল অপ্রতুল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বৈশ্য রাজ্যপাল পুষ্যগুপ্ত জলাধার নির্মাণের জন্য জুনাগড়ের কাছে একটি বড় বাঁধ তৈরির কাজ শুরু করেন এবং জলাধারটি পরবর্তী প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত টিকে ছিল; তবু এখানে প্রত্যন্ত দক্ষিণের সঙ্গে তুলনীয় কিছু আমরা পাই না। উত্তরের বন্য আতবিক অধ্যুষিত ছোট ছোট অঞ্চলগুলি লাঙ্গলের প্রভাবে হ্রাস পেতে পেতে খাদ্য সংগ্রাহক এলাকায় পরিণত হয়েছিল। *অর্থশাস্ত্র*-এর সুপারিশ মতো (১৩.৩) খুব বেশিদিন আর বনবাসীদের অতর্কিতে আক্রমণ বা বিষাক্ত মদ খাইয়ে হত্যা করার প্রয়োজন ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজারা যদি তাদের সেনাবাহিনীর সহায়ক হিসেবে এদের নিয়োগ করে, অবরোধ চূর্ণ করা বা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ঘুষ খাইয়ে থাকে (*অর্থশাস্ত্র*-এ যেমন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে)—সেটাও তাহলে এদের খাদ্য সংগ্রহ ভিত্তিক আর্থব্যবস্থার অবসানে সাহায্য করেছিল। নব্য ব্যবস্থায় প্রধান প্রতিনিধি হিসেব তাদের সর্দাররা আকস্মিকই জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত এক নতুন ধরনের সম্পত্তির অধিকারী হয়ে রাজায় রূপান্তরিত হল এবং লাঙ্গল চালিত কৃষি ও নিয়মিত করের সাথে সাথে গ্রাম বসতিরও বিস্তার ঘটাতে লাগল। সমাজের সাথে আন্তঃক্রিয়ায় আসা উপজাতিগুলি টিকে থাকল কেবলমাত্র বর্ণ হিসেবে। উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সমাজে যারা যত দেরিতে এল অর্থনৈতিক এবং সেইসূত্রে সামাজিক মানদণ্ডে তাদের স্থান হল তত নীচে। নতুন গ্রাম বসতি গড়ে তোলার পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল। যেহেতু বনভূমি উচ্ছেদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাই গড় জোগানও কমে এল (যদিও কিছুটা উন্নত কৃষি পদ্ধতির কারণে এই ক্ষতি পুষিয়ে যাচ্ছিল)। উত্তরাঞ্চলের সমতল ভূমিতে খাদ্য-উৎপাদক ও খাদ্য-সংগ্রাহক উভয়ের জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান ছিল না। দক্ষিণাঞ্চলের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেননা সেখানে নিবিড় চাষপদ্ধতি ছিল অসম্ভব। কৃষি-ভিত্তিক বসতি, যা দাক্ষিণাত্যে বড়জোর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট এলাকায় গড়ে উঠেছিল—তাও প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল মৌর্য যুগের পরে। সেখানে, বিশাল বিশাল পাহাড়ী বনভূমির দ্বারা বিঘ্নিত জনবিরল বাণিজ্যপথগুলি ছিল মৌর্যদের অধিকারে। মহীশূরের দক্ষিণে যে কোন বিজয় অভিযান পরিত্যাগ করতে হচ্ছিল। দখল সম্পন্ন হয়েছিল বৃহৎ প্রস্তরযুগের সংস্কৃতিসম্পন্ন আদিবাসীদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য ঘাঁটি গেড়ে বসার পর।

উৎপাদন-উপায়ের ক্ষেত্রে মূল পার্থক্য অর্থাৎ দীর্ঘ স্থাপিত ও নবোদ্ভূত গ্রামবসতিগুলির মধ্যেকার তফাৎ প্রতিফলিত হয়েছে দুই প্রধান অংশের ভিন্ন রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে। ধর্ম এবং বর্ণের ভূমিকাও ছিল ভিন্নতর—যদিও সারা দেশে গ্রাম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যেই একটা সংহতি প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। স্বনির্ভর গ্রামগুলিতে শ্রেণীসংঘের মতো প্রাচীন উৎপাদন -এককগুলির কোন ভূমিকা না থাকলেও—উত্তরে তা সঙ্কুচিত হতে হতে নগণ্য হয়ে পড়ার পর দক্ষিণে ক্রমশই স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হচ্ছিল।

অর্থশাস্ত্র যেমন প্রাক্-অশোক যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক রচনা, তেমনি এই পর্বের বৈশিষ্ট সূচক রচনা হল বাৎস্যায়ণের বিখ্যাত *কামসূত্র* (এবং তা *অর্থশাস্ত্র*-র আদর্শের উপর ভিত্তি করেই নিপুণভাবে রচিত)। এটিই আপাতভাবে বিশ্বের প্রথম গ্রন্থ যেখানে যৌন প্রবৃত্তিকে

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করা হয়েছে এবং তা শুধু ব্যক্তিগত স্তরে নয় বরং সেইসঙ্গে এক সমাজবিজ্ঞান হিসাবেও। এক অর্থে, বৌদ্ধ সন্ন্যাস ব্রতের যে ঐতিহ্য একটা সভ্য প্রভাব হিসেবে গ্রামাঞ্চলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এটি ছিল তারই পরিপূরক। স্বাভাবিকভাবেই এটি লেখা হয়েছিল নব্য অভিজাত অর্থাৎ 'নাগরক' বা নগর সংলগ্ন মানুষদের জন্য—যাদের অস্তিত্বই প্রমাণ করে তাদের আয়ের উৎস এবং পর্যাপ্ত অবসরের, এবং সেইসঙ্গে যেখানে এই নব্য শ্রেণী তার রুচির বিকাশ ঘটাতে পারে তেমন অজস্র নগরীরও। এদের আমোদ-প্রমোদ বলতে বোঝাত সমস্ত ধরনের সুসংস্কৃত আচার-আচরণ—যার মধ্যে শুদ্ধ যৌন উপভোগও অসঙ্কোচে ও খোলাখুলিভাবে স্থান পেয়েছিল। দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল আদ্যন্ত বস্তুবাদী, কিন্তু কখনই স্থূল নয়। সমাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল (*কামসূত্র* ১.৪.২৭) যেন জ্ঞানদায়িনীর মন্দিরের এক নীরস সভার মতো। একটা নতুন সংঘ—অত্যন্ত মার্জিতরুচি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বারাঙ্গনাদের নিয়ে গঠিত সমিতির মতো—গড়ে তোলাটা একটা কেতায় পরিণত হল (যেমন ছিল পেরিক্লিন এথেন্সে); *কামসূত্র*-এর 'গোষ্ঠী' (১.৪.৩৪) শব্দটি পরবর্তীকালে সাধারণ সমিতি অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ণীয় বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরেও এই নতুন শ্রেণীর গোষ্ঠী-জীবন উপভোগের জন্য অজস্র উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল (*কামসূত্র*, ১.৪.৮২)। তার কয়েকটি *জাতকের* (১১৮, ১৪৭) আধা শাস্ত্রীয় পৌর 'নক্কহট্ট-কিলা' আচারের কথা মনে করিয়ে দেয়—যা প্রতিটি দম্পতিকেই পালন করতে হত। সংস্কৃতিসম্পন্ন নাগরিকরা গ্রামে গেলে নগরজীবনের রুচিকর অর্জনগুলিকে এমনভাবে প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করতে হত যাতে গ্রামের বুদ্ধিমান মানুষেরা পুরোপুরি সংস্কৃতে বা পুরোপুরি গ্রামীন কথ্য ভাষায় আলোচনা না করলেও তা বুঝতে পারত। এ সব কিছুর মধ্যেই, উপযুক্ত বধূ নির্বাচনের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়নি; তাছাড়া, যৌন ক্রিয়ার জটিল অনুষঙ্গগুলির আনুপূর্বিক বিবরণ থাকায় গ্রন্থটি বেশ কিছু ভক্ত পাঠক পেয়েছে (এবং অন্যায়ভাবে সন্নিবেশিত কিছু অংশও) —যা *অর্থশাস্ত্র* পায়নি। এর রচনাকাল উল্লেখ করতে গিয়ে আবছাভাবে একজন চোল শাসকের কথা বলা হয়েছে এবং বর্ণিত উন্মত্ত কামলীলার কর্তা হলেন রাজা কুন্তল শাতকর্ণী।

এই আমলের কোন তর্কাতীত কালপঞ্জি[১] স্থির করে দেওয়াটা এখনও কঠিন, সুতরাং রাজাদের নাম ও তাদের আনুমানিক শাসনকালের দিকে দৃষ্টি দেওয়াটা কাজের হবে। অশোকের মৃত্যুর অব্যবহতি পরেই দাক্ষিণাত্যে অভ্যুদয় ঘটে শাতবাহন (বা শাতকনি, সংস্কৃতে শাতবাহন, শালিবাহন ও শাতকর্ণি) রাজবংশের। এদের মূল উৎপত্তিস্থল হতে পারে বর্তমান বেল্লারি জেলার কাছাকাছি, কিন্তু রাজত্বের শেষ গৌরবের দিনগুলিতে অন্ধ্র অঞ্চলের সঙ্গে এরা সংশ্লিষ্ট ছিল। শাতবাহন পর্বের ভূস্তর-ই (অর্থাৎ চাকার আকৃতির মাটির বাসনপত্রের সন্ধান) হল দক্ষিণের সভ্যতাগুলির প্রথম সুস্পষ্ট নিদর্শন, যদিও প্রাক-মৌর্য বৈশিষ্ট্যগুলি আরও কিছুকাল বজায় ছিল; শাতবাহন রাজত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সেগুলির বিলোপ ঘটে। শাতবাহন স্তরের রোমান পণ্যসামগ্রীর (কোল্হাপুরে, করহাদে এবং পণ্ডিচেরির কাছে পাওয়া গেছে) নিদর্শন থেকে আমরা নির্ধারণ[২] করতে পারি যে বিলাস দ্রব্যের বাণিজ্যের গুরুত্ব ও পরিসর কত বিরাট ছিল এবং তা *পেরিপ্লাস*-এর বিবরণের যাথার্থ্যও প্রমাণ করে। চাকার আকৃতির মৃৎপাত্র ছিল ৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী পর্বে কৃত অ্যারেটাইন মৃৎশিল্পের নকল। কমোডাস-এর মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধের টালমাটালের মধ্য দিয়ে অ্যান্টোনিনেস-এর যুগের যখন অবসান ঘটল, শাতবাহন রাজত্বেরও তখন থেকে পতন শুরু হল। এই রাজত্বে গ্রামীণ কৃষির

যথেষ্ট বিকাশ হলেও তা ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। টলেমি-র রাজা সিরো-টলমাইওস এবং বাসিথিপুত সিরি পুলুমাই—একই ব্যক্তি বলে মনে করা হয়।[৩]

শাতকনি নামটি সম্ভবত একটি আদিবাসী নাম। এর মৌলগুলি[৪] হল দুটি ইন্দো-অস্ট্রিক শব্দ: শাদ (Sada) = অশ্ব এবং কোন্ (Kon) = পুত্র — যা ইঙ্গিত দেয় কোন অনার্য অশ্ব টোটেমের। এই উদ্ভব কোন প্রাগার্য যুগের ইঙ্গিতবাহী নয়, কেননা অশ্ব—শাতবাহনদের অজস্র মুদ্রায় যার ছাপ আছে—তা ভারতবর্ষে প্রচলন করেছিল আর্যরাই। এই রাজবংশটি *সুত্তনিপাত* (৯৭৭)-র অস্সক বংশ হতে পারে। 'শাত' শব্দটির সঠিক সংস্কৃতরূপ হল 'শপ্তি' (অশ্ব)—যা প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালের একটি *পুরান*-এ ব্যবহৃত হয়েছে। শপ্তিকর্ণ-টা মনে হয় কোন ভগ্ন-টোটেম, 'অশ্ব-কর্ণ'। যাই হোক, 'কর্ণ' এবং 'বাহন' — এই দুটি পদই 'উপজাত' অর্থটি বহন করে — যা থেকে মনে করা যেতে পারে যে এই মানুষগুলি ছিল অশোকের সতিয়পুতদেরই মতো। এই রাজারা অবশ্য যজ্ঞ করতেন এবং বৌদ্ধদের মতো ব্রাহ্মণদেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এদের মধ্যে অন্তত একজন নিজেকে 'অনন্য ব্রাহ্মণ' বলে দাবি করেছেন—যা থেকে বোঝা যায় উপজাতিক দক্ষিণে শ্রেণীকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরোহিততন্ত্র কীভাবে সহায়ক হয়েছিল। একইভাবে, ব্রাহ্মণ্য *পুরাণ*-গুলির ওপর শাতবাহন বাণিজ্যের প্রভাব বোঝা যায় সেগুলির অসামান্য ভৌগোলিক জ্ঞান থেকে —যা এক কল্পিত অঞ্চলের দেব-দেবীর বর্ণনার নীচে ঢাকা দেওয়া রয়েছে। জে এইচ স্পিক যখন প্রথম নীলনদের উৎস খুঁজে বের করেন তখন তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন বোম্বাইয়ের লেফটেনান্ট উইলফোর্ড[৫] কর্তৃক *পুরাণ* থেকে আঁকা একটি মানচিত্র—যা আফ্রিকার অভ্যন্তরের স্থানিক নামগুলি বিস্ময়কর রকমের নিখুঁতভাবে খুঁজে পেতে তাঁকে সাহায্য করেছিল। পরে অবশ্য উইলফোর্ড, লক্ষ্যণীয় মিলগুলির কারণ ব্যাখ্যা না করেই এটি তাঁর পণ্ডিতের জালিয়াতি বলে বাতিল করে দিয়েছিলেন (*এশিয়াটিক রিসার্চেস*, ১৮০৫)। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মূল ভৌগোলিক পুঁথিগুলি রয়ে গেছে; তারই একটি, প্রধান আকর হিসেবে কাজ করেছে টলেমির *জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া* রচনায় এবং *ব্রহ্মা-পুরাণ* রচনাতেও (ই. এইচ. জনস্টোন, *জার্নাল অফ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসায়টি অফ লণ্ডন*, ১৯৪১, ২১৩-২২২)। কিন্তু *পুরাণ*-এর ভূগোলের সঙ্গে স্পষ্টভাবে বর্ণিত চীনা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা তার চেয়েও স্পষ্ট আরব পর্যটকদের বর্ণনার দুঃখজনক অমিল আছে। নথিভুক্তির সম্মতি পাওয়ার আগে কোন স্থানকে ব্রাহ্মণদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করাতে হত; তারপর নাম ঘুরিয়ে, অতিকথার আস্তরণে মুড়ে তবেই তার উল্লেখ চলত। এই ধরনের তীর্থের সন্ধানে ভারতীয়রা (নানা যুগে) আসাম বা দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলে জঙ্গলেই শুধু ঘুড়ে বেড়ায়নি, বাকুতে প্রাকৃতিক গ্যাসের অগ্নিশিখার পূজোও করেছে। শাতবাহন পর্বে এই আবিষ্কারের প্রেরণা চরমে পৌঁছেছিল, কিন্তু গ্রাম সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্থবির মানসিকতাও বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রশমিত হয়। কেবলমাত্র তীর্থদর্শন বা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ভ্রমণের ক্ষেত্রেই পূর্ণ-বিকশিত 'হিন্দুধর্ম' নিরুৎসাহিত করেনি।

শাতবাহন বংশের গোড়ার দিকের রাজাদের প্রায় সমসাময়িক এক রাজবংশের তৃতীয় রাজা খারবেলা-র ১৭-লাইনের একটি খোদাই লিপি (দুর্ভাগ্যবশত এখন তা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত) পাওয়া গেছে মহানদী অঞ্চলে —যা তখন সবেমাত্র অশোকের প্রভাবাধীনে এসেছে। এই রাজা এমনিতে অখ্যাত হলেও, মগধ, পাণ্ড্য এবং শাতকনি অঞ্চল সমেত ভারতবর্ষের একটা বিস্তীর্ণ অংশে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জৈন, কিন্তু তাঁর ধর্ম সামরিক উন্নতি লাভের পথে বৌদ্ধ

ধর্মাবলম্বী হর্ষবর্ধনকে বা চেঙ্গিস খাঁকে যতটা বাধা প্রাপ্ত করেছিল তার চেয়ে বেশি কিছু করেনি। এই সমস্ত অহিংস ধর্মগুলি কখনই বড় বড় যুদ্ধকে রোধ করেনি, কেন না সে যুদ্ধগুলির পিছনে ছিল গভীর অর্থনৈতিক কারণ। মগধের রাজা নন্দ (১০৩ কিংবা ৩০০ বছর আগে) কর্তৃক বিজিত জৈন ধ্বংসাবশেষ মগধরাজ বহসতিমিত (সম্ভবত শূঙ্গ বৃহস্পতি-মিত্র, বা পুষ্যমিত্র)-এর কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করা সমেত সামরিক কৃতিত্বগুলি ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন সেইসঙ্গে অসংখ্য জৈন 'অরহত' ও ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোটাও। মন্দির নির্মাণ ও শতাধিক গুহা খননের (যার অনেকগুলিই খুঁজে পাওয়া গেছে) কথা উল্লেখ করা হয়। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে প্রতিটি পূর্ত কাজের জন্য লক্ষ লক্ষ পণ খরচ করে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা হত; মুদ্রায় খাদ মেশানো হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু খরচের পরিমাণটাও ছিল বিপুল। এই খোদাই লিপির পাঠ ও ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই (আমি অনুসরণ করেছি বি. এম. বরুয়া-র *ওল্ড ব্রাহ্মী ইনসক্রিপসনস্ অব দি উদয়গিরি অ্যান্ড খণ্ডগিরি কেভস,* কলকাতা, ১৯২৯ গ্রন্থটি) কিন্তু এতে বর্ণিত সম্ভবত সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক কাজটা হল তোসালি (?) রোড থেকে পুরনো একটি খাল বহু অর্থব্যয়ে সম্প্রসারণ। এই খালটি প্রথমে কেটেছিলেন রাজা নন্দ, যা থেকে প্রমাণ হয় যে এমনকী অশোক বা মৌর্যদের আগে মগধের রাজারাও কলিঙ্গের দিকে নিয়মিত বসতির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু খারবেলা এই 'আবদ্ধ জলাশয়' (তিমির-দহ)-টিকে তার উৎপত্তির ১১৩ বছর পর যুক্ত করেছিলেন লাঙ্গল নদীর সঙ্গে; জলাধার ও নদী বাঁধের ব্যাপক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্প্রসারণ থেকেও বোঝা যায় যে কলিঙ্গ অঞ্চলে নিয়মিত চাষবাস তখন শুরু হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই রাজার স্মৃতি এখন পুরোপুরি বিলুপ্ত।

খারবেলা-র মগধ আক্রমণ ঘটেছিল নিশ্চিতই প্রথম শূঙ্গ সম্রাট পুষ্যমিত্রের আমলে—যিনি শেষ মৌর্য সম্রাটকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন, কিন্তু সমগ্র সাম্রাজ্যকে শাসন করতে পারেননি। এই বংশটি মৌর্যদের অধীনে উজ্জয়িনী বা পার্শ্ববর্তী বিদিশায় শাসন কার্য চালাত। শূঙ্গ নামটি হল একটি স্বীকৃত ব্রাহ্মণ (ভরদ্বাজ) গোত্র এবং তা থেকে প্রমাণ করা হয়েছে যে এটি ছিল একটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ। এটা কিছুটা অদ্ভুত মনে হয়। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদেরও সেই সময় গোত্র ছিল। তৎকালীন ব্যাপক বাণিজ্য, অভিবাসন, আক্রমণ এবং নতুন নতুন মানুষকে গোষ্ঠীভুক্ত করে নেওয়া—এ সবেরই অর্থ হল পুরনো গোত্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছিল, অবশ্য কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছাড়া —যাদের গঠনটা রক্ষণশীলই রয়ে গিয়েছিল। আবার ব্রাহ্মণদের আর্য গোষ্ঠীতে গ্রহণ করে নেওয়ার যে পুরনো বৈদিক প্রথা—তা থেকে বোঝা যায় যে নতুন গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল; সাধারণভাবে এগুলি ছিল সেই সমস্ত উপজাতিক প্রধানদের গোত্রেরই অনুরূপ যাদের বলিদানে ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করত। এখন, অনার্য দলপতি ও বণিকদের জয় করার লক্ষ্যে শাসনকে দক্ষতার সঙ্গে সংহত করে নেওয়া হল যাতে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদেরও তাদের কুল পুরোহিতের গোত্রে নিয়ে নেওয়া যায় (*ব্রাউ,* ১৯৫-৬)। শেষ শূঙ্গ রাজার কুল পুরোহিত ছিলেন, জনৈক কম্বায়ন (ইনিও ভরদ্বাজ গোত্রভুক্ত)। সুতরাং শূঙ্গ নামটি হল একটি কৌম-নাম, কোন পুরোহিতের নাম নয় এবং তা ক্ষত্রিয় হওয়াও সম্ভব। গোতমিপুত সিরি শতকনি-র মতো মায়ের গোত্র নাম উল্লেখ করার যে শাতবাহন প্রথা—হতে পারে তা মাতৃতান্ত্রিকতার ইঙ্গিত কিংবা তার অবশেষ, কিন্তু সেটাই একমাত্র ব্যাখ্যা নয়—কেননা বহুবিবাহ প্রথার কারণেও তা হতে পারে। মাতৃবংশের নাম ব্যবহার করাটা পুত্রকে তার বৈমাত্রেয়দের

থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করায় সাহায্য করত এবং একই সঙ্গে পিতৃ-মাতৃ উভয় বংশেরই আভিজাত্য প্রকাশ করত।

শুঙ্গ রাজারা একটি বিলুপ্ত ধর্মীয় আচারকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন—তা হল প্রাচীন বৈদিক অশ্ববলিদান[৬]। পুষ্যমিত্রের ক্ষেত্রে মনে হয় এটা নিশ্চিতই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল—কেননা তাঁর অন্যায়ভাবে দখলীকৃত সাম্রাজ্যের ওপর নতুন আক্রমণকারীরা ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। যাইহোক, অশোকের ধর্মকে হেয় করেছিলেন বলে কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা দেওয়া হয়েছিল তা থেকে বোঝা যায় যে খুব বেশি হলে তিনি নিষিদ্ধ প্রথাগুলিকে আবার চালু করার কাজে ব্রাহ্মণদের মদত যুগিয়েছিলেন। ভারহিউত-এর চমৎকার বৌদ্ধ কাঠামোগুলি এবং সাঁচীরও বেশ কয়েকটি নির্মিত হয়েছিল শুঙ্গ রাজাদের আমলে। অশ্ববলির প্রথা কোন কাজে আসেনি— কেননা উজ্জয়িনীর বাণিজ্যপথ ধরে যবন শুঙ্গ রাজত্বের অনেক ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন। গ্রীকরা যে সাকেত অবরোধ করেছিল এবং সম্ভবত পাটনা পর্যন্ত ঢুকে এসেছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিক্ষিপ্ত কিছু সূত্র থেকে। এই সুনির্দিষ্ট যবন হলেন সম্ভবত ইউথিদেমোস-এর সবচেয়ে সফল বংশধর মেনন্দর—যিনি ছিলেন বিস্তীর্ণ কিন্তু পরিবর্তমান ভূখণ্ডের স্বল্পস্থায়ী শাসক। ইউথিদেমোস-এর পুত্র দেমেত্রিওস-ও 'ভারত জয়' করেছিলেন—তবে আলেকজাণ্ডারের মতো অতখানি নয়। মহান অ্যান্টিওকাস-কে ভারত জয়ের তৃপ্তি লাভ করতে হয়েছিল 'ভারতীয়দের রাজা' সুভগসেনার কাছ থেকে উপঢৌকন পেয়ে। সুভগসেনা ছিলেন শুধুমাত্র কাবুল উপত্যকায় মৌর্য প্রদেশের শাসক। মেনন্দার হলেন *মিলিন্দপনহ* (= 'রাজা মিলিন্দ্-র প্রশ্নাবলী') পুঁথিতে বর্ণিত সাগলের রাজা মিলিন্দ। পালি ভাষায় রচিত এই বৌদ্ধ পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয় সিংহলে এবং শুধুমাত্র এতেই (উদ্ধৃতি সহ), শিক্ষিত ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি রক্ষিত হয়ে আছে। তাঁর রাজধানী, অধুনা শিয়ালকোট, ছিল আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে এবং তারও আগে তা ছিল মদ্রদের প্রধান কেন্দ্র (*মহাভারত* ২.২৮.১৩; *জাতক* ৪৬৪)। এই নির্দিষ্ট বংশধারার আক্রমণকারীরা ধ্বংস হয়েছিল ৭৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ—আগে থেকেই সিন্ধুর ব-দ্বীপ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে থাকা শকেদের হাতে। ইতিমধ্যে ইউথিডেমিড-রা তাঁদের মূল ব্যাকট্রিয়ান রাজত্ব খুইয়ে ফেলেছিলেন ইউক্রেটাইডস ও তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে—যাঁরা আবার ঠেলা খেয়ে ঢুকে পড়েছিলেন অসুখী সিন্ধু উপত্যকায়। তাঁদের পরে পরে এসেছিলেন শকরাজ মউয়েস, আজেস এবং অন্যরা। এই মিছিলের সব শেষে এসেছিলেন কুষাণেরা; ব্যাকট্রিয়া জয় করার পর তাঁরা দখল করেন কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল। এই দখলদারিটা ছিল অনেক বেশি স্থায়ী। ৭৮ খৃষ্টাব্দে কণিষ্কের রাজ্যভিষেকের মধ্য দিয়ে কুষাণ সাম্রাজ্যের পূর্ণ পত্তনের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয়—কিন্তু এই সালটি নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। ৭৮ খৃষ্টাব্দে শালিবাহন শক রাজত্ব তখনও টিকে ছিল বলে অনেকের ধারণা। কুষাণেরা মেনান্দার বা তাঁদের পূর্ববর্তী যে কোন আক্রমণকারীদের চেয়ে অনেক সফলভাবে ভারতীয় ধারা গ্রহণ করেছিলেন—তাঁদের মুদ্রায় বুদ্ধ বা শিব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তির ছাপ মেরে। তাঁদের বিশাল স্তূপগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে চীনা পর্যটকদের এবং একাদশ শতকে আলবিরুনির বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। স্বাভাবিক অবক্ষয় সত্ত্বেও তাঁদের সাম্রাজ্য বাসুদেব (প্রায় ২৩০ খৃষ্টাব্দ)-এর সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল—যা, মনে হয়, বাকি অঞ্চলের ওপর বিচ্ছিন্ন আক্রমণ চালানোর পরিবর্তে নিয়মিত উদ্বৃত্ত আদায়ের উন্নত

পদ্ধতির কারণেই ঘটেছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে, সম্ভবত তখনও পর্যন্ত স্মরণে থাকা একাইমেনিড ও পারসিক-গ্রীক আদর্শ অনুসরণ করেই। পারসিক প্রদেশকর্তারা অভিজাত হলেও, কার্যত ছিলেন রাজাধিরাজের দাস (বন্ধক) এবং স্বৈর-নৃপতির ইচ্ছামতো তাঁদের সরিয়ে আনা বা বিনা বিচারে শাস্তি দিয়ে দেওয়া যেত। ভারতীয় প্রদেশ-কর্তা—যেমন হগাণ, হগামাষ (এ দুটি শব্দই ইহুদি ধ্বনি যুক্ত), মথুরায় রাজুল—এদের সর্বময় কর্তা কে ছিলেন তা সব সময় স্পষ্ট নয়। কুষাণ প্রদেশ-কর্তারা পূর্ণ ক্ষমতাব অধিকারী ছিলেন; বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার এবং সেইসঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজন্ উপাধিও তাঁরা গ্রহণ করেছেন। সারনাথে চতুর্থ কুষাণদের খোদাই লিপিতে বনষ্পর ও খরপল্লানকে 'প্রাদেশিক মহাশাসক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রুদ্রদমন (১৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের)সমেত কাস্তন-এর স্কিথিয় বংশীয়রা রাজা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রদেশ-শাসক থাকাকালীন নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। অধীনতার নিদর্শনস্বরূপ কি কর তাঁরা দিতেন তা জানা যায়নি, কিন্তু উপাধির মধ্যে একটা করদ নিহিতার্থ থেকে গেছে। খকহরাত নহপায়নও নিজেকে উজ্জয়িনীর প্রদেশ কর্তা ও রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোতমিপুত্র শাতকনির কাছে ইনি পরাস্ত হন। গোতমিপুতর পুত্র (?) বাসিথিপুত পুলুমাই রুদ্রদমনের সঙ্গে দুবার যুদ্ধ করেন ও হেরে যান। সম বর্ণ, জাতি, উপজাতিক, বা ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও ইনি বা অন্য এক বাসিথিপুত শাতকর্ণি ছিলেন রুদ্রদমনের জামাতা।

দক্ষিণে শাতবাহন ও উত্তরে কুষাণ বংশের রাজত্ব স্থিতিশীল হওয়ার মধ্য দিয়েই যে এই যুগটির অবসান ঘটেছিল তা নয়। তেমনটাই ঘটত যদি তা নিছকই প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন গ্রামগুলির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাজত্বগুলিকে উচ্ছেদের ব্যাপারই হত। বাণিজ্যের উৎসাহ-উদ্দীপনায় বন্য বা অনুন্নত অঞ্চলগুলির বিভিন্ন অংশে অসংখ্য স্থানীয় রাজবংশ গজিয়ে উঠেছিল (এফ. ই. পারজিটার, অক্সফোর্ড ১৯১৩ ; আর সি হাজরা, ঢাকা, ১৯৪০)। কমপক্ষে চারজন নাগ রাজা হয়েছিলেন। নাম থেকে মনে হয় সাতজন গর্দভীল ছিলেন ভীল উপজাতির—যাদের স্বল্প সংখ্যক টিকে থাকা মানুষগুলি আজও পর্যন্ত খাদ্য-সংগ্রাহকের স্তর থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। তেরোজন পুষ্যমিত্র (বা পুষ্পমিত্র) পরিচিত শুধু তাদের বর্গনামে; হুন ও হারহুনরা ছিল আপাতভাবে শ্বেত হুন (এফথালাইটিস)। পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ স্কন্ধগুপ্ত প্রথম উপজাতিটিকে বিধ্বস্ত করলেও শেষেরটির ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধায় পড়েছিলেন। (দশজন) আভির রাজাদের উৎপত্তি ঘটেছিল উপজাতি হানাদারদের মধ্যে থেকে—পরে যারা আহির পশুপালক জাতে রূপান্তরিত হয়। আভির রাজা ও সেনাপতিদের অস্তিত্বের সমর্থন রয়েছে খোদাই লিপিগুলিতেও (ল্যুডারস ১১৩৭; ৯৬৩)। এই উপজাতিটি (মহাভারত, ২.২৯.৯) পরে প্রত্যেকের নিজস্ব গ্রাম ও নিজস্ব গবাদি পশুর মধ্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে ম্লান হয়ে আসে। এদের চিহ্ন এখনও পাওয়া যায় ইউ পি-র আহির গ্রামগুলিতে—অন্তর্বিবাহে যুক্ত আহির শাখা-প্রশাখার অসংখ্য সম্বন্ধহীন জাতগুলির মধ্যে (আর এনথোভেন, *ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস্ অফ বোম্বে*, ৩ খণ্ড বোম্বাই ১৯২০-২২-এর ১(১২), ৩৪, ২৬৩, ৩১৩, ৩৬৮, ২.২৪৫ ২৭৫ ইত্যাদি; সম্ভবত ১.২৬৪, ২.৪০৬-এ ও), এবং নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষায় আভিরি শব্দ প্রয়োগের মধ্যে। এদের সঙ্গেই উত্থান ঘটেছিল যৌধেয়দের মতো কিছু উপজাতির—রুদ্রদমন যাদের 'নিশ্চিহ্ন' করলেও দুই শতাব্দী বা আরও অনেক পরে যারা নিজেদের মুদ্রা প্রচলন করতে পেরেছিল। শতদ্রু নদীর

দক্ষিণ তীরে বহাওয়ালপুরের বর্তমান জোহিয়া-রা মনে হয় এদেরই বংশোদ্ভূত। একই সময়কালে সুদূর দক্ষিণে জন্ম হয়েছিল তিনটি রাজ্যের ঃ মালাবারে চের, উপদ্বীপের সংকীর্ণ প্রান্তে পান্ড্য এবং দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে চোল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী নাগাদ সেগুলিতে গ্রামীণ বসতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, নিজস্ব গাথা (সঙ্গম আমলে), বৌদ্ধ মঠ—এ সব ছিল। অতঃপর, নতুন কোন 'সর্বব্যাপী সাম্রাজ্য' বিস্তারের জন্য প্রয়োজন ছিল মৌর্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কোন বিজয় অভিযান চালানো।

প্রতিদ্বন্দ্বী উপজাতি, রাজা ও আক্রমণকারীদের এই হিন্দোল থেকে প্রমাণ হয় যে নবোদ্ভূত গ্রামগুলিই যুধ্যমান সেনাবাহিনীগুলির ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উদ্বৃত্ত যোগাত। এটা ঐ সমস্ত গ্রাম-মালিকদের আরো বেশি উচ্চাকাঙ্খী করে তোলে। আগে এক সময়, হয়ত পুরনো বসতি থেকে উচ্ছেদ হয়ে কিংবা বিভিন্ন উপজাতির বিচিত্র উপাদান নিয়ে যেসব নতুন উপজাতি গড়ে উঠেছিল—তারা এখন খাদ্য-উৎপাদক 'গণ'-এ রূপান্তরিত হল। এদের মধ্যে মালব গণ-রা একটা নতুন অব্দ প্রতিষ্ঠা করেছিল—আপাতভাবে যা ৫৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে শুরু হওয়া বিক্রম বা কৃত অব্দেরই অনুরূপ; এবং প্রচলিত লোককাহিনী[৭] যদি কোন নির্দেশক হয় তাহলে উজ্জয়িনীর রাজা শেষ গর্দভীল-এর হত্যাকারী শাহানুশাহী আক্রমণকারীদের সঙ্গে তা সম্পর্কযুক্ত। এই উপজাতিরাও (যৌধেয়দের মতো) ছিল ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষক; এই পৃষ্ঠপোষকতাই অব্দটির চালু থাকায় ও তার অতিমানব প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমকে এক সর্বজনীন 'চক্রবর্তিন' সম্রাটে পরিণত করায় সহায়ক হয়েছে। তাঁর কোন মুদ্রা বা খোদিত লিপি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি, পুরাণগুলিতেও তাঁর কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু পুরাণের তালিকাগুলি শূন্যগর্ভ হয়ে পড়ে যেহেতু সদ্য উল্লিখিত রাজবংশগুলি ক্রমশঃই মুদ্রাতত্ত্বের সমর্থন পাচ্ছে এবং মুদ্রাগুলির সন্ধান-ক্ষেত্র থেকেও রাজত্বের এলাকা সম্পর্কে কিছু ধ্যানধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

৮.২ ধর্মের প্রশ্নটা, এমনকী কোন রাজবংশের ইতিহাস বিশ্লেষণেও, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরো খুঁটিয়ে তা পরীক্ষা করা দরকার। ভারতবর্ষকে পশ্চাদপদ করে রেখেছিল বলে কুসংস্কারের ভূমিকার নিন্দা করার সময় কখনই ভুলে গেলে চলবে না যে সভ্যতার আবাহনে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে পুরোহিতদের ধর্মীয় ক্রিয়াচার ও যাদু-ও সহায়ক হয়েছিল। শ্রেণী-কাঠামো দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের বিশ্বাসগুলি শৃঙ্খলে পরিণত হয়। প্রথম ঋগবৈদিক দ্বি-বর্ণ ব্যবস্থার ফলেই সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলের বাইরে অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। আর্য যজুর্বৈদিক উপজাতিগুলির অভ্যন্তরে বিকশিত হওয়া চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা ভিত্তি স্থাপন করেছিল এক শ্রেণী-সমাজের—যা পরস্পরের প্রতিবন্ধক যুদ্ধরত উপজাতিগুলির চেয়ে ছিল অনেক বেশি প্রগতিশীল। গ্রীকরা আমাদের ব্রাহ্মণদের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন (স্ট্রাবো ; মেগাস্থিনিস ৫৯) ; 'ভৌত প্রপঞ্চগুলি সম্পর্কে তাদের ধ্যানধারণা খুবই স্থূল—কেননা, যেহেতু তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে নীতিগল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই যুক্তিবিচারের চেয়ে কাজকর্মে তারা অনেক ভাল।' এই সমস্ত নীতিগল্প এবং কিছু কঠোর নিয়মকানুন আদিম মানুষদের ওপর আরোপ করে শ্রেণী-সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। মানুষ যদি প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট প্রয়োজনের মধ্যে তফাৎ করতে না পারে, সচেতনভাবে বস্তুর অন্তর্নিহিত সূত্রগুলির সন্ধান না পায়—তাহলে প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে অসহায় থেকে যেতে হয়। আর তাই, পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতা অর্থাৎ, প্রয়োজনের স্বীকৃতি এবং মূল্য-উৎপাদন, যা *সামাজিক প্রয়োজনীয়*

শ্রম-সময় দিয়ে পরিমাপ করা হয়—এই উভয়কেই ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল। প্রয়োজনের ধারণা থেকে বিজ্ঞানকে অন্ধতা ও কর্তৃত্বের প্রতি যে ব্রাহ্মণ্য ঝোঁক তার সঙ্গে মেলানো যায়নি। এই অসঙ্গতি আরো বেড়েছে মূল গ্রন্থগুলিকে জাল বা পুনর্লিখন করে বিধানে পরিণত করার রেওয়াজের মধ্য দিয়ে। এই সমস্ত কুসংস্কারেরই মূল লুকিয়ে আছে আদিম উৎপাদন-উপায়ের গভীরে—যা খাদ্য-সংগ্রাহকের জীবন থেকে সামান্য এক ধাপ ওপরের। আজও পর্যন্ত ভারতীয় কৃষকরা হাল, বীজ বপন, ফসলকাটা, ঝাড়াই প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মীয় ক্রিয়াচার পালন করে।

এ থেকে বোঝা যায় যে গোড়ার দিকের উৎপাদন-উপায়ের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নিশ্চিতই কোন বৈশিষ্টসূচক ভূমিকা ছিল, কোন অনন্য অর্জন যা সমাজে তার একটা কর্তৃত্ব এনে দিয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন গভীর শিকড় না থাকলে শুধু শুধু কোন কুসংস্কার সৃষ্টি হতে পারে না—যদিও সহজাত শক্তির জোরে তা টিকে থাকতে পারে। ভাল পঞ্জিকা তৈরি ছিল এ রকমই একটি কাজ। এখানে কৃষকদের পক্ষে, ইউরোপের মতো, প্রাকৃতিক লক্ষণ দেখে শীতের শেষ বুঝে নেওয়াটাই যথেষ্ট ছিল না। বৃষ্টির আরেক নাম 'বর্ষা' এবং বছর হল 'বর্ষ'। ভারতের ক্ষেত্রে বার্ষিক বর্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা আসার আগেই ভারতীয় কৃষককে তার জমি তৈরি করে নিতে হয়। বপনের কাজ শুরু হয় ঠিক ভাবে বর্ষা আসার পর, না হলে গাছ মারা যায়। নিড়ানের কাজ করতে হয় বর্ষার মাঝামাঝি বিরতির সময়। মরশুমের শেষ বৃষ্টির আগে যদি ফসল কেটে ফেলা হয় তাহলে খামারে তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা পুরোপুরি থাকে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে চার মাসের বর্ষার শুরু, বিরতি ও শেষ মোটামুটি বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে হয়। বছরের সেই সময়টা সঠিকভাবে বলাই আসলে কঠিন। মিশরীয়রা সৌরজাগতিক লুব্ধক নক্ষত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নীলনদের বাৎসরিক বন্যা অর্থাৎ তাদের কৃষিসংক্রান্ত মূল ঘটনাটি সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী করত। চীনারা তাদের কৃষকদের সমস্যার সমাধান করেছিল বছরকে চব্বিশটি সৌরভাগে ভাগ করে; এর সঙ্গে অবশ্য বারোটি চান্দ্র মাসের কোন সম্পর্ক নেই—যাতে আবার প্রতি উনিশ বছর অন্তর সপ্তম মাসের সঙ্গে একটি বাড়তি মাস যোগ করা হত। ভারতেরও এরকম একটা কিছুর প্রয়োজন ছিল—-যদিও পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতির নিম্নমান এবং দীর্ঘকাল ধরে তথ্যাদি রেখে দেওয়ার মতো সামগ্রীর অভাব সমেত এখানে সমস্যা ছিল অনেক জটিল।

আদিম মানুষের সাধারণ আচারপালনের পক্ষে চাঁদ ও তার কলা-ই ছিল যথেষ্ট—অন্যদিকে পাখি, পশু এবং গাছপালারা নিজেরাই খাদ্য সংগ্রহকারীদের সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাত। এ থেকেই অবধারিতভাবে জন্ম নিল চান্দ্র মাস এবং শুভাশুভ ঘটনার পূর্বানুমান। খাদ্য উৎপাদকদের গণনায় এল সৌর বছর—যার সঙ্গে চান্দ্র মাসগুলিকে অনবরত খাপ খাইয়ে নিতে হয়। জ্যোতির্বিদ্যা, বীজগণিত, সংখ্যাতত্ত্ব—এ সবই ভারতীয়দের (নির্দিষ্টভাবে ব্রাহ্মণদের) উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং তার মূলে ছিল কাজ চালানোর মতো একটা পঞ্জিকা তৈরির জরুরি তাগিদ। ঋতু সম্পর্কে যাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়—এমনকী সূর্য ও চাঁদ যখন তাদের তারকাখোচিত চালচিত্রকে মুছে দেয় বা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে তখনও। আদিম যুক্তিধারা অবধারিত ভাবে এই সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছেছিল যে মহাজাগতিক বস্তুনিচয় নিছক পূর্বাভাসই দেয় না, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়াটিও সৃষ্টি করে; 'meteorology' (আবহবিদ্যা) শব্দটির মধ্যে এখনও সেই অর্থই নিহিত আছে। সুতরাং, গ্রহ ও নক্ষত্রগুলি সমগ্র মানব জীবন সম্পর্কেও ইঙ্গিত

দেয় এবং তা নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবে কোষ্ঠী (যা এমনকী গ্যালিলেও-ও তাঁর সময়ে এঁকেছিলেন), জ্যোতিষশাস্ত্র, মন্ত্র এবং গ্রহশান্তি বা সন্তুষ্টির জন্য আচারপালন এসবই ছিল অপরিহার্য ব্রাহ্মণ্য 'পঞ্চাঙ্গে'-র স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। আজও পর্যন্ত ভারতীয়রা যথেষ্ট নির্ভুলভাবে বলে দেন কোন্ কোন্ গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হতে চলেছে। অন্যদিকে, কুম্ভ মেলাগুলির সময়ে বা সূর্যের গ্রহণমুক্তির পর অসংখ্য ভারতবাসী পবিত্র তীর্থগুলিতে স্নান করেন—যার দিনক্ষণ নির্ণীত হয় নৌ-পঞ্জিকার সাহায্যে, ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বের সাহায্যে নয়। একই তত্ত্বগত ভিত্তি সত্ত্বেও, আলাদা আলাদা ভাবে অন্তত তিনটি পঞ্জিকা পদ্ধতির ব্যবহার দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষদের মধ্যে চালু আছে। মৌসুমী বৃষ্টির স্থানিক তারতম্যই হয়ত এই পার্থক্যের আসল কারণ। একইভাবে, জ্যামিতিক বিজ্ঞানের ('ভূ-পরিমাপক') মহতী উদ্ভব ঘটেছিল মিশরে—যেখানে নীলনদের বন্যার পলিতে জমির সীমা চিহ্ন মুছে যাওয়ার পর সম উর্বরতাসম্পন্ন এলাকার ক্ষেত্রগুলিকে ভাগ করার জন্য ত্রিভূজের সাহায্যে জরিপের প্রয়োজন ছিল। উল্লেখ্য, ইউক্লিড এই বিজ্ঞানকে চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন টলেমিদের আমলে—যাদের প্রধান কাজই ছিল দাসত্বে আবদ্ধ কৃষকদের কাছ থেকে সর্বাধিক উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা।

আর্যভট্ট (যাঁর মতে, পৃথিবী নিজের অক্ষপথে ঘোরে; কিন্তু তাঁর ভাষ্যকাররা এই মতকে নস্যাৎ করে দেন) যে গুপ্তযুগের (৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দ?) লোক ছিলেন এটা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বরাহমিহির—যিনি অনেক বেশি পরিচিত তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্র, মূর্তিবিদ্যা, ভবিষ্যৎ গণনা এবং সংশ্লিষ্ট 'বিজ্ঞানের' জন্য—নিঃসন্দেহে ছিলেন গুপ্ত রাজসভার এক অলঙ্কার। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে শেষ মহান ব্যক্তিত্ব হলেন এক দক্ষিণ ভারতীয়—ভাস্করাচার্য, যিনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে হায়দ্রাবাদের মানুষ ছিলেন। এ থেকে পূর্ণ কৃষি অর্থনীতির বিকাশে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যেকার বিলম্বিত পর্যায়টি বোঝা যায়। ভেষজের ক্ষেত্রেও ভারত অনেক বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। কিন্তু তা-ও শল্য চিকিৎসা, শবব্যবচ্ছেদ, অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যার (সব নোংরা ব্যাপার) প্রতি ক্রম অনীহা, রসায়ন গবেষণাকে অপরসায়নে রূপান্তর, এবং ব্রাহ্মণ্য বিদ্যাগুলির গুপ্ত চরিত্রের কারণে হারিয়ে যায়।

৮.৩ পৌরাণিক অগস্ত্য কাহিনীর পিছনে রয়েছে দক্ষিণে ব্রাহ্মণ্য অনুপ্রবেশ। এই কাহিনী অনুযায়ী, ঋষি অগস্ত্য সুউচ্চ ও অলঙ্ঘ্য বিন্ধ্য পর্বতকে হুকুম দেন নিচু হতে, 'দানবদের' (যাদের ধর্মবিশ্বাস হয়ত একদিন স্থানিক স্তরে খুঁজে পাওয়া যাবে) জয় করেন এবং সমুদ্রকে পান করে নেন। এটা অগস্ত্য গোত্রীয় মানুষদের প্রারম্ভিক উপনিবেশ স্থাপনের ইঙ্গিত কিনা তা স্পষ্ট নয়। এই ধরনের সূত্রের সন্দেহজনক বিশ্লেষণের চেয়ে *মনুস্মৃতি*-র বিশ্লেষণ অনেক বেশি কার্যকরী। এটি এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এক ব্রাহ্মণ্য নথি এবং বর্তমান রূপ অনুযায়ী, এর উদ্ভব প্রকৃত অর্থে আমাদের আলোচ্য কালপর্বেই। গ্রন্থটি মূলত রচিত হয়েছিল ব্রাহ্মণদের জন্য। এর একটা বড় অংশে ধর্মীয় ক্রিয়াচার ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা রয়েছে—যা পুরোহিতদেরই ব্যাপার। বিভিন্ন সূত্র ও স্বীকৃত শাস্ত্রগুলি থেকে সংকলন করেই যে এটি রচিত হয়েছিল তার লক্ষণ রয়ে গেছে এর পরস্পরবিরোধী বক্তব্যগুলির মধ্যে—যা দুর্বোধ্য বিধানগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিন্দু আইনকে তার নমনীয় প্রয়োগ ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তত্ত্ব উপহার দিয়েছে। এর সবচেয়ে আগ্রোহদ্দীপক অংশ হল প্রশাসন সংক্রান্ত আলোচনা—বিশেষ করে *অর্থশাস্ত্রে*-এর সঙ্গে তার বৈপরীত্যের কারণে। (তা সত্ত্বেও *অর্থশাস্ত্র* এটিকে নীরবে

প্রভাবিত করেছে)। রাষ্ট্র ও সামাজিক শৃঙ্খলার ভিত্তিতে রয়েছে বলপ্রয়োগ ঃ

'রাজার স্বার্থেই, প্রভু আগে তাঁর নিজের পুত্র দণ্ড-কে সৃষ্টি করেছেন—যিনি সকল জীবের রক্ষক, ব্রহ্মার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ থেকে সৃষ্ট (রক্ত মাংসের দেহধারী) আইন (*মনুস্মৃতি* ৭.১৪)।... দণ্ড একাই সকল জীবকে শাসন করেন, তারা যখন নিদ্রা যায় তাদের ওপর নজর রাখেন; জ্ঞানীরা দণ্ড-কেই আইন (ধর্ম) বলে ঘোষণা করেন (*মনুস্মৃতি* ৭.১৮)।... সমগ্র পৃথিবীকেই দণ্ড সুশৃঙ্খল রেখেছেন। কেননা কোন নিরপরাধ মানুষ খুঁজে পাওয়া শক্ত (*মনুস্মৃতি* ৭.২২)।... (রাজা) সতর্কতার সঙ্গে বৈশ্য ও শূদ্রদের বাধ্য করবেন তাদের (নির্ধারিত) কাজ করতে; কেননা এই দুই বর্ণের মানুষেরা যদি তাদের কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়ায় তাহলে তারা গোটা পৃথিবীকেই বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলবে।' (*মনুস্মৃতি*, ৮.৪১৮)

মনুস্মৃতি-র ব্যবস্থা অনুযায়ী, রাষ্ট্রের কাজ হল শাসক শ্রেণীর ভরণপোষণ চালাতে উৎপাদকদের বাধ্য করা; সমস্ত কায়িক শ্রমের কাজ হল শূদ্রদের, গো-পালন ও বাণিজ্যের জন্য বৈশ্যরা। 'ধর্মশাস্ত্র' নামে অভিহিত কোন গ্রন্থে বলপ্রয়োগের এই প্রশস্তি প্রমাণ করে যে ব্রাহ্মণ্যবাদ তখন সামাজিক ন্যায়নীতি হিসেবে 'ধর্ম'-এর অশোক আমলের যে ধ্যানধারণা তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বাস্তব পরিস্থিতিটা হল এই যে *মনুস্মৃতি*-র (৮.৩৪৮) 'আপদ্‌ধর্ম' সংক্রান্ত অংশে, কঠিন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে এমনকী উচ্চবর্ণের মানুষদের ব্যবসা করা, সুদে টাকা খাটানো প্রভৃতির অনুমতি দেওয়া হয়েছে; এমনকী, ব্রাহ্মণরাও অভাবে পড়লে সৈনিকের পেশা গ্রহণ করতে পারবে (*জাতক* ৪৯৫-ও তুলনীয়)।

চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা এখানে শ্রেণী-কাঠামোর প্রতিরূপ। ব্রাহ্মণরা কর-ছাড় সমেত অজস্র বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। রাজা প্রচণ্ড টানাটানিতে পড়লেও তাদের ওপর খাজনা বসাতে পারত না (*মনুস্মৃতি* ৭.১৩৩)। ক্ষত্রিয়রা কর আদায় করত, নিজেরা দিত না। অন্য দুটি বর্ণকেই সব বোঝা বইতে হত। শূদ্রদের ছিল শুধু একটা মামুলি জীবনধারণের অধিকার—ক্রীত হোক বা না হোক কোন শূদ্রকে কাজ করতে বাধ্য করানো যেত, বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা তা পারত। দাসত্ব ছিল তার প্রকৃতিতে এবং সৃষ্টিতেই, তাই কোন নির্দিষ্ট মালিকের কাছ থেকে মুক্তি পেলেও এ থেকে সে মুক্তি পেতে পারত না (*মনুস্মৃতি* ৮.৪১৩-৪; ১০; ১২১)। কোন শূদ্রের সম্পদবৃদ্ধি ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদনাদায়ক (*মনুস্মৃতি*, ১২০)। এটা স্বভাবতই সেই সব লোকের সঙ্গে বসবাস করা কঠিন করে তোলে যারা এই তিনটি বর্ণের কোনটিতে, কিংবা দ্বিজ বা উচ্চবর্ণীয় নয়—অথচ তাদের দমনও করা যায় না। এই অবশিষ্ট মানুষগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া হল যে তারা মূল চারটি বর্ণের মধ্যেকার অসবর্ণ সন্তানোৎপাদনেরই ফলশ্রুতি—রাজার যা বন্ধ করা উচিত। তা সত্ত্বেও, বহুগামিতা স্পষ্টতই ছিল এবং তা মেনে নিতে হত। অন্যদিকে, বিপরীত ঝোঁক, অর্থাৎ নিম্নবর্ণীয় কোন পুরুষের উচ্চবর্ণীয় কোন নারীর কাছে গমন ছিল অত্যন্ত আতঙ্কজনক ঘটনা। আবার ধারাবাহিকভাবে সাতপুরুষ অসবর্ণ বিবাহ করলে এমনকী কোন শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারত বা তার বিপরীতটাও। সুতরাং প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্ণ ততখানি কঠোর ছিল না যতটা ছিল তত্ত্বে (*মনুস্মৃতি*, ১০.৬৪-৫)। প্রতিটি অপ্রধান মিশ্র বর্ণকেই সাধারণভাবে কোন না কোন উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। এর ফলে সমস্ত ধরনের উপজাতি ও সংঘগুলিকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেত। মাগধ, বৈদেহক, লিচ্ছবি, অম্বস্থ, উগ্র প্রভৃতি নাম থেকে এই সব মিশ্র বর্ণের

অস্তিত্ব প্রমাণ হয়—যেগুলির অধিকাংশেরই চিহ্ন উপজাতি, সংঘ, জাতি (প্রাথমিক চারটি শ্রেণী বর্ণের প্রতিটির জন্য পুরনো 'বর্ণ' বা রঙ-এর পরিবর্তে) প্রভৃতির অগ্রগতির পথে অন্যত্রও রয়ে গেছে। এই মিশ্র-বর্ণের তত্ত্ব আরো সহজরূপে পাওয়া যায় *অর্থশাস্ত্রে* (৩.৭)—সম্ভবত মিশ্র জন্মের ঘটনা তখন খুব স্বাভাবিক ছিল বলেই। কোন বর্ণ-সমাজে অবিভক্ত পরিবারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নটার সমাধান কঠিন; তাই, যে সন্তান পিতা বা মাতা কারোরই বর্ণের উত্তরাধিকারী নয় তার জন্য কোন পেশা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। বর্ণ-বহির্ভূত সংগঠনগুলিকে পুরোহিতরা ভাল চোখে দেখত না, যদিও এই ধরনের সংগঠন থেকে সম্ভাব্য সবধরনের সুযোগ সুবিধা আদায়ে তারা কখনই পিছপা ছিল না। কোন গ্রাম বা জেলায় বসবাসকারী কোন সংঘের কোন সদস্য যদি প্রতিশ্রুত চুক্তির খেলাপ করত তাহলে তাকে এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হত (*মনুস্মৃতি* ৮.২১৯)। যে সব ব্রাহ্মণ পুরোহিত কোন গণ-এর (উপজাতিক সম্প্রদায়) জন্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করত শ্রাদ্ধে তাদের নিমন্ত্রণ করা যেত না (*মনুস্মৃতি*, ৩.১৬৪)। তা সত্ত্বেও, উপজাতীয় ধর্মবিশ্বাসের সেবা করার ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য এমনকী হাল আমলেও বজায় রয়েছে (*বল*, ২৫২), বিশেষ করে উপজাতিকরা যখন 'সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষী' ছিল (*রায়*, ১৭৯)। একটি প্রাচীন সালংকায়ন সনদে (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা*, ৩১.১-১০) জনৈক 'রথকার' ব্রাহ্মণকে অব্দে দুটি গ্রাম দান করা হয়েছিল—যা *মনুস্মৃতি*-র বিধান বিরোধী এবং নিশ্চিতই তিনি ছিলেন কোন সংঘ-পুরোহিত।

ধর্মের ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে *স্মৃতি*-লেখকরা সুদ বা তেজারতির কথা ভুলে বসেননি। *অর্থশাস্ত্রের* আগের উদ্ধৃতির সঙ্গে *মনুস্মৃতি* (৮)-এর উদ্ধৃতির বৈপরীত্য মিলিয়ে দেখা যেতে পারে ঃ

'বশিষ্ঠ অনুমতি দিয়েছেন যে, কোন কুসীদজীবী মাসে শতকরা ১/৮০ সুদ কড়ার করতে পারে (১৫ শতাংশ) (৮.১৪০) ... শতকরা পাক্কা দুই, তিন, চার, পাঁচ (কিন্তু এর বেশি নয়)-ও সে সুদ নিতে পারে বর্ণের ভাগ অনুযায়ী (অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে ২৪ শতাংশ, ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে ৩৬ শতাংশ, বৈশ্যদের ৪৮ শতাংশ, শূদ্রদের ৬০ শতাংশ ধার্য করা যেতে পারে; ৮.১৪২) ... বিধিবদ্ধ হারের চেয়ে বেশি কড়ারের সুদ আদায় করা যাবে না; সেগুলিকে বলে চোটা; কোন ক্ষেত্রেই শতকরা পাঁচের (প্রতি মাসে; ৮.১৫২) বেশি সুদ নেওয়ার অধিকার কুসীদজীবীর নেই। এক বছরের বেশি সুদ নিতে দেওয়া যাবে না; এমন কোন সুদ যা অনুমোদিত নয়, চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ, পর্যায়বৃত্ত সুদ বা কায়িক শ্রমের (বন্ধক রাখা পশু বা ক্রীতদাসের ; ৮.১৫৩) দ্বারা পরিশোধিত সুদ নেওয়া যাবে না। যদি কেউ (চুক্তির সময়ের মধ্যে) ধার শোধ করতে না পেরে নতুন চুক্তি করতে চায় তবে দেয় সুদ পরিশোধ করে তা সে করতে পারবে (৮.১৫৪)। যদি সে (পাওনা সুদের) অর্থ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে নতুন চুক্তিতে তা যোগ করে নিতে পারে। তাকে অবশ্যই (আগেকার) বাকি সুদ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে (৮.১৫৫)। ... অধমর্ণ যদি উত্তমর্ণের জাতের বা (উত্তমর্ণের চেয়ে) নীচু জাতের লোক হয় তাহলে সে নিজের কায়িক শ্রম দিয়ে ঋণ শোধ করতে পারে; কিন্তু উঁচু জাতের অধমর্ণ ধীরে ধীরে (যখন সে কিছু আয় করবে তখন) সেই ঋণ শোধ করবে।'

মূলত আগের হলেও পুনর্লিখিত *নারদ*-এ (ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ, ৯৭) অনেক বেশি খুঁটিনাটিভাবে ঋণ, চুক্তি, বন্ধক, আমানত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণগুলির পর্যায়

অনুযায়ী অর্থনৈতিক অবস্থানটা হল নতুন; *অর্থশাস্ত্র*-এ ঋণকে বিচার করা হয়েছে উত্তমর্ণ বা অধমর্ণের বর্ণ নিরপেক্ষ-ভাবে। ঋণ-দাসত্ব—পরবর্তীকালে যা অনেক উপজাতিক বর্ণকে ভূমিদাসের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল—*অর্থশাস্ত্র*-এ, মনে হয়, তা ছিল রাষ্ট্রের বকেয়া ঋণ, অর্থাৎ কর; সুতরাং তা ছিল আইনী-দাসত্ব। এই পর্বে আমরা দেখি প্রচলিত সুদের হারের সঙ্গে নতুন লোভ ও তেজারতির সংঘাত এবং পেছনের দরজা দিয়ে সেগুলি ঢুকে পড়ছে। ব্রাহ্মণদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলিকে পুরোপুরি মেনে নিলেও এটা স্পষ্ট যে নতুন ও ভিন্নতর এই শোষণে বর্ণ, এক আনকোরা যুক্তি হিসেবে এসেছিল। উদ্যোগের ঝুঁকি নয় (যেমনটা *অর্থশাস্ত্র*-এ ছিল), বংশমর্যাদাই হল অধমর্ণের সুদের হার নির্ধারক। এর অর্থ, নির্দিষ্টভাবে দরিদ্রতম কৃষকের ঘাড়ে দুর্বহ বোঝা চাপানো—প্রতিবার সারাবছরের খোরাকের পক্ষে পর্যাপ্ত ফসল না উঠলেই। চক্রবৃদ্ধি সুদের ব্যাপারটা যখন চালু হল, পরিণামে সৃষ্টি হল চিরস্থায়ী ঋণজালে আবদ্ধ এক শ্রমজীবী শ্রেণী—যা ইউরোপীয় চিরায়ত ক্রীতদাস বা সামন্ত ভূমি াসেরই বিকল্প।

মনুস্মৃতি-র রাজা হলেন এক অত্যন্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শাসক। তাঁর কাছ থেকে মুদ্রার প্রচলন বা বিশাল জনহিতকর কাজ আশা করা যায় না। বড়জোর কেউ পুরনো বাঁধ বা জলাধারের ক্ষতি করলে তিনি তাকে শাস্তি দিতে পারতেন। *মনুস্মৃতি* ৮.৪০২ অনুযায়ী, তাঁর উচিত প্রতি পাঁচদিন অন্তর জনসমক্ষে বাজার দর নির্ধারণ করে দেওয়া। কৃত কাজের জন্য অনুতপ্ত চোরকে রাজার সামনে একটা শক্ত কাঠের মুগুর, ডান্ডা, বা বর্শা নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত শাস্তি চাইতে হবে (৮.৩১৪-৬); রাজা যদি যথোচিত শক্তি প্রয়োগ করে তাকে আঘাত না করেন তাহলে বাকি পাপের প্রায়শ্চিত্ত রাজাকেই করতে হবে। কিছু ভাষ্যকারের মতে, সবচেয়ে পাপজনক চুরি অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সোনা চুরির ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য ছিল (দ্র. ৯.২৩৫; ১১.৫৫)। এই রকম কোন রাজা, যদিও প্রতিবেশীদের সঙ্গে সবসময়ই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত কিন্তু একটা জেলার বেশি এলাকা শাসন করতে পারত না। প্রকৃতপক্ষে, *অর্থশাস্ত্র*-র অর্থনীতির সঙ্গে এর কোন তুলনাই চলে না। 'পণ' তৈরি হত তামা দিয়ে (*মনুস্মৃতি*, ৮.১৩৬), ৩২-গুঞ্জ ওজনের রৌপ্য মুদ্রাগুলিকে বলা হত 'পুরানো'। বেতনহার ছিল মৌর্যদের তুলনায় অনেক কম : 'সর্বনিম্ন মজুরি অবশ্যই দিতে হবে এক (তাম্র) পণ (ভাষ্যকারদের মতে দৈনিক), সর্বোচ্চ ছয় পণ; অনুরূপভাবে বস্ত্র দিতে হবে প্রতি ছ'মাস অন্তর এবং প্রতি মাসে এক *দ্রোণ* শস্য।' (*মনুস্মৃতি*, ৭.১২৬)। এটা রাজার চাকরবাকরদের জন্য; আমলাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হত জমি থেকে। গ্রামই ছিল প্রধান একক এবং তা খুঁটিনাটিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হত; নগরগুলির দিকে মনোযোগ দেওয়া হত না। গ্রামের প্রধানকে নিয়োগ করত রাজা, উপরি পাওনা হিসেবে দেওয়া হত খাদ্য, পানীয়, জ্বালানি; প্রতি দশটি গ্রামের প্রধানকে দেওয়া হত একটি পরিবার চালানোর মতো জমি। প্রতি কুড়িটি গ্রামের প্রধান পিছু বরাদ্দ ছিল পাঁচটি পরিবারের উপযোগী জমি; একশটি গ্রামের শাসক পেত একটা পুরো গ্রামের খাজনা এবং হাজারটি গ্রামের শাসককে দেওয়া হত একটা শহরের রাজস্ব। এটা হল একটি আদি-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। দুই উচ্চবর্ণের থেকে, অন্তত তত্ত্বগতভাবে, রাজস্ব মকুব ছাড়াও রাজার মোট আদায় ছিল অত্যল্প। গবাদি পশু ও সোনার (বৃদ্ধিতে) ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ এবং শস্যের ক্ষেত্রে এক-অষ্টমাংশ, এক-ষষ্ঠাংশ, বা এক-দ্বাদশাংশই ছিল সাধারণ আদায় (৭.১৩০)। রাজকোষে টানাটানির সময় খুব বেশি হলে এক চতুর্থাংশ (১০.১১৮) নেওয়া যেতে পারে এবং তাতে পাপ হবে না—যদিও ভাষ্যকারদের মতে, তা শুধু শূদ্রদের কাছ থেকেই নেওয়া

উচিত। বৈশ্যদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর শস্যের ১/৮, মুনাফার ১/২০ বা ন্যূনপক্ষে এক কার্ষাপণ নেওয়া যেতে পারত। চাণক্যের সুপারিশকৃত পীড়নমূলক আদায়গুলির তুলনায় এ ছিল নেহাতই সামান্য। মুক্ত শ্রমিক, তা সে শূদ্র হোক বা না হোক, এবং কারুশিল্পী—যারা এমনকী কিঞ্চিন্মাত্র পরিমাণও দিতে পারত না (৭.১৩৭) তাদের কাছ থেকে রাজার জন্য একদিনের অবৈতনিক শ্রম কর হিসেবে নেওয়া হত। এটাই ছিল সামন্ততান্ত্রিক বেগার শ্রমের সূচনা।

দুটি নিষেধাজ্ঞা থেকে এই ধরনের শাসনের সঙ্গে অস্তমিত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনের তফাত বিশেষভাবে বোঝা যায়। 'ক্রয় ও বিক্রয়ের (মূল্য), রাস্তার (দূরত্ব), খাদ্য ও আনুষঙ্গিকের (যাত্রাকালীন খরচ), দ্রব্যের নিরাপত্তা ব্যয় (বীমা, বা বেতনভুক রক্ষী বাবদ) ভালভাবে বিবেচনা করে রাজাকে বণিকদের ওপর কর ধার্য করতে হবে।' (*মনুস্মৃতি,* ৭.১২৭)। বণিকদের জন্য এই বিবেচনাটা অত্যাবশ্যক ছিল, কেননা রাষ্ট্র তখন আর উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়ে ব্যাপক মাত্রায় যুক্ত ছিল না। রাজকীয় 'সীতা' জমি বা *অর্থশাস্ত্র*-এর গৌরবময় পৌর-জনপদগুলিও অনুপস্থিত ছিল। রাজকীয় একাধিপত্যের কথা *মনুস্মৃতি*-তে (৮.৩৩৯) শুধু উল্লেখই করা হয়েছে, বিস্তারিত কোন আলোচনা করা হয়নি। ধাতু ও লবণের ক্ষেত্রে এ ধরনের একাধিপত্য ছিল না; ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে সাধারণভাবে এ দুটিই আমদানি করতে হত। আর একটা নতুন বৈশিষ্ট্য হল, সমাজের সকল সদস্যের ওপর সাধারণ বিধিনিষেধ হিসেবে আইনের ধারণাটির অবলুপ্তি ঘটেছিল। মনুর বিধানগুলিতে সেগুলির নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকারই করা হয়েছে (৮.৪১, ৪৬) ঃ 'পবিত্র বিধানগুলি সম্পর্কে অবহিত (কোন রাজাকে) অবশ্যই জাতির বিধান, জনপদের বিধান শ্রেণীর বিধান ও কুলের বিধান খতিয়ে দেখতে হবে।' বিচারকে এ সবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। *অর্থশাস্ত্র* (৩.১০) এমনকী যৌথ গ্রামগুলিকেও নিয়ন্ত্রণে এনেছিল; সেখানকার অধিবাসীরা সম্প্রদায়ের কাজকর্মে, আনন্দোৎসবে, আমোদপ্রমোদে, বা সম্মিলিত উদ্যোগে তাদের দেয় দিতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকত। *মনুস্মৃতি* এ ব্যাপারটিকে হয় উপেক্ষা করেছে, না হয় স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছে। তাই রাষ্ট্র কেবলমাত্র সামাজিক উৎপাদনে অংশ নেওয়া গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার লেনদেনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং অন্যদিকে, প্রতিটি গোষ্ঠীকে তার নিজস্ব বিধান অনুযায়ীই বিচার করেছে। গোষ্ঠী-আইনের এই স্বাধীনতা *অর্থশাস্ত্রে* শুধুমাত্র উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হয়েছে। সমাজ ছিল আলগাভাবে পরস্পর-সংবদ্ধ, এমনকী চতুর্বর্ণ ব্যবস্থাকে যখন অতিরিক্ত 'মিশ্র' বর্ণগুলির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া হচ্ছে তখনও। 'আতবিক' কোন খাদ্য-সংগ্রাহকদের উল্লেখ কোনোভাবে নেই; তারা ছিল চৌহদ্দির বাইরে।

মনুস্মৃতি ও তার ব্যবস্থা অজস্র গ্রাম শাসনকারী ছোট ছোট রাজাদের পক্ষে এতই উপযোগী যে মনে হয়, তাদের উদ্ভব গাঙ্গেয় মূল অঞ্চলে মৌর্য সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়া অংশগুলির মধ্যেই ঘটেছিল; এর সপক্ষে *মনুস্মৃতিতে* (২.১৭-২৪) প্রমাণও আছে। জঙ্গল হাসিল তখনও চলছিল, কিন্তু এরপর থেকে তা হতে থাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে—আরও গ্রাম বৃদ্ধির যা একটা বড় কারণ। নাগসেন রাজা মিনান্দারকে বলেছিলেন (*মিলিন্দপনহ্,* ৪.৫.১৫) : 'আর যখন কোন মানুষ জঙ্গল হাসিল করে কোন ভূমিখণ্ডকে মুক্ত (*নিহরতি*) করে, লোকে বলাবলি করে ঃ 'এটা তার জমি। যদিও জমিটা সে সৃষ্টি করেনি। যেহেতু জমিটা সে ব্যবহারের উপযোগী করেছে, তাই তাকে বলা হয় সেই জমির মালিক।' *অর্থশাস্ত্র* (২.১) তার এই মালিকানা অনুমোদন করত না, শুধু তার হাসিল করা জমি থেকে, এমনকী যদি সে আশু চাষ না-ও করে তাহলেও উচ্ছেদ করা চলবে

না—এই অধিকারটুকু দিত; তবে যদি সে ফসল ফলাতে বা রাষ্ট্রকে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হত তখন শেষপর্যন্ত সত্ত্ব খোয়া যেত। *মনুস্মৃতি* (৯.৪৪) *মিলিন্দপনহ্-র* সঙ্গে একমত যে : জমি প্রথম যে হাসিল করবে তার, যেমন প্রথম তীরবিদ্ধ করতে পারা শিকারীই হয় হরিণের মালিক। অবশ্য, ব্যক্তি যখন কোন জমিখণ্ড হাসিল করত সাধারণভাবে সে হত কোন গ্রামের ওপর বা আত্মীয়তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কোন সম্প্রদায়ের সদস্য—তাই এই হাসিল করাটা হত সীমিত। বসতির বিস্তারের কথা মাথায় রাখলে এবং বন্য মানুষদের হাত থেকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা তাদের সঙ্গে আপস করার কথা ভাবলে সেই আমলে গহন অরণ্যের কুমারী মাটিতে নিঃসঙ্গ কোন চাষীর অস্তিত্ব কল্পনা করাও শক্ত। *মনুস্মৃতি-র* উত্তরাধিকারের আইনে (৯.২১৯) বলা হয়েছে যে চারণভূমি অবিভাজ্য—যার অর্থ অন্য জমি, যদি উত্তরাধিকারীরা যৌথ পরিবারে থাকতে রাজি না হয়, তাহলে বিভাজনযোগ্য। একই সঙ্গে, জলাশয় বা ফলের বাগান বিক্রি ছিল নিজের স্ত্রী ও সন্তান বিক্রির মতো গর্হিত অপরাধ (*মনুস্মৃতি,* ১১.৬১-২)। প্রতিটি জনপদের কড়া সীমান্ত প্রহরার পরিবর্তে এই পর্বে এল (*মনুস্মৃতি,* ৭.১১৪) প্রতি দুই, তিন, পাঁচ ও একশ গ্রামের জন্য স্থানীয় আরক্ষা চৌকি (*গুল্ম,* যা নিয়ে নবম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি)। গ্রামগুলিকে রক্ষা করাই ছিল এদের কাজ, কেননা ডাকাতির মোকাবিলার প্রয়োজন অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মনে হতে পারে যে এই 'গুল্ম'গুলি না থাকলে ঢিলেঢালা গ্রামাঞ্চল থেকে কর, অল্প হলেও, আদায় করা সম্ভব হত না।

নতুন সমাজের জন্য *অর্থশাস্ত্র-র* একটা সরল ভাষ্য তৈরি করা হয়েছিল—তা হল কামন্দনদকি-র *নীতিসার* (ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ১৪)। এর রচনাকাল সপ্তম শতাব্দীর পরের হতে পারে না, কেননা 'সামন্ত' শব্দটি 'সামন্ত রাজা' অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। নিয়ত ভ্রাম্যমান রাজ-স্কন্ধাবার (দরবার-শিবির)-এর হাতির ওপর অত্যাধিক গুরুত্বদান, যতদূর সম্ভব মৃত্যুদণ্ড পরিহার করা (১৫.১৭), বৃত্তি অনুদান কখনই বন্ধ না করার পরামর্শ—এ সবই 'উচ্চাগত সামন্ততন্ত্রে'র পরিচায়ক, যা নিয়ে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। *অর্থশাস্ত্র-র* অপরিহার্য গুপ্তচর বাহিনী অন্তর্হিত হয়েছিল—কেননা নিরাসক্ত গ্রাম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন বণিকদের জন্য তা ছিল অপ্রয়োজনীয়।

৮.৪ *স্মৃতি* গ্রামবিজয় সম্পূর্ণ হবার পূর্বাভাস দেয়—যার পরিণতি যে কোন আগ্রাসনের চেয়েও ছিল মারাত্মক। বর্ণপ্রথার গোঁড়ামি কঠোর হয়ে উঠেছিল কেবলমাত্র সেই সমস্ত বদ্ধ গ্রামগুলিতেই যেগুলির প্রধান বৌদ্ধিক ফসল ব্রাহ্মণরা এক সংশোধনাতীত গ্রাম্যতায় সমাচ্ছন্ন বলে চিহ্নিত হয়েছিল এবং ধর্মান্ধতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের কাছে আর্যদেশের চিরাচরিত সীমানার বাইরে যাওয়ার অর্থ ছিল প্রায়শ্চিত; বসবাস করাটা ছিল নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ যেন কোন নগরে প্রবেশ না করে, নগরের ধুলো যেন তার গায়ে না জমে—বৌধায়নের *ধর্মসূত্রের* (২.৩.৩৩) এ এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপদেশ, এবং তা অমান্যও করা হত নিয়মিত। এই মানসিকতাই ইতিহাসকে মেরেছে। তুলনামূলকভাব অপরিবর্তনশীল গ্রামগুলি কোন্ রাজা শাসন করছে তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না। অভ্যন্তরীণ মামুলি উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা গ্রামাঞ্চলে ইন্দো-গ্রীক শাসকদের চমৎকার মুদ্রাগুলি আর পাঁচটা রূপোর টুকরোর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করতে সমর্থ এমন যে কাউকেই তারা কর দিত সামগ্রীতে—সুতরাং মুদ্রার ব্যবহারও তেমন হত না। বৎসরান্তের চেয়ে অত্যাবশ্যক

ঋতুচক্রগুলির আবর্তন ছিল অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ —কেননা গ্রামবাসীরা সারা বছরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব সামগ্রীই উৎপাদন করত, এবং (কর বাবদ নিয়ে নেওয়া অংশ বাদে) তা দিয়েই পরবর্তী বছরের ফসল না ওঠা পর্যন্ত চালাত। ফলশ্রুতি হিসেবে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা উৎসব-অনুষ্ঠানের, এমনকী রামের পৌরাণিক লঙ্কাজয়ের তিথি-নক্ষত্র নিয়েও তিক্ত আধ্যাত্মিক বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত থাকত (এবং এখনও আছে), বছরটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাত না। একমাত্র জৈন পাণ্ডুলিপিগুলিতেই সাধারণভাবে সাল-তারিখ এবং যুগ দেওয়া থাকত, কেননা বণিকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বাৎসরিক হিসাব-নিকাশ রাখার রীতি ছিল। গ্রামে অসাধারণ চরিত্রের কোন মানুষ দেখা গেলে তাকে রাজসভায় নিয়ে নেওয়া হত, অথবা গ্রামবাসীরা তাকে মাহাত্ম্য দান করত; উভয়ক্ষেত্রেই তার রূপকল্প ও স্মৃতি বিনাবিচারে লোকগাথা ও কাহিনীতে ঢুকিয়ে নেওয়া হত। বিদেশীদের সম্বন্ধে জ্ঞানের অর্থই হল ভ্রমণ, যুদ্ধবিগ্রহ বা বাণিজ্যের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকা। এগুলির মধ্যে প্রথমটি ছিল খুবই কম, তীর্থ ভ্রমণের নামে। নিরস্ত্র গ্রামগুলির পক্ষে দ্বিতীয়টি ছিল অসম্ভব। আর তৃতীয়টি হয়ে গিয়েছিল খুবই নগণ্য; স্বতন্ত্র, অবজ্ঞাত, পেশাদার গোষ্ঠীগুলির একচেটিয়া ব্যাপার। গ্রামের পুরোহিতদের কাছে প্রতিবেশী নিম্নবর্ণের মানুষদের জীবনের বাস্তব ঘটনাবলির চেয়ে ক্রমশ গালগল্পই হয়ে উঠেছিল বেশি বাস্তব; তাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বা সামাজিক আদানপ্রদান ছিল নীচ কাজ। নিশ্চল উৎপাদন-উপায়ের কারণে গ্রামগুলির মধ্যেকার পার্থক্য ঘুচে যাচ্ছিল, ফলে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত কোন গ্রামকে এক বা দুই শতাব্দী পরেও হাজার বছর আগে স্থাপিত কোন গ্রামের মতোই দেখাচ্ছিল। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের কাছে ভারতীয় গ্রামগুলির 'সময়হীন' মনে হওয়ার সরল কারণ গ্রামের জীবনে স্মৃতি ও সময়ের হিসাব কোন কার্যকর প্রয়োজনে লাগত না।

মনুস্মৃতির গ্রাম-রাজ্যে, আর্যান্তরিত যুদ্ধরত উপজাতিগুলিকে নতুন সমাজে সংহত করার উপযোগী বৌদ্ধধর্ম বা প্রাচীন বৈদিক ধর্মের সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু উভয় ধর্মেরই মৌল উপাদানগুলি রক্ষিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা একই সঙ্গে অহিংসা ও যুদ্ধের সপক্ষে প্রচার করত, এবং সম্ভবত নিজেরা বেদ অধ্যয়নও করত। পাঁচ পশু-বলির প্রচলিত মহান বৈদিক প্রথা তখন রূপান্তরিত হয়েছিল প্রতীকী উৎসর্গে (*মনুস্মৃতি,* ৩.৬৭-৭১)। তীব্র পানাসক্ত দেবতা ইন্দ্র (মেগাস্থিনিসের ডিওনাইসোস) ও বৈদিক দেবতাদের নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে মানানসই করে গড়ে তোলা যায়নি—যদিও তার চেষ্টা হয়েছিল,[৯] কেবলমাত্র বিষ্ণুই পুনর্গঠিত হয়েছিলেন। নতুন আবির্ভূত দেবতারা গ্রাম্য মানসিকতার পক্ষে আরো বেশি উপযোগী হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের পক্ষে লাভজনকও। সবচেয়ে সফল ছিলেন বিষ্ণু-নারায়ণ-কৃষ্ণ—*মনুস্মৃতি*-র সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত *মহাভারতের* চূড়ান্ত সম্পাদনকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। সমস্ত প্রাচীন ও স্থানিক বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাসগুলিকে ঈশ্বরের আবির্ভাব বা লীলামাহাত্ম্য বলে আত্মস্থ করে নেওয়াটা সহজ ছিল। এই আত্মস্থ করাটা ব্রাহ্মণদের একটা সংহতি দিয়েছিল, ভূখণ্ডকে দিয়েছিল এক সাংস্কৃতিক ঐক্য। বিদেশাগতদের বর্ণ-সমাজে মিলিয়ে নেবার ক্ষেত্রে এটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন বিদিশার কাছে বেসনগর-এর একটি শিলাস্তম্ভে নিম্নোদ্ধৃত প্রাকৃত খোদাইটা এখনও আছে ঃ

'দেবতাদের দেবতা বাসুদেব-এর এই গরুড়ধ্বজ স্তম্ভটি এখানে ভগবতের সেবক, দিয় (দিও)-র পুত্র, তক্ষশীলাবাসী, গ্রীক (যোন)-দূত—যিনি মহান রাজা অ্যান্টিয়ালকিডাস-এর কাছ থেকে, নিজ

রাজত্বের বর্তমান চতুর্দশ বৎসরে উত্তীর্ণ ত্রাতা রাজন কাশিপুত ভাগভদ্র-র কাছে এসেছেন সেই হেলিওডোরোস কর্তৃক স্থাপিত হল।'

উৎকীর্ণ লেখাটির অদ্ভুৎ শব্দ-বিন্যাসের[১০] মতো ত্রাতা (গ্রীক 'সোতের') এই বিশেষণটিও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গ্রীক। ভাগভদ্রকে একজন শুঙ্গ রাজা বলে মনে করা হয়। অ্যান্টিয়ালকিডাস ৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় তক্ষশীলা শাসন করতেন। গ্রীকরা কৃষ্ণ-বাসুদেবকে হেরাক্লেস বলে পূজা করত না, যদিও আলেকজান্ডার থেকে মেগাস্থিনিস সকলেই এঁদের অভিন্ন বলেই মনে করতেন। ভগবৎ (আশীর্বাদ প্রাপ্ত কেউ) উপাধিটি বিষ্ণুর উপাসকরা বৌদ্ধধর্ম থেকে গ্রহণ করেছিল, যেমন পুরুষোত্তম ('পুরুষদের মধ্যে উত্তম') নামটি। বাস্তবে, নাগ (নায়) নাড়সব একটি বৌদ্ধ গুহা দান করার সময় নিজেকে, ভাজা-র ভাগবৎ বলে অভিহিত করেছেন—যদিও খোদাই-এর ওপর একটি সূক্ষ্ম ফাটল সেটির পাঠকে বিভ্রান্ত করেছে (*জার্নাল অফ দি বোম্বে ব্রাঞ্চ অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি* ৩০(২), ১৯৫৬, পৃ. ৭০)। আগেকার ব্রাহ্মণরা বহিরাগতদের বর্জন করার যে নীতি নিয়েছিল বিষ্ণু-ভক্তদের দ্বারা তা স্পষ্টতই পরিত্যক্ত হয়েছিল।

আর একজন বিশিষ্ট দেবতা হলেন শিব—টোটেম পশুদের দ্বারা পরিবৃত ত্রি-মুন্ডক বিশিষ্ট সিন্ধুর মূর্তির সঙ্গে যাঁর মিল আছে। তাঁর 'গণ' সঙ্গীসাথীরা হল ভূত-প্রেত, পরিবারের কর্ত্রী হলেন তাঁর 'স্ত্রী' দেবীমাতৃকা পার্বতী ('গিরিরাজ কন্যা') এবং এসব নিয়ে শিব-ও বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়ে একটা ধর্মমত গড়ে তুলতে পারেন। এই সমস্ত দেবতাদের বংশ-পরিচয় আর প্রাসঙ্গিক ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এঁরা সব নতুন ব্যক্তিগত দেবতা—সবাই এঁদের পূজা করতে পারে। শিবের পূজায় উন্মত্ত আচার-পালনের প্রয়োজন—যা অনেক আদিম পূজাপদ্ধতির মধ্যে থাকলেও বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতির মধ্যে নিশ্চিতই ছিল না। *ভাগবদ্‌গীতা* (যার রচনা সম্পূর্ণ হয়েছে সম্ভবত আমাদের আলোচ্য কালপর্বের শেষে)-র প্রচারক হিসেবে কৃষ্ণ পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্মতত্ত্বের সারসংক্ষেপ করেছেন, এর সবগুলিকেই চালিত করেছেন এক অভিন্ন লক্ষ্যে ঃ সর্বোত্তম দেবতা হিসাবে তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখা। যেহেতু, তিনি ছিলেন এক মল্লবীর, অজস্র দেবিকার স্বামী এবং সেইসঙ্গে এক রাখাল বালক—তাই মূলত ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের অজস্র মানুষ তাঁর ভজনা করতে পারে এবং করেছে। এই সমস্ত গ্রাম্য ধর্মবিশ্বাসই কৃষ্ণের নামে *ভাগবদ্‌গীতা* রচনা সম্ভব করেছে। পরবর্তীকালে, বৌদ্ধধর্ম বিলীন হওয়ার পর দুই নতুন উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংস বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল—যা চরমে পৌঁছয় দ্বাদশ শতাব্দীতে; এবং এই লড়াই চালানো হয়েছিল মুসলমানদের দিকে ন্যূনতম নজর না দিয়েই, যদিও তারা ছিল সমস্ত হিন্দুধর্মেরই বিরোধী। এর কারণ, শিব তখন হয়ে গেছেন বড় বড় ভূস্বামীদের দেবতা, অন্যদিকে রাখাল বালক কৃষ্ণ রয়ে গেছেন ছোট ছোট উৎপাদকদের সঙ্গে। স্মার্ত-বৈষ্ণব এই বিরোধের প্রতিধ্বনির অনুরণন ঊনবিংশ শতাব্দীতে পর্যন্ত শোনা গেছে। এখানে আমরা উল্লেখ করব যে বুদ্ধ ও শিবের (বিষ্ণুর নয়) মূর্তি কুষাণ মুদ্রায় ছাপা হয়েছিল। সেইসঙ্গে, বৌদ্ধধর্ম বেশ জোরের সাথেই উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অংশেই প্রচলিত ছিল; প্রথমোক্ত অংশে অন্তর্নিহিত শক্তির কারণে এবং দ্বিতীয়োক্ত অংশে সভ্যতা অর্জনের লক্ষ্য তখনও পূর্ণ হয়নি বলে। বিখ্যাত বৌদ্ধগুরু মাতৃচেত-র একটি চিঠির সন্ধান আমরা পেয়েছি[১১] যা কোন এক অনামী (কিন্তু, মনে হয়, কুষাণ) শাসককে লেখা। সেখানে তাঁকে পশুহত্যা না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধে মানবহত্যা সম্পর্কে কোন

উল্লেখ নেই। একটি অত্যন্ত বিতর্কিত শাস্ত্র অনুসারে, কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধদের চতুর্থ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। তা হল, বৌদ্ধদর্শনের দুটি ধারার মধ্যে বিভাজন। উত্তরের মানুষরা দাবি করল মহাযান—সুনির্দিষ্ট ভাবে যা অভিজাত ও প্রদেশ শাসকদের প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; প্রাচীন বৌদ্ধ মঠগুলিকে এরাই উপঢৌকন যুগিয়ে আসছিল। মহাযান ধারা নিজেদের ভাষা পরিবর্তিত করে নিল সংস্কৃতে—যদিও সেই পরিবর্তন পাণিনিয় ধরনের সতর্কতায় সব সময় করা হয়নি; বৌদ্ধদের মিশ্র সংস্কৃত নিজেই একটা বাগধারা সৃষ্টি করেছিল। তারা তাদের তত্ত্বের সূক্ষ্মতা প্রদান, বিজ্ঞান-অন্বেষণ ও উচ্চতর বিমূর্ত দর্শনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আরো দূরে সরে গেল। রক্ষণশীল হীনযানরা (উত্তরাঞ্চলের শিক্ষিতরা অবজ্ঞাভরে তাদের এই নাম দিয়েছিল) এক প্রারম্ভিক দুরূহ বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করে চলল—তার সরল পালি ভাষা সমেত। পালি ভাষা দক্ষিণে, যেখানে এই সমস্ত ভিক্ষুরা তাদের অনুশাসনের প্রচার করত, সেখানকার সাধারণ মানুষের কথ্যরীতির থেকে সংস্কৃতের মতোই দূরবর্তী। উত্তরে যে কয়েকটি হীনযান মঠ টিকে ছিল সেখানে বিভাজনটা এতখানি প্রকট ছিল না। অন্যদিকে, মহাযান ধারাও খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে নিম্ন কৃষ্ণা অববাহিকা অঞ্চলের মতো সুদূর দক্ষিণে পৌঁছে গিয়েছিল। এই মতাবলম্বী ছিলেন বিজ্ঞানী ও ধর্মতত্ত্ববিদ স্বনামখ্যাত নাগার্জ্জুন—যিনি নাগার্জ্জুনকোন্ডায় প্রয়াত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। অন্য ধর্মমতগুলিও নিষিদ্ধ ছিল না। জৈনরা দক্ষিণে সবসময়ই প্রভাবশালী ছিল, এই সময় উত্তরেও তারা জমি পেল। মথুরার লাল বালিপাথরের চমৎকার কুষাণ ভাস্কর্যগুলিতে জৈন বৈশিষ্ট্যের অজস্র নিদর্শন আছে। এটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়—কেননা দরবারী অভিজাতদের এই মূর্তিগুলির পরনে আছে সূক্ষ্ম কাজ করা পোশাক—যার অর্থ বাণিজ্য, এবং সেই সূত্রে বণিকরাও—যাদের কাছে সম্ভবত অত্যধিক প্রশ্রয় প্রাপ্ত বৌদ্ধধর্মের চেয়ে জৈন ধর্মই ছিল বেশি গ্রহণযোগ্য। মথুরায় আরো উন্নত পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালালে কম বিনাশশীল পণ্যগুলি সম্পর্কে আমরা আরো বেশি তথ্য জানতে পারব—যেগুলির বিনিময় নিশ্চিতই এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রটিতে হয়েছে।

আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, মূল উৎপাদনগত যে পার্থক্য—যার ওপর বাকি সবকিছুই পরিশোভিত ছিল—তা হল মোটামুটি নিম্নোক্ত ধরনের। মহাযান মঠগুলি তাদের অধিকৃত বিপুল পরিমাণ জমি, ধাতু ও অন্যান্য উৎপাদন-উপকরণগুলি থেকে কাজ হাসিলে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিত। হীনযানদের সামগ্রিকভাবে, এ ব্যাপারে দক্ষতা ছিল অনেক কম—যদিও মধ্যস্থদের দৌলতে অনেক ক্ষেত্রেই এই পার্থক্যটা কমে গিয়েছিল (জে. গারনেট, ৭৪)। একেবারে গোড়ার দিকে, বুদ্ধের মৃত্যুর একশ বছর পরে বৈশালীতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক (A Bareau : *Less premiers conciles bouddhiques,* Ann. Musee Guimet LX, Paris 1955, নির্দিষ্টভাবে 145-7) দ্বিতীয় পরিষদে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। পরিষদ নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও ভজ্জিপুত্তক সম্প্রদায়ের লোকেরা সোনা ও রূপা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। এই নিষেধ *বিনয়*-তেও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবু, শীঘ্রই আর একটি পরিষদ ডাকতে হল এবং এক ধরনের অনৈক্য প্রকট হয়ে উঠল—যদিও, এবার তা এক জটিল ধর্মতাত্ত্বিক কূটকচালির ওপর ভিত্তি করে, কিন্তু নিঃসন্দেহে এর পেছনে ছিল একই অন্তর্নিহিত কারণ। পরবর্তীকালের সাতসিপুত্রিয় ও তাদের অসংখ্য অনুগামী ধারাগুলির উদ্ভব সম্ভবত ভজ্জিপুত্তকদের থেকেই। অত্যন্ত জটিল দর্শনের নীচে নিরাপদে লুকিয়ে থাকা অর্থনৈতিক উদ্গামটিকে খুঁজে বের করার চেয়ে আমরা বরং গোটাদেশের

আরও বিকশিত অর্থনৈতিক রূপটির মধ্যে মঠের জীবনচর্যা কোন্ অপরিহার্য প্রভাব ফেলেছিল সে দিকে তাকিয়ে দেখি।

৮.৫ উত্তরাঞ্চলের দুটি বিশাল পাললিক নদী-উপত্যকায় যে ভিন্ন পদ্ধতিগুলির সাহায্যে কৃষিবসতির বিকাশ ঘটেছিল সেগুলির কথা আমরা আলোচনা করেছি। এ সব পদ্ধতি দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অপ্রতুল জলের উৎস সমন্বিত পাহাড়ী এলাকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উর্বরা ভূখন্ডগুলির পক্ষে উপযোগী ছিল না; বা অতিবৃষ্টি ও গহন অরণ্য অধ্যুষিত উপকূলবর্তী সমভূমির পক্ষেও নয়। উত্তরের বণিকরা মৌর্যদের অনেক আগেই উপকূলপ্রান্ত বরাবর পৌঁছেছিল এবং সোনা ও বনজ সামগ্রীর জন্য খোদ মালভূমির মধ্যাঞ্চলে অত্যন্ত সীমিত ও অপ্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই অনুপ্রবেশ স্থানীয় অধিবাসীদের অন্তত কিছু পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল, তা না হলে মৌর্যদের পক্ষে বিজয়টা হত কঠিন ও অর্থহীন—ঠিক যেমন সিজারের পক্ষে জার্মানী জয়ের প্রশ্নই ছিল না, গলবিজয়টাই ছিল সহজ ও মূল্যবান।

দাক্ষিণাত্য নামটি এসেছে *সুত্তনিপাত* (৯৭৬-৭, ১৯৩১, ১০১১-১৪)-র দক্ষিণী (বাণিজ্য) পথ = দক্ষিণাপত থেকে। এর আভাষ প্রথম পাওয়া যায় *জাতক* (৩৯,২৬৪) এবং *সুত্তনিপাত*-র চতুর্থ সুত্তে-র দক্ষিণাগিরি (= দক্ষিণের পর্বত)-র উল্লেখে; শেষোক্তটিতে অবশ্য এর দ্বারা কেবলমাত্র মির্জাপুরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরের নিকটবর্তী পর্বতমালাকেই বোঝানো হয়েছে। বুদ্ধের সময়ে এই এলাকাগুলিতে জনবসতি ছিল এবং তিনি এখানে ধর্মপ্রচারও করেছেন। কাশী-ভরদ্বাজ নামের এক ব্রাহ্মণ কৃষক এখানে তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। এই অঞ্চলের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু জানা গেছে (এ. সি. কার্লাইল, *আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রিপোর্ট,* ২২,১৮৮৫; পুনরাবিষ্কার, মর্সেস. বি. আলচিন, *ম্যান* (নৃতত্ত্ব গবেষণার একটি জার্নাল), ১৯৫৮, ১৫৩-৫ ও প্লেট-M)। সমতলের গুরুত্বপূর্ণ সমাধি স্তূপগুলিতে পাওয়া গেছে মৃৎপাত্র এবং বিভিন্ন আকারের পাথরের হাতিয়ার, কিন্তু কোন ধাতুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। গুহাগুলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্ষুদ্র পাথরের হাতিয়ার, যদিও বসতির লক্ষণ খুবই সামান্য। রিপোর্টগুলিতে দেখানো হয়েছে যে ক্ষুদ্র পাথরের হাতিয়ার ব্যবহারকারীরা শুধু ধাতু-পূর্ব যুগেরই ছিল না, ছিল মৃৎপাত্র ব্যবহারেরও আগের যুগের; তাছাড়া (জেরিকোর প্রারম্ভিক স্তরগুলির ক্ষেত্রের মতোই), ক্ষুদ্র পাথরের হাতিয়ারগুলি বৃহত্তর পাথরের হাতিয়ারগুলির অনুষঙ্গ ছিল না। গুহা ব্যবহারকারীরা লাল হেমাটাইট দিয়ে আমাদের জন্য অদ্ভুত সব রেখাচিত্র এঁকে রেখে গেছে — যেখানে তাদের দেখা মিলছে তীর-ধনুক এবং সেইসঙ্গে মুগুর ও বর্শায় সজ্জিত হয়ে। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, চার-ঘোড়ার রথে চেপে একজন যুদ্ধ করছে পদাতিক আদিম মানুষদের সঙ্গে। আর এক (দুই-ঘোড়ার) রথারূঢ়কে দেখা যাচ্ছে ডান হাত দিয়ে অর-লাগানো একটি চাকা ছুঁড়ে মারছে। গাঙ্গেয় দেবতা নারায়ণ-কৃষ্ণের ধারাল ক্ষেপণাস্ত্র 'চক্র'—যা দিয়ে তিনি এক কুমীরের মাথা কেটে ফেলেছিলেন এবং *মহাভারতে*-র উপাখ্যান অনুসারে, চেদিরাজ শিশুপালের শিরশ্ছেদ করেন—এটি তার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। *ঋগ্‌বেদ* (৮.৫.৩৭-৩৯)-এ উল্লিখিত চেদি-রা সম্ভবত প্রাচীন মদ্র উপজাতি। *মহাভারতে*-র চেদি রাজ্য ছিল আমাদের আলোচ্য অঞ্চলেই, কিংবা আরও কিছুটা দক্ষিণে। বসতির বিচারে এবং বুদ্ধের আমলের বহু আগেই ধারালো চক্রের মতো অস্ত্রের বিলুপ্তির কথা মাথায় রাখলে গুহাচিত্রগুলির অঙ্কনকালকে যুক্তিসম্মতভাবেই ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে—যা, পৌরাণিক বংশ বৃত্তান্তের নিরিখে পারজিটার ও অন্যদের নির্ণয় অনুযায়ী

কথিত *মহাভারত*- যুদ্ধেরও কাল। রথারোহীরা সম্ভবত লৌহ-আকরিকের উৎসগুলি দখলের জন্য সচেষ্ট ছিল, অন্যদিকে হেমাটাইট-ই ছিল আদিম মানুষদের একমাত্র রঞ্জক পদার্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ছোট পাথরের হাতিয়ারগুলি আকারগত, বস্তুগত, এবং ধার-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার হাতিয়ারগুলিরই অনুরূপ।

গাঙ্গেয় উপত্যকার ছোট পাথরের হাতিয়ারগুলির প্রকাশিত বিবরণ (ভিনসেন্ট স্মিথ, *ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুইটি* ৩৫.১৯০৬, ১৮৫-৯৫) আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হাতিয়ারগুলির সঙ্গে আকারে, নির্মাণবস্তুতে ও ধার-বৈশিষ্ট্যে হুবহু মিলে যায়। বস্তুত, দাক্ষিণাত্যে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাহাড়ের ওপরের পাথর টুকরোগুলো সামগ্রিকভাবে অপরিমার্জিত, কিন্তু সেগুলির মধ্য থেকে (যেমন, বেতালের আশপাশে) ১৭ মি.মি. লম্বা, ১ থেকে ৪ মি.মি. চওড়া, সযত্নে ধার দেওয়া চমৎকার সূক্ষ্ম নমুনাগুলিও খুঁজে পাওয়া যায় (আমার সংগ্রহ থেকে কিছু ফলা ও সেগুলির মাপসই মূল অংশ খড়কওয়াস্‌লা-র ন্যাশনাল ডিফেন্স আকাদেমি-র মিউজিয়ামে জমা দিয়েছি)। এমনকী অলঙ্কারশিল্পীদের পক্ষেও দৃষ্টান্তযোগ্য এই টুকরোগুলো এমন সূক্ষ্মতা ও নিপুণতার সঙ্গে কাটা যে কেবলমাত্র শল্য ব্যবচ্ছেদ-সরঞ্জামের কথাই মনে হবে—যা দিয়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় প্রদত্ত বলির ব্যবচ্ছেদ হত অথবা কোন ভক্ত রক্তোৎসর্গ আচার পালন করত। প্রকৃতপক্ষে এই পাথরগুলি ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের গা বরাবর কিছুটা উচ্চতা পর্যন্ত এবং তা ভূমিরই কাছাকাছি, চূড়ার নয়। এখানে, সাধারণভাবে নির্মাণকৌশল অনেকটা ভাল কিন্তু 'শল্য সরঞ্জামগুলি' হয়ে দাঁড়িয়েছি ২২ মি.মি. দৈর্ঘ্যের ফলকে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন মৃৎপাত্র বা বড় পাথরের হাতিয়ার পাওয়া যায়নি; আবিষ্কারগুলি মিলেছে উপরিতলে সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে থাকা অবস্থায় নয়, বরং এক মাইল বা এই রকম দূরে দূরে পুঞ্জীকৃত অবস্থায়। খনন চালিয়ে প্রকৃত স্তর-সন্ধান সম্ভব নয়। চুনের গুঁড়োগুলো মাটির সঙ্গে মিশে 'মেঝে' তৈরি করেছে এবং পাথরের কারিগরিগুলো কাদার মধ্যে ডুবে গেছে। বন কাটার ফলে ধুয়ে গেছে ওপরের স্তরের মাটি, রয়েছে কেবল ক্ষয়রোধক এবং উদ্ভিদের জন্মরোধক শক্ত চুনাপাথর পরিব্যাপ্ত উপরিতল যার ভেতর থেকে উঁকি মারছে হাতিয়ারগুলি। এর মধ্যেও যেখানে যতটুকু ফাঁক পাওয়া গেছে সেখান থেকেই স্তর-বিন্যাসের অন্তত আংশিক উদ্ঘাটনও সম্ভব হয়েছে; বর্তমান উপরিতলের বড়জোর ছ'ফুট নীচেয় লুকিয়ে থাকা হাতিয়ারগুলির মতো একই ধরন ও আকারের হাতিয়ার 'শ্বেত মৃত্তিকা'-ও অবশ্য ধারণ করছে, কিন্তু তা কখনই স্তূপাকারে নয়।

ক্ষুদ্র পাথরের হাতিয়ারগুলি পশ্চিম উপকূলমুখী গিরিপথগুলোয় পাহাড়ের গা বরাবর নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাবে পান্ধারপুরের নিকটস্থ বৃহত্তর হাত-কুঠারের এলাকা পর্যন্ত, এবং তার পরেও। সবচেয়ে ভালভাবে, স্তূপীকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় সেই সমস্ত ধর্মস্থানে যেখানে এখনও পূজার্চনা হয়—কিন্তু সেগুলো নিকটস্থ গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে দূরে (সাধারণত এক মাইলেরও বেশি)। দুই বা ততোধিক পথের সঙ্গমস্থলে এই ধর্মস্থানগুলিই ছিল প্রাচীন সম্মিলনক্ষেত্র—যেখানে আদিম গোষ্ঠীগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মিলিত হত। সাধারণ-অবয়বহীন, রক্তবর্ণরঞ্জিত প্রস্তরখণ্ডগুলির একটা উল্লেখযোগ্য অংশই এখনও দেবীমূর্তি হিসেবে স্বীকৃত। অনেকের নামও বেশ চমৎকার (যেমন, ওয়ারসুবাঈ, উদলাঈ, মৃহাত্রিয়াঈ, বোলহাঈ, করজাঈ, ইনজাবাঈ অথবা কর্জটে-র ধাপায়া-র মতো অত্যন্ত দুর্লভ কোন পুরুষ দেবতা)—যার অর্থ বা

ব্যুৎপত্তি-সংক্রান্ত কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; এবং প্রত্যেকের দেখাও মেলে শুধুমাত্র কোন একটি জায়গাতেই। এঁরা নিশ্চিতই দীর্ঘকাল ধরে পূজিত প্রাচীন ছোট ছোট উপজাতি গোষ্ঠীর দেবদেবী—পরে বিলুপ্ত হয়েছেন অথবা মিশে গেছেন সাধারণ জনসমাজের সঙ্গে। পথগুলি বর্তমানে বন কাটা ও চাষবাসের ফলে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে, টিকে আছে মেষচারকদের ঘোরা-পথ হিসেবেই (সাধারণভাবে বছরে ৩০০ থেকে ৪০০ মাইল অতিক্রম করতে হয়); সবচেয়ে দীর্ঘতম হল পান্ধারপুরগামী তীর্থপথটি। নদী তীরমুখী ধারাবাহিক চলাচল সবচেয়ে ভাল প্রত্যক্ষ করা যায় তলেগাঁও থেকে আট মাইল দূরের নবলাখ আম্বের-এ। মূল চারণ-গ্রামটি ছিল এক মালভূমির শিখরে—যেখানে গ্রামের রক্ষক দেবতার আদি থানটি এখনও আছে এবং গবাদি পশুগুলি বছরের অর্ধেক সময় এখনও চরে বেড়ায়। পাহাড়টির ঠিক নীচেই রয়েছে একটি হনুমান মন্দির—যা দ্বিতীয় গ্রামের চিহ্ন। নদী তীরের কাছাকাছি বিলুপ্ত হয়ে আসা যে গ্রামটি চোখে পড়ে—সামন্তযুগে তা ছিল এক সুন্দর নগরী।

এ হল মধ্যপ্রস্তর যুগের শান্তিপ্রিয় যাযাবর-জীবনের ছবি—যে জীবন তৎকালীন ঘন অরণ্য আচ্ছাদিত নিম্ন উপত্যকা থেকে দূরে পাহাড়ের গায়ে পশুপালনের মধ্য দিয়েই কেটে যেত। ছোট পাথরের হাতিয়ারগুলি ব্যবহৃত হত চামড়া ছাড়ানো, চামড়ার নীচের তন্তুগুলিকে কেটে বিনা রাসায়নিকে তার ক্ষত নিরাময় সমেত নানা সূক্ষ্ম চামড়ার কাজে; মাংসপেশী কাটা (এবং ঝুড়ির জন্য গাছের ডাল) ইত্যাদি মৃৎপাত্র-পূর্ব খাদ্য সংরক্ষণের যাবতীয় দরকারে। বাস্তবিকপক্ষে, কিছু কিছু মেষপালক ধাঙ্গড় (তিন-চারটি পরিবার শ'তিনেক ভেড়ার পাল নিয়ে বার্ষিক দীর্ঘ মেষচারণ পর্ব শেষ করার পর) এখনো খাসি করার কাজে পাথরকুচি ব্যবহার করে, কেননা ধাতুর ছুরিতে কাটলে মাঠের পরিবেশ থেকে কাটা জায়গায় সংক্রমণ ঘটে যেতে পারে। মধ্যপ্রস্তরযুগের মানুষেরা অল্পই শিকার করত এবং ছোট ছোট যেসব ফলা পাওয়া গেছে সেগুলো সম্ভবত তীরের মাথায় ব্যবহার করা হত। পাহাড়ের গায়ে হালের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন চত্বরগুলিকে দেখলে আপাতভাবে মনে হয়, ঝুম-পদ্ধতিতে চাষের কিছুটা চেষ্টা তারা চালাত। ঘষামাজা না করা ছোট পাথরগুলি দিয়ে সীমারেখা বরাবর ফুটখানেক উঁচু দেওয়াল গড়া হত। জুন্নার যাওয়ার পথে (এবং তার পরেও, তুলজা গুহার আশপাশ পর্যন্ত) মুলশি ও খড়কওয়াস্‌লা উপত্যকা-য় এবং অন্যত্র সীমাচিহ্নিত ফালি জমিগুলি নিশ্চিতই ধাতুপূর্ব যুগের। ঝুম-চাষপদ্ধতি এক অদ্ভুত ঐতিহ্য রেখে গেছে ধান চাষের ক্ষেত্রে—যেখানে লতাপাতা, খড়,গোবর এবং লালমাটির মিশ্রণ (জমির উৎকর্ষতা অনুযায়ী)-এর আস্তরণ বিছিয়ে ধানখেতটিকে সযত্নে তৈরি করা হয়, তারপর নিয়ন্ত্রিতভাবে সেটিকে পুড়িয়ে জমির উর্বরতা বাড়ানো হয়। মধ্যপ্রস্তর যুগে সংগৃহীত খাদ্য এবং পশুপালের থেকে পাওয়া খাদ্যের তুলনায় শস্যের গুরুত্ব হয়ত অল্পই ছিল।

মূল্য ও বিনিময়ের নতুন ধারণা নিয়ে উত্তরের বণিকদের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আদিম দ্রব্য-বিনিময়ই ছিল লেনদেনের একমাত্র মাধ্যম—যে সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মালিনোস্কি। উপকূল থেকে লবণ ও কড়ি অবশ্যই আসত, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। মগধের পণ্যবাহী বণিক্‌দলের সামনে এক মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দাক্ষিণাত্যের মালভূমির ২০০০ ফুট উঁচু এক খাড়াই পাহাড় এবং তার আগের কয়েকটি রীতিমত দুর্গম গিরিবর্ত্ম। লমাং-রা এখনো মালবাহী পশুর পিঠে চাপিয়ে এই গিরিবর্ত্মগুলোর চড়াই-উৎরাই ভেঙে লবণ ও কিছু খাদ্য শস্য বয়ে নিয়ে যায়—যদিও তাদের মূলত ভাড়া করা হয় জঙ্গলে পোড়ানো কাঠকয়লা বয়ে

সুবিধাজনক গুদামগুলোতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেখান থেকে লরিতে সেগুলো পৌঁছে যায় শহরে। সুতরাং, গিরিবর্ত্মগুলি সঠিক পথ নির্ধারণের পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে। চোউল-এর বন্দর থেকে নাঙেখাত-এর উপরে জুন্নার পর্যন্ত মূল যে পথটি ছিল তার কিছু অংশ এখনও ব্যবহৃত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত জুন্নার-এ প্রতি রবিবার একটা হাট বসে—যেখান থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে জিনিসপত্রের সরবরাহ হয়। পিঠে বোঝা নিয়ে কমবেশি শ'তিনেক মালবাহী পশুর পাল যখন নাঙঘাট-এর পিচ্ছিল পথ বেয়ে নেমে আসে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোমবার সকালে)—সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। এইসব পথের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল, এমনকী যখন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকেছে তখনও, এদের সংযোগস্থলগুলিতে তৈরি হয়েছে বিশাল বিশাল বৌদ্ধ গুম্ফা এবং আরও অনেক পরে, মধ্যযুগে এগুলির আশপাশে রণনৈতিক কারণে গড়ে উঠেছে দুর্গ। এগুলো এমনই সুনিশ্চিত ইঙ্গিত বহন করে যে, কোন মানচিত্রে চিহ্নিত বা গেজেটিয়ারে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও থানালে ও করসম্বলের কাছে দুটো বিশাল গুহা-সমাহার পুনরাবিষ্কার (*টাইমস অফ ইন্ডিয়া,* মার্চ ১৯,১৯৫৮) করা সম্ভব হয়েছে। শুধু, মূল পথের ওপর মধ্যযুগীয় দুর্গগুলির দ্বারা সুরক্ষিত (ওপরে কোরিগড়, নীচে সুধাগড়) ভাগজাই ও সবাস্নি-র চমৎকার গিরিপথ দুটি লক্ষ্য করার ফলেই তা ঘটেছে। যুক্তি অনুসারেই ওখানে গুহা থাকার কথা এবং ছিলও। যথাক্রমে ২৮ ও ৩৭টি বৃহৎ গুহা সমন্বিত সমাহার দুটির উন্মুক্ত বহির্ভাগ বর্ষার প্রবল বৃষ্টিপাতে বিলুপ্ত হলেও যা রয়ে গেছে তা থেকে ভালভাবেই বোঝা যায় যে এগুলো ছিল বিলাসবহুল বৌদ্ধ মঠ; দেওয়ালের চিত্রগুলো ছিল অজন্তার মতোই সমৃদ্ধ, আর ছিল বিশেষ ধরনের গর্ভগৃহ—যেগুলো দেখে কেবলমাত্র কোষাগার বলেই মনে হবে। গোটা পথ বরাবর, খুব বেশি হলে পাঁচ মাইল অন্তর অন্তর রয়েছে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র কক্ষ। ভামচন্দারে তুকারামের পাহাড়ে বা দেহু ছাড়িয়ে ভান্ডারা-র মতো জায়গাগুলিতে কক্ষগুলি গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক গুহা থেকেই এবং ক্ষুদ্র প্রস্তরযুগের চমৎকার সব নিদর্শন ও সেই সঙ্গে অধুনা নিম্ন উপত্যকায় প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসগুলির একদা পুণ্যস্থান হবার লক্ষণ এগুলিতে স্পষ্ট। কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টান্তমূলক গুহা-সমাহারগুলি (কোন্ডানে, জুন্নার,কার্লে, ভাজা, বেড়া, নাসিক, করাড়, শিবওয়াল, ইলোরা, অজন্তা) রয়েছে হয় প্রধান পথগুলির সংযোগস্থলে অথবা মহাড়, কুড়া ও কহ্হেরি-র মতো মোড়গুলিতে।

বৌদ্ধ মঠগুলির এই স্থান নির্বাচন খুবই যুক্তিসম্মত। প্রারম্ভিক ভিক্ষুরা এসেছিল আদি পথগুলি ধরেই; তখনকার দিনে তারা ছিল ভাল খাদ্যসংগ্রহকারী (*সুত্তনিপাত* ২৩৯ ইত্যাদি, এবং *জাতকের* নানা কাহিনী দ্রষ্টব্য), আর পণ্যবাহী দলগুলি প্রয়োজনে তাদের সঙ্গ দিত। চৌমাথাগুলিতে শ্রোতা পাওয়ার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। ভিক্ষুদের বিশেষ উদ্দেশ্যটা ছিল দেবস্থানগুলিতে প্রচলিত বলি প্রথার বিলোপ। প্রকৃতপক্ষে, অশোকেরও শ্রদ্ধা-আকর্ষণকারী একটি সূত্তে বুদ্ধ ভিক্ষুদের নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ 'নিজের ইন্দ্রিয়সুখ জয় করতে আগ্রহী ভিক্ষুরা (রাত্রিতে) নির্জন আশ্রয়ে বাস করবেন কোন বৃক্ষতলে (গ্রামের বাইরের), শ্মশানে, অথবা পাহাড়ের গায়ের কোন গুহায় (*সুত্তনিপাত,* ৯৫৮)।... যেহেতু আত্মোৎকর্ষতা অর্জনই তাঁর লক্ষ্য তাই অপরিচিত ধর্মবিশ্বাসের মানুষদের ভয়ঙ্কর প্রথাগুলিতে ভীত না হয়ে সেগুলিকে এবং অন্যান্য বিঘ্নগুলিকে তাঁকে এড়িয়ে চলতে হবে পরোক্ষভাবে' (*সুত্তনিপাত,* ৯৬৫)। অনেক *জাতক* কাহিনীতেই বুদ্ধ কিভাবে তাঁর বিভিন্ন পূর্বজন্মে নরবলি বা রক্তোৎসর্গ বন্ধ করেছিলেন তার বর্ণনা আছে। এর মধ্যে অন্তত একটি ঘটনাস্থলের কথা ঐতিহাসিক কালেও স্মরণ করা

হত—তা হল, কুরুদেশের কম্মাস-ধম্ম গ্রাম (*জাতক* ৫৩৭, *রত্থাপল*-সুত্ত, প্রভৃতি)। বলিস্থানের গাছটি কেটে ফেলা হয়নি, বরং অপদেবতাটির রূপান্তরণ ঘটিয়ে তাকে আবার পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল প্রধান উৎসর্গের গ্রহীতা হিসেবেই—যদিও তা রক্তপাতহীন (*অগ্গবলি-পতিগ্গাহকা*)। পূর্বতন দেবস্থানগুলির সঙ্গে বৌদ্ধ গুহাগুলির সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়া নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ফার্গুসন কলেজ গুহার উপরে ক্ষুদ্র প্রস্তরযুগের একটি নিদর্শনক্ষেত্রের ক্ষয়িষ্ণু বেতাল-মূর্তিটিকে সরিয়ে সম্প্রতি একটি হনুমান-মূর্তি বসানো হয়েছে। একই গুহার নীচে, কলেজের অব্যবহৃত জলাধারগুলির পাশে উৎকৃষ্ট ধরনের প্রচুর পরিমাণ ছোট পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। কার্লে-তে দেবীমাতৃকা ও মৃত্যুর দেবী যামাই-র পূজা খুব ধুমধাম করে হয়; ব্রাহ্মণ্য রূপান্তরণে ইনি হয়েছেন একবীরা রেনুকা—কিন্তু সূদূর বোম্বাই থেকে আসা কোলিদেরও ইনি পূজ্যা। তারা এঁকে চৈত্য গুহার অভ্যন্তরের মহাস্তূপ বলেই মনে করে এবং তাদের পরিবারের রক্ষক দেবী যামাই-র ব্রত করে পাওয়া সন্তানকে নিয়ে এই স্তূপ প্রদক্ষিণ করে। জুন্নার-এর কাছের মানমোড়ি গুহাগুলিতে দেবী মানমোড়ির পূজা হয়, কখনও কখনও ভিন্ন নাম অম্বিকায়। যে তিনটি ভগ্ন মূর্তিকে এই পূজা দেওয়া হয় তার কোনটাই কিন্তু নারী নয়, আপাতভাবে মনে হয় এগুলি হল বোধিসত্ত্বের মহাযান বুদ্ধদের! একটি খোদাইয়ে এই স্থানটির মানমকুড়া নামটির উল্লেখ আছে—যা প্রমাণ করে, ধর্মবিশ্বাসটি গুহাগুলির চেয়ে প্রাচীন। কার্লে-তে চৈত্য গুহার বহির্মুখে উৎকীর্ণ রয়েছে 'মামালে' বা 'মামাল-হার'-এর শাসকের উদ্দেশ্যে শাতবাহনের একটি সনদ। নামটি স্পষ্টতই বর্তমানের মাভল; পৌন মাভল-এর দুটি মাভল তালুকে এই নামটির উদ্ভব ঘটেছে মাভলা-দেবীর নাম থেকে। অনাম্নী জলদেবীরা সেখানে এক সঙ্গে পূজিতা হন বহুবাচনিক এই মাভলা-দেবী নামে। এর সঙ্গে হুবহু মিল *সুত্তনিপাত* (৬৮৩)-এ বুদ্ধের জন্মগ্রহণের অঞ্চলটিকে 'লুম্বিনি জেলা' (পানপদ লুম্বিনেয়ি) হিসেবে বর্ণনার; সেখানকার অনেক আলাদা আলাদা গ্রামে এখনও রুম্মিন-দেইর পূজার প্রচলন আছে।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এই সুমার্জিত প্রভাবের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের বড় বড় গুহামঠগুলির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। ইতিমধ্যে, ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেই সেগুলি যথেষ্ট বিপুলাকার হয়ে উঠেছিল এবং তাদের সম্পদ বেড়ে চলেছিল সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত। খোদাইগুলি থেকে জানা যায় যে দলবদ্ধভাবে বাণিজ্যে যাওয়া বণিকেরা উদারহস্তে দান করত এবং এও প্রমাণিত যে অবসরগ্রহণকারী বণিকরা তাদের সম্পদ পেশা বহির্ভূত আত্মীয়স্বজন বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রচলিত রীতি ভেঙে সেসব সমেত মঠে যোগ দিত। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ধেনুকাকত-এর বণিক সম্প্রদায়ের কার্লে-র চৈত্য গুহামঠে যোগদান (*জার্নাল অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ লন্ডন* ৩০-২, ১৯৫৬, ৫০-৭১ + ৪টি প্লেট)। গোড়ার দিকের বণিকদের (*বানিয়া-গাম*) এই উল্লেখযোগ্য সংযুক্তি ছাড়াও এ অঞ্চলে সম্পদশালী ও বদান্য গ্রীক বণিকদের বসতি ছিল। তাদেরই একজন কোন ক্ষুদ্র শিলামূর্তির আদলে তৈরি একটি স্ফিংকস্-মূর্তি (কম আলোর জন্য এতদিন এটা নজরে পড়েনি) সমেত চৈত্য-র ত্রয়োদশ স্তম্ভটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। ভাজা-র ভারতীয় রূপের অশ্বমানব মূর্তিগুলি এবং নাসিক, পিতলখোরা, ভারহুত-এর সিংহ-সর্প-ছাগ মিশ্রণে গঠিত দানবমূর্তিগুলি একটা যোগসূত্রের সন্ধান দেয় যা গান্ধার হয়ে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ধেনুকাকতন যবনরা বিদেশ থেকে খুব সম্ভবত চোউল হয়ে সমুদ্রপথে তাদের পণ্য আমদানি

করত। জায়গাটিকে উপদ্বীপের ঠিক আড়াআড়ি বর্তমান ধরণীকোটা এবং ডোংগ্রি গ্রামটি সলচেত দ্বীপের উত্তর প্রান্তে বলে মনে করা হয়—কিন্তু তা কার্লে গুহার নিকটবর্তী বর্তমানের দেবঘর নামের ছোট গ্রামটিতে হওয়াটাই বেশি সম্ভব। চীনা নথিগুলি থেকে দেখা যায় যে গোড়ার দিকের বৌদ্ধ মঠগুলি সচেতনভাবে ভারতীয় রীতি অনুসরণ করেই কিভাবে চীনের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল (জে. গারনেট)। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, মহাজনী, প্রত্যক্ষ কৃষিকাজ, কৃষিভিত্তিক বসতিস্থাপনে উৎসাহদান ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিল। তাছাড়াও, চীনে এই সমস্ত কাজের প্রধান উদ্যোগটা ছিল মহাসংঘিকাদের এবং কার্লে-র সুন্দর গুহাগুলিও তাদেরই। ভারতীয় গুহামঠগুলির অমিত সম্পদের প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের বিপুল ধ্বংসস্তূপ থেকেই। স্পষ্টতই এগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা এবং সেই সঙ্গে পণ্যবাহী বণিকদের ব্যাঙ্ক ও সামগ্রী সরবরাহের ঘাঁটি। ধার্মিকতার কারণে এদের যথেষ্ট সম্মান ছিল—যা বাজেয়াপ্ত হওয়ার হাত থেকে তাদের সম্পদকে রক্ষা করত; বাস্তবিক পক্ষে, রাজারা এগুলিকে বিপুল অনুদান দিয়ে সাহায্যই করত। *বিনয়* আইন সত্ত্বেও, পাপের পথ পরিত্যাগ করতে চাওয়া অনুতপ্ত ডাকাতরা বা বাকি সকলেও মঠগুলিকে এক নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে গণ্য করত। কাথকরি বা অন্য আদিবাসী যারা তখনও এ অঞ্চলে টিকে ছিল, তাদের এবং গ্রামবাসীদের দুর্ভিক্ষের সময় পরহিতকর কাজ হিসেবে মঠগুলি দেখাশোনা করত। মঠগুলির প্রভাব এ অঞ্চলের ভাষাতেও প্রত্যক্ষ করা যায়—যার উদ্ভব ঘটেছিল উত্তরাঞ্চলীয় প্রাকৃত-ভাষা থেকে। মারাঠী 'লেনিং' শব্দটি এসেছে গুহাগুলির খোদাই থেকে, কিন্তু মাভল-এর কৃষকরা গুহাগুলিকে এখনও 'বেহের' বলে উল্লেখ করে — যা প্রাচীন 'বিহার' শব্দেরই অপভ্রংশ। উত্তরাঞ্চলের বাঁকানো জোয়াল ও খাড়া হাতল লাগানো যেসব লাঙ্গল কুষাণ ভাস্কর্যে দেখা যায় মহারাষ্ট্রে তা কদাচিৎ চোখে পড়ে, অথচ জুন্নার ও দেহু-র গুহাগুলির আশপাশে এর ব্যবহার এখনও হয়। শাতবাহন রাজারা এখানে লাঙ্গলের প্রবর্তন করেননি, বরং উল্টোদিকে, লাঙ্গল চাষ পদ্ধতিই এখানে কর প্রদানযোগ্য নিয়মিত সংগঠক হিসেবে শাতবাহন শাসনকে সম্ভব করে তুলেছিল।

চিত্র ৩৫ : কার্লে-র চৈত্য গুহায় বামদিকের তৃতীয় স্তম্ভে গ্রীক ধম্ম কৃত উৎসর্গলিপি।

গোদাবরীর তীর পর্যন্ত পণ্যবাহী বণিক যাত্রীদলকে সঙ্গদান ব্রাহ্মণরাও করত এবং তা বৌদ্ধদের আগে থেকেই। *সুত্তনিপাত*-র শেষ অংশে দেখানো হয়েছে যে তারা মগধের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত, কিন্তু ব্যস্ত থাকত মূলত বৈদিক ক্রিয়াচার ও উপনিষদের চর্চা নিয়েই। জুন্নার-এর বৃহৎ বাণিজ্য নগরীটি গড়ে ওঠার পর পুরোহিতরা নিজে থেকেই সেখানে এসেছিল। এর প্রকৃত নাম ছিল সম্ভবত টগর। জুন্নার হল নিছকই 'প্রাচীন নগরী'টির সংকুচিত রূপ, কেননা পনেরো মাইল দূরবর্তী ওতিয়ুর হল উত্তরপুর অর্থাৎ 'উত্তরের শহর' এবং নাণ্ডেঘাট যাওয়ার পথে রাজ্জিয়র গ্রামটি হল 'রাজার শহর' রাজপুর। শাতবাহন বংশের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নথিগুলি রয়েছে নাণ্ডঘাট গিরিবর্ষের উপরের বৃহৎ গুহাগুলিতে। এগুলি ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ের শুল্ক আদায়কারীদের প্রশাসনিক গুহা, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিভৃত-সাধনার মঠ নয়। গুহাগাত্রের সাড়ম্বর খোদাই-এ বৈদিক বলিদান এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের হাজার হাজার গবাদি পশু, অশ্ব, হস্তী, রথ ইত্যাদি দান করার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। এই পুরোহিতরাই

পূর্বতন উপজাতীয় প্রধানদের উপজাতীয় আইনের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং ধর্মীয় অনুমোদন সহকারে বর্ণের ভিত্তিতে নতুন শ্রেণী কাঠামোর প্রবর্তন ঘটিয়েছিল। গুহার পিছনের দেওয়ালে এক সময় রাজপুরুষদের ছবি খোদাই করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে সেগুলির মাথার ওপরের নাম এবং পা ও পোষাকের উঁচু হয়ে থাকা অংশ ছাড়া বাকি সবই মিলিয়ে গেছে। এগুলি সম্ভবত উত্তরাঞ্চলের বিশিষ্ট কুষাণ চিত্র-ভাস্কর্যের অনুকরণে তৈরি। গ্রাম-বসতির সাধারণ বিস্তারের সাথে সাথে বিলাসদ্রব্যের ব্যবসা সঙ্কুচিত হতে থাকে, কিন্তু গ্রামগুলির মাধ্যমে সার্বিক ব্যাবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘঠে। মঠগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকা বিশিষ্ট বণিকশ্রেণীর সংখ্যা হ্রাস পায়। বৌদ্ধ মঠগুলি তখন অর্থনীতির ক্ষেত্রে অপচয়কর হয়ে দাঁড়ায়, কেননা মূল্যবান ধাতু ও ব্রোঞ্জে তৈরি মূর্তিগুলির মধ্যে একটা বিপুল মূলধন আটকে পড়ে থাকে (ফলে একান্ত প্রয়োজনীয় মুদ্রা ও নোট তৈরির কাজ ব্যাহত হয়েছিল)। মঠ অধীনস্থ অসংখ্য গ্রামের রাজস্ব চলে গিয়েছিল রাজার হাতে। কার্লে ও কুড়া-তে নরনারীর যেসব মনোহর যুগলমূর্তি খোদাই করা আছে—হতে পারে সেগুলি দাতাদের, কিন্তু তপস্বীদের সমাবেশস্থলে অলঙ্কৃত হবার উপযোগী মূর্তি এগুলি নয়। পুরুষ ও নারী উভয়দের চুলই চূড়া করে বাঁধা। প্রচুর অলংকার ও স্বচ্ছ পোশাকের আবরণে সুন্দরী নারীরা হয়ে উঠেছে আরো মনোরমা এবং তাদের অনিন্দ্য সুন্দর স্তনগুলি রাখা হয়েছে অনাবৃত। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য যুগে, অজন্তায় বোধিসত্ত্বেরা মণিমুক্তাখচিত মুকুট পরত; তাদের ছিল অতিমানবিক মর্যাদা। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুতে ছিল তাদের স্থান ; সম্পদহীন ভিক্ষু—বুদ্ধ নিজেও যা ছিলেন—সে জীবনের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নেই। অন্যদিকে ব্রাহ্মণরা তখন ধীরে ধীরে শিখে নিচ্ছিল কিভাবে স্থানিক ধর্ম বিশ্বাসগুলিকে আত্মস্থ করে নিতে হয়; নিজেদের তারা অপরিহার্য করে তুলছিল একই সঙ্গে রাষ্ট্রের কাছে এবং প্রকৃত পশ্চাদপদ গ্রামীণ মানুষদের কাছেও। সুতরাং, হরিশচন্দ্রগড়ের মতো ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠা ষষ্ঠ শতকের আগের নয়। শিরওয়ালের অনতিদূরের সুন্দর অথচ ছোট ছোট যাদব মন্দিরগুলিও গুপ্ত আমলের সাঁচীর সপ্তদশ মন্দিরের আগের হতে পারে না; ভারসাম্য ও অনুপাত সমেত রেখার নিখুঁতত্বে প্রায় গ্রীক মানের এই মন্দিরটির সঙ্গে সেগুলির সাদৃশ্য আছে।

আদিম অবশেষগুলির চিহ্ন রয়ে গেছে কোলি, ঠাকুর বা অন্য উপজাতিদের বিশ্লিষ্ট শাখার নিরাবয়র দেবী মাতৃকাদের গ্রাম বহির্ভূত ছাদহীন থানগুলির মধ্যে; এঁরা প্রত্যেকেই আছেন তাঁদের নিজস্ব 'কুঞ্জবনে' এবং অভিহিত হন 'পল্লী-আভলি' নামে বা গ্রামনামের অনুকরণে (কান্দিভ্‌লি, লোনাভ্‌লি, দোমবিভ্‌লি প্রভৃতি), যা থেকে আদিম উপজাতিক ছোট ছোট গ্রামগুলির অস্তিত্বের ইঙ্গিত বোঝা যায়।

৮.৬ দান যারা করত তাদের বৈশিষ্ট্যের দিকটা আজও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। গ্রীক ধম্ম যবন-এর স্তম্ভটির রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন সোপারা-র এক সাধারণ শিষ্য। (সমুদ্র উপকূলে থানা-র কাছে সোপারা এখন আর পাঁচটা গ্রামের মতোই একটা গ্রাম, কিন্তু এক সময় অশোকের অনুশাসন খোদাই করার কাজের জন্য তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টলেমি একে এক বিখ্যাত বন্দর হিসেবে জানতেন এবং *পেরিপ্লাস*-এও তার উল্লেখ আছে।)সোপারার এই পৃষ্ঠপোষক শিষ্যটি যিনি স্তম্ভটির নির্মাণ খরচ যুগিয়েছিলেন—তিনি ছিলেন বিজয়ন্তী-র মহাজন (*শেঠিন*) ভূতপাল-এর মতোই একজন সম্পন্ন ব্যক্তি। ভূতপাল 'ভারতের সবচেয়ে সুন্দর এই মর্মর-ভবনটি নির্মাণের কাজ শেষ করেছিলেন' (*পরিনিখাপিতম*)। তোরণদ্বারের দু'পাশে তাঁর দানে নির্মিত পাঁচতলা উঁচু

চমৎকার ভাস্কর্যগুলো দেখে সেই সময়কার কথা বিবেচনা করলে এই গর্ববোধ যে সঙ্গত তা বোঝা যায়। বিজয়ন্তী-কে সুদূর উত্তর কনর-এর খাঁড়ি-বন্দর বনবাসী বলে চিহ্নিত করা হয়। খিলানযুক্ত তোরণদ্বারটির ডান দিকের অংশ নির্মাণের জন্য অর্থ দান করেছিলেন ধেনুকাকতের গন্ধদ্রব্য-বিক্রেতা (*গন্ধিকা*) সিংহদত — যিনি একেবারেই স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর লোক। ধেনুকাকত থেকে সূত্রধর সামিনা-ও এসেছিলেন—তিনি কেন্দ্রীয় তোরণের সামনের স্তম্ভটি নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এটির কাঠের কাজ এখন মুছে গেলেও, এক সময় ছিল (ভাজা-র গুহা-সদরের পুরো বাইরেটাই ছিল কাঠের)। চৈত্য-র অভ্যন্তরের কাঠের খিলান (এবং মূল চিত্রকলার কিছু অবশেষ) এখনও রয়েছে — যা দিয়ে গুহাটিতে 'মন্তপ' নির্মাণশৈলীর অনুকৃতি সম্ভব হয়েছে এবং এর আদি অংশগুলির (যেহেতু সম্প্রতিকালে সংরক্ষণের জন্য এতে কাঠের জোড়াতাপ্পি কিছু দেওয়া হয়েছে) কার্বন-১৪ পরীক্ষার সাহায্যে কাল নির্ধারণ করাটাও সম্ভব। নাসিক, কুড়া, কাহ্নেরী-র মতো জায়গায় অন্য গুহাগুলিকে নিরীক্ষণ করলেও আমরা দেখব যে অসংখ্য বণিক, চিকিৎসক, রাজকর্মচারীদের দানের (গুহাগুলির অংশবিশেষে) স্বাক্ষর সেখানে রয়ে গেছে। পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর দানের স্বাক্ষর রয়ে গেছে যাদের পক্ষে পরবর্তীকালের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাধারণভাবে শস্যের ছিটেফোঁটা অংশ বা অবসরে চাষ করার মতো দু-এক টুকরো জমি ছাড়া আদৌ কোন সম্পদের অধিকার কায়েম করা সম্ভব হয়নি ঃ যেমন—কামার, মালাকার, কাঁসারি, হলকর্ষক, গৃহস্থ (*গহপতি, কুটুম্বিক*)। রাজ অনুদান ছিল তুলনামূলকভাবে খুবই কম। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাসিক ও কার্লে-তে শক উসবদাত-র দান। শেষোক্তটির ক্ষেত্রে শাতবাহন বাসিথিপুত পুলুমাই-এর রাজত্বের সপ্তম বর্ষে তাঁর নির্দেশে জনৈক মহারথী (সম্ভবত রানির ভাই এবং এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী) কর্তৃক যে দান করা হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।

এর সঙ্গে কুষাণ রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকদের বৈপরীত্যটা লক্ষণীয়। সেখানে আমরা দেখি দাতাদের বেশির ভাগই রাজন্য বা অভিজাতবর্গের মানুষ। মথুরায় দানের স্বাক্ষর হিসেবে তাদের মূর্তি হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। সম্পদশালীরা (জনৈকা বারবনিতা, তার কন্যা ও সঙ্গীসাথীরাও তাই ছিল) সাধারণভাবে ছিল বণিক এবং মথুরায় জৈন প্রতিষ্ঠানগুলিকেও তারা পৃষ্ঠপোষকতা করত। সাঁচীর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অনেকটা বৈচিত্র্য ছিল, কিন্তু এমনকী সেখানেও শ্রমজীবীদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে খুবই কম (মার্শাল-ফুচার : *সাঁচী* ১৯৯ (= ল্যুডারস্ ১৮১), ৪৪৮, ৪৫৪, ৪৯৯ ৫৮৯)। সাঁচীর ৪০৭ টি খোদাই থেকে ল্যুডার্স যে তালিকা তৈরি করেছেন (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা,* ১০ আনুমানিক সংখ্যা ১৬২-৫৬৮) তার মধ্যে খুব বেশি হলে জনা ছয় সন্দেহাতীতভাবে কারিগর—যার মধ্যে একজন (সংখ্যা ৩৪৬) রাজা সিরি-শতকনি-র কারিগরদের' সঙ্ঘ-নেতা বা কর্মী সর্দার। তবু, আমরা বলতে পারি, সাঁচী থেকে শুরু করে দক্ষিণে স্ব-সম্পূর্ণ গ্রাম-অর্থনীতি ও তার অঙ্গাঙ্গী হিসেবে বদ্ধ অবস্থাটা ছিল না। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত জায়গায় কাজকর্মের খরচের একটা বিপুল অংশই আসত দান থেকে এবং স্বতন্ত্রভাবে সেগুলির পরিমাণ ছিল এতই কম যে তা খোদাই করা হত না — কিন্তু তা সত্ত্বেও, এসব দান ছিল নগদ অর্থে। যথেষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় হত, যার ফলে নানা ধরনের কারিগররা অর্থ সঞ্চয় করতে পারত; সাধারণ স্বনির্ভর গ্রামে এই সমস্ত কারিগরদের দান করার মতো কিছুই থাকত না। এটা ভেবে দেখা দরকার যে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া উপকূলের কোলি জেলেরা আজও যে সমস্ত রীতিপ্রথা মেনে চলে (তাদের

নববর্ষের ঠিক পরেই বোম্বাই দ্বীপ বা আরও দূরবর্তী স্থান থেকে পথ পেরিয়ে কার্লে-তে আসা) তার সঙ্গে অতীতে তাদের ধেনুকাকত ও সোপারা থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও মালপত্র পরিবহনের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। এই ধরনের সম্পর্কের আজও অস্তিত্ব থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপিতে বর্ণিত ভোজক-রা ছিল পিতনিকদের (পাইথন-এর) মতোই দক্ষিণের মানুষ—যাদের উভয়কেই একই গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে করা হয়। জনৈক মহাভোজের কন্যা মহারথিনী সামড়িনিকা বেড়সা-য় একটি জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। মহাদ-কুড়া অঞ্চলে মহাভোজ বলতে সম্ভবত বোঝাত উপজাতি সর্দার। ঐ একই এলাকায় আমরা দেখি মহাভোজ হল তফশিলী জাতির মানুষদের পদবী — যারা আগে অস্পৃশ্য ছিল।

এই কারিগরদের মধ্যেকার কিছু মানুষ শক্তিশালী সঙ্ঘের মধ্যে সংগঠিত ছিল। নাসিকের ১০ নং গুহায় উসবদাত-র একটি খোদাইয়ের বিস্তারিত উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যায় (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা,* ৮.৮২-৪)ঃ

'সিধম্। ৪২ বর্ষে, বৈশাখ মাসে, দিনিক-র পুত্র, ক্ষহরাত প্রদেশের শাসক রাজা নহপান-এর জামাতা উসবদাত এই গুহাটি সকল স্থান (থেকে আসা ভিক্ষুদেব) সঙ্ঘকে অর্পণ করেছেন। তিনি তিন হাজার— ৩০০০ — *কহাপন* স্থায়ী বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও করেছেন — যা এই গুহায় বসবাসকারী, যে কোন সম্প্রদায় বা জন্মসূত্রের মঠ সদস্যদের পোশাক (*চিবরিক*) ও বহিঃভ্রমণের (*কুসান,* ভ্রমণ ব্যয়) অর্থ হিসেবে কাজে লাগবে। আর যে কহাপণগুলি গোবধন-এর সঙ্ঘ-আবাসে নিয়োগ করা হয়েছে (এই ভাবে)ঃ বয়নশিল্পী (*কোলিকনিকায়ে*)-দের সঙ্ঘে (মাসিক) শতকরা এক *পদিকা* (বার্ষিক ১২ শতাংশ) হারে — ২০০০ ; এবং বয়নশিল্পীদের আর একটি সঙ্ঘে শতকরা ৩/৪ *পদিকা* (বার্ষিক ৯ শতাংশ) সুদে ১০০০। আর যে *কহাপন*গুলি অপরিশোধীয়, সেগুলির কেবল সুদই ভোগ করা যাবে (এইভাবে)। তার মধ্যে ২০০০ হল শতকরা এক *পদিকা* হারে পোশাকের অর্থ; এ দিয়ে আমার গুহায় বর্ষাকাল অতিবাহনকারী প্রতি কুড়িজন ভিক্ষু পিছু একজনকে বারো (*কহাপন*) পোশাক-ভাতা দেওয়া হবে। শতকরা ৩/৪ *পদিকা* হারে যে এক হাজার তার মধ্যে রয়েছে ভ্রমণ ব্যয়ের অর্থ। আর কপুর জেলার চিখলপদ্র গ্রামে দান করা হয়েছে ৮০০০ সমূল নারিকেল গাছ; এবং এ সবই ঘোষণা ও নথিবদ্ধ করা হয়েছে নগরীর বিধান কক্ষে (*নিগম-সভা*), নথি ফলকের (*ফলক-বর*) উপরে।'

তখনকার দিনে 'কহাপন' তৈরি হত উৎকৃষ্ট রূপায়। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে জোঘলতেম্ভি ভাণ্ডারে পাওয়া নহপান-এর মুদ্রাগুলি থেকে। এই মুদ্রার অনেকগুলিতেই বিজয়ী রাজা গোতমীপুত্র শাতকর্নি-র নিজস্ব ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছিল; এই বংশটি নিজস্ব রৌপ্যমুদ্রা চালু করতে খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি। মুদ্রাগুলির ওজন ছিল প্রায় ৩২ গ্রেন করে এবং সেগুলির মোট সংখ্যা (আনুমানিক ২২,০০০, কখনও গোনা হয়নি) জ্ঞাত অন্য যে কোন ভাণ্ডারের চেয়ে অনেক বেশি। বাজারে চালু মুদ্রার মাপকাঠিতে এই রাজত্ব যে সমৃদ্ধ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অঞ্চলের জন্য অবশ্য সীসার মুদ্রাও তৈরি করা হয়েছিল এবং তা ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকেও হত। সীসা আমদানি করা হত এবং সম্ভবত উপজাতি মানুষেরাই বিশেষভাবে এটা পছন্দ করত; ভিক্ষুদের কর্তব্যাকর্তব্য বিচার অনুযায়ী সোনা-রূপা স্পর্শ করার প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা—তা দিয়েও হয়ত এই অদ্ভুত মুদ্রার প্রচলনের বিষয়টির ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

কুমোর, কামার, শস্য-ব্যাপারি, তিলি, কূপ-খনক, ঘরামি, জেলে প্রভৃতিদের অন্য সঙ্ঘগুলিও দান দিত বা রাজাদের সঙ্গে একই ধরনের কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হত (*দাসক*, গোষ্ঠীপতি মুণ্ডদাস-এর মাধ্যমে, নাসিকের ৮ নং গুহা)। এই প্রদেশে *কোলি* শব্দটি দিয়ে এখনও তাঁতীদের বোঝায় (এখন *কোষ্টি* শব্দটিও ব্যবহৃত হয়) — কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে তারা নিচু জাত হিসেবেই গণ্য হয়ে আসছে এবং গোষ্ঠী-ঐক্যহীনভাবে গ্রামাঞ্চলগুলিতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ভিক্ষুরা যে তাদের উপযোগী পোষাকের পরিবর্তে সরাসরি রৌপ্য মুদ্রাই নিত — এটা *বিনয়* আইনের শিথিল হওয়ারই লক্ষণ।

নারকেল গাছ আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ — কেননা শুধুমাত্র এর কারণেই উপকূলবর্তী অঞ্চলে কৃষি-বসতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এই গাছের ব্যবহার নানা ধরনের। পাতা দিয়ে ঘরের বেড়া হয় বা তা দিয়ে সরাসরি কুঁড়েগুলোকে ছেয়েও নেওয়া যায়। কাঠ দিয়ে তৈরি হয় ভাল বাতা, গুঁড়ির দিকটা থেকে মাছ ধরার ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা; ছোবড়া থেকে ভাল দড়ি। সবচেয়ে মূলবান হল এর ফল, যা ডাব হিসেবে খাওয়া যায় এবং পেকে গেলে শুকনো করার পর বেরিয়ে আসে চমৎকার ভোজ্য তেল। ছোবড়া ছাড়িয়ে নেওয়ার পর তিন-চোখওয়ালা (যার একটি কলিমুখ এবং সেখান দিয়ে সহজেই ফুটো করে দেওয়া যায়) শক্ত খোলার খোদ ফলটা এখন শাস্ত্রীয় অনুমোদন ছাড়াই হিন্দুদের সমস্ত পূজা-পার্বণে 'জল-পূর্ণ পাত্র' (উদকুম্ভ)-র স্থান দখল করেছে। ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা হিসেবে আগে যে বেল ফল দেওয়া হত এখন তারও স্থান নিয়েছে নারকেল। দেবতাদেরও দেওয়া হয় এবং প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয় টুকরো বা কুরো। ৪২ অব্দে (শকাব্দ বোঝানো হয়ে থাকলে এটি হল ১২০ খ্রীষ্টাব্দ) উপকূলবর্তী অঞ্চলে নারকেল চাষ ছিল নতুন, কেননা *দ্য পেরিপ্লাস অফ দ্য এরিত্রেইয়ান সী* (যা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে লেখা হয়েছিল) গ্রন্থে পশ্চিম উপকূলবর্তী প্রতিটি ভারতীয় বন্দর থেকে কি কি পণ্য রপ্তানি করা হত তার পুঙ্খানুপুঙ্খ যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে এর কোন উল্লেখ নেই। পূর্ব উপকূলে এর ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় আরিকামেডুতে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর প্রাক অ্যারেনাইন ভূস্তরগুলিতে নারকেল দড়ির অস্তিত্ব থেকে (*এন্‌সিয়েন্ট ইন্ডিয়া*, প্লেট-২, ৩৭-বি)। নারকেল ছিল প্রধানত বাণিজ্যিক ফসল, তা না হলে উসবদাত-র উপহারের কোন অর্থ হয় না। সুতরাং প্রচুর বৃষ্টিপাতসম্পন্ন ঘন অরণ্য আবৃত এক অঞ্চলকে উৎসাদন করে প্রথমেই এসেছিল এক পণ্য উৎপাদনভিত্তিক অর্থনীতি। ফসলটি পরবর্তীকালেও রয়ে গেল এক মূল্যবান পণ্য হিসেবেই, অন্যদিকে এর চাষ ছড়িয়ে পড়ল পুরো উপকূল বরাবর — একেবারে বাংলা পর্যন্ত। গাছটি এসেছিল মালয় থেকে—'নায়র কলি'-র সংস্কৃত রূপই হল 'নারিকেলি'। এই পর্বের প্রসার্যমান বাণিজ্য-ই একে প্রথম ভারতে এনেছিল এবং সম্ভবত পান (তাম্বুল)-ও আসে সেই সময়েই।



চিত্র ৩৬ : শাতবাহন মুদ্রায় সমুদ্রগামী জাহাজ।

উসবদাত-র অমিতব্যয়িতার প্রমাণ এই গুহাগুলিরই অন্য খোদাই থেকে পাওয়া যায়। তিনি আরও ৩২,০০০ নারকেল গাছ দিয়েছিলেন বিভিন্ন চরক উপাসকমণ্ডলীকে; দেবতা ও ব্রাহ্মণদের জন্য বন্দোবস্ত করেছিলেন ৭০,০০০ কহপানের — ৩৫ কহপান পিছু এক সুবর্ণ মুদ্রা ধরলে যার পরিমাণ হয় ২,০০০ সুবর্ণমুদ্রা। দলিলটি আবার 'রীতি অনুযায়ী নথিবদ্ধ' ও করা হয়েছিল। তিনি

ব্রাহ্মণদের ৩০০,০০০ গরু দান করেছিলেন বলে দাবি করা হয়, যার মধ্যে একটি অভিষেক অনুষ্ঠানেই ৩০০০। সাধারণ মানুষদের জন্য নিজের খরচে ইবা, পারাদা, দমন, তাপি, করবেনা, দাহনুকা প্রভৃতি স্থানে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা করেছিলেন—যে স্থানগুলিকে এখন চিহ্নিত করা যায়। নিজ রাজত্বের বাইরে তীর্থযাত্রার সময় দানধ্যানের ব্যবস্থা বা গুহা, জলাধার নির্মাণ—এসবের কথা ছাড়াও একটি সেনা-অভিযান সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ 'বর্ষার কারণে মালয়ীদের হাতে বন্দী হয়ে পড়া উত্তমভদ্রদের প্রধানকে মুক্ত করতে আমি গিয়েছিলাম; নিছক গর্জনেই এই মালয়ীরা পালিয়েছিল এবং তাদের সকলকে উত্তমভদ্র যোদ্ধাদের হাতে বন্দী করা হয়েছিল।' (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা*, ৮.৭৮)। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই কারো মনে হতে পারে যে এই সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির আশপাশের উপজাতি এলাকাগুলিতে সম্পত্তির দ্রুত উপজাতীয় থেকে ব্যক্তিগত হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ এক নতুন ধরনের বিকাশ সংঘটিত হয়েছিল (আজকের সৌদি আরবে যেমনটা হচ্ছে)—যা থেকে এক নব্য ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব এবং প্রধানদের হাতে অমিত সম্পদ ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এসে জড়ো হয়।

বাণিজ্য-অর্থনীতির শিকড় যে কত গভীরে প্রবেশ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নাসিকের শিলালিপির শেষপর্বের একটি উল্লেখ থেকে ঃ 'তৎ কর্তৃক (উসবদাত) ৪০০০ কহপান মূল্যের একটি জমিও বারাহি পুত্র ব্রাহ্মণ অশ্বিভূতিকে কিনে দেওয়া হয়েছে — যা তাঁর পিতারই ছিল; জমিটি নগরীর উত্তর-পশ্চিম দিকের সীমায় অবস্থিত। এ থেকে উৎপন্ন খাদ্য আমার গুহায় [= নাসিকের ১০ নং গুহা] বসবাসকারী সমস্ত ভিক্ষুর জন্যই (সম্প্রদায়গত) বাছবিচার না করে সংগ্রহ করা যাবে।' সরাসরি জমি কেনার এই ঘটনা অভূতপূর্ব — এমনকী তার জন্য রাজার পক্ষ থেকে এক ব্রাহ্মণকে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে সেটাও। প্রাথমিকভাবে এটা ব্রাহ্মণের প্রতি বদান্যতা ছিল না, ছিল ভিক্ষুদের প্রতি। সুতরাং জমিতে ব্যক্তিগত মলিকানা, ক্রয়-বিক্রয় অর্থে, সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করত সর্বজনীনভাবে তা ক্রয় ও বিক্রয় সঙ্ঘটিত হবার উপরই। দক্ষিণের আর্থব্যবস্থা নগদ লেনদেনের একটা উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যার ভিত্তি ছিল পণ্য উৎপাদন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করত সঙ্ঘগুলি যার মধ্যে সমস্ত স্তরের সাধারণ ব্যক্তিও অংশ নিতে পারত, এমনকী লাঙ্গলকারী (*হালকিয়া*) কৃষক পর্যন্ত। তা সত্ত্বেও সম্পদশালী শাতবাহন রাজাদের অস্বাভাবিক রকমের নিচুমানের সীসা ও পোটিন (Potin)-এর মূদ্রাগুলি প্রমাণ করে যে সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যটা চলত সোনা-রূপার ব্যবহার না-জানা অনুন্নত আদিম উপজাতিদের সঙ্গে, বিনিময় প্রথার মাধ্যমে। রাষ্ট্র মুনাফাও করত এবং তা *অর্থশাস্ত্র*-র বিধিবিধান বা নিপীড়ন ব্যতিরেকেই — অবশ্য যদি উসবদাত-র দান করা নারকেল গাছ (বা সেগুলির ওপর প্রদেয় করের রাষ্ট্রীয় অংশ) তাঁর নিজের কাছ থেকেই গিয়ে থাকে, যা নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। এই সমাজের উন্নত উপাদানগুলি জাত-পীড়িত গ্রাম্য *মনুস্মৃতি*-র স্তর — যা আগে বিকশিত হওয়া গাঙ্গেয় উপত্যকাকে গ্রাস করেছিল বলে সন্দেহাতীতভাবে মনে করা হয় — তার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী ছিল নিশ্চিতই। কিন্তু এই অগ্রগামিতাকে কতদিন বজায় রাখা সম্ভব তা নির্ভর করেছিল অধোগমনের দ্রুততা, অর্থাৎ গ্রাম-বসতির বিকাশের হার-এর ওপর; এবং বহিঃশত্রুর সামরিক চাপ কতটা তার ওপরও। নিজেদের সময়ে শাতবাহনরা আত্মরক্ষা এবং অন্যের বশ্যতা আদায়ে সমর্থ ছিলেন। তাঁদের বিজয়ের তালিকা থেকে মনে হয় যে তা উজ্জয়িনী থেকে শুরু করে আরো দক্ষিণের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিরই তালিকা ; অন্যদিকে প্রত্নতত্ত্ব প্রমাণ করে চলেছে যে

পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের গুটিকয় সমৃদ্ধ কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পশ্চাদভূমি ছাড়াও কীভাবে তাঁরা খাদ্য সংগ্রাহক অঞ্চলগুলিতেও সভ্যতার সূচনা ঘটিয়েছিলেন।

'এই বাণিজ্য-নগরীতে (বরিগজ = ব্রোচ) নিম্নোক্ত পণ্যগুলি আমদানি করা হয় ঃ মদ — ইতালীয়রা পছন্দ করে, সেইসঙ্গে লাওডিসিয়-রা এবং আরবীয়-রাও; তামা, টিন ও সীসা; প্রবাল ও পোখরাজ; সব ধরনের সূক্ষ্ম ও মোটা কাপ ; একহাত চওড়া ও উজ্জ্বল রঙের কোমরবন্ধ; স্টোর‍্যাক্স (storax) মিষ্ট ক্লোভার (sweet clover), স্বচ্ছ কাঁচ; মোমছাল (= আর্সেনিক মনোসালফাইড), অ্যান্টিমণি, সোনা ও রূপার মুদ্রা — দেশীয় অর্থের সঙ্গে বিনিময় করা হলে যা থেকে লাভ হয়; এবং মলম— খুব দামিও নয়, পরিমাণেও বেশি নয়। আর রাজার জন্য এই সব জায়গায় নিয়ে আসা হত অত্যন্ত মূল্যবান রূপার পাত্র, গায়ক বালক, হারেমের জন্য সুন্দরী দাসী, উৎকৃষ্ট মদ, সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা পাতলা পোষাক ও মনের মতো মলম। ... এই সমস্ত জায়গা (পইথন ও টগর) থেকে বরিগজ-তে আমদানিটা হয় শকটে এবং পথবিহীন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে; পইথন থেকে মূল্যবান লাল পাথর বিপুল পরিমাণে নিয়ে আসা হয়, টগর থেকে সাধারণ বস্ত্র, আর স্থানীয়ভাবে সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে অন্যান্য পণ্যসামগ্রী। গুরুত্বের দিক থেকে বরিগজ (ব্রোচ)-র পরে এ অঞ্চলের বাণিজ্য নগরীগুলি ছিল ঃ সোপারা এবং কল্যান নগরী — যা জ্যেষ্ঠ সরগনুস (?) -এর আমলে এক চমৎকার বাণিজ্যনগরীতে পরিণত হয়, কিন্তু সন্দনেস-এর অধীনে আসার পর এই বন্দরটি নানা বাধার সম্মুখীন হয় এবং কোন গ্রীক সেখানে অবতরণ করলে তাকে বন্দী করে বরিগজ-এ নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।' (স্কফ ৪২-৩)।

এটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার যে, পাইথন থেকে এই বন্দরগুলি পর্যন্ত অঞ্চলটি (*পেরিপ্লাস*-এর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে) তখনও ছিল হিংস্র পশুতে ভরা ঘন অরণ্য; বসতি-স্থাপন ও চাষবাস শুরু হয় পরে। ষাঁড় বাহিত শকটের ব্যবহার যাত্রার শুরুতে ও শেষে, বা সমতল এলাকাতেই করা যেতে পারত। অধিকাংশ সামগ্রী নিশ্চিতভাবেই নিয়ে আসা হত ভারবাহী পশুর দলের পিঠে চাপিয়ে — লামাং-রা এখনও যেমনটা করে। দুয়ার্তে বারবোসা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম উপকূলের চৌল-এর কাজকর্মের রীতিনীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। 'স্পেনীয়দের মতো, জিন-পরানো পোষমানা ষাঁড়ের বিশাল বিশাল পালের পিঠে চাপিয়ে তারা তাদের মালপত্র আনে; বড় বড় বস্তায় মাল-পত্র ভরে এগুলির পিঠে তা আড়াআড়িভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতি কুড়ি-তিরিশটির পালের পেছনে থাকে একজন করে চারক (*কোনাউতোর*)'। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা চৌল বন্দরের কাছে বিনিময়ের মাধ্যমে সেগুলি নিয়ে নিত। কল্যাণ বন্দরটি এক শত্রুভাবাপন্ন শতকর্নি রাজা (গ্রীক বিবরণে যাঁর নাম বিকৃতভাবে করা হয়েছে সন্দনেস) কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই সম্ভবত স্বল্পকালীন গ্রীক বাণিজ্য বসতি হিসেবে ধেনুকাকতের উদ্ভব ঘটে — যেখানকার অনেক মানুষেরই দানের স্বাক্ষর কার্লে গুহায় আছে। কিন্তু অত্যন্ত স্বকীয় এক বাণিজ্য-সমাজের বিলোপের কারণ হিসেবে এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট যুক্তিসম্মত নয়।

বৌদ্ধ *জাতক* গুলিতে এই সমাজের একটা পরিচ্ছন্ন ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এই ছবি বুদ্ধের সময়কার মগধ ও কোশলের বলে যে প্রায়শই মনে করা হয় তা ঠিক নয়। লেখাগুলি নিশ্চিতই বুদ্ধের অনেক পরের এবং হতে পারে, দক্ষিণী আকরগুলি থেকে নিয়ে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক নাগাদ সেগুলি রচিত হয়েছিল। রীতিটা ছিল পুরনো, অন্ততপক্ষে বুদ্ধের পূর্বজন্মগুলির বিস্তারিত

কাহিনী যাঁরা বর্ণনা করেছেন তাঁরা সেটাকে সত্যি বলেই জানতেন। অবশ্য, *অর্থশাস্ত্র* পরবর্তীকালীন পর্বে সঙ্ঘগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুব কমই ছিল, অশোকের অনুশাসনগুলিতে তো একেবারেই নেই; এরপর, স্বনির্ভর গ্রাম উৎপাদন-ব্যবস্থার সাথে সাথে মগধে সেগুলির আকস্মিক পুনরাবির্ভাবের কোন কারণই ছিল না। তা সত্ত্বেও *জাতকে* রাজার আঠারোটি সঙ্ঘকে সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। (৫৩৮) — যার অনেকগুলিরই নাম *জাতক* ৫৪৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে। *জাতক* ৪৪৫-এর উল্লেখে রাজার কাছে তারা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, কেননা নতুন পদ সৃষ্টি করে অতি দক্ষ একজনকে তাদের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। *জাতক* ৫১, ৭০, ১৫৪, ১৬৫-তে সেনি (সঙ্ঘ) ও সেনী (সেনাবাহিনী)-র মধ্যে গুলিয়ে গেছে — যা থেকে বোঝা যায় যে ঐতিহ্যটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছিল এ কথা মেনে নিলেও বলতে হয়, কাহিনীকাররা তাঁদের বয়োঃজ্যেষ্ঠদের স্মৃতির চেয়ে একেবারে আলাদা কিছু কল্পনা করতে পারছিলেন না — তাই শাতবাহন আমল ও সাম্রাজ্যই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে উপযোগী। বর্ণ বিভাজনমূলক *মনুস্মৃতি*-র সঙ্গে তফাৎটা প্রকটভাবেই চোখে পড়ে, যদিও জীবন সম্পর্কে *পঞ্চতন্ত্রে*-র যে দৃষ্টিভঙ্গি তা-ও প্রায় একইরকম। উৎসাহব্যঞ্জক কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সঙ্ঘগুলির উচ্চ অবস্থান, ঝুড়ি প্রস্তুতকারক বা অন্য পণ্য-উৎপাদকদের (কখনও কখনও চণ্ডালদের নিয়েও, যারা নিজেদের ভাষায় কথা বলে) নিয়ে পুরো এক একটা গ্রাম — এসবই অন্য যে কোন স্থান-কালের চেয়ে আমাদের আলোচ্য স্থান ও কালে অনেক ভালভাবে খাপ খায়। *জাতকের* 'গহপতি' (আক্ষরিক অর্থ 'গৃহকর্তা') বলতে সাধারণভাবে বোঝাত বৈশ্য জাতের মানুষ—যে তেজারতি, বাণিজ্য, চাষবাস থেকে শুরু করে, ছুতোরের কাজ — যে কোন পেশাই গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু সব সময়ই সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিল। সঠিক অর্থে, মাভল গুহা-লিপিগুলিতে এটাই আমরা দেখতে পাই — যেমন, শেলারবাড়িতে। সেখানে, *হালকিয়া* (লাঙ্গলকারী) উসভনক-র স্ত্রী ধেনুকাকতের শ্রীমতি সিয়াগুতনিকা তাঁর পুত্র 'গহপতি নমদ'-এর সঙ্গে একটি গুহা দান করছেন। সবচেয়ে ধনবান লোকদের বলা হত 'মহসালা' (যেমনটা *ছান্দোগ্য উপনিষদে*-ও বলা হয়েছে), যারা ছিল বৃহৎ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারগুলির গৃহকর্তা; এরা ক্ষত্রিয় হতে পারত, ব্রাহ্মণ হতে পারত এবং সেই সঙ্গে জাত হিসেবে গহপতি-ও হত; প্রতিটি ধরনের মহশালা-কে পালি সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তৎকালীন সমাজের এরাই ছিল শাসক শ্রেণী। 'পৌর-জানপদ' এবং আরও প্রাচীন 'শ্রেয়'দের উল্লেখ কোথাও নেই — অর্থাৎ উপজাতিক অবশেষগুলি তখন বিস্মৃত; এবং 'মহাশাল'রা ছিল মূলত গ্রামাঞ্চলগুলিরই বাসিন্দা — সম্ভবত সম্পন্ন অভিজাতদের মতোই চাষাবাদ ও অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির তদারকি করত। *জাতকের* পিতামাতারা অজস্র পেশার মধ্য থেকে ছেলের জন্য কোন্‌টি বেছে নেওয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা করত; *স্মৃতি-র* নির্দেশ যদি মেনে নেওয়া হত তা হলে জাত-ই ঠিক করে দিত কোন্ পেশা নিতে হবে। বর্ণনিরপেক্ষভাবে নিজের ইচ্ছামতো পেশা বদলানোটা *জাতকে* ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার। সেখানে, *স্মৃতি* সাহিত্যের 'আপদধর্মে'র অজুহাত খাড়া না করে বিনা অনুশোচনাতেই ব্রাহ্মণরা (যেমনটা *পঞ্চতন্ত্রে* আছে) ব্যবসায় নেমে যেতে পারত। কোন শ্রেষ্ঠী-র ক্রীতদাসকেও লালনপালন করা হত ছেলের মতো করে; সে কোথাও পালিয়ে গিয়ে শ্রেষ্ঠীর ছেলে বলে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অন্য কোন ধনী শ্রেষ্ঠীর মেয়েকে বিয়ে করলে আগেকার

মালিক প্রতারণা ধরে ফেলেও তা ফাঁস করে দিত না; পরে তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই জাবনযাপন করত (*জাতক* ১২৫, *কতাহকজাক*)। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ এবং নগদ অর্থলাভের চেষ্টা এই প্রথম *জাতক*-এ একটা নতুন শব্দ নিয়ে এল যা ধ্রুপদী সংস্কৃত বা এমনকী প্রাচীন পালি সাহিত্যেও চোখে পড়েনি; তা হল — '*লঙ্ক*' অর্থাৎ ঘুষ। 'সে ঘুষ খায়' (*লঙ্কম খাদতি*) — এই অভিনব বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করা হয়েছে এক দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারকের বিচার-বিক্রির ঘটনার প্রেক্ষিতে (*জাতক* ২২০-৫১১ ; সেই সঙ্গে তুলনীয় ৩১, ৭৭, ৫২৫, ৫৪৬); এহেন বিচারকের অস্তিত্ব — কার্যসিদ্ধির জন্য রাজকর্মচারীদের উৎকোচ প্রদানের দুর্ভাগ্যজনক রেওয়াজের মতোই আজও বিদ্যমান। *অর্থশাস্ত্রে*, মনে হয়, রাজকর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের বিষয়টি বোঝানো হত 'উপদা' শব্দটি দিয়ে। গ্রহীতাকে বলা হত 'গূঢ়জীবিন', অর্থাৎ যার আয়ের গোপন উৎস আছে। গুপ্তকথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে যারা অর্থ আদায় করত, বিষ প্রয়োগ করত, ডাকিনীবিদ্যা, জালিয়াতি ইত্যাদি চর্চা করত তাদের ক্ষেত্রেও এই শব্দটি প্রযোজ্য ছিল; এদের সকলকেই নিয়ন্ত্রণ করা হত গুপ্তচর ও প্ররোচকদের মাধ্যমে। এখানে, 'লঙ্ক' — এই বিশেষ পরিভাষাটির অর্থ দাঁড়াল রাজকর্মচারী এবং তাদের ঘুষ দিতে পারার মতো যথেষ্ট ধনী মানুষদের এক নতুন ধরনের নৈতিকতা।

৮.৭ ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশের কোন ঐতিহাসিক পর্যালোচনাই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়।[১২] খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের আর্য বর্হিআক্রমণকারীরা এক ধরনের সংস্কৃতে কথা বলত; তারই পরিণতিতে এমন কিছু ঘটল যার ফলে দেশটাও রূপান্তরিত হয়ে গেল আর্যে। প্রাকৃত ভাষা ব্যবহারের একটা ঝোঁক (ধ্রুপদী থেকে কথ্য লাতিনে যেমন) বেদগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। অশোকের বা কুষাণ ও শাতবাহন রাজাদের শিলালিপিগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে দেশের কথ্যভাষা, যদি একটাই থেকে থাকে, তবে তা ছিল 'সংস্কৃত' নামটির অর্থানুসারী যে অলঙ্কৃত ভাষা তার চেয়ে অনেকখানিই ভিন্ন। তা সত্ত্বেও, এর পরের আমলের এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে সাহিত্য ও অঞ্চল নির্বিশেষে শিলালিপিগুলির ভাষা ছিল সংস্কৃতই। কীভাবে এই পরিবর্তনটা এল? যেভাবে প্রাচীন লাতিন, ধ্রুপদী লাতিন, মধ্যযুগীয় লাতিন হয়ে রোমান ভাষাগুলির উদ্ভব হয়েছিল ঠিক সেই ক্রমানুসারে বৈদিক থেকে ধ্রুপদী হয়ে কথ্যভাষায় ধারাবাহিক বিকাশের পরিবর্তে ভাষার ধ্রুপদী যুগের পরেই অমার্জিত কথ্যরীতির যুগ শুরু হওয়া সম্ভব হল কেমন করে? বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। বিমূর্ত সাংস্কৃতিক উপাদনগুলির যদি কোন নিজস্ব জীবনীশক্তি থাকত তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটা উচিত ছিল মধ্য এশিয়ায়, যেখানে ভারতীয়, চৈনিক ও গ্রীক—পৃথিবীর এই তিনটি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির মিলন ঘটেছিল, যার প্রমাণ, তুরফান প্রভৃতি অঞ্চলে আবিষ্কৃত শিল্পকলার রূপগুলির মধ্যে বিদ্যমান। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তেমন লক্ষণীয় কোন প্রভাব না রেখেই পৃথিবীর স্থল বাণিজ্যের একদা জনবহুল এই মিলন কেন্দ্রগুলি মোঙ্গল বিজয়ের অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নটার শিকড় রয়ে গেছে ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের মধ্যে; আরও সুনির্দিষ্টভাবে, ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্য বিশেষ মর্যাদা সৃষ্টি হওয়ার মধ্যেই। 'আশীর্বাদ দান'-এর মতো বিশেষ কর্মপ্রণালীগুলিই পুরোহিত-আধিপত্য প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। উত্তরাঞ্চলের মহাযান বৌদ্ধদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য অনুপ্রবেশ স্পষ্ট, অন্যদিকে দক্ষিণে বুদ্ধঘোষের

(খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) মতো প্রাজ্ঞরা প্রায়শই এসেছেন স্থানীয় কৃষকদের (*গহপতি*) মধ্য থেকে। ধর্মীয় ক্রিয়াচারের ওপর জোর দেওয়া উপজাতি-অভ্যন্তরস্থ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যে ভেঙ্গে পড়েছিল তা প্রত্যক্ষ হয় মগধের মন্ত্রীপদে বশ্শকার ও চাণক্যের উন্নীত হওয়া থেকে। গ্রাম অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার শর্ত হিসেবে ব্রাহ্মণদের সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করার অর্থই হল কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সংরক্ষণ ও বিকাশ — যেগুলি প্রাচীনত্বের যাবতীয় গাম্ভীর্য সমেত সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণে পালিত হওয়ার জন্য অনেক বেশি প্রভাবব্যঞ্জক। কিন্তু, এটা বড়জোর ভাষাটিকে সজীব রেখেছে — আসিরীয় পুরোহিততন্ত্র যেভাবে সুমেরীয় ভাষাকে রেখেছিল ; অ্যান্টিওকস সোতের-এর সঙ্গে কিউনিফর্ম শিলালিপি বা ক্লিওপেট্রা ও আদি রোমান সম্রাটদের সঙ্গে মিশরীয় চিত্রলিপির যোগ আজও যেন বিদ্যমান। এ ধরনের ঐতিহাসিক রূপান্তর এক শব্দহীন অস্তিত্বকেই শুধু তুলে ধরে, সাহিত্যের প্রবল কোন প্রস্ফুটনকে নয়। সুতরাং আলোচ্য প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর নিহিত রয়েছে পরিবর্তিত অর্থনীতির আনুকূল্য প্রাপ্ত নতুন শ্রেণী-সম্পর্কগুলির মধ্যেই।

যজুর্বেদের যুগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষত্রিয়রা যে বৈশ্য ও শূদ্রদের দমন করত সে আলোচনা পঞ্চম অধ্যায়ে করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচ্য যুগে, স্থায়ী অঞ্চলগুলিতে এক নব্য শাসকশ্রেণী উপজাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত না হয়ে বা প্রতিবেশী-প্রতিবেশীতে যুদ্ধ না করে (কেননা তাদেরও ওপরে ছিল কোন রাজা বা সম্রাট) সামগ্রিকভাবে, বৈশ্যদের কাছ থেকে বিপুল কর আদায়ের লক্ষ্যে, শ্রমজীবী শ্রেণীকে শোষণ করে যেতে লাগল। তিনটি উচ্চবর্ণেরই শুধু অধিকার ছিল ধর্মীয় প্রতীকগুলি ব্যবহারের, ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার এবং আর্যত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠান পালন করার — যেটা আসলে এক দীর্ঘ বিস্মৃত উপজাতিক রীতিরই অনুকরণ। শূদ্রদের এই সমস্ত অধিকার ছিল না। প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, বিত্ত ও অস্ত্রের জোরে কিছু নবাগতও উচ্চবর্ণ হিসেবে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হয়ে যেতে পারত, অথবা উচ্চবর্ণে বিবাহ করতে পারত। বেসনগর স্তম্ভের হেলিওডোরোস-কে যারা কৃষ্ণ -বাসুদেবের ভাগবদ ধর্মে গ্রহণ করেছিল তারাই তাঁকে শূদ্র বলে গণ্য করছে — এটা কল্পনা করাও শক্ত। সুতরাং, সংস্কৃত ছিল নব্য উচ্চ শ্রেণীগুলির ঐক্যকে চিহ্নিত করার, বাকিদের থেকে তাদের উচ্চ অবস্থানকে স্পষ্ট করার এক নতুন হাতিয়ার। ভাষার সঠিক উচ্চারণ ভঙ্গি অন্য দেশেও একই ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে ফার্সী এবং আরও পরে ইংরাজি ভারতীয় নগর ও রাজসভাগুলিতে সংস্কৃতের স্থান দখল করেছিল এবং তা একই শ্রেণী উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে। রেনেসাঁকালীন ইউরোপে লাতিন বা অষ্টাদশ শতকে, নির্দিষ্টভাবে জার্মানি রাশিয়ায় ফরাসী ভাষার ভূমিকাও ছিল একইরকম। *অর্থশাস্ত্রে*-এর বৃত্তি প্রাপকদের তালিকায় কোন সভাকবির নাম নেই, অশোকেরও তেমন কেউ ছিল বলে জানা যায়নি; তাঁর জনসংযোগকালীন কথাবার্তার যদি কোন লিখিতরূপ থেকেও থাকত, তবে তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। পালি সাহিত্যে *জাতক* এবং *ত্রিপিটক* অনুশাসনে সংযোজিত *অত্থকথা* ভাষ্যগুলির চেয়ে বেশি ইহজাগতিক আর কোন রচনার সন্ধান মেলেনি। সেই অর্থে, ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য উদ্বৃত্তের এক নতুন পুনর্বণ্টনকেই সূচিত করেছে। প্রাকৃত ভাষায় অসাধারণ বৈষয়িক গ্রন্থ হল হাল (সম্ভবত শাতবাহন বংশীয়)-কৃত ৭০০-টি স্তবক সংকলন (কয়েকটি রচিত)। আপাত যুক্তিসঙ্গত এক পুঁথি অনুসারে, ঐ একই রাজসভার জন্য গুণাধ্যয়-এর *বৃহৎ-কথা* রচিত হয়েছিল গ্রাম্য বাক্‌রতির পৈশাচী

(= পিশাচের) ভাষায়। শেষোক্তটির যা কিছু অবশেষ তা পাওয়া যায় সোমদেব-এর *কথা-সরিৎ-সাগর* এবং ক্ষেমেন্দ্র-র *বৃহৎকথা-মঞ্জরী*-র মতো সংস্কৃত তরজমাগুলির মধ্যে; এই দুই গ্রন্থকারই ছিলেন কাশ্মীরি। হাল-এর রসসমৃদ্ধ কাব্যে স্তবকগুলির মধ্যে কোন সংযোগসূত্র না রেখেই, অসংখ্য গ্রামীণ দৃশ্য ও সাধারণ মানুষ উঠে এসেছে; এর ঝোঁক মূলত যৌন প্রেম কাহিনীর দিকে এবং উদ্দীপক টীকাগুলি দিয়ে তা অনেকখানি বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। এই ধরনের রচনা তৎ-বা পরবর্তীকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে খুব একটা দুর্লভ নয়।

ইউরোপীয় সাহিত্যকে বর্ণনা করা যেতে পারে মূলত যৌনতা (প্রেম)ও হিংসা (শৌর্য) নির্ভর। একইভাবে সংস্কৃত সাহিত্যও ছিল প্রেম ও ধর্মের উপর ভিত্তিশীল—কেননা তার প্রধান প্রচারক, শিক্ষক ও উদ্ভাবক-রা ছিল ব্রাহ্মণ, এবং তাদের মধ্য থেকেই মূলত পুরোহিত নিয়োগ করতে হতো। তাছাড়া, এ দুটিই ব্রাহ্মণ ও রাজাদের যৌথ স্বার্থ চরিতার্থ করত। আলেকজান্দ্রীয় ও আধুনিক লেখকদের মধ্যবর্তী সময়কার ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেম-বর্ণনা যদি অনেক বেশি খোলামেলা হয়েই থাকে তবে তার কারণ সংস্কৃত জানা লোকের অনুপাত ক্রমশই কমে আসছিল, এমনকী যখন মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখনও। সেই অর্থে এটা কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা (*কোইনি*) ছিল না, ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক শ্রেণী ও পুরোহিততন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভামা। চাণক্যের *অর্থশাস্ত্রের* রাজনৈতিক-অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়বস্তুই প্রমাণ করে যে জনসাধারণের পাঠ্য হওয়া এটির পক্ষে সম্ভব ছিল না; বিশেষ করে, এর চতুর্দশ অংশে রসায়ন ও বিষ নিয়ে যে আলোচনা তা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মানুষেরই গোপন চর্চার বিষয় হিসেবে অনুমতি পেতে পারত। অশোকের অনুশাসনগুলিও প্রতিপন্ন করে যে মগধের প্রশাসনিক ভাষা সংস্কৃত ছিল না। *অর্থশাস্ত্রের* আদর্শ-অনুসারী এবং সেই কারণে তার সমসাময়িক বলে বিবেচিত *কামসূত্র* (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক?)-এর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। এর লক্ষ্যই হল সংস্কৃত জানা এবং পর্যাপ্ত অবসর হাতে থাকা উচ্চ শ্রেণীগুলি— যারা মিনিসিঙ্গারদের অসহায় আত্মনিগ্রহ বা হেলেনীয় নীতিভ্রষ্টতার পথে না গিয়েও অসাধারণ পুঙ্খানুপুঙ্খতায় প্রেমকলার চর্চা চালাতে পারত। কেউ লক্ষ্য করতে পারেন যে, আলেকজান্দ্রীয় সাহিত্যের খোলাখুলি কামলীলার বর্ণনার তুলনায় হোমারীয় সাহিত্য অনেকখানিই সংযত; গ্রীক ছিল গোড়ার দিকে সমগ্র জনসাধারণেরই ভাষা (সম্ভবত মুষ্টিমেয় কিছু ক্রীতদাস বাদে), অন্যদিকে মিশরে তাদের শাসকশ্রেণীর চরিত্র প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ভারতের ক্ষেত্রে, এটা খুবই অসাধারণ বিষয় যে, এমনকী জৈন এবং মহাযান বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও *শৃঙ্গার* কাব্য পাঠ, উপভোগ, এবং সম্ভবত রচনাও করতে পারত — যার মাধুর্য ইংরেজি অনুবাদে আসে না; ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা এগুলির লাতিন অনুবাদ, বা কদাচিৎ গ্রীক, আবারও প্রমাণ করে যে পাণ্ডিত্যের ওপর শ্রেণীর প্রভাব কতখানি। তা সত্ত্বেও এই সব ভিক্ষুদের নৈতিক বিশুদ্ধতা, আন্তরিক ধর্মভাব, বা ব্যক্তিগত কঠোর তপশ্চর্যা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না; বোকাচ্চিও-র কামুক যাজকদের মতো কারো সঙ্গে এদের তুলনাও চলে না। সাহিত্যের *শৃঙ্গার* হল চৈত্য সভাকক্ষকে অলঙ্কৃত করা ইন্দ্রিয় উত্তেজক ভাস্কর্যগুলিরই এক চমৎকার প্রতিরূপ; উভয়েরই উৎপত্তি ক্ষমতাসীন শ্রেণীর বিলাস-বৈভব থেকে।

সংস্কৃতের ধারাবাহিক বিকাশ ও প্রভাব সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র এক অসাধারণ প্রয়োগগত অর্জনের কারণেই—তা হল ব্যাকরণ। কৈশোরের কঠোর অধ্যয়নকালে কোন ছাত্র ব্যাকরণের

সংহত সূত্রগুলি মুখস্থ করে নিতে পারে — যাতে তারপর থেকে শিল্প বর্জিত স্থূল লেখাগুলির সাহায্য ব্যতিরেকেই তার কাজ চলে যায়। এই সূত্র শৈলীই পুরোহিততন্ত্র ও প্রায়োগিক সংস্কৃতের সাধারণ আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় ঃ *অর্থশাস্ত্র* ও *কামসূত্রে* সূত্রগুলির সঙ্গে অপরিহার্য ভাষ্যও যুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলির জন্য আলাদা আলাদা ভাষ্য রচিত হয়েছে — যেগুলি, এমনকী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসের জন্যও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন পাণিনি — যিনি এক স্বকীয় সুগভীর পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তাঁর অজস্র পূর্ববর্তীর প্রয়াসগুলিকে সংহত করে আমাদের উপহার দিয়েছেন পৃথিবীর জ্ঞাত সবচেয়ে প্রাচীনতম বিজ্ঞানভিত্তিক এক ব্যাকরণ। বিজ্ঞানটিকে নিহিত রেখে দেওয়া হয়েছে এক রহস্যজনক শৈলীর আড়ালে। এতদ্‌সত্ত্বেও পাণিনিই বিনষ্ট করেছিলেন পুরনো ব্যাকরণগত সমস্ত বিধিনিয়মগুলিকে, প্রায় স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন ভাষার আরও বিকাশকে এবং যে কোন মূল্যেই হোক না কেন একে প্রতিহত করেছিলেন বিভিন্ন কথ্যরীতিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ার হাত থেকে। তাঁর জন্মস্থান সালাতুরা ছিল সীমান্ত অঞ্চলে। কার্ষপণ ও ১০০-রক্তিকা বক্র-ধাতুখণ্ডের মুদ্রা (*শতমান*) — এই উভয়েরই উল্লেখ তক্ষশীলার বাজার-স্থান সম্পর্কে অবহিত এমন কারো লেখায় স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসত। তাঁর সময়কাল নিয়ে বিতর্ক আছে, আর তা আশ্চর্যের ব্যাপারও নয়। পাণিনির গ্রন্থে (৪.১.৪৯) 'যবন' শব্দটির ব্যবহার দেখলে সাধারণভাবে আমাদের মনে হয় যে তিনি ছিলেন আলেকজাণ্ডার পরবর্তী সময়ের; এখানে 'যবন' বলতে আইওনীয় গ্রীকদের বোঝানো হয়েছে এমন ধারণা প্রমাণ সাপেক্ষ, কিন্তু তা যদি মেনেও নেওয়া যায় তাহলে এই বৈয়াকরণকে বড়জোর জেনোফোন-এর 'দশ হাজারী' গ্রীক বাহিনীর পারস্য অভিযানের সময়কার বলে মনে হতে পারে। তার আগে পর্যন্ত আইওনীয়দের কথা ভারতে, এমনকী বণিক হিসেবেও, শোনা গিয়েছিল কিনা সন্দেহ। এটা সঠিক হলে, পারস্যে আইওনীয়দের প্রভাব-বলয়ের এ প্রান্তে ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের জনসাধারণ কবে তাদের কথা জানতে পেরেছিল তা খুঁজে বের করা দরকার। সময়টা প্রথম দারিয়ুসের আগে হওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। পাণিনিকে এক সময় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর কিংবা তারও আগেকার মানুষ বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে; কিন্তু এই ধরনের কালচ্যুত দেশপ্রেম খেয়াল করেনি যে কার্ষপণ-এর মতো নিয়মিত মুদ্রার প্রচলন খুব বেশি হলে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা। পাণিনির প্রথম ভাষ্যকার কাত্যায়ন 'যবনাল লিপ্যাম'-এর উল্লেখের ব্যাখ্যা করেছেন; এটাই ছিল প্রথম কোন লিপির উল্লেখ এবং অবশ্যই গ্রীক আগ্রাসনের পরেকার। ভাষ্যকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলি প্রসঙ্গক্রমে পুষ্যমিত্রের উল্লেখ করেছেন — যা থেকে (অনুসৃত দ্ব্যর্থব্যাঞ্জকতা সত্ত্বেও) তাঁর সময়কাল ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কয়েক বছর আগে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাধারণ জীবনযাত্রার অজস্র উল্লেখই হল পতঞ্জলির মহাভাষ্য-এর আকর্ষণ ও প্রাণশক্তি। কিন্তু এর ফলে ভাষার মতো অনুপম অস্ত্রটি — তিনি ও তাঁর পূর্বসূরীরা যার সূত্রগুলিকে আবিষ্কার করেছিলেন — তার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেনি। শব্দ হল চিরন্তন। লোকে কুমোরের কাছে গিয়ে বলতে পারে — আমাকে এই এই ধরনের একটা পাত্র তৈরি করে দাও। কিন্তু বৈয়াকরণকে গিয়ে কেউ বলে না — আমাকে এই এই ধরনের একটা শব্দ তৈরি করে দিন। সংস্কৃত ভাষায় কোন ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুই সাধারণভাবে হল 'পদার্থ' — যা দিয়ে আক্ষরিকভাবে বোঝায় 'শব্দের অর্থ' অর্থাৎ শব্দার্থবিদ্যাগত ঝোঁকই সংস্কৃত বাগরীতির মধ্যে বদ্ধমূল এবং তা এই ভাষার মূল প্রবক্তা ব্রাহ্মণদের অভিপ্রেতই ছিল।

পরবর্তীকালের বেদ ও উপনিষদগুলি শাব্দিক রহস্যময়তায় ভরা। অলঙ্কারবহুলতা ক্রমশই সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। জটিল বাক্যবিন্যাস, দুর্বোধ্য যৌগিক শব্দ, অসংখ্য প্রতিশব্দ, শব্দ ও বাক্যাংশের অতিব্যবহার ইত্যাদির ফলে কোন সংস্কৃত নথির সুনির্দিষ্ট অর্থটা খুঁজে বের করা ক্রমশই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রাজস্তুতি-র চমৎকার চমৎকার সব রচনায় কোন্ রাজার যশ কীর্তন করা হয়েছে তার নামটি উল্লেখ করতেই স্তুতিকারেরা ভুলে গেছেন — কী কাজের জন্য সে প্রশ্ন না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। অর্থের বদলে গঠন শৈলীর এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে অসুবিধাটা ঘটিয়েছে ফলিত সাহিত্যে, যদিও সংস্কৃত তাকে সংক্ষেপিত করে, অবোধ্য হলেও, মুখস্থ করার মতো সূত্র হিসেবে দাঁড় করাতে সাহায্য করেছে। গাছ-গাছড়াকে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করার জন্য আধুনিক লাতিন নামগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে। সংস্কৃত পরিভাষা আর যাই হোক সুনির্দিষ্ট নয়। ভেষজ সংক্রান্ত লেখালেখিতে সংস্কৃত বৃক্ষনাম 'অনন্ত' (অন্তহীন) ব্যবহার করা হয়েছে অন্ততপক্ষে ১৪টি ভিন্ন প্রজাতির গাছ বোঝাতে — এক ফুট লম্বা কোন গুল্ম থেকে শুরু করে মহীরূহ পর্যন্ত। এর ফলে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, স্থানিক ব্যবহার রীতি ও ভাষার (যেগুলি প্রকৃত অর্থেই সংস্কৃত-ভাষার সমান জীবনীশক্তি সম্পন্ন ছিল) প্রভাবই শুধু বঞ্চিত হয়নি, ভারতীয় বিজ্ঞান কীভাবে অধঃপতিত হয়ে গুপ্তবিদ্যায় পর্যবসতি হয়েছিল তা-ও-প্রমাণিত হয়েছে। এই চোদ্দটি গাছ-গাছড়ার অধিকাংশই আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। সব কবিরাজই মনে করেন তাঁরটাই আসল 'অনন্ত', অন্যজন (যে একই রোগের চিকিৎসা সম্পূর্ণ আলাদা এক 'অনন্ত' গাছ দিয়ে করে) অজ্ঞ হাতুড়ে।

সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে, সৌন্দর্যের এক জটিল ধরন সমেত, সংস্কৃত সাহিত্য অনবদ্য। কিন্তু, এমনকী সেই পর্যায়েও গভীরতা, প্রকাশের সারল্য, মননের চমৎকারিত্ব, মানবতার প্রকৃত মহিমা—যা পালি *ধম্মপদ*, *ডিভাইন কমেডি* বা *পিলগ্রিম'স প্রোগ্রেস* এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়—তা এতে নেই। এ হল একটা শ্রেণীর জন্য সেই শ্রেণীরই সৃষ্ট সাহিত্য — জনসাধারণের নয়।

কৃৎকৌশল, কায়িক উদ্যোগ, বাণিজ্য সংবিদা, চুক্তি বা জরিপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন একটা শ্রেণীর দীর্ঘ একচেটিয়া সাহচর্য ভাষাটিকে জীর্ণ করেছে। সাধারণ মানুষের মগজ অতিক্রম করা অতিসূক্ষ্ম ধ্যান-ধারণা যন্ত্রণাদায়ক কায়দায় লেখার, এবং ওইসব লেখা থেকেই সেগুলির ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার মতো পর্যাপ্ত সময় এই শ্রেণীর হাতে ছিল। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যগুলির মধ্যে গদ্য ছিল কার্যত অনুপস্থিত। সাহিত্যের মধ্য থেকে উঠে আসা শব্দগুলিরও ব্যবহার এত ভিন্ন ভিন্ন সম্পূরক অর্থে যে ভাষ্য ছাড়া কোন ভাল সংস্কৃত পুঁথির মর্মোদ্ধার করা দুরূহ।* টীকাগুলি প্রায়শই স্পষ্ট ভুল এবং তা মূল পাঠকে শুধু জটিলই করে তোলে; ইউরোপে উদ্ভাবিত

* প্রাচীন রোমে রিপাবলিকের শেষ দিনগুলো থেকে অ্যান্টোনিনেসের আমল পর্যন্ত কিংবা তারও পরের গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। প্রধানত গ্রীক উপাখ্যানের উদ্ভট সব ধ্যানধারণা নিয়ে রীট্যার-এর ছাত্ররা তর্কবিতর্ক চালাত এমন একটা সময়ে যখন রোমের বিচারসভাগুলি ব্যস্ত ছিল নানা ধরনের অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক সব মামলা নিয়ে। কল্পনা শক্তির অভাব, 'শোভন' বিষয়বস্তুর স্বল্পতা, এবং প্রকৃত সত্যকে দেখার অক্ষমতার অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায় এখানকার পণ্ডিতদের মনোভাবের সঙ্গে এবং তা একই কারণে : ভাষাটা ছিল একটা শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত। অবশ্য সেই কারণেই যে তার চর্চাকেও অবহেলা করতে হবে তা নয়, কিন্তু সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করার যে বর্তমান প্রস্তাব তার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিগুলির সাহায্যেই সেগুলির পুনরুদ্ধার করা দরকার। প্রাচীনতর প্রশাসনিক পরিভাযাগুলির কথা (যেমন *অর্থশাস্ত্র* এবং তামার পাতে লেখা সনদগুলি) ভুলে যাওয়া হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবেই অস্পষ্টতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ, তান্ত্রিক অতীন্দ্রিয়বাদ) সেখানে ধর্ম বিশ্বাসটি ও মূল পাঠের অর্থ একই সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে। স্মৃতিতে ধারণ করার অভ্যাসটা বিস্ময়কর ভাবে বেড়েছিল, কিন্তু অতি-বিশেষীকরণ এবং প্রতিটি শাখার জন্য নির্দিষ্ট পারিভাষিক শব্দপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের ফলে তারও পরিণতি একই হয়েছে। এখনও এমন অনেক শাস্ত্রী রয়েছেন যাঁরা একটা শব্দও বাদ না দিয়ে সঠিক উচ্চারণে যে কোন অংশ থেকে (আক্ষরিক অর্থেই শেষ থেকে শুরু বা শুরু থেকে শেষ) পুরো বেদ মুখস্থ বলে যেতে পারেন। অনেকে আছেন যাঁরা সহজভাবেই পাণিনির পুরো ব্যাকরণ বা *অমরকোষ* অভিধান মুখে মুখে বলে যেতে পারেন। তা সত্ত্বেও, এমন কেউ নেই যিনি প্রকৃতই পুরো সংস্কৃত ভাষাটাকে জানেন। গণিত বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত রচনাগুলিকে 'কারিকা' রূপ দান করার ফলে সহজেই মুখস্থ করা যায়, কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব—কেননা প্রতিটি সংখ্যা ও ক্রিয়া প্রণালীকে বোঝানো হয়েছে আলাদা আলাদা নানা শব্দ দিয়ে, যেগুলির অর্থ সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যরকম। বরাহমিহিরের *বৃহৎ সংহিতা*-তে কিছু ব্যবহারিক ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যদিও তার অধিকাংশই ধর্মীয় স্থাপত্য ও মূর্তি সংক্রান্ত; এটি রচিত হয়েছিল গুপ্ত যুগে। মূর্তিবিদ্যা, অঙ্কন, স্থাপত্য নিয়ে পরবর্তীকালের যে সমস্ত গ্রন্থ এখনো পাওয়া যায় সেগুলির সঙ্গে ভাস্কর্য-মূর্তি ও ভবনগুলির মাপজোকের বা রঞ্জকগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণের অমিল প্রচুর; শিল্পী ও রাজমিস্ত্রীরা নিজেদের মতো করেই কাজ করত। বিত্রুবিয়াস-এর স্থাপত্য সংক্রান্ত রচনার সঙ্গে এর বৈপরীত্যটা চোখে পড়তে পারে। কামার, কুমোর, ছুতোরমিস্ত্রী, তাঁতী, কৃষকের কাজে লাগার মতো কোন সংস্কৃত রচনা পাওয়া যায় না। সমাজের উচ্চকোটির মানুষদের কাজে লাগতে পারত এমন সব গ্রন্থেও খুব বেশি পরিমাণে রয়েছে চিরাচরিত বিষয়গুলি—যেগুলির না ছিল কার্যকারিতা, না প্রয়োগ, কোন কাজেই লাগত না। ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস রচনার অভাবের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত রচনাগুলির অধিকাংশেরই জায়গা জুড়ে রয়েছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও কাব্য। এ প্রসঙ্গে, সংস্কৃতের সঙ্গে আরবী-র পার্থক্যটাও লক্ষ্য করা উচিত। তৎকালে, চিকিৎসা, ভূগোল, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যবহারিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত আরবী গ্রন্থগুলি অক্সফোর্ড থেকে মালয় পর্যন্ত সর্বত্রই যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল। তবুও, এক নতুন ধর্মের সঙ্গে আরবী-কেও অজস্র ভিন্ন ভিন্ন জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তফাৎটা ছিল এই যে, মূলগতভাবে আরবের শিক্ষিত সমাজে অবজ্ঞা-পূর্ণ কোন পুরোহিত-বর্ণ ছিল না, যাঁরা লিখতেন তাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য বা যুদ্ধে অংশ নিতে, বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চা করতে কুণ্ঠিত হতেন না; কিংবা ইতিবৃত্ত রচনা করতেও নয়।

৮.৮ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত খোদাইগুলির মধ্যে জ্ঞাত সবচেয়ে প্রাচীনতমটি হল রুদ্রদামন-এর (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা,* ৮৪৩ ও পরবর্তী); এটি ১৫০ খ্রীষ্টাব্দের। অশোকের বিখ্যাত গিরনার অনুশাসনগুলির পাথরেই তা খোদিত, যদিও ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে উভয়ের পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধনের ফলে পাথরের উপরিভাগে খোদাইয়ের পুরো সপ্তম অংশটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। বাকি অংশে প্রধান যে কৃতিত্ব দাবি করা হয়েছে তা হলো 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের 'রাষ্ট্রীয়' (রাজ্যপাল) বৈশ্য পুষ্যগুপ্ত কর্তৃক নির্মিত এবং অশোক

মৌর্যের অধীনস্থ যবন (= পারসিক) রাজা তুষাস্ফা কর্তৃক সেচ ব্যবস্থা সমেত সম্পূর্ণতা দেওয়া' বাঁধটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পর দ্বিগুণ আকারে সেটির পুনর্নির্মাণ। অশোক প্রজাদের প্রতি তাঁর উপদেশাবলীতে এই কাজকে স্মরণে রাখার মতো মূল্যবান বলে মনে করেননি। রুদ্রদামন '*পৌর জানপদ* নাগরিকদের ওপর কর না বসিয়ে, বিশেষ দান বা ব্যধ্যতামূলক শ্রম গ্রহণ না করেই নিজের কোষাগার থেকে বিপুল অর্থব্যয়ে এই কাজ করতে পেরেছিলেন বলে' খুবই গর্বিত ছিলেন। যদিও এই পুনর্নির্মাণ ছিল মূলত এবং সম্পূর্ণত তাদেরই স্বার্থে। যুদ্ধ ব্যতীত নরহত্যা বন্ধ করা, অবন্তী থেকে সিন্ধু ও অপরান্ত পর্যন্ত অসংখ্য প্রদেশ এবং নিষাদদের (বন্য-উপজাতি) আক্রমণ ও জয় করা, পরাক্রমশালী যৌদ্ধেয়দের সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং 'দাক্ষিণাত্য অধিপতি শাতকর্ণি' (বিবাহসূত্রে আত্মীয়তার কারণে যাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল)-কে দু'বার পরাস্ত করার জন্য রুদ্রদামন গর্ববোধ করতেন। তাঁর রাজকোষের সোনা, রূপা, রত্নগুলির কথা সগর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; আরো বেশি গর্ব ব্যক্ত হয়েছে সমস্ত ধরনের সাহিত্যধর্মী ভাব ও অভিব্যক্তি—তা সে গদ্য বা কাব্য যাই হোক না কেন—তার শব্দাবলী (সংস্কৃত)-র উপর তাঁর প্রভুত্ব নিয়ে। একে রাজসভার চাটুকারিতা ভাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ ছিল স্পষ্টতই দেশীয় শাসকশ্রেণীর রুচি ও শিক্ষা বাল্যে আত্মস্থ করা এক বিদেশী বংশোদ্ভুত শাসককে তাদের কাছে প্রিয় করে তোলার জন্য অনুসৃত এক পদ্ধতি। সংস্কৃত সাহিত্য ও নাটকের পৃষ্ঠপোষক বিখ্যাত রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজশেখর (খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দী) যে বাসুদেব-কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন—তিনি ছিলেন সম্ভবত শেষ কুষাণ সম্রাট (২০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ)। এই সমস্ত রাজারা 'মহারাজাধিরাজ' রুদ্রদামনের মতোই চতুর্বর্ণকে রক্ষা করার কথা আরো প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারতেন—যদি তাঁরা শুদ্ধ সংস্কৃতে কথা বলতেন এবং ব্রাহ্মণদের ভাল দানধ্যান করতেন (গিরনারের উৎকীর্ণ শিলালিপির অন্তর্নিহিত অর্থ এটাই)। তাঁর প্রতিনিধি (*নিযুক্ত*) যে পহ্লব (= পেহ্লেবি, পারসিক) বংশীয় বর্বর কুলইপ-র পুত্র সুবিশাখ তাতে কিছু এসে যায় না; গোরু, ব্রাহ্মণ ও সংস্কৃত সম্পর্কে যথাযথ মনোভাব রাজা ও প্রশাসক উভয়েরই পীড়াদায়ক পিতৃমাতৃ পরিচয়কে সহনীয় করে তুলত।

নির্ভরযোগ্য জীবন কিংবা সন-তারিখ উল্লিখিত সাহিত্য-সূত্রের অভাব আমাদের বাধ্য করে, এই ধরনের প্রাপ্ত সাক্ষ্যগুলির উপর নির্ভর করেই একটা সাধারণ সংজ্ঞায় পৌঁছতে। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ (তার বিভিন্ন অঞ্চলে) ওপর থেকে নামা সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উল্টোদিকে, ধ্রুপদী গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের পতন সম্পূর্ণ হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে। এর কারণটা আবারও অনুসন্ধান করতে হবে ভারতে সামন্ততন্ত্রের স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং স্বতন্ত্র ভূমিকার মধ্যেই। অনুরূপভাবে, এক গৌণ, সাধারণ সংস্কৃতের নিছক ফুটে ওঠা এবং আঞ্চলিক সাহিত্যের উত্থানকে গণ্য করতে হবে নীচে থেকে উঠে আসা সামন্ততন্ত্রের প্রথম সাফল্য হিসেবে। সেই সঙ্গে, এক অনামী লেখকের একটিমাত্র পংক্তিই তুলে ধরে কোন নির্মম সামন্তশাসকের নিপীড়নের পরিচিত অবশ্যম্ভাবী পরিনামটা কী ছিল : না খেতে পেয়ে মরার মুখে পড়ে থাকা কয়েকটি কৃষিজীবী পরিবার ছাড়া বাকি সবাই গ্রামগুলি ছেড়ে চলে গেছে। এটি বিদ্যাকরের সংকলন গ্রন্থ *সুভাষিতরত্নকোষ*-এর ১১৭৫ নং পংক্তি। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে এ ধরনের আর কোন বিবরণের কথা আমার জানা নেই। প্রতিটি নতুন শ্রেণীই যে নতুন মহান সাহিত্য সৃষ্টি করে তা নয়—কেননা সব নতুন শ্রেণীই প্রগতিশীল নয়; সাহিত্যের প্রয়োজন সবাই অনুভব করে না, বা সমগ্র সমাজকে এক নতুন, আরও

উৎপাদনশীল রূপে পুনর্গঠিত করার দায়িত্ব যে সব নতুন শ্রেণীই গ্রহণ করে তা-ও নয়। যদিও, অভিজ্ঞতা এর উল্টোটাকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছে : প্রতিটি মহান নতুন সাহিত্যরূপের অর্থই হল কোন নতুন শ্রেণীর নেতৃত্বে কোন নতুন সামাজিক রূপের উন্মোচন ; ব্যতিক্রম শুধু সমাজতন্ত্র—যেখানে নতুন গণসাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সময়টাকে হিসেবের মধ্যে রাখা হয়। নতুন সমাজের ধরনটি যখনই সংহত হয়ে ওঠে শ্রেণীটিও তখনই গোটা সমাজকে নিজের নেতৃত্বের পেছনে জড়ো করার কাজ থেকে সরে এসে তার আসল কাজ, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন শোষণের কাজ শুরু করে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাহিত্য-রূপগুলিও অনমনীয় হয়ে ওঠে, শুরু হয় সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। নতুন সাহিত্য যদি গোড়াতেই সমগ্র মানবজাতির কথা না বলে থাকে তাহলে সমকালীন জনগণ বা উত্তরপুরুষদের কাছে তার কোন আবেদন থাকে না; কিন্তু যদি তা সমগ্র মানবতার সপক্ষে কথা বলে যায় তাহলে যে শ্রেণী তার জন্ম দিয়েছে, যে শ্রেণীর স্বার্থ তার রক্ষা করার কথা তার প্রতিই অবশ্যম্ভাবীভাবে বৈরিতামূলক হয়ে ওঠে। এ থেকে বোঝা যায়, কেন অধিকাংশ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সাহিত্যে মহান স্রষ্টাদের নামগুলি শুরুতেই উচ্চারিত হয়। এ যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ যে এই সমস্ত কালজয়ী সাহিত্যিকদের প্রত্যেকেরই পিছনে ছিল এক দীর্ঘ ঐতিহ্য—মহান চারণ-কবিদের ধারার সম্ভবত শেষ প্রতিনিধিই ছিলেন হোমার। যে পুরনো ঐতিহ্যের গর্ভে তাঁদের সৃষ্টি অঙ্কুরিত হয়েছিল তাকেই তাঁরা অপসৃত করেন, অপ্রাসঙ্গিক করে তোলেন। গ্রীক ভাষা হোমার সৃষ্টি করেননি, শেক্সপীয়ারও ইংরেজি নাটকের উদ্ভাবক নন। এলিজাবেথিয়ান-দের আগেও ইংরেজি নাট্যকাররা ছিলেন, যাঁরা তাঁদের আঙ্গিকের জন্য সেনেকা ও চিরায়ত নাটকগুলির কাছে অনেকখানি ঋণী এবং নিশ্চিতভাবেই, মধ্যযুগীয় চার্চের যাদু-নাটক বা রেঁনেসাঁ যুগের রাজদরবারের মুখোশ-নাটকের কাছেও কিছুটা। তা সত্ত্বেও, সঙ্গতভাবেই, মার্লো ও শেক্সপীয়ারকে এক নতুন থিয়েটার, নতুন সাহিত্যের উদ্গাতা হিসেবেই বরণ করা হয়, পুরনো ধারার শিখরে আরোহনকারী হিসেবে নয়—যদিও এটা ঘটনা যে আর কোন ইংরেজি নাট্যকারই কখনও তাঁদের উচ্চতায় পৌঁছতে পারেননি। সুতরাং, বিভিন্ন সময়ের সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশকে আমরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ও কালের সমাজ-বিকাশের লক্ষণ হিসেবেই গণ্য করতে পারি—অবশ্য সেই অঞ্চল ও কাল সম্পর্কে যখন কিছুটা পরিমাণ নিশ্চিত হতে পারি তখনই।

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম যে নামটি স্মরণীয় তা হল অশ্বঘোষ-এর। তিনি ছিলেন ঐতিহ্যগতভাবে কুষাণ রাজসভা ও কয়েকটি মঠের সঙ্গে যুক্ত এক উত্তরাঞ্চলীয় বৌদ্ধ। বুদ্ধের জীবন ও প্রথম যুগের বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে তিনি যে কাব্য ও নাটক রচনা করেছিলেন তা ছিল অভিনব, কেননা তাঁর আগে সম্ভবত কোন সংস্কৃত নাটক লেখা হয়নি। এই নতুন সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে একসময় গ্রীকদের অবদানের কথা বলা হত, বিশেষ করে তাঁরাই বলতেন যাঁরা বিদেশী মডেল ছাড়া ভারতীয়দের অসহায় বলে মনে করেন—যদিও কাঠামো বা প্রকরণের দিক থেকে সংস্কৃত নাটক গ্রীক নাটক থেকে পুরোপুরি আলাদা, মিলের কথা ভাবাও যায় না। পুরনো যাদু-নাটকগুলির চেয়ে ভাষা ও চিন্তাধারায় এগুলি এতই ভিন্ন ছিল যে মনে হয়, ভারতীয় দর্শকদের তা মুগ্ধ করেছিল। ভাষা ছিল অত্যন্ত রকমের অলঙ্কারবহুল, যৌনতামূলক 'শৃঙ্গার' রস-কল্পনাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল ঃ নারী, দাসদাসী, সাধারণ মানুষকে সম্ভাষণ করা হত সংস্কৃতে, কিন্তু তারা নিজেরা কথা বলত প্রাকৃত ভাষায়। অশ্বঘোষের প্রাকৃত ছিল চলতি

কথ্যভাষারই কাছাকাছি ঃ পরবর্তীকালে তা সম্পূর্ণ কৃত্রিম হয়ে দাঁড়ায়। কথাবার্তা এবং প্রেমালাপ রাজদরবারের কেতাদুরস্ত ভাষার মতোই ছিল—যা এই ধরনের প্রায় সব নাটকেই দেখা যায়। বস্তুত, এর একমাত্র ব্যতিক্রম হল শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* (মৃৎ-শকটিক = মাটির খেলনা গাড়ি)—যার উপজীব্য ব্রাহ্মণ চারুদত্তের সঙ্গে রাজনর্তকী বসন্তসেনার প্রেম। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে জনগণের অভ্যুত্থান ও রাজবংশের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে; আরো তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, কোনরকমে জীবনযাপন করার গতানুগতিক ঐতিহ্যই শূদ্রককে শাতবাহন রাজাদের সঙ্গে যুক্ত করেছিল এবং একমাত্র তাঁদের রাজত্বেই এরকম অত্যন্ত মানবিক এক সংস্কৃত নাটক লেখা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়। অন্য নাটকগুলিতে চিত্রিত করা হয়েছে দেবতাদের (রাজার মতো করে, মানবিক দুর্বলতাগুলো সমেত), মহাকাব্যের বীরদের, প্রবাদপ্রতিম শাসক কিংবা মহামন্ত্রীদের; এদের এমন একটা ছাঁচে ঢালা হয়েছে যার সাহায্যে সমকালীন কোন রাজার স্তাবকতা করা যেত। রীতি অনুযায়ী, শূদ্রককেও রাজা হিসেবে প্রতিপন্ন করা যেত। রাজার পক্ষে কবি-নাট্যকার হওয়াটা নতুন কিছু ছিল না। মধ্যযুগীয় ইউরোপের ভার্জিলের মতোই, মহান সাহিত্যস্রষ্টাদের চরিত্রে সাধারণত যাদুকরী ক্ষমতা আরোপ করা হত। এই রীতির কারণেই তাঁদের জীবন সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যগুলি আড়ালে থেকে গেছে। ভারতীয় সাহিত্যের কোন সমালোচক যদি প্রমাণ করতে পারেন যে অমুক লেখক সত্যিই ছিলেন, তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলির মতোই কাল্পনিক ছিলেন না—তাহলে প্রায়শই তিনি ভাগ্যবান।

মৃচ্ছকটিক-এর আগের একটি নাটকের নাম *দরিদ্র-চারুদত্ত;* চার অঙ্কের এই অসম্পূর্ণ নাটকটি শূদ্রকের নাটকের প্রথম চার অঙ্কে প্রায় হুবহু নকল করা হয়েছে। এই *দরিদ্র-চারুদত্ত* সমেত একই ধরনের তেরোটি ভিন্ন দৈর্ঘ্যের নাটক গণপতি শাস্ত্রী কেরালায় আবিষ্কার করেন এবং ভাস-এর রচনা হিসেবে তা প্রকাশ করেন। কিন্তু রচয়িতার নামটি নিয়ে এক অন্তহীন বিতর্ক জেগে ওঠে—যদিও ভাস ছিলেন এমন একজন কবি-নাট্যকার যাঁর সম্পর্কে এমনকী, কালিদাস-ও উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর *স্বপ্ন বাসবদত্তা*-য় (বৃদ্ধ উদয়নকে কেন্দ্র করে রচিত রোমান্স) এমন সব অংশ রয়েছে যা সূক্ষ্মতা ও গতিশীল নাটকীয়তার দিক থেকে অতুলনীয়। তা সত্ত্বেও, যাঁরা সংস্কৃতকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভাষা বলে মনে করেন এবং তাকে আরও জটিল করে তোলার জন্য ক্লান্তিহীন চেষ্টা চালিয়ে যান তাঁরা ভাস-এর রচনাগুলিকে সংরক্ষণ করেননি। গদ্যের ক্ষেত্রে, কবি বাণ-এর লেখা হর্ষের রোমান্টিক জীবনীতে রোমান্সের কারণে ইতিহাসকে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং সেটি এমন সব শব্দে ভরা যেগুলির কমপক্ষে দুটি করে অর্থ। তাঁর *কাদম্বরী*-তে প্রকৃতপক্ষে একটা কার্যকর সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃত গদ্যের উঠে আসার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা হয়েছে; সেখানে এমন সব বিরাট বিরাট জটিল বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলোর পাক খুলতে ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যায়। সংস্কৃত গদ্য লেখকদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলেন *দশকুমার চরিত*-এর রচয়িতা দন্ডিন। ইনি ছিলেন সম্ভবত (দাক্ষিণাত্যের পল্লব রাজ্যে) সপ্তম শতাব্দীর মানুষ। রুচিবোধ, মার্জিত উজ্জ্বল ভাষা, সংযত হাস্যরস ও শ্লেষ, সকল স্তরের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের দিক থেকে এ গ্রন্থটির কোন সমকক্ষ পাওয়া যায় না। তবু, এর প্রামাণিক যেটুকু অংশ পাওয়া যায় তা মাঝের অংশ। দন্ডিন, মনে হয়, রাজ সভাসদদের চরিত্র চিত্রণে বাণ-এর চেয়ে কম কুশলী ছিলেন। *সুভাষিত* নামের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তিগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে এমন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে যে একটা নাটকের মূল অংশ, ঘটনাপ্রবাহ,

শিরোনাম, এবং রচয়িতার নাম হারিয়ে গেলেও সেগুলি টিকে রয়েছে এবং সামন্ততন্ত্র বিকশিত হওয়ার পর এক বিশেষ ভূমিকাও পালন করেছে। আপাদমস্তক তৈলমর্দনের জন্য এই বচনাংশগুলি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করাটা ছিল রাজানুগ্রহ লাভের একটা পন্থা। এটা ইঙ্গিত দেয় এক ধরনের কর্ম-নিযুক্তির, যাকে বলা যেতে পারে 'রাজকর্ম'—দলিল, চিঠিপত্র ইত্যাদি লেখা। এই ধরনের দলিলপত্রের নিদর্শন রয়েছে, যেমন *লোকপ্রকাশ*—যা ক্ষেমেন্দ্রর রচনা বলে পরিচিত, এবং *লেখপদ্ধতি।* শেষোক্তটি করণিকদের কাজকর্মের এক পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ : জনজীবনের সর্ববিষয় সম্পর্কে উচ্চশ্রেণীর মানুষদের লেখা চিঠিপত্র, বিচারের রায় ও দন্ডবিধি, চুক্তি, কর, শুল্ক এবং অন্যান্য বকেয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ও শংসাপত্র। পান্ডুলিপিটি মনে হয় ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়কাল থেকে শুরু করে সংকলিত হয়েছে—যদিও এর অনেকগুলিই আরো পুরনো, যেমন ১২৩২ বা ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দের। এটি গুজরাটে পরবর্তীকালের সামন্ততন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ বুঝতে সাহায্য করে। উচ্চ শ্রেণীগুলি মূলত করণিকদের সাহায্যে সংস্কৃতকে সংযোগের একটা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত। *সুভাষিত*-ও একটা ভূমিকা পালন করত—ঠিক যেমনটা, সমধরনের কৃত্রিম রচনা *পাকু* চীন সাম্রাজ্যে মিং রাজবংশের আমল থেকে করেছিল।

সংস্কৃতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল নতুন ধর্মবিশ্বাস, উৎসব অনুষ্ঠান, ক্রিয়াচার ইত্যাদিকে গাম্ভীর্য ও প্রাচীনত্ব প্রদান। প্রকৃত ক্রিয়াচারটি ছিল হয়ত *বেদের* চেয়েও প্রাচীন—কিন্তু তা ছিল স্থানিক এবং কোন দুর্বোধ্য কারণে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগুলিতে অনুল্লিখিত। পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ আত্মীকরনের জন্য প্রয়োজন সকল পক্ষের সমান অনুমোদন—তবেই তাকে প্রকৃত বলে চালানো যায়। এ ব্যাপারে বেদ কোন কাজে আসেনি—কেননা পরিবর্তনাতীত নিয়মনীতির দ্বারা সেগুলির মূল পাঠ ছিল স্থিরীকৃত—তাতে এমনকী একটা পদ-এরও অদলবদল চলত না। *স্মৃতি*-গুলিরও একবার পুনর্লিখনের পরই আবার কোন অনধিকার পরিবর্তন সম্ভব ছিল না, অথবা এ নিয়ে বিরোধের পরিণতি হত সমস্ত কর্তৃত্বেরই বিলুপ্তি। সুতরাং কাজটা ছিল, নতুন পুঁথিগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা ন্যায়সঙ্গত প্রাচীনত্ব প্রদান—যাতে সেগুলির বিষয়বস্তুর কিছুটা সংশোধন করে নেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে, *মহাভারত*-এর ভৃগু-সংস্করণ একটা দৃষ্টান্ত। পুরাণগুলি ছিল আরো সুবিধাজনক। প্রথমে এগুলি ছিল আধা-ঐতিহাসিক বিবরণ—সৃষ্টিরহস্য দিয়ে শুরু করে শেষ হত রাজ বংশবৃত্তান্তে। এগুলির পরিবর্তন *মহাভারত*-এর পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত—যা প্রমাণ করে যে এই উভয় পরিবর্তনই ব্রাহ্মণদের কাছে আশু প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। রাজ বংশবৃত্তান্তকে (ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে যা ব্যক্ত করা হত) সমকালীন রাখার জন্য স্পষ্টতই প্রয়োজন ছিল *পুরাণ*গুলির ঘন ঘন সংস্করণের। *মহাভারত* ও *পুরাণ*, উভয়েরই রচয়িতা ব্যাস বলে মনে করা হয়—যাঁর নামের আক্ষরিক অর্থ সম্প্রসারক, এবং ক্রমে ক্রমে *বেদ*গুলি রচনার কৃতিত্বও তাঁকে দেওয়া হয়েছে (বেদ-ব্যাস)। আর. সি. হাজরার মতে (দ্রষ্টব্য এফ. ই. পারজিটার-এর টীকা), (পৃ. ১৮৮-৯) সম্প্রসারণ সংঘটিত হয়েছিল দুটি পর্যায়ে, প্রথম পর্যায়ে (আনুমানিক ২০০-৫০০ খৃষ্টাব্দে) *স্মৃতি*-র বিষয়বস্তুগত পুষ্টি ঘটানো হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে (ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে) তা ডানা মেলে বৃহত্তর এলাকায়—যার ফলে *পুরাণ*-উদ্ভূত নতুন সংযোজনগুলিতে দক্ষিণা, অশুভ গ্রহ তুষ্টির জন্য বলি, মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ্য মহিমা, তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়কালটি, উপর থেকে নামা সামন্ততন্ত্রের জাঁকিয়ে বসার সঙ্গে সম্পর্কিত—যখন

গ্রাম-বসতির ঘনত্ব প্রভৃত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সংশোধন সম্পর্কে বলা যায়, এর সবচেয়ে হাস্যকর দৃষ্টান্ত *ভবিষ্য-পুরাণ*—যার খোদ শিরোনাম অর্থাৎ 'ভবিষ্যত-অতীত' কথাটিই স্ববিরোধী; মুদ্রিত হবার আগে এর মূল পাঠে কমপক্ষে দশ বছর ধরে অবিরাম নানা বিষয় ঢোকানো হয়েছে।

স্থানিক ধর্মবিশ্বাসকে আত্মীকৃত করার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত হল বাঙ্গালোরের করগা* উৎসব। এটা তিগল-দের একটা বিশেষ উর্বরতা-কামনা উৎসব। তিগলরা এখন ফল-তরিতরকারী চাষের বাগানের মালিদের একটা পেশা-ভিত্তিক জাত এবং উত্তর আরকট জেলা থেকে অভিবাসিত বলে পরিচিত। পূজার মূল বিগ্রহ হল একটি মাটির ঘট, যার ভিতরে থাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একটি স্বর্ণখণ্ড। আগে ঘটের সামনে যত পশুবলি দেওয়া হত তার সংখ্যা কমিয়ে এখন একটায় দাঁড় করানো হয়েছে; বাকি পশুগুলোর বদলে লেবু কাটা হয়, কিংবা সেগুলোর প্রতীক হিসেবে রাখা হয় ভাতের পিন্ড। শেষ শোভাযাত্রায় প্রধান অংশগ্রহণকারী (*অর্চক*, বংশানুক্রমিক তিগল পুরোহিত) মাথায় করে ঘটটি বহন করেন, কিন্তু তাঁকে সাজতে হয় নারীর বেশে। উৎসব চলাকালীন তাঁর স্ত্রীকে থাকতে হয় আলাদা। তিগল প্রতিনিধিরা, প্রতিটি পরিবার থেকে কমপক্ষে একজন করে, অর্চক-এর পিছন পিছন হেঁটে কিংবা নাচতে নাচতে যায় এবং ধারালো তরবারি দিয়ে নিজের নিজের দেহে আঘাত করতে থাকে; যদিও এই কঠোর পরীক্ষার সময় কোন রক্তপাত ঘটে না। প্রধান পুরোহিত যদি তাঁর যাওয়ার পথে কোন রহস্যজনক বাধা উপলব্ধি করেন, তাহলে সেই আধিদৈবিক কিংবা নারকী শক্তিগুলির বাধা দূর না হওয়া পর্যন্ত লেবু কেটে রাস্তায় ছড়ানো হতে থাকে। এই পালনীগুলি নিশ্চিতই আর্য নয়। গত দেড়শো বছরের মধ্যে এই উৎসবটির ব্রাহ্মণ্যীকরণ করা হয়েছে। এখন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে, ঘটের অলৌকিক স্বর্ণটি হল পঞ্চপান্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীর আত্মা; তিনটি করগা ঘটে রাখা লেবুগুলি হল তাঁর স্বামীদের প্রতীক। ঘটটিতে কিছুটা সাধারণ জল ও কিছুটা ডাবের জলও থাকে। তিগলদের প্রধান পূজ্য দেবতা রয়েছেন ধর্মরাজ মন্দিরে; এই নামটি, মনে হয়, জ্যেষ্ঠ পান্ডবের নামানুসারী। এটাও মনে রাখা দরকার যে, মৃত্যুর দেবতা যম-এর আরেক নাম ধর্মরাজ। এর সঙ্গে,বৌদ্ধযুগের শেষ পর্বের ধর্মযান বিশ্বাস—যা মহম্মদ বিন বখতিয়ার-এর বঙ্গবিজয়ের ঠিক আগে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল বলে মনে করা হয়, তার কোন সংযোগ আছে কিনা জানা যায়নি। বর্তমানে এই বিগ্রহ-পূজার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং এমনকী নারীবেশী অর্চক ও শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেওয়া আরেক তিগল যখন গুহ্য আচার পালন করেন তখনও তিনি হাজির থাকেন। এই ক্রিয়াচারগুলোর বর্ণনা প্রকাশ করা হয় না, কিন্তু নিশ্চিতই সমগ্র উৎসবটি তিগলরা গ্রহণ করেছে তাদের মহিলাদের কাছ থেকে। ঘটটি তৈরি করতে হয় হাতে এবং রোদে শুকনো করতে হয়। এটি তৈরি হবে নির্দিষ্ট একটি পুকুরের পাঁক থেকে, আর উৎসবের শেষে ঘটটি বিসর্জন দিতে হবে সেই পুকুরেই—অবশ্য দ্রৌপদীর স্বর্ণস্থিত 'আত্মা'টি পরের বছর ব্যবহারের জন্য পুরোহিত গোপনে সরিয়ে রাখেন। ন'দিনের এই উৎসব শেষ হয় চৈত্র পূর্ণিমার (এপ্রিল) দিন এক মহা-

* পয়লা আশ্বিন ঘট-পূজা (*ঘট-স্থাপনা*) করার প্রথা করগার চেয়ে অনেক প্রাচীন। ন'দিনের এই উৎসব ফসল পেকে কাটার সময় ঐ তারিখ থেকে শুরু হয়। 'নবরাত্র'-র এই দিনগুলিতে বিশেষ করে সমস্ত দেবীর পূজা হয়। অষ্টম দিনে সরস্বতী দেবীর উদ্দেশ্যে অতি অবশ্যই বলিদান করা হয় (এখন তা খুব একটা ক্ষতিকর নয়)। গ্রামবাসীরা এখনও বছরের এই সময়ে সুসজ্জিত ষাঁড় নিয়ে শোভাযাত্রা করে—যদিও আগের মতো এ ষাঁড়গুলিকে আর বলি দেওয়া হয় না।

শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে; কিন্তু অস্পৃশ্যদের নিজস্ব করগা অনুষ্ঠিত হয় এর মাস দুয়েক পরে, তেমন কোন আড়ম্বর না করেই। তিগল করগা উৎসবে শহরের প্রতিটি দেবমন্দির থেকে প্রতিনিধি হিসেবে একটি করে বিগ্রহ পাঠানো হয় শোভাযাত্রায় অংশ নিতে—তা সে মন্দিরের দেবতা যতই উচ্চস্থানীয় বা রক্ষণশীল হোন না কেন। এটা পারস্পরিক সংস্কৃতি-বিনিময়ের একটা নিদর্শন। আমাদের কাছে যেটা সবচেয়ে মজার তা হল, এই ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে—ঠিক *পুরান-মহাভারত*-এর আঙ্গিকে—একটি জাল সংস্কৃত বিবরণী (এখনও অপ্রকাশিত) গত পঁচাত্তর বছরের মধ্যে বানিয়ে তোলা হয়েছে।

আর্যায়িত অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় স্ব-ভাষার সাহিত্য যখন শুরু হয়েছে তখন তা প্রায়শ সংস্কৃত মডেল বা আদর্শকেই অনুসরণ করেছে। সাধারণ মানুষের হৃদয়ে আজও উজ্জ্বল জোলা কবীর বা 'কুনবি' খাদ্যশস্যের ব্যাপারী তুকারাম সেই রচয়িতাদেরই প্রতিনিধি—যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন সাধারণের ভাষায়, ব্যবহার করেছিলেন সাধারণের পরিচিত বাক্যালঙ্কার। তা সত্ত্বেও, তাঁদের গানগুলিও গাওয়া হয়, যাকে বলা যেতে পারে, ধর্মীয় উদ্দেশ্য থেকেই। ধর্ম—রাষ্ট্রের, অর্থাৎ শাসক শ্রেণীগুলির সাধারণভাবে এমন এক হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল যে, কোন প্রতিবাদও আপনা থেকে সেই একই মতাদর্শগত কাঠামোর মধ্যেই তার ভাষা খুঁজে পেত। ধর্মীয় অভ্যুত্থানগুলি—যেগুলির মূলে ছিল সম্পত্তি-সম্পর্কের ব্যাপক পরিবর্তন—এই কথাটাই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণদের প্রাণ; এবং রাজদরবারের সেবক—কেননা তা দিয়েই উদ্বৃত্ত উৎপাদকদের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যেত। এর অভিব্যক্ত প্রধান সামাজিক রূপ হল বর্ণ—শ্রেণী বিভাজনগুলি কঠোর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যা একসময় শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে এক অত্যন্ত অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়েছিল; এবং ঐ একই ব্যবস্থা সেবা করেছিল তাদেরও যারা স্থিতাবস্থা থেকেই লাভবান হয়েছে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১. আরো ভালো কালপঞ্জির অভাবে *দি কেম্ব্রিজ হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া* এবং L. de la Vallée Poussin কৃত কালপঞ্জী ব্যবহার করা হয়েছে; তুলনীয়, J. van Lohuizen de Leeuw-র *The 'Scythian' Period* (লাইডেন, ১৯৪৯); এ বিষয়ে এবং গুপ্তযুগ সম্পর্কে একটা সাধারণ আলোচনার উপস্থাপনা করা হয়েছে আমার 'বেসিস অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্টরি' শীর্ষক গবেষণা-নিবন্ধে (*জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি* ৭৫.৩৫-৪৫; ২২৬-২৩৭)।

২. আর. ই. মর্টিমার হুইলার : *রোম বিয়ন্ড দ্য ইমপিরিয়াল ফ্রন্টিয়ারস* (পেলিকান বুকস এ. ৩৩৫; লন্ডন ১৯৫৫), বিশেষ করে ১৪১-১৮২ পৃষ্ঠা; এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক ও সেই সঙ্গে সাহিত্যিক উপাত্ত বিষয়ে এক ব্যাপক নিরীক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩. *জার্নাল অফ দি নিউমিজমেটিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া* (জে. এন. এস. আই.) ২ (পৃ. ৮৩-৯৪)-এ ভি. ভি. মিরাশি তরহালা ভান্ডারে পাওয়া শাতবাহন রাজাদের নিম্নমানের সীসা মেশানো মুদ্রার বিবরণ দিয়েছেন। কুম্ভ, কর্ণ ও সক—শাতবাহন বংশের এতদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত এই তিন রাজার নাম যুক্ত করে *পুরাণ* তালিকা-ও বাড়ানো হয়েছে (এফ. ই. পারজিটার, ৩৬)।

একটি তাম্রমুদ্রার ওপর ছাপ দেওয়া শাতবাহন (অসম্পূর্ণ) নামটি সম্ভবত এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার; এ বিষয়ে *জে. এন. এস. আই,* ৭, ১৯৪৫, পৃ. ১-৪-এ ঐ একই লেখকের নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই রাজবংশের ইতিহাসের পক্ষে এমনকী এসমস্ত মুদ্রাতাত্ত্বিক প্রমাণও যে কত নগণ্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় এস. এল. কাতারে এবং মিরাশি-র মধ্যেকার আলোচনা, *জে. এন. আই. এস,* ১৬, ১৯৫৪, ৭৭-৮৫ এবং পি. এল. গুপ্তর নোট, *পূর্বোক্ত,* ৮৬-৯ থেকে। শাতবাহনদের রৌপ্যমুদ্রা বিরল; এর অর্থ তাঁরা প্রধানত অন্যদের মুদ্রা ব্যবহার করতেন, কখনো কখনো তার উপর নিজস্ব ছাপ মেরে—যেমন, নহপান এবং গোতমীপুত্রের ক্ষেত্রে। উত্তরাঞ্চলের ছাপ-মারা মুদ্রাও এই সময় দক্ষিণে প্রচলিত ছিল, ফলে রূপোর অভাব বিশিষ্ট এই অঞ্চলে শাতকানি রাজাদের নতুন মুদ্রার প্রচলন আবশ্যিক হয়ে ওঠেনি। এ ধরনের মুদ্রা না থাকার ব্যাপারটা ইঙ্গিত দেয় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে পণ্য বিনিময় প্রথাটাই বেশি চালু ছিল।

৪. J. Przyluski : *জার্নাল অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ লন্ডন* (জে. আর. এ. এস), ১৯২৯, পৃ. ২৭৩-২৭৯; তৃণকর্ণ, মসুরকর্ণ এবং সম্ভবত জতুকর্ণ নামে অন্তঃপদ 'কর্ণ'-এর ব্যবহার থেকে মনে হয় যে এই ধরনের অন্য কৌম-নামও ছিল (*জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি,* ৭৫, পৃ. ৪১, পাদটীকা ৯)।

৫. জে. এইচ. স্পিক : *এ জার্নাল অফ দি ডিসকভারি অফ দি সোর্সেস অফ দি নাইল,* প্রথম অধ্যায়; ১৮৬৩-তে প্রথম প্রকাশিত হয় লন্ডনে, কিন্তু এর এভরিম্যান'স লাইব্রেরি সংস্করণের (নং ৫০) ২৫-২৭ পৃষ্ঠায় মানচিত্র সহ বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। লে. ফ্রান্সিস উইলফোর্ড-এর নিবন্ধ প্রকাশিত হয় *এশিয়াটিক রিসার্চেস,* ৩, ১৮০১-এ; এখানে যেটা লক্ষণীয় তা হলো, তালগোল পাকানো *পুরাণ*-গুলির জট ছাড়ানো হয়েছে বলে এক নিশ্চয়তাপূর্ণ স্বকপোলকল্পনা এবং জয়োল্লাসে সে কথার ঘোষণা। বিরোধটা উপস্থিত হয় এটি প্রকাশের চারবছর পরে এই একই জার্নালে এবং সেখানে দোষ দেওয়া হয় সেই পণ্ডিতকে যাঁর কাজের ওপর ভিত্তি করে উইলফোর্ড তাঁর লেখাটি লিখেছিলেন—যদিও আগের লেখায় উইলফোর্ড তাঁকে কোন কৃতিত্ব দেননি।

৬. পুষ্যমিত্র-র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য L. de la Vallée Poussin : 'L'Inde aux.... Yue-Tchi' ১৭৫ ও পরবর্তী। *হরিবংশ*-র একটি স্তবকে খুব সম্ভবত মালবিকাগ্নিমিত্র-র উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে জনৈক কাশ্যপ 'সেনানী' (প্রধান সেনাপতি) অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। গোত্রটি ভুল, কিন্তু সেনানী উপাধি অন্তত পক্ষে প্রথম দিককার শুঙ্গ রাজাদের মুদ্রায় বজায় ছিল। এ রকম একটা মুদ্রা পাওয়া গেছে কোসম-এ। পুষ্যমিত্র যে একাই এ ধরনের যজ্ঞ করেছিলেন তা নয়—কিন্তু তাঁর এই আপাত উচ্চ ভাবমূর্তির কারণ, অশোক কর্তৃক নিষিদ্ধ হবার পর তিনিই প্রথম এই যজ্ঞ করেছিলেন।

৭. বিক্রম-যুগের সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে জৈন আচার্য কালক-এর কাহিনী বিশ্লেষণ করে। ১৯৪৩ সালে বিক্রমের ২০০০-তম বার্ষিকী পালিত হয়েছিল মহা আড়ম্বরে, যদিও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি বা বহুল প্রচারপ্রাপ্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা কেউই বিষয়টি সম্পর্কে কোন আলোকপাত করতে পারেননি। এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থগুলি—ইংরাজিতে *বিক্রম ভল্যুম* (উজ্জয়িনী, সিন্ধিয়া ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, ১৯৩৮), হিন্দীতে, *বিক্রম নিবন্ধ সংগ্রহ* (কানপুর, ১৯৪৪)—শুধুমাত্র এ ধরনের 'গবেষণা'-র অন্তঃসারশূন্যতাই প্রমাণ করেছে। এই সমস্ত স্মারকগ্রন্থের পরস্পরবিরোধী প্রবন্ধগুলির কোনটিই—বিশ্বাস করার ইচ্ছার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু ব্যক্ত করেনি।

৮. *মনুস্মৃতি*-র বিষয়ে, আমি সাধারণভাবে কুল্লুক-এর ভাষ্য সমন্বিত নির্ণয়সাগর প্রেসের প্রচলিত পাঠ ব্যবহার করেছি; সেইসঙ্গে, মেধাতিথি-র ভাষ্য সমন্বিত গঙ্গানাথ ঝা-র (কলকাতা, ১৯৩২) সংস্করণও। অনুবাদ জি. বুহ্‌লার-এর ('স্যাক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট', ২৫)। এটি যেখানেই লেখা হয়ে থাকুক না কেন, গ্রাম-অর্থনীতি ও গ্রামীণ পুরোহিত মানসিকতার সঙ্গে তা খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এই গ্রন্থটির ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার কারণও সেটাই।

৯. 'দি অবতার সিনক্রেটিজম অ্যান্ড দি পসিব্‌ল সোর্সেস অফ দি ভগবদ্‌গীতা' (*জার্নাল অফ দি বোম্বে ব্রাঞ্চ অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি,* ২৪-২৫, ১৯৪৮-৯, ১২১-১৩৪) শীর্ষক লেখায় আমার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০. হেলিওডোরাস শিলালেখ বিষয়ে : ভি এস সুকথঙ্কর, *অ্যানালস্ অফ দি ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট,* ১.৫৯-৬৬; রচনা সংগ্রহ (স্মারক সংস্করণ), ভল্যুম-২, পৃ. ২৬৬-২৭২-এ প্রমাণ করেছেন যে এর শব্দ-বিন্যাস ও পরিভাষা প্রাকৃতের চেয়ে গ্রীক ভাষার অনেক কাছাকাছি। তাড়াহুড়ো করে প্রকাশ ও জে মার্শাল-কৃত অসংলগ্ন অনুবাদের (*জে. আর. এ. এস,* ১৯০৯, ১০৫৫-৬) কারণে ভাগভদ্র-কে বানানো হয়েছিল অ্যান্টিয়লকিডস-এর এক সামন্ত; সঠিক পাঠের জন্য ক্রমান্বয়িক সংশোধনীগুলি দ্রষ্টব্য : জে ফ্লিট, *জে. আব এ. এস.* ১৯০৯, ১০৮৭-৯২; এ. ভেনিস, *জে. আর. এ. এস.* ১৯১০, ৮১৩-৫; জে. ফ্লিট, *পূর্বোক্ত,* ৮১৫-১৭।

১১. মাতৃচেত-র চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছিল এফ. ডব্লিউ. টমাস-এর একটি অনুবাদে (*ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুইটি,* ৩২, ১৯০৩, ৩৪৭-৯; ১৯০৪, ২১; ১৯০৫, ১৪৫)। অশ্বঘোষের সঙ্গে এঁকে এক করে দেখাটা আমার কাছে খুবই অসম্ভব বলে মনে হয়েছে; এঁদের মধ্যে প্রধান মিলটা হল যে উভয়েই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ লেখক এবং তাঁদের খুব কম লেখাই পাওয়া গেছে।

১২. সাধারণভাবে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে এ. বি. কেইথ-এর *হিস্টরি অফ স্যানস্ক্রিট লিটারেচার* (অক্সফোর্ড, ১৯২৮) সহজবোধ্য, কিন্তু সহানুভূতিশীল নয়। নৈরাশ্যমূলক বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য : 'দি কোয়ালিটি অফ রিনানসিয়েশন অফ ভর্তৃহরি'স পোয়েট্রি' (*ফার্গুসন কলেজ ম্যাগাজিন,* পুনা, ১৯৪১); পরিবর্তন এবং মুদ্রণপ্রমাদ সহ *ভারতীয় বিদ্যা* (বোম্বে), ১৯৪৬, পৃ. ৪৯-৬২-তে পুনর্মুদ্রিত; বিকাশমান সামন্ততন্ত্রের সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্যাকর-এর *সুভাষিত রত্নকোষ* (আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের, এখনও পর্যন্ত জানা সবচেয়ে প্রাচীন সংস্কৃত-সংকলন)-এর সংস্করণে ভি. ভি. গোখলে-র সঙ্গে একসাথে আমার লেখা মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নবম অধ্যায়

সামন্ততন্ত্র ঃ উপর থেকে

উপরোদ্ভূত বা উপর থেকে সঞ্চারিত সামন্ততন্ত্র[১] বলতে বোঝায় এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে কোন সম্রাট বা শক্তিশালী রাজা তার অধঃস্তনদের কাছ থেকে বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ কর আদায় করত এবং এই অধঃস্তনরা আবার—যতদিন সর্বোচ্চ শাসককে কর দিত ততদিন তাদের স্ব স্ব এলাকায় নিজ অধিকার বলে শাসন করতে এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারত। এই অধঃস্তন শাসক এমনকী উপজাতি সর্দাররা-ও হতে পারত, এবং মনে হয় সাধারণভাবে তারা প্রকৃত ভূম্যাধিকারী স্তরের কোন শ্রেণীর মধ্যবর্তিতা ছাড়াই প্রত্যক্ষ প্রশাসনের সাহায্যে জমি দেখাশোনা করত। নিচের থেকে সামন্ততন্ত্র হল এর পরের ধাপ (দশম অধ্যায়ে আলোচিত)—যেখানে রাষ্ট্র ও কৃষকের মাঝখানে গ্রামের ভিতর থেকেই জমির মালিক একটা শ্রেণী বিকশিত হয়ে স্থানীয় জনসাধারণের ওপর ক্রমশ অস্ত্রের শাসন কায়েম করে। এই শ্রেণী সেনাবাহিনীর কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অন্য কোন স্তরের মধ্যস্থতা ছাড়াই রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দাবি করত। খাজনা আদায় করে ছোট ছোট মধ্যস্বত্বভোগীরা তার একটা অংশ সামন্তপ্রভুদের দিত; বিপরীতে, উপরোদ্ভূত সামন্ততন্ত্রে তা সরাসরি আদায় করত রাজকর্মচারীরাই। উভয়ক্ষেত্রেই, খাদ্য-সংগ্রহকারী উপজাতিক স্তর পর্যন্ত, পূর্ববর্তী সব ব্যবস্থার অবশেষগুলি (স্থানীয়ভাবে বা রূপের মধ্য দিয়ে) টিকে ছিল। এই দুই পর্যায়ের মধ্যেকার মূল পার্থক্য নিরূপণ করা যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়ীরা যাতে নিয়মিতভাবে ক্রেতা ও মালের যোগান পায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য নিজেদের হাতে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত কেন্দ্রীভূত করতে পারে এমন এক শ্রেণী সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা থেকে। এ থেকে বোঝা যায় যে ব্যবসায়ীর সংখ্যাও বেড়েছিল। আক্রমণকারীদের দ্বারা বসতি অঞ্চলগুলি বিজিত হওয়া এবং তাদের সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর প্রদানও দ্বিতীয় পর্যায়টিকে ত্বরান্বিত করেছিল। এশিয়া মাইনরে

সেলজুক প্রশাসন সম্পর্কিত গর্দলেক্সস্কির বিবরণ (*জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি,* ৭৪, ১৯৫৪, ১৯২-৫-এ বর্ণিত হয়েছে) আক্রমণকারীদের পূর্বতন উপজাতি সংগঠন, সামন্ততান্ত্রিক বসতি ও সামরিক আবশ্যকতাগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে এক উপযোগী দলিল।

৯.১ লাঙ্গল ব্যবহারকারী গ্রামগুলিকে নিয়ে ছোট ছোট রাজ্যের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সামন্ততান্ত্রিক বিকাশও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। শাতবাহন বংশের শেষের দিককার রাজারা শুধু রাজপুরুষদের মূর্তি খোদাইয়ের ব্যাপারেই কুষাণদের অনুকরণ করেননি (যেমনটা দেখা যায় নানেঘাটে), প্রশাসনের ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চলীয় ব্যবস্থারও প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন ঃ

'সিধম। শাতবাহন বংশীয় রাজা সিরি পুলুমাবি-র রাজত্বের অষ্টম বর্ষে শীতকালের দ্বিতীয় (পক্ষের) প্রথম দিনে এই পুষ্করিণীটি খনন করেন গৃহপতি (*গহপতিক*), ... মহাসেনাপতি খন্ডনাক-এর শাতবাহনী-হার জিলা (*জঙ্গনপদ*)-র সেনাপতি (*গুমিক*) কুমারদত-র বিপুরক গ্রামের বাসিন্দা।'[২]

'গুমিক' (সংস্কৃত 'গৌল্মিক', পরবর্তীকালে 'ত্রিশ জনের সেনাপতি') শব্দটি (মিয়াকদোনি-তে আনুমানিক ১৪০ খ্রী. সময়কার) এই শিলালেখে অস্পষ্ট হয়ে গেলেও, এটি যে শাতবাহন বংশের রাজত্বকালের শেষের দিককার—ল্যুডার্স (১২০০) তা প্রমাণ করেছেন। গ্রামটি কোন্ অর্থে সেনাপতির, কিংবা জেলাটি মহাসেনাপতির ছিল যষ্ঠী-বিভক্তির ব্যবহার থেকে তা স্পষ্ট হয় না; তবু তাদের নামগুলি যদি উল্লেখ করার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে তারা নিশ্চিতই রাজা ও গৃহপতির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগসূত্র গঠন করেছিল। 'গুল্ম'র উল্লেখ ইঙ্গিত দেয় (যেমন *মনুস্মৃতি*-তে আছে) যে গ্রামীণ উপনিবেশগুলিতে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছিল। সম্ভবত, কর আদায়ের ব্যবস্থা-ও এখানে বর্ণিত হয়েছে—কেননা বেল্লারি জেলা ছিল, মনে হয়, শাতবাহন রাজাদের আদি বাসস্থান (মূল অন্ধ্র থেকে অনেক দূরে); সুতরাং, তাদের রাজ্যের সবচেয়ে পুরনো বসতি অঞ্চলও বটে।

অর্থশাস্ত্র-এ 'গুল্ম' শব্দটির অর্থ ঘন ঝোপ (পরবর্তীকালেও যেমনটি চলছে), ঘন সন্নিবেশ (যেমন, *বল্মীক-গুল্ম*), কাষ্ঠ নির্মিত খেয়াঘাট (গুল্ম-তর দেয় = খেয়া ও মালপত্র পারাপারের জন্য দেয় উপশুল্ক)—কিন্তু কোন সামরিক পরিভাষা নয়, কেবলমাত্র হয়ত সাধারণভাবে জনসন্নিবেশ-এর অর্থে ছাড়া। *মহাভারত* (১.২.১৫.১৭) এবং *অমরকোষ* (২.৮.১০.১১)-এ দেখা যায়, আলোচ্য কালপর্বের মধ্যে, 'গুল্ম' শব্দটির অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ন'টি *পত্তি*-র একটি সম্মিলিত সেনাদল—সর্বমোট ৯টি রথ, ৯টি হস্তী, ২৭টি অশ্ব ও ৪৫ জন পদাতিক সৈন্য নিয়ে গঠিত। সামরিক প্রকৌশলের দিক থেকে এটি একটি নতুন সংযোজন—যা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। *অর্থশাস্ত্র*-তে *পত্তি* কোন রণকৌশলগত বিশেষ বাহিনী নয়, বরং সাধারণভাবে পদাতিক সৈন্য—সংগঠিত ব্যূহের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনারা। হস্তী, রথ, এমনকী অশ্বারোহীদেরও একটি সম্পূরক *পাদগোপ* পদাতিক রক্ষীবাহিনী থাকত; এরা *পত্তি* বাহিনীর সদস্য নয়, কিন্তু যোদ্ধা; কিছু অনুবাদক যেমন অর্থ করেছেন তেমন চাকরবাকর নয়। এদের অত্যন্ত গতিসম্পন্ন হতে হত বলে হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকত। *অর্থশাস্ত্র* (১০.৪) অনুযায়ী, হাতি ব্যবহার করা হত প্রাচীর, কাঠের বেড়া, স্তম্ভ, ফটক, কোন বাধা বা সম্মিলিত পদাতিক বাহিনীকে চূর্ণ করার কাজে, ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে ঘিরে ফেলা, এবং রণকৌশলগত দিক থেকে

বিপক্ষকে হতচকিত করে দেওয়ার কাজে—ঠিক আধুনিক ট্যাঙ্কের মতোই। কিন্তু সেগুলির ছিল একটা অতিরিক্ত কার্যকরী ভূমিকা, আধুনিক ট্যাঙ্কের যা নেই—পূরণ করার জন্য প্রয়োজন পড়ে লরি, বুলডোজার, ট্রাক্টর ইত্যাদির; পরিবহণ (বিশেষ করে ধনসম্পদ), ভারি সাজ সরঞ্জাম টেনে তোলা, পথ তৈরি, জঙ্গল ও অগম্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাওয়া—যার মধ্যে জলে সাঁতার কেটে পার হওয়া বা কাঠের গুঁড়ি ফেলে দ্রুত সাঁকো নির্মাণও আছে। এই সামরিক কৃৎকৌশলের উপযোগিতা নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে ১৯৪১-৪৫ ব্রহ্মদেশ অভিযানের সময় (দ্রষ্টব্য ঃ *এলিফ্যান্ট বিল,* জে. এইচ. উইলিয়ামস্‌, পেঙ্গুইন বুকস ১১২০)—যখন ব্রিটিশ ও জাপানী উভয় সেনাবাহিনীই হাতি ব্যবহার করেছে , অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যন্ত্রপাতির চেয়ে বেশি কার্যকর ভাবে। আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসবিদরা লিখেছেন যে হাতিগুলো যুদ্ধের সময় গতি ব্যাহত করে বলে কোন কাজে আসে না, হঠাৎ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, আপন বাহিনীর সৈন্যসামন্তের কাছেই সবসময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, অভিযানের সময় দায়িত্ব পালন করতে ভুলে যায় এবং সেগুলিকে রক্ষা করার জন্যই পদাতিক বাহিনীকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হানিবল বা সেলুকাসের মতো দক্ষ সেনাপতিরা সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য এমন এক বাহিনীর জন্য নিশ্চিতই অমন ব্যগ্র হয়ে উঠতেন না। অন্যদিকে, একটি কর্মক্ষম হাতির জন্য প্রয়োজন দৈনিক ৬০০ পাউন্ড করে সবুজ পশুখাদ্য বা তার সমতুল অর্থাৎ দৈনিক ৩০ থেকে ৫০ পাউন্ড দানাশস্য এবং সেই সঙ্গে শাকসব্জি ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী (*ওরিয়েন্টাল মেমোয়ারস,* ১.৩৫৪-৫; *মানুচ্চি* ২.৩৬৩-৪)। সুতরাং ভারতে তখন প্রচলিত পরিবহনের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন পরিবহণের কথা জানা থাকলে বসতি এলাকায় বিশাল হাতির পাল পোষা সম্ভব ছিল না। সেই জন্যই একটা হাতি, একটা রথ (দুটিই উচ্চপদস্থদের ব্যবহারের জন্য), প্রচুর অস্ত্রসজ্জিত পাঁচজন পদাতিক সৈন্য, তিনজন সশস্ত্র অশ্বারোহী সেনা এবং সম্ভবত হালকা অস্ত্রে সজ্জিত উপযুক্ত রক্ষীবাহিনী নিয়ে ছোট সেনাদলের মতো এক একটা *পত্তি* গড়ে তুলতে হয়েছিল। এই ছোট দলগুলিই গ্রামে যে কোন প্রতিরোধ কার্যকরভাবে দমন করতে পারত এবং সেখানকার সম্পদহানি না করেই ডাকাত মোকাবিলার কাজে এদের ব্যবহার করা যেত। বড় কোন অভিযানের সময় ছড়িয়ে থাকা এই ধরনের দলগুলিকে সমবেত করা যেত। শিলালেখ বা পরবর্তীকালের সূত্রগুলি থেকে এটা অবশ্য পরিষ্কার যে এই দলগুলির প্রধান কাজ ছিল গ্রামাঞ্চলে 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা', *পত্তি* বা *গুল্ম*-এর মতো সাধারণ যুদ্ধবিগ্রহে রণকৌশলগত ব্যবহারের জন্য নয়। কোন সুপরিকল্পিত যুদ্ধে পেশাদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় অশ্বারোহী, পদাতিক ও হস্তীবাহিনীর সমাবেশ ঘটাতে হত আলাদা আলাদা ভাবে; ইতিমধ্যে সৈনাধ্যক্ষদের জন্য ছাড়া, রথ তখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছিল (স্যামুয়েল বিল ১.৮২-৩)। বাহিনীগুলিকে এই সমস্ত বিভিন্ন দলে ভাগ করে নিয়ন্ত্রিত এবং প্রকরণসম্মতভাবে অনুশীলন না করালে তাদের দক্ষতা কমে যেত। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আবক্ষক-*গুল্ম*দের ছড়িয়ে দেওয়া হলে আসল যুদ্ধে সেনাবাহিনীর কার্যকরতা কমতে বাধ্য। গ্রাম-বসতির বিস্তার এবং সাধারণভাবে রাজ্যের সমৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শক্তি কেন দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল বা আক্রমণ প্রতিরোধে অক্ষম হয়েছিল তার প্রায়োগিক কারণগুলির ব্যাখ্যা এ থেকে পাওয়া যায়।

চতুর্থ শতকের গোড়ার দিক থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ের প্রথম দুশ বছর ছিল গুপ্ত রাজত্ব। বাকাতক মিত্রদের সহায়তা নিয়ে গুপ্ত সম্রাটরা দক্ষিণের কিছু অংশ ও কাশ্মীর বাদে

পূর্বতন মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশ এলাকাই নিয়ন্ত্রণ করত। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সবচেয়ে উর্বর ও উৎপাদনশীল এক অঞ্চল—বঙ্গ, যেখানে এই প্রথম যথাযথভাবে বসতি স্থাপন শুরু হয়। আসামে অনুপ্রবেশ হর্ষবর্ধনের সময়কালের মধ্যেই ঘটেছিল। মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্যেকার পার্থক্য পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠেছে এলাহাবাদ দুর্গের অশোক স্তম্ভে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের শিলালেখে (প্লেট ১)। জনৈক হরিষেণ-এর স্বাক্ষর সম্বলিত উন্নত ধ্রুপদী সংস্কৃতে লেখা এই সালঙ্কার স্তুতিগুলি শুধু ভাষা ও শৈলীর দিক থেকেই নয়, অন্য দিক থেকেও অশোকের সহজ সরল অনুশাসনগুলির থেকে আলাদা। এতে রয়েছে সমুদ্রগুপ্তর যুদ্ধজয়ের বিস্তৃত বর্ণনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে রাজার নাম করেই। আর্যাবর্তের (গাঙ্গেয় উপত্যকার) রাজাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সম্রাটরা তাঁদের এই স্ব-ভূমিকে সরাসরি শাসন করতেন কর আদায়ের মাধ্যমে—যার পরিমাণ পর্যটকদের কাছে মনে হয়েছিল নগণ্য, সম্ভবত চীনের তুলনায়। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন* তাঁর সময়কার যুক্ত প্রদেশ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন (লি ইউং-সি'র অনুবাদ, পিকিং ১৯৫৭) ঃ

'জলবায়ু উষ্ণ, কুয়াশা কিংবা তুষারপাত হয় না। লোকেরা ধনী ও পরিতৃপ্ত, মাথা-পিছু ধার্য কোন কর বা রাজকীয় বাধানিষেধের ভারে পীড়িত নয়। শুধু যারা রাজার জমি চাষ করে তাদের একটা খাজনা দিতে হয় এবং তারা ইচ্ছা করলে ছেড়ে চলে যেতে বা থাকতে পারে। প্রাণদন্ড না দিয়েই রাজারা রাজ্যশাসন করেন, তবে অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী আইনভঙ্গকারীদের কম বা বেশি জরিমানা ধার্য করা হয়। এমনকী যারা রাজদ্রোহে লিপ্ত হয়, তাদের শুধু ডান হাত কেটে নেওয়া হয়। রাজার পরিচারক, দেহরক্ষী ও পোষ্যরা প্রত্যেকেই বেতন ও বার্ধক্যভাতা পায়। এই দেশের মানুষেরা কোনো প্রাণী হত্যা করে না, মদ্যপান করে না এবং পেঁয়াজ কিংবা রসুন খায় না। একমাত্র ব্যতিক্রম চন্ডালরা, যারা 'বদ মানুষ' হিসেবে পরিচিত এবং অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। তারা যখন শহরে কিংবা বাজারে প্রবেশ করে তখন নিজেদের উপস্থিতি জানানোর জন্য এক টুকরো কাঠ বাজাতে বাজাতে যায়—যাতে অন্যরা জানতে পারে যে তারা আসছে এবং তাদের এড়িয়ে যেতে পারে। এদেশে কোন শূকর বা মুরগি রাখা হয় না এবং কোন জীবিত প্রাণী বিক্রি হয় না। বাজারে কোন কসাই কিংবা শুঁড়ি নেই। ব্যবসায় মুদ্রা হিসেবে কড়ি ব্যবহার করা হয়। একমাত্র চন্ডাল ধীবর এবং শিকারীরা মাছ বিক্রি করে।

* ফা হিয়েনের সম্ভবত সর্বশেষ ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে *চাইনিজ লিটারেচার* (১৯৫৬.৩.১৫৩-১৮১)-এ। তার সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত অংশের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের ক্ষেত্রগুলি হল ঃ লোকেরা ধনী ও পরিতৃপ্ত, মাথা-পিছু ধার্য কোন কর বা রাজকীয় বাধানিষেধের ভারে পীড়িত নয়। ... রাজাব পরিচারক, দেহরক্ষী ও পোষ্যরা প্রত্যেকেই বেতন ও বার্ধক্যভাতা পায়। ... বুদ্ধের নির্বাণের পর রাজারা, বয়োঃবৃদ্ধরা এবং বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষেরা ভিক্ষুদের জন্য মঠ নির্মাণ করেছেন এবং তাঁদের জন্য বাসস্থান, উদ্যান, কৃষিজমি ও সেগুলিতে চাষবাস করার জন্য কৃষক ও গবাদিপশুর ব্যবস্থা করেছেন। জমিব মালিকানা-স্বত্বের দলিল লোহার ওপর খোদাই করে হস্তান্তর করা হত ...' (পৃ. ১৫৪-৬)। ১৫৫ পৃষ্ঠায় আমরা মঠে অভিনীত নাটকগুলির কথা জানতে পারি, যার মধ্যে *শারিপুত্র-প্রকরণ* (এর অংশবিশেষ মধ্য এশিয়ায় পাওয়া গেছে)-কে চিহ্নিত করা যায়; এ থেকে মনে হয় যে মোগ্গললান ও কাশ্যপ সম্পর্কেও অনুরূপ নাটক লেখা হয়েছিল। নগরীগুলি ইতিমধ্যেই ধ্বংস হতে শুরু করেছিল ঃ 'এই (গয়া) নগরী জনশূন্য ও সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত।' (পৃ. ১৭০)।

'বুদ্ধের নির্বাণের পর রাজারা বয়োঃবৃদ্ধরা এবং বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষেরা ভিক্ষুদের জন্য মঠ নির্মাণ করেছেন এবং তাঁদের জন্য বাসস্থান, উদ্যান, কৃষিজমি ও সেগুলিতে চাষবাস করার জন্য কৃষক ও গবাদিপশুর ব্যবস্থা করেছেন। জমির মালিকানাস্বত্বের দলিল লোহার ওপর খোদাই করে হস্তান্তর করা হত এক রাজার কাছ থেকে আর এক রাজার কাছে, এবং কেউ এই রীতি অগ্রাহ্য করার সাহস পায় না বলে এখনো চালু আছে। ভিক্ষুদের যাতে অনাবশ্যক চাইতে না হয় তার জন্য মঠগুলিতে বিছানাপত্র, খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সরবরাহ করা হয়। এরকমটা সব জায়গাতেই হয়। ভিক্ষুরা নিজেদের নিয়োজিত করেন নৈতিক গুণাবলীব অনুশীলন, শাস্ত্রপাঠ কিংবা ধ্যানে।'

এটি গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য) রাজত্বের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দকালীন অবস্থার বর্ণনা। রাজকর্মচারীরা তখনও পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বা ক্ষমতা পায়নি। *মধ্যদেশ* বহির্ভূত অঞ্চলের জমির ওপর নিশ্চিতই কর ধার্য করা হত—উৎপাদিত ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিতে হত। মনে করা যেতে পারে যে, সাম্রাজ্যের মূল অংশে কম কর ধার্য করে বিশেষ আনুকূল্য দেখানো হত। *অমরকোষ*-এর বর্ণনা অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলে অবশ্যই ভাটিখানা, এবং মদবিক্রেতা ছিল। জমিতে থাকা বা ছেড়ে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ভূমিদাস প্রথা ছিল না। কিন্তু তাহলে বৌদ্ধ মঠগুলি 'বসবাসকারী মানুষজন ও তাদের গবাদি পশু সমেত' জমির মালিক কিভাবে হত তা স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে চীনা মূল গ্রন্থটির কোন দুটি অনুবাদও এক রকম নয়। প্রচলিত জমি দানের বিষয়টি বিচার করলে মনে হয় জনগণের ওপর রাষ্ট্রের অধিকার হস্তান্তর করা হত জমি প্রাপকদের—যার অর্থ বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ নির্ধারিত কর প্রাপ্তি, কিন্তু সম্পত্তি হিসেবে কোন অধিকার বা মালিকানা স্বত্ব নয়। লোহার ওপর লেখা কোন সনদের কথা জানা যায়নি, যদিও ফা-হিয়েন 'তিয়েন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন; হতে পারে, কালো হয়ে যাওয়া তামার পাতকে তিনি হয়ত লোহা ভেবে ভুল করেছিলেন। বৌদ্ধ মঠগুলির অলস ও বিলাসবহুল জীবন যেমন ছিল ৮.৫ অংশে ঠিক তেমনটিই তুলে ধরা হয়েছে, এবং চীনা ভিক্ষুরাও সেই ধাঁচেই গড়ে উঠেছিল (জে. গারনেট)। ফা-হিয়েন ভিক্ষুদের মধ্যে 'প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ৯৬টি সম্প্রদায়ের' কথাও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, বৌদ্ধ মঠগুলি তখনও ছিল সম্পদের প্রধান ভান্ডার, কিন্তু বিরোধী ধর্মমতগুলিকে তারা ধ্বংস করেনি।

আসল মুনাফাটা আসত মূল মগধ ভূখন্ডের বাইরের বিজিত উপজাতিগুলি ও রাজাদের কাছ থেকে। দাক্ষিণাত্যের (*দক্ষিণাপথ*) রাজাদের পরাজিত করার পর আবার সিংহাসনে বসানো হত; উপজাতিগুলিকে বশ্যতা স্বীকার করানোর পর আপাতভাবে তাদের নিজ নিজ ব্যবস্থা অনুযায়ী চলতে দেওয়া হত, কিন্তু বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ সবাইকে কর দিতে হত ঃ *সর্ব-কর-দানাজ্ঞা-করণা-প্রণাম*... কথাগুলি বিপুল জটিলতার অংশমাত্রকেই ব্যক্ত করে—যার নিহিতার্থ বশ্যতাসূচক কর, নির্দেশ মান্যতা, শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন। এটা লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, যৌধেয়, বা তার চেয়েও প্রাচীন আরজুনায়ন উপজাতিক নামগুলি যদিও তখন অপ্রচলিত, কিন্তু তারা তখন অ-সামাজিক 'জন'-র পর্যায়ে ছিল না বরং 'গণ'-তে রূপান্তরিত হয়েছিল—যা উপজাতি-উর্ধ্ব সমাজের অস্তিত্বই প্রমাণ করে। যতদূর মনে হয়, এগুলির প্রত্যেকটিই বহিঃআক্রমণের উদ্দেশ্যে সামরিক নেতৃত্ব (ফ্লিট ৫৮ : ৫৯ প্রভৃতি) গড়ে তুলেছিল; প্রায় প্রত্যেকটিরই (নাগ সমেত)

উপজাতির ভিতরেই জ্ঞাতিত্ব-সম্পর্ক ছিল। এমনকী, বন্য-আদিবাসী যারা বশ্যতা স্বীকার করেছিল বলে স্তম্ভগাত্রে উল্লেখ আছে—সেই সময় তাদেরও রাজা ছিল বা অনতিবিলম্বেই রাজপদ সৃষ্টি হয়েছিল (ফ্লিট ২১-৩১; ৮১)। তারপর থেকেই, প্রতিবেশী শাসকদের অস্ত্রবলে করদ রাজায় পরিণত করেছেন এমন ঘোষণা করতে পারাই ছিল একজন রাজার পক্ষে সবচেয়ে গৌরবের বিষয় (*হর্ষচরিত*, ১০০)। *সামন্ত*—এই নির্দিষ্ট পরিভাষাটির অর্থ আগে ছিল 'প্রতিবেশী' বা 'প্রতিবেশী রাজ'; এরপর থেকে তার অর্থ দাঁড়াল 'উচ্চবর্গীয় সামন্তপ্রভু'। গুপ্ত রাজত্ব শুরু করেছিলেন একজন সাধারণ রাজা শ্রী-গুপ্ত, তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ-কে উত্তরসূরীরা আর একটু বড় উপাধি দিয়েছিলেন; কিন্তু প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে উপাধি হয় 'মহারাজাধিরাজ'।

রাজকর্মচারী, প্রাদেশিক শাসক, রাজকুমার, উপজাতি সর্দাররা পূর্বে যে সম্পদ অধিগত করেছিল তা লুণ্ঠনের জন্য হানা দেওয়ার ঘটনা ঘটত এবং তা ছিল খুবই লাভজনক। মৌর্য রাজত্বের শেষ দিক থেকে এটাই ছিল রেওয়াজ এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তা বজায় ছিল। কিন্তু, দেশকে বিশাল এক সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় শাসনাধীনে রেখে দেওয়া—গুপ্ত রাজারা প্রায় দু'শতাব্দী ধরে যা করতে পেরেছিলেন—তার মধ্যে কোন হানাদারির চেয়ে বেশি কিছু নিহিত থাকে, যথা, উৎপাদনভিত্তির কোন সম্প্রসারণ। যার অর্থ, এতদিন পর্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ থাকা অঞ্চল হাসিল করে নতুন গ্রাম বসতি স্থাপন এবং সেইসঙ্গে নতুন এলাকায় লাভজনক ব্যবসা থেকে প্রাথমিক মুনাফা অর্জন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের নতুন এলাকা হিসেবে বঙ্গ ছিল বসতি স্থাপনের পক্ষে আদর্শ জায়গা; কম উর্বর দাক্ষিণাত্যেও তখন স্থায়ী কৃষি-ভিত্তিক গ্রামের সূচনা হয়েছিল। বসতি স্থাপনের এই পদ্ধতি মৌর্য রাজত্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বসতি স্থাপনের পদ্ধতির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন; সেখানে নির্ভর করা হত শূদ্রদের জোর করে বসতি স্থাপন করানো, ধাতুর ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং বিপুল মুদ্রা সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তাসম্পন্ন এক আর্থব্যবস্থা সহ উৎপাদন ও বাণিজ্যে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের ওপর। এটা লক্ষ্যণীয় যে, গুপ্ত রাজাদের চমৎকার স্বর্ণমুদ্রা ও কিছু তাম্র মুদ্রার সন্ধান আমরা পেয়েছি, কিন্তু সে আমলের রৌপ্য মুদ্রা প্রায় নেই বললেই চলে—যা আছে তা-ও অতি নিম্নমানের এবং গঠনশৈলীর দিক থেকে পশ্চিমী প্রাদেশিক শাসকদের মুদ্রার নকল। গুপ্ত রাজত্বে গায়ের জোরে বসতি স্থাপন করানোটা সম্ভব ছিল না—কেননা তার এলাকা ছিল বিশাল। (তখন) হাসিল না-করা জমির জোগান-ও ছিল আপাতভাবে পর্যাপ্ত এবং খাদ্য-সংগ্রহকারী আদিম বনবাসীদের নিজস্ব এলাকা—যেখানে লাঙ্গলবাহিত চাষ থেকে উৎপাদন গাঙ্গেয় পলি-অধ্যুষিত সমতলের চেয়ে অনেক কম হত—সেখান থেকে তাদের উৎখাত করাটা ছিল কঠিন। প্রকৃত যে পদ্ধতিটা উঠে এসেছিল তা হল ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সাথে ধর্ম দিয়ে অনুপ্রবেশ—ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পূর্বতন উপজাতি এলাকাগুলিতে বর্ণের ছদ্মবেশে এক শ্রেণী-কাঠামোর প্রচলন। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র সাহায্য করেছিল স্থানীয় সর্দারদের মধ্যেকার ছোটখাটো যুদ্ধবিগ্রহ থামিয়ে এবং আদিম বন্য মানুষদের আক্রমণের হাত থেকে কিছু নিরাপত্তা দিয়ে। যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া মাত্রই তা এমন সব কাজে সাহায্য করেছিল যা কোন একক গ্রামের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না—যেমন, জল-সরবরাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্যপথগুলিতে পাহারার ব্যবস্থা ইত্যাদি; এ সবই করা হত অধীনস্থ সামন্তপ্রভু কিংবা প্রাদেশিক শাসকদের মাধ্যমে। গিরনারে মৌর্যদের তৈরি বাঁধটি, যা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী শেষ মেরামত করিয়েছিলেন স্কন্দগুপ্ত নিযুক্ত সুরাষ্ট্রের রাজ্যপাল পর্ণদত্তের

পুত্র চক্রপালিত—সম্ভবত ৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে (*ফ্লীট,* ১৪)। পর্ণদত্ত নামটি সন্দেহাতীতভাবেই ফারসী থেকে সংস্কৃত করা (দ্রষ্টব্য : জে. কার্পেন্টার, *জার্নাল অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ লন্ডন* ১৯২৮, পৃ. ৯০৪-৫; সেই সঙ্গে এফ. ডব্লিউ কোনিগ, *Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes,* ৩১, ১৯২৪, ৩০৯-এ বংশ বৃত্তান্তের 'ফরোনদাত')। এই ধরনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজটি করিয়েছিলেন রাজা ভোজ (মৃত্যু ১০৫৫-৬ খ্রীষ্টাব্দ)—ভোজপুরে বিশাল জলাধারটি নির্মাণ করিয়ে। মোটামুটি মাপের মাত্র দুটি বাঁধকে পরিকল্পনা-মাফিক বসানোর ফলে হ্রদটি ২৫০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছিল। যেহেতু, বড় বাঁধটি অন্ততপক্ষে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত (*ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুইটি* ১৭, ১৮৮৮, পৃ. ৩৪৮-৫২) যথাযথ অবস্থায় ছিল এবং অন্যদিকে ছোটটি (হোসেন শাহ্ কেটে দিয়েছিলেন) প্রায় ৮৭ ফুট উঁচু ও ৫০০ থেকে ৭০০ গজ লম্বা—তাই আমাদের আধুনিক পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই জলাধারটিকে অন্য কোন তুলনীয় মানের প্রকল্প নির্মাণের চেয়ে অনেক কম খরচে সংস্কার করা আজ খুবই সহজ হবে। নৃপতি ও যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও ভোজ সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন; তাঁর সাহিত্য-তত্ত্ব, মৌলিক রচনা এবং সমসাময়িক লেখকদের পৃষ্ঠপোষণার কারণে সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি এক অতিবিশিষ্ট নাম। তাঁর সাথে সাথেই (সংস্কৃত) সাহিত্যে রাজপুরুষদের অবদানের যে ঐতিহ্য—খুব আগে হলে, রুদ্রদামনের সময় থেকে যা শুরু হয়েছিল এবং গুপ্ত রাজাদের ও হর্ষের আমলে যা প্রকৃত অর্থেই বিকশিত হয়ে ওঠে (যদিও এই দুই উন্নত সাম্রাজ্যের সঙ্গে ধারা বংশের রাজত্বের কোন তুলনা চলে না)—তার অবসান ঘটতে থাকে। তাঁর কোন রচনাতেই (যেগুলি দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে) রাজস্ব-ব্যবস্থা, জমি বন্দোবস্ত বা জমির মালিকানা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।

রাষ্ট্র, উৎপাদিত সামগ্রী কর হিসেবে দেওয়ার শর্তে (যা মৌর্য আমলে প্রদেয় করের চেয়ে অনেক কম ছিল) ব্যক্তিগত বসতি স্থাপনকে সুরক্ষা ও উৎসাহ যুগিয়েছিল। তথাপি, এই সমৃদ্ধিই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। কার্যত স্বনির্ভর গ্রাম বিকাশের অর্থই হল মাথা পিছু পণ্য উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাওয়া। সপ্তম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, এইরকম বিশাল একটা দেশে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রকে পোষণ করা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন বিপুল পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে ব্যাপক বাণিজ্য এবং নগদ অর্থে পর্যাপ্ত কর আদায়ের ব্যবস্থা থাকে। প্রভূত লাভদায়ক নতুন বাণিজ্যগুলি সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। শাতবাহন আমলের সেই ক্ষমতাশালী বণিক-সঙ্ঘগুলি ক্রমশ অন্তর্হিত হতে হতে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটা ছিল : প্রতিটি গ্রামের পক্ষে অপরিহার্য ন্যূন সংখ্যক বর্ণভিত্তিক শিল্পী ও কারিগরদের কীভাবে রক্ষা করা হবে; পরে দেখানো হয়েছে, বণিকসঙ্ঘ, দাসপ্রথা, নগদ অর্থে লেনদেন, বা তাদের উৎপাদনকে পণ্যে রূপান্তরণ ছাড়াই কেমন সুচারুভাবে এই সমস্যার সমাধান হয়েছিল। এর অর্থ, উৎপন্ন সামগ্রীতে প্রদেয় কর সংগ্রহ করলেই শুধু চলবে না বরং তা বেশি বেশি করে স্থানীয় রাজকর্মচারী ও ছড়িয়ে থাকা *গুল্ম* আরক্ষাবাহিনী বা কোন নিয়ত ভ্রাম্যমান রাজদরবারকে ভোগ করতে হবে—কেননা যে-বাণিজ্যের মাধ্যমে শস্যকে নগদ অর্থে (সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর মূল ঘাঁটিগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যা অপরিহার্য) রূপান্তরিত করা সম্ভব হত তা ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। উল্টোদিকে এটা কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার, নতুন নতুন উপজাতির মধ্য থেকে স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃপতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামন্তপ্রভু, কিংবা দুঃসাহসী রাজকর্মচারীদের উত্থান

ঘটানোর দিকে নিয়ে গিয়েছিল। বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর আদায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল; সুতরাং সাম্রাজ্যের পতনও হলো অবশ্যম্ভাবী, যার পর আবার শুরু হল সেই এক সামগ্রিক বিশৃঙ্খলা। বহিরাগত—যারা বাণিজ্য বা চাকরী[৩]-র সন্ধানে এসেছিল তারা পরিবর্তিত হল আগ্রাসনকারীতে—এক সময়োচিত রূপান্তরণ—যখন অস্ত্রের জোরে অনেক বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়।

৯.২ নতুন আর্থ ব্যবস্থায় একই সঙ্গে হলেও দুটি পরস্পর বিরোধী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল; অল্প কয়েকটি বন্দর এবং রাজধানীগুলিতে সমৃদ্ধি ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল, যদিও সাধারণভাবে বড় বড় শহরগুলির পতন হতে শুরু করেছিল। ফা-হিয়েন লিখেছেন যে শ্রাবস্তী-তে খুব বেশি হলে ২০০ পরিবার বাস করত। কোলদের সদরকেন্দ্র রামগ্রাম পরিত্যক্ত হয়েছিল, তার চারপাশ ঘিরে ছিল জঙ্গল। কপিলাবস্তু, কশিনারা, পুরনো রাজগীর ও গয়া ছিল প্রায় জনশূন্য। হিউয়েন সাঙের কপিলাবস্তুর অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিতর্কিত জায়গায়, অর্থাৎ মধ্যবর্তী ২০০ বছরে মূল জায়গাটির কথা বিস্মৃত হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে পুরনো বাণিজ্য পথগুলির গুরুত্ব আর ছিল না, গ্রামগুলিই হয়ে উঠেছিল প্রধান। কিন্তু পাটনার তখনও শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল এবং গোটা 'মধ্যদেশ'-এ সেটিই ছিল সর্ববৃহৎ নগরী—যদিও অশোকের প্রাসাদগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং সেগুলির অসাধারণ খোদাই ও ভাস্কর্যগুলিকে মনে হত মরণশীল মানুষের নয়, ভূত-প্রেতের সৃষ্টি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় রাজদরবারগুলিই মত্ত হয়ে উঠেছিল নতুন বিলাস-বৈভবে। সবচেয়ে সুন্দর ভাস্কর্য ও চিত্রকলা বা অজন্তার সেরা গুহাগুলি এই আমলেরই এবং বহুলোকের চমৎকার সমন্বিত সহযোগিতায় তৈরি হয়েছিল যে সাঁচি ও কার্লে সেখানে ক্রমশ বেশি করে দাতারা প্রতিস্থাপিত হতে শুরু করেছিল রাজদরবার, অভিজাতবর্গ ও সম্পদশালী লোকদের দ্বারা। এ নিয়ে সমালোচনা করার সময় অবশ্য এ কথা ভুললে চলবে না যে তখন কিছু সময়ের জন্য এক চমৎকার নতুন সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার সৃষ্টি হয়েছিল। উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের বিকাশের প্রথম সাফল্যের সময়কার এই নতুন সমাজ শুধু বেশি শান্তিপূর্ণ বা কম অত্যাচারীই ছিল না, নিঃসন্দেহে বেশি সংস্কৃতিবানও ছিল। গ্রাম-অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ বিকাশের সাথে সাথে তার ক্রমাবনতি এর বিপরীতকেই শুধু প্রবল করে তোলে।

গ্রাম-বসতির প্রথম বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে অবশ্য ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বোত্তম সৃষ্টিগুলির সংযোগ আছে। কালিদাস ঠিক কোন্ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন তা এখানো পর্যন্ত জানা না গেলেও, তাঁকে যুক্তিসম্মতভাবেই ৩৮০ থেকে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেকার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভার সভাসদ বলে গণ্য করা হয়। ভাস সম্ভবত আরও আগের। তৃতীয় অনন্য নাট্যকার কবি ভবভূতির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল কনৌজেব রাজা যশোবর্মণের অন্যতম সভাকবি হিসেবে; ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের এক ক্ষণস্থায়ী আক্রমণে যশোবর্মণ পরাস্ত (এবং সম্ভবত নিহত) হন। কনৌজের রাজা হর্ষ (আনুমানিক ৬০৬-৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) নিজেই ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট মানের নাট্যকার, যদিও কদর্য মানসিকতার সমালোচকরা ইঙ্গিত দেন যে তাঁর অনেক সভাকবি (যাঁদের প্রধান ছিলেন মহাকবি বাণ, যিনি অত্যন্ত অলঙ্কার সমৃদ্ধ সংস্কৃত গদ্যও রচনা করেছিলেন) সেগুলি লিখে দিতেন এবং সম্রাট তাতে স্বাক্ষর করতেন। এই সমস্ত প্রচলিত নাটকে নারী ও দাসদাসীরা যে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলত তা

ছিল সংস্কৃতের মতোই কৃত্রিম, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত কথ্যরীতির থেকে তা অনেক আলাদা। আমাদের ঐতিহাসিকদের মতে, এটা ছিল ভারতের স্বর্ণ যুগ। সত্যিই, পূর্ববর্তী (বা অনেক পরের) যে কোন রাজার চেয়ে গুপ্ত রাজাদের সময়কার স্বর্ণমুদ্রা অনেক বেশি পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও, এই স্বর্ণযুগে মগধের মহানগর পাটনা, যা একসময় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল — তা এক গ্রামে পরিণত হয়েছিল (*বিল,* ২.৮৬), যদিও গ্রামাঞ্চল মৌর্যযুগের মতোই সমৃদ্ধ (*বিল,* ২.৮২) ও উর্বর থেকে গিয়েছিল। অশোকের আমলের বিশাল সৌধগুলিকে দেখা হত অতিপ্রাকৃত নির্মাণকর্ম হিসেবে। গৌরবের দিনে পাটনা যেমন ছিল পৃথিবীর সেরা নগরী, গুপ্ত রাজাদের প্রধান রাজধানী উজ্জয়িনী কখনোই তা ছিল না; পরবর্তী রাজধানী কনৌজ ছাপ রেখেছিল আরো অনেক কম। রাজারা এরপর থেকে সেনাবাহিনী, হারেম, রাজসভা, সচিবালয় নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন[৪] — তাই উদ্বৃত্ত যেখানেই উৎপন্ন হোক না কেন তা আত্মসাৎ না করে তাদের ভরণপোষণ সম্ভব ছিল না। বিলি বন্দোবস্তের হিসাব সাধারণত *স্কন্ধাবার* বা 'প্রধান শিবিকা' থেকেই রাখা হত।

চিত্র ৩৭ : বলভী (৫২৫ খ্রী.)-র প্রথম ধ্রুবসেন-এর স্বাক্ষর : স্বহস্ত মম মহারাজ-ধ্রুবসেনস্য। তাম্রফলকে ব্রাহ্মণ রোতঘমিত্র-কে ভূমিদান।

হর্ষ (পুষ্যভূতির বংশধর, প্রায় নিশ্চিতভাবেই এঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন উপজাতীয়) ছিলেন একাধারে সূর্য-উপাসক, মহেশ্বরের অনুগামী (*বিল,* ১.২২২-৩; *এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ৪.২১১; ৭.১৫৮) এবং বৌদ্ধ — যুগপৎ অহিংসা ও যুদ্ধ-দেবতার ভক্ত। বিরোধী শক্তির উত্থান ঘটেছিল বঙ্গদেশে; নতুন নতুন গ্রাম ও সুবিধাজনক বন্দরগুলি নিয়ে সে স্বাভাবিকভাবেই কনৌজের ক্ষমতাকে অপমানজনক মনে করতে পারত। সেই সঙ্গে এর পেছনে পাটনার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা বাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাওয়াটাও ছিল কারণ। পূর্বাঞ্চলের রাজা শশাঙ্ক অর্থাৎ নরেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন উত্তরাঞ্চলের গুপ্ত বংশের শেষ রাজা (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ৬.১৪৩-৪)—যাঁর যুদ্ধাভিযান বঙ্গ থেকে সুদূর মৌখরি অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং যিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজাকে হত্যা করেছিলেন (*বিল,* ১.২১০; *হর্ষচরিত* ১৮৬) হর্ষ তাঁকে শেষপর্যন্ত পরাস্ত ও বিতারিত করেন। শশাঙ্কের আক্রমণের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল তার অভিনব ধর্মীয় ভেক : তিনি বৌদ্ধ স্থাপত্যগুলি ধ্বংস করেছিলেন এবং বুদ্ধ যে বৃক্ষের তলায় বসে বোধিলাভ করেছিলেন সেটি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন (*বিল,* ২.১১৮-১২২)। এটা প্রমাণ করে যে ভিত্তিতে কিছু সংঘাত ছিল এবং এই প্রথম তা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হল ধর্মীয় চেতনার স্তরে। উপর থেকে উদ্ভূত সামন্ততন্ত্রের যুগে এই ভেক ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। এটা সম্পূর্ণ এক নতুন বিকাশ, গোড়ার দিকের বৈদিক ব্রাহ্মণ বা আদি বৌদ্ধদের মধ্যেকার পার্থক্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। হর্ষবর্ধন একটি যুদ্ধে পুলিকেশিনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন (*বিল,* ২.২৫৬ ; *এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ৬.১০), পুলিকেশিন আবার হেরে গিয়েছিলেন তাঁর দক্ষিণ পূর্ব প্রতিবেশী পল্লব রাজাদের কাছে—কিন্তু তার ফলে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে কোন লাভ হয়নি। তবু গুপ্ত রাজাদের

(যাঁদের কেউ কেউ ভাগবদ ধর্মের অনুগামী ছিলেন) রাজত্বকালের মতো হর্ষের রাজত্বকালেও মন্দির, বৌদ্ধ-বিহার ও ব্রাহ্মণরা নতুন নতুন দানে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

ধর্মীয় বিবাদ সম্ভবত প্রতিবেশী রাজাদের করদ রাজায় পরিণত করার জন্য অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল। হর্ষ ত্রিশ বছর ধরে বিরতিহীন যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন (*বিল,* ১.২১৩)। একই বিবরণ অনুসারে এই সময়কালে তাঁর সেনাবাহিনীর শক্তি ৫,০০০ হাতি, ৫০,০০০ পদাতিক ও ২,০০০ অশ্বারোহী থেকে বেড়ে ৬০,০০০ হাতি, ১০০,০০০ অশ্বারোহী ও সেই অনুপাতে পদাতিক সৈন্য সংখ্যায় গিয়ে পৌঁছেছিল। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে এরকম কোন বাহিনীর একটা ভগ্নাংশও যে কোন দেশ ও সাম্রাজ্যের সম্পদে টান ধরাতে পারত। হর্ষ, তাঁর 'পূর্বপুরুষদের দৃষ্টান্ত' অনুসরণ করে, প্রয়াগের একটি বিশেষ মেলাক্ষেত্রে প্রতি পাঁচবছর অন্তর বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও দরিদ্র মানুষদের মধ্যে ধনরত্ন বিতরণ করতেন। 'এরপর বিভিন্ন দেশের শাসকরা তাঁদের ধনরত্ন ও লুণ্ঠিত সামগ্রী রাজাকে উৎসর্গ করতেন, যাতে তাঁর কোষাগার আবার পূর্ণ হয়ে যায়' (*বিল,* ১.২৩৩)। দানধ্যানের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উপরোদ্ভুত সামন্ততন্ত্রে বশ্যতাসূচক কর আদায়ের জন্য পঞ্চবার্ষিকী সমাবেশের রীতিটিই প্রকাশিত হয়। রাজার নিজ ভূখণ্ড দিয়ে রাজবাহিনীর অগ্রগতির ফলে কেমন আতঙ্ক সৃষ্টি হত ও লুঠপাঠ চলত তার বর্ণনা দিয়েছেন বাণ (*হর্ষচরিত,* সপ্তম অধ্যায়, বিশেষ করে পৃ. ২১২-৩)। পঙ্গপালের উৎপাতও গ্রামবাসীদের পক্ষে এর চেয়ে সর্বনাশা হত না।

চীনা পরিব্রাজক পণ্ডিত (যাঁকে রাজসভায় স্বাগত জানানো হয়েছিল, পরিভ্রমণের জন্যে দেওয়া হয়েছিল বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং শ্রেষ্ঠ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হিসেবে ভাল বৃত্তি পেয়ে যিনি অধ্যয়ন করেছেন) সমৃদ্ধি সম্পর্কে যে ধারণাই পেয়ে থাকুন না কেন, জীবনে এমন কিছু ছিল যাতে সমকালীন সমাজের অন্তত একটা অংশ এবং উচ্চ শ্রেণীর মানুষ সন্তুষ্ট ছিল না। তা না হলে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের কাছে প্রয়াগে অতি পবিত্র বটবৃক্ষের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার নতুন যে চল (*বিল,* ১.২৩২) তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে কীভাবে; কেনই বা বেশ কিছু সংখ্যক বৃদ্ধ পবিত্র গঙ্গার তীরে নয়, জলে প্রাণ বিসর্জন দিতে চাইত?

গ্রাম শুধু নগর এবং সংঘগুলিকেই ধ্বংস করেনি, 'স্বর্ণযুগ'-এর উপরিকাঠামোর ওপরও সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত ছাপ রেখে গেছে। *পুরাণ*গুলিতে *ঠেসে* দেওয়া যে সমস্ত অদ্ভুত লোকাচার ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদ, স্থানিক রীতিনীতি বা তীর্থভ্রমণে পালিত হয়নি এই সময়েই সেগুলির অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। বোম্বাই বন্দরের এলিফ্যান্টা দ্বীপে যেসব চমৎকার গুহা-ভাস্কর্য রয়েছে (গঠনশৈলীর বিচারে যেগুলিকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের বলে মনে করা হলেও তা নিয়ে বিতর্ক আছে) সেগুলির কোনটিতেই কোন স্থাপয়িতার নাম খোদাই করা নেই—যা উন্নত সামন্ততান্ত্রিক যুগেরই বৈশিষ্ট্যসূচক। এগুলি স্থাপনের সঙ্গে দূরবর্তী অঞ্চলের বণিকরা সম্ভবত যুক্ত ছিল না। কারা এগুলির সৃষ্টিকর্তা তখন সবাই তা জানত। অন্যদিকে সমাজ কাঠামোকে এত পরিবর্তনহীন বলে মনে করা হত যেন নাম-না-লেখা নির্মাণকারীর কথা 'চিরকাল'-ই মনে থাকবে — যেমনটা আজও দেখা যায় প্রায় দুই শতাব্দী আগে তৈরি নামোল্লেখহীন অজস্র সমাধি-সৌধ ও মন্দিরের ক্ষেত্রে। মনে রাখতে হবে, যেসব আদিবাসী খাদ্য-সংগ্রাহকদের এলাকায় গ্রাম-সংস্কৃতি প্রসার লাভ করেছিল তাদের মধ্যেও তার ছাপ ফেলার প্রয়োজন ছিল। সেখানে সংঘ ও উপজাতি উভয়ের বদলে নতুন সংকীর্ণ জাতপাতের উদ্ভবই শুধু ঘটেনি, সভ্যতাও পিছিয়ে পড়েছিল।

আদিম ক্ষত্রিয় (স্ট্র্যাবো ১৫.১.৩০) সতী প্রথা, গোড়ায় যা ছিল বিধবা পত্নী বা উপপত্নীকে হত্যা করে মৃত সর্দারকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য পরলোকে পাঠানো, তা এখন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সতী শব্দটিরই অর্থ দাঁড়াল 'চরিত্রবতী, বিশ্বস্ত স্ত্রী'। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এক ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় সহমরণে যেতে দেখে গ্রীকরা স্তম্ভিত হন (স্ট্র্যাবো ১৫.১.৬২; ডায়োডোরাস ১৯.৩০, ৩৩-৩৪)। মৌর্য যুগে এই প্রথার কথা জানা ছিল না, *জাতকে*-ও কোন উল্লেখ নেই। গুপ্তযুগ শুরু হওয়ার ঠিক আগে সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত *মহাভারত*-এ এই বর্বর প্রথার সপক্ষে সংশোধন করা হয়। হৃদয় বিদারক এই প্রথাটি কখনই সর্বসাধারণ্যে আচরিত হয়নি। উচ্চ বংশের যে বিধবা স্বেচ্ছায় সহমরণে যেতে রাজি না হত তাকে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হত, যেমনটা সাধারণভাবে উচ্চবর্ণের বিধবারা যাপন করত। সন্ন্যাসিনীদের মস্তকমুণ্ডন এবং সাধারণ গেরুয়া বা সাদা কাপড় পরার যে রীতি ছিল পরবর্তীকালে তা উচ্চ শ্রেণীর, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ বিধবাদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়ে দাঁড়াল। সতী হওয়ার ঘটনা বিরল হলেও তা সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করেছিল। এরাণে ৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের একটি স্মৃতিস্তম্ভ (ফ্লিট ২০) থেকে আমরা জানতে পারি যে গোপরাজ নামে জনৈক সেনাপতির মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী সতী হিসেবে সহমরণে গিয়েছিলেন। নিজের স্বামীর আশু মৃত্যু সম্পর্কে *পূর্বানুমান করে* হর্ষবর্ধনের মা যশোমতী ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে এই জঘন্য প্রথা অনুসরণ করেছিলেন (*হর্ষচরিত* ১৬৩.৯)। হর্ষের বিধবা ভগ্নী রাজ্যশ্রী যখন চিতায় উঠতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় তাঁর ভাই তাঁকে উদ্ধার করেন। মৌখরি-র অভিজাতবর্গ কর্তৃক একটা আনুষ্ঠানিক নির্বাচনের পর তাঁরা যৌথভাবে গ্রহবর্মণের সিংহাসনে বসতে সমর্থ হয়েছিলেন। অপরদিকে, গুপ্ত বংশের কোন রানি সতী হিসেবে স্বেচ্ছায় সহমরণে গিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিংবা সেরকম রেওয়াজও ছিল না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিধবা কন্যা প্রভাবতীগুপ্ত অন্তত তাঁর এক পুত্রের হয়ে দীর্ঘকাল বাকাতকের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। এর সঙ্গে আরো যোগ করা যেতে পারে যে সতী শিলা—যার পূজা এখনও গ্রামে গ্রামে প্রচলিত আছে—খুব বেশি প্রাচীন হলে তা সামন্ত যুগের শেষের দিককার।

নিচের স্তরে গ্রামের চিহ্ন দেখা যায় সাক্ষীদের জন্য কঠোর পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনের মধ্যে, যদিও অপরাধ ও শাস্তিদান উভয়ের ঘটনাই ছিল খুব কম। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* (৬.২৬) কোন সন্দেহভাজন চোরকে গরম লোহা দিয়ে পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। *অর্থশাস্ত্র*-এ কোথাও এর কোন উল্লেখ নেই। *মনুস্মৃতি* (৮.১১৪-৫)-তে রয়েছে মাত্র দুটি চরণ—যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ-এর *স্মৃতি*-তে জলে চোবানো, ফুটন্ত তেল, গরম কুঠার বা লাঙ্গলের ফলা ইত্যাদির ব্যবহার সমেত নানা পরীক্ষা পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আজও পর্যন্ত পারধি-দের মধ্যে এই বিচার পদ্ধতি কিভাবে টিকে আছে তা আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে— যা সেই অর্থে স্বীকারোক্তি আদায় নয়, বরং উপজাতীয় দেবদেবীদের অনুমোদন লাভেরই উপায়। পরিশেষে, *অর্থশাস্ত্র* (৪.১০)-তে নরমাংস বিক্রির জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে। হর্ষের পিতাকে মারাত্মক অসুস্থতার হাত থেকে বাঁচানোর ব্যর্থ প্রয়াসে সভাসদরা তাঁদের নিজ নিজ দেহের মাংস কেটে বিক্রি করেছিলেন (*হর্ষচরিত* ১৫৩.; আরো দ্রষ্টব্য ১৯৯, ২২৪) — যা কোন যাদুবিদ্যার প্রয়োগ। ডাকিনীবিদ্যার জন্য নরমাংস বিক্রির ব্যাপারটা দেখা যায় ভবভূতির *মালতী মাধব* (৫.১২)-এ, এবং সোমদেব ভট্টর *কথাসরিৎ সাগর*-এ (২৫.১৮৩, ১৮৭ প্রভৃতি) মাঝে

মাঝেই এর উল্লেখ আছে। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রকূটে রাজত্বকারী (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ) প্রথম অমোঘবর্ষের আমলেই তাঁর বংশের গৌরব চরম শিখরে পৌঁছেছিল; কিন্তু তিনি, ধর্মাশ্রিত বীর-নারায়ণ উপাধি গ্রহণ করে অনির্দিষ্ট কোন চরম দুর্দশার হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্যে লক্ষ্মী মন্দিরে (সম্ভবত কোলাপুরে) নিজের আঙ্গুল কেটে অঞ্জলি দিয়েছিলেন বলে গর্ব করেছেন (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ১৮.২৫৫)। পরবর্তী শতাব্দী থেকে, আরো বেশি অমার্জিত গাঙ্গ রাজারা ব্রতের অঞ্জলি হিসেবে মন্দিরে মূল বিগ্রহের সামনে তাদের নিজেদের মাথা কেটে ফেলতে শুরু করলেন। স্বর্ণযুগে সমাজ এইভাবে আরো একটু পিছিয়ে গেল আদিম যুগের দিকে; ব্রাহ্মণ্যবাদ যে আদিম মানুষদের লাঙ্গল ধরতে বাধ্য করেছিল, এবার তারা তার জবাব দিল।

৯.৩ হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের শাসনাধীন সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের উত্তর-ভারতের বর্ণনা দিয়েছেন (*বিল,* ১.৭৫-৮৮)। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের সময়কার ফা-হিয়েন বর্ণিত অবস্থার সঙ্গে এর মৌলিক কোন প্রভেদ নেই (*বিল,* পৃ. ৩৭-৩৮)। চীনা তীর্থযাত্রীদের মতামত সম্পর্কে উভয়ক্ষেত্রেই কিছুটা ছাড় দিতে হবে—কেননা তাঁরা ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র দেখতে পাননি, ঠিক যেমন প্রায় ১০০০ বছর আগের মেগাস্থিনিসের বিবরণের গ্রীক অভিমতও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয় — কেননা সেখানে ভারতে দাসপ্রথা ছিল না বলে দেখানো হয়েছে। অবাধ্য সাক্ষী কিংবা অভিযুক্তদের জেরা করার সময় নির্যাতন করা হত না* এবং লঘু শাস্তি দেওয়া হত দেখে চীনা পরিব্রাজক অভিভূত হয়েছিলেন; তাছাড়াও, সাধারণভাবে সৎ, শান্তিপ্রিয়, আইন মানা, দয়ালু, অতিথিবৎসল জনসাধারণের মধ্যে সামান্য কিছু চরম ক্ষেত্রে নির্যাতনের আশ্রয় নেওয়া হত। উত্তরাঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে পেঁয়াজ ও রসুন, এবং কয়েক ধরনের মাংস (প্রধানত গো-মাংস) ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলে তখনই মনে করা হত, এবং বাস্তবে এখনও হয়। শহর ও গ্রামগুলির (বৃহৎ, *অর্থশাস্ত্র*-র রীতি অনুযায়ী যা ১০০ থেকে ৫০০ পরিবার নিয়ে গঠিত ও এখানে বলা হয়েছে 'প্রাচীরবেষ্টিত নগরী') নোংরা আঁকাবাঁকা রাস্তার পাশে সারবন্দি খুপরির পাঁচিলের আড়ালে বাস করা অস্পৃশ্যদের বাঁদিকে রেখে দূর দিয়ে হাঁটাচলা করতে হত — যা জনসাধারণের খুঁতখুতে, আচার-বিচারগত মৌলিক পরিচ্ছন্নতার বিপরীত। দরজি-র কাজ ছিল খুবই কম; *হর্ষচরিত*-এ যে বিশেষ পোশাকের বর্ণনা করা হয়েছে তা পরতো বাছাবাছা কিছু লোক, সাধারণ মানুষ নয়। চামচ কিংবা কাঠি ব্যবহার না করে, আঙুল দিয়েই খাওয়া হত। প্রাদেশিক ঘটনাপঞ্জি লিখে রাখা হত 'নীল রঙের বেলনাকারে পাকানো দলিল'-এ। প্রকৃত শাসক ছিল ক্ষত্রিয় অভিজাতরা (পূর্বতন পৌর-জানপদ), তবে জাতপাত ব্যবস্থা তখনই অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিস্তার লাভ করেছিল।

* জে জে মেয়ার সমেত পণ্ডিত ব্যক্তিরা দেখেছেন, অভিযুক্তদের জেরা করার জন্য নির্যাতনের বিধান *অর্থশাস্ত্র* (৪.৮)-তে দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয়, ওই গ্রন্থে 'কর্ম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যেসব অবাধ্য অপরাধীর (গুরুতর) অপরাধ নিয়ে কোন সংশয় নেই তাদের আরও শাস্তি হিসেবে নির্যাতন, চালানো বোঝাতে; স্বীকারোক্তি আদায়ের পদ্ধতি নয়, বরং তা শাস্তিরই অঙ্গ। *অর্থশাস্ত্র*-র অন্য জায়গায় নগদ অর্থে জরিমানার (দণ্ড দাসত্বের দ্বারাও যা উশুল করা যেতে পারে) বিকল্প কিংবা সম্পূরক হিসেবে অঙ্গচ্ছেদ ও সংশোধনমূলক শাস্তিদানের কথা বলা হয়েছে; যেমন, ৪.১০ -এ বিধান দেওয়া হয়েছে, কোন ডাকাত অনুমতি না নিয়ে নগরে কিংবা দুর্গে প্রবেশ করলে, কিংবা দেওয়ালে সিঁদ কেটে জিনিসপত্র চুরি করলে ২০০ পণ জরিমানার বিকল্প হিসেবে হাঁটুর পিছনের সবচেয়ে বড় শিরাটি, কিংবা কণ্ডরা কেটে দেওয়ার।

'সরকারী প্রশাসন যেমন সদাশয়তার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি কার্যনির্বাহী ব্যবস্থাও সরল। পরিবারগুলির নাম নথিভুক্ত করা হয় না এবং লোককে শ্রমদান করতেও বাধ্য করা (জোর করে সৈন্যদলে ভর্তি করা) হয় না। রাজার নিজস্ব সম্পত্তি চারটি মূলভাগে বিভক্ত; প্রথমটি রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা ও দেবদেবীর উদ্দেশ্যে বলিদানের জন্য; দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রের মন্ত্রীদের ও মুখ্য রাজকর্মচারীদের ভরতুকি দেওয়ার জন্য; তৃতীয়টি অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের পুরস্কার দেওয়ার জন্য; এবং চতুর্থটি যেসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানচর্চা (শিক্ষা) করা হয় তাদের দান করার জন্য। এইভাবে সাধারণ মানুষের ওপর ধার্য করের বোঝা কম, এবং তাদের কাছ থেকে নেওয়া ব্যক্তিগত শ্রমের প্রয়োজন থাকে পরিমিত। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব পার্থিব সম্পদ শান্তিতে রাখতে পারে, এবং প্রত্যেকেই খেয়ে-পরে বাঁচার জন্য চাষ করে। যারা রাজার জমিতে চাষ করে তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ কর হিসেবে দেয়। আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত বণিকরা তাদের মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করতে পারে (অবাধে)। সামান্য পরিমাণ শুল্ক দিলে নদীপথ ও সড়ক পথের বাধা খুলে দেওয়া হয়। পূর্ত কাজের প্রয়োজন হলে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, কিন্তু সবেতন। মজুরীর পরিমাণ কঠোরভাবে নির্ধারণ করা হয় কাজ অনুযায়ী। ... সেনাবাহিনী সীমান্তরক্ষা করে, কিংবা চরম কিছু হলে দমন করতে যায়। সৈন্য সংগ্রহ করা হয় সেনাবাহিনীর প্রয়োজন অনুযায়ী; এদের কিছু বেতন দেওয়া হয় এবং জনসমক্ষেই সেনাদলে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত ভরণপোষণের জন্য প্রাদেশিক শাসক, মন্ত্রী, বিচারক, রাজকর্মচারীদের জমি দেওয়া হয়। ... জমিতে চাষ করা যাদের কাজ, তাদের বীজবপন, ফসল কাটা, হাল করা, (আগাছা) নিড়ানো, এবং ঋতু অনুযায়ী ফসল ফলাতে হয়; এই শ্রমের পর তারা কিছু সময় বিশ্রাম করে। জমির ফসলগুলির মধ্যে ধান ও ভুট্টা প্রচুর পরিমাণে ফলে। মিশ্র শ্রেণীর মানুষ ও অন্ত্যজদের সঙ্গে (খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপারে) অন্যান্য মানুষদের কোন তফাত নেই—কেবলমাত্র তারা যেসব বাসনপত্র ব্যবহার করে সেগুলির মূল্য ও উপাদান উভয় ক্ষেত্রেই পার্থক্যটা প্রকট।... ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে তারা সব সময়ই বিনিময় প্রথার আশ্রয় নেয়, কেননা তাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা নেই (*বিল*, ১.৮৭-৮)। রাষ্ট্রীয় কারবারে লেনদেনের প্রয়োজন হলে তিনি (হর্ষ) পরিবাহী নিয়োগ করতেন—যারা সব সময়ই যাতায়াত করে। নাগরিকদের আচার-আচরণে নিয়ম বহির্ভূত কোন ব্যাপার ঘটলে, তিনি তাঁদের মধ্যে যেতেন। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই সাময়িকভাবে বসবাসের জন্য তৈরি অবস্থাতেই পাওয়া বাড়িতে বসবাস করতেন। প্রবল বর্ষার তিন মাস তিনি অবশ্য, এভাবে ভ্রমণ করতেন না। তাঁর ভ্রমণকালীন প্রাসাদে নিয়মিতভাবেই তিনি সকল ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে তাদের পছন্দসই মাংস বিতরণ করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা হবে সম্ভবত এক হাজার, ব্রাহ্মণ পাঁচশ।' (*বিল*, ১.২১৫)

একই সঙ্গে *অর্থশাস্ত্র*, অশোকের ও *মনুসংহিতার* আর্থব্যবস্থার এই টিকে থাকাটা লক্ষণীয়। সামন্ততন্ত্র যখন শক্তিশালী হল (যেমনটা জমিদার-শাসিত চীনে ঘটেছিল), শাসক ও জনসাধারণের চরিত্রও বদলে গেল। পরবর্তীকালে নিচে থেকে গড়ে ওঠা সামন্ততন্ত্রের যুগে অসংখ্য বাধা-নিষেধ ও আমদানি-শুল্ক চাপিয়ে ছোটখাটো বণিকদের নিংড়ে নেওয়া হত। মরশুমি শ্রমের পর কিছু দিনের জন্য কৃষকরা বিশ্রাম করে বলে যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ, তারা ছিল স্বাধীন, ভূমিদাসত্ব কিংবা ভূস্বামীদের নিপীড়ন ছিল না। আবদ্ধ গ্রাম-অর্থনীতির অশুভ বিস্তারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় মুদ্রা ছাড়াই বিনিময় প্রথার ভিত্তিতে বাণিজ্যের উল্লেখ থেকে। বাস্তবিকই, হর্ষের আমলের

মুদ্রার কথা জানা যায় না (দুই ধরনের নিম্নমানের মুদ্রা পাওয়া গেলেও সেগুলি আরোপিত বলে সন্দেহ হয়)। উল্টোদিকে, মৌর্য ও ক্ষাত্রপ রাজাদের রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে পর্যাপ্ত পরিমাণে, প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে গুপ্ত রাজাদের স্বর্ণ মুদ্রা; এর মধ্যে নরেন্দ্র গুপ্ত-শশাঙ্কর স্বর্ণমুদ্রাও আছে—বাংলার সমৃদ্ধ বাণিজ্য বন্দরগুলি ছিল যাঁর অধীন। হর্ষের সাম্রাজ্যই ছিল শেষ, বিশাল, ব্যক্তি-শাসনাধীন, কেন্দ্রীকৃত সাম্রাজ্য। এরপর থেকে রাজ্যগুলি ছিল ছোট, এবং সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের শ্রেণী—যদি তত্ত্বে না-ও হয়, বাস্তবে—সংখ্যায়, ক্ষমতায় ও গুরুত্বে বেড়ে উঠে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী বর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাষ্ট্রের যথার্থ মূল শ্রেণী। [এই কালপর্বের পরে, শেষ দিককার সামন্ততান্ত্রিক কৃষকদের হয় বেশি পরিমাণে জমির খাজনা, কর ও অনুর্বর জমি, কিংবা ভূস্বামীদের বল প্রয়োগ ও তাদের স্বার্থে বাধ্যতামূলক বেগার শ্রমদানের ফলে ক্রমবর্ধমান দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছে। অবশ্য এ দুটিই ছিল অভিন্ন মূল কারণের লক্ষণমাত্র। অবধারিতভাবেই, পরবর্তীকালে কঠোর সামন্ততান্ত্রিক বিচারকরা তাদের সন্দেহভাজনদের চাবুক দিয়ে পেটাতে ও নির্যাতন করতে শুরু করল, আর জমির নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ বেশি বেশি করে চলে যেতে লাগল সেই সব লোকের হাতে যাদের প্রধান কাজই ছিল কৃষকদের নিঙড়ে যত বেশি সম্ভব কর আদায় করে যত কম সম্ভব উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে দেওয়া।] হিউয়েন সাঙ আমাদের জানাননি জমির কতটা অংশ সরাসরি রাজার হাতে ছিল, কিংবা জমির মালিকানার রূপ ও বাকি জমিতে খাজনার হার কেমন ছিল। হর্ষর ভ্রাম্যমান প্রাসাদ ও ঝাঁক বেঁধে চলা সৈন্য সামন্তদের কথা তাঁর সভাকবি বাণে-র লেখাতেও সমর্থিত হয়েছে (*হর্ষচরিত* ৫৮-৭০; ২০৭-২১৩)। চীনা পরিব্রাজক হর্ষের নাট্য-কৃতির কথা উল্লেখ করেননি (যদিও তাঁর উত্তরসূরী ই-সিঙ করেছেন) বা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ পৃষ্ঠপোষণার কথাও—যা গুপ্ত রাজাদের আমলের এক নতুন ঘটনা এবং কুষাণ ও ক্ষাত্রপদের আমলে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। এটার প্রয়োজন ছিল, কেননা এই কৃত্রিম ভাষা ও কেতাদুরস্ত সাহিত্য উচ্চকোটির ক্ষত্রিয় সভাসদ ও তাদের সহযোগী ব্রাহ্মণদেরকে তাদের জন্য খাদ্য ও বিলাসদ্রব্য উৎপাদনকারী সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক করেছিল।

ভারতীয় পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এখন 'জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবনের' কৃতিত্ব দেওয়া হয় গুপ্ত রাজাদের এবং সবাই আন্তরিকতার সঙ্গেই কথাটির পুনরাবৃত্তি করেন। প্রকৃতপক্ষে, 'স্বর্ণযুগ'-এর প্রাপ্ত কোন দরবারী নাটক বা অন্য সাহিত্যে কোন গুপ্ত রাজার প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই[৫]। কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্র* শুঙ্গ রাজাদের সঙ্গে সম্পর্কিত; বিশাখদত্ত-র *মুদ্রারাক্ষস*-এর উদ্দেশ্য রাজন্যবর্গের ষড়যন্ত্র বর্ণনা—যার দ্বারা চাণক্য সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে মগধের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। সমসাময়িক নথিগুলির মধ্যে কেবলমাত্র *পুরাণগুলিতেই* গুপ্তবংশের প্রথম দিককার রাজাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা-ও দায়সারাভাবে আরো অনেক ছোট ছোট রাজার সঙ্গে : 'গঙ্গার তীরবর্তী প্রয়াগ (এলাহাবাদ), সাকেত (ফৈজাবাদ) এবং মগধ—এই সব জেলা (*জনপদান*) গুলি ভোগ করবে গুপ্তবংশীয় (রাজা)-রা। ... এই সমস্ত রাজারা হবে আপাতক, বর্বর (ম্লেচ্ছ প্রায়স্), পাপিষ্ঠ (বা অধার্মিক), অসৎ (বা মিথ্যাবাদী), কৃপণ, নিতান্তই নির্গুণ।' প্রত্যেক রাজার নিজের নামের শেষে গুপ্ত উপাধি যোগ করে রাজবংশীয় নাম গ্রহণ প্রমাণ করে যে এঁদের কোন মর্যাদাপূর্ণ কৌম, উপজাতিক বা বর্ণগত উৎস ছিল না। ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়ে বংশপঞ্জি উদ্ভাবনের মতলব, পরে যা হামেশাই করা হয়েছে[৬], তখনও চালু হয়নি বলে মনে হয়। আদি গুপ্ত সম্রাট (৩১৯-২০ খ্রী.) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকুমারী কুমারদেবী-কে বিবাহ করে স্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে

মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন; শুধু তা-ই নয় তাঁর পুত্র দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্তও নিজের মাতৃকুল নিয়ে গর্ব বোধ করতেন। সমুদ্রগুপ্ত সব নাগ রাজাকে 'সম্পূর্ণ ধ্বংস' করেছিলেন এবং বাকি যে নাগেরা টিকে ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকটি রাজ পরিবারকে বাদ দিলে, বাকিদের সঙ্গে বর্বরদের তফাত তেমন কিছু ছিল না এবং তারাও অল্পকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উচ্চবংশীয় পরিবারগুলি আধুনিক যুগের অহম ও গোন্ড রাজাদের কয়েকজনের মতোই সম্ভবত ব্রাহ্মণদের দৌলতে বংশ-মর্যাদা লাভ করে নিশ্চিতভাবেই অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। কেননা, সমুদ্রগুপ্তর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (যিনি দেবগুপ্ত নামেও পরিচিত ছিলেন এবং বিক্রমাদিত্য ও সাহসাঙ্ক প্রভৃতির মতো গৌরবমণ্ডিত উপাধি গ্রহণ করেছিলেন—যেগুলি আপাতভাবে তিনিই প্রথম নেন ও সম্মানের সঙ্গে বহন করেন) বিবাহ করেছিলেন নাগ বংশের কুবের নাগা নামের এক রাজকুমারীকে। তাঁদের কন্যা প্রভাবতীগুপ্ত-র বিবাহ হয়েছিল মিত্ররাজা বাকাতক (একটি উপজাতীয় নাম, সম্ভবত পাকোতক-ও বলা হয়)-এর সঙ্গে—যা এই পরম্পরার আর একটি রাজনৈতিক বিবাহ। শেষোক্ত বংশের প্রথম যে-ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় তিনি হলেন এক ধনী কিন্তু সাধারণ বাকতক *গহপতি* (গৃহস্থ)। এই ব্যক্তি ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ অমরাবতীর বৌদ্ধ বিহারে দান করেছিলেন (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ১৫-২৬১-৮)। প্রথম বাকাতক রাজা বিন্ধ্যশক্তি ছিলেন গুপ্তদের পূর্বজ। গুপ্ত রাজাদের রাজ্য বিস্তারের প্রাথমিক গুপ্ত শর্ত এটাই যে, বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাদার সেনাবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্র পর্যন্ত কোন উপজাতি কিংবা জাতপাতগত বিধিনিষেধ তাঁদের ওপর ছিল না। বিভিন্ন রাজবংশের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল কিছুটা পরে—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন ও বংশমর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন কোন ব্রাহ্মণ লিচ্ছবিদের[৭] প্রায় অচ্ছুৎ নিচু জাত বলে গণ্য করত (*মনুসংহিতা* ১০.২২)—যদিও বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে তারা অতি উচ্চ স্থানেই অধিষ্ঠিত ছিল। লিচ্ছবিদের রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব লোপ পায় অশোকের আগেই। বিশাখদত্ত-র *দেবী-চন্দ্রগুপ্ত* নামে হারিয়ে যাওয়া একটি নাটকের নির্যাসে এবং রাজশেখরের *কাব্যমীমাংসা*-র নবম অধ্যায়ে উদ্ধৃত একটি পংক্তিতে গুপ্ত বংশের এক রাজকুমারের রোমান্টিক বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের বর্ণনা আছে; জনৈক খাশ (বা শক) প্রধান তাঁর অগ্রজের স্ত্রীকে জামিন-বন্দী করে রেখেছিলেন বলে রাজকুমার ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁকে হত্যা করেন। পরে তিনি বিবাহ করেন ঐ প্রধানের বিধবা স্ত্রীকে—যাঁর নাম দেওয়া হয়েছে ধ্রুবদেবী বা ধ্রুবস্বামিনী। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, ধ্রুবদেবী হল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-র এক রানির নাম—যাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত (*ফ্লিট* ১০, ১২, ১৩) পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহন করেন এবং তাঁর পরে রাজা হন সেনাপতি স্কন্ধগুপ্ত। বসরা-য় পাওয়া প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে ধ্রুবস্বামিনী নামাঙ্কিত এই রানির ব্যক্তিগত সীলমোহরটির দিকে নজর দেওয়া হয়নি* (প্রাচীন বৈশালী; *জার্নাল*

* প্রাচীন বৈশালী বস্‌রা-য় পাওয়া টেরাকোটার সিলমোহরটি (*জার্নাল অফ দি বিহার অ্যান্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি* ৫.৩০৩; *অ্যানুয়াল রিপোর্ট, আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া* ১৯০৩-৪, প্লেট- ৪০) এই রানির বলে মনে হয়। হারিয়ে যাওয়া নাটকে যে নাম দেওয়া হয়েছে এখানে ঠিক সেই নামই রয়েছে—ধ্রুবস্বামিনী। *ভবিষ্যোত্তর পুরাণ* থেকে দেওয়া কারো কারো উদ্ধৃতি (যেমন, এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার, *হিস্ট্রি অফ ক্লাসিকাল স্যানস্ক্রিট লিটারেচর*, মাদ্রাজ-পুনা ১৯৩৭, ভূমিকা, পৃ. ১০২-৫) যদি যাচাই করা যায়—সবচেয়ে ভাল হয় প্রাপ্ত সমস্ত পুঁথিগুলি থেকে নেওয়া উদ্ধৃতির একটি বিশ্লেষণমূলক সংস্করণে—তাহলে আমরা গুপ্ত বংশের রাজাদের সম্পর্কে আর একটু বেশি জানতে পারব। কিন্তু এই অনুচ্ছেদগুলির প্রামাণিকতা অত্যন্ত সন্দেহজনক, এমনকী কোন পুরাণের ক্ষেত্রেও।

অফ দি বিহার অ্যান্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি ৫.১৯১৯.৩০৩; *আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া*, বার্ষিক সংখ্যা ১৯০৩-৪ পৃ. ১০৭ + প্লেট -৪০)। কোন অসদুদ্দেশ্য থেকেও নাটকের সুবিধাজনক অংশ বেছে নেওয়া হতে পারে, কেননা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতেই (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ৭.৩৮; ১৮.২৪৮) জনৈক গুপ্তবংশীয় রাজার কাহিনী ঘৃণার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যিনি তাঁর নিজের ভাইকে হত্যা করে বিধবা ভ্রাতৃবধুকে বিবাহ করেছিলেন। যে রাজবংশের শাসনকে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল বলে তুলে ধরা হয় সেই বংশের এক রোমান্টিক উপাখ্যানের এমন অস্পষ্ট আভাসও লোভনীয়। গুপ্তবংশের রাজাদের প্রশংসা প্রধানত দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের নিজস্ব খোদাইগুলিতেই—উনবিংশ শতাব্দীতে প্রিন্সেপ ও তাঁর পরবর্তী ইউরোপীয় গবেষকদের দ্বারা পাঠোদ্ধার হবার আগে পর্যন্ত হাজার বছর ধরে যেগুলির কথা লোকে ভুলেই ছিল। এমনকী সম্রাটদের নামগুলি পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল স্মৃতি থেকে। একবার পাঠোদ্ধার, প্রকাশিত ও অনূদিত হওয়ার পর জায়মান ভারতীয় বুর্জোয়ারা সাগ্রহে সেইসব নথি আঁকড়ে ধরেছিলেন—'বিদেশী আক্রমণকারীদের হাতে ধারাবাহিকভাবে বিজিত হওয়া ছাড়া ভারতের কোন ইতিহাস নেই' বলে ব্রিটিশরা যে কথা সমানে প্রচার করে চলেছিল তার প্রতিবাদ হিসেবে। গুপ্তবংশের রাজাদের হাতে জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটা তো দূরের কথা বরং জাতীয়তাবাদই গুপ্ত রাজাদের এই পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে।

৯.৪ সামন্ততান্ত্রিক অনুদানের সঙ্গে আগেকার দানের পার্থক্য বুঝে নেওয়াটা জরুরি। সতব্যা গ্রামের ওপর পায়াসি রাজন্ন-কে দেওয়া ক্ষমতা (*দিঘ নিকায়* ২৩), এবং ব্রাহ্মণদেরকে দেওয়া অন্যান্য বৃত্তির (*দিঘ নিকায়* ৩,৫ প্রভৃতি) কয়েকটি শর্তের সঙ্গে শেষোক্ত সনদগুলির কয়েকটি শর্তের মিল আছে। *জাতকে* অনাথপিণ্ডকের মতো এক ধনী বণিকের কথা বলা হয়েছে, কোন গ্রামের ওপর যার কিছু বিশেষ অধিকার ছিল। কিন্তু বর্ণনা থেকে পরিষ্কার যে এই অধিকার রাজার মনোনীত 'গ্রামীণ'-এর ক্ষমতারই অনুরূপ—সে গ্রাম থেকে মুনাফা করতে পারত, প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্নও ছিল, কিন্তু কোন সামন্ততান্ত্রিক মালিকের সঙ্গে আদপেই এর কোন মিল নেই। এই সময় থেকে প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত জমিদানের হাজার খানেক তাম্রসনদ পাওয়া গেছে— যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলি প্রকাশিতও হয়েছে। প্রায় নবম শতাব্দী পর্যন্ত এই উপহার সনদগুলি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন মন্দিরকে (ফা-হিয়েনের মতে, সেগুলি আগে ছিল বৌদ্ধ বিহার), কিন্তু হামেশাই তার চেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট কোন মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্রাহ্মণদের। এমনকী পরবর্তীকালে পর্যন্ত ব্রাহ্মণদেরকে দেওয়া দানের সংখ্যাই বেশি; দাতার ও দাতার পিতামাতার জন্য খ্যাতি অর্জন, তার গৌরব ও সাফল্য বাড়ানোই ছিল সবসময় এই লোক দেখানো দানের কারণ। এটা উৎপাদন ভিত্তির কোন প্রকৃত উদ্দেশ্যকে গোপন করে। হিংসার প্রয়োগকে কমিয়ে আনার কাজে নতুন ব্রাহ্মণ ছিল রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ; বশ্যতা স্বীকারের সপক্ষে তাদের নীতিকথা সামগ্রিক প্রশাসনিক খরচকে কমিয়ে দিয়েছিল। আলোচ্য কালে,তাদের ভূমিকা ছিল আরো বেশি কিছু : আদিম এলাকাগুলিতে অগ্রদূত, লাঙ্গল-ভিত্তিক গ্রাম-সংস্কৃতিতে রূপান্তরণের প্রধান হাতিয়ার। পঞ্জিকা সম্পর্কে এদের জ্ঞানের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও, বীজ, শস্য, গো-প্রজনন (গরু ছিল পবিত্র এবং সেই সঙ্গে কাজের) তারা জানত—যা লাঙ্গল ব্যবহারের আগেই জানা থাকার দরকার ছিল। রাজার আমন্ত্রণে প্রায়শই সুদূর অঞ্চল থেকে অভিবাসনের ফলে দূরবর্তী বাজারগুলি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল এবং শস্যের মূল্য

সম্পর্কেও—যা বিনিময়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগত। আদিবাসী-অধ্যুষিত বনাঞ্চলগুলিতে— যেখানে সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ ছিল রীতিমত কঠিন ও কম লাভজনক—সেখানে প্রবেশের অনুমতি তাদের ছিল। শান্তিপ্রিয় গুণিন হিসেবে তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াচার ও জীবনযাত্রা বেশ সহজেই আদিম মানুষদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যেত। ব্যবসায়ীরাও পুরোহিত হিসেবে তাদের সাহায্য নিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ইচ্ছাকৃতভাবেই তাদের নিজস্ব কোন আচার অনুষ্ঠানের উদ্ভব ঘটায়নি, ফলে তারা ও ব্রাহ্মণরা পাশাপাশি কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিল। কোন রাজা হিন্দু ছিল, না বৌদ্ধ তা নিয়ে এখন দীর্ঘ, অর্থহীন যুক্তিগুলির পাঠ হাস্যকর ঠেকে যখন, দৃষ্টান্ত হিসেবে, হর্ষ-ই 'হিন্দু' শব্দের অর্থ বুঝতেন না এবং *নাগানন্দ*-র মতো এক বৌদ্ধ নাটক দেবী গৌরীকে উৎসর্গ করতে কোন অসুবিধাবোধ করেননি। তিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষরা, অন্য অনেক বিশিষ্ট কিংবা সাধারণ রাজার (যাদের উৎপত্তি কখনো কখনো সন্দেহজনক, খুব বেশি হলে উপজাতি-সর্দার—যাদের মধ্য থেকে তারা এসেছিল—তাদের চেয়ে এক ধাপ ওপরে) মতো-ই, চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার কথা জোর দিয়ে বলেছেন। মূলত এর উদ্দেশ্য, যথেষ্ট আদিম পর্যায়ের উৎপাদনের মধ্যে একটা শ্রেণী-কাঠামো বজায় রাখা; কিন্তু ফলশ্রুতিতে, কথিত চারটি মূল বৈদিক বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র—এই দুটির বেশি বর্ণের বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হয় দক্ষিণাঞ্চল।

সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ বলেছেন ঃ

'*বিনয়* (*liu*), *উপদেশাবলী* (*lun*), *সূত্রাবলী* (*king*) সমধরনেরই বৌদ্ধ গ্রন্থ। যিনি এইসব গ্রন্থের একটা শ্রেণীকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেন, *কর্মদান* নিয়ন্ত্রণ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কেউ যদি দুটি শ্রেণীকে ব্যাখ্যা করতে পারেন, তিনি এই অব্যাহতি ছাড়াও উচ্চতর আসনের (কক্ষ) সাজ-সরঞ্জাম পান; যিনি তিনটি শ্রেণীকে ব্যাখ্যা করতে পারেন তাঁকে সেবা করার ও তাঁর আদেশ পালন করার জন্য আলাদা ভৃত্য দেওয়া হয়। যিনি চারটি শ্রেণীকে ব্যাখ্যা করতে পারেন তাঁকে পরিচর্যা করার জন্য দেওয়া হয় 'খাঁটি মানুষ' (*উপাসক* = ধর্মপ্রাণ অপেশাদার অনুগামী); যিনি পাঁচটি শ্রেণীকে ব্যাখ্যা করতে পারেন তাঁকে সহযাত্রী রক্ষী দল দেওয়া হয়। কোন মানুষের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যখন উচ্চ শিখরে পৌঁছয় তখন তিনি বিভিন্ন সময়ে বিতর্ক সভার আয়োজন করতে পারেন। ... সভায় কেউ যদি পরিশীলিত ভাষা, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, এবং তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারেন তাহলে তাঁকে মূল্যবান অলঙ্কারে সাজানো একটি হাতির পিঠে চাপিয়ে নানা বাদ্যযন্ত্রের সমবেত সুর সহযোগে মঠের তোরণদ্বারে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্টোদিকে, কেউ যদি যুক্তি দেওয়ার সময় আটকে যান, কিংবা নিম্নমানের ও অশোভন শব্দ ব্যবহার করেন, কিংবা বিতর্কের নিয়ম ভঙ্গ করে সেই অনুযায়ী নিজের মতো করে কথাবার্তা বলেন তাহলে তাঁর মুখে লাল-সাদা রঙ এবং দেহে ধুলো-ময়লা লেপে কোন পরিত্যক্ত জায়গায় বা কোন খানাখন্দে ফেলে আসা হয়। (*বিল* ১.৮১)। ... সিন্ধু নদের তীরে, বিলে-ভরা সমতল কয়েক হাজার *লি* নিচু জমিতে কয়েক লক্ষ পরিবার বসতি স্থাপন করেছে। তাদের মানসিকতা নির্মম ও হঠকারী, এবং শুধুই রক্তপাতে আসক্ত। গবাদি পশু পালন করাই তাদের একমাত্র কাজ এবং তা দিয়েই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এদের কোন প্রভু নেই, এরা—নারী হোক বা পুরুষ—কেউই ধনী বা দরিদ্র নয়; এরা মস্তক-মুণ্ডন করে ও ভিক্ষুদের *কাষায়* আলখাল্লা পরে বলে আপাতদৃষ্টিতে ভিক্ষু বলে মনে হয়, যদিও তারা সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করে। তারা নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে থাকে এবং মহাযানদের ওপর আক্রমণ চালায়। ... কিন্তু, ধর্মীয় পোশাক পরলেও, তাদের

জীবনে নৈতিক নিয়মের কোন বালাই নেই, এবং তাদের পুত্র-পৌত্ররা ধর্মীয় পেশার প্রতি কোন রকমের মর্যাদা না দেখিয়ে পার্থিব মানুষের মতোই জীবন ধারণ করেন।' (*বিল* ২.২৭৩)

শেষের উদ্ধৃতিটি খুবই আগ্রহোদ্দীপক, কেননা সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আর্যদের তখনও পর্যন্ত পশুচারক ও উপজাতীয় বংশধররা সেই নদের তীরেই বসবাস করছে ইন্দ্র যেটিকে 'মুক্ত করেছিলেন'। আলখাল্লাগুলি বৌদ্ধদের মতো, না-কি অনেক আগে থেকেই তার চল ছিল এবং বাস্তবে, প্রাচ্যের আর্যদের মধ্য দিয়েই বুদ্ধের পছন্দকে তা প্রভাবিত করেছিল—সেটা স্পষ্ট নয়; হতে পারে প্রথমটাই ঠিক। বাকি অংশে দেখানো হয়েছে কীভাবে বৌদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে লামাবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল, কিংবা তা বিপুল মুনাফাকারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এক ধর্মীয় চতুরালি-তে পরিণত হয়েছিল । খোদাইগুলিতে কিছু বিশিষ্ট ভিক্ষুর নামে দান, বা সাধারণ ভক্তদের দেওয়া দান থেকে, এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়কার মূর্তিগুলিতে বা সমকালীন অজন্তার গুহাচিত্রগুলিতে দেখা যায় একের পর এক বিশালকায় বোধিসত্ত্ব (মূল্যবান রত্নখচিত মুকুট পরিহিত, কিংবা মহার্ঘ সিংহাসনে আসীন) — যেগুলির অবস্থান সাধারণ মানুষের থেকে সবসময়ই অনেক উঁচুতে। এ থেকে প্রমাণ হয়, ধর্মটি তার প্রতিষ্ঠাতার নীতি, আচরণ ও অনুশাসন থেকে কত দূরে সরে গিয়েছিল। চীনা পরিব্রাজক উল্লিখিত উচ্চ-বৃত্তিপ্রাপ্ত *সঙ্ঘরাম*-দের অসংখ্য গোষ্ঠীর নাম এবং নালন্দার আবাসিক শিক্ষক ও পণ্ডিতদের দেয় বেতনের বিস্তারিত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে বৌদ্ধ বিহারগুলির হাতে কী পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল। বিহারের সম্পত্তি পরিচালনার ব্যাপারটা (পরবর্তীকালে মন্দিরের সম্পত্তির মতই) কোন একক পরিবারের লাভজনক একচ্ছত্র অধিকারে পরিণত হবার দিকে ঝুঁকে পড়ে। নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও ভোগদখলের ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত করা হত (যেমন হয়েছে সিংহলে) কনিষ্ঠতর কোন পুত্রের মস্তকমুণ্ডন করে — যে যথাসময়ে মঠের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হত। মন্দিরগুলি নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি, কেননা পুরোহিতরা চিরকৌমার্য কিংবা দারিদ্র্য কোনটারই অঙ্গীকার করত না এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারত, যদিও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়শই তাদের সাহায্য করেছিল। সংঘ এই সময় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল উচ্চতর শ্রেণীগুলির ওপর; সাধারণ মানুষের সঙ্গে ন্যূনতম যোগাযোগও ছিল না — এমনকী উচ্চশ্রেণীগুলিকে ভালভাবে সেবা করার জন্যেও যার প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধের একটা ভাঙা দাঁত দেখার জন্য দক্ষিণা দিতে হত এক খণ্ড সোনা (*বিল,* ১.২২২)। স্বভাবতই এই ভবিষ্যদ্বাণী খুব চালু ছিল যে ধর্মের অবসান ঘটবে (*বিল* ১.২৩৭ প্রভৃতি), যখন অমুক বা তমুক মূর্তি মাটির নীচে অদৃশ্য হয়ে যাবে (*বিল* ২.১১৬)। ধর্ম যে তখনই কার্যত অদৃশ্য হয়ে ধন-সম্পদ ও কুসংস্কারের পাঁকে ডুবে গিয়েছিল, বিশ্বাসে অন্ধ চোখে নয়, আধুনিক চোখে তা স্পষ্ট বলে মনে হয়। এই রকম বিলাস-বৈভব থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে, হর্ষের মহা-সঙ্ঘারাম-এ আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পর তাঁকে হত্যা করার চেষ্টার (*বিল* ১.২২০-১) — যা ধর্মতত্ত্বের আড়ালে অর্থনৈতিক অসন্তোষেরই পরিণতি। এরপর থেকে এই ধরনের বিবাদ ক্রমশই বেশি বেশি করে ধর্মীয় আবরণ নিয়েছে।

উল্লেখ্য, *সুত্তনিকায়* ৮২৪-৩৪-র মর্মার্থের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, তার সম্পূর্ণ স্পষ্ট কথাগুলিও চীনা পরিব্রাজকরা একেবারের জন্য লক্ষ্যও করেননি — যেখানে আচার্য নিজেই কোন সভার (*পরিসা*) সামনে বিতর্কে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন; সেগুলিকে চিত্রিত

করেছেন অসার, এমনকী অসৎ অবসর বিনোদন হিসেবে। চূড়ান্তভাবে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে ই-সিঙ (পৃ. ৫৮-৯) ভিক্ষুদের রেশম বস্ত্র পরিধানকে সমর্থন করেছেন — যদিও তার জন্য রেশম-গুটি হত্যা করতে হত। কিন্তু তখন, তিনি ভারতে নিছক ধর্মতত্ত্ব শিখতে আসেননি। তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রশাসনিক কার্যকলাপের বিবরণে ভরা ঃ বৌদ্ধ মঠের কোন প্রবীণ তার ইচ্ছানুযায়ী কতটা সম্পত্তি ভোগের অধিকারী সে সম্পর্কে সেখানে খুঁটিনাটি আইন লিপিবদ্ধ আছে (*ই-সিঙ* ১৮৯--৯২)। ভিক্ষুরা মঠের বিপুল সম্পদ নিজেরাই ভোগ করার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল (১৯৩-৫)—যদিও প্রবীণ ভিক্ষুর আদর্শকে তখনও নিরাপদ দূরত্ব থেকে শ্রদ্ধা জানানো হত। 'সঠিক জীবনযাত্রা'র অষ্টমার্গ পথ (পৃ. ৬০) তখন মঠের জমি চাষ করতে দিয়ে খাজনা আদায়ের পর্যায়ে নেমে এসেছে। সঙ্ঘের ভাগ ছিল ⅙ থেকে ⅓ (*ই-সিঙ* পৃ. ৬০-১)। ভারতীয় বৌদ্ধ মঠগুলির 'সঠিক আচরণ'-এ মোহিত হয়ে (পৃ. ৬৫) এই পরিব্রাজক লিখেছেন ঃ 'নালন্দা বিহারের ধর্মীয় ক্রিয়াচার এখনও অনেক বেশি কঠোর। ফলে, আবাসিকের সংখ্যা অনেক— ৩০০০ ছাড়িয়ে গেছে। এর অধিকারভুক্ত জমিতে রয়েছে ২০০রও বেশি গ্রাম। বহু প্রজন্ম ধরে রাজারা এইসব জমি (বিহারকে) দান করেছেন। এইভাবে ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি এখনও ঘটেই চলেছে, এবং তা শুধু এই (বাস্তব) কারণেই যে *বিনয়* খুব কঠোরভাবে মেনে চলা হচ্ছে।' এখানে বৌদ্ধ বিহারের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ধর্মের শ্রীবৃদ্ধিকে এক করে দেখা হয়েছে। বাদবাকি সম্পর্কে বলা যায়, চীনারা যোগ্য ছাত্র হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছিলেন। তাঁদের বিহারগুলিও জমির সত্ত্ব না পেয়েও জমির খাজনা আদায়ের অধিকার পেত (জে. গারনেট, ১০৯), এবং ভুট্টা ধার দেওয়ার বিনিময়ে অত্যধিক সুদ নিংড়ে আদায় করত (১০০), যদিও হয়ত দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্তদের মধ্যে খাদ্যশস্য বিলিও করা হত (৯৬)।

ধীরে ধীরে যে নতুন, মধ্যবর্তী, ভূম্যধিকারী শ্রেণীগুলি তখন জন্ম নিতে শুরু করেছিল তাদের কাছে ব্রাহ্মণ্যবাদ, তার নব্য-দিশারি উচ্চবর্ণ সমেত, সামগ্রিকভাবে ছিল বেশি উপযোগী। বৈদিক বলিদান প্রথা পরিত্যাগ করার পর বিশাল, অনুৎপাদক বৌদ্ধ বিহারগুলির তুলনায় এর জন্য খরচ ছিল অনেক কম; অন্যদিকে, ধর্মীয় ক্রিয়াচারের ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার ব্রাহ্মণদেরকে রাষ্ট্রের আরো ভাল অনুষঙ্গী করে তুলেছিল। ব্রাহ্মণরাই, ভিক্ষুদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে, শান্তিপূর্ণভাবে উপজাতিগুলিকে বিভিন্ন বর্ণে রূপান্তরিত করতে পারত। বিশাল, জঙ্গি চরিত্রের অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শাসিত সাম্রাজ্যগুলির পতনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল; উভয়ই তখন অলাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ধর্ম তখন আর কোন হর্ষকে যুদ্ধ থেকে শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারত না— যেমন পেরেছিল অশোককে। বড় বৌদ্ধ বিহারগুলি (তাদের সামাজিক ভূমিকা ও শ্রেণী সেবার ক্ষেত্রে) হয়ে উঠেছিল বিশাল কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর সমতুল। এ দুটিই ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং স্ব-নির্ভর গ্রামসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অপ্রয়োজনীয়; তাছাড়া, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নগদ অর্থে কেনাবেচার বদলে চালু হয়েছিল স্থানীয় বিনিময় প্রথা।* আদি বৌদ্ধ ধর্মের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল সর্বজনস্বীকৃত, ফলে সভ্যতার বিকাশে তার প্রভাব থেকে যায়। কিন্তু যা

* নগদ অর্থের বদলে দ্রব্য বা শ্রম দিয়ে মূল্য শোধ করার রেওয়াজ ভারতে এখনো যথেষ্ট বেশি। একটি জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় (যার ব্যাপ্তি নিয়ে সংশয় আছে) হিসাব করা হয়েছে (INDIA, 1956. 99) যে তা ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্যের ৪০ শতাংশ, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ৪৩ এবং শহরাঞ্চলে ১১ শতাংশ।

হারিয়ে গেল তা সম্ভবত কখনো যথাযথভাবে উপলব্ধি করা হয়নি ঃ সৎ, পরিচ্ছন্ন, *সামাজিক* চিন্তায় ব্যক্তিমানুষের মনকে পরিশীলিত করে তুলতে হবে—ঠিক যেমন গান করার জন্য তার কণ্ঠস্বরকে বা কোন চারুকলায় দক্ষতা অর্জনের জন্য হাত চোখকে করতে হয়। ব্যক্তির স্বাস্থ্যের জন্য যেমন দেহের, বা শস্য উৎপাদন বজায় রাখার জন্য খেতের পরিচর্যা প্রয়োজন, তেমনি সমাজের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন মনকে যথাযথভাবে সংস্কৃত করা।

দুই ক্ষত্রিয় বণিক যুক্তপ্রদেশের বুলন্দশহর জেলায় একটি সূর্য-মন্দির স্থাপন করেছিলেন (*ফ্লিট* ১৬) এবং ৪৬৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে একটি চিরস্থায়ী দীপ প্রজ্জ্বলিত করেন একজন ব্রাহ্মণ। এটা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রচলিত বর্ণরীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন গোতমীপুত্রর মতো কোন লড়াকু শাসক নিজেকে 'অনন্য ব্রাহ্মণ' বলে দাবি করেন তখন বর্ণ বলতে কি বোঝায়? একই সময়ের আর একজন শাতকর্ণী রাজা শক জাতিভুক্ত বিদেশী রুদ্রদামন-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। পিতার মতোই এই রাজকুমারীও, শাতবাহন রাজারা সবাই মিলে সংস্কৃতের প্রতি যতটা অনুরাগ দেখিয়েছিলেন তার চেয়ে ঢের বেশি অনুরাগ দেখিয়েছেন (ল্যুডার্স ৯৯৪, কানহেরি-তে)। তা সত্ত্বেও, বাসিষ্ঠিপুত পুলুমাঈ 'বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক মিশ্রণের অবদান ঘটিয়েছেন' বলে দাবি করেন। খাদ্য-সংগ্রহকারী আতবিক উপজাতিগুলির সর্দাররা ব্যবসার সাহায্যে কিংবা আরো উন্নত সেনাবাহিনীতে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করে উপজাতি-সম্পত্তি বাড়িয়েছিল। এই অর্জিত সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার কোন উপায় তাদের খুঁজে বের করতেই হত। কোন উপায়ে নিজ উপজাতির বাকিদের চেয়ে বেশি উঁচুতে ওঠার প্রয়োজন তাদের ছিল। তাদের জন্য, ব্রাহ্মণরা মহাকাব্যগুলিতে তাদের পূর্বপুরুষদের নাম আবিষ্কার করতে পারত, কিংবা প্রাচীন কোন পাঠে লিখে দিতে পারত তাদের কথা। *পুরাণ*গুলিতে[৮] বর্ণিত 'হিরণ্যগর্ভ'-র মতো অনুষ্ঠান কার্যত করাত এই ধরনের সর্দাররাই (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ২৭.৮-৯; ১৭.৩২৮; *ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুইটি* ১৯.৯ পরবর্তী)।সেই অনুষ্ঠানে পুরোহিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রার্থীকে একটা স্বর্ণপাত্রে ঢুকিয়ে দিত—যা 'গর্ভ'। তারপর কোন গর্ভবতী নারীর উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ করা হত, এর পর হত জন্মের মন্ত্রপাঠ। রাজা তখন তার গুটিসুটি অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে এই পুনর্জন্মের জন্য নানা কথায় পুরোহিতকে কৃতজ্ঞতা জানাত। এই উপায়ে সে অর্জন করত উচ্চবর্ণ, আর পরোপচিকীর্ষু ব্রাহ্মণরা দক্ষিণার অংশ হিসেবে পেত সোনার পাত্রটি। নতুন বর্ণ রাজাকে এবং তার সু-জাত বংশধরদের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবার অধিকার দিত—শূদ্র ও জাতে-না-ওঠা উপজাতি উভয়ের পক্ষেই যা ছিল নিষিদ্ধ। যেসব উপজাতি বা উপজাতির অংশবিশেষ লাঙ্গলচালিত কৃষিকাজের দিকে গেল না তাদের বংশবিস্তারের গতি ছিল নতুন পদ্ধতি গ্রহণকারীদের চেয়ে অনেক কম। শেষোক্তরা অনেক বেশি নিয়মিত ও পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ পেত। তা সত্ত্বেও, প্রায়শই দেখা যেত কোন কৃষক বা কারুশিল্পী *জাতি*-র এবং প্রতিবেশী খাদ্য-সংগ্রাহক উপজাতির নাম একই। রূপান্তরণের এই পর্বে উপজাতি সমাজের অনেক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যই বজায় ছিল—যেমন, আন্তঃবিবাহ; কিন্তু, কেবলমাত্র সর্দারদের ক্ষেত্র বাদে; কেননা তারা তখন রাজা, এবং পূর্বতন সমকক্ষদের থেকে পৃথক। সহভক্ষণ নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ তখন দাঁড়াল নিচু জাতির কোন মানুষের রান্না করা খাবার না খাওয়া। আগেকার 'জেন' কিংবা উপজাতি থেকে বহিষ্কার করার মতোই এখন জাতিচ্যুত করাটা হয়ে দাঁড়াল সবচেয়ে কঠিন ও ভয়ঙ্কর শাস্তি, কেননা নিজের গোষ্ঠী যেসব অধিকার সুনিশ্চিত করত সেগুলি হারানোর পর কোন লোকের পক্ষে আর একটা গোষ্ঠীর সদস্য

হওয়া সহজ ছিল না। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কিছু উপজাতীয় পুরোহিতও ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। এই রূপান্তরণ ছিল সম্পূর্ণ উপজাতি-সমাজ থেকে আরো বৃহত্তর সাধারণ সমাজের নবগঠিত অংশ হওয়ার যে মৌলিক পরিবর্তন—তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ব্রাহ্মণ দেশান্তরীরা প্রায়শই তাদের পরিবারের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আনতে পারত না। এর অর্থ স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে অসবর্ণ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, এবং বিভিন্ন *স্মৃতি*-র বিবরণ অনুযায়ী সাত প্রজন্ম ধরে এরকম অসবর্ণ বিবাহ দিলে কোন শূদ্র ব্রাহ্মণ হতে পারত (*মনুস্মৃতি* ১০.৬৪-৬৫)। মালাবার অঞ্চলের নায়ারদের মতো, নেপালের গোটা জৈসিয়া জাতটিই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এরকম নিয়মিত সহবাস থেকে সৃষ্টি হয়েছিল—যা একইসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-তত্ত্ব অনুযায়ী ছিল কালেভদ্রের অবৈধ প্রণয়। বাংলার লোকনাথের মতো রাজারা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাণী মিলনের ফলেই নিজবংশের উদ্ভব হয়েছে বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হননি (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ১৫.৩০১ ও পরবর্তী)। রাজা হস্তিন ও শঙ্কশোভ-র (৫২৮-৯ খ্রী.) *নৃপতি-পরিব্রাজক* (রাজযোগী) বংশ, যাঁরা 'আঠারোটি অরণ্য রাজ্য' (বর্তমান আঠারোগড়) শাসন করতেন, এরকমই একজন যোগী সুশরমন-এর ঔরসজাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে (*ফ্লিট* ২৫)। সুশরমন নামটি থেকে বোঝা যায় যে তিনি নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে, যোগী-র জীবনযাপন করার চেয়ে তিনি একজন উপজাতীয় রমণীকে বিবাহ করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। ইন্দোচীনের প্রাচীন রাজ্য চম্পা-ও একইভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উচ্চবর্ণীয় একজন ভারতীয় অভিযাত্রী কৌণ্ডিন্য—যিনি তীরন্দাজিতে উন্নত শৌর্যের পরিচয় দিয়ে স্থানীয় আদিবাসীদের ভয় পাইয়ে দেন ও তাদের 'নাগ' সর্দারনি সোমা-কে বিবাহ করে একটি সমৃদ্ধশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু, আদিম মানুষেরা প্রায়শ তাদের মাতৃবংশীয় পরিচয়কেই শুধুমাত্র বহন করত তাই গ্রাম, এবং সেই সঙ্গে কঠোর বর্ণ ব্যবস্থা চেপে না বসা পর্যন্ত সেটাই সহায়ক হয়েছিল এই আত্তীকরণের।

৯.৫ বাকাতক-রাজ দ্বিতীয় প্রবরসেন তাঁর রাজত্বের অষ্টাদশ বছরে যে ভূমিসনদটি জারি করেছিলেন তার শর্তাবলী উদ্ধৃত করাটা প্রাসঙ্গিক হবে। এতে এক সহস্র ব্রাহ্মণকে যৌথভাবে একটি গ্রাম দান করা হয়েছিল—যার মধ্যে ৪৯ জনের,সম্ভবত পরিবারের কর্তাদের, নাম উল্লেখ করা হয়েছে (ফ্লিট ৫৫):

'এখন আমরা একটি গ্রামের স্থায়ী ব্যবহার অনুমোদন করছি। এই গ্রামটির মালিক হলেন এমন কিছু লোকের একটি সম্প্রদায় যাঁরা চতুর্বেদেই পারঙ্গম। এটি (গ্রামটি) যে এঁদেরই উপযুক্ত পূর্বতন রাজারা তা প্রমাণ করেছেন। এর জন্য এঁদের কর দিতে হবে না; নিয়মিত সেনাবাহিনী কিংবা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা এখানে প্রবেশ করবে না; উৎপাদনের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে গোরু ও বলদের ওপর এঁদের অধিকার থাকবে না; অধিকার থাকবে না ফুল ও দুধের তৈরি সামগ্রীর ওপর কিংবা চারণভূমি, পশুচর্ম, কাঠকয়লার ওপর, কিংবা লবণের খনির ওপর। এঁরা সব রকমের বেগার শ্রমের দায় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, সমস্ত গুপ্তধনের অধিকারী। ব্রাহ্মণদের, এবং (ভবিষ্যৎ) ভূস্বামীদের সনদের এই শর্ত মেনে চলতে হবে; যথা, তাঁরা যদি পরবর্তী রাজাদের শাসনকালে রাষ্ট্রের কিংবা তার কোন অংশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করেন; তাঁরা যদি ব্রাহ্মণ-হত্যাকারী কিংবা চোর, ব্যভিচারী, রাজাকে বিষ প্রয়োগকারী প্রভৃতি না হন; তাঁরা যদি যুদ্ধ না চালান; তাঁরা যদি অন্য সব গ্রামের প্রতি কোন অন্যায় না করেন তাহলে যতদিন সূর্য-চন্দ্র থাকবে ততদিন (এই

অনুমোদন বজায় থাকবে)। কিন্তু তাঁরা যদি অন্য পথে চলেন, কিংবা (ওই ধরনের কাজ) করেন তাহলে ঐ জমি কেড়ে নিয়ে রাজা কোন চুরি করবেন না।'

শর্তগুলি অস্বাভাবিক নয়, শুধু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। গ্রাম ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ-রা দখল করে ফেলেছিল, এরপর থেকে তারা চাষবাস শুরু করবে বিনা করে। কিন্তু স্পষ্টতই পূর্বতন ভোগদখল—যা নিশ্চিতই অকৃষক পশুপালকরা করত এবং যাদের সযত্নে রক্ষা করা হয়েছিল—তার ওপর ব্রাহ্মণদের কোন অধিকার ছিল না। গ্রামটিকে হতে হয়েছিল শান্তিপূর্ণ, কখনই অস্ত্র ধরা বা অন্য গ্রাম দখল করা চলত না। এই ধরনের নিরস্ত্রীকৃত গ্রামগুলিই ছিল বসতিস্থাপনের পক্ষে আদর্শ, ব্রাহ্মণদেরকে দেওয়া জমি ব্যবহার করা হত শুধুই বীজ বপনের কাজে। রাজার সৈন্যদল, রাজকর্মচারী বা আরক্ষাবাহিনীর গ্রামে ঢোকার অনুমতি না পাওয়াটা এই সমস্ত অনুদানগুলির সঙ্গে যথার্থই সঙ্গতিপূর্ণ; গ্রামগুলির এই অসহায় অবস্থাই এ ধরনের যে কোন লোকের পক্ষে প্রজাপীড়ন করে খেয়ালখুশি মতো শাসন করার কাজ সহজ করে তুলেছিল। আপাতসঙ্গত একটা যুক্তি দেওয়া হয় যে আগ্নেয়াস্ত্র প্রচলনের আগে, এমনকী কোন কৃষকের কৃষি-যন্ত্রপাতিও ভাল অস্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারত, এবং পীড়ন খুব বেশি হলে তা দিয়ে রাজার সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করা সবসময়ই সম্ভব ছিল। সনদগুলি কিন্তু অন্য কথা বলে; তাছাড়া উপরোক্ত যুক্তিতে মাথায় রাখা হয়নি যে, গ্রামগুলি ছিল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, কৃষকদের অস্ত্রধারণের বিপক্ষে বর্ণ ও রাষ্ট্রের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল, এবং *গুল্ম* সৈন্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা—যা গ্রামবাসীদের দেওয়া হত না। আজকের দিনেও, আমলা ও পুলিশ সামান্য শক্তি প্রদর্শন করেই ভারতের প্রায় সব গ্রামেই পীড়ন চালাতে পারে।

অন্যান্য ভূমিদান-সনদ থেকে দেখা যায় কীভাবে পতিত জমিতে একটু একটু করে আরো বসতির বিকাশ ঘটছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর দামোদরপুর ফলকগুলিতে (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ১৫.১১৩-১৪৫) রাষ্ট্রের কাছ থেকে কীভাবে জমি কেনা হয়েছিল তা বোঝা যায়, যেমন বোঝা যায় ফরিদপুর (*ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুইটি* ১৯১০, ১৯৩-২১৬) ফলকগুলি থেকেও। উভয়ক্ষেত্রেই, পূর্বনির্ধারিত কোন ধারণা নিয়ে না চললে, যে-কেউই স্পষ্ট বিষয়টা বুঝতে পারবেন। উভয় সনদগুচ্ছেই দেখা যাচ্ছে যে, মর্যাদালাভের জন্য যেসব বণিক ব্রাহ্মণদের দান করতে চাইত তাদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হত। নিবন্ধরক্ষক ও বয়স্কদের উপস্থিতিতে জরিপকারী জমি মাপত; এগুলি সবসময়ই হত চাষ-না-করা ও কর না-বসানো পতিত জমি। দাতা 'রাজার এক-ষষ্ঠাংশ ভাগ' দিয়ে দেওয়ার পর জমিখণ্ডটি ব্রাহ্মণকে (বা মন্দিরকে) হস্তান্তর করা হত। **যা কেনা হত তা জমি নয়, বরং কর না দিয়ে চিরকাল ধরে জমি চাষ করার অধিকার।** সাধারণভাবে এই করের পরিমাণ ছিল, উৎপন্ন ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ। বাংলায় ক্ষমতাশালী বাণিজ্য এবং গ্রাম-বসতির দ্রুত সম্প্রসারণকে আপতিকভাবে এই ধরনের অনুদানের প্রেক্ষিতে দেখতে হবে।

ভোগদখলের স্থানীয় শর্তগুলি ছিল এক এক জায়গায় এক এক রকম, এবং পুরনো রীতিগুলিকে সবসময়ই যথাসম্ভব মেনে চলা হত। *ফ্লিট* ৮০ অনুযায়ী, কোন সভার সম্মতিক্রমে একটি গ্রাম ও সেই সঙ্গে তার অধিবাসীদের, যারা অবশ্যই শূদ্রদের কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ছিল, মন্দিরের পুরোহিতদের দান করা হয়েছিল। এই বিভ্রান্তিকর দানটি করেছিল *মহারাজা মহাসামন্ত*

সমুদ্রসেন সপ্তম শতাব্দীর পাঞ্জাবে; অন্যত্র, দান করা হত বিজিত আদিবাসীদের। কিন্তু, গ্রামের মজুরদেরও কখনো কখনো 'দিয়ে দেওয়া' হয়েছে (*জার্নাল অফ দি বিহার অ্যান্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি* ২.৪২৩, ৪০৭, ৪১৫; *এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ১৫.১ ও পরবর্তী)। কোন কোন ফলকে ব্যক্তিগত জমি দান অনুমোদন করা হয়েছে। যতই দিন গেছে ততই দান করা হয়েছে আরো বেশি বদান্যতার সঙ্গে। তবু অপরিবর্তিত থেকে গেছে একটি বৈশিষ্ট্য। কোন সম্পূর্ণ গ্রামের প্রাপকরা খুব বেশি হলে লাভ করেছে সেইটুকু অধিকার যা রাষ্ট্র সাধারণভাবে দাবি করতে পারে। অর্থাৎ, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নির্ধারিত করই তারা সংগ্রহ করত। করের কোন অংশই রাষ্ট্রকে কিংবা কোন রাজকর্মচারীকে দিতে হত না, কিন্তু দানগ্রহীতার এই সমস্ত কর বৃদ্ধির অধিকার বা জমি ও গবাদিপশুর ওপর মালিকানা সত্ব ছিল না। জমিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার যে তত্ত্ব *অর্থশাস্ত্র* উপস্থিত করেছিল তা বজায় ছিল, কিন্তু তার অর্থ মূলত এই দাঁড়িয়েছিল যে চাষ করা জমিতে রাষ্ট্র কর দাবি করবে, এবং এই জমির ওপর বসতি স্থাপনকারীদের অধিকার সামগ্রিকভাবে সুনিশ্চিত করা হবে। আবার, কৃষকদের নিপীড়ন সীমিত করার ক্ষেত্রে বর্ণব্যবস্থারও কিছুটা ভূমিকা ছিল। পরিস্থিতি খুব খারাপ হলে, একই উপজাতি সম্ভূত সহ-বর্ণীয়রা একে অপরের পাশে এসে দাঁড়াত; এরকম কোন স্থানীয় 'জাতি' সাধারণভাবে একাধিক গ্রামেই ছড়িয়ে থাকত। *হর্ষচরিত* এবং একের পর এক দামোদরপুর ফলকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টি লক্ষ্যণীয় ঃ উপরোদ্ভূত সামন্ততন্ত্র যত দিন গেছে ততই মাথাভারী হবার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

নিচের উদ্ধৃত অংশটি (রাজত্বের) ২৫তম বৎসরে হর্ষের এক ভূমিদান-সনদ থেকে নেওয়া। এ থেকে প্রচলিত পদ্ধতির একটা ছবি ফুটে ওঠে ঃ

'বিজয় (লাভ পূর্বক), কপিত্থিকা (গ্রামে) নৌকা, হস্তী, অশ্ব সমন্বিত মহারাজাধিরাজের শিবির-রাজধানী থেকে মহেশ্বরের ভক্ত হর্ষ শ্রাবস্তী *ভুক্তি*-তে কুন্দধানী *বিষয়*-এর অধীন সোমগুন্ড গ্রামে সমবেত সামন্ত ও রাজকর্মচারীদের (*মহাসামন্ত* বৃন্দ, *মহারাজ* বৃন্দ, *দৌঃসাধ্য-সাধনিক* বৃন্দ, *প্রমাতার* বৃন্দ, *রাজস্থানীয়* বৃন্দ, *কুমারামাত্য* বৃন্দ, *উপরিক* বৃন্দ, *বিষয়পতি* বৃন্দ, নিয়মিত ও সহায়ক সৈন্যবৃন্দ, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্যদের); এবং সেখানে বসবাসকারী জনগণের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ জারি করছেন ঃ

'আপনাদের সকলের অবগতির জন্য! একটি জাল সনদের জোরে ব্রাহ্মণ ভামরথ্য যে এই গ্রামের ভোগদখল করতেন সে-সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে আমি সেই (তাম্রফলক) সনদটি ভেঙ্গে ফেলেছি এবং গ্রামটি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি। এবং (আমার মাতা-পিতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সকল পরলোকগতের) আত্মিক মঙ্গল বৃদ্ধির জন্য *ভূমি-ছিদ্র* প্রথা অনুযায়ী দানস্বরূপ এটি (ব্রাহ্মণ) ভট্ট শিবস্বামিন ও ভট্ট ভাটস্বামিন-কে *অগ্রহার* হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রদান করছি। ...এই দান তার যথাযথ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত, এবং তা (প্রদান করা হচ্ছে) *উদ্রঙ্গ* (কর) সমেত, রাজপরিবার যেসব আয় দাবি করতে পারেন সেগুলি সমেত, কিন্তু সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি সহ। (একে গণ্য করতে হবে) জেলা থেকে বের করা একটি অংশ হিসাবে। (এটি দেওয়া হচ্ছে) বংশানুক্রমিকভাবে পুত্র-পৌত্র পরম্পরায়—যতদিন চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী থাকবে ততদিনের জন্য।

এটি অবগত হয়ে, আপনারা এই (প্রদানে) সম্মতি দেবেন, এবং বসবাসকারী নাগরিকরা, আমার নির্দেশ মেনে (এরপর থেকে) শুধু এই দুইজনকেই উৎপাদিত সামগ্রীর সঠিক (একের ছয়) অংশ, জমি ভোগদখল কর (*ভোগ*-কর), নগদ অর্থে প্রদেয় কর ও অন্যান্য দেয় হস্তান্তর করবেন। এবং

তাঁদের সেবা করবেন (রাষ্ট্রের দাবি অনুযায়ী)।...এই দলিলের *দূতক* হলেন *মহাপ্রমাতার মহাসামন্ত* শ্রী স্কন্দগুপ্ত; এবং দলিলপত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চ আধিকারিক (অক্ষপতল)-এর নির্দেশমতো *সামন্ত মহারাজ* ঈশ্বরগুপ্ত।' (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা,* ৭.১৫৫-৬০)

সামন্ততান্ত্রিক আধিকারিকরা নিজেরা এই প্রথম 'মহারাজা, প্রতিবেশী রাজা' হল। তা সত্ত্বেও, তাদের কারোরই নিজস্ব উদ্যোগে এই ধরনের দান করার অধিকার ছিল না, প্রয়োজন ছিল না তাদের সম্মতিরও। প্রকৃতপক্ষে, সনদের ওপর রাজার সই থাকাটাই ছিল রীতি, যা থেকে একটা ছোট খেতের চেয়ে বেশি কিছু পাওয়া যেত না। শিবিরের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভা, সচিবালয় সব কিছুই ছিল ভ্রাম্যমান। ব্রাহ্মণকে জমিদান করেছেন এক বৌদ্ধ সম্রাট, যিনি নিজেকে আবার শুধুই শিবের ভক্ত বলে ঘোষণা করেন। পরিশেষে, এই ধরনের দান জাল করার পক্ষে যথেষ্ঠ লাভজনক হয়ে উঠেছিল। এখনো পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করা তাম্র-ফলকগুলির মধ্যে এই জালিয়াতির প্রমাণ বাস্তবিকই পাওয়া গেছে। উদ্যোগী ব্রাহ্মণরা সফলভাবে সরাসরি সনদ জাল করার জন্য তাদের সংস্কৃত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারত এবং কখনও কখনও লাগাতও। জ্ঞাত এইরকম আরো কয়টি জালিয়াতি হল 'সমুদ্রগুপ্ত'-র একটি সনদ (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ১৫), তরলস্বামিনের সনদ (*করপাস ইনসক্রিপসনাম ইনডিকারাম,* চতুর্থ ১৬পি-৬৫ ৫৯৪-৫খ্রী.), বিজয়রাজের কৈর ফলকগুলি (আনুমানিক ৬৫০ খ্রী. পরবর্তী সময়ের, পূর্বোক্ত, ১৬৫-৭৩) এবং অন্যান্য। রাজার বংশবৃত্তান্ত উদ্ভাবন, বা কোন *পুরাণ* জাল করার চেয়ে এই জালিয়াতি করা হয়েছে অনেক বেশি দ্রুততার সঙ্গে এবং ধরা পড়লেও সম্ভবত শাস্তি বিশেষ কিছু হত না। সমকালীন কোন আরিয়ান-এর পক্ষে এ কথা প্রমাণ করা কঠিন ছিল যে, ভারতীয়রা এখনও মিথ্যা কাকে বলে জানে না।

চিত্র ৩৮ : বনস্‌খেরা তাম্রফলকে (*ই. আই.* ৪.২০৮-১১) হর্ষের স্বাক্ষর : স্বহস্ত মম মহারাজাধিরাজ-শ্রী-হর্ষস্য। এই ফলকে দুই ব্রাহ্মণকে একটি গ্রাম দান করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় হল অশোকের সাদামাটা 'মাগধে রাজা' উপাধির সঙ্গে এর পার্থক্য।

নীচের প্রতীতিগুলি উপরোক্ত বিবরণমালাকে বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। আধুনিক বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ কেনা ও বেচার অধিকারের দিক থেকে দেখলে জমির ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে ওঠার প্রশ্নটি অর্থহীন। প্রথমত, প্রকৃত কৃষকদের অধিকাংশেরই উদ্ভব ঘটেছিল এক উপজাতি-পর্যায় থেকে—যেখানে জমি ছিল নিছকই কর্মক্ষেত্র; আর, লাঙ্গল ও গোময়-সার উদ্ভাবনের আগে পর্যন্ত প্রচলিত আদিম ঝুম চাষ পদ্ধতি-র পক্ষে ব্যক্তিগত ভূমিখণ্ড ছিল অকার্যকরী। দ্বিতীয়ত, কোন জমির ওপর অধিকার, এমনকী তা যদি নিছক জমি চাষের অধিকারও হয় তাহলেও তা ছিল একটা বিশেষাধিকার এবং সেই সঙ্গে কোন গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার স্বীকৃতি। কোন ব্যক্তিকে কৃষকদের উপ-গোষ্ঠী, সাধারণভাবে 'জাতি', থেকে বহিষ্কার না করা পর্যন্ত তার সব জমি হারানোর সম্ভাবনা ছিল না। পরিশেষে, কার্যত কোন পণ্য উৎপাদন করে না এমন কোন গ্রাম সমাজে যেখানে অপরিষ্কৃত পতিত বা প্রান্তবর্তী এবং তখনও পর্যন্ত চাষ করা হয়নি এমন জমি

পাওয়া যেত---সেখানে জমির ক্রেতা পাওয়া সম্ভব ছিল না। রাজাকে কর দেওয়াটাই ছিল একমাত্র শর্ত, এবং নতুন বসতি স্থাপনকারীরা নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে তুলতে না পারলে পূর্বতন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্ভবত খুব সামান্য পরিমাণে পোষ্য সত্ব দেওয়া। স্থানভেদে কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও, এই ধরনের ব্যবস্থা প্রায় মুঘল আমলের শেষ পর্যন্ত বজায় থেকেছে।

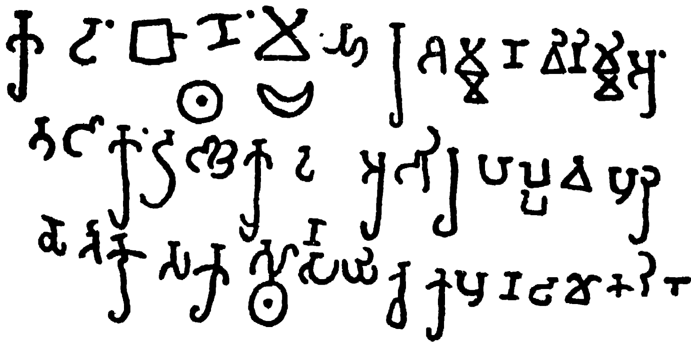
সনদগুলিতে প্রায় একচেটিয়াভাবে ব্রাহ্মণদেরকে দেওয়া অনুদানগুলির বিশেষ শর্তাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের অনুদানে লেখা *কর্ষতঃ কর্ষয়তঃ* শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'তিনি (নিজে) চাষ করুন কিংবা (অন্যদের দিয়ে)চাষ করান' থেকে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি ও জমিদারি প্রথা সৃষ্টির কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বর্ণ ও তার পৌরোহিত্য কর্ম, প্রায় রীতি হিসেবেই, তাকে প্রকৃত কৃষিকাজ থেকে নিবৃত্ত করেছিল। তবু, জমি ব্রাহ্মণকে দান করা হলে তা অবশ্যম্ভাবীভাবেই হত করমুক্ত। ফলে, সনদে বিশেষ ছাড় না দেওয়া হয়ে থাকলে*, অন্য কেউ চাষ করাটা কর ফাঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এইসব শর্ত এবং পরবর্তীকালে এদের অবশেষগুলি থেকে জমিতে সাধারণ অধিকারগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। গ্রামের কুটিরগুলি ঘেরা থাকত একটি বেড়া দিয়ে, এবং বেড়ার চারপাশ ঘিরে থাকত সাধারণের ব্যবহার্য বৃহৎ চারণভূমি। তার পরে থাকত প্রথম বসতির খাদ্য-উৎপাদনের জমি; তার ওপরও ছিল সকলের অধিকার এবং সকলকেই তার জন্য কর দিতে হত। এই প্রধান চাষের জমির কোন খণ্ড বা খেতের একমাত্র অধিকার প্রকৃতই যে জমি চাষ করে তাকে, যতদিন চাষ করবে ততদিনের জন্য হস্তান্তরের ভিত্তিতে দিত সেই জমির প্রকৃত মালিকরা, অর্থাৎ গোটা গ্রাম—যার প্রতিনিধিত্ব করত গ্রাম-সভা। এরপর থাকত পতিত জমি। সেখানেও কোন খেত বা বনভূমি হাসিল করে কেউ (ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ) চাষ করতে চাইলে পঞ্চায়েত বা রাজা সেই জমি হস্তান্তর করতে পারত। যতদিন সে কর দিত, এবং জমি চাষ করত ততদিন এই সত্ত্ব বজায় থাকত—অবশ্য যদি না, আগে যে বিরল ছাড়ের কথা বলা হয়েছে তা সে পেয়ে থাকে। পরবর্তীকালে, শ্রমশক্তির সরবরাহ বৃদ্ধি এবং এক নতুন, বিকাশমান বাজার পাওয়ার ফলে ব্রাহ্মণদের অপ্রত্যক্ষ চাষ—স্থাবর এবং এমনকী সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি গড়ে ওঠার মডেল হিসেবে কাজ করেছে; তফাৎ শুধু এইটুকু যে রাষ্ট্র প্রাপকের কাছ থেকে কিছু কর ও পরিষেবা দাবি করত।

৯.৬ গুপ্তযুগ ও তার পরবর্তী পর্বে জমির বিলি-বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ার যে রূপরেখা পূর্ববর্তী বিভাগগুলিতে দেওয়া হয়েছে সৌভাগ্যক্রমে নথিপত্র, প্রত্নতত্ত্ব ও ক্ষেত্রানুসন্ধানের সাহায্যে তা বিস্তারিত করা যায়। বিকাশের পর্যায়ক্রমকে ইতিহাসের সন্ধানী আলোয় আনার জন্যই শুধু একটা আঞ্চলিক দৃষ্টান্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে। কদম্ব গাছ (*নউক্লিয় কদম্ব,* বা খুব সম্ভবত) *এন্থোসেফলাস কদম্ব* ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে পরিচিত—বিশেষ করে উষ্ণ অঞ্চলের মানুষদের কাছে, তার আকর্ষণীয় কমলা রঙের ফুলের জন্য। এর ফল এখন প্রায়শ দিশি ওষুধে ব্যবহার করা হয়। *এন্থোসেফলাস*-এর অন্য নাম *হলি (রি) প্রিয়,* অর্থাৎ

* এক খণ্ড জমির ক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণ নিজে চাষ করে বা অন্যকে দিয়ে চাষ করিয়ে যা পাবে, সেটাই হবে তার আয়। যখন গোটা গ্রাম দান করা হতো তখন আয় নির্দিষ্ট ছিল ততটাই যতটা রাষ্ট্রের পরিবর্তে দানগ্রহীতার কাছে যেত। তা সত্ত্বেও, পতিত জমিতে নতুন বসতি স্থাপনকারীর জন্যে, অথবা পতিত জমির কোন অংশ সরাসরি নিজে চাষ করার জন্যে শর্তাবলী তৈরির অধিকার দানগ্রহীতার ওপর ন্যস্ত ছিল, এবং সেগুলি নতুন মুনাফার একটা স্থায়ী উৎসই শুধু ছিল না, পরবর্তী সামন্ততান্ত্রিক ভোগদখল শর্তের একটা ছাঁচ-ও ছিল।

'কৃষকদের প্রিয়' বা 'হরি (বিষ্ণু)-র প্রিয়'। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গাবড়া ও অন্যান্য উপজাতি-রা এখনো এটিকে টোটেম হিসেবে পুজো করে।[৯] মহারাষ্ট্রে অনেক জাতের মধ্যেই কদম পদবীটি অত্যন্ত সুলভ—যার উৎপত্তিও এই শব্দটি থেকে।

কদম্ব নামটি অবশ্য ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণভাগ, এবং কোঙ্কনের একটি রাজবংশ হিসেবে পরিচিত।[১০] এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ময়ূরবর্মণ-কে (যথারীতি পণ্ডিতী বিতর্ক সমেত) চিহ্নিত করা হয়েছে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকের মানুষ হিসেবে। তার একমাত্র খোদাইটি[১১] রয়েছে চিতলদ্রুগের (মহীশূর রাজ্য) পশ্চিমে চন্দ্রবল্লি-তে, প্রাকৃত ভাষায় : 'এই জলাশয়টি খনন করিয়েছেন কদম্ব বংশের রাজা ময়ুর শর্মন, (যিনি) পরাস্ত করেছেন ত্রিকূট, আভীর, পল্লব, পরিযাত্রিক, সকস্থা (ন), সয়িনদক, পুনাত, মোকরি-দের।' (চিত্র ৩৯)। জলাশয়টি এখনও বর্তমান, যদিও খোদাইটি আসল কিনা তা নিয়ে, বা তার পাঠ ও ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। মলবল্লি-তে একটি দান সনদ পাওয়া গেছে (*এপিগ্রাফিয়া কর্ণাটিকা* ৭ শ. ২৬৪; এটিও প্রাকৃতে লেখা, শেষ সংস্কৃতে একটি সংক্ষিপ্ত আশীর্বচন রয়েছে)—যাতে দাতার নাম নেই; তবে তিনি সম্ভবত কদম্ব



চিত্র ৩৯ : চন্দ্রবল্লি জলাধারে কদম্ব ময়ুরশর্মনের খোদাইলেখ : কদম্বানাং ময়ুরশর্ম্মনা বিনিম্মিয়ং ততাকং দুভ ত্রেকির্উত-অভির-পল্লব-পারিযাত্রিক-সকস্থান-সয়িন্দক-পুণাত-মোকরিক। প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের মধ্যে রয়েছে সূর্য ও চন্দ্র।

বংশের গোড়ার দিকের কোন রাজা যিনি স্থানীয় দেবতা মলপলিদেবের সেবার জন্য জনৈক ব্রাহ্মণকে কয়েকটি গ্রাম দান করেছিলেন। আগে এই গ্রামগুলি দান করেছিলেন পূর্বাঞ্চলের পল্লব বংশীয় রাজা শিবস্কন্দবর্মণ। এই রাজবংশ প্রশ্নাতীতভাবে আদিবাসী-সম্ভূত হলেও এঁরা একটি ব্রাহ্মণ্য নামমালা ধারণ করেছিলেন—যেমন, মানব্যসগোত্র হারীতিপুত্র শিবস্কন্দবর্মন। একশৈলিক পল্লব স্থাপত্য এবং মামল্লপুরম (মহাবলীপুরম)-এর মন্দিরগুলি ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য কীর্তিসমূহের অন্যতম। *মনুস্মৃতি*-তে উল্লিখিত জুনাগড় ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমণকারী পহ্লবদের (পেহ্লবি) সঙ্গে এই পল্লবদের গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

ময়ূরশর্মনের নাম এরপর দেখা যায় তাঁর বংশধর কাকুস্থবর্মণের (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ৮.২৪-৩৬) একটি খোদাইয়ে; সংস্কৃত ভাষায় লেখা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার

এই খোদাইটি রয়েছে তালগুন্ডায়। এতে বলা হয়েছে যে, ময়ূরশর্মন প্রথমে ছিলেন পল্লব রাজাদের বিরোধী, পরে তাদের সামন্তরাজা ঃ

'যুদ্ধে পল্লব রাজাদের সীমান্ত প্রহরীদের দ্রুত পরাস্ত করে তিনি শ্রী পর্বতের প্রবেশ মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত দুর্গম বনভূমি দখল করেন। মহান বাণ-এর নেতৃত্বাধীন রাজাদের একটি গোষ্ঠীর কাছ থেকে তিনি অনেক কর আদায় করেছেন। সুতরাং, অলঙ্কারের মতো নিজের এইসব প্রয়াসের মাধ্যমে তিনি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন এবং তা পল্লব রাজাদের ভ্রূকুটির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এই কৃতিত্বগুলি অতীব মনোহর কেননা এর ফলে তাঁর সংকল্প পূর্ণ হতে শুরু করে এবং তা তাঁর উদ্দেশ্যসাধন ও এক প্রবল আক্রমণের সূচনা নিশ্চিত করে। যখন শত্রুরা, কাঞ্চীর (পল্লব) রাজারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি অর্জন করেন, তখন তিনি—রাত্রিতে তাঁরা যখন অসমতল এলাকা দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন কিংবা বিশ্রাম করছিলেন সেই সময়ে, যেখানে আক্রমণ চালানো সুবিধাজনক সেই জায়গায়—তাঁদের সেনাবাহিনীর মহাসমুদ্রের সামনে অবতরণ করে শক্তিশালী বাজপাখির মতো তাঁদের ওপর আক্রমণ চালান। (এইভাবে) শুধুমাত্র তরবারির শক্তির ওপর নির্ভর করে তিনি সেই চরম দুর্দশা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। তাঁর এই শক্তি এবং সেই সঙ্গে তাঁর শৌর্য ও বংশ পরিচয় আবিষ্কার করে পল্লব রাজারা বলেন যে তাঁকে ধ্বংস করে লাভ হবে না, আর তাই তাঁরা তাঁকে দ্রুত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। তখন (পল্লব) রাজার সেবায় নিযুক্ত হয়ে তিনি যুদ্ধে নিজের সাহসের পরিচয় দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করেন এবং পল্লবরাজ নিজ হাতে ফিতায় পল্লবশাখা বেঁধে সেই মুকুট মাথায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। এবং তিনি একটি রাজ্যও পান, যার পশ্চিম সীমান্তে মহাসাগরের জল বাঁকানো ঢেউ তুলে নৃত্য করে এবং তার সীমা (?) প্রহর দিয়ে ঘেরা; সেখানে অন্যরা প্রবেশ করবে না—এই চুক্তির ভিত্তিতে তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।'

এই অংশে, পূর্বপুরুষদের স্তুতিপূর্ণ ১৪-২১ ছত্রে, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ওপর থেকে উদ্ভূত সামন্ততন্ত্রের বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে। এইসব এলাকায় বসতি স্থাপন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুপ্রবেশ এতটাই ঘটেছিল যে এলাকা দখলের জন্যে যুদ্ধ, বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধ—যা নিয়মিত সেনা অভিযানের সাহায্যে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না,* তা লাভজনক

* গেরিলা যুদ্ধের কৌশল হায়দার আলি খুব সুন্দরভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফৌজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্য কর্নেল উড যখন তাঁকে চিঠি লিখে জানান যে একটা পদাতিক বাহিনী ও অল্প কয়েকটা কামানের সামনে একজন মহান যুবরাজের পালিয়ে বেড়ানোটা খুবই লজ্জাজনক, হায়দার সংক্ষেপে তার উত্তর দিয়েছিলেন ঃ '... সময় হলে আপনি আমার যুদ্ধ-কৌশল বুঝতে পারবেন। আমার অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতিটি ঘোড়ার দাম যেখানে এক হাজার টাকা সেখানে আপনার দু'পয়সা দামের গোলার সামনে তাকে খোয়ানোর ঝুঁকি কী আমি নেব? না! আমি আপনার সৈন্যদের ঘুরিয়ে মারবো যতক্ষণ না তাদের পাগুলো ফুলে দেহের সমান হয়। আপনি ঘাসের একটা টুকরো, কিংবা এক ফোঁটা জলও পাবেন না। আপনার ডঙ্কানিনাদ আমি শুনতে পারব, কিন্তু মাসে একবার আমি কোথায় থাকব তা আপনি জানতেও পারবেন না। আপনার ফৌজের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব, তবে আমার যখন ইচ্ছা হবে তখনই, আপনার পছন্দমতো সময়ে নয়।' (*ওরিয়েন্টাল মেমোয়ারস* ২.৩০০-১)। এই প্রতিশ্রুতি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই পালন করা হয়েছিল। হায়দার যখন শেষ আক্রমণ হানলেন, তখন ক্লান্তি ও বিস্ময়ের কৌশল এতই কার্যকরী হয়েছিল যে, ঠিক সময় মতো অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন একদল সৈন্য এসে না পড়লে উডের গোটা বাহিনীটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ভূ-পরিবেশ প্রতিকূল এবং আকস্মিক আক্রমণের পক্ষে অকার্যকর না হলে সৈন্যদের দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন ও সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করাটা ছিল মারাঠাদের সবচেয়ে সফল রণকৌশল।

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ৭-১৩ ছত্রে বর্ণিত ময়ূরশর্মনের বংশের উৎপত্তি আরো বেশি আগ্রহোদ্দীপক। তিনি ছিলেন 'কদম্ব বংশজাত'; এই নামটির উদ্ভব ঘটেছে একটি কদম্ব গাছ (যা কোন সন্ন্যাসীর আশ্রমের কাছে জন্মেছিল) থেকে যেটিকে তাঁর পূর্বপুরুষরা পূজা করতেন এবং তার ফলেই তাঁরা 'অনুরূপ গুণসম্পন্ন (*সাধর্ম্য*) হয়ে ওঠেন'। তরুণ ময়ূরশর্মন নিজ টোটেম বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে তাঁর ব্রাহ্মণ গুরু বীরশর্মনের সাথে পল্লবদের নগরী (কাঞ্চী)-তে গিয়েছিলেন—কোন প্রতিষ্ঠানে (*ঘতিকা*) যোগদানের জন্য। একদিন, পল্লব রাজাদের অশ্বারোহী বাহিনীর জনৈক সেনাপতির সঙ্গে তাঁর বচসা হয় এবং ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তরবারি ধারণ করে তিনি বিশ্বজয়ের প্রতিজ্ঞা করেন। আগেই বর্ণনা করা হয়েছে, কত দক্ষতার সঙ্গে তিনি তরবারি চালনা করতে পারতেন। তাঁর বংশের টোটেম বর্ণনা-ও যথার্থ, কেননা কদম্ব বংশের পরবর্তীকালের নথিপত্রেও (*এপিগ্রাফিয়া কর্ণাটিকা* 9. শ. 117, Dg. 35) বলা হয়েছে যে কদম্বদের 'পূর্বপুরুষ', ময়ূরবর্মনের পিতার জন্ম হয়েছিল এক কদম্ব গাছের নিচে, শিবের ললাটচ্যুত 'একটি স্বেদবিন্দু' থেকে; ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রমতে এই পূর্বপুরুষ ছিলেন ত্রিনয়ন এবং চতুর্ভুজ বিশিষ্ট। ভিন্ন আর একটি মত অনুযায়ী, ময়ূরবর্মন নিজেই তিনটি চোখ নিয়ে, পবিত্র কদম্ব গাছের নিচে জন্মেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য 'শর্মন' থেকে ক্ষত্রিয় 'বর্মন' পদবীতে পরিবর্তিত হওয়াটা প্রমাণ করে যে বসত গ্রামগুলির বাইরে বর্ণব্যবস্থার একটা স্বাভাবিক নমনীয়তা ছিল।

ময়ূরশর্মনের বীরগাথা তাৎপর্য অর্জন করেছে[১২] মধ্যযুগের শেষভাগে লেখা *স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডের* একটি বিবৃতি থেকে—যেখানে বলা হয় যে গোয়ায় নিজের রাজ্যে বসতি স্থাপনের জন্য তিনি উত্তরাঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণদের আনিয়েছিলেন। কন্নড়ের হব্বু-দের অনুরূপ ঐতিহ্য রয়েছে (এনথ্রোভেন, ২.২৫২), কিন্তু তারা সংখ্যায় এত কম এবং ময়ূরশর্মনের এত পরে (হব্বু-রা অষ্টম শতাব্দীতে সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে দাবি করেন) যে মনে হয়, স্থানীয় 'ব্রাহ্মণদের' কোন উত্তরাঞ্চলীয় উৎসজাত বলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার এটা আর একটা ঘটনা। অসংখ্য স্থানিক গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় গত আদমসুমারি থেকেও (১৯৪১)—যেখানে জাতপাতের উল্লেখ করা হয়েছিল। বোম্বাই রাজ্যের আদমসুমারি থেকে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণরা প্রধান প্রধান গোষ্ঠীর (দেশস্থ, সারস্বত, চিৎপাবন, হবিক, নাগর) কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নয় এবং কোন একটি একক গোষ্ঠীতে সংখ্যায় ৯০০০-এর চেয়ে অনেক কম, যদিও সব গোষ্ঠীতে মিলে সংখ্যাটা নিশ্চিতই অনেক বেশি (এনথ্রোভার ১.২১৩ পরবর্তীতে গোষ্ঠীগুলির বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য)। অল্প কিছু গোষ্ঠীর উৎপত্তি অ-ভারতীয়দের থেকেও হয়ে থাকতে পারে (*ইন্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুইটি* ৪০, ১৯১১.৭-৩৭)। এটা অন্ততপক্ষে এটুকু প্রমাণ করে যে, তত্ত্বে এবং গ্রামীণ ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে ছাড়া বর্ণপ্রথা কখনই অপরিবর্তনীয় কিছু ছিল না। গোয়ার প্রচলিত কাহিনী সত্যি বলে মনে হয়, কেননা সাধারণভাবে ব্রাহ্মণদের বিশ্বাস, এই বসতিস্থাপন করেছিলেন পৌরাণিক কাহিনীর পরশুরাম; তিনি ন্যূনপক্ষে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার পর সমুদ্র থেকে নতুন দেশ (কোঙ্কন) সৃষ্টি করেছিলেন। কদম্ব-রা একাদশ শতাব্দী ও তার পর থেকে গোয়ায় পরিচিত, কিন্তু সারস্বত ব্রাহ্মণরা—যারা এক অদ্ভুত ব্যবস্থা অনুযায়ী গোয়ার সেরা জমিগুলি এখনও ভোগদখল করে—তারাও কোন কদম্ব শাসকের কথা, বা নিছক লোকগল্প ছাড়া ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেকার কোন পারিবারিক প্রথার কথা মনে করতে পারে না। উত্তর থেকে, যথা কনৌজ থেকে দ্বিতীয়বারের (১০ ম শতাব্দী) অভিবাসন সম্পর্কে

কিছু কথা শোনা যায়। গোয়ার সারস্বতদের সবচেয়ে বড় দেবতা হলেন মঙ্গেশ বা মাঙ্গিরীশ—আপাতভাবে যাঁকে বিহারের 'মুঙ্গেরের দেবতা' বলে মনে হয়; মূল বিগ্রহটি ছিল একটি শিবলিঙ্গ, (মাধবাচার্যের বৈষ্ণব সংস্কারের পর) দেবতার মুখের একটি স্বর্ণ-নির্মিত মুখোশ তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। *সহ্যাদ্রি-খণ্ড* তে উল্লিখিত গ্রামগুলি এখনও আছে এবং খুব সহজেই সেগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।* উল্লিখিত প্রাচীন মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষগুলিও যথাস্থানেই রয়েছে।

ময়ূরশর্মনের দান করা সাপ ও বাঘে ভরা গভীর, পথহীন, পর্বতসঙ্কুল জঙ্গল কেবলমাত্র কঠোর পরিশ্রমী অগ্রগামীদের পক্ষেই ছিল উপযুক্ত। পশ্চিম উপকূলের প্রবল বর্ষায় জঙ্গল দ্রুত বাড়ে, এবং মজুর সরবরাহ ছাড়া কোন ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপনকারীর পক্ষেই সেই জঙ্গল পরিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল লক্ষ্যণীয় উপায়ে। মুনাফা ভাগ করে নিয়েছিল যাদের জমি দেওয়া হয়েছিল সেই ব্রাহ্মণরা এবং জমিতে নিযুক্ত প্রকৃত মজুররা। এই মজুরদের নেওয়া হয়েছিল আদিবাসী গাবড়া (যারা এখনও একাধারে জাত ও উপজাতি)-দের মধ্য থেকে; সঙ্গে অল্প কিছু কুণবি এবং অন্যান্য নিম্নবর্ণীয় কৃষক—যাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যটা হল, ভূমি-দানের সময় তারা হয়ে গিয়েছিল *কুটুম্বিন* বসতিস্থাপনকারী। অন্যদিকে, গাবড়ারা তখনও ছিল চাষের জমিতে স্থায়ী অধিকারহীন উপজাতি। ব্রাহ্মণরা অল্প কিছু কায়িক শ্রম করত। সামান্য একটু মাটি খুঁড়তো, মজা পাওয়ার জন্যে হাল ধরত, বা ভাড়াটে মজুরের অভাব পূরণ করত। কিন্তু বর্ণসূত্রে, জীবনধারণের জন্য এই ধরনের শ্রম তারা নিয়মিত করতে পারত না। তাদের দু'টি কর্তব্য ছিল : বেদ পাঠ করা ও শিক্ষা দেওয়া, নিজের জন্য ও অপরের জন্য পূজার্চনা, দান গ্রহণ ও প্রদান করা। এর মধ্যে তিনটি সক্রিয় কর্তব্য—বেদ শিক্ষা দেওয়া, অপরের জন্য পূজার্চনা, এবং দক্ষিণা গ্রহণ বাস্তবে বিলুপ্ত হয় জমির মালিকের জীবনযাপন করার ফলে; গোয়ার সারস্বতদের নিজেদের এই সব কাজ শেষ পর্যন্ত করে দিত করহাড়া-র মতো অন্য গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণরা। এই সব কাজ খোয়াতে সারস্বতদের সাহায্য করেছে মাছ ও শিকার করা পশুমাংস খাওয়ার নিয়মিত অভ্যাস—যার জন্য অবশ্য তাদের জাত খোয়াতে হয়নি। তা সত্ত্বেও, বিদ্যাচর্চার ঐতিহ্যটা থেকে গিয়েছিল; আর, বড় বড় পাঁচটি মন্দিরে নিয়মিত পূজার্চনার জন্য পুরোহিতের পদটিও সারস্বত ব্রাহ্মণরা নিজেদের হাতেই রেখেছিল, কেননা মন্দিরের সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করাটা ছিল খুবই লাভজনক।

* আমি নিজে কিছু দিনের জন্য সানকোয়ালে (*শঙ্খাবলী*)-তে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা খামার বাড়ি কিনেছিলাম—আগে একসময় যেখানে মন্দিরের নর্তকীরা থাকত। বুজে যাওয়া পুরনো কূপগুলির চওড়া বাঁধানো পাড় দেখলে বোঝা যায় যে জায়গাটা একসময় ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। বিগ্রহ নিয়ে শোভাযাত্রার অমসৃণ বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি রাস্তাটা এখনও বনের মধ্যে রয়েছে। পর্তুগীজরা মন্দিরটা ধ্বংস করে সেখানে একটি গির্জা নির্মাণ করেছিল। তার পদ্মপুকুরটা এখনও আছে। মন্দিরের খুব পুরনো, বিশাল গোখরো সাপগুলো কখনোসখনো মানুষের চোখের সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোয়। যারা তা দেখে এবং তার চেয়েও বড় কথা, ছোবল না খেয়ে ফিরে আসে তাদের খুবই ভাগ্যবান বলে মনে করা হয়। ১৯৪২ সালেও, বড় দিনের আগের রাতে একটা ফলগাছের ওপর তৈরি মাচায় বসে একটা বাঘিনীকে খামার বাড়ির কাছে মেরে রেখে যাওয়া তার শিকার এক মহিষ-শাবকের কাছে ফিরে যেতে দেখেছি। গির্জার দিক থেকে ভেসে আসত কোঙ্কনি ভাষায় পাদ্রিদের আবেগহীন ধর্মোপদেশ, আর বাড়ির দিক থেকে আমাদের পরিবারের বৃদ্ধ কর্তা আমার কাকার বাজখাঁই দেহাতী ভাষায় বলা শিকারের কাহিনী।

গ্রামের সমস্ত জমি ছিল সামগ্রিকভাবে (ব্রাহ্মণ) সমাজের হাতে। গ্রাম সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হতো সমাজের সভায়, সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপস্থিতিতে। তবে, মজুররাও উপস্থিত থাকত এবং তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়ে আলাপ-আলোচনাও হত, এমনকী যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কোন কথা তারা বলত না। আসল আলোচনা হত প্রবীণদের (বৃহৎ অবিভক্ত পরিবারগুলির প্রধানদের) মধ্যে, এবং সাধারণত তাদের ইচ্ছাই চাপিয়ে দেওয়া হত নবীন সদস্যদের ওপর। সবশেষে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হত সরাসরি ভোট বা সুস্পষ্ট সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে নয়, বরং সভার বিচার-বুদ্ধি অনুসারে; যার ফলে, এমনকী কোন ঝগড়াটে বৃদ্ধ গৃহস্বামী একাই সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দিতে পারত। এরকম একটা কঠিন বাধাকে সভা থেকে সুকৌশলে বাদ দিয়ে দেওয়া হত ঠাট্টার ছলে তাকে এ কথা বলতে বাধ্য করে যে, 'আমার এই কাঠের ছড়িটা (*কোকেম*) আমার প্রতিনিধিত্ব করবে' (যখন সভা বিশেষভাবে ডাকা হত এমন কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যেগুলি সম্পর্কে তার কোন আগ্রহ নেই)। যেহেতু নিজের কথা সে আর ফিরিয়ে নিতে পারত না, তাই বাকি জীবন ছড়িটাই সাফল্যের সঙ্গে তার প্রতিনিধিত্ব করে চলত। গুরুতর জটিলতার সময়, এরকম কোন সভায় পারিবারিক প্রথা, স্থানীয় রীতিনীতি বা দৈববাণীর সাহায্যও নেওয়া হত—এ সবই তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে গেছে।

দেশটা সমুদ্রের কাছে পাহাড়ে ভরা এলাকা। খাদ্য উৎপাদনের প্রধান জমিগুলি রয়েছে উপত্যকার নিচের দিকে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিবিড় চাষের ফলে মেঝের মতো সমতল হয়ে গেছে। এখানে মূল বনভূমি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, উপত্যকার স্রোতস্বিনী এখন ক্ষীণস্রোতা। ধান-ই এখানকার জমির একমাত্র শস্য। জল যাতে জমতে না পারে তার জন্য জলধারাকে এমন হারে প্রবাহিত হতে দেওয়া হয় যাতে জলস্তর ধান চাষের উপযোগী অবস্থায় থাকে। তাছাড়াও, জোয়ারের সময় নদীর মোহানা থেকে নোনা জল জমিতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এর অর্থ, জলস্রোত রোধ করার জন্য বাঁধ নির্মাণ (বিশেষ করে সমুদ্র-চরের *খাজন* জমির জন্য) এবং তার নিয়মিত মেরামত; তাছাড়া কাঠের তৈরি শক্ত ফ্লাড-গেটগুলিও ছিল—যেগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটগুলি জোয়ারের সময় আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যেত, আবার ভাঁটার সময় ভিতরের নদীর জলের চাপে খুলে যেত। বড় ফ্লাড-গেটগুলি খোলা ও বন্ধ করার জন্যে গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এক বা একাধিক বেতনভোগী কর্মী নিয়োগ করা হত। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি নদীতে তৈরি করা হত অস্থায়ী মাটির বাঁধ। বর্ষার পরে রাস্তা গড়ে প্রায় ১০০ ইঞ্চি চওড়া করে মেরামত করা হত চার মাসের মধ্যে। অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে খরচও ছিল—যেমন, মন্দিরের খরচ, ছুতোর, নাপিত, কুলি, কামার ও অন্য যেসব কারিগর সামগ্রিক বিচারে সমাজের জন্য কাজ করত তাদের খরচ। তাই, উপত্যকার নিচের দিকের সেরা জমিগুলি সমাজের সদস্যদের মধ্যে স্থায়ীভাবে ভাগ না করে দিয়ে সমষ্টিগত মালিকানায় রাখা হত। দ্বিতীয় স্তরের জমিগুলিকে এ থেকে পৃথক করা হত তিন থেকে দশ ফুট উঁচু পাথরের বাঁধ দিয়ে (যা নির্মাণ করত সমাজ নিযুক্ত সবেতন মজুররা)। এই বাঁধের ওপর দিয়েই রাস্তা চলে যেত, এবং বাড়িঘরও তৈরি করা হত সেই সমতলে। বাড়িঘরের পিছনে ছিল পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় জমিও ছিল আবার সাধারণভাবে সকলের সম্পত্তি—পশুচারণ ও জ্বালানি সংগ্রহের জন্য। মাল বহনের প্রাচীনতম পথগুলি এখনো খুঁজে পাওয়া যায় মাইলখানেক অন্তর অন্তর মাথার মালপত্র নামিয়ে রাখার জন্য তৈরি জায়গা এবং কোথাও কোথাও, পাথরের বুকের ওপর দিয়ে শতাব্দীর পর

শতাব্দী অনাবৃত পায়ে হেঁটে চলার ফলে সৃষ্ট কয়েক ইঞ্চি গভীর পথরেখা থেকে; এইসব পথ পাহাড়ের চূড়া হয়ে যেত, আর তা পরিষ্কার রাখাও ছিল সব থেকে সহজ। বাকি জমি যৌথ পরিবারগুলিকে দেওয়া হত চাষ করার জন্যে। মজুর পরিবারগুলি বন কেটে ও পুড়িয়ে *কুম্তের* প্রথায় নাচণী (***Elensine Coracana***) চাষের জন্য এক জমি থেকে আরেক জমিতে সরে সরে যেত; পাহাড়ের ঢাল-এও তারা চাষ করত। কখনও কখনও পাহাড়ের ওপরের সমতল ছোট ছোট জমিও তারা সমাজের কাছ থেকে ইজারা নিতে পারত। কঠিন পরিশ্রম করে মাটি বয়ে নিয়ে এসে এই সব জমিতে মাটির পাতলা একটা আস্তরণ ফেলে লাভজনক ভাবে তারা চাষ করত— কেননা সমুদ্র থেকে পাওয়া লবণ ও মাছের সঙ্গে ছাই মিশিয়ে সার তৈরি করা হত।

ব্রাহ্মণ পরিবারগুলিকে পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন মাপের জমি দেওয়া হত এবং তারা মালিক হিসেবে সেই জমির বনহাসিল বা বাড়িঘর ও খামার তৈরি করতে পারত। এটা মাথায় রাখা অত্যন্ত দরকার যে, এই সব খামারের অর্থ হল প্রথম বসতি স্থাপনের সময় থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্য উৎপাদন হত এবং সে সব বিনিময় করা হত গোষ্ঠীর বাইরেও। প্রধান রপ্তানি সামগ্রী ছিল নারকেল (ও তার উপজাত সামগ্রী) এবং সমুদ্র উপকূলে তৈরি লবণ। এই রপ্তানির আয় থেকে প্রধান আমদানিগুলি ছিল : বস্ত্র, ধাতু, এমনকী কখনো কখনো খাদ্যশস্যও। নারকেলের চিরাচরিত ব্যবহার নিঃসন্দেহে শুরু হয়েছিল চাষবাস শুরু হওয়ার সময় থেকেই এবং পূজার্চনায় এর সার্বজনীন ব্যবহার এখনও আছে, তা সত্ত্বেও প্রাচীন নথিপত্রে এর প্রথম উল্লেখ কোথায় আছে তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ইবন বতুতা কী লিখেছেন দেখা যাক ঃ

"নারকেল গাছ সবচেয়ে অদ্ভুত গাছগুলোর একটা, এবং দেখতে ঠিক খেঁজুর গাছের মতো। নারকেলের খোলটা দেখতে অনেকটা মানুষের মাথার মতো, কেননা তাতে রয়েছে মানুষের চোখ ও মুখের মতো দাগ, আর শাঁস কাঁচা অবস্থায় ঘিলুর মতো। এতে আছে চুলের মতো ছোবড়া, তা দিয়ে এরা দড়ি তৈরি করে, আর এই দড়ি গজালের বদলে ব্যবহার করে নৌকাগুলিকে একসাথে বেঁধে রাখার কাজে। কাছি হিসেবেও এর ব্যবহার হয়। নারকেলের গুণাবলীর মধ্যে হলো তা দেহকে শক্তিশালী ও মেদযুক্ত করে, মুখে লালচে আভা এনে দেয়। কাঁচা অবস্থায় কাটলে যে পানীয় পাওয়া যায় তা সুস্বাদু, মিষ্টি ও বিশুদ্ধ। পান করার পর লোকে খোলার একটু অংশ কেটে নিয়ে চামচের মতো তৈরি করে তা দিয়ে খোলের ভিতরের শাঁস বের করে খায়। এর স্বাদ অনেকটা আধসিদ্ধ ডিমের মতো, এবং তা পুষ্টিকর। মালদ্বীপে থাকার সময় দেড় বছর ধরে আমি এই খেয়ে থেকেছি (বতুতা, ২৪২, সঙ্গে থাকত শুঁটকি মাছ; দ্রষ্টব্য, বিল ২.২৫২)। এর আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, এ থেকে তেল, দুধ ও গুড় নিষ্কাশন করা যায়। গুড় তৈরি করা হয় এইভাবে। যে বৃন্তের ওপর ফলটি ফলে তার একটা দু'আঙুল লম্বা করে কেটে তাতে বেঁধে দেয় ছোট একটা কলসি। সেই কলসি-তে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ে। সকালবেলায় যদি তা বাঁধা হয় তাহলে বিকেল বেলায় একজন চাকর দুটি কলসি নিয়ে গাছে ওঠে, একটা ভরা থাকে জলে। জমে ওঠা রস আর একটা কলসিতে ঢেলে, বৃন্তটি জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে সামান্য একটু কেটে দেয়। তারপর তাতে বেঁধে দেয় আর একটা কলসি। একই কাজের পুনরাবৃত্তি হয় পরদিন সকালে—যতক্ষণ না পর্যাপ্ত পরিমাণে রস সংগৃহীত হয়। তারপর তা জ্বাল দিতে থাকা হয় ঘন না হওয়া পর্যন্ত। এতে তৈরি হয় চমৎকার গুড়। সেই গুড় কেনে ভারত, ইয়েমেন ও চীনের বণিকরা। তারপর দেশে নিয়ে গিয়ে তারা তা থেকে তৈরি করে মিঠাই। দুধ তৈরি করা হয় নারকেলের শাঁস জলে মিশিয়ে। এর রঙ ও স্বাদ ঠিক দুধের মতো হয়

এবং খাওয়া হয় খাবারের সঙ্গে। তেল তৈরির জন্যে, ঝুনো নারকেলের শাঁস শক্ত খোলা থেকে ছাড়িয়ে রোদে শুকিয়ে বড় কড়াই-তে জ্বাল দিয়ে তেল বের করা হয়। এই তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো আর লুচি ভাজা হয়, আর মেয়েরা তাদের চুলে মাখে।' (বতুতা ১১৪-৫)

এই ধ্রুপদী বর্ণনার সঙ্গে আরও কয়েকটি উৎপাদন যোগ করতে হবে—যেমন, খোলা থেকে কাঠকয়লা, রস থেকে চিনি ও মদ, ছোবড়া থেকে রেশমের মতো বিরল এক ধরনের বস্ত্র ('দি ইটিনেরারি অফ লুডোভিকো ভরথেমা অফ বোলোগনা' ৬৫-৬৬), এবং পাতা ও কান্ড দিয়ে তৈরি ছাউনি ও বাড়ি, মাছ ধরার ডিঙ্গি নৌকো, পাল খাটানোর দন্ড ইত্যাদি।

এই ভূস্বামীরা উপত্যকার ধান-উৎপাদনের জমি তিন বছরের জন্য জমায় নিতে নিলামে দর হাঁকত। তারপর ভাগে চাষ করত, বা কদাচিৎ মজুরীতে; প্রকৃত চাষী—যারা কেবলমাত্র শ্রম দিত, কিন্তু যন্ত্রপাতি, বীজ, পরিকল্পনা, তদারকি ও পরিবহণের দায়িত্ব যাদের থাকত না—তাদের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে। এ নিয়ে এই সেদিন পর্যন্তও তেমন কোন কঠিন প্রতিযোগিতা ছিল না। নিলামের লাভ প্রথমে খরচ করা হত সমষ্টির প্রয়োজনে—বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণের কাজে। প্রায়শই কোন অতিরিক্ত আদায় নেওয়া হত, যেমন প্রত্যেক ব্রাহ্মণের জন্য একটা নির্দিষ্ট ভাগ—যা পরবর্তীকালে পুনঃহস্তান্তর বা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া যেতে পারত। এ সবের পর ওই উদ্যোগে যদি লোকসান হত তাহলে তার দায়ভার মোটামুটিভাবে স্বত্বপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ অনুপাতে ভূস্বামীদের বহন করতে হত। হামেশাই যেমন হত, তেমন মুনাফা হলে—তা ভাগ করে নেওয়া হত মজুর পরিবারগুলি ও জমির অংশীদারদের মধ্যে; মজুররা পেত দুই-তৃতীয়াংশ, আর মালিকরা এক-তৃতীয়াংশ; পরে আবার তা ভাগ করা হত প্রতিটি পরিবারের অংশীদারিত্বের সংখ্যার অনুপাতে। মজুর-শ্রেণীর অংশ নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুনর্বিভাজিত হত পরিবারের শ্রমিক-সংখ্যা অনুযায়ী। কিছু কিছু জমির, যেমন সমুদ্র কিংবা নদীর মোহানা থেকে উদ্ধার করা *খাজন* জমি ইজারা দেওয়া হত নয় বা আরো বেশি বছরের জন্য, কেননা এই জমিতে বেশি পুঁজি খরচ করতে হত। এই ধরনের ইজারা সাধারণভাবে সমাজের কাছ থেকে নিত পারস্পরিক মতৈক্যের ভিত্তিতে লভ্যাংশের ভাগীদার অনেক মজুর নিয়ে গঠিত অস্থায়ী সমিতিগুলি—যা অনেকটা প্রাচীন 'গোষ্ঠী'-র মতো। এ সব কিছুতে স্থানিক রীতি প্রথা অনুযায়ী কিছু কিছু তফাত অবশ্যই থাকত।

এই সব স্বশাসিত গ্রাম-সংঘের (village commune) পরবর্তী বিকাশগুলি লক্ষ্য করাটাও জরুরি। গোয়া দ্বীপে (*তিসুয়ারি*) ব্রাহ্মণ-বসতির সংখ্যা ছিল তিরিশটি, সলচেতে ছিল ছেষট্টিটি—নাম এবং পরম্পরা উভয় দিক থেকেই যার প্রমাণ পাওয়া গেছে। একইভাবে, স্বভাবতই নিকৃষ্ট পড়ে থাকা জমিতে গড়ে উঠেছিল অব্রাহ্মণ-জনবসতি। রাজত্বগুলির চরিত্র পরিবর্তন ও ক্রমবর্ধমান যুদ্ধবিগ্রহের অর্থই ছিল কোন না কোন ধরনের করের বোঝা চাপা, কেননা গ্রাম-সংঘগুলির—তা সে ব্রাহ্মণ বা অন্য বর্ণ, যারই হোক না কেন—অধীন কোন সশস্ত্র বাহিনী ছিল না। এমনকী কতকগুলো গুরুতর অপরাধের জন্যও কেবলমাত্র তাড়িয়ে দিয়ে অথবা রাজাকে দিয়ে শাস্তি দেওয়ানো হত। ধারাবাহিকভাবে বিজিত হবার ফলে প্রত্যেকবারই পূর্ববর্তী প্রদেয় করের চেয়ে বেশি কিছু দিতে হত, জমি থেকে কর আদায়ও ক্রমশ বাড়ত। ১৮৮০-র দশক পর্যন্ত এই কর দিতে হত প্রধানত ফসলে—যতদিন পর্যন্ত না সরকারের প্রয়োজনে নগদ

অর্থে রূপান্তরিত করার জন্য সেই ফসলকে নিলামে তোলা হত। সঙ্ঘের জমিতে মুসলমানরা প্রথম হানা দেয় ১৩১০ খৃ. নাগাদ মালিক কাফুরের নেতৃত্বে এবং তা অল্প কিছু দিনের জন্য হাসান গঙ্গু বাহমনি-র অধীনস্থ হয়। পরে এই অঞ্চল সম্ভবত বিজয়নগরের নিয়ন্ত্রণে যায়। প্রায় এই সময় নাগাদই এখানে আবির্ভাব ঘটে সেনাবাহিনীর, এবং প্রতিরক্ষার কাজে তা কার্যকর হোক বা না হোক, তার জন্য কর দিতে হত। প্রকৃত মুসলিম বিজয় (১৪৭০-এ মহম্মদ গাওয়ান-এর আক্রমণকে সংহত করে) ঘটেছিল ১৪৮২-তে ইউসুফ আদিল শাহ-র নেতৃত্বে। মুসলমানরা অবিলম্বে কয়েকজন ভূস্বামীকে গ্রামগুলির সামন্ততান্ত্রিক সামরিক শাসক নিযুক্ত করে তাদের *দেশাই* খেতাব দান করে; এখন তা একটা পদবী। বেছে নেওয়া এই অল্প কিছু লোকের সেই প্রথম অধিকার ও কর্তব্য হল পারিশ্রমিক দিয়ে সশস্ত্র কর্মী নিয়োগ করা—যারা প্রয়োজনে উচ্চতর সামন্তপ্রভুর সেবা করবে, কিন্তু কর আদায় করাই তাদের প্রধান কাজ। ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক একধর্মিতা নব্য দেশাই-দের প্রত্যক্ষ নিপীড়নের হাত থেকে তাদের সহ-ভূস্বামীদের রক্ষা করতে পারল না। পরম্পরা থেকে বোঝা যায় কেউ কেউ প্রতিবেশীদের বশে আনার জন্য চাকরবাকরের বা আস্তাবলের কাজ করতে বাধ্য করত। সঙ্ঘগুলি এমনকী একে অপরের জমি পর্যন্ত দখল করতে শুরু করল, এবং তাদের মধ্যেকার যে একমাত্র মারাত্মক সশস্ত্র সংঘর্ষটির কথা জানা যায় তা ঘটেছিল এই চল্লিশ বছর সময়কালের মধ্যেই।

পর্তুগীজরা তিসুয়ারি দ্বীপ দখল করে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে। ভাল ভাল জাহাজ ও গোলাবারুদ আছে কিন্তু স্থায়ী সেনাঘাঁটি রাখার মতো খুব বেশি জনবল নেই এমন এক নৌ-শক্তির পক্ষে (ম্যাকাও, বোম্বাই, দিউর মতোই) এই দ্বীপটি দখলে রাখা সম্ভব ছিল। মুসলমানদের বিতাড়িত করা হয় ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে। এদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ আলফন্‌সো ডি আলবুকার্ক-কে সাহায্য করেছিল স্থানীয় মানুষেরা। পুরস্কার হিসেবে, সঙ্ঘগুলির পুরনো অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ও তা সুনিশ্চিত করা হয়; তবে, এই শর্তে যে তাদের ওপর চাপানো সমস্ত কর দিতে হবে, এমনকী মুসলমানরা যেসব কর চাপিয়ে গিয়েছিল সেগুলিও। এই পরিস্থিতিই গোয়ার গ্রামসংঘগুলিকে, অন্তত বাহ্যিকভাবেও, টিকে থাকতে সাহায্য করেছে। জেসুইট-রা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে অনেক নতুন গাছ এনে লাগিয়েছিল। এগুলির মধ্যে কাজু (বাদাম) ছিল সবচেয়ে মূল্যবান অর্থকরী ফসল, যদিও এর পুষ্পোদ্‌গমজাত পার্শ্ব উৎপাদন (যা কখনই ঠিকমতো ব্যবহার করা হয়নি) গুল্ম ধ্বংস করে এবং জলস্তরকে যথেষ্ট নামিয়ে দেয়। আনারস কখনই পর্যাপ্ত পরিমাণে চাষ করা হয়নি এবং আলু, পেয়ারা ও আতা (সীতা-ফল) গোয়ার বাইরে ভাল ফলেছে। প্রায় একইসময়ে (১৫৭৫ খ্রী.) সেই একই সক্রিয় জেসুইটরা প্রণালীবদ্ধভাবে আমের কলম কাটতে শুরু করে এবং তা শুধু এই ভারতীয় ফলটির অভাবনীয় উন্নতি ঘটাতেই সাহায্য করেনি, গোটা ভারতের ফল-চাষীদের জন্য আয়ের একটা উৎসও সৃষ্টি করেছে। পর্তুগীজরা অসংখ্য বিশেষ কর আরোপ করেছিল। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে জেসুইট-রা বিতাড়িত হওয়া পর্যন্ত পর্তুগীজরা জোর করে ধর্মান্তরিত করেছে, ধ্বংস করেছে একের পর এক মন্দির। ফলে অনেক ভূস্বামী পালিয়ে গিয়েছিল অন্য জায়গায়। পারিবারিক জমি রক্ষা করার জন্য যারা থেকে গিয়েছিল তারা সৃষ্টি করেছিল এক অদ্ভুত জিনিস—গোয়ার 'ব্রাহ্মণ-খ্রীষ্টান'। তারা এখনো আদি ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে তাদের *জোনো* অংশ নেয়, আর তাদের মহিলারা (অন্য খ্রীষ্টানদের মতোই) এখনো গোপনে হিন্দু দেবদেবীর ব্রত ও পূজার্চনা করে। বাণিজ্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি

অনেক আগেই গোয়ার কিছু কিছু ব্রাহ্মণকে ব্যবসার দিকে ঠেলে দিয়েছিল; অনেকে পেশোয়াদের অধীনে অভিজাত সামন্ত হওয়ার জন্য গোয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সংঘগুলির বিলুপ্তি ঘটেছিল মূলত পর্তুগীজ আইনের জন্য—যাতে জমি হস্তান্তর না করেই ফসলের অংশ হস্তান্তরের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ, সংঘগুলিতে প্রচলিত ভোটদানের ক্ষমতা সেই সমস্ত মানুষদের হাতে রয়ে যাওয়া—যারা (এমনকী সুদূর পূর্ব-আফ্রিকায় বসবাস করত) সবচেয়ে বেশি মুনাফা অর্জনেই শুধু আগ্রহী, স্থানীয় এলাকার উন্নতি হল কি হল না তাতে তাদের কিছু এসে যায় না। গোষ্ঠীগত সম্পত্তিকে বুর্জোয়া সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করতে গিয়ে সাময়িক ভাবে উপত্যকার জমি বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তার পরিমাণও ছিল খুব কম। এর পর থেকে দেশান্তরী শ্রমিকদের পাঠানো টাকায় আমদানি করা খাদ্যসামগ্রীই ছিল গোয়ার মানুষদের প্রধান ভরসা।

৯.৭ গুপ্তযুগের চমৎকার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে যতটা পাওয়া যায় তাব চেয়ে বেশি পাওয়া যায় কুতুব মিনারের সামনে চন্দ্র (সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত)-র মেহরাউলি লৌহস্তম্ভে। হাতে ঢালাই করা এই স্তম্ভটি প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ক্ষতিকর জলহাওয়ায় থাকা সত্ত্বেও তাতে মরচে পড়েনি।* এটি যে কোন দেশের এবং ইতিহাসের যে কোন কালপর্বের পক্ষেই একটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতি-স্তম্ভ। শ্রমিক-শ্রেণীর উদ্ভবের বিষয়টি এখনো খতিয়ে দেখা হয়নি। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সময়ের তুলনায় কারিগর-সংঘগুলি দুর্বল হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। বিখ্যাত মন্দসর খোদাইয়ে (ফ্লিট ১৮) এক কারিগর-সংঘের কাজকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে—যারা বিলাসসামগ্রীর বাণিজ্যের জন্য রেশম বস্ত্র ও মিহি কাপড় বুনত। ৪৭৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে (গুপ্তযুগে নয়, মালব-গণ যুগে) লাত (গুজরাট) থেকে আসা এই তন্তুবায়-সংঘ ছিল যথেষ্টই ধনী। এরা এখানে আসার ৩৬ বছর আগে নিজেদের নির্মিত ও বৃত্তিপ্রদত্ত সূর্য-দেবতার মন্দির শুধু মেরামতই করত না, সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জনৈক বৎসভট্টি একটি বিশদ সংস্কৃত কাব্যও রচনা করেছিলেন। বৎসভট্টি-র সভাকবিসুলভ রচনাশৈলী এবং কালিদাসের লেখার দুটি পরিচিত স্তবকের সুস্পষ্ট নকল ঘটনাক্রমে কালিদাস কোন্ সময়ের মানুষ ছিলেন সেই রহস্য সমাধানের একমাত্র সূত্র যোগাচ্ছে। তন্তুবায়-সংঘ ('শ্রেণী')-এর সদস্যদের যুদ্ধে এবং সংস্কৃতিমূলক সমস্ত শিল্পকলা, বিজ্ঞান, ধর্ম, জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী বলে বর্ণনা করা হয়েছে; পূর্ববর্ণিত অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র তৈরিতে তাদের দক্ষতার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফ্লিট ১৬-তে তিলিদের একটি সংঘের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যার নেতা ছিলেন জনৈক জীবন্ত। এই সংঘ আর একটি সূর্য-মন্দিরের (বাতি জ্বালানোব তেলের জন্য) স্থায়ী ভাতা হিসেবে একটা আমানত পেয়েছিল; এমনকী, সংঘটি স্থানান্তরে গেলেও এই ভাতা পেত। সমসাময়িক খোদাইগুলিতে বর্ণিত এটাই সম্ভবত একমাত্র সংঘ যারা সাধারণ মানুষের জন্যে কোন সামগ্রী উৎপাদন করত। সাধারণভাবে 'শ্রেণী'গুলি বিলুপ্ত হয়েছিল, তার জায়গায় প্রয়োজনে গঠিত হচ্ছিল আর এক ধরনের জোট, তথা 'গোষ্ঠী' (যেমন, *এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ২৭-৩২; ৬৪৩ খ্রী.) — যা সীমিত সময়ের জন্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে; জাতপাত কিংবা জ্ঞাতিত্বের বন্ধন সেখানে ছিল না। যেমন, রাজ্য বর্মলাত (৬২৫ খ্রী.; তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কবি মাঘ-এর

---

* ধার-এ একটি লৌহস্তম্ভ (*জার্নাল অফ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি* ১৮৯৮, ১৪৩-৪) ১৮৯৮-তে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়; এটি সম্ভবত একাদশ শতাব্দীব।

পিতামহ)-এর সময়ের বসন্তগড় ফলকে (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ৯.১৮৭-১৯২) দেবী ক্ষেমার্য (দুর্গার স্থানিক নাম)-র একটি মন্দির স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এটি নির্মাণ করেছিল একটি 'গোষ্ঠী', যার প্রায় চল্লিশ জন সদস্য খোদাইটিতে স্বাক্ষর করেছে। এদের নামগুলি থেকে বোঝা যায় যে এরা জ্ঞাতি-সম্পর্কিত ছিল না। এদের একজন, বোতক, নিজেকে জোর দিয়ে প্রতিহার বলে বর্ণনা করেছেন; পরবর্তীকালে কনৌজের রাজাদের প্রতিহার বলা হলেও এখানে আজও বিদ্যমান রাজস্থানী পড়িয়ার জাত-ই বোঝানো হয়েছে। শেষ স্বাক্ষরকারিণী হলেন গণিকা (মন্দির-নর্তকী, এবং সেই কারণেই বেশ্যা) বৃতস। 'গোষ্ঠী' রীতির বহুল প্রচলন ঘটেছিল, আর তাই দ্বাদশ শতাব্দীর 'রাণক' (অধিকৃত অঞ্চলের অধিপতি) শূলপাণিকেও বর্ণনা করা হয়েছে প্রস্তর খোদাইকারীদের 'গিষ্ঠী'-র প্রধান হিসেবে; এর সঙ্গে তাঁর নিশ্চিতই কোন বর্ণগত সম্পর্ক ছিল না। তিনি (সম্ভবত অপেশাদার শিল্পী হিসেবে) বিজয়সেনের দেবপাড়া (বাংলা) প্রশস্তি খোদাই করেছিলেন (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা,* ১.৩০৫-১৫)।

'গোষ্ঠী'-র শব্দপ্রকরণ 'গোত্র'-রই মতো। এর সদস্যরা যে বিত্তের অধিকারী ছিল তা দেখা যায় সাঁচিতে দানের তালিকায় (মার্শাল-ফুচার ৯৬-৮, ১৭৮ ল্যুডার্স ২৭৩), ৭৯৩; ভট্টিপ্রোলু-তে ল্যুডার্স ১৩৩২, ১৩৩৫)। বণিক সমিতিগুলির উদ্ভব ও বিকাশ ছিল আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ (*জার্নাল অফ দি সোস্যাল অ্যান্ড ইকনমিক হিস্টরি অফ দি ওরিয়েন্ট* ২.২)। কার্লে-র (স্তম্ভ ১১) ধেনুকাকতনের 'বাণিজ্য-গাম' থেকে দন্ডিনের *দশকুমারচরিত*-এর 'বনিজ গ্রাম' শেষ পর্যন্ত পরিণত হল দাক্ষিণাত্যের 'মণি-গ্রামম' বণিক সমিতিতে। একসময়, রাজারা এই ধরনের সমিতিগুলিকে আলাদা আলাদা অধিকার সনদ দিত, যদিও কখনওই কোন রাজধানীতে তা দেওয়া হত না। সাধারণত সে জায়গাগুলি হত পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের কোন কেন্দ্র এবং অধিকার-সনদ থেকে বণিকরা সেখানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও ছাড় পেত (*করপাস ইনস্ক্রিপসনাম ইন্ডিকারাম* ৪র্থ, ১৫৮; *এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ৩০.১৬৩-৮১, নিকৃষ্ট অনুবাদ)। বণিকসম্প্রদায়ের মর্যাদা বেড়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে এই কেন্দ্রগুলিকে গ্রাম না বলে নগর বলা হত এবং তারা সনদ-নির্দিষ্ট এলাকায় নাগরিক পৌরসভা হিসেবে কাজ চালাত। পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত তাদের নিয়ন্ত্রণ পরিষদ অধীনস্থ এলাকার সম্পত্তি স্থায়ীভাবে ন্যায়াধীন করার দলিল ও দান সমেত সমস্ত বাণিজ্যিক লেনদেন সুনিশ্চিত করত। এই 'পঞ্চ-মন্ডলী'-র সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় সাঁচিতে সেনাপতি আম্রকারদ্দভ-র দানগুলিতে (ফ্লিট ৫)। নিচে থেকে সামন্ততন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই বণিকদের আইনে, এমনকী রাজার কাছ থেকে দান হিসেবে পাওয়া এক ব্রাহ্মণের জমি, বন্ধকী বাজেয়াপ্তকরণ বলে, জনৈক রাণক অভিজাতকে হস্তান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে (*করপাস ইনস্ক্রিপসনাম ইন্ডিকারাম* ৪র্থ, ৩৬৯-৭৪, ১২১২ খ্রী.)। ইতিমধ্যে, শক্তিশালী ও বিত্তবান কারিগরদের নিয়ে গঠিত সংঘগুলি—যারা একসময় শাতবাহন রাজাদের সঙ্গে সমকক্ষের মতো কারবার করেছে—তারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল। বণিকরা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী শ্রমিকদের সরাসরি অর্থ দিয়ে উৎপাদন করাতে পারত—তবে তা তুলনামূলকভাবে কমই হত। অর্থাৎ,পরস্পরাবিরোধী দুটি প্রবণতা ছিল এবং তাদের প্রকৃত প্রভাবটা খতিয়ে দেখা দরকার : মোট পরিমাণের দিক থেকে পণ্য-উৎপাদন বেড়েছিল, যদিও মাথাপিছু পণ্য উৎপাদনের হার ছিল কম। ইউরোপ ও ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এটাই। চীনে হং বণিকদের ছেঁটে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু উৎপাদক

বা শ্রমিকদের সংঘগুলিকে ধ্বংস করা হয়নি; প্রাদেশিক সমিতিগুলিতে যারা বণিক নয় তারাও অংশ নিতে পারত (ডি. জে. ম্যাকগোয়ান, *জার্নাল অফ দি নর্থ চায়না ব্রাঞ্চ অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি,* সাংহাই ১৮৮৯ পৃ. ১৩৩-১৯২)। এটা ভারতের চেয়ে ব্যাপক ভিত্তি যুগিয়েছিল।

পণ্য-উৎপাদনের নিবিড়তা কমতে থাকার এই অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ গ্রামের মৌলিক প্রয়োগগত সমস্যাগুলিকে অমীমাংসিত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল। মূল শ্রমের যোগান অর্থাৎ কৃষিশ্রমিক সরবরাহটা সুনিশ্চিত ছিল। উপজাতিভুক্ত মানুষদের মধ্য থেকে 'কুণবী' কৃষকদের উদ্ভব এবং তারা বিভিন্ন জাতপাতে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনা সূক্ষ্মতর কৃৎকৌশল আয়ত্ত করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গবাদি পশুর চামড়া ছাড়ানো, তা শুকনো কবা, বা চামড়া দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি—এ সবই ছিল নিচু জাতের কাজ, সে কারণে খুব কম লোকই তা করতে পারত। উপজাতিভুক্ত কিছু লোক হয়ত ঝুড়ি তৈরি করত, কিন্তু কীভাবে কাপড় বুনতে বা সুতো কাটতে হয় তা শিখত না। অন্যদিকে, সব গ্রামই কামার, চামার, বা ঝুড়ি-প্রস্তুতকারকদের পুরো কোন সংঘকে ভরণপোষণের সংস্থান করতে পারত না। অপরিহার্য কর্মপ্রণালীগত এই সমস্যাটা ছিল খুবই জটিল, এবং তার সমাধান না হওয়ার অর্থ—হয় গ্রাম ধ্বংস হওয়া, না-হয় পণ্য-উৎপাদনের পথে যাওয়া।

তাঁতি কিংবা দর্জি গ্রামের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কারিগর ছিল না, কেননা জলবায়ু ও পোশাকের ধরনের জন্যে বস্ত্রের চাহিদা ছিল কম; তাছাড়া, তুলোও সব জায়গায় উৎপন্ন হত না। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কর্মীদের মধ্যে প্রথম ছিল ছুতোর: এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই আমরা গুপ্তযুগে ছুতোরদের জন্য (গ্রামের সার্বজনীন চাষের জমি ও চারণভূমির বাইরে) বিশেষ জমির উল্লেখ দেখতে পাই। ৫৭১-২ খ্রীষ্টাব্দে বলভী (ভাবনগর-এর নিকটবর্তী)-র রাজা দ্বিতীয় ধরসেন জনৈক ব্রাহ্মণকে এই ধরনের একটি ছোট জমি (*বর্ধকি-প্রত্যয়*) দানের কথা উল্লেখ করেছেন (*ফ্লিট* ৩৮)। গুনাইঘরে প্রাপ্ত বিনয়গুপ্ত-র (৫০৬ খ্রী.) ফলকগুলিতে (*ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টারলি,* ৬.৪৫-৬০) গুপ্ত রাজ্যের অপর প্রান্তে এই ধরনের জমির (*বিষ্ণু-বর্ধকি-ক্ষেত্রশ চ*) উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে, সর্বত্রই এর অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা যায়। এই বিশেষ কারিগররা যাতে নিজেরাই চাষ করতে পারে তার জন্যে দেওয়া হত ছোট ছোট জমি। নিবিষ্টভাবে নিজ শিল্পে নিয়োজিত থাকার পক্ষে এই জমি পর্যাপ্ত ছিল না. তাই ভাতাদি সহ বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাব সংস্থান রাখা হয়েছিল এবং প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে তা এখনও নানা রূপের মধ্যে দিয়ে চালু আছে (*বুকানন,* ৩.৪৪৮-৯: *গ্রিয়ারসন* ৭৪-৮০)। এই ধরনের বিশেষ শ্রমিকদেব পুরো গোষ্ঠীকে মহারাষ্ট্রে *অলুতেদার-বলুতেদার*[১৩] বলে অভিহিত করা হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে, ছুতোররা পেত প্রত্যেক কৃষকের ফসলেব প্রায় দুই শতাংশ, এবং 'বীজের জন্য' পেত আধ-থেকে চার সের পর্যন্ত দানা শস্য; বিনিময়ে, তারা বাড়িঘর, কৃষি যন্ত্রপাতি (লাঙলের ফলা বাদ দিলে বাকিটা সবই কাঠের) এবং কুয়োর কাঠামো মেরামত করে দিত। নতুন নির্মাণকার্যেব জন্য দেওয়া হত আলাদা পারিশ্রমিক। কামার পেত ফসলের ১.৭৫ শতাংশ, এবং আধ থেকে দেড় সের 'বীজ' : সে যন্ত্রপাতির লোহার তৈরি অংশ ঠিকঠাক করে দিত; নতুন হালের ফলা, শিকল, ছুরির জন্যে দিতে হত ধাতু ও অতিরিক্ত পারিশ্রমিক। কামার ও ছুতোর উভয়েই নীরস একঘেয়ে কাজের জন্য যেমন. হাপর চালানো, ভারী কাঠের গুঁড়ি বওয়া ইত্যাদি—সহকারী

নিত। গ্রামের কুমোর পেত আধ থেকে এক সের বীজ এবং কৃষকের ফসলের ১.২৫ শতাংশ; সে জল রাখা, পূজার্চনা, রান্না করার জন্যে সাধারণ হাঁড়ি-কলসি-ঘট প্রভৃতির যোগান দিত। কিন্তু বিশেষ বড় পাত্র—যেমন, ফসল মজুত করার পাত্রের জন্য আলাদা পারিশ্রমিক নিত। নাপিতদের সুযোগ-সুবিধা ছিল কম, কেননা সাধারণভাবে তাকে মাসে তিনবার করে একজন পুরুষের ক্ষৌরকার্য করতে হত। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যে যে ধরনের চুলের কারুকাজ দেখা যায় গ্রামবাসীরা সেরকম কেতাদুরস্তভাবে চুল ছাঁটত না, হয় পুরো মাথা নেড়া করত, না-হয় মাথার চাঁদির চুল চেঁছে বিশেষ ধরনের টিকি রাখত। ধোপা, চামার প্রভৃতিদেরও অনুরূপ কাজ ও পারিতোষিক ছিল, এবং তা দেওয়া হত দানাশস্যে, কখনও কখনও বিশেষ জমিতে কিছু কাজ করে। বিভিন্ন জাতের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, এই কারিগররা বিশেষভাবে ঐক্যবদ্ধ একটি গোষ্ঠী গঠন করেছিল এবং তাদের সম্মিলিতভাবে *নারু-কারু* বলা হত। কোন রকম ওজর-আপত্তি, বা বিশেষ পারিশ্রমিক দাবি না করেই তারা একে অপরের কাজ করে দিত, পরস্পরের পাশে দাঁড়াত সবসময়। স্বভাবতই, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিবাহ, পূজা-পার্বণ প্রভৃতিতে এ সব কারিগরের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট কাজ থাকত, এ জন্যে তারা সামান্য পারিতোষিকও পেত। মধ্যযুগে অনুদানের বদান্যতা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণদের দান করার হাত থেকে এরা সম্পূর্ণই রেহাই পেয়েছিল (*এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা* ৫.১১২), অর্থাৎ এই সমস্ত *গ্রাম-কারভঃ*-রা নতুন দানগ্রাহকদের কিছু দিত না, অথচ তাদের আগেকার সমস্ত সুযোগ সুবিধাই বজায় থাকত। যে মূল সমস্যার সমাধান জাতপাত ও শ্রেণী করতে পারেনি, তার সমাধান এভাবেই হয়েছিল। তালিকায় গ্রামের পুরোহিত বলে যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হত সে প্রায়শই ব্রাহ্মণ না হলেও, জ্যোতিষ হত। বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার ঠিক করত স্বর্ণকার-পোদ্দাররা। ইংরেজরা নির্দিষ্ট মান ঠিক করে না দেওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। এদেরই মতো, করণিক-হিসাব রক্ষকরাও সব গ্রামে থাকত না—যদিও তাদের তালিকাভুক্ত করা হত গ্রামের (প্রচলিত প্রথানুযায়ী বারোজন) কর্মীদের মধ্যে। গ্রামের কুলি ও পাহারাদারের কাজ ভাগাভাগিভাবে করতে পারত চামার ও মহার-রা; মহারদের কাজ ছিল গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। কোন নির্দিষ্ট পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়লে যে অসুবিধা দেখা দিত তার সমাধান প্রতিটি গ্রাম আলাদা আলাদা ভাবে করত; কখনো তাদের স্থানান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হত, কখনো বাড়তি কিছুটা জমি দেওয়া হত যার সাহায্যে কারিগর পরিবারের নতুন সদস্যদের ভরণপোষণ চলে।

দুটি মন্তব্য এখানে যোগ করা প্রয়োজন। আদিম যন্ত্রপাতি এবং ধাতুর অভাব কাজ শেখার কালটিকে তখন দীর্ঘ করে তুলত। পণ্য-উৎপাদন না হওয়ায় এবং সেহেতু কারিগররা কেন্দ্রীভূত না হওয়ার অর্থ পরিবারের মধ্যেই প্রশিক্ষণ লাভ। সুতরাং, জাতপাতের একটা শক্তিশালী পেশাগত ভিত্তি ছিল এবং সেই সঙ্গে তা কৃৎকৌশলকেও পশ্চাৎপদ রাখতে ভূমিকা নিয়েছিল। দ্বিতীয় মন্তব্যটি, গ্রামীণ কারিগর ব্যবস্থার উৎপত্তি বিষয়ে। কেউ কেউ এদের পাণিনি (৬.২.৬২) উল্লিখিত *গ্রামঃ শিল্পিনি* হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাছাড়া, পাণিনি (৫.৪.৯৫) 'গ্রাম' ও 'কৌট-তক্ষণ'-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করেছেন এবং তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে *অমরকোষ*-এ (২.১০.৪)। বিষয়টা হল, পাণিনির 'গ্রাম'-এ বর্ণনা করা হয়েছে শুধুই আগেকার 'সজাত' গোষ্ঠীর কথা, যারা বছরের অর্ধেক সময়ই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াত। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় যে পাণিনির 'গ্রাম'-এর ছুতোর-এর সঙ্গে 'নিজস্ব

কুটিরে বসবাসকারী স্বাধীন ছুতোর'-এর তফাৎ আছে, কেননা *কৌট* শব্দটি এসেছে *কুটি* (= কুটির) থেকে। গ্রামে বসতিস্থাপনকারী ছুতোরের নিজস্ব কুটির ছিল না এমন যুক্তি নিশ্চয়ই দেওয়া যায় না। বরং, এ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে আগেকার স্বাধীন ছুতোরদের নিজস্ব স্থায়ী বাড়ি ছিল, 'গ্রাম'-এর সঙ্গে তাদের ঘুরে বেড়াতে হত না। ছুতোর, কামার, বা নাপিতের মতো গ্রামীণ কারিগরদের উদ্ভব যে নব্য-বৈদিক যুগের আধা- যাযাবর উৎপীড়ক 'গ্রাম' গুলির সেবা করতে হত এমন মানুষদের মধ্যে থেকেই ঘটেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। শুধুমাত্র পরিভাষা থেকে আমরা যেন এমন সিদ্ধান্তে না পৌঁছই যে অতি প্রাচীনকালের 'গ্রাম' এবং সবার পরিচিত স্বনির্ভর লাঙ্গল ব্যবহারকারী ভারতীয় গ্রাম এক। গ্রাম-বসতির ঘনত্বের প্রশ্নটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সেটাই সাম্রাজ্যগুলির ভাগ্য নির্ধারণ করত। 'গ্রাম শিল্পিন' বা '-কারু'দের উল্লেখ *অর্থশাস্ত্র*-এ পাওয়া যায় না, *জাতক*-এও নয় (*জাতক* ৪৭৫-এ একটি ভুল প্রয়োগের কথা বাদ দিলে)। কার্লে-র প্রবেশদ্বারে স্বাক্ষর দানকারী ধেনুকাকতনের তক্ষণশিল্পী (ছুতোর) সামিন এবং কনহেরী-তে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ গুহার মধ্যবর্তী পথটির নির্মাতা কল্যাণের তক্ষণশিল্পী নন্দ (ল্যুডার্স ১০৩২) উভয়েই তাঁদের ব্যক্তিগত ক্ষমতায়, তাঁদের অনুরূপ পরবর্তীকালের কারিগরদের চেয়ে ঢের বেশি বিত্তবান হয়েছিল।

এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে যায় একমাত্র বুর্জোয়া আর্থব্যবস্থায় এসে, যেহেতু শ্রমিকরা নিজেদের অংশ ফেরত না দিয়ে ও গ্রামীণ কর্তব্য কমিয়ে দিয়ে নগদ অর্থ উপার্জনের নানা পথ খুঁজে পেল। তা সত্ত্বেও, যেসব গ্রামে পণ্য-পরিবহণের ব্যবস্থা এখনো দুর্বল সেখানে জমির-মালিক কারিগর ও তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী লব্ধ বিশেষাধিকাব বজায় রয়েছে। যেমন, নিকৃষ্ট টিনের ব্যাপক যোগান ও স্থানীয় বাজার সংকুচিত হওয়ার ফলে বোম্বে-পুনা সড়কের কাছাকাছি গ্রামগুলির টিকে থাকা কুমোরেরা গ্রাম ছেড়ে পুনা ও তালেগাঁও-ব মতো বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে চলে এসেছে। পুনা উপত্যকার ওপরের বেড়ষা-করঞ্জ গ্রাম একজন পূর্ণ সময়ের কুমোরের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না, আবার গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার্য মাটির বাসনপত্রও এখান থেকে সহজে সড়ক পথে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায় না। সুতরাং, পাশের গ্রামের এক কুমোব বেড়ষার প্রতিটি গৃহস্থবাড়ি থেকে বছরে প্রায় তিন সের শস্যেব একটা 'বালুতেম' পায়। বিনিময়ে যে অন্যকোন অর্থ দাবি না করেই তাদের সম্বৎসরের জন্যে রান্নার হাঁড়ি, কলসি, উৎসবের বাসনপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মকর সংক্রান্তিতে (বর্তমানে ১৩-১৪ জানুয়ারী) ব্যবহৃত ছোট ছোট ঘট। শুধু এগুলি তৈরির কাজেই কুমোরেরা মকর সংক্রান্তির কয়েক মাস আগে থেকে ব্যস্ত থাকে। অন্যদিকে, বেড়ষা-করঞ্জের স্বর্ণকাব পবিবারটি পূর্বপুরুষদের স্মৃতিফলক ও প্রাপ্ত জমিজমা ফেলে রেখে অজ্ঞাত কোন জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। নিকটবর্তী, ২০০০ বছর আগে তৈরি হওয়া এবং ১০০০ বছরেবও বেশি আগে পবিত্যক্ত হওয়া গুহাগুলির ভিক্ষুদের ভরণপোষণে গ্রামটি নিশ্চয়ই একসময় অবদান রেখেছিল; গ্রামবাসীরা প্রচলিত মারাঠী ভাষায় 'লেনিস' না বলে সঠিকভাবেই এগুলিকে 'বিহার' বলে অভিহিত করে। যাই হোক, খাদ্য উৎপাদনের জন্য সমষ্টিগত মালিকানার কোন জমির হদিশ পাওয়া যায়নি। পেশোয়া-রা সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় এক ব্রাহ্মণ-কে এই ছোট গ্রামটি 'ইনাম' দিলেও, মনে হয়, মালিক পরিবারটি কখনও এখানে বসতিস্থাপন বা জমিদারী সত্ব কায়েম করেনি; বর্তমান সত্বভোগী থাকেন হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে, কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা অঙ্ক প্রতিবছর এক সদাশয়

সরকার-এর কাছ থেকে সরাসরি গ্রহণ করেন, এবং এই সরকারও, ইংরেজদের মতোই, সম্পত্তির সমস্ত অধিকার সুরক্ষিত রাখেন।

অমরকোষ[১৪] নামের সংস্কৃত অভিধানটিকে যুক্তিসম্মতভাবেই গুপ্তযুগের বলে চিহ্নিত করা হয়। এটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ব্যবস্থাটি, এমনকী সেই যুগেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তাই গ্রামীণ ছুতোরের সঙ্গে স্বাধীন ছুতোরের তফাত বিশেষভাবেই নির্ধারিত হয়েছিল; নাগরিক সংঘগুলি ছিল (২.৮.১৮) 'এলাকার এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ'। নগরের কারিগর ও শ্রমিকদের নিয়ে স্বতন্ত্র বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। 'শূদ্রদের শ্রেণী' (২.১০)-কে অত্যন্ত সঠিকভাবেই তুলনা করা হয়েছে কোন গ্রামের শ্রমিকদের সঙ্গে—যারা অস্পৃশ্য এবং গ্রাম সমাজের সীমা বহির্ভূত উপজাতি মানুষদের পর্যন্ত নিয়ে একটা ক্রম-নিম্ন শ্রেণীবিভাগ গঠন করেছিল। পশুপক্ষি সংগ্রহ করে বিক্রি করার দায়িত্ব এখন পারধি-র মতো উপজাতীয় শিকারীদের, জবাই করার কাজ যথাক্রমে মুসলমান ও ক্রিশ্চান কসাইয়ের। *অমরকোষ*-এর মদ্য-প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতারা পরবর্তীকালের ভারতীয় গ্রামে স্থায়ী স্থান পায়নি, বরং তাদের সম্পর্কে নাসিকা-কুঞ্চন করা হয়েছে। মদের ওপর ধার্য করের বোঝা ক্রমেই এমন বাড়তে থাকে যে তা সামন্তপ্রভুদের, ও পরে ব্রিটিশ সরকারের একচেটিয়া কারবার হয়ে দাঁড়ায়। বাদবাকি প্রায় সমস্ত শ্রমিকদেরই প্রতিরূপ এখনও গ্রামে খুঁজে পাওয়া যায় এবং তারা 'অপরিবর্তনীয় গ্রাম'-এরই সাক্ষ্য বহন করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শূদ্রদের এখন দেখা যায় না তারা হল পরাধীন উঞ্ছবৃত্তিধারী শ্রমিকদের একটি শ্রেণী যাদের স্থান, কারিগর নয় এমন অসংখ্য বৃত্তিভুক মজুরদের ঠিক পরেই ছিল। এরা ঠিক কীভাবে কাজ করত তা স্পষ্ট নয়, কিন্তু এদের বেশিরভাগেরই উদ্ভব যে ঘটেছিল দুর্ভিক্ষের সময় নেওয়া অপরিশোধিত ঋণ, বা বিলুপ্ত উপজাতিভুক্ত মানুষদের মধ্য থেকে—তা স্পষ্ট। পশুপালন ও ব্যবসার মতোই, সুদ খাটানোটাও ছিল বৈশ্যদের নিয়মিত পেশা (২.৯.৩-৫)। অভিধানটিতে ভূমিদাস, কিংবা জমিদার, ভূমি মালিক, বা গ্রামীণ দোকানদারের কোন উল্লেখ নেই।

গ্রামবাসীদের যৌথ ক্রিয়াকর্মের কোন ছাপ *অমরকোষ*-এ পড়েনি, যা পড়েছে আঞ্চলিক ভাষাগুলির ওপর। যেমন, মারাঠীতে 'গাম্বই' শব্দের অর্থ কোন রাজকর্মচারীর দেওয়া নির্দেশ (বা ধার্য করের শর্ত ইত্যাদি) মানতে অস্বীকার করা বা তাতে বাধা দেওয়া। এটা প্রতিবাদের একটা চরম রূপের প্রকাশ; যেমন, গোটা গ্রামের মানুষের সম্মিলিতভাবে গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও গিয়ে বসতি স্থাপন—মিশরে টলেমির-র অনুগামীরা যাকে বলতেন 'অ্যানাকোরেসিস'—তারই সমার্থক। অনুরূপ শব্দ 'গাম্ব-সই'-এর সঙ্গে এর পার্থক্য করা দরকার। গাম্ব-সই কথাটির অর্থ কোন দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে পুরোহিত (ভগৎ) কর্তৃক নির্ধারিত অল্প কয়েকদিনের জন্যে স্বেচ্ছায় ঘটা করে গ্রাম ত্যাগ করা; নয় কিংবা আরো বেশি দিনের জন্যে গ্রামের বাইরে মাঠে কিংবা গাছতলায় বাস করার পর (সেই সময় গ্রামটি সম্পূর্ণ জনশূন্য থাকত) গ্রামবাসীরা আবার সাড়ম্বরে গ্রামে ফিরে আসে বসবাসের জন্যে। এই প্রথা সম্ভবত চরম নির্যাতনের যুগের, এবং মানুষের সুস্বাস্থ্য ও সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক বলে মনে করা হয়। গ্রামীণ সংগঠনকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় 'গাম্ব-গাড়া' বা 'দু'চাকার গাড়ী'; এটা যাতে ভালভাবে চলতে পারে তা দেখা সমস্ত গ্রামবাসীর কর্তব্য। আরও আদিম

গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানগুলিও টিকে আছে : গ্রাম প্রধানের ষাঁড়—গবাদিপশুর বার্ষিক শোভাযাত্রা 'পোলা'-র নেতৃত্ব দেয়, তাকে এমনভাবে সাজানো হয় যেন বলি দেওয়া হবে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১. এই অধ্যায়ের সাধারণ বিষয়বস্তুর জন্য পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া গেছে ফ্লিট, *ডি. এইচ. আই.* এবং *হর্ষচরিত* থেকে। ই. বি. কোয়েল এবং এফ. ডব্লিউ থমাস-কৃত হর্ষচরিত-এর অনুবাদ (লন্ডন ১৮৯৭) সহায়ক হয়েছে, যেমন হয়েছে এস. চৌধুরি-কৃত হিন্দী অনুবাদ (২খণ্ড, কথৌতিয়া, বিহার; ১৯৫০, ১৯৪৮)। *হর্ষচরিত* সম্পর্কে ভি. এ. আগরওয়ালের হিন্দী প্রবন্ধে (পাটনা, ১৯৫৩) ভাস্কর্যগুলি থেকে মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক উপাত্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রচনাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে *শুক্রনীতি*-কে গুপ্ত প্রশাসনের বর্ণনামূলক ধরে নেওয়ার ফলে। *শুক্রনীতি*-তে গোলাবারুদ (ফর্মুলা সমেত) ও আগ্নেয়াস্ত্রের বর্ণনা আলাদা আলাদাভাবে পাঁচ জায়গায় করা হয়েছে। তাই, এটি মুসলমান যুগের শেষ দিককার রচনা বলে এর সম্পাদক ও অনুবাদক বি. কে. সরকার (এলাহাবাদ, ১৯২৫) প্রমাণ করেছেন। 'রাজা কোনরকম কালবিলম্ব না করে দ্রুত ভূমি-রাজস্ব, মজুরি, শুল্ক, সুদ, ঘুষ, ও খাজনা আদায় করবেন। রাজা প্রত্যেক কৃষককে নিজের সীলমোহর লাগানো খাজনার (মূল্য নির্ণায়ক) রসিদ দেবেন। রাজা গ্রামের ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করে কোন ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে অগ্রিম তা আদায় করবেন, কিংবা মাসিক বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার (পরিশোধের) নিশ্চয়তা আদায় করবেন। অথবা রাজা তাঁর নিজস্ব আদায়ের $^{১}/_{১৬}$, $^{১}/_{১২}$, $^{১}/_{৮}$, $^{১}/_{৬}$ অংশ দেওয়ার ভিত্তিতে 'গ্রামপা' নামে কর্মচারী নিয়োগ করবেন। ... তিনি (পুঁজি) বৃদ্ধির কিংবা কুসিদজীবীর সুদের $^{১}/_{৩৬}$ অংশ আদায় করবেন। চাষের জমির মতো বসতবাড়ি ও অন্যান্য বাড়ি থেকে খাজনা আদায় করবেন তিনি। তিনি কর আদায় করবেন দোকানদারদের কাছ থেকেও। যারা রাস্তা ব্যবহার করে তাদের কাছ থেকে তিনি উপশুল্ক আদায় করবেন রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য।' (*শুক্রনীতি*, সরকার-এর অনুবাদ; ৪.২.২৪৫-২৫৮)। বারুদের ফর্মুলা দেওয়া হয়েছে ৪.৭.৪০০-৪০৬-এ, গাদা বন্দুক ও কামানের বিবরণ ৪.৭.৩৮৯-৯৪-এ, কামান-বন্দুকের নল ৪.৭ ৪১৮-২১, রাজার দেহরক্ষীদের জন্যে আগ্নেয়াস্ত্র ৪.৭.৪৭-৫৩। উকিল ও তাদের পারিশ্রমিকের (উদ্ধার বা আদায় করা অর্থের $^{১}/_{১৬}$ থেকে $^{১}/_{১৬০}$ অংশ) বিষয়ে আলোচনা রয়েছে ৪.৫.২২৪-৩১-এ। সুতরাং, এই রচনা নিচের থেকে সামন্ততন্ত্রের বিকাশের যুগের—যখন করদাতা কৃষক, উপশুল্ক, আবাসন কর, প্রভৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। বাস্তবিকপক্ষে, রচনাটি যে একটি অতি সাম্প্রতিক জালিয়াতি তা সন্দেহ করার চমৎকার কারণ খুঁজে পেয়েছেন ভি. রাঘবন। এই জালিয়াতি সম্ভবত করেছেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের ওপার্টের পণ্ডিতরা—*গালব-নিরুক্ত, নরসিংহ-সংহিতা* প্রভৃতির মতো আবিষ্কারগুলিও যাঁদের উদ্ভাবন বলে মনে হয়। আর. এন. সালেতোর-এর *লাইফ ইন দ্য গুপ্ত এজ* (বোম্বাই, ১৯৪৩) একটি বিশ্লেষণহীন সংক্ষিপ্তসার—যা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির জন্য সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। আগের অধ্যায়ে ১ নং টীকায় আমার যে-নিবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণীগুলির আলোচনা সমেত ভূমিদান ও উপজাতিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।

২. 'তথাকথিত' অন্ধ্র রাজাদের আদিনিবাস সম্পর্কে ভি. এস. সুকথাংকর-এর নিবন্ধে (*এ. বি. ও. আর. আই.* ১.২১-৪২; স্মারক সংস্করণ, খণ্ড-২, পৃ. ২৬১-৫) এই শিলালেখটিকে পরিশিষ্ট

হিসেবে দেওয়া হয়েছে; আমি এর অনুবাদে সামান্য পরিবর্তন করেছি। একই লেখক এই শিলালেখটি প্রকাশ করেছেন *ই. আই* ১৪.১৫৩-৫ তেও (স্মারক সংস্করণ ২.২১৩-৫)।

৩. 'গুজরাট কিংবা কাথিয়াবাড়ের কোন জায়গায়' খুঁজে পাওয়া একটি সাবাকান (Sabacan) শিলালেখ (যার একটা ফটোকপি ১৯৪২-এ সেখান থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল 'কিউনিফর্ম' ভেবে) সনাক্ত করেছেন অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরির ড. এ এফ এল বিস্টন (১৯৫১-র ২০-শে আগস্টের চিঠি)। এই শিলালেখ-এর অনুরূপ আর একটি শিলালেখ পাওয়া গেছে এডেনের কাছে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে *করপাস ইনসক্রিপসনাম সেমিনার* ২৭, ১৯০৫, ১৫৩-৫-এ ঃ 'হার্‌রান-এর অভিরত এবং হাররান পাহাড়ে তাঁর সহ-জনগোষ্ঠীভুক্ত, অর্থাৎ হাথ্‌ইর উপজাতি এবং রাবিব ও খৈত কৌমভুক্ত মানুষদের ভূসম্পত্তি—এই শিলালেখটির স্থান থেকে উত্তরে প্রসারিত, আর পূর্বদিকে তাকে ঘিরে রেখেছে বড় বড় *ইমারত* এবং গভীর ও সঙ্কীর্ণ গিরিখাত।' এই প্রাচীন হস্তলিপিটি খ্রীষ্টযুগের গোড়ার দিকেরও হতে পারে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ততর সাবাকান প্রস্তরলিপি পাওয়া গেছে ভুজ-এ (ই. আই ১৯.৩০০-৩০২)। চেনাব্‌ নদীর তীরে বসতিস্থাপনের জন্য সূর্য-উপাসকদের সম্ভবত নিয়ে আসা হয়েছিল কুষাণ আমলে। এরা মগ ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু এদের নিজস্ব *সাম্ব-পুরাণ* মেনে চলত (দ্র. আর সি হাজরা, *এ বি ও আর আই* ৩৬.১৯৫৫.৬২-৮৪)। জুনাগড়ে (গিরনার) বিদেশী শাসকদের বংশধারাটি চোখে পড়ার মতো, যদিও তাদের পরবর্তী বংশধররা প্রায়শই ভারতীয় নাম গ্রহণ করত। স্কন্ধগুপ্তের কিছুদিন পরেই জনৈক ভতার্ক তাঁর উপজাতি বা কৌমের সমর্থন নিয়ে বলভি-র মৈত্রক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন; সর্দার ও তাঁর উপজাতির নাম—দুটিই সংস্কৃতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং এঁরা সম্ভবত বিদেশী। মালাদা (বন্ধুমতীর পুত্র ও নির্মলার ভ্রাতা), যিনি বালাদিত্য-র অধ্যক্ষতাধীন নালন্দার বৌদ্ধ বিহার বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ভাতা প্রদান করেছিলেন, তিনি বলেছেন (*ই. আই* ২০.৩৭-৪৬) যে, যশোবর্মণের অধীনস্থ 'উত্তরের লোকপাল, মন্ত্রী, এবং গিরিপথগুলির অধিপতি' জনৈক তিকিনা ছিলেন তাঁর পিতা। এই রাজা কনৌজের যশোবর্মন হতে পারেন, কিন্তু সম্পাদকের অভিপ্রায় মতো, মালোয়ার যশোধর্মণ নন—যিনি আরও এক শতাব্দী আগের। 'তিকিনা' (= *তেগিন*) যে একটি তুর্কি উপাধি সেকথা স্বীকৃত—যার অর্থ 'প্রধান', 'অভিজাত', বা 'রাজকুমার'। গুপ্ত সম্রাটরা একাধিকবার হূণদের পরাজিত করলেও, হূণ-রা ওই সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অবশেষে তারা ভারতীয়দের মধ্যে একেবারে লীন হয়ে গিয়েছিল, যদিও সংস্কৃত কাব্যে হূণ ও শক নারীদের কাঞ্চনবর্ণের উচ্চ প্রশংসার মধ্যে তাদের স্মৃতি রক্ষা পেয়েছে—যা স্বর্ণযুগেরই যথাযোগ্য সংযোজন। এমনকী, মুসলমান ও ইংরেজদের ক্ষেত্রে পর্যন্ত আগে শুরু হয়েছে বাণিজ্য, পরে সামরিক তৎপরতা; তবে সেই তৎপরতাও এসেছে তখনই যখন তা তুলনামূলকভাবে কম খরচে বেশি লাভজনক।

৪. হর্ষের শিবির ও তাঁর সেনা-অভিযানের মূর্ত বর্ণনা দিয়েছেন বাণ, তাঁর *হর্ষচরিত*-এ। এই সভাকবি সম্ভবত কখনও মূল রাজধানী থানেশ্বর, বা সেই কারণে, কনৌজে যাননি। পূর্বোক্ত অঞ্চল সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে, সেখানে রয়েছে প্রচুর নারকেল বন; যদিও নারকেল গাছ, পাটনার উত্তরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরের নিকটবর্তী কবির জন্মস্থান থেকে খুব বেশি উত্তরে আর এগোতে পারেনি। তিনি সম্ভবত ধরেই নিয়েছিলেন যে নারকেল গাছ যে কোন উর্বরা জমির প্রতীক।

৫. এখানে *মুদ্রারাক্ষস*-এর 'ভরতবাক্য' এবং বিলুপ্ত নাটক *দেবী চন্দ্রগুপ্ত*-র বিক্ষিপ্ত কিছু অংশের উল্লেখকে সম্ভাব্য ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

৬. এই ধরনের বংশবৃত্তান্তগুলির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় নল রাজাদের বংশবৃত্তান্ত (*ডি কে এ* ৫২)। এঁরা খুব সম্ভবত ছিলেন আদিম বনবাসী নিষাদ, নলের পিতাকে তাঁদের আদিপুরুষ বলে দেখানোর জন্য তাঁদের যে নিষাধ-এ রূপান্তরিত করা হয়েছিল—আসলে তাঁরা তা ছিলেন না। পান্ডুবংশী রাজারা (ফ্লিট ৮১) এবং মধ্যভারতের বনাঞ্চলে আজও যে পান্ডো উপজাতিদের খুঁজে পাওয়া যায় (ভারতের আদমশুমারী, ১৯৩১, প্লেট ৩) তারা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই একই বংশের। পাল রাজারা যে গৌরবময়, অতি সংস্কৃতিবান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারানাথের মতে, তার সূচনা করেছিলেন নাগ বংশের এক জারজ সন্তান। ভৌম-রা নিছকই 'দেশজ'।

৭. লিচ্ছবিদের বিষয়ে দ্রষ্টব্য: সিলভ্যা লেভি, *Le Népal, étude historique d'un royaume Hindou* (প্যারিস ১৯০৫-৮, ৩ খন্ড, ২-৩, *Annals du Musice Guimet*-এ); বিশেষ করে ২.৮৯-৯০, ৩.৬৪ (প্রথম লিচ্ছবি শিলালেখ, ৬ষ্ট শতকের শেষে কিংবা ৭ম শতকের গোড়ায়) ৩.৭৯ প্রভৃতি; মল্ল ৩.৬৯, ২.২১২ প্রভৃতি। এমনকী খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা স্রং-ভৎসান গাম-পো (Srong-tsan Gam-po) পর্যন্ত দাবি করেছিলেন যে তিনি লিচ্ছবি বংশীয়। এসব থেকে পরবর্তীকালে ভিনসেন্ট স্মিথ ও অন্যান্যরা এক অদ্ভুত তত্ত্ব খাড়া করেন যে বুদ্ধ ছিলেন 'এক বলিষ্ঠ তিব্বতী'।

৮. 'হিরণ্যগর্ভ' পুনর্জন্ম অনুষ্ঠান সম্পর্কিত উৎকীর্ণ নথির জন্য দ্রষ্টব্য ডি সি সরকারের *সাকসেসার্স অফ দি শাতবাহনস।* ক্রিয়াচারটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে *মৎস্য পুরাণ* ২৭৫ (১-২৩)। এর পূর্ববর্তী 'তুলাপুরুষ' ক্রিয়াচারটি অনেক বেশি প্রচলিত হয়েছিল। এতে রাজবংশের লোকদের ওজন করা হতো সোনা বা রূপো দিয়ে, তারপর সেগুলি বিলি করে দেওয়া হত ব্রাহ্মণদের মধ্যে। অবশ্য নতুন বর্ণ নিয়ে পুনর্জন্মলাভের সুবিধা এ ধরনের দানে ছিল না।

৯. আর ই এনথোভেন : *ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস্ অফ বোম্বে* (৩ খণ্ড, ১৯২০), 'সাব-গাবড়া' ১.৩৬২; এবং সেই সঙ্গে গাবিট-দের এক 'দেবক', এবং আরো কয়েকটি।

১০. জি. এম. মোবায়েস : *দি কদম্ব কুল* (বোম্বাই ১৯৩১); আরও দ্রষ্টব্য : *ট্রানস্, ফিফথ্ ইন্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেস* ১৯৪১, ১৬৪-৭৪; *ফিস্টস্‌ক্রিফট* আর. কে মুখার্জী (*ভারত কৌমুদী,* এলাহাবাদ ১৯৪৫) ৪৪১-৪৭৫। ডি সি সরকার *সাকসেসর্স অফ দি শাতবাহনস্* ২২৫-৫৪।

১১. আর্কিওলজিকাল সার্ভে, মাইসোর স্টেট; *অ্যানুয়াল রিপোর্ট* ১৯২৯, পৃ. ৫০। খুবই সংক্ষিপ্ত এই খোদাইলেখ এখনও স্পষ্ট নয়, যদিও এটা স্পষ্ট যে লেখক তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েছেন।

১২. গোয়ার গ্রাম-বসতি স্থাপন বিষয়ে আমার নিব "দি ভিলেজ কমিউনিটি ই দি 'ওল্ড কনকোয়েস্টস' অফ গোয়া" (*জার্নাল অফ দি ইউনিভার্সিটি অফ বোম্বে,* ১৫, ১৯৪৭, ৬৩-৭৮) দেখুন। খুবই কাজে লেগেছে জি. গেবসন দ কুনহা-কৃত *সহ্যাদ্রি-খণ্ড*-র সংস্করণ (বোম্বাই, ১৮৭৭), এবং *দি কোঙ্কনী ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার* (বোম্বাই, ১৮৮১) শীর্ষক তাঁর গবেষণাকর্মটি। তবে, ক্ষেত্রানুসন্ধানের কাজ আমি নিজেই করেছি, কেননা আমার জন্ম গোয়াতেই এবং এখানকার অসংখ্য বয়োঃবৃদ্ধদের সঙ্গে কথা বলে প্রবলভাবে প্রচলিত প্রাচীন প্রথাগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি. এ সম্পর্কিত নথিপত্র দেখেছি Filippe

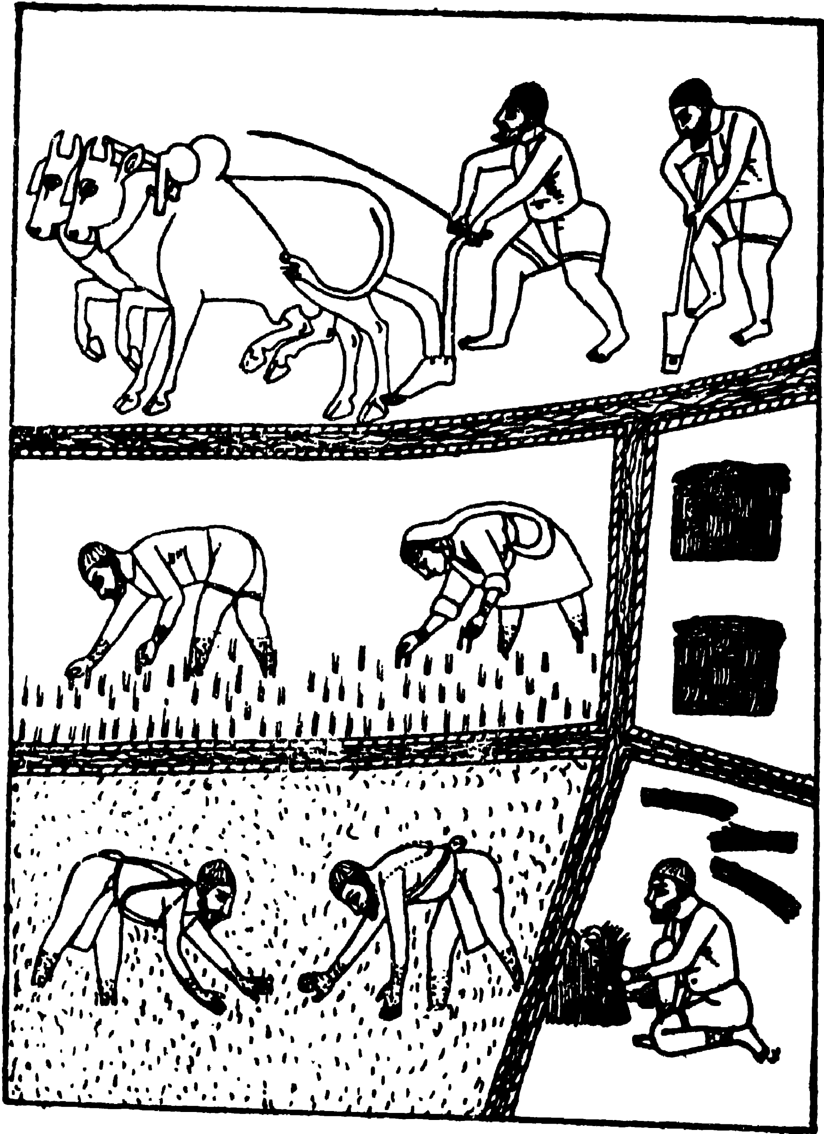
Néry Xavier's (পর্তুগীজ)-এর *Bosquejo historico das comunidades das aldeas dos concelhos Ilhas, Salcete e Bardez* (2nd ed Bastora, 3 vol. 1903-17)। ঐ লেখকেরই Gabineto literaris das fontainbas গ্রন্থটি এখন দুর্লভ।

১৩. এই সমস্ত গ্রামীণ কারিগরদের সম্পর্কে দ্রষ্টব্য মোলসওয়ার্থ-এর *মারাঠী-ইংলিশ ডিকসনারী*। টি এন আত্রে-র *গাম্ব-গাড়া* (মারাঠী ভাষায়, কর্জট আমলনার, ১৯১৫) গ্রন্থটিতে নব্য বুর্জোয়াদের বিতর্কপ্রিয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে—যদিও তাদের কাছে এর কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেছে অনেক আগেই।

১৪. এটা করা হয়েছে আমার লেখা 'দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন দ্য অমরকোষ' (*জে. ও. আর.* ২৪, ১৯৫৫, ৫৭-৬৯)-এ; *কোষ*-এর প্রথম দুটি অধ্যায়ে বর্ণিত ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নীতিগুলি স্পষ্টতই নজর এড়িয়ে গেছে। ২.১০.৬-এ ব্যবহৃত 'তুন্ন-বায়' ও 'সৌচিক' শব্দ দুটির অর্থ এক ধরনের সিবন-শিল্পী। এখন 'দর্জি' শব্দটি সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দেশের বেশিরভাগ অংশেই সেলাই করা পোষাকের চল ছিল বলে হিউয়েন সাঙ যে মন্তব্য করেছেন তার প্রেক্ষিতে সিবন-শিল্পী হওয়াটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত।



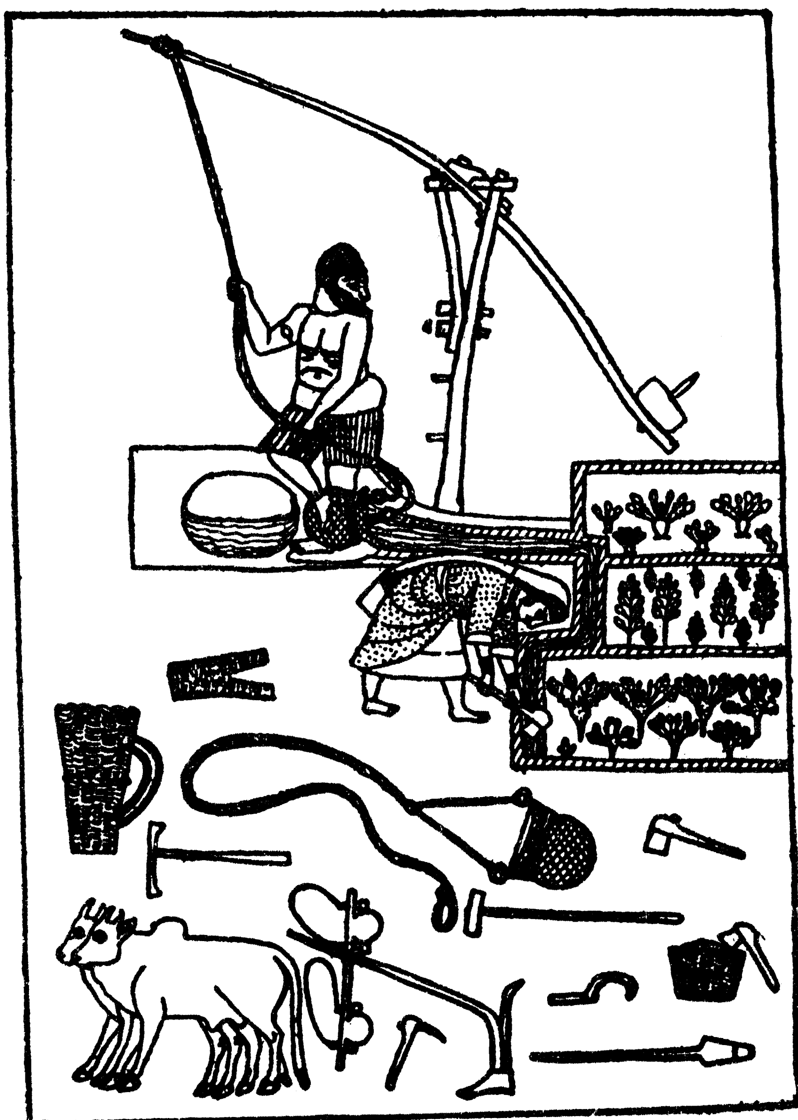
চিত্র ৪০ : শুখা জমিতে চাষ। পাঠে চাষীকে বলা হয়েছে 'জমিদার'—যা স্পষ্টই পারসিক ভাষার ভ্রান্তি। এটি শেষ সামন্তপর্বে কাশ্মীরের উৎপাদন-চিত্র। লক্ষ্যণীয়, উপরের ছবিতে হাতে বীজ ছড়ানো হচ্ছে এবং চাষীরা পায়ে চেপে তা মাটিতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।



চিত্র ৪১ : জলাজমিতে চাষ (ধান)। ছবিতে হাল চষা, সেচ, (নিকাশী) খাল, বীজতলার জমি এবং রোপন দেখানো হয়েছে। ধান চাষের এই পদ্ধতি সারাদেশে এখনও চালু আছে। ফাঁকা হয়ে যাওয়া বীজতলার জমিতে সাধারণত: বীজধানই বপন করা হয়।



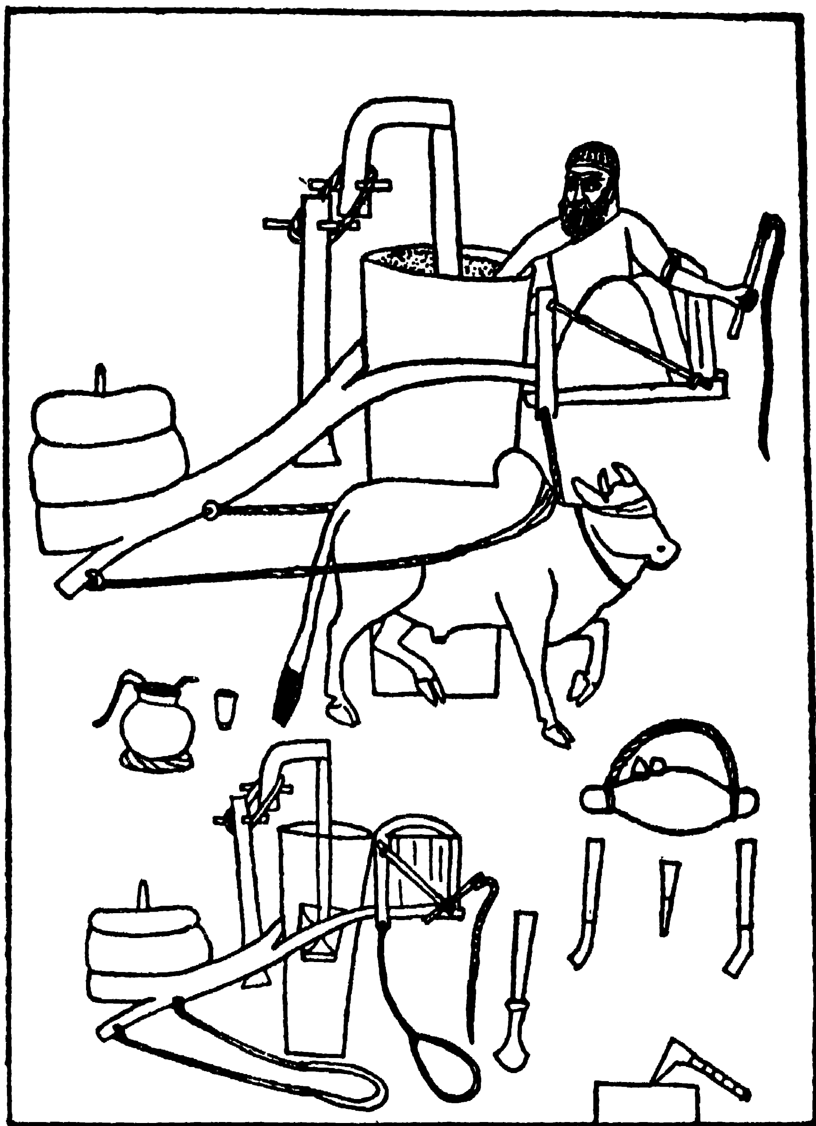
চিত্র ৪২ : শস্য ঝাড়াই, জমিদারের লোক দেখাশুনা কবছে। জমিদারের অংশ শস্য ব্যাপারীর কাছে বেচে দেওয়া হচ্ছে। ঘোড়ার গাড়িতে পবিবহণ। সুতরাং শস্য হয়ে উঠছে পণ্য।



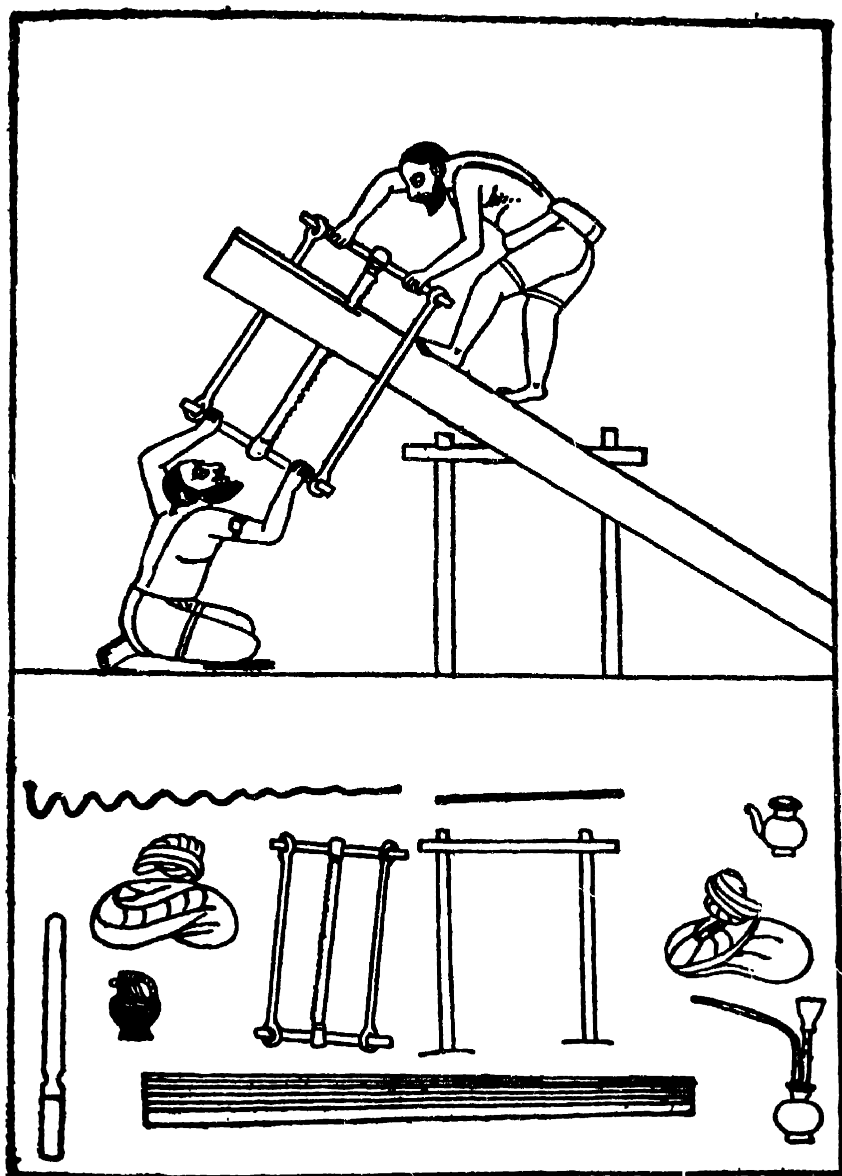
চিত্র ৪৩ : সব্জি চাষ এবং সরঞ্জাম : মহিলা কোদাল চালাচ্ছে, পুরুষ কূয়ো থেকে কপিকলে জল তুলছে, ছবির শস্যটি শালগম জাতীয় বলে মনে হয়।



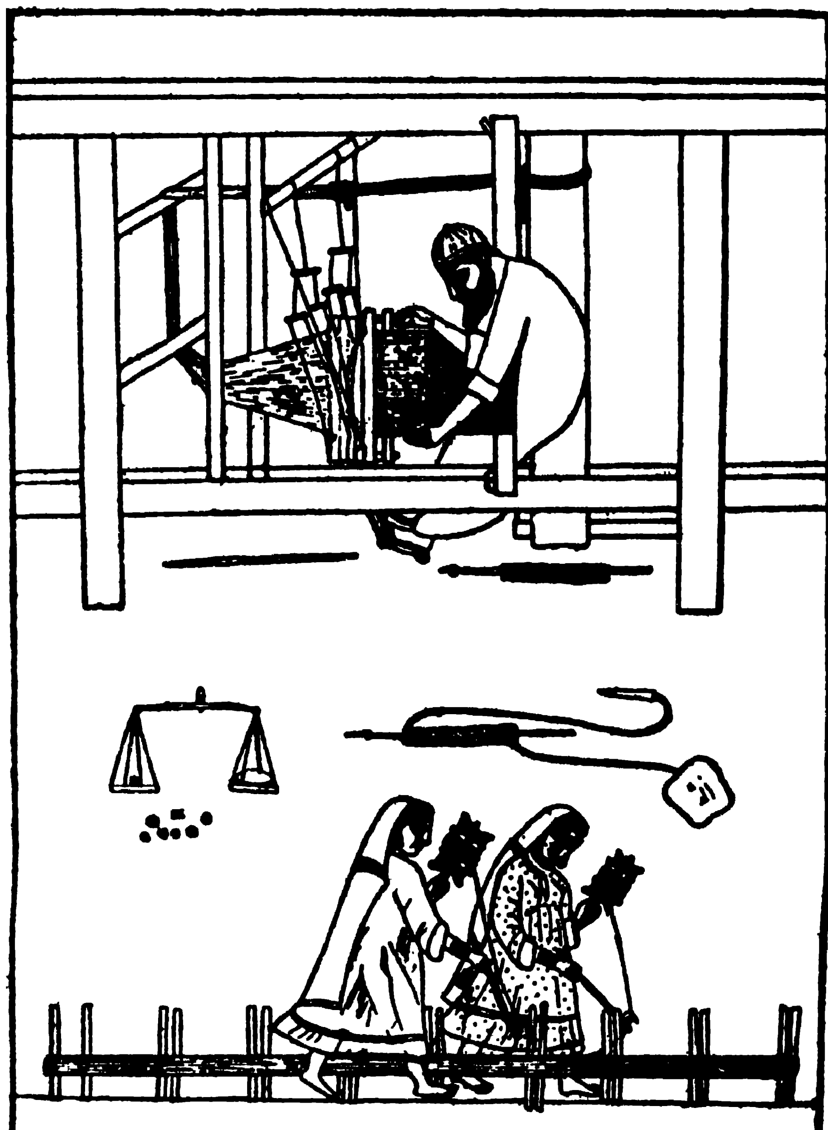
চিত্র ৪৪ : ছুতোর ও তার যন্ত্রপাতি। চিত্র ৪০ থেকে ৪৭ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পুথি থেকে (অনুমতিক্রমে) ব্যবহৃত। এটি উইলিয়াম মুরেক্রফট ১৮২০ নাগাদ কাশ্মীরে পেয়েছিলেন। গ্রামের ছুতোররা অবশ্য আরও কম সুক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে।



চিত্র ৪৫ : গ্রামের ঘানি। এখনও পর্যন্ত জ্ঞাত গ্রামবসতির কোন পর্যায়ের সঙ্গেই কারিগরদের তেমন কোন পার্থক্য নেই। দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গেও কারিগরীতে তারতম্যও নেই বললেই চলে।



চিত্র ৪৬ : করাতি। ছবিটা যদিও কাশ্মীরের কিন্তু দেশের যে কোন অংশের সঙ্গে এর পার্থক্য শুধু কারিগরদের কেশবিন্যাস ও পরিচ্ছদে।



চিত্র ৪৭ : তাঁতী। এরা কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক এক গ্রাম্য কারিগরই নয়, বরং, এমনকী সামন্তযুগেও, পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যের বাহক।

দশম অধ্যায়

সামন্ততন্ত্র ঃ নিচে থেকে

১০.১ ভারতীয় ও ব্রিটিশ সামন্ততন্ত্রের পার্থক্য
১০.২ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বাণিজ্যের ভূমিকা
১০.৩ মুসলমান শাসন
১০.৪ নিচে থেকে সামন্ততন্ত্রে পরিবর্তন; দাসপ্রথা
১০.৫ সামন্ততান্ত্রিক রাজা, জমিদার ও কৃষক
১০.৬ অবক্ষয় ও পতন
১০.৭ বুর্জোয়া-বিজয়

এই কালপর্ব-সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাষার নথিপত্রগুলিব ক্রমোৎকর্ষতা সত্ত্বেও সেগুলির পার্থক্য এত বেশি যে, তার ফলেই, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দুরূহ হয়ে ওঠে। এই দুরূহতা আরও বৃদ্ধি পায় প্রাচীন প্রথাগুলির অজস্র বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থানিক উদ্বর্তনের ফলে—যেগুলি, অন্তত রূপের দিক থেকে, দৃষ্টিকে ভিত্তি থেকে সরিয়ে নেয়। এর সম্পূর্ণ ধরনটা এত জটিল ও বিভ্রান্তিকর যে তার অনুসন্ধান পাঠকের মধ্যেও অবশ্যম্ভাবীভাবে কিছুটা বিভ্রান্তি সঞ্চারিত করবে। তাই, কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়েই শুধু এখানে আলোচনা করব।

১০.১ ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের তফাত, অন্তত আপাত অভিব্যক্তির দিক থেকে, এত বেশি যে—কেবলমাত্র মুসলমান ও রাজপুত সামরিক শাসনতন্ত্রের বর্ণনা দেওয়ার সময় ছাড়া—ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বের কথাই কখনো কখনো অস্বীকার করা হয়েছে। ইউরোপীয় (বিশেষ করে ব্রিটিশ) সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সারসংক্ষেপ[১] করা যেতে পারে এইভাবে ঃ ১. 'নিম্নস্তরের কৃৎকৌশল, তা'তে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি সরল ও সাধারণত কমদামী, এবং উৎপাদন-কর্মের চরিত্র হল মূলত ব্যক্তিগত; শ্রম-বিভাজন ... রয়ে গেছে বিকাশের একেবারে প্রাথমিক স্তরে।' ভারতবর্ষে, প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক সমেত, সকল পর্যায়ের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। ২. 'উৎপাদন কোন পরিবারের কিংবা কোন গ্রামীণ-জনগোষ্ঠীর আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্যে, কোন ব্যাপকতর বাজারের জন্যে নয়।' ব্যাপক অর্থে, এটিও এখানকার ক্ষেত্রে সত্য, যদিও ধাতু, লবণ, নারকেল, তুলা, পান (তাম্বুল), সুপারি ইত্যাদির ক্ষেত্রে পণ্যোৎপাদন বাড়ছিল—তা মনে রাখা দরকার। ৩. 'খাস-জমি চাষ; জমিদারের খাস তালুকে প্রায়শই যথেষ্ট পরিমাণে বাধ্যতামূলক শ্রমদান।' ভারতের ক্ষেত্রে এটা আদৌ প্রয়োজ্য নয়।

এখানে জমিদারি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটতে শুরু করেছিল সামন্ততান্ত্রিক পর্বের শেষ দিকে। তার কারণ, প্রাচীন রোমের ভিলা বা দাস নির্ভর আর্থব্যবস্থার সঙ্গে মৌর্য সাম্রাজ্যের কোন মিলই ছিল না। বসতির একক ছিল গ্রাম। আগেই দেখানো হয়েছে, রোম সাম্রাজ্যে, বা শার্লম্যান-এর, বা সামন্ত ব্যারনদের এলাকার তুলনায় এখানকার উপজাতি-অঞ্চলে গ্রামবসতির বিস্তার সাধারণভাবে অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও, পরবর্তীকালের ভারতীয় সামন্তপ্রভুরা গ্রামবাসীদের ওপর নির্ভরশীল না থেকে সবসময়েই নিজেরা কিছু জমি সরাসরি চাষ করার চেষ্টা করে এসেছে—যাতে চাষীদের সম্মিলিত প্রতিরোধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল না পেলে অবস্থাটা বিপর্যয়কর না হয়ে দাঁড়ায়। জরুরি সময় ব্যারনদের পোষ্য সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যের যোগানটা সুনিশ্চিত করতে হত। সামন্ততান্ত্রিক যুগে ইউরোপের এই সমস্ত জমিদারদের জমি প্রায়শই চাষ করানো হত দাসদের দিয়ে। ফলে, এই যুগে দাসত্ব এক নতুন গুরুত্ব পায়, যদিও তখনও তা অপরিহার্য কোন উৎপাদনের উপায় হয়ে দাঁড়ায়নি। ৪. 'রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ'—যা ভারত ও ইউরোপ উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটেছিল এবং শুরু হয়েছিল উপরোদ্ধৃত সামন্ততন্ত্রের আমলে। সমস্ত জমিই রাজার—এই মৌর্যতত্ত্বে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল উপজাতীয় উপলব্ধি থেকেই যে, জমি হল উপজাতির যৌথ কর্তৃত্বাধীন কাজের ক্ষেত্র (সম্পত্তি নয়), আর সর্দার হল তার প্রতীক ও অভিব্যক্তি। এই সর্দার প্রতিস্থাপিত হতে পারে রাজার দ্বারা (*অর্থশাস্ত্র* ১১.১), কিংবা নিজে রাজা হয়ে, কিংবা কোন বিজয়ী রাজা—যে সর্দারের সঙ্গে তার পূর্বতন উপজাতির বিরোধে প্রয়োজনে সর্দারের পক্ষ সমর্থন করবে—তার দ্বারা করদ সামন্তে রূপান্তরিত হয়ে। কিছুকাল পরেই, গ্রাম-পরিষদগুলির কাজকর্মে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে লাগল নিকটতম সামন্তপ্রভুরা। ব্যতিক্রম ছিল সেই সমস্ত গ্রাম যেখানকার অধিবাসীরা রাজাকে সরাসরি কর দিত। সেখানকার ক্ষেত্রে বা সেখানকার ব্যক্তিগত ভূমি মালিকদের ক্ষেত্রে মালিকানার বা ভোগদখল-সত্ত্বের আলাদা কোন রূপকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ৫. 'কোন ধরনের সেবার বিনিময়ে ভোগদখল (service-tenure)-এর শর্তাধীনে জমিদারদের জমি-মালিকানা।' এটা বিশেষভাবে দেখা যায় রাজপুতদের মধ্যে—যাদের মুখ্য পেশাই ছিল যুদ্ধ করা ; এবং গোড়ার দিককার মুসলমানদের মধ্যে—যাদের প্রধান-রা ছিল আক্রমণকারী এবং যারা, ধর্মান্তরিত সমেত, নিজেদের বাকি জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে ধর্মকে ব্যবহার করত। দাক্ষিণাত্যে এই ব্যবস্থার প্রচলন সম্ভবত প্রথম ঘটান গাঙ্গ রাজারা (প্রথম আম্মা, দশম শতাব্দী)। পরবর্তীকালে সব জমিদারকেই উর্ধ্বতনের সেবা করতে হয়েছে, কিন্তু তাদের 'জায়গীর' এক এক সময়ে এক এক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে। এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করা দরকার যে, কেন্দ্রের উচ্চ সামরিক পদগুলি সাধারণত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যেত না। সভা-অভিজাতদের একমাত্র মালিকানা ছিল সম্রাটের এবং সম্রাট ইচ্ছা করলে তাদের সন্তানদের চরম দারিদ্রের মধ্যে ঠেলে দিতে পারত। উচ্চ সভাসদরা এমনকী ক্রীতদাসও হয়ে যেতে পারত। ৬. 'কোন জমিদার কর্তৃক তার অধীনস্থ প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিচার বা আপাত-বিচারের কাজকর্মের অধিকার গ্রহণ।' এটা অংশত এসেছিল নিরস্ত্র গ্রামের মধ্যে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব জমিদারের হাতে ছিল বলে, এবং অংশত, পূর্বতন গ্রাম-পরিষদকে সরিয়ে দেওয়ার কারণে। এর তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে আগের *মনুস্মৃতি*-তে—যেখানে ক্ষুদ্র শাসক নিজেই 'রাজা'-র মতো বিচার করছে। অথবা রাজার বিস্তৃত 'সীতা' জমিতে মৌর্য-সার্বভৌমত্ববাদ প্রতিষ্ঠার মধ্যেও। এ দুটিই পরবর্তী পর্যায়ের

সামন্ততন্ত্রের বিকাশে অবদান রেখেছে এবং যতদিন গ্রামের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ছিল না ততদিন এটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আবারও ভারতীয় ও ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের মধ্যেকার পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তুলছে: দাসপ্রথা বৃদ্ধি, সঙ্ঘগুলির অনুপস্থিতি, এবং সংগঠিত কোন চার্চ না-থাকা। সঙ্ঘ ও চার্চ উভয়েরই প্রতিস্থাপন ঘটেছিল বর্ণের দ্বারা—যা আরও আদিম কোন উৎপাদন-রূপেরই লক্ষণ এবং কারণও বটে।

মধ্যযুগের ইউরোপে বাতাস-চালিত কল, ঘোড়ার গলবন্ধনী বা ভারী লাঙ্গলের মতো যেসব যন্ত্রপাতির উদ্ভব ঘটেছিল 'উপরোদ্ভুত' দেশজ সামন্ততন্ত্র তেমন কোন কৃৎকৌশলের বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তা উভয়ের মধ্যেকার এক মৌলিক বৈপরীত্য। এসবের কতকগুলির উদ্ভাবন নিশ্চিতই চীনে হয়েছিল (যেমন, ঘোড়ার লাগাম, নৌকা বা জাহাজের পিছনদিকের হাল, হস্তচালিত তাঁত ইত্যাদি; দ্রষ্টব্য ঃ জে নীডহ্যাম, *Centaurus* 3 (1953), 1.2, p. 46-7), কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপ সেগুলি আয়ত্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছিল, ভারতের সনাতনী সমাজ যা করেনি। মার্কো পোলোর বিবরণের[২] মধ্যে এটা ভাল ফুটে উঠেছে ঃ

'বছরের সবসময়ই সবাই খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায়—এটা দেখলেই আপনারা বুঝতে পাববেন যে এই গোটা মালাবার রাজ্যে কোট কাটা বা সেলাই করার জন্যে কখনও কোন দর্জি ছিল না...! শোভনতার জন্যে এরা শুধু এক টুকরো কাপড় পরে, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র সবাই, সবসময়, এবং রাজা (সুন্দব-পান্ড্য) নিজে পর্যন্ত। ... এটা ঘটনা যে, অন্যদের মতো রাজাও খালি গায়ে থাকেন, শুধু তাঁর পাছায় জড়ানো থাকে এক টুকরো মিহি জমিনের কাপড়, আর গলায় চমৎকার সব পাথর দিয়ে তৈরি একটি হার—পদ্মবাগমণি, নীলকান্তমণি, পান্না, ইত্যাদি, অর্থাৎ কণ্ঠহারটি মহামূল্যবান। সোনা ও মণিমুক্তা থেকে শুরু করে রাজা যা পবিধান করেন তার মূল্য কোন নগরীর চেয়েও বেশি। ...এখানে ঘোড়া প্রজনন হয় না; আর তাই দেশের সম্পদের একটা বড় অংশই নষ্ট হয় ঘোড়া কিনতে। . .কিশ, এবং ওরমুজ, ধাফর ও সোহার আর এডেনের বণিকরা বিপুল সংখ্যক যুদ্ধে ব্যবহার্য ও অন্যান্য ঘোড়া সংগ্রহ করে এই রাজা ও তাঁর চার ভাই-এর রাজ্যে নিয়ে আসে। ... একটা ঘোড়া বিক্রি করে তারা আয় করে ৫০০ সন্ধি সোনা—যার মূল্য রূপোর ১০০ মার্কেরও বেশি, আর প্রতি বছরই বিপুল সংখ্যক ঘোড়া সেখানে বিক্রি হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই রাজা প্রতি বছর ২০০০-এরও বেশি কবে ঘোড়া কিনতে চান, আর তাঁর চার ভাই-ও তাই—যাঁরা প্রায় রাজারই মতো। তাঁবা যে প্রতি বছর এত বেশি ঘোড়া কিনতে চান তার কারণ, বছরেব শেষে একশোটা ঘোড়াও বেঁচে থাকবে না, সব মবে যাবে। অব্যবস্থাই এর মূলে, একটা ঘোড়াকে কীভাবে পালন করতে হয় সে-সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও এই সমস্ত লোকেদের নেই; আর তা ছাড়া, এদের কোন অশ্ববৈদ্য নেই। ঘোড়ার ব্যবসায়ীরা শুধু যে নিজেদের সঙ্গে কখনও কোন অশ্ববৈদ্য আনে না তাই নয়, কোন অশ্ববৈদ্যের সেখানে যাওয়াও আটকায়—কেননা তাহলে ঘোড়া বিক্রি করে প্রতিবছর তাদের যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা হয় তা কমে যাবে। তারা ঘোড়া নিয়ে আসে সমুদ্রপথে জাহাজে করে। .. আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার এখানে বলা দরকার, এই দেশে ঘোড়া প্রজননের কোন সম্ভাবনা নেই, বারবার পরীক্ষা করে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমনকী যখন কোন ভাল জাতের জোয়ান ঘোটকীর সঙ্গে কোন ভাল জাতের জোয়ান মদ্দা ঘোড়ার-ও মিলন ঘটানো হয় তখনও এমন বাজে পা বাঁকা রোগা ও অকেজো ঘোড়া জন্মায় যে তা চড়ার উপযুক্ত নয়। ... এ দেশে লোকে যুদ্ধ করতে যায় খালি গায়ে, সঙ্গে থাকে শুধু

একটা বল্লম আর একটা ঢাল; এবং এরা খুবই বাজে যোদ্ধা। এরা পশু বা পাখি, কিংবা প্রাণ আছে এমন কিছুই হত্যা করে না; যে সব পশুর মাংস তারা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সেগুলিকে জবাই করে স্যারাসন (Saracen), বা তাদের নিজ ধর্ম বাদে অন্য ধর্মের কষাইরা। ... (থান-এর) রাজার সঙ্গে জলদস্যুদের একটা চুক্তি আছে যে তারা যত ঘোড়া লুঠ করবে তা দিতে হবে রাজাকে, বাকি সব লুঠের মাল তাদের নিজেদের। (থান-এর) রাজা একাজ করেন কারণ তাঁর নিজের কোন ঘোড়া নেই, আর এর অনেকটাই বিদেশ থেকে ভারতে যায় জাহাজে করে; অন্য মালপত্রের পাশাপাশি কোন জাহাজই ঘোড়া না নিয়ে সেদেশে যায় না। ... প্রতি বছর (লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী আরব নগরীগুলি থেকে) ভারতে রপ্তানি করা ঘোড়ার সংখ্যা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। এর একটা কারণ সেখানে কোন ঘোড়া প্রজনন হয় না, আর একটা কারণ ঠিকমতো লালনপালন না করার ফলে ঘোড়াগুলি সেখানে পৌঁছনোর পরই মারা যায়; ঘোড়ার যত্ন কীভাবে করতে হয় তা সেখানকার লোকে জানে না, তারা ঘোড়াকে রান্না করা মানুষের খাবার ও অন্যান্য আজেবাজে জিনিস খাওয়ায়— যেমনটা আগেই আমি আপনাদের বলেছি; এবং তাছাড়াও তাদের কোন অশ্ববৈদ্য নেই।' (বেনেদেত্তো-উদ্ধৃত পৃ. ২১৫ শেষ দুটি বাক্য কোন সূত্রেই দেখতে পাওয়া যায় না।)

তৎকালীন ভারতীয় সমাজে অশ্ববৈদ্য থাকার অর্থ দাঁড়াত আর একটা নতুন জাত সৃষ্টি হওয়া। এখানকার জলবায়ুতে পোশাক আশাকের দরকার হত না, কিন্তু মণিমুক্তার প্রয়োজন তো ছিল নিশ্চিতই আরো কম। ধাতুর শোচনীয় অভাব সুদূর প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে এখনও রয়েছে, সেখানে কাজে না লাগা পর্যন্ত যে কোন ধাতুর বাতিল টুকরোও তুলে রাখা হয় যত্ন করে। দক্ষ কামার ও ধাতুবিদ, জাতবিভক্ত সমাজে যাদের উদ্ভব ঘটাটা ছিল অসম্ভব, থাকলে উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম তৈরি করতে পারত। যাই হোক, পদাতিক সৈন্যদের রক্ষা করার কাজটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল মানুষের জীবন সম্পর্কে, বিশেষ করে নিচু জাতের লোকেরা, যারা পূর্বজন্মের পাপের শাস্তি ভোগ করছিল তাদের সম্পর্কে অবজ্ঞা থেকেই। আর, কৃৎকৌশলের অভাব নয়, ক্রয়ক্ষমতার অভাবই মানুষকে বস্ত্রহীন, পাদুকাহীন, গৃহহীন করে রেখেছিল, যেমনটা এমনকী আজও রেখেছে।

'এই (অন্ধ্র) রাজ্যে তৈরি হয় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে কোমল রেশমী কাপড়, আর সেগুলি সবচেয়ে দামী-ও; প্রকৃতপক্ষে, সেগুলি দেখতে অনেকটা মাকড়সার জালের মতো। (মালাবার) উৎপাদন করে অত্যন্ত নরম ও সুন্দর রেশমী কাপড়। ... (থান থেকে) বিপুল পরিমাণে রপ্তানি হয় নানা ধরনের চামড়া, এবং সেইসঙ্গে ভাল রেশমী কাপড় ও তুলো। ... যথেষ্ট পরিমাণ তুলো (কাম্বে থেকে) রপ্তানি করা হয় বিভিন্ন অঞ্চলে; আর ভালভাবে সংস্কার করা পশুচর্মের ব্যবসা হয় বিপুল পরিমাণে; সঙ্গে থাকে আরও নানাধরনের পণ্যদ্রব্য, যেগুলির উল্লেখ করতে গেলে খুব একঘেয়ে লাগবে। ... (গুজরাটে) প্রতিবছর (সব ধরনের চামড়া) এত বেশি পরিমাণে সংস্কার করা হয় যে সেগুলি আরব দেশে ও অন্যান্য জায়গায় রপ্তানি করতে বহু জাহাজ লাগে। লাল ও নীল চামড়া দিয়ে সুন্দর সুন্দর সব মাদুরও তৈরি হয় এখানে ... সোনা ও রূপোর তার দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে সেগুলির ওপর সূচিকর্ম করা হয় ... এরকম অনেক মাদুরের এক একটার দাম দশ মার্ক।'

ভেনিসিয় পর্যটক তাঁর তৃতীয় গ্রন্থে এই কথাগুলি লিখেছিলেন, এবং সেখানে কোন অতিশয়োক্তি নেই; কেননা অন্ধ্রের বিভিন্ন অংশে এখনও দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর চমৎকার সব মিহি কাপড় হাতে বোনা হয়।

ভাল ঘোড়া ভারতীয় জলবায়ুতেও জন্ম নিতে পারত, তবে ভাতের সঙ্গে মাংস মেখে খাওয়ালে তা হয় না। ঘোড়ার ব্যাপারে পাণ্ড্য রাজ্যের চেয়ে সুনিশ্চিতভাবেই উন্নত এক সময় ও স্থানে *অর্থশাস্ত্র* (২.৩০) বলছে ঃ

'উৎকৃষ্ট ঘোড়ার (খাবারের) জন্য দুই *দ্রোণ* (পরিমাণ) চাল, বার্লি বা অন্য কোন দানাশস্য ভিজিয়ে বা সিদ্ধ করে, তার সঙ্গে সিদ্ধ মুগ ডাল বা মাসকলাই মেশাতে হবে; এক *প্রস্থ* (পরিমাণ) তেল, ৫ *পল* (ওজনের) লবণ, ৫০ *পল* মাংস, এক *আধক* ঝোল, কিংবা দুই *আধক* দই, ৫ *পল* চিনি এক *প্রস্থ* সুরা বা দুই *প্রস্থ* দুধের সঙ্গে মেশাতে হবে।'

মার্কো পোলো-র পর্যবেক্ষণ সঠিক, এবং বোঝা যাচ্ছে, *অর্থশাস্ত্র* পড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা রাজাকে নিশ্চয়ই যথাযথ পরামর্শ দিয়েছিল। সুন্দর পাণ্ড্য-র জ্ঞানী ধর্মতত্ত্ববিদরা হয়ত তাঁকে শঙ্কর ও রামানুজের তত্ত্বের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলিও বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল; পুরোহিতরা তাঁর হয়ে একেবারে নিখুঁতভাবে প্রাচীন বৈদিক অশ্ববলির ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। রাজা যেটা করতে পারেননি তা হল উপযোগী ঘোড়া বা তার পরিপূরক কোন পশুসম্পত্তি উৎপাদন করতে। উত্তরাঞ্চলের গবাদি পশু, বিশেষ পদ্ধতির কারণে যা উৎপন্ন করা যেত না, সেগুলিরও আমদানি করা ঘোড়ার মতোই, বংশবৃদ্ধি ঘটছিল না। গোরু পূজার পক্ষে যথেষ্ট পবিত্র ছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের ঠিকমতো খাওয়ানো বা বাছুর নির্বাচনের ভার যাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তারা নিজেরাই ঠিকমতো খেতে পেতো না, আর তাই ভাল গোরুর ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথাও ছিল না। এ কথা এমনকী আজও উপলব্ধি করা হয়নি যে তথাকথিত হ্রাস প্রাপ্ত প্রজাতির ভেড়া, গোরু, ঘোড়া ও কুকুরকে যদি ঠিকমতো নির্বাচন, মিলন ও উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া যায় তাহলে যে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটবে তা স্থানীয় কাজের পক্ষে আমদানি করা পশুব চেয়ে অনেক বেশি উপযোগী হবে।

আরব দেশের সেরা ঘোড়াগুলি যে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে এসে পৌঁছবে, সেটাই ছিল অবশ্যম্ভাবী। কেননা তাদের পিঠে চেপেছিল সেই মানুষরা—যাদের কোন জাত ছিল না এবং সামাজিক অবস্থান ব্যক্তিগতভাবে অশ্ব-পরিচর্যার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি; আর প্রায়শ ঘোড়াগুলির বংশলতিকাও ছিল তাদের মালিকদের বংশলতিকার চেয়ে ঢের বেশি লম্বা। সংযুক্ত বক্ষ ও পৃষ্ঠত্রাণ বা লোহার আংটা গাঁথা বর্মে সজ্জিত (*ডি. বি.* ১১৯) এই নতুন আক্রমণকারীরা (আরব, তুর্কি, মোঙ্গল, বা মিশ্রিত-রক্তের মুসলমানরা) ভারতের যে কোন তরবারির চেয়ে অনেক উন্নতমানেব ইস্পাত দিয়ে তৈরি তরবারি এবং ভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর যে কোন অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি নিক্ষেপ-ক্ষমতাসম্পন্ন ধনুক নিয়ে অনবচ্ছিন্নভাবে দেশের অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছিল। আলাউদ্দিন খলজি, যিনি ভাইদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন আর এক সুন্দর পাণ্ড্য কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন (মার্কো পোলো এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন), তাঁরই সেনাপতি মালিক কাফুরের হাতে অরক্ষিত মাদুরার পতন ঘটে ১৪ই এপ্রিল ১৩১১-এ। ভারতীয় যুদ্ধবিগ্রহে প্রথম অশ্ব ব্যবহারকারী আর্যদের আধ্যাত্মিক উত্তরসূরিরা তাদের অতীত থেকে শিক্ষা নিতে অস্বীকার করেছিল। সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়া হয়েছিল *অর্থশাস্ত্র*-এর যুক্তিসম্মত অংশগুলি, তার যুদ্ধ-কৌশল সমেত; এমনকী দীর্ঘ ধনুক ও তার অপ্রতিরোধ্য তীরের অস্তিত্বও মনে হয় হ্রাস পেয়েছিল, স্থানিক কিছু ব্যতিক্রম বাদে (*ডি. বি.* ১৮১)। তবু, ভারতীয় সামন্ততন্ত্র,

ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের মতোই, নির্ভরশীল ছিল অস্ত্র আর অশ্বের ওপর। গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষার কৌশল শিখে গেলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে, তাদের প্রতিরক্ষাহীন করে রাখাটা ছিল ঢের বেশি সহজ।

ভেনিসিয় পর্যটকের বিবৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা সেখানে অবিশ্বাস্য, নতুন, সামন্ততান্ত্রিক সম্পদ-পুঞ্জীকরণ ও এক নতুন শ্রেণী—অদ্ভুত ধরনের এক সামন্ততান্ত্রিক ভূ-সত্বাধিকারী জমিদারশ্রেণীর উদ্ভবের প্রমাণ আছে। দাক্ষিণাত্যে দশম শতাব্দী ও তার পরবর্তীকালের শিলালেখগুলিতে এদেরই রাষ্ট্রকূট বা এই ধরনের নামে অভিহিত করা হয়েছিল (*ই. আই.* ৫. ১১৮-১৪১; ২৭.৪১-৭; ৩.২২১-৪, ইত্যাদি)। মার্কো পোলো লিখছেন ঃ

'আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে এই রাজার অধীনস্থ অনেক ভূসত্বাধিকারী রয়েছেন, আর তাঁরা এরকম। যেহেতু তাঁরা ইহলোকে তাঁদের প্রভুর অধীনস্থ ভূ-সত্বাধিকারী এবং রাজা যেখানেই যান এই জমিদাবরা যান তাঁর সঙ্গে সঙ্গে; তাঁরা রাজার সঙ্গে রাজসভায় থাকেন; অশ্বারোহণকালেও তাঁর সঙ্গী হন; তাঁকে ঈশ্বরের মতো ভক্তি করেন; এবং রাজা যেখানেই যান এই জমিদাররা হন তাঁর সঙ্গী; এবং রাজ্যের সর্বত্রই তাঁদের প্রবল কর্তৃত্ব আছে. এবং শুনুন, রাজা মারা গেলে তাঁর মৃতদেহ যখন চিতায় পুড়তে থাকে, তখন এই সমস্ত জমিদাররা যাঁরা তাঁর ভূ-সত্বাধিকারী ছিল—যেমনটা আমি আগেই বলেছি—নিজেদের সেই অগ্নিতে প্রক্ষেপন করেন এবং আত্মাহুতি দেন রাজাকে পরলোকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। ... রাজা যখন মারা যান, এবং বিপুল ধনসম্পদ রেখে যান, এবং তাঁর জীবিত পুত্ররা পার্থিব কোন কাবণেই তা স্পর্শ করেন না। . . এবং সেই কারণেই এই রাজ্যে অতি বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ সঞ্চিত রয়েছে।'

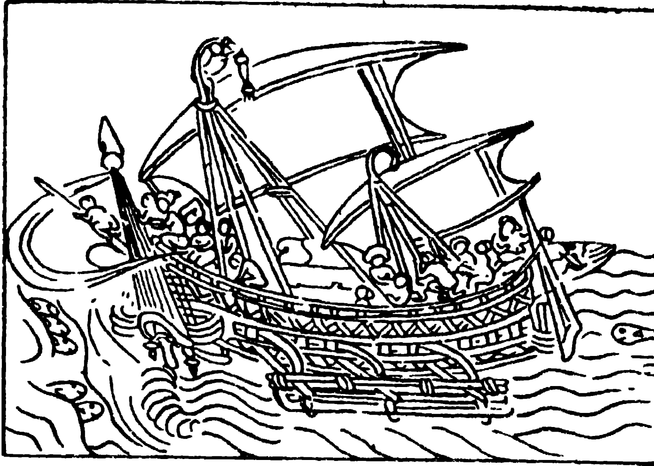
মৃত্যুর পরে স্থাবর সম্পত্তির এই উত্তরাধিকারের উল্লেখ শিলালেখগুলিতেও পাওয়া যায় (*ই. সি.* ১০, কোলার ১২৯, আনু. ১২২০ খ্রী.; মুলবাগল ৭৭-৮, আনু. ১২৫০ খ্রী.)। কোন ভৃত্য কিংবা বিশ্বস্ত অনুচর হয়ত কোন উপলক্ষ্যে তার প্রভুর—কোন গ্রামের 'ওড়েয়া' প্রধানের চেয়ে উচ্চ কোন পদে যে ছিল না—মৃত্যুর পর নিজের মাথা বলি দিয়ে থাকতে পারে (*ই. সি* ১০, চিন্তামনি ৩১, প্রায় ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের, এবং সম্ভবত গোরিবিন্দুর ৭৩, ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের)। অন্যত্রও কেউ অনুরূপ ঘটনার কথা পড়ে থাকতে পারেন (Masudi *Prairies d'or,* trans. de Meynard-Courteille, 2.86)। এটাকে যেমন আদিম মনে হয়, এর তাৎপর্য কিন্তু সেই আদিমতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে; এই অর্থে যে প্রধানের প্রতি আনুগত্য অন্য সব বিচার-বিবেচনাকে অতিক্রম করছে—যার মধ্যে, পূর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য, তা সে উপজাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, বা বৃহৎ পিতৃতান্ত্রিক পরিবার যাই হোক না কেন। ক্রমোচ্চ শ্রেণী-বিন্যাসে উর্দ্ধতনের প্রতি এই ব্যক্তিগত আনুগত্যই সামন্ততন্ত্রের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াকে সংঘটিত করে। একবার রাজারা যখন সামন্ত জমিদারদের হাতে উচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে আরম্ভ করেছিল তখন এই শ্রেণী বিন্যাসও ছিল অবশ্যম্ভাবী। উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের অন্তিম পর্যায়ের এই কালকে খুব সহজেই সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। কেননা, হুন হানাদার মিহিরগুল-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের কথা সদম্ভে ঘোষণা করতে গিয়ে ৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ যশোধর্মন সামন্ত বলতে বুঝিয়েছিলেন—'রাজবংশীয় প্রতিবেশী' (*ফ্লিট* ৩৩)। ৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এর অর্থ দাঁড়াল কেবলই 'সামন্ততান্ত্রিক জমিদার'

(*ই. আই.* ৩০. ১৬৩-১৮১)। ঘটনাক্রমে এ থেকে বোঝা যায় যে, *অমরকোষ* লেখা হয়েছিল ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, অথবা হয়ত তারও একশ বছর আগে গুপ্ত রাজসভায়। অন্যদিকে কবি ভর্তৃহরির কাল-কে সরিয়ে আনতে হবে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে, বা হয়ত আরও একশ বছর পরে।

১০.২ প্রকৃত মূলগত আন্দোলনটা ছিল নব্য বণিকশ্রেণীর প্রতিরূপ আর একটা শ্রেণী সৃষ্টির অভিমুখী। আন্তর্জাতিক পরিসরে বাণিজ্য খুবই লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যা বৃহৎ বন্দরগুলিকে প্রত্যক্ষ করলেই বোঝা যেত (চিত্র ৪৮)। মৌসুমী বায়ু, স্রোত, নদীর মোহানা, জাহাজ নোঙর করার উপযোগী উপকূলের নিকটবর্তী সমুদ্রের অংশ, বন্দর, এবং জলদস্যু—এ সব কিছুর কথাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জানা ছিল। অন্ততপক্ষে মালাবার উপকূল দিয়ে বাণিজ্য চালানো হত চার-মাস্তুল ও পিছনের স্তম্ভবাহিত-হাল সমন্বিত দক্ষিণ-চীনের জাহাজে করে। জাহাজগুলির অন্তত দশ ফুট অংশ থাকত জলের নীচে, আর ভিতবে থাকত ২০০ থেকে ৩০০ নাবিক ; একটি ডেকে বণিকদের জন্য ৫০ বা ৬০টি স্বতন্ত্র কেবিন, জল ঢুকতে পারে না এমন তেরোটি মালঘর যাতে ৬০০০ ঝুড়ি গোলমরিচ নিয়ে যাওয়া যেত এবং প্রতিটি জাহাজের সঙ্গে থাকত অজস্র বড় বড় মালবাহী নৌকো; এ সব কিছুই এক অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক বিনিময় বৃদ্ধিরই প্রমাণ (*মার্কো পোলো* ; গ্রন্থ ৩, অধ্যায়-১; *বেনেদিত্তো* পৃ. ১৬১-২)। এই ধরনের বড় বড় চীনা জাহাজে করে পরবর্তী বেশ কয়েক শতাব্দী ধরেই প্রাচ্য থেকে পণ্য রপ্তানি বা আমদানি করা হয়েছে (*বতুতা* ২৩৫-৬)। কায়ল (মার্কো পোলো-র চায়েল) এবং তিন্নেভেল্লি জেলায় তাম্রপর্ণী নদীর মোহানায় কোরকেই (সম্ভবত টলেমির কোলখোই)-তে প্রণালীবদ্ধভাবে খননকার্য চালালে এটা আরো ভালোভাবে প্রমাণ হবে। প্রথমোক্ত স্থানে মিলতে পারে অসংখ্য ভাঙ্গা চীনামাটির পাত্র (*আই. এ.* ৬.১৮৭৭.৮০-৮৩)। চীনা প্রভাবের (যার কিছুটা এসেছিল উত্তর থেকে স্থলপথে) অন্য লক্ষণগুলি হল বিজাপুরের বোলি গম্বুজ-এর মিনারগুলি, আর সেখানে চীনামাটির বাসন তৈরির কারখানার সাক্ষ্যও আছে। মান্নারগুড়ি ভাণ্ডারের চীনা মুদ্রা কেবলমাত্র সমুদ্রপথেই এসে থাকতে পারে এবং ভাণ্ডারটি নিঃসন্দেহে গড়ে উঠেছিল কোন সংগ্রাহকের নিজস্ব সম্পদ হিসেবেই। জিম্বাবোয়েতে এবং আফ্রিকার সমগ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে যে সব মধ্যযুগীয় চীনা সামগ্রী পাওয়া গেছে সেগুলিও এই ধরনের জাহাজে করেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মুসলমানরা আরব থেকে পণ্য নিয়ে প্রাচ্যে, প্রধানত ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায়, গিয়েছিল। ভারতীয় নৌ-পরিবহণ ছিল অদ্ভুত ধরনের অদক্ষ। পশ্চিম উপকূলের গবিট-ডুমরি নামের জেলে-নাবিক জাতটির পূর্বপুরুষরা সম্ভবত আরব বংশীয়, দেশান্তরী পেশাদার নাবিকদের অভিবাসনের ফলেই হয়ত গড়ে উঠেছিল। শাতবাহন-*জাতকে*-র সময়কার সমুদ্রযাত্রার মহান ঐতিহ্য গুপ্তযুগ এবং আগেকার শিল্পনৈপুণ্যের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ইন্দোনেশীয় মন্দির-স্থাপত্যকলার আদিরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলার পাহাড়পুরে (*আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া,* রিপোর্ট, ১৯২৯) একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোল কিছু সময়ের জন্য সমগ্র বঙ্গোপসাগরে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু তার কোন স্থায়ী প্রভাব পড়েনি। ইন্দোনেশীয় নথিপত্রে এক অজ্ঞাতনামা রাজার উল্লেখ আছে যিনি, সম্ভবত গুজরাট থেকে, ৫০০০ অনুগামী নিয়ে সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে জাভায় এসেছিলেন। এটা আপাত দৃষ্টিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা দেশের অভ্যন্তরে সেই সময় হর্ষের মতো সাম্রাজ্যগুলির চাপ সহ্য করার ক্ষমতা

কেবলমাত্র পুলকেশী-র মতো রাজত্বগুলিরই ছিল, বন্দর নগরীগুলির ক্ষুদ্র নৃপতিরা তা পারত না। এ থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় জাহাজগুলি তখন নিজেদের উৎপাদন ক্রমশই কম করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, যদিও সেই উৎপাদনের আয়তন ও মূল্য ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। নিজস্ব



চিত্র ৪৮ : বোরোবুদুর-এর রিলিফে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়কার সমুদ্রগামী ইন্দোনেশীয় জাহাজ ; লক্ষ্যণীয়, জাহাজটির কোন দাঁড় নেই, কিন্তু দিকনির্দেশক মাস্তুলের পরিবর্তে আছে বহির্কাঠামো ও দিকনিয়ন্ত্রক বৈঠা।

উৎপাদনের এই বাণিজ্যিক অক্ষমতা গ্রাম-অর্থনীতিরই এক ফলশ্রুতি এবং এর অর্থ, বিদেশী প্রভাব বা আধিপত্যের ফলে উৎপাদন-ভিত্তিতে সম্ভাব্য কোন পরিবর্তন ঘটেছিল। মার্কো পোলোর সমসাময়িক (১২৯২ খ্রী. নাগাদ) ফ্রিয়ার মেনেতিল্লাস পশ্চিম উপকূল সম্পর্কিত বিবরণীতে লিখেছেন ঃ

'কারিগরদের সংখ্যা খুবই কম, কেননা কারিগরি ও কারিগরদের মূল্য খুব নগণ্য এবং তাদের কাজের সুযোগও অত্যন্ত সীমিত। ... যদি কোন যুদ্ধ শুরু হয় তারা তাড়াতাড়ি তাতে যোগ দেয়, সেনাবাহিনী যত বড়ই হোক না কেন; কেননা তারা যুদ্ধে যায় খালি গায়ে, তলোয়ার আর ছোরা ছাড়া সঙ্গে কিছুই নেয় না। ... এই অঞ্চলে এদের জাহাজগুলি বিস্ময়কর রকমের পলকা আর জবুথবু, তাতে কোন লোহা নেই, নেই কোন জলনিরোধক ব্যবস্থা। এগুলি যেন পাকানো সুতো দিয়ে একসাথে সেলাই কবা কাপড়ের মতো। ... জাহাজের হালগুলি পাতলা আর দুর্বল, অনেকটা টেবিলের উপর দিককার মতো; মাস্তুল স্তম্ভের মাঝখানটা এক হাতের মতো চওড়া এবং পাল টাঙানোর সময় অনেক ঝক্কি পোয়াতে হয়; আর বাতাস যদি কখনো খুব জোরে বয় তাহলে পাল আদৌ টাঙানো যায় না। জাহাজগুলিতে একটার বেশি পাল ও মাস্তুল থাকে না এবং পালগুলি, হয় দড়ির মাদুর দিয়ে আর না হয় কোন বাজে কাপড় দিয়ে তৈরি। দড়ি হয় নারকেলের ছোবড়া থেকে। তার ওপর এদের নাবিকের সংখ্যা খুব কম এবং তারা মোটেই দক্ষ নয়। সুতরাং, অনেক ঝুঁকি নিয়ে জাহাজ চালাতে

হয় বলে যখন কোন জাহাজ নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায় সমুদ্রযাত্রা শেষে ফিরে আসে তখন তারা একথা বলতেই অভ্যস্ত যে 'সবই ঈশ্বরের কৃপা, মানুষের ক্ষমতা আর কতটুকু!' (*ইউল* ৩.৬৬)।... জানা দরকার যে পৌত্তলিক (হিন্দু)-রা জাহাজে করে খুব বেশি পণ্য নিয়ে যায় না, পণ্যদ্রব্য নিয়ে যায় মুররা; কেননা কালিকটে অন্তত্পক্ষে পনের হাজার মুর রয়েছে, তারা বহুলাংশে এই দেশেরই মানুষ।' (বার্থেম ৬১)

'একসাথে সেলাই' করার কাজ পশ্চিম উপকূলে আজও হয়; তক্তাগুলির একটাকে আর একটার সঙ্গে ঠিকভাবে লাগিয়ে উভয় তক্তাতেই ছিদ্র করা হয় (আগে এ কাজ করা হত গবম লোহার রড বা তার দিয়ে), তারপর কাজু-বাদাম গাছের আঠালো কষে ভেজানো ছোবড়া, সিসল গাছের আঁশ বা পাটের দড়ি সেলাই করার মতোই ওই ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। পাল (এখন কারখানায় তৈরি ত্রিপল) ও হাল-এর এখন উন্নতি হয়েছে, তবু আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে উৎপাদনের সেকেলে যন্ত্রপাতি এখনও পীড়াদায়কভাবে বিপুল পরিমাণে রয়ে গেছে (এবং তা শুধু সমুদ্রযাত্রার ক্ষেত্রেই নয়)। কৃৎকৌশলগত খামতির—যা চীন ও ভারতের মধ্যেকার এক বড় পার্থক্য—গুরুতর আনুষঙ্গিক প্রভাব প্রশাসনেও পড়েছে ঃ বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও মুসলমানরা প্রায়শই বিভিন্ন বন্দরে প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছে (*ইউল* ৩.৬৮) এবং তার রাজনৈতিক পরিণাম হয়েছে দুর্ভাগ্যজনক। আদা, গোলমরিচ, মশলাপাতি, তুলা ও বস্ত্র, নীল, কাঁচা ও পাকা চামড়া, গালিচা ও মণিমুক্তা—এ সবই ছিল রপ্তানী পণ্য। বন্দর-বণিকদের অস্তিত্বের অর্থই হল কিছু গ্রামের পূর্বতন বদ্ধ-অর্থনীতির উপর সমূহ আঘাত, এবং সেই সঙ্গে তা দলবদ্ধভাবে পণ্য নিয়ে আসা অভ্যন্তরস্থ বণিকদের অস্তিত্বেরও প্রমাণ; এরা তখন গ্রামাঞ্চল থেকে তাদের যোগান পাচ্ছিল—গ্রামবসতি স্থাপনের আগে তাদের মুষ্টিমেয় পূর্বসূরিরা যা পায়নি। এই যোগানের অর্থ আবার, কিছু লোকের হাতে কোন উদ্বৃত্ত সঞ্চিত হওয়া—যাদের সঙ্গে বণিকরা পণ্য বিনিময় করতে পারত। এই লোকগুলি, নিচে থেকে সামন্ততন্ত্রের আলোচ্য যুগে, ছিল সাধারণভাবে ছোটখাটো সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও ভূস্বামী। উপরদিকের সামন্তপ্রভুরা উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করত কর হিসাবে, কিন্তু সাধারণত তারা নিজেরা তার বিপণন করত না—কেবল মাত্র কর হিসেবে পাওয়া নতুন মুক্তো (যেমন, কন্যাকুমারী উপকূলে যত মুক্তো তোলা হত তার দশ শতাংশ), বা ঘোড়া ও বিলাসদ্রব্য কেনার সময় ছাড়া। তার ফলে দেশের ভিতরকার ছোট ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার তেমন ঘটেনি। নিজেদের আশু প্রয়োজনের বাইরে বেশি করে মশলা উৎপাদনের কোন তাগিদ গ্রামবাসীদের ছিল না—যদি না বিপুল কর, বলপ্রয়োগ, বা পরবর্তীকালে মুনাফার তাড়নায় তারা বাধ্য হত। সামন্ততান্ত্রিক শাসকরা সাধারণত (দ্রষ্টব্য, *মনুস্মৃতি* ৮.৩৯৯-র মেধাতিথি) স্থানীয় কিছু উৎপাদন —যেগুলির অসামান্য বাণিজ্য-মূল্য ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলির দ্বারা প্রমাণিত হত—সেগুলির ওপর একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করত; যেমন, কাশ্মীরে জাফরান, ত্রিবাঙ্কুরে গোলমরিচ (*এফ ও এম* ১.২৪৬), মহীশূরে চন্দনকাঠ। এর অর্থ অবশ্য *অর্থশাস্ত্র*-র বর্ণনা মতো প্রত্যক্ষ বাণিজ্য বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বিকাশ নয় বরং নিছকই অধিকতর কর চাপানো এবং সম্ভবত অন্যের উপর হুকুম জারি করার বিশেষাধিকারের প্রয়োগ। পরবর্তীকালে সামন্ততান্ত্রিক প্রাদেশিক শাসকরা কয়েক ধরনের ব্যবসা করে আয় বাড়িয়েছিল। সেই সঙ্গে উপশুল্ক ও পথ-করগুলিও পণ্য-উৎপাদনের ওপর সাধারণভাবে চেপে বসেছিল।

বাজারের জন্য কিছুটা পরিমাণে পণ্য-উৎপাদনকারী এক ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব লক্ষ্য করা যায় গোয়ার গ্রামসংঘগুলিতে। দশম শতাব্দীর মধ্যেই (অব্রাহ্মণ) সামন্তদের গ্রাম দান—খুব বিরল হলেও শুরু হয়ে গিয়েছিল (*ই. আই.* ২৭.৪১.৭); কখনও কখনও তা দেওয়া হত যুদ্ধে অংশ নেওয়ার প্রতিদান হিসেবে। এই দানগুলি ছিল প্রায়শই করমুক্ত, কিন্তু কোন উপলক্ষ্যে রাজার বিশেষাধিকার বলে এই দান থেকে কিছু কর, এমনকী ব্রাহ্মণের কাছ থেকেও, নেওয়া হত। এই ধরনের করগুলির মধ্যে ছিল 'চোর-দণ্ড' (*ফ্লিট,* ২৭)—যা গ্রামের মধ্যে কোন ডাকাতির জন্য জরিমানা হিসেবে ধার্য করা হত; কিন্তু বিশেষ বন্দিত্ব-মোচন বা 'তুরস্কদণ্ড'-এর (*ই. আই* ৯.৩০৫, ৩২৯; ১০.২১; *আই. এইচ. কিউ* ৯.১২৮) মতো করগুলি—যেগুলির সংখ্যা সমানে বেড়ে চলেছিল—তা সব সময় এর অন্তর্ভূক্ত ছিল না। এই সমস্ত করের অধিকাংশ সবসময়ই চালু ছিল। যেমন, গোয়াতে 'ঘোড়া-কর' প্রথমে চালু করেছিল বিজয়নগরের রাজারা—গ্রামাঞ্চলকে ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, পরে তা চালু থাকে মুসলমান এবং পর্তুগীজদের আমলেও। গোয়ার গ্রামবাসীরা কোনদিনই অশ্বারোহী ডাকাত দেখত না—কেননা ডাকাতরা পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক পদবী (রাণে) দাবি করে গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাদের লুণ্ঠন চালিয়ে গেছে। ব্রিটিশরা নিছকই বিভিন্ন অনিয়মিত সামন্ততান্ত্রিক আদায়গুলিকে (যেমন, মারাঠা চৌথাই, সর-দেশমুখী, ইত্যাদি) একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। কর-সংগ্রহ, প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর কাজকর্ম তদারকির জন্য রাজার আত্মীয়দেরই যত বেশি সম্ভব নিয়োগ করা হত। ওপর থেকেই নতুন রাজকর্মচারীর সংখ্যা বাড়ছিল—যেমন 'রাণক', মূলত যার অর্থ ছিল রাজপরিবারের সদস্যভুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা। এরই ব্যুৎপত্তিগত শব্দ 'রাণা' বলতে বোঝাত কোন স্বাধীন সর্দার। 'ঠক্কুর'-এর প্রচলনও এই সময়ই ঘটে—পরে যা 'ঠাকুর' পদবী (যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ও জমিদারের খেতাবের রূপ পায়। আগে, বিশেষ অনুমতি না পেলে বিনা কর-ছাড়ে, এমনকী ব্রাহ্মণরা-ও ঠক্কুর হতে পারত, অর্থাৎ খেতাবটি সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কযুক্ত (এরসঙ্গে তুলনীয়, সামন্ততান্ত্রিক 'নার্গাবুন্ড', *ই. আই* ২৭.১৭৯, অক্টোবর ২৭, ১১১৫ খ্রী.)। রাজার দান হিসেবে পাওয়া জমির মালিক ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি, নিচে থেকে স্পষ্টতই একটা নতুন ভূস্বামী শ্রেণী নিয়মিতভাবে গড়ে উঠছিল। চালুক্য ভূমিদান সনদে উল্লিখিত 'রাষ্ট্রকূট'-রা ছিল এই শ্রেণীরই অন্তর্ভূক্ত (দ্র. *ই. আই* ৫.৭৯; ১১৮-১৪১) এবং সাধারণ কৃষিজীবী বসতিস্থাপনকারী 'কু-উমবিন'-দের উপরে ছিল এদের স্থান। শেষোক্ত নামটির অর্থ নিছকই 'এক পরিবারভুক্ত', এবং শেষপর্যন্ত তা 'কুণবি' নামে কৃষকদের এক বৃহৎ আধুনিক জাতে রূপান্তরিত হয়। অন্যদিকে, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তা 'রাষ্ট্রকূট' বা ইলোরার বড় গুহাগুলিতে প্রাপ্ত ঐ নামের রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দক্ষিণের কৃষক ও বণিক জাত রেড্ডিদের সঙ্গেও। সুস্পষ্টভাবেই, এদের অস্ত্রধারনের অধিকার ছিল—যে অধিকার সাধারণ বসতি স্থাপনকারীদের দেওয়া হয়নি, এবং এভাবেই তারা আমাদের নিয়ে আসে প্রকৃত নিচে থেকে উদ্ভূত সামন্ততন্ত্রের কাছাকাছি—যা সম্পূর্ণতা পায় যখন এই ধরনের সুবিধাভোগী, সশস্ত্র, ভূমিমালিকদের ওপর দায়িত্ব পড়ে কর-সংগ্রহের।

যুদ্ধে, বা এমনকী হানাদারদের আক্রমণের হাত থেকে গ্রাম রক্ষা করতে গিয়ে নিহতদেরও প্রায়শই জমি দান করা হত নিষ্কর। এই ধরনের মৃতদের উদ্দেশ্যে নির্মিত 'বীরগল' স্মৃতিসৌধগুলিকে শনাক্ত করা যায় মাথার কলসাকৃতি রিলিফ থেকে এবং হামেশাই সেগুলি

দেখতে পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্য ও মহীশূরে; আর এর স্থাপত্য থেকেই বোঝা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের দাঙ্গা হত গবাদি পশু লুঠ করার সময়। জমি দান-সনদের নমুনা পাওয়া যায় *ই সি* ১০, কে এল. ৭৯, কে এল ২০০, কে এল ২৩২-৩-এ, যেগুলির সময়কাল ৭৫০ থেকে ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে, একই সময়ের আরো জমিদান-সনদ পাওয়া গেছে যেগুলিতে করের কোন উল্লেখ নেই, অর্থাৎ তা দিতে হত। ১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বৌরিঙপেট-২৮ এ আমরা দেখি যে, সামন্ত প্রতিনিধিদের তাঁত, স্বর্ণকারবৃত্তি ও ঘোড়ার ওপর সহ সব ধরনের সম্পদের ওপর কর আদায় করার অধিকারই শুধু ছিল তাই নয়, তা দান করার অধিকারও ছিল। ঠিক কোন সময় থেকে রাজা এই সব অধিকার অন্যদের হস্তান্তর করেছিল তা নির্ধারণ করা সহজ নয়, কেননা প্রথম দিককার সমস্ত দানই করা হয়েছে মন্দির কিংবা ব্রাহ্মণকে, করমুক্তভাবে, রাজার নিজের নামে।

কাশ্মীরের ঘটনাবলী থেকে এর সবচেয়ে ভাল ছবি ফুটে ওঠে।[৩] এই উপত্যকাটি ছিল কার্যত বদ্ধ, সহজে আত্মরক্ষার উপযোগী ও তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন। কলহনের বিবরণী (*রাজতরঙ্গিনী*)-তে বিকাশের গতিপথটি স্পষ্ট হয়েছে—যা প্রত্নতত্ত্ব ও আঞ্চলিক স্থান-নামগুলির দ্বারা সুন্দরভাবে প্রত্যয়িত; সূত্রের অভাবে ভারতবর্ষের অন্য কোন ক্ষেত্রের পক্ষে এমনটি পাওয়া দুরূহ। চম্বার মতো হিমালয়ের অন্য উপত্যকা—যেগুলি উপরোল্লিখিত সামন্ততন্ত্রের পরিচয়বাহী হিসেবে এখনো যথেষ্ট রক্ষণশীল, সেগুলির থেকে কাশ্মীর ছিল স্বতন্ত্র। কাশ্মীরের পক্ষে পণ্য-উৎপাদন ও দূর-বাণিজ্য ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হিমালয় অঞ্চলের জলবায়ুতে স্বাভাবিকভাবেই কিছু পশম ও মদ উৎপাদন হত এবং তা বিনিময় হত খাদ্যশস্যের সঙ্গে—যা শুধু সংকীর্ণ উপত্যকাগুলিতে কিংবা পাহাড়ের গায়ে বিশেষভাবে তৈরি চত্বরেই শুধু জন্মাতে পারত। তাছাড়া, একটি মূল্যবান পণ্য—যা গিরিপথগুলি দিয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হালকা এবং যার চাহিদাও সবসময় অপূর্ণ থাকত—সেই জাফরান ছিল কাশ্মীরের একচেটিয়া উৎপাদন, ভারতবর্ষের অন্য আর কোথাও তা হত না। এর বিনিময়েই কাশ্মীর লবণ, কিছু ধাতু, বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী আমদানি করতে পারত। আবার, এর রপ্তানি থেকে কিছু সম্পদও সঞ্চিত হয়েছিল—যা কখনও কখনও কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাশ্মীরী রাজাকে বহির্আক্রমণ চালাতে বা বিদেশী রাজাকে কাশ্মীরে হানা দিতে প্ররোচিত করেছে। রাষ্ট্র যখনই যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে, জাফরানের একচ্ছত্রাধিকার গেছে রাষ্ট্রের হাতে। দুরধিগম্য পরিবহণ, ঘনবসতির অসম্ভাব্যতা, উপজাতি-ডাকাত-বন্যপশুর হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির কারণে গ্রামাঞ্চলকে নিরস্ত্র করার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। কাশ্মীরে জাতপাত ব্যবস্থাও ছিল সাংঘাতিক রকমের শিথিল। কোন ব্যবসায়ী বা গ্রামের মুখিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করে কিছু উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করতে পারলেই, যে কোন জাতপাতের কিছু পোষ্যকে অস্ত্রসজ্জিত করে লোকজনের ওপর হুকুম চালাত এবং নিজ নিজ এলাকায় কর্তৃত্ব করত। এরা কর আদায় করত, কিন্তু তা থেকে রাষ্ট্রকে কিছু দিত না। ফলে, রাজা ও এই ধরনের 'ধামার'-দের মধ্যে পরস্পরকে উচ্ছেদের জন্য লড়াই শুরু হয়ে যেত এবং শেষপর্যন্ত ছোট মাত্রার এই সামন্ততন্ত্রই জয়ী হত বিভিন্ন নামে। সম্পদ বৃদ্ধি পেত একের পর এক দুর্ভিক্ষের সময় যখন শস্যাগারের মালিক হওয়া মন্ত্রী, রাজ (তন্ত্রিন) রক্ষী, ও অন্যরা চড়া দামে শস্য বেচে দিত। স্থানীয় সমর্থন আদায়ের জন্য রাজা প্রায়শই তার নিজস্ব সামন্ত-জমিদার তৈরি করত, উল্টোদিকে বিরোধী সামন্ত-জমিদাররা তাদের নিজেদের রাজা ঠিক করত, অথবা রাজসিংহাসনের পছন্দমাফিক দাবিদারদের সমর্থন করত।

পরোক্ষভাবে, সংকট বাড়িয়ে তুলেছিল বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলিই। এ সবই শুরু হয়েছিল অনেক আগে, কিন্তু মহারাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় যখন প্রথম এর ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন তা থেকে এক নতুন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়—যা ঐ রাজাকে এক বলিষ্ঠ সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এরপর ললিতাদিত্য—নীচের অন্তত মালওয়া এবং সম্ভবত সমুদ্রে পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হানা দিতে শুরু করেন। তাঁর বংশধররা উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলেন ব্যয়বহুল কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী, প্রশাসন, বিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের ঐতিহ্য (রাজসভায় উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্যচর্চা সমেত), মন্দিরগুলিকে বিপুল দানধ্যান, এবং সেই মূল্যবান পরামর্শ যে, টিকে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনের বাইরে গ্রামবাসীদের আর কোন সামগ্রী সঞ্চয় করতে দেওয়া উচিত নয়—দিলে তারা বিদ্রোহ করবে; এই শেষোক্ত নীতিটি পরবর্তীকালে দিল্লির সুলতানরাও গ্রহণ করেছিলেন। রাজা অবন্তিবর্মনের অধীনস্থ জনৈক প্রতিভাবান চণ্ডাল মন্ত্রী সূয্য যে বিস্ময়কর রকমের পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তার ফলে গ্রাম-বসতি বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রধান শস্য ধানের দাম এত কমে গিয়েছিল যে নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব পণ্য আমদানি করতে হত তার মূল্য যোগানো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাই, জয়াপীড় (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) ও শঙ্করবর্মনের (৮৮৩-৯০২) মতো কাশ্মীরী রাজারা ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে দানধ্যান কমাতে এবং মন্দির-সম্পত্তির ওপর কর আদায় করতে শুরু করলেন। চীনে বৌদ্ধ মূর্তি ও বিহারগুলির অলঙ্করণে যে বিপুল পরিমাণ ধাতু আটকে ছিল তা মুক্ত করে টাঁকশালে নিয়ে আসার জন্য চীনা সম্রাট ও প্রাদেশিক শাসকরা ৫৭৪-৭৭, ৮৪২-৪৫ ও ৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষ বারের মতো ৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে সুঙ সম্রাটদের আমলে বুদ্ধ-মূর্তি এবং 'মানুষ ও অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অন্য মূর্তি' নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার মতো যেসব নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন—এগুলি ছিল ঠিক তারই প্রতিতুল্য। এমনকী ব্রাহ্মণদের শেষ বেপরোয়া পদক্ষেপ, আমৃত্যু অনশনও প্রায়শই রাজার হৃদয় পরিবর্তন করতে পারেনি, এবং শেষপর্যন্ত কৃষ্টিসম্পন্ন, সংস্কৃত কাব্যচর্চার পৃষ্ঠপোষক, সাহিত্য-রচয়িতা ও চারুকলার সমঝদার হর্ষ (১০৮৯-১১০১ খ্রী.) একের পর এক মন্দিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন এবং 'দেবতাদের উৎপাটনের ভারপ্রাপ্ত' বিশেষ এক মন্ত্রীর (*দেবোৎপাটন-নায়ক*) দায়িত্বে মূর্তিগুলিকে সরিয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে সেগুলি ভেঙে ও গলিয়ে ফেলেছেন, অথচ এই মন্ত্রীও নিজে ছিলেন একজন সৎ হিন্দু। আসলে, সৈন্যদের (তখন তারা ধামার ও রাজসিংহাসনের দাবিদারদের বিরুদ্ধে লড়াইতে লিপ্ত ছিল) বেতন দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং ধাতু (দক্ষ খনকের অভাবে কাশ্মীরে চিরকালই যার অভাব ছিল) সংগ্রহই ছিল এর পেছনের একমাত্র কারণ। কোন ধর্মতাত্ত্বিক প্রয়োজন আবিষ্কৃত, উল্লিখিত বা অনুভূত হয়নি। হর্ষ মুসলমান 'তুরুষ্ক' সেনা নিয়োগ করলেও, শূকরের মাংস খেয়ে—তাঁর নিজের ধর্মের মতোই—ইসলামের বিরুদ্ধেও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলেন। হিন্দুরা, তা সে ব্রাহ্মণ হোক বা না হোক, এ সবকে মেনে নিয়েছিল শান্তভাবেই (*রাজতরঙ্গিনী* ৭.১১০৩-৭ প্রভৃতি), এবং যেখানেই সম্ভব হয়েছে মুনাফায় ভাগ বসিয়েছে। কিছু ব্রাহ্মণ ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীতে বিশেষ কৃতিত্বের নজির রেখেছিল। কোন কোন রাজবংশ ছিল নিম্নবর্ণের। কাশ্মীরের সব হিন্দু রাজাই যে জাতপাতের গালগল্পে বিশ্বাস করত—তা নয়। জনৈক সৌজন্যপরায়ণ বণিক তাঁর পত্নীকে এক অভিভূত রাজার হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং রাজা অবিলম্বে তাঁকে পাটরানির মর্যাদা দেন। এক রানি ছিলেন মদ্য-প্রস্তুতকারকের কন্যা। একেবারে

নিচু জাতের জনৈকা রানির নিকট আত্মীয়রা উচ্চপদ ছাড়াও 'অগ্রহার' ধরনের জমি দান হিসেবে পেয়েছেন—যা তখনও পর্যন্ত ছিল ব্রাহ্মণদেরই বিশেষাধিকার।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে বিকাশের গতিপথও ছিল মূলগতভাবে একইরকম। রাষ্ট্রকে রাজস্ব দেওয়ার শর্তে সামন্ততান্ত্রিক সত্ত্বাধিকারসম্পন্ন জমি অব্রাহ্মণদের দান করাটা এক সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রাহ্মণদের জমি থাকলে, যখনই কোন নতুন কর বসত এমনকী হিন্দু রাজারা-ও তাদের কাছ থেকে তা আদায় করত। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্রাহ্মণরা অনেক আগে থেকেই নেমে গিয়েছিল। পাঞ্জাবে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে (*আলবেরুণী* ২.১৩২) ব্যবসায় নামার আগে মুখরক্ষার জন্য তাদের একটা নকল মধ্যস্থতাকারী বৈশ্য শ্রেণীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মার্কো পোলো (*বেনেদেত্তো*, পৃ. ১৮৯) দেখেছেন যে দক্ষিণে সততা, বহিরাগতদের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার, এবং স্বল্প কমিশনের কারণে চোল রাজ্যের ব্রাহ্মণ বাণিজ্য-প্রতিনিধিদের বিরাট চাহিদা ছিল। আবার, ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় অস্ত্রধারণ করে তারা সামন্ততান্ত্রিক সৈনাপত্যের পদও দখল করেছিল। এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছিল পুনার পেশোয়াদের আমলে—যারা ১৭২০ খ্রীঃ থেকে সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করেও পারসিক মন্ত্রীত্বের খেতাব বহন করত। এরা সমস্ত ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াচার পালন করত, সবরকমের বিলাস ব্যসনে লিপ্ত থাকত, এবং যুদ্ধে সেনাবাহিনীরও নেতৃত্ব দিত। এই ঘটনায়, প্রায় ১৯০০ বছর আগে শুঙ্গ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে কণ্বায়ন ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাদখলের প্রতিধ্বনিই শোনা যায়, কিন্তু আলোচ্যকালে, হিন্দু হোক বা মুসলিম, ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলের মতোই এখানকার মূল উৎপাদন-রীতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক। দিল্লির সাম্রাজ্যেই শুধু নয়, সমসাময়িক বিজাপুরের মুসলমান ও বিজয়নগরেব হিন্দু রাজ্যেও জমির মালিকানা ও কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল মূলত একইরকম। এ কথা সত্যি যে, মন্দিরের সঞ্চিত ধনসম্পদ অধিকাংশই ঝেঁটিয়ে নিয়ে নিয়েছিল মুসলমানরা। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কারণটি যে ধর্মীয় নয় তা বোঝা যায় ১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের কাশ্মীর বিজয় থেকে—যা বিনা শক্তিপ্রয়োগেই ঘটেছিল। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ শুরু হয়েছিল নীরবে, এমনকী আগেই। বিজয়ের ফলে নতুন করে আর কাশ্মীরের বিদ্যমান মন্দিরগুলিকে লুণ্ঠিত হতে হয়নি—বরং, একজন বাদে, সমস্ত মুসলমান শাসকই সেগুলিকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রশাসনের উচ্চপদগুলি থেকে ব্রাহ্মণদেরও অপসারিত করা হয়নি এবং এমনকী সরকারী দলিল-দস্তাবেজের ভাষাও ছিল সংস্কৃত ও ফার্সীর মিশ্রণ, অন্তত মুঘল অধিকৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত। আবার, ভারতের বাকি অংশে শৈব ও বৈষ্ণবদের বিরোধের ফলে মন্দিরের সম্পত্তি বিপুলভাবে আত্মসাৎ করেছিল হিন্দুরাই। সামন্ততন্ত্রের বিলম্বিত পর্যায়ে ধনবান ভূস্বামীরা যে কোন বর্ণের শাসনকেই ভেঙে ফেলতে পারত—তার জন্য কোন শাস্তি পেতে হত না। গায়ের জোরে বা রাজার বদান্যতায় ভূস্বামী হওয়া নিম্নবর্ণীয়রা পরিচয় গোপন করতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পর্যাপ্ত ধনসম্পদ দিয়ে নিজেদের উচ্চ বংশস্তুতির দাবি প্রতিষ্ঠা করত। নব্য 'ব্রাহ্মণ'দের হঠাৎ আবির্ভাব সমেত এরকম জাতে ওঠার ঘটনা সারা দেশেই ঘটেছে। যাই হোক না কেন, ইসলাম ধর্ম কিন্তু বর্ণব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল—যে ব্যবস্থায় দেবতারা নিজেদের মন্দিরই রক্ষা করতে পারে না। বর্ণব্যবস্থা অনমনীয় থেকে গিয়েছিল সেখানেই যেখানে শ্রেণীগুলি—বিশেষ করে জমির মালিকানা—ব্যাপক আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে নাড়া খায়নি। রাষ্ট্রকূট তৃতীয় ইন্দ্র স্বল্পকালের জন্য কনৌজ দখল করেছিলেন (৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে); কন্নড়-এর হিন্দু ভাড়াটে সৈন্যরা ভারতের বাইরে গজনির মামুদের সেনাবাহিনীতে তাদের স্বধর্মী

সেনাপতিদের অধীনে কাজ করেছে (*আলবেরুনি* ১.১৭৩; ২.২৫৭)। রাজেন্দ্র চোল বাংলা, উড়িষ্যা দখল করেছিলেন এবং নৌবাহিনী গঠন করে সিংহল, সুমাত্রা ও বঙ্গোপসাগরের অন্যান্য দেশে আক্রমণ চালিয়ে বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ কর আদায় করেছিলেন (১০৩০ খ্রী. নাগাদ)। যেটা অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল তা হল শ্রমজীবী মানুষকে ধারাবাহিকভাবে অধিকতর উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে যেতে হয়েছিল তাদেরই জন্য—যারা তা আত্মসাৎ করত।

নিম্নোদ্ভুত সামন্ততন্ত্রে বাণিজ্য ও পণ্য উৎপাদনের অবস্থা এক নজরে দেখা যেতে পারে বিজয়নগর সাম্রজ্যের কাঠামোতে। সেরিঙ্গপটম, বাঁকাপুর, গেরসোপ্পা, কালিকট, ভাটকল, বাঁকানুর-এর বড় বড় প্রধানরা ছিল কার্যত স্বাধীন; তাদের শুধু নগদ অর্থে কর দিতে হত এবং সশস্ত্র বাহিনীতে প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত নির্দিষ্ট অংশ পূরণ করতে হত। অপরদিকে, কেন্দ্রকে বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ কর আদায়ের পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হত, কেননা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তদের দুর্বল সম্রাটের বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং প্রায় সব ছোট ছোট নায়েকই তখন রাজা হতে চেষ্টা করছিল। সুতরাং, দিল্লির সুলতানের মতো, সম্রাটকেও ব্যক্তিগত ভাবে কিছু এলাকা শাসন করতে হত, যেন তিনি নিজেই সবচেয়ে বড় সামন্ত-জমিদার। রাজস্ব আদায় ও তা সোনায় রূপান্তরিত করাটা নির্ভর করত বিপুল বাণিজ্য ও সেই সঙ্গে বন্দরগুলির নিয়ন্ত্রণের ওপর। এটা প্রযোজ্য ছিল দিল্লির ক্ষেত্রেও; সেখানে লোদি সুলতানদের তখনই নির্ধরিত কর দ্রব্যে আদায়ের পন্থায় ফিরে যেতে হত যখন গুজরাট ও বাংলার বন্দরগুলি তাদের অধীনে থাকত না এবং ফলে, সোনার বাটের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। পশ্চিম-উপকূলের বন্দরগুলি থেকে রাজধানী বিজয়নগরে আসার দীর্ঘ রাস্তায় শুল্ক আদায়ের শেষ চৌকিটি (হসপেট-এ) ইজারা দেওয়া হয়েছিল বছরে ১২,০০০ *পর্দাও*-র বিনিময়ে। সন্নিহিত বিশাল জলাশয় ও তার জল-সরবরাহের ব্যবস্থা থেকে পাওয়া যেত আরো ২০,০০০; ওই এলাকা থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১০,০০০ *পর্দাও*-রও কম। তাছাড়া, এই আদায়ের একটা বড় অংশ রাজার ভান্ডারে মজুত হয়ে যেত বলে তা কোন কাজে লাগত না (পান্ড্যদের ক্ষেত্রে মার্কো পোলো এমনটা লক্ষ্য করেছিলেন), এবং কোন রাজার সঞ্চিত সম্পদ তার উত্তরাধিকারীরাও খুলতে পারত না। রাজস্বের খুব সামান্য অংশই জলাধার ও খাল কাটার মতো একান্ত প্রয়োজনীয় নির্মাণকর্মের মাধ্যমে কার্যকরভাবে সঞ্চালিত হত। রাজার দান ও বেশ্যা-নটীদের দৌলতে মন্দিরগুলির স্বতন্ত্র পর্যাপ্ত আয় থাকা সত্ত্বেও তা অগ্রগতির পথে কোন সহায়তা করেনি। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের পতন পর্তুগীজদের পক্ষে ছিল এক বড় বিপর্যয়—কেননা বাণিজ্যের সবচেয়ে লাভজনক অংশ, অর্থাৎ বস্ত্র ও মশলাপাতি রপ্তানির বিনিময়ে ঘোড়া ও সোনা-রূপার বাট আমদানির একচেটিয়া কারবার ছিল তাদের হাতে। মাঝ-দরিয়ার ও (গোয়া সমেত) বন্দরগুলির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে মুসলমানরা সব সময়ই ছিল পর্তুগীজদের প্রতিপক্ষ ও শত্রু, তাই তাদের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই চিমটি কাটাকাটি গোয়াতে ধর্মগত অপরাধ তদন্তের জন্য বিচারসভা জোরদার করার কাজকে সহজ করে তুলেছিল, এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল আরো তিক্ত। বৃহৎ শক্তি হিসেবে পর্তুগালের পতন সম্পূর্ণ হয়েছিল স্থলে স্পেনের এবং সমুদ্রে হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের শক্তিবৃদ্ধির ফলে, কিন্তু প্রধান ধাক্কাটা এসেছিল বিজয়নগরের আকস্মিক পতন ও ভারতীয় উপদ্বীপের বৃহত্তম অংশের নিয়ন্ত্রণকারী এই হিন্দু রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য নষ্ট হওয়ার ফলেই।

১০.৩ এক সম্পূর্ণ নতুন প্রাদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ মেলে আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টির সূচনা থেকেও। হিন্দী কাব্য, *মহাভারত*-এর ভাষান্তর *অন্ধ্রভারতমু,* তেলেগু শিলালেখগুলি, প্রাচীন কন্নড় কাব্য, মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের অধিকতর বিকাশ—এসবই প্রমাণ করে যে গ্রামগুলির মধ্যেকার আন্তঃসংযোগ এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। নিছকই পরিমাণগত পরিবর্তন—অর্থাৎ বসতির ঘনত্ব—এক গুণগত পরিবর্তনের কাছে নিয়ে এসেছিল, যার ফলে, এই প্রথম, উদ্ভব ঘটেছিল জাতিত্বের। তামিল ভাষা অবশ্য অনেক আগে থেকেই তার নিজস্ব বিকাশের পথে গিয়েছিল। এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসূচক নতুন সাহিত্য ছিল রাজস্থানের 'রাসো' বীরগাথাগুলি, যেগুলির সঙ্গে মধ্যযুগের শৌর্য ও বীরত্বের গাথাগুলির মিল আছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত পৃথ্বিরাজ চৌহান (চাহমান; ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর কাছে পরাজিত হওয়ার কিছুদিন পরেই নিহত হন)-এর 'রাসো' প্রকাশিত হয়েছে[৪] খুবই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, *মহাভারত* ও পুরাণগুলির আঙ্গিকের সচেতন অনুকরণে। মূল চারণকবি চাঁদ বরদাঈ-র বংশধররা এখনও আছেন এবং তাঁরা যেটিকে প্রাচীন কবির আসল রচনা বলে দাবি করেন তা যে ঠিক নয় একথা সহজেই বোঝানো যেতে পারে। পাশাপাশি দরবারী সংস্কৃতেও বীরগাথা রচিত হয়ে চলেছিল (সেগুলিও কম উদ্ভট নয়), কিন্তু এমনকী একই চরিত্র নিয়ে রচিত 'রাসো'গুলির সঙ্গেও তার বৈপরীত্য প্রকট। যেমন এক বীরত্বব্যঞ্জক লোককাহিনী *পৃথ্বি-রাজ-বিজয়*-এর ভূর্জপত্রে লিখিত যে জীর্ণ পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে এই রোমান্টিক বীরকে ধ্রুপদী ভাষা ও আঙ্গিকে কেমন ভিন্নভাবে চিত্রিত করা হয়েছিল। রাজপুত্র হাম্মীর নামটি এসেছে মুসলমান আমীর থেকে। *হাম্মীর-রাসো*-র কথাও আমাদের জানা। ন্যায়চন্দ্র সূরি (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে) রচিত *হাম্মীর-মহাকাব্য*-তে ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের সেনাবাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ রণথাম্ভোর-এর শেষ চৌহানরাজ ও তাঁর অনুগামীদের মহান কিন্তু ব্যর্থ প্রাণ-বিসর্জনকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে, অথচ সেই সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা *হাম্মীর-মদ-মর্দন*-এ উল্লেখ করা হয়েছে জনৈক আমীরেব পরাজয়ের কথা। *বিশালদেহ-রাসো*-র সঙ্গে *ললিত-বিগ্রহ-রাজ* (*আই. এ.* ২০.২১২ পরবর্তী) নাটক (যার পাথরে খোদিত বিক্ষিপ্ত অংশ আজমীরে আবিষ্কৃত হয়েছে)-এর মিল খুব সামান্যই। রাজাদের নামগুলি ছিল একই, কিন্তু সংস্কৃত নাটকে আছে অলঙ্কারবহুল স্তবক—যেগুলি রাজা ও তার তুরস্ক প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে বসানো। এই সমস্ত কিছুকে একত্রিত করলে খুব অল্প তথ্যই পাওয়া যায়, এবং এটুকু বোঝা যায় যে সংস্কৃত কাব্য আর বাস্তবকে প্রতিফলিত করতে পারছিল না। যতটুকু আমরা জানতে পারি তা হল, রাজপুতরা লোককাহিনীর বীর বপ্প বাভল (সম্ভবত যাঁর মুদ্রা[৫] সম্ভবত পাওয়া গেছে)-এর বংশধর হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করেছিল; এবং কয়েকটি পাঠান কৌমের সঙ্গে পূর্বতন জ্ঞাতিত্বের একটা প্রাচীন ঐতিহ্য তাদের ছিল—যে পাঠানরাও আবার ছিল তরবারির জোরে জীবনধারণ করা বিভিন্ন সামরিক গোষ্ঠী। রাজপুতরা সুযোগ পেলে হয়ে উঠত আক্রমণকারী, অর্থ পেলে ভাড়াটে সৈন্য, কিন্তু ঘরে থাকলে চাষের কাজও করতে পারত। তাদের সামরিক শাসনতন্ত্র, অর্থাৎ প্রত্যেককেই একজন স্বীকৃত নেতার প্রতি অনুগত থাকতে হবে এই রীতি উপজাতিক বা কৌম উৎপত্তিরই ইঙ্গিতবাহী।[৬] রাজনৈতিক দিক থেকে এদের যে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকতা—তারও কারণ ছিল সংকীর্ণ উপজাতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নাছোড়বান্দার মতো আঁকড়ে থাকা। তাদের নিজস্ব এলাকা ছিল রাজস্থানের তুলনামূলকভাবে বন্ধ্যা জমিতে

(রাজস্থান খালের প্রাণদায়ী জল যেখানে পৌঁছেছে সে জায়গাগুলি চেনার অসাধ্য হয়ে ইতিমধ্যে পাল্টে গেছে)। এই এলাকার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল দক্ষিণমুখী গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথটি। সুতরাং, রাজপুতরা আমাদের দেখিয়েছে যে, এক অনুন্নত পর্যায়ে বাহ্যিক উপাদানগুলি সামন্ততন্ত্রের গঠনে ভূমিকা নিয়েছে, কিন্তু বিস্তীর্ণ জমিতে চাষের জন্য কোন শ্রমের যোগানে নেয়নি। এই ধরনের সেনাপতিরা রাজাদের অধীনে নিযুক্ত থাকারই উপযুক্ত ছিল এবং এই রাজারাও ইতিমধ্যেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল ৮৪টি, তারপর ৪২টি ও ২১টি গ্রামের প্রশাসনিক একক নিয়ে, যা সম্ভবত উপর ও নিচে থেকে—উভয় ধরনের সামন্ততন্ত্রের মধ্যবর্তী শেষ আনুষ্ঠানিক পর্যায়।

ক্ষণস্থায়ী হানার সঙ্গে মুসলমান বিজয়ের যে চরিত্রগত পার্থক্য—তার মূলে ছিল বাজার। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর একশ বছরের মধ্যেই মুসলমান আক্রমণকারীরা দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিল। স্থানিক অতীতের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে তাদের ভূমিকাও ছিল বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। পূর্বতন রোম সাম্রাজ্যে তারা মানুষকে মুক্ত করেছিল সাম্রাজ্যিক কর-আদায়কারী ও চার্চের শোষণের হাত থেকে। পারস্যে তাদের বিজয় মুক্তি এনে দিয়েছিল অভিজাত ও রাজাদের অসহনীয় শোষণের হাত থেকে। সংকীর্ণ প্রথাগুলি ভেঙে চুরমার করে নতুন কৃৎকৌশলের গ্রহণ ও সঞ্চালনের মাধ্যমে সর্বত্রই তারা সেই ভূমিকাই নিয়েছিল যা দু'হাজার বছর আগে আর্যদের ছিল। তুলনাটা খাটে না উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা আনার প্রশ্নে; এক্ষেত্রে তারা আর্যদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল—আর্যরা অনেক বেশি নতুন অঞ্চল আওতাভুক্ত করেছিল লাঙ্গলের। মুসলমানরা বারুদ, কাগজ, পোরসেলিন ও চা-এর মতো চীনা আবিষ্কারগুলিকে ভারতে চালু করেছিল। গ্রীক বিজ্ঞান ও জ্যামিতি, ভারতীয় ভেষজবিদ্যা ও বীজগণিতের আরবী অনুবাদ এবং তাদের নিজস্ব নতুন অবদানগুলির কল্যাণেই মধ্যযুগীয় ইউরোপ রেনেসাঁ-র অভিমুখে তার প্রথম পদক্ষেপ ফেলতে পেরেছিল। উৎপাদন সম্পর্কের কিছু ক্ষয়িষ্ণু রূপকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেওয়াটাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব; ধর্ম নয়, শক্তিই যে শ্রেণীভিত্তিক রাষ্ট্রের আসল অবলম্বন এটা তা উদ্ঘাটন করেছে।

পাঞ্জাবে মুহম্মদ ইবন-অল-কাসিমের নেতৃত্বে প্রথম মুসলমান হানাদাররা সুলতানের প্রাচীন সূর্যমন্দিরটিকে ভালভাবে কাজে লাগিয়েছিল। তার বিগ্রহটিকে রক্ষা করলেও সেটিকে জামিন এবং অসংখ্য তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে মুনাফা অর্জনের উৎস হিসেবে আটকে রেখেছিল (দ্র. *বিল* ২.২৭৪)। খলিফার অনুমতি মতো (*ইডি* ১.১৮৫-৬) জনগণকে অধিকার দেওয়া হতো 'তাদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস মেনে চলার, কেবলমাত্র যারা মুসলমান হতে চাইত তাদের বাদে' (*আলবিরুনি* ১.২১)। নথিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবর্তে, ব্রাহ্মণরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে আত্মসমর্পণের পক্ষে প্রচার চালাত। প্রবলতর শক্তিসম্পন্ন ম্যাসিডোনিয় সৈন্যদলের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টির যে উৎসাহ উপজাতিগুলির মধ্যেকার আদি ব্রাহ্মণ্যবাদ আগে যুগিয়েছিল—তার সঙ্গে এব দুস্তর ব্যবধান। মুসলমানদের তখন লক্ষ্য ছিল সিন্ধু নদ দিয়ে সমুদ্রে আসার পথকে নিরাপদ করা—পরবর্তী দু'শতাব্দীর মধ্যে যে কাজ তারা সম্পূর্ণ করতে পেরেছিল। সোমনাথ, থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজের মন্দিরের মতো সম্পদশালী মন্দিরগুলির ধ্বংসকারী গজনীর মামুদ বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছিলেন ঠিকই—কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নীতির পরিবর্তন ঘটেছিল। মামুদ পূর্বতন সঞ্চয় আত্মসাৎ করার স্বাভাবিক পদ্ধতিটাই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একের পর এক প্রতিটি

আক্রমণের মধ্য দিয়ে মুসলমান বণিকরা দেশের আরো বেশি ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল, এবং সেনাপতিদের চেয়েও তাদের অবস্থান ছিল অনেক অভ্যন্তরে। তাই, বেরাবল ও গোয়ায় আমরা দেখি হিন্দু রাজারা মুসলমানদের, মুসলমান ধর্মগ্রহণকারীদের এবং মসজিদগুলিকে সুরক্ষা দিচ্ছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের তিব্বতি ইতিহাসকার তারনাথ ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেছেন, উত্তরাঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের শেষ দিনগুলিতে—যখন আদিমতম উপজাতিক প্রথাগুলির (যেমন, ডোম্ভি-হেরুক) মধ্য থেকে ধর্মযান-এর মতো মতগুলি তখনও দীর্ঘ-অবক্ষয়িত ধর্মটির নামে ছড়িয়ে পড়ার লক্ষ্য নিয়ে জেগে উঠছিল—সেই সময় মুসলমান (তুরস্ক) ধর্মমতেরও সেখানে শান্তিপূর্ণ প্রসার ঘটছিল। বৌদ্ধ মঠগুলি তখনো মাঝেমধ্যে গাহড়বাল রাজাদের কাছ থেকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা (*ই. আই* ১১.২০-২৬) এবং গোঁড়া তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে উপহার পেয়ে আসছিল।

মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি-র অনায়াস বিজয় দেখিয়ে দেয় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তরাঞ্চলে মুসলমানদের অগ্রগতির আংশিক অর্থ হল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই সমস্ত মুসলমান বণিকসম্প্রদায় ও ধর্মান্তরিতদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন (*তারনাথ* ২৫৫)—যারা অনতিবিলম্বেই অস্ত্রধারণ করেছিল এবং সাধারণ লুঠপাঠেও অংশ নিয়েছিল। এটা একইসঙ্গে গ্রামাঞ্চলের নির্বীর্য হয়ে পড়ারও প্রমাণ। শতাব্দীর শেষে এই মহম্মদই নদীয়া (নবদ্বীপ) দখল করেছিলেন। তিনি অগ্রবর্তী বাহিনীর খুব বেশি হলে আঠারো জন সৈন্য নিয়ে প্রাসাদে হানা দেন (*তবকাৎ-ই-নাসিরি* ১.৫৬৫-৮)—যারা, আপাতভাবে মনে হয়, নগরে ঢুকেছিল মুসলমান বণিকদের সঙ্গে। এই ছোট সৈন্যদলটিকে বণিক ভেবে ভুল করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মাত্র এই কয়েকজন সৈন্য যে আতঙ্ক ছড়িয়ে রাজধানী ধ্বংস করতে পেরেছিল এবং বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনকে চিরকালের জন্য পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল তা থেকে প্রমাণ হয়, নিজেদের শাসককে সিংহাসনে বসিয়ে রাখার ব্যাপারে কোন আগ্রহ জনগণের ছিল না। উত্তরাঞ্চলের শেষ বড় হিন্দু রাজ্যের পতন ঘটান কুতুব-উদ-দিন—জয়চন্দ্র গাহড়বাল-কে পরাস্ত করে। লক্ষণীয়, সমসাময়িক এই সব ঘটনার কোনটাই স্থানীয় বুদ্ধিশালী সম্প্রদায়ের সনাতনী আচরণ কিংবা আত্মতৃপ্তির ওপর সামান্যতম প্রভাবও ফেলতে পারেনি। এই অঞ্চলে এবং প্রায় এই সময়কালে রচিত শেষতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যে সমসাময়িক ঘটনাবলীর কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই। রাজা গাহড়বল-এর সভাকবি শ্রীহর্ষ (পাঁচ শতাব্দী আগের কবি-নৃপতি হর্ষের সঙ্গে এঁকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়) *মহাভারতে*-র দম্পতি নল ও দময়ন্তীর প্রেমকাহিনী নিয়ে সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। লক্ষণসেনের সভাকবি ধোয়ি কালিদাসের *মেঘদূত*-এর অনুকরণে *পবনদূত* রচনা করেছেন। সেন রাজাদের সভাকবিরা পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যাওয়ার পরও তাঁদের অর্থহীন রচনাশৈলীরই পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। পাল রাজাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল কোন অতি সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থের মতো। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* সংস্কৃত কাব্যকে ছন্দ-মেলানো ধাঁধার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল, কেননা এর প্রতিটি ছত্রকে দু'ভাবে পড়া যায় ঃ পুরাকাহিনীর রামের ইতিহাস, অথবা শেষ বড় পালরাজা রামপালের। ফলে, এর কিছুই বোঝা যেত না। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব তাঁর শক্তি আহরণ করেছিলেন চারণ হিসেবে সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়ে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে। তিনি প্রাচীন কিছু হিন্দী কাব্য রচনা করলেও, মানুষের ভালোবাসা, প্রশংসা, শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন তাঁর *গীতগোবিন্দ*-র জন্য। সংস্কৃত গীতি-নাট্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে সঙ্গীতময়, গূঢ় অর্থপূর্ণ ও সুন্দর নাটক এটি, যদিও অভিনয়-উপযোগী আদৌ নয়।

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যগুলি পড়লে মনেই হবে না যে মুসলমানদের তখন কোন অস্তিত্ব ছিল। মুসলিম বিবরণীগুলি পড়লে মনে হবে যেন যুদ্ধবিদ্যা ভারতে ছিল একটা বিলুপ্ত কলা। মহম্মদ বখতিয়ার নিজেই এই ভুল করেছিলেন। যখন তিনি বাংলার লুটের মালের ওপর তিব্বতের লুটের মাল যোগ করার বাসনাতাড়িত ১০,০০০ অভিজ্ঞ অশ্বারোহী সৈন্য-সমন্বিত তাঁর বিশালতম বাহিনী নিয়ে নেপালের দিকের অনুন্নত উত্তরাঞ্চল আক্রমণ করেন—ঐ অঞ্চলের উপজাতি সৈন্যরা তখন গেরিলা যুদ্ধের আশ্রয় নেয়। ভাগ্যের জোরে মহম্মদ তাঁর বড়জোর একশ সেনা নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন (*তবকাৎ-ই-নাসিরি,* ১.৫৬০.৭২)। এরপর শীঘ্রই, হয় তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম ও অবসাদের ফলে মারা যান, অথবা তাঁর নিজের কোন সেনাপতিই তাঁকে রোগশয্যায় হত্যা করেন। 'এশীয় সার্বভৌমত্বের দৃঢ় ভিত্তি' প্রতিরোধহীন গ্রামগুলির উপরমহলে তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল গৃহযুদ্ধের এক নতুন পর্ব। তা সত্ত্বেও, সেখানে এক শ্রেণী-সংঘাতও ছিল—এরপর থেকে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে ধর্মের আবরণে। দক্ষিণে এই আন্দোলন শুরু করলেন রামানুজ ও মাধব, বাংলায় চৈতন্য, এবং তা বৈষ্ণব ও শৈব ভক্তদের মধ্যেকার অত্যন্ত তিক্ত ধর্মীয় বিরোধে পরিণত হল—অথচ প্রথমোক্তরা বুদ্ধকে তাদের দেবতার নবম অবতার হিসেবে গ্রহণ করেছিল। প্রকৃত লড়াইটা ছিল বৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের সঙ্গে নব্য ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের—অর্থাৎ, ঠিক অর্থে, উপরোদ্ভূত সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে নিম্নোদ্ভূত সামন্ততন্ত্রের। পরিণামে জয়ী হয়েছিল শেষেরটি। পূর্ববাংলায় নিপীড়িত গ্রামবাসীরা তাদের নিজস্ব ধরনের বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। এই ধর্মান্তরণ পরবর্তীকালের দেশ ভাগের পক্ষে এক নিশ্চিত ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেও, অল্প কিছু নতুন ভূস্বামী বাদে, আপামর কৃষক জনসাধারণের কোন অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারেনি। বিন্যস্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে আক্রমণকারীরা স্থায়ীভাবে জেঁকে বসার পর ইসলামের ধর্মীয় গণতন্ত্র খুব কম ধর্মান্তরিত মানুষকেই আকৃষ্ট করেছে, কেননা এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বলে কিছু ছিল না।

গজনির মামুদের অনুচর, আরবী ভাষার লেখক আবুল রয়হান আলবিরুনি ছিলেন খোরেজ্‌ম-এর মানুষ (১০৩০ খ্রী. নাগাদ)। তিনি মূলত আগ্রহী ছিলেন হিন্দুদের বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে— যেগুলি তিনি মূল সংস্কৃতে সযত্নে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান বিবরণ রেখে গেছেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের চরিত্র, 'মটরের সঙ্গে কুলিচার বীজ, মুক্তার সঙ্গে গোবরের যারা মিশ্রণ ঘটাতে চায়' (*আলবিরুনি* ২.১১৪) এমন একটা জাতির মধ্যে কুসংস্কারের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিশ্রণের যে বৈশিষ্ট্য—তা তাঁর নজর এড়ায়নি। তাঁর সময়েই সম্ভবত মুলতানে শিব-পূজার বদলে নারায়ণ-পূজা শুরু হয়েছিল। পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থগুলি থেকে পাওয়া তাঁর পূর্বজ্ঞান ধাক্কা খেয়েছিল চতুর্বর্ণের অস্তিত্ব এবং গ্রামে তাদের একত্রিত বসবাস থেকে। গ্রামের বাইরে বাস করত বর্ণহীন চাকরবাকরদের আটটি সঙ্ঘ, এবং আরও নীচ অস্পৃশ্যরা (*আলবিরুনি* ১.৯৯-১০৪)। যেহেতু কামার, ছুতোর, কুমোর-এরা আলবিরুনির বিবরণের আটটি সঙ্ঘের মধ্যে ছিল না তাই উচ্চবর্গীয় এই কারিগররা যদি শূদ্রবর্ণের না হয়ে থাকে তাহলে বাস্তবের সঙ্গে বা *অমরকোষের* বিবরণের সঙ্গে একে মেলানো শক্ত। ভারতীয় রাজারা, আলবিরুনি (২.১৪৯) জানিয়েছেন, বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ জমির খাজনা হিসেবে আদায় করত, যদিও বিস্তারিত বিবরণ তিনি কিছু দেননি।

১০.৪ অজস্র ব্যর্থ সূচনা-প্রয়াসের পর সামন্তপর্বের চূড়ান্ত রূপান্তরণটা সম্পূর্ণ হল ফিরুজ তুঘলকের (১৩৫১-১৩৮৮) অধীনস্থ অঞ্চলে। উপরোদ্ভূত সামন্ততন্ত্র তার শেষ শক্তিশালী

উত্থান ঘটিয়েছিল আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালে (১২৯৬-১৩১৬)। এর খুঁটিনাটি দিকগুলি উদ্ধৃত করা যেতে পারে সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের বিবরণ থেকে, যাঁরা নিজেরাই পরবর্তী সামন্ততন্ত্রের পক্ষে ছিলেন।

'(আলাউদ্দিন) হুকুম দিয়েছিলেন যে, যেখানেই কোন গ্রাম মালিকানা সত্বে (*মিলক্*), নিষ্কর দান (*ইনাম*) হিসেবে, বা ধর্মীয় অনুদান (*ওয়াকফ্*) হিসেবে রয়েছে, কলমের এক খোঁচায় সেগুলিকে রাজস্ব দফতরের অধীনে নিয়ে আসতে হবে। যে কোন ছুতোয় মানুষের ওপর চাপ দিয়ে ও জরিমানা করে অর্থ নিংড়ে নেওয়া হত। অনেক লোকের হাতেই কোন পয়সা ছিল না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে মালিক, এবং আমীর, রাজকর্মচারী, মুলতানী (বণিক), ও মহাজনদের বাদ দিলে বাদবাকি মানুষের হাতে সামান্য কপর্দকও থাকত না। বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারটা এমন ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াল যে, দেশে মাত্র কয়েক হাজার টঙ্কা ছাড়া বাদবাকি সব অবসর-ভাতা, জমি দান (*ইনাম ওয়া মফজজ্*) ও বৃত্তিগুলিকে আত্মসাৎ করা হল। লোকে অন্নসংস্থানের জন্যেই এত ব্যস্ত হয়ে থাকল যে বিদ্রোহের কথা কখনও মুখেও আনল না। দ্বিতীয়ত, গোপন সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা তিনি এমন সতর্কতার সঙ্গে করেছিলেন যে, ভাল বা খারাপ মানুষের কোন কার্যকলাপই তাঁর অগোচরে থাকত না। তাঁর অগোচরে কেউ নড়তে চড়তে পারত না এবং কোন অভিজাত, বিশিষ্ট ব্যক্তি বা রাজকর্মচারীর বাড়িতে কি আলোচনা হয়েছে তার খবর পর্যন্ত গুপ্তচরেরা সুলতানের কাছে পৌঁছে দিত। আর, কোন খবরকেই যে উপেক্ষা করা হত না, তাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়াই তার প্রমাণ। খবরাখবর সংগ্রহের এই ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অভিজাতরা এমনকী বড় বড় প্রাসাদেও জোরে কথা বলতে সাহস পেত না। ... সুলতান হুকুম দিয়েছিলেন যে অভিজাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একে অপরের বাড়িতে যেতে, বা খানাপিনা করতে, বা বৈঠক করতে পারবে না। সুলতানের অনুমতি ছাড়া জোট বাঁধা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ... হিন্দুদের ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য এবং যে ধনসম্পদ ও সম্পত্তি অসন্তোষ ও বিদ্রোহকে উৎসাহ দেয় তা থেকে তাদের বঞ্চিত করার জন্য কিছু আইন-কানুন তৈরি করতে সুলতান জ্ঞানীগুণী মানুষদের অনুরোধ করেন। *খুত* থেকে শুরু করে *বলহর* (ধাঙড়) পর্যন্ত সকলের জন্যই কর দেওয়ার একটাই আইন থাকত, এবং সবচেয়ে গরীব লোকদের ওপর সবচেয়ে ভারী করের বোঝা চাপত না। হিন্দুদের হাল এমন করে দিতে হত যে তাদের যেন চড়ার জন্য কোন ঘোড়া না থাকে, কোন অস্ত্র যেন বহন করতে না পারে, কোন ভাল পোশাক পরতে, বা জীবনের কোন বিলাসিতাকে উপভোগ করতে না পারে। ... সমস্ত চাষবাসই চালাতে হত মাপ অনুযায়ী প্রতি *বিস্বা-র* জন্য একটা নির্দিষ্ট হারে। (উৎপাদনের) অর্ধেক কর হিসেবে দিতে হত, এবং এই নিয়ম প্রয়োগ করতে হত ... সামান্যতম হেরফের না করেই। *খুত*দের যে নিজস্ব বিশেষাধিকারগুলি ছিল সেগুলি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হত। দ্বিতীয় (নতুন আইন)-টি মহিষ, ছাগল ও অন্যান্য যেসব পশু দুধ দেয় তাদের সম্পর্কে। চারণভূমির জন্য প্রতিটি বাড়ি থেকেই নির্ধারিত হারে কর আদায় করতে হত, ফলে কোন জন্তু—তার হাল যতই খারাপ হোক না কেন—করের আওতার বাইরে যেতে পারত না। গরীবদের ওপর গুরু করগুলি চাপানোর কথা না থাকলেও, কর দানের আইনগুলি ধনী ও দরিদ্রের ওপর সমানভাবেই প্রয়োগ করতে হত। রাজস্ব আদায়কারী, কেরানি, ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য রাজকর্মচারী—যারা ঘুষ নিত ও অসৎ কাজ করত তাদের সবাইকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ... (এইসব নিয়ম) এত কঠোরভাবে পালন করা হত যে *চৌধুরী, খুত* ও *মুকদ্দিম* (বিভিন্ন ধরনের গ্রাম্য প্রধান)-রা ঘোড়ায় চড়তে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে, বা ভাল পোশাক পরতে, বা পান-সুপারি খেতেও পারত না। ... লোকেদের

আজ্ঞানুবর্তিতার বহরকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছিল যে রাজস্ব বিভাগের একজন সচিব ২০ জন *খুত, মুকদ্দিম,* বা *চৌধুরী*-কে একসঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে ও মারধর করে কর আদায় করতে পারত। কোন হিন্দুই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত না, এবং তাদের ঘরে সোনা, রূপা, *টঙ্কা,* বা *জিতাল* (খুচরো পয়সা), কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন সামগ্রীর লেশমাত্র দেখা যেত না। দারিদ্রের তাড়নায় খুত ও মুকাদ্দিমদের স্ত্রীরা মুসলমানদের বাড়িতে ভাড়ায় কাজ করতে যেত। ... গ্রামের হিসাবরক্ষকের খাতা থেকে (রাজস্ব বিভাগের সচিবদের) নামে জমা করা প্রতিটি পাই-পয়সা [*জিতাল*] মিলিয়ে নেওয়া হত। কোন হিন্দু বা মুসলমানের কাছ থেকে অসৎভাবে বা ঘুষ হিসেবে একটা *টঙ্কা* আদায় করারও কোন সুযোগ ছিল না। রাজস্ব-আদায়কারী ও অন্যান্য সচিবদের এমনভাবে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা হত যে পাঁচশ' বা হাজার টঙ্কা-র জন্যেও তাদের বছরের পর বছর ধরে জেলে পুরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত। লোকে রাজস্ব-বিভাগের সচিবদের দেখত জ্বরের চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু হিসেবে। কেরানিগিরি করাটা ছিল একটা মহা পাপ কাজ, এবং কোন লোকই কেরানির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইত না। রাজস্ব-বিভাগে চাকরির চেয়ে মৃত্যুও যেন ছিল বেশি কাম্য।' (ই. ডি. ৩.১৭৯-১৮৩)।

এই সমস্ত পদক্ষেপগুলির কয়েকটি বিস্ময়করভাবে *অর্থশাস্ত্র*-র অনুরূপ। যেহেতু, ঠাকুর ফেরু নামে আলাউদ্দিনের একজন জৈন ধর্মাবলম্বী টাঁকশাল-বিশেষজ্ঞ ছিলেন—মুদ্রা সম্পর্কে যাঁর মূল্যবান রচনাগুলিতে (১৩১৮-৯ খ্রী. লিখিত) সমস্ত মুদ্রার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, ধাতু সংকর, ও বিনিময় হার দেওয়া রয়েছে এবং দিল্লির টাঁকশালও যা মেনে নিয়েছিল (*দ্রব্যপরীক্ষা,* স. মুনি জিনবিজয়, সিংঘি জৈন গ্রন্থমালা)—তাই, মনে হয়, এমনটা অসম্ভব ছিল না যে মৌর্য যুগের নিয়মকানুন জানেন এমন একজন মানুষকেই সুলতান পরামর্শদাতা হিসেবে খুঁজে পেয়েছিলেন। লক্ষ্যটা ছিল, এক বিশাল সাম্রাজ্যে—যেখানে অধিকাংশ করই আসত নগদ অর্থে, হাতি, বা মূল্যবান ধাতুতে—তার নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী রাখা। উপরোক্ত নিয়মকানুনগুলি ছিল *কেবলমাত্র* সাম্রাজ্যের সেই অংশের জন্য যা কেন্দ্র কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হত—তা না হলে দূরবর্তী অঞ্চলে কর আদায়ের জন্য সেনাবাহিনী রাখা সম্ভব ছিল না। 'হিন্দু' বলতে বোঝাত নিশ্চয়ই যে কোন স্বত্ব সম্পন্ন ভূস্বামী গোষ্ঠীর দেশজ নেতাদের। দিল্লির জন্য করের একটা হার ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। *দোয়াব*গুলি কর দিত সামগ্রীতে (দিল্লি, মীরাট, আলিগড় জেলায়)। প্রধান প্রধান পণ্যের ব্যবসায়ী ও দলবদ্ধভাবে বাণিজ্যে যাওয়া স্থলবণিকদের জোর করে নগরীর কাছাকাছি বসতি স্থাপন করানো হত। তাদের পরিবারগুলি ছিল কার্যত জামিন-বন্দী; কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করা হত। সমস্ত জিনিসপত্রের দামই বেঁধে দেওয়া হত, ফলে অভাবের সময় দামের তফাত ঘটত না। সাধারণ সৈন্য, যারা নগদ অর্থে বেতন পেত তাদের সন্তুষ্ট করাই ছিল এর উদ্দেশ্য—কার্যকরভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যেটা সম্ভব হত না।

'(দিল্লিতে) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আলাউদ্দিন এত চেষ্টা করেছেন যে তাঁর প্রয়াস ইতিহাসগুলিতে স্থান করে নিয়েছে। বণিকদের তিনি দিয়েছিলেন সম্পদ, দিয়েছিলেন পর্যাপ্ত পণ্যসামগ্রী ও অপরিমেয় সোনা। রাজোচিত সমস্ত অনুগ্রহ তিনি তাদের দেখিয়েছেন, এবং তাদের জন্য নিয়মিত পারিতোষিকও স্থির করে দিয়েছিলেন। পাশাপাশি চলেছে ওজন ঘাটতির জন্য কঠোর শাস্তির বিধান; ঘাটতি পোষাতে বিক্রেতার পাছা থেকে মাংস কেটে

নিওয়া হত। গোয়েন্দা বিভাগ দরিদ্র, অশিক্ষিত বালকদের পাঠাতো জিনিসপত্র কেনার জন্যে; মাল কম হলে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হত। ... না, তাদের মালপত্রের ওজন এমন হত যে ক্রেতা প্রায়শই কিছু বেশি পেত।' (*ই ডি* ৩.৩৪৯, ও ৩.১৯৬)

এ সবের পরিণতিতে, আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে চারটি বড় রকমের বিদ্রোহ ঘটেছিল অভিজাতদের; এবং খোজা-প্রধান, মুখ্য দেহরক্ষী মালিক কাফুরের মতো ক্রীতদাস উন্নীত হয়েছিলেন প্রধান সেনাপতির পদে—যিনি প্রথমে দক্ষ ছিলেন, কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। *অর্থশাস্ত্র*-র বিধান মতো রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে—কেননা *দোয়াব*-গুলির বাইরে দ্রুত বিকাশমান সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তিটি থেকে যাচ্ছিল অক্ষত।

মুসলমান ইতিহাসবিদরা, যাঁরা সচিবালয়ের কর্মী ও ছোট ছোট সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, পরবর্তী রাজত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। গিয়াসুদ্দিন করের হার কমিয়ে মোট ফসলের $^১/_{১০}$ বা $^১/_{১১}$ অংশ করেছিলেন। পুরনো ও নতুন করের মধ্যেকার ফারাকটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদকের কাছে না থেকে কর-সংগ্রহকারী প্রতিনিধিদের পকেটে যেত। তবু, এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবছর চাষ বাড়ানো (*ই ডি*, ৩.২৩০)। 'হিন্দুদের ওপর এমনভাবে কর চাপাতে হবে যেন তারা ধনসম্পদে অন্ধ হয়ে না যায় এবং তা থেকে অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; আবার, অন্যদিকে, এমন দরিদ্র ও নিঃস্ব করাও উচিত নয় যে চাষবাস চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্যও তাদের থাকবে না।' আপাত-মনোহর এই দর্শনে খেয়াল করা হয়নি যে বড় বড় সব বিদ্রোহ করেছিল দরবারের মুসলমান অভিজাতবর্গ এবং সেনাপতিরাই। বাস্তব অবস্থাটা হল, পুরনো ব্যবস্থা সমস্ত শ্রেণীগুলিকেই এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল যে কোন রাজস্ব উৎপাদনের ক্ষমতা তাদের আদৌ ছিল না। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিন্তু অস্থিরমতি মহম্মদ তুঘলক প্রতীক মুদ্রা প্রচলন করা, রাজধানী দক্ষিণে দৌলতাবাদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, এবং চীনের বিপুল সম্পদ দখল করার জন্যে উত্তরাঞ্চলের কল্পিত পথে বিপর্যয়কর সামরিক অভিযান চালানো সমেত কিছু নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। শেষোক্ত অভিযানে নিযুক্ত হতভাগ্য মৃত সৈনিকদের হাড়ে হিমালয়ের রূপ-কুন্ড হ্রদের তীর এখনো সাদা। ইবন বতুতা তাঁর সময়কার দিল্লির সরকার, এবং জাদুবিদ্যা সহ মহম্মদের পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলির সুস্পষ্ট বিবরণ রেখে গেছেন (*বতুতা* ২২৫-৬)। অবশেষে, ফিরূজ তুঘলক নিম্নোদ্ভূত সামন্ততন্ত্রের কাছে নতিস্বীকার করেন এবং তাঁর শাসনকালের প্রায় শেষপর্যন্ত কাটিয়ে যান বিদ্রোহ ব্যতিরেকেই। অবশ্য, তাঁর সময়কালে ফসলের ফলন ভাল হয়েছিল; এমনকী তাঁর গুণমুগ্ধরাও স্বীকার করেছেন যে তাঁর আমলে জিনিসপত্রের দর কম ছিল নেহাতই ভাগ্যের জোরে, যেমন আলাউদ্দিনের আমলে ছিল নির্মম আইন কানুনের জোরে। তাঁরা যেটার উচ্চ প্রশংসা করেছেন তা হলো অনুগামীদের মধ্যে তাঁর গ্রাম ও জমির বন্টন।

'দিল্লীর পূর্বতন শাসকদের রাজত্বে রাজকর্মচারীদের বৃত্তি হিসেবে গ্রাম-প্রদানের নিয়ম কখনো ছিল না। ... (ফিরূজের রাজত্বকালে) সেনাবাহিনীর কোন কর্মকর্তা মারা গেলে (দানের সত্বাধিকার) পাবে তার পুত্র; তার কোন পুত্র না থাকলে পাবে জামাতা, কোন জামাতা না থাকলে পাবে ক্রীতদাস; কোন ক্রীতদাস না থাকলে পাবে নিকট আত্মীয়রা; কোন আত্মীয় না থাকলে পাবে স্ত্রী-রা। ... তাঁর রাজ্যে দোয়াব অঞ্চলগুলি থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৮,০০০,০০০ টঙ্কা ... দিল্লি এলাকা

থেকে ৬, ০৮,৫০,০০০ টঙ্কা। ... এই সব রাজস্ব যথাযথভাবে ভাগ করে দেওয়া হত; প্রত্যেক খাঁ-ই নিজের উচ্চ পদের উপযুক্ত অর্থ পেত। আমির ও মালিকরাও তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাতা পেত, এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে তার জন্য তাদের পর্যাপ্ত বেতন দেওয়া হত। সৈন্যদের এমন পরিমাণ জমি দেওয়া হত যাতে তারা খেয়ে পরে ভালভাবে থাকতে পারে, আর অনিয়মিত সৈনিকরা বেতন পেত সরাসরি কোষাগার থেকে। যেসব সৈন্য এভাবে বেতন পেত না তাদের রাজস্বের একটা অংশ দেওয়া হত। সৈনিকদের এই অংশ যখন জায়গীর হিসেবে আসত তখন তারা জায়গীর-মালিকদের মোট অংশের প্রায় অর্ধেকটা পেত। তখনকার দিনে [ন্যস্ত] এই অংশ কিনে নেওয়াটা কিছু লোকের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যা উভয়পক্ষের কাছেই সুবিধাজনক বলে মনে হত। এর জন্যে শহরে তারা পেত মোট মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ, এবং জেলায় অর্ধেক। এই সমস্ত অংশের ক্রেতারা এগুলি নিয়ে ব্যবসা চালাত এবং তা থেকে মুনাফা লুঠত, কেউ কেউ প্রচুর অর্থ কামিয়ে ধনী হয়ে গিয়েছিল।' (ই ডি ৩.৩৪৪-৬)।

সুলতান ফিরূজ ২৩টি পুরনো কর বিলোপ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও অসৎ রাজকর্মচারীরা যখনই অতিরিক্তটা আত্মসাৎ করতে পারবে বলে মনে করত তখনই গোপনে এইসব কর আদায় চালিয়ে যেত। আইনানুগ কর ছিল চাষ করা জমিতে উৎপন্ন ফসলের ১/১০ অংশ, *খরাজ* হিসেবে; হিন্দু 'এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' কাছ থেকে নেওয়া হত *জ়কাৎ* ('ভিক্ষা'), *জিজিয়া*; লুটের মাল ও খনি উৎপাদন থেকে নেওয়া হত ১/৫ অংশ। কিন্তু ফিরূজের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করাটা উচিত নয়। এমনকী *জ়কাৎ* করও, যা এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র বিজয়ী মুসলমানরাই চাপিয়েছে বলে মনে করা হত, তার অনুরূপ করের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গুজরাটে ৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের বিষ্ণুসেনের সনদে—যেখানে স্বাভাবিক করগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত *ধার্মিক* করের উল্লেখ আছে। পরম্পরাগতভাবে সামন্ততান্ত্রিক কর-আদায়কারী একটি শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে (*ই সি* ১০ Bow. ২৮)। সামন্ত শ্রেণীটির অস্তিত্ব নির্ভর করত এই ধার্য কর এবং প্রাচীন প্রথা, গায়ের জোরে আদায় করা কর, বা প্রত্যক্ষভাবে জমি চাষ করে জায়গীররা যা পেত তার পার্থক্যের ওপর হিন্দু মন্দিরগুলিও কিছু কিছু মুসলমানকে আকৃষ্ট করতে শুরু করেছিল; অতঃপর, স্বৈরাচারী শাসকরা সেগুলিকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে শুরু করল। এটা এই দেশে বসতিস্থাপন-কারী মুসলমানদের, তাদের নিজস্ব রীতিতে, ক্রমশ হিন্দুদের মতো ই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হওয়া বা তাদের চেয়ে বেশি গোঁড়া হয়ে ওঠার হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি—যার কারণ, 'গ্রামীণ জীবনের নিরেট মূর্খতা'। অবশ্য, অনেক হিন্দু ভূস্বামী খেতাব বজায় রাখা ও করের হাত থেকে বাঁচার জন্য মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা *জিজিয়া* করের বিরুদ্ধে অনশন করেছিল, তবে তাদের অনেকেই ছিল কার্যত ভিখারী। দিল্লিতে *জিজিয়া* কর ছিল প্রথম শ্রেণীর জন্য বছরে ৪০ টঙ্কা, দ্বিতীয় শ্রেণী ২০ টঙ্কা, এবং তৃতীয় ১০ টঙ্কা। ব্রাহ্মণরা প্রাসাদ দ্বারগুলিতে বেশ কয়েকদিন ধরে অনশন করার পর প্রায় মরতে বসেছিল। তখন অন্যান্য হিন্দুরা হস্তক্ষেপ করে এবং সুলতান করের হার মাথা পিছু ১০ টঙ্কা ও ৫০ *জিতল* স্থির করে দিলে তা দিতে রাজী হয়। ফিরূজ যমুনা ও শতদ্রু থেকে দুটি খাল করনালের ওপর দিয়ে দিল্লি পর্যন্ত খনন করান এবং অজস্র ছোট ছোট জল প্রকল্প গড়ে তোলেন। এবং ধর্মীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা করার পর ১০ শতাংশ হারে আলাদা জল-কর ধার্য

করা হয়। এই সমস্ত *উলেমারাই* আলাউদ্দিনকে ক্ষুব্ধ করেছিল এই কথা বলে যে, অতি সাধারণ কোন সৈনিকের চেয়ে বেশি অধিকার তাঁর নেই; অর্থাৎ, ইসলামের ধর্মীয় গণতন্ত্র ততদূর পর্যন্তই গিয়েছিল যতদূর অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ইসলাম অবিশ্বাসীদের কাছে থেকে মুনাফা করতে দেয়। এখন তারা যে বিবেচনাটা দেখাল তা সুলতান রাজত্বের শ্রেণী-ভিত্তিকে দৃঢ় করল। ফিরুজ, দাসদের সাহায্য নিয়ে, নিজেই উৎপাদনে অংশ নিয়েছিলেন।

'সুলতান ফিরুজ দাসদের নিয়োগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত অধ্যবসায়ী ছিলেন, এবং তাঁর এই অধ্যবসায় এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে বড় বড় জায়গীরদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যুদ্ধ হলেই দাসদের বন্দী করে তাদের মধ্য থেকে সেরাদের বেছে নিয়ে রাজদরবারের কাজে লাগাতে। (হাতি প্রভৃতির মতো এই উপহারকে মূল্যবান বলে মনে করা হত, এবং এর জন্যে কর ছাড় দেওয়া হত—যা আগে কোন শাসকই করেনি।) ... যে সব প্রধান অনেক দাস নিয়ে আসত তারা সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেত। ... প্রতি বছর এই সংখ্যা বর্ণনাতীতভাবে বেড়ে উঠছিল। ... সংখ্যায় বেশি হয়ে গেলে সুলতান তাদের পাঠিয়ে দিতেন মুলতান, দীপালপুর, হিসার, ফিরোজা, সমান, গুজরাট এবং অন্যসব সামন্ত উপনিবেশগুলিতে। সব ক্ষেত্রেই তাদের ভরণপোষণের জন্য উদারভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হত। কোন কোন স্থানে তাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হত, দান করা হত গ্রাম। যাদের শহরে নিয়োগ করা হত তারা পর্যাপ্ত ভাতা পেত এবং তার পরিমাণ সর্বনিম্ন ১০ *টঙ্কা* থেকে ১০০ *টঙ্কা* পর্যন্ত। প্রতি ছয়, চার বা তিন মাস অন্তর কোষাগার থেকে এই ভাতা পুরোটাই দিয়ে দেওয়া হত, কোন কিছু কেটে না নিয়েই। কিছু (দাস)-কে কারিগরদের অধীনে নিয়োগ করা হত এবং কারিগরি কাজ শেখানো হত—ফলে প্রায় ১২,০০০ দাস বিভিন্ন ধরনের কারিগর (*ক সীহ্*) হয়ে উঠেছিল। ... এই প্রতিষ্ঠান (দাসত্ব প্রথার) দেশের কেন্দ্রেই গভীরমূল হয়েছিল এবং এদের জন্য আইন তৈরি করাকে সুলতান তাঁর অন্যতম আরোপিত কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ... এমন কোন পেশা ছিল না যাতে ফিরুজ শাহ্-র দাসরা নিযুক্ত হয়নি। এই সুলতানের পূর্বসুরিদের কেউই কখনো এত বেশি দাস সংগ্রহ করেনি। মৃত সুলতান আলাউদ্দিনের সংগ্রহ ছিল প্রায় ৫০,০০০, কিন্তু তাঁর পর থেকে সুলতান ফিরুজ-এর এই ব্যবস্থা চালুর আগে পর্যন্ত কোন সুলতানই দাসদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর দেননি। ... বড় বড় সামন্ত প্রধানদের অধীনে দাসের সংখ্যা যখন খুব বেশি হত তখন তাদের কিছু কিছুকে সুলতানের হুকুমে আমির ও মালিকদের অধীনে দিয়ে দেওয়া হত যাতে তারা নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট কাজ শিখতে পারে। ... কিন্তু তাঁর (ফিরুজ শাহ্-র) মৃত্যুর পর বিশেষ আনুকূল্যপ্রাপ্ত এই ভৃত্য (অর্থাৎ দাস)-দের নির্মমভাবে মুন্ডচ্ছেদ করে দরবারের সামনে স্তূপাকৃতি করে রেখে দেওয়া হয়।' (*ই ডি* ৩.৩৩০-৩৪২)।

সুলতানের দিক থেকে এই ধরনের দাসত্বপ্রথা ছিল নিজের সামন্তদের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমানোর একটা প্রয়াস। দাসরা তাঁর নিজস্ব বাগানে চাষ-বাসের কাজ চালাত এবং সেখানকার উৎপন্ন ফসল যে শুধু প্রাসাদে আসত তা নয়, খোলা বাজারেও বিক্রি হত—যেমন বিক্রি হত কারখানায় দাসদের বোনা কম্বল ও বস্ত্র। সুলতানের সাজ-সরঞ্জাম, গাড়িঘোড়া, বা প্রাসাদগুলি পাহারা দেওয়ার জন্য চল্লিশ হাজার দাস নিযুক্ত ছিল। সুলতানি দাসের (*বন্দগাঁ-ই-খাস*) সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১,৮০,০০০—আলাউদ্দিনের সময় যা ছিল

৫০,০০০। ফিরূজ বিবাহের যৌতুক হিসেবে ইমাদ-উল-মুলক্ নামে একজন দাস পেয়েছিলেন—যিনি পরবর্তীকালে তাঁর রাজ্যের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন; তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি টঙ্কা। 'তিনি রাপরি-র জায়গীরের মালিক ছিলেন, এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তা দেখাশোনা করতেন।' যখন আমরা মাথায় রাখি যে দিল্লির অধিকাংশ পূর্বতন সম্রাটই সক্ষম হলে দাস রাখতেন, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে এই ধরনের দাসত্ব-প্রথা উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল না। ফিরূজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সামন্তপ্রভুরা এই বিপুল দাসের অস্তিত্ব নিজেদের পক্ষে যথেষ্ট বিপজ্জনক মনে করেই তাদের কচুকাটা করেছিল। সাধারণভাবে, সামন্ত দাসরা অধিকাংশই ছিল গৃহভৃত্য—সংকটের সময় নিজেদের মালিকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে যারা হয়ত জাত বা সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য দেখাত। ছোট ছোট ভূস্বামী, বিশেষ করে অবসর-ভাতা হিসেবে পাওয়া জমির মালিক সৈনিকদের ক্ষেত্রে, দাসরা প্রায়শই হত তাদের আইনসম্মত উত্তরাধিকারী এবং প্রকৃতপক্ষে দাসদের সেভাবেই গ্রহণ করা হত যাতে তারা বৃদ্ধ বা পঙ্গু মালিকদের জীবদ্দশায় দেখাশোনা করতে পরে (*এম. ই. আই* ৩.৪৯৬-৭)।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ উত্তর কনড় জেলায় দাসের সংখ্যা ছিল ১৬,২০১, অন্যদিকে স্বাধীন মানুষের সংখ্যা ছিল ১,৪৬,৮০০ (*বি. জে* ২.৪৪২)। দক্ষিণ কনড় জেলায় ৩,৯৬,৬৭২ জন অধিবাসীর মধ্যে দাস ছিল ৪৭,৩৫৮ জন (*বি. জি.* ৩.২-৬); মালাবারে ১৬,৫৭৪ জন দাস, স্বাধীন ১,০৬,০০০ জন (বি. জে ২.৩৬২)। এদের মধ্যে নারী এবং শিশুও যুক্ত, তবু এই অনুপাতটা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। দাসদের একটা মজুরির হারও নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু মালাবারে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হত জঘন্য (বি. জে. ২.৩৭১)। প্রস্থিত দাসত্বপ্রথার এই সংক্ষিপ্ত উপস্থিতির পিছনের কারণ অংশত ঐতিহাসিক এবং অংশত, এই সময় ও স্থানে পণ্য উৎপাদনের আপেক্ষিক ভাবে অত্যন্ত বেড়ে ওঠা। মুসলমান বিজয় স্বশাসিত গ্রাম-সংঘগুলিকে, রূপের দিক থেকে দেশের ক্ষুদ্র একটা অংশে ছাড়া, সর্বত্রই ভেঙ্গে দিয়েছিল; রয়ে গিয়েছিল মধ্যম বর্গীয় ভূস্বামী শ্রেণীগুলি। এদের কারোরই বড় কোন বাগিচা ছিল না, ছিল না বড় কোন দাসের দল; জনাকয়েক ভূমিদাস (আর তাদের পরিবার) রাখাটাই, মনে হয়, ছিল রীতি। স্বশাসিত গ্রাম-সংঘের আগেকার বিধিনিষেধগুলি থেকে মুক্ত এই ভূস্বামীরা কোন সামন্ত শাসক ছিল না, কেননা সাধারণত মুসলমানরা নিজেদের পরিতৃপ্ত করত দূর থেকে রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে এবং বসতি স্থাপনকারী মুসলমানরা ছিল ব্যবসায়ী। উপকূল বরাবর ও নদীর মোহানায় পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল অস্বাভাবিক রকমের ভাল। বাইরে, স্থানীয় উৎপাদন, প্রধানত নারকেলের চাহিদা ছিল খুব বেশি। তাই, জাতে ওঠার অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং কঠোর কায়িক শ্রমে অনিচ্ছুক এই ভূস্বামীদের পক্ষে দুর্ভিক্ষ এবং উপজাতি এলাকাগুলিতে জঙ্গল হাসিলের ফলে ঋণ ও দাসত্বের শক্ত ফাঁদে আটকে পড়া উপজাতিভুক্ত মানুষদের মধ্যে থেকে কয়েকজন দাস রেখে দেওয়াটা ছিল লাভজনক—ফ্রান্সিস বুকাননের সতর্ক চোখে এটা ধরা পড়েছে। তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন যে, সামন্ত যুগের বিহারে (*এম. ই. আই*) ছোট ভূস্বামীরা খুবই খুশি হত তাদের দাসরা পালিয়ে গেলে, কেননা তাহলে তাদের ভরণপোষণের খরচ বেঁচে যেত। উত্তরাঞ্চলের বড় বড় ভূস্বামীরা সাধারণত বেশি সংখ্যক দাস রাখত মূলত মর্যাদা এবং গৃহকাজের জন্য। উত্তর কনড় সন্নিহিত গোয়া-য়, যেখানে আদিম স্বশাসিত গ্রাম-সংঘ টিকে ছিল, সেখানে কোন দাসত্ব প্রথা ছিল না;

ব্যারন সুলভ* কৃত্রিম জাঁকজমক 'নতুন বিজিত অঞ্চল'-এ ছিল। কাউকে দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করার জন্য কোন আইন ছিল না, ছিল না বিক্রি করার বা বরখাস্ত করার কোন পথও। বাড়ির অল্পবয়সীদের তাদেরকে সম্মান দেখাতে হত, বিবাহের সময় আসন দেওয়া হত সম্মানিতদের মধ্যে। তরুণ-তরুণীদের পতি বা পত্নী বেছে নিতে হত তাঁদের সমবয়সীদের মধ্যে থেকে—যার ফলে অপরিহার্যভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল অতি ক্ষুদ্র একটা আলাদা জাত, যা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই বিলুপ্ত হয়। এই ধরনের জীবন কোন অর্থেই মনোরম ছিল না ঠিকই, কিন্তু এর সঙ্গে তুলনা চলে না অস্থাবর দাস-সম্পত্তি প্রথার—যা নিয়ে এই সময়কালেই সঙ্ঘটিত হয়েছিল এক ভয়ঙ্কর হত্যালীলা আমেরিকার গৃহযুদ্ধে; প্রাচীন গ্রীক ও রোমান দাসত্বের সঙ্গে তো নয়ই। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ-ভারতে এক ডিক্রি জারি করে এই প্রথা রদ করা হয়—কিন্তু দেশের বাকি অংশে তার বিলুপ্তি ঘটে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক না হওয়ার কারণেই, ব্রিটিশ প্রভাবে নয়। অন্যদিকে, প্রকৃতই দৃঢ়মূল কুসংস্কারগুলি** এবং জাতিভেদ সমেত প্রচলিত প্রথাগুলির অস্তিত্ব বজায় থাকে।

১০.৫ মূলত এই ধরনের সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্যই ছিল গায়ের জোরে[৭] এবং সামন্ত জমিদারদের বিনিয়োগের মাধ্যমে বসতির ঘনত্ব বাড়ানো। যেমন, জল-সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, এবং সেচের ব্যবস্থা কোন একক গ্রামের ক্ষমতা ও সীমা বহির্ভূত ব্যাপার, কয়েকটি গ্রাম জুড়ে জমিদাররা বছরের পর বছর একাজ করে যেত। এগুলি ছিল সবচেয়ে লাভজনক লগ্নি। এর জন্যে জমিদাররা *অগর বাতাই* ভাগ-ব্যবস্থা অনুসারে শস্য ঝাড়াইয়ের পর ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি খাজনা আদায় করে নিত (*বি. পি. এল* ১৯৬-২১০)। আনুমানিক শস্য উৎপাদনের ওপর খাজনার মূল্য ধরে দেওয়ার *ভাওলি* প্রথা ছিল, যাতে নগদ অর্থে জমিদারকে খাজনা দিতে হত। প্রথমটির ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে, সমস্ত মালিকদের সঙ্গে তখন ব্যবসায়ীদের লেনদেন ছিল, এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ীরা সরাসরি রায়তদের সঙ্গে কারবার চালাতে পারত।

বৈশিষ্ট্যসূচক দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে দুই ধরনের সামন্ততন্ত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং অবশ্যম্ভাবী যে, দ্রুত রূপান্তরণ তার প্রক্রিয়াটিকে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে :

* যেমন, আমার অক্ষম প্রপিতামহ যখন সামন্ততান্ত্রিক অধিকারবলে পাওয়া বিপুল ভূ-সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে 'আগে বিজিত' অঞ্চলের একটা জনমানবহীন গ্রামে বসতি স্থাপনের জন্য চলে যেতে বাধ্য হন তখন পুরনো দু'জন *বন্দে* গৃহভৃত্য তাঁর সঙ্গে সেই নির্বাসনে যায়, এবং গৃহস্থের সামান্য আয় বাড়ানোর জন্যে খেতে কাজ করে, খড় তালপাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি ঘরে একইসঙ্গে বাস করে কোনমতে জীবন-যাপন করতে থাকে।

** দৃষ্টান্ত হিসেবে, ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর প্রত্যক্ষ বংশধারায় আমিই প্রথম জন্মানো পুত্রসন্তান বলে তাঁর দেহান্তরিত আত্মা,ডাক-নাম, এবং নাম-এর স্বাভাবিক অধিকারী হয়েছিলাম। একজন নম্র, অভিজাত ব্রাহ্মণ রমণী হিসেবে আমার বিধবা ঠাকুমা (তিনি মারা যান ১৯১৬ সালে) আমাকে ভাল-নাম ও ডাক-নাম কোনটাতেই ডাকতে পারতেন না—যদিও আমি ছিলাম তাঁর প্রিয় নাতি, যাকে তিনি একই সঙ্গে প্রশ্রয়ও দিতেন আবার শাসনও করতেন। ছেলেবেলায় দূরের শহর থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর যখন আমি গ্রামে যেতাম তখন প্রথমেই পা ছুঁয়ে প্রণাম করতাম আমার ঠাকুমাকে। আমার অল্প-বয়সী মাথা থেকে সম্ভাব্য কু-দৃষ্টির প্রভাব আনুষ্ঠানিকভাবে ঝেড়ে ফেলার জন্য ক্রিয়াচার পালন করা হত। তারপর উপস্থিত পরিবারের লোকজনের সামনে তিনি আমাকে কোলে বসিয়ে আমার মুখে কিছুটা চিনি পুবে দিতেন, আর আশীর্বাদ করতেন আমার কথাগুলো যেন চিনির মতো মিষ্টি হয়। যাঁরা এই মনোহর, হাস্যকর ও অধুনাবিস্মৃত ক্রিয়াচারের সাক্ষী ছিলেন, এর ফলাফল বিচার করে, তাঁদের ধারণা হবে ঠাকুমা আমার মুখে যথেষ্ট চিনি দেননি!

'মুসলমান শক্তি যখন (উত্রাউলা) রাজ্য জয় করলেন, সেই রাজ্যের রাজাকে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর দিতে বাধ্য করা হল এবং নিজস্ব কয়েকটি গ্রাম শুধু রাজার অধীনে রাখা হল, আর বাদবাকি সমস্ত গ্রাম থেকে রাজার রাজস্বের অংশ নিয়ে নিলেন লক্ষ্ণৌ সরকার; কিন্তু রাজা গ্রামগুলির রাজস্ব হারালেও সেগুলির উপর এক ধরনের কর্তৃত্ব বজায় রাখলেন, এবং তারপর তিনি *এক বা একাধিক গ্রামের সম্পূর্ণ জমিদারি স্বত্ব বিক্রি করে বা দান করে* (কোন বিবেচনার কারণে) *অর্থ সংগ্রহ করতে* শুরু করলেন; এটা তাঁকে শুধু অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও কর্তৃত্বের অধিকারই দিল তাই নয়, এই এলাকার সমস্ত পতিত ও অন্যান্য 'জমিদারি-সংক্রান্ত' অধিকারও দিল। এইভাবে যে মালিকানার স্বত্ব সৃষ্টি করা হল তা 'বার্ট জমিদারি' (birt zamindari) হিসেবে পরিচিত হল এবং এটাই সবচেয়ে প্রচলিত হয়ে দাঁড়াল। ... এই রাজ্যে অনেক গ্রামই জায়গীর দেওয়া হয়েছিল সেই সব মুসলমান সৈন্যকে যারা আফগান হানাদারকে বিজয়ী হতে এবং রাজ-এর দখল পেতে সাহায্য করেছিল। এই সমস্ত জায়গীরদাররা কোন রাজস্ব দিত না, শুধু সামরিক সাহায্য প্রদানের দায়বদ্ধতার অতিরিক্ত বছরে একবার করে সামান্য কিছু কর দিত। যথেষ্ট স্বাভাবিক কারণেই, এই ধরনের দান-প্রাপকদের পরিবারগুলিই হয়ে উঠেছিল গ্রামগুলির যৌথ মালিক, পুরনো জমি-মালিকরা হল তাদের রায়ত।... যেমন, বাংলায় মুঘল সুবাদার কখনোই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙার কাজে হাত দেননি, বা কোন নতুন ব্যবস্থা প্রচলনের কাজেও নয়। আকবরের বিলি-বন্দোবস্তের লক্ষ্য ছিল সব অর্থেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং সাদামাটাভাবে, উৎপাদনে রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশ—যতটা হিন্দু শাসককে প্রদেয় ঠিক ততটাই—নিয়মিতভাবে আদায় করার নিশ্চয়তা; কিন্তু যখন রাষ্ট্র রাজস্ব সংগ্রহের জন্য রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করতে শুরু করল,তখন, স্বাভাবিক কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত, মূল গ্রামীণ ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়ল, এবং তা রাজস্ব-আদায়কারীদের, নিছক পরিস্থিতিব আনুকূল্যেই সমগ্র ব্যবস্থার 'মালিক'-এর মতো হয়ে উঠতে সাহায্য করল। রীতি অনুসারেই জমিদাররা হয়ে উঠেছিল গ্রামের মালিক, যেমন বাংলায় রাষ্ট্রকে একটা বিপুল পরিমাণ কর তাদের দিয়ে যেতে হত, পরিণতিতে তারাও নিজেদের অধীনে গ্রামের কৃষকদের নিয়োগ করতে বাধ্য হত এবং তাদের প্রধান কাজই ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা; ফলে তারা, পতিত জমিতে নিজেদের ইচ্ছেমতো কৃষকদের চাষ করতে দিত এবং যদি মনে করত চাষযোগ্য জমির মূল চাষী ঠিকমত চাষ করতে বা খাজনা দিতে পারছে না, তাহলে বিনা কেতাকানুনেই তাকে উচ্ছেদ করে দিত। সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে জমির মূল স্বত্বাধিকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে জমিদাররাই ভূস্বামী হয়ে গেল। ... (এ লিয়াল, *ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার ফর বেরার,* পৃ. ৯৬ থেকে উদ্ধৃত) ঃ উৎপাদনের ভাগ দেওয়ার ব্যাপারটা এখন সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে, ধনবান হওয়া কৃষকরা তাদের উৎপাদনের অর্ধেক খাজনা দিতে রাজি হবে না, এবং অংশীদার হওয়ার দাবি জানাবে। নগদ অর্থে খাজনা দেওয়াটাও ধীরে ধীরে রীতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ... যারা চাষ করে না এমন শ্রেণীগুলির হাতে জমি এখন কদাচিৎ যায় এবং যদি যায়ও তারা তা অন্যকে ভাড়া দিতে বাধ্য হয়। মহাজনরা এখন ঋণ শোধের জন্য কৃষকের অন্নসংস্থানের জমি কিনে নিতে পারে, এবং তা ইজারা দিতে পারে; আগে তাদের পক্ষে রায়ত পাওয়াটা ছিল কঠিন ব্যাপার।' (*বি-পি., ম্যানুয়াল,* পৃ. ৫৬, ৬৫২-৩, ৬৩৫)।

এ থেকে বোঝা যায়, জমিতে সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া অধিকারগুলি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, আনুকূল্যটা নেওয়া হয়েছিল অস্ত্রেরও, 'নিছক'ই পরিস্থিতির নয়। শক্তিশালী সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র শুধু পুরনো ধরনের গ্রামের মালিকানাই ধ্বংস করেনি, মালিকানার নতুন রূপকে নিয়মানুগ না করে, বা তাকে নিরাপত্তা ও ধারাবাহিকতা না দিয়ে নিজের ভিত্তিকেও

ধ্বংস করেছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রও রাজস্ব না মেটালে জমিমালিককে উচ্ছেদ করতে পারে, কিন্তু তার জন্য অনেক বেশি নিয়মকানুন মানতে হয় এবং উচ্ছেদ করাটা হয়ে ওঠে লাভজনক।

শাসক বংশের আপাত-নিঃসাড় পরিবর্তনগুলি, ক্রমবর্ধমান হানাদারি (বিশেষ করে মারাঠাদের দ্বারা), এবং একের পর এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের ক্রমপুঞ্জিত পরিপাটি ফল একটাই—তা হল, সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী শ্রেণীর বিকাশ। শুধু যে পর্যায়ক্রমিক প্রাকৃতিক দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করার অর্থনৈতিক ক্ষমতাই তাদের হাতে ছিল তা নয়, বেতনভুক বা দাস মজুরদের দিয়ে নিজস্ব মালিকানায় চাষবাসের জন্য সেরা জমি দখল করার শক্তিও তাদের ছিল; ঘটনাক্রমে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে দাসপ্রথার একমাত্র কাজ ছিল এটাই। গৃহ দাস-রা ছিল মর্যাদা ও জাঁকজমক দেখানোর জন্যে; কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধাজনক জমিতে চাষ করতে প্রজাদের রাজি করানো না গেলে ভূস্বামীরা দাসদের দিয়ে তা চাষ করাত। নগদ অর্থে এই দাসদের কেনা হলেও সাধারণত এদের ভরণপোষণের জন্য কিছুটা জমি বরাদ্দ করে দেওয়া ছাড়াও জমিদারের শস্যভাণ্ডার থেকে ভাতা হিসেবে কিছু খাদ্য দেওয়া হত। এই বিশেষ ধরনের কৃষক-দাসত্ব বাস্তবিকই তেমন প্রচলিত ছিল না। দাসদের মধ্যে ছিল নানা ধরনের মানুষ। উপজাতিভুক্ত অনেক মানুষ দাসত্বে আবদ্ধ হত দুর্ভিক্ষের সময় এবং এদেরই একধাপ দূরের উপজাতিক বর্ণগুলির মানুষ বা সবচেয়ে গরীব কৃষকরাও দাস হত ঐ একই কারণে—প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শুধতে পারা যাবে না এমন কোন দেনার দায়ে। মালাবারের চেরুমন, আলমোড়ার কাছে হিমালয়ের কোলে জৌনসার-রাওয়ারের কোল্টা, গুজরাটের হালি ইত্যাদির মতো সর্বনিম্ন পোষিত জাতগুলি এই ধরনেরই। দুর্ভিক্ষ-দাসত্ব এবং ঋণ-দাসত্বর কথা প্রাচীন *স্মৃতি*গুলিতেও (*নারদ* ৫.২৪-৬, *মনুস্মৃতি* ৮.৪১৫) উল্লেখ রয়েছে। সেই অর্থে, *মনুস্মৃতির* ক্ষুদ্র নৃপতিদেরও খুব সহজেই সামন্ত জমিদার বা বৃহৎ সামন্ত ভূম্যাধিকারীদের সঙ্গে মেলানো যায়। কখনও কখনও দাসদের ভাড়া খাটানো হত এবং ভাড়া অর্জন করত মালিকরা। সামগ্রিকভাবে অবশ্য, বৃহদায়তন দাসপ্রথা লাভজনক হয়নি। দাসদের পালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে কোন আইন ছিল না, কোন বিশেষ জমিদার বা কর-ইজারাদারের নগ্ন বলপ্রয়োগ ছাড়া প্রতিবিধানও কিছু ছিল না; প্রায়শই ফেরার দাসদের আশ্রয় দিত অভিজাত সম্প্রদায়দেরই অন্য কোন সদস্য। দাসত্বের ফলে কিছু দাস তাদের জাত খোয়াত, আবার অনেকে তা রক্ষা করত; দাসত্ব ও অসবর্ণ বিবাহের ফলে কয়েকটি নতুন জাত-ও সৃষ্টি হত। কিন্তু, বিগত কালের অবশেষগুলি ছাড়া এই সীমাহীন বৈচিত্র্য নিয়ে চর্চা করাটা অর্থহীন।

মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্বিপাকের হাত থেকে সামন্ত জমিদারদের সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল সামান্যই। যে কোন হানাদার সহজেই ভূস্বামীর বাড়ির অবরোধ ভেঙে ফেলে তার সঞ্চিত সম্পদ লুঠ করে নিতে পারত। তা সত্ত্বেও, যে হানাদার বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর আদায় করতে চাইত—তাকে কারো কারো সামন্ততান্ত্রিক অধিকার মেনে নিতে হত; ফলে, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ক্ষয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত ভূস্বামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল। এই জমিদাররা যারই কর আদায়ের ক্ষমতা ছিল তাকেই কর দিত। এরা *গধী* নামে প্রাচীর ঘেরা নিজস্ব সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল গড়ে তুলত (*ডি. আর* ১.১০৬) এবং যার যার সাধ্যমতো সশস্ত্র রক্ষী পুষত। ক্রমশঃই আরো বেশি বেশি করে এই ধরনের জমিদাররা কর আদায়ের দায়িত্ব পেতে শুরু করেছিল। আকবরের মতো শক্তিশালী কোন শাসকের সময় কর দাবি করা হত নগদ অর্থে, তবে তা শস্যের

নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী। বিশাল সাম্রাজ্যের বহির্ভূত কিন্তু আধা-স্বাধীন রাজপুতানা, দক্ষিণ ভারত ও বাংলার কোন কোন অংশের সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলি থেকে রাজস্ব আদায় করত বেতনভুক সরকারি কর্মচারী বা কর-ইজারাদাররা (ফসলে সংগৃহীত (নির্দিষ্ট) কর নগদ অর্থে রূপান্তরিত করে রাজকোষে জমা দেওয়ার দায়িত্ব এরা গ্রহণ করেছিল)। তা সত্ত্বেও, আবুল ফজল *আইন-ই-আকবরি* (সেই আমলের অর্থশাস্ত্র, আইনগ্রন্থ ও ইতিহাস)-তে লিখেছেন যে, সামন্ত ভূস্বামীদের পোষিত সৈন্যের (*বুমি*) সংখ্যা তখন মোট ছিল ৪০ লক্ষ। কিন্তু এরা ছিল অনিশ্চিত সম্ভার, রাষ্ট্রের কোন কাজেই লাগত না; সামন্তপ্রভুরা সহায়তা পাঠানোর আগে সবসময়ই দেখে নিত কোন্ পক্ষ জিততে চলেছে (*মোর* বি. ৩৪, ৭৪)। সামন্ত জমিদারদের মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের এইভাবে ছড়িয়ে পড়াটা অসহনীয় রকমের ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুখের দিনে, জমিদার বলতে বোঝাত শুধুই বিভিন্ন কৃষকের হয়ে কর জমা দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কখনও কখনও এদের উদ্ভব ঘটত গ্রামের প্রধান, *মুকদ্দম* বা *চৌধুরী*-দের মধ্য থেকে। সেক্ষেত্রে, জমি চাষ করা হতো সাধারণত *বিরাদরি* ('ভ্রাতৃত্ব') প্রথায়—যা উপজাতিক অধিকারের সম্প্রসারণ বা সামন্ততান্ত্রিক পরিবার প্রথার বিকাশের মাধ্যমে যৌথ মালিকানারাই বহিঃপ্রকাশ। অন্ততপক্ষে, মুণ্ডাদের মধ্যেকার 'অখণ্ড *খুন্ত-কাট্টি* অধিকার' (*রায়,* পরিশিষ্ট-১, পৃ. দশ, ছয় পরবর্তী) আদিতে ছিল সমান অধিকারত্বের ভিত্তিতে যৌথ উপজাতীয় সম্পত্তি; পরবর্তীকালে তার সঙ্গে যুক্ত হয় কোন উর্দ্ধতন প্রভু, সামন্ত বিজেতা, বা উন্নতিকামী উপজাতি সর্দারকে কর প্রদানের যৌথ দায়িত্ব। যুক্তপ্রদেশে গত শতাব্দীতে পর্যন্ত জমিদারি বলতে বোঝাত 'জমি ভোগদখলের একটা ব্যবস্থা যাতে গ্রামের সমস্ত জমি যৌথ অধিকার ও তত্ত্বাবধানে থাকে। এই মহালের খাজনা এবং অন্যান্য যাবতীয় মুনাফা একটি যৌথ তহবিলে জমা হয় এবং সরকারের রাজস্ব (*মালগুজারী*) ও গ্রামের খরচ (*গাম্ব-খরচ*) কেটে নেওয়ার পর বাকি ভাগ অংশীদারিত্বের অনুপাত, বা আইন, বা গ্রামের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে বেটে দেওয়া হয়' (*ক্রুক,* ২৮৪)। এটা সাধারণভাবে জমির মালিক হিসেবে একটা উচ্চ শ্রেণী ছিল বলে প্রমাণ করে। মূল স্বশাসিত গ্রাম-সংঘ থেকে বিকাশের নিচের পর্যায়ে ছিল *ভইয়া-কার* স্বত্ব (*ক্রুক,* ৪০)—যাতে কোন যৌথ মালিকানার উত্তরসূরিরা প্রত্যেকের অধিকৃত জমির অনুপাত অনুযায়ী কর দানের দায়িত্ব ভাগ করে নিত। বুন্দেলখণ্ডের *ভুজ-বেরার* (*ক্রুক* ৪৩) ব্যবস্থা ছিল যৌথ-মালিকানার আর এক রূপ, যেখানে 'কোন লোকের পরিবারের শ্রম-শক্তিই হয়েছিল তার সম্পত্তির মাপকাঠি।' দক্ষিণে মালিকানার স্বীকৃতি দেওয়া হত *মিরাসদারি* স্বত্বে—যাতে একটা নির্দিষ্ট, এবং বাস্তবিকই অত্যন্ত বেশি, কর দেবার শর্ত যুক্ত থাকত; এই স্বত্ব বিক্রি করা, উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করা, বন্ধক (ঋণ শোধ করার সঙ্গে সঙ্গে মালিকানা ফিরে পাওয়ার অধিকার সমেত) রাখা যেত। আর এক ধরনের মালিকানা স্বত্বও ছিল—যা দেওয়া হত স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে, কিংবা কম উর্বর বা হাসিল না করা জমিতে। এতে রাষ্ট্র বা তার সামন্ত প্রতিনিধি খাজনা নির্ধারণ করত সাধারণত সহচারী মানে, অর্থাৎ শস্য বপনের ভিত্তিতে।

যে সমস্ত কারণের জন্য স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছিল তার একটা হল উপরের দিকে উত্তরাধিকার নীতির অভাব। কোন নিয়মিত জমিদারিত্ব, ভূ-স্বামিত্ব, বা আভিজাত্যে-র স্বীকৃতি ছিল না। রাজার সভাসদদের মধ্যে কখনো কখনো দাসও থাকত। কেউ যদি সামন্তপ্রভু (বিশেষ প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে রাজধানী থেকে যথেষ্ট দূরে স্থায়ীভাবে মোতায়েন, যেমন নিজম-উল-

মুলক) বা নিজ অধিকার বলে অধীনস্থ রাজা (যে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার কিছুটা পরিমাণে নিয়মিত) না হত তাহলে সম্রাটই ছিল তার উত্তরাধিকারী এবং প্রায়শই অধিকার দাবি করত। প্রদেশগুলিতে সামরিক নিয়োগ এবং তার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে যুক্ত রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব বংশানুক্রমিক ছিল না, যদিও আবার কখনো কখনো বেতন হিসেবে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের আয়ের ওপর অস্থায়ী সামন্ততান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হত। এইভাবে, সম্রাটের সচিববর্গ ও দরবারের উচ্চ অভিজাতবর্গের মধ্যে একটা ধারাবাহিক সংঘাত ছিল, যা আরও জটিল হয়ে উঠেছিল দরবারে বর্গগুলির সতর্ক ভারসাম্য রাখতে গিয়ে—যেমন, রাজপুত ও পাঠানদের মধ্যে। এর কোনটাই স্থায়ীভাবে করা হয়নি। ঔরঙ্গজেবের পর মুঘল জায়গীর এবং (পেশোয়াদের সময় থেকে) মারাঠা জায়গীর বংশানুক্রমিক হয়েছিল, কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে, তা নিছক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের দুর্বলতাই প্রকট করে তোলে। মারাঠাদের হাতে যথেষ্ট জমি ছিল এবং তারা কর দিত সরাসরি কেন্দ্রকে।

সামন্ততান্ত্রিক নগরগুলির ক্ষণজীবী চরিত্রের কথা সুবিদিত। এগুলি সৃষ্টি হত প্রয়োজন সাপেক্ষে চলমান রাজসভা ও সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল ভোক্তাদের তুলনামূলক সীমিত একটি গোষ্ঠীর জন্য। ঔরঙ্গাবাদের জনসংখ্যা ঔরঙ্গজেবের আমলে ৪০০,০০০-এ পৌঁছেছিল। তিনি বেশ কয়েকবছর এই কেন্দ্র থেকে সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। এই নগরীর জন্য তিনি যে জলসরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ করেছিলেন—জনৈক ইংরেজ ইনজিনিয়র তার ভূগর্ভস্থ উৎস খুঁজে বের করতে গিয়ে যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করলেও—বর্তমান ছোট শহরটির পক্ষে তা পর্যাপ্ত। বিজয়নগর, তার সমৃদ্ধির দিনে, ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় নগরীগুলির একটি। প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখন মনে দাগ কাটে না, আর বাড়িগুলি ধুয়ে এসে চষা খেতের কাদার সঙ্গে মিশে গেছে। শুধুমাত্র বিশাল একশিলা মূর্তি সমন্বিত অসংখ্য স্মৃতিসৌধ দর্শককে বুঝিয়ে দেয় যে একসময় এটা কোন সাধারণ বসতি ছিল না। বিজাপুরকে খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায় একটি জেলার এক গৌরবমণ্ডিত গ্রাম হয়ে ওঠার হাত থেকে রেলপথ বাঁচাতে পারেনি। আগ্রা মুঘল আমলের রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও, রাজসভা অন্যত্র চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ছোট বসতিতে পরিণত হয়। অল্প যে ক'টি নগরী হস্তশিল্পের অনন্যসাধারণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সেগুলি সরাসরি নতুন শিল্পকেন্দ্রে রূপান্তরিত হতে পারেনি, বরং বিস্ময়কর দ্রুততায় ইংরেজ উৎপাদকরা সেগুলিকে ধ্বংস করেছিল। যেমন, ঢাকা নগরীর জনসংখ্যা যখন প্রায় ১৫০,০০০ তখন এই জেলা বছরে লক্ষ লক্ষ উৎকৃষ্ট হাতে বোনা কাপড় উৎপাদন ও (প্রধানত ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে) ইউরোপ-আমেরিকায় রপ্তানি করত। ১৮৩৭ সালের মধ্যেই বস্ত্রের এই গতি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়ায় এবং এক প্রজন্মের মধ্যে ঢাকার জনসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২০,০০০। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মূল বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল, সুরাটে নয়, বোম্বাই-এ—যেখানকার রাস্তার নামগুলি আজও গ্রামগুলির সঙ্গে প্রতারণা করে যায়, কারণ এই গ্রামগুলিই প্রথম বিকাশ ঘটিয়েছিল কাপড়কলের। একইভাবে, সুরাটও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে ঃ

'সেনাবাহিনীর পিছন পিছন যায় বেইড, লুটি, ও পিন্ডারী-দের ভিন্ন ভিন্ন সব লুটেরা দল এবং তারা দেশের মধ্য দিয়ে যাওয়া সৈনিকদের চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক। এই লুটেরারা কোন বেতন নেয় না, বরং তারা যখন যে বাহিনীর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে সেই বাহিনীর সেনাপতিকে লুটের বখরা দেয়, এবং অন্য কোন পেশার চেয়ে লুটেরার জীবনই বেশি পছন্দ করে; বর্শা ও তলোয়ারে

সজ্জিত হয়ে, কুঠার, লোহার শাবল এবং ভাঙচুরের অন্যান্য সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে তারা সেনাবাহিনীর হাতে ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত ও জনহীন গ্রামগুলিতে ঢোকে ঃ সেখানে সাধারণ লুঠতরাজ হিসেবে খাদ্য শস্য, মোটামুটি অক্ষত থাকা আসবাবপত্র ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি নেবার পর পিন্ডারীরা বাড়িঘরের তালা, কবজা ও সমস্ত ধরনের লোহার জিনিস ছাড়াও পছন্দসই কাঠ লুঠ করে; তারপর শস্যের সন্ধানে মাটি খোঁড়ে, গুপ্তধনের আশায় দেওয়াল ভাঙে এবং সবশেষে যেগুলি বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না সেগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়; যদিও আগুন লাগানো জিনিসগুলির চাহিদাও শিবিরের বাজারে থাকে, সেখানে মরচে পড়া একটা পেরেক পর্যন্ত কোন উপযুক্ত বস্তুর সঙ্গে বিনিময় করা হয়। ... এই পিন্ডারী-রা এবং শিবিরের অনুগমনকারী নানা ধরনের নিরস্ত্র লোকেরা বিস্ময়করভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সন্ধির পর, রাঘোব-এর ফৌজ যখন মন্ত্রীর ফৌজের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সব ধরনের শিবির অনুগমনকারী মিলিয়ে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ; গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল দু'লক্ষের বেশি; দুষ্কর্মে সহযোগীর সংখ্যা তো আরো বেশি। ... রাঘোবের শিবির ছিল কয়েক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে; তার নিজস্ব এবং বড় বড় সেনাপতিদের বাহিনীর অধীনে বাজার বা হাট বসত কয়েক হাজার তাঁবুর নিচে—সেখানে সমস্ত পণ্য এবং পেশার মানুষ মিলত, ঠিক নগরীর মতোই নিয়মিতভাবে। স্বর্ণকার,জহুরি, মহাজন, বস্ত্রব্যাপারী, ঔষধ-বিক্রেতা, ময়রা, ছুতোর, দর্জি, ঘরামি, শস্য পেষাইকারী, ঘোড়ার খুরে নাল পরানোর লোক সবাই পুরো সময়ের কাজ পেত; যেমন পেত রূপা, লোহা ও তামার সামগ্রী প্রস্তুতকারকরা; কিন্তু যাদের সবসময় কাজে লাগাত তারা সম্ভবত রাঁধুনি, ময়রা এবং ঘোড়ার ডাক্তাররা।' (*এফ. ও. এম.* ১.৩৪৪-৫)।

১৭৭৫ সালের রঘুনাথ রাও পেশোয়া-র শিবিরের এই বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালের যে কোন সামন্ততান্ত্রিক শিবিরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নারী, শিশু, ভৃত্য, বণিক, এবং কারিগর নিয়ে এই শিবির যখনই চলা বন্ধ করত তখনই তা হয়ে উঠত কোন নগরী। কিন্তু তা এমন কোন নগরী হত না যা সমাজের ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপাদন করে, বরং স্থানীয় উৎপাদনকেই আত্মসাৎ করে গ্রামাঞ্চলকে তা ধ্বংস করে দিত।

অপরদিকে অবশ্য শ্রমিকদের একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল যারা ভূমিদাসদের স্থান নিল এবং তাদের অস্তিত্বের ওপরই কার্যত এই ব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল। এরা ক্রীতদাস নয়, মজুর—যাদের নিজেদের কোন জমি নেই, থাকলেও সামান্য। বর্ষার আগে চাষের কাজ এবং ফসল কাটার সময় এরা নিজে থেকেই আসত। আদিম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত বলে আবহাওয়া বাধ্য করত (যেমন আজও করে) সমস্ত শ্রম-শক্তি একই সঙ্গে নিয়োগ করতে। সামন্ত জমিদার বা কর-ইজারাদাররা এই সমস্ত মজুরদের চাপ দিয়ে কাজ করাতে বা রায়তদের হাল-বলদ দখল করে নিজের জমিতে লাগাতে দ্বিধাবোধ করত না, কিন্তু তার একমাত্র পরিণতি ছিল বিপর্যয় এবং পরের বছর কম রাজস্ব আদায়; শোষিত মজুররা হয় না খেতে পেয়ে মরত, না হয় পালিয়ে যেত। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমদিকে এক ফরমান জারি করে এই ধরনের দখল বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। কোঙ্কন-এর খোত-রা, প্রত্যেকে গড়ে দুটি বা তিনটি গ্রামের কর আদায়কারী প্রতিনিধি হিসেবে, কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনপক্ষে ফসলের এক-তৃতীয়াংশ আদায় করত, যদিও রাষ্ট্রকে জমা দিত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ। পেশোয়াদের সময় এদের অধিকার ছিল নিজস্ব খাস

জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে (বেগার ভেট) গ্রামবাসীদের বাধ্য করার। এইসব খাসজমিগুলি ছিল সাধারণভাবে একটা পরিবারের উপযোগী ছোট জমি বা খেত, এবং গ্রামবাসীরা সবাই মিলে দু'তিন দিন খাটলেই কাজ মিটে যেত। কখনও কখনও হয়ত প্রাদেশিক শাসক রাষ্ট্রের জন্য রাজস্ব উৎপাদন হতে পারে এমন জমি চাষ না করে ফেলে রাখার অপরাধে—কিন্তু এর প্রকৃত তাড়নাটা ছিল অতৃপ্তি, পর্যাপ্ত জমির অভাব। মজুরদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত কাজের দিনে খাদ্য-সহ নগদ অর্থে, বা ফসলের ভাগে। সারাবছর খেয়েপরে থাকার পক্ষে এটা কখনই যথেষ্ট ছিল না, তাই পাশাপাশি অন্য কাজ তাদের করতেই হত। গ্রিয়ারসন লক্ষ্য করেছেন ঃ

'যদি আমরা আয়ের অন্যান্য উৎসগুলিকে বাদ দিই, তাহলে জেলার ৭০ শতাংশ জমিই তার কৃষকদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে না। এদের মধ্যে যাদের দুবেলা খাওয়া-পরার মতো যথেষ্ট সংস্থান আছে, তাদের কৃষিকাজ ছাড়াও আয়ের অন্য উৎস রয়েছে। ... মজুর শ্রেণীগুলির প্রত্যেকের এবং কৃষক ও কারিগর শ্রেণীগুলির ১০ শতাংশের মতো মানুষের পরনের পর্যাপ্ত পোশাক, কিংবা পর্যাপ্ত খাদ্য, কিংবা দুটোই নেই বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এরা জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ, কিংবা সংখ্যার বিচারে ১০ লক্ষ। ... সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চলে এবং সবচেয়ে ভাল সময়েও দরিদ্রতম শ্রেণীগুলি সপ্তাহে এক বা দু বারের বেশি পেট পুরে খেতে পারে না। .... ডোম বাদে, সব জাতের এমনকী সবচেয়ে গরীব মানুষেরও অন্তত একটা ধাতুর থালা ও একটা ধাতুর বাটি থাকে। রান্নার বাসনপত্র ও জলের পাত্র হয় মাটির। অজন্মার বছরে ধাতুর বাসনগুলি বিক্রি করে দেওয়া হয় প্রথমেই, এবং হালে এমনটা বারবার ঘটছে বলে এর ব্যবহারও উঠে যাচ্ছে। .... গরম কালে গবাদি পশুগুলি দিনের বেলায় সর্বসাধারণের রোদে পোড়া মাঠে শুকনো ঘাসের গোড়া চেটে বেড়ায়, আর সন্ধ্যা হলে যখন তাদের তাড়িয়ে গোয়ালে নিয়ে আসা হয়—খেতে দেওয়া হয় আস্ত কিছু বিচালি। ... (মজুররা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছিল) দারোয়ান, পিওন ইত্যাদি, এবং চটকলে তাঁতির কাজ করার জন্য। বিশেষভাবে, শেষের কাজটি করত জোলা সম্প্রদায়ের লোকেরা, হাওড়ার মিলগুলি গয়া-র জোলা-য় ভর্তি।" (*এন ডি জি* ১২৬)।

উপরে বর্ণিত উনবিংশ শতাব্দীর শেষের গয়া জেলার এই মানুষগুলি যে পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর চেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত ছিল—তা নয়। ইংরেজরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমির স্বত্ব ও খাজনা স্থির করে দিয়ে মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে স্থায়িত্ব দিয়েছিল। যেহেতু হাওড়ার চটকলগুলির পুরো মুনাফাটাই তখন যেত ইংরেজ মালিকদের হাতে, সেগুলিতে শস্তা শ্রমের যোগানের জন্য এমন একটা কিছু তো করতেই হত—যা অল্প হলেও ধরা পড়েছে গ্রিয়ারসনের সতর্ক সমীক্ষায়। তিনি তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া* রচনার কাজে। কিন্তু, ইংরেজ শাসকশ্রেণী পছন্দ করত কিপলিং-এর লেখা, কেননা তিনি তাঁদের জন্য বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন 'অরাজক নিম্নজাতি'-র উপর প্রতিষ্ঠিত এক সাম্রাজ্যের মাহাত্ম্য।

১০.৬ এই কালপর্বের শেষ দিকে ধর্মের বাধা অতিক্রম করে নতুন লোকবিশ্বাসগুলির উদ্ভব ঘটেছিল এবং, তা ছিল হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের অভিন্ন গ্রামীণ জীবনের এক অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। মার্কো পোলো ও ইবন বতুতা সিংহলের অ্যাডাম পর্বত চূড়ার একটি পদচিহ্নে বৌদ্ধ,

মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের একইসঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখেছিলেন। আসাম ও বাংলায় (*এম ই আই,* ৩.৪৬৩, ৩.৫১২) এটা রূপ নিয়েছিল কোন দেবতা বা অবতাররূপী সন্ত পীরের উদ্দেশ্যে যৌথ তীর্থযাত্রার। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সত্যপীর—অষ্টাদশ শতাব্দী শুরুর আগে যাঁর পূজার প্রচলনের সপক্ষে সতিকারের কোন প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে মনে হয় না; যদিও রামেশ্বর ভট্টাচার্য নামের এক ব্রাহ্মণ রচিত *সত্যপীরের কথা* (বাংলা ভাষায়, সম্পাদনা-শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০)-র মতো হিন্দু পাঁচালীগুলির মাধ্যমে এই সন্ত-এর জীবনকথার দ্রুত উন্মোচন ও জনপ্রিয়তা লাভ ঘটেছিল। এই পূজো সারা ভারতে সত্যনারায়ণ ('প্রকৃত নারায়ণ') পূজার রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তা ছিল ধর্মীয় অনুমোদন, বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মুনাফা, বা কোন নির্দিষ্ট তিথি-র বন্ধন থেকে মুক্ত এক সর্বজন পালনীয় জনপ্রিয় হিন্দু অনুষ্ঠান। তাছাড়া, বহু হিন্দু গ্রামে, যেখানে কোন মুসলমান বাস করত না সেখানে *তাজিয়া* বানানোর জন্য প্রায়শই মুসলমানদের নিমন্ত্রণ জানানো হত; বিদেশীদের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমান উত্তেজনা সৃষ্টির আগে পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৮) শিক্ষা মুসলমান ও হিন্দু উভয়কেই আকৃষ্ট করেছিল, ঠিক যেমন করেছিল তাঁর প্রায় সমসাময়িক মুসলমান জোলা কবীরের (১৪৫৫-১৫১৭) দোঁহাগুলি। এমনকী হিন্দু বাবা-মা'রাও, আজও তাদের সন্তানদের কবীর সম্প্রদায়ে সঁপে দেয়। ইসমাইলি খোজাদের (*এনথোভেন* ২.২১৭ পরবর্তী) সঙ্গে তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের বিরোধ (ইংরেজদের প্ররোচনা সত্ত্বেও) তুলনামূলকভাবে কম থাকার কারণ তারা কিছু হিন্দু প্রথা গ্রহণ করেছিল। নিচু জাতের মতিয়া কুণবিদের (এনথোভেন ২.১৫০) বর্ণনা করা হত 'আধা হিন্দু আধা মুসলমান বলে।' আকবর বিভিন্ন ধর্মের সংশ্লেষে নিজের নেতৃত্বে এক পরীক্ষামূলক রাষ্ট্রধর্ম সৃষ্টির দ্বিধাগ্রস্ত প্রয়াস চালিয়েছিলেন; কিন্তু সেই নতুন পদক্ষেপ সযত্ন পরিকল্পনাপ্রসূত বা কোন শক্তিশালী শ্রেণীর প্রয়োজনের উপর ভিত্তিশীল ছিল না। কোরানের পরমত-অসহিষ্ণু ধর্মতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠার ভান করে মুসলমান আপসবিরোধিতা নতুন ধর্মমতগুলির এই সমন্বয় প্রচেষ্টাকে প্রথমে বেশিদূর এগোতে দেয়নি। পরে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি ভারতের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যেকার বিরোধকে উস্কে দিয়েছে। উৎপাদনক্ষমতার বেদনাদায়ক অভাবই যে এই সমস্ত পদক্ষেপের মূলে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। ঔরঙ্গজেবের ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের পক্ষে যে কোন উপায়ে—তা যতই ক্ষতিকর হোক না কেন—খাজনা আদায় করাটাই ছিল বড় কথা; আর্থিক প্রয়োজনেই জিজিয়া করের পুনঃপ্রচলন ও হিন্দু-বিরোধী অবস্থান নিতে হয়েছিল। ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনটা ছিল নব্য ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর, অন্ততপক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতায় ভাগ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা-দমন করা। অবস্থাটা ছিল, মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হলেও তাদের হাতে ছিল মোট সম্পদের এক-নবমাংশেরও কম। সম্পদের এই অংশও, তার ওপর, আবদ্ধ হয়ে ছিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-মালিকানায়, আধুনিক পুঁজিতে (ব্যাঙ্ক, কারখানা, শেয়ার-লগ্নি) রূপান্তরিত হয়নি। অর্থাৎ, মলিকানাটা এসেছিল পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক ভোগদখল থেকে, যেভাবে এসেছিল বাস্তবিকই অদক্ষ কৃষি ব্যবস্থাটাও; কিন্তু প্রকৃত নিয়ন্ত্রণটা কায়েম হয়েছিল জমিদারদের পরগাছা বংশানুক্রমিক কুসীদজীবী, বাজারে কেনাবেচার একচেটিয়া মধ্যস্থতাকারী দালাল, এবং সেরেস্তার দুর্নীতিপরায়ণ দেওয়ানদের হাতে—যার ফলে পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থায় বিবর্তিত হওয়াটা

কার্যকরভাবে রুখে দেওয়া হয়েছিল। ধর্মীয় উত্তেজনার আড়ালে ছিল এক প্রকৃত অর্থনৈতিক উত্তেজনা—যা ধর্মতত্ত্বের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, আর বিদেশী শাসকরা সেটাকেই কাজে লাগিয়েছিল।

জাতপাতের বিষয়টা ছিল অর্থনৈতিক বর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত। একই পরিমাণ জমির জন্য ব্রাহ্মণদের সামগ্রিকভাবে কম কর দিতে হতো। অংশত, এটা দাবি করা হত প্রাচীন বিশেষাধিকার হিসেবে। যুক্তপ্রদেশে কোন ব্রাহ্মণ হয়ত ছিল অশিক্ষিত, কিন্তু সে হুমকি দিতে পারত নিজের রক্ত ঝরানোর, কোন শিশুকে হত্যা করার, পরিবারের কোন বৃদ্ধাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার, বা আমৃত্যু উপবাস করার; সেই পাপের বোঝা বইতে হবে সামন্তপ্রভুকেই। কখনো কখনো এই ধরনের কাজ করা হত জমির মালিকানার কোন দাবিদারের সমর্থনে (*ডি আর* ১, পরিশিষ্ট ১৪)। গোবিন্দচন্দ্র গাহড়বালের (তৃতীয় অধ্যায়, ১৫নং টীকা) দান করা প্রাচীন নগ্বা (বর্তমানে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এখানেই অবস্থিত)-র উত্তরাধিকারীরা তাদের করমুক্ত চাষের বিশেষাধিকার বজায় রাখা ও সম্প্রসারিত করার জন্য চরম পদক্ষেপেরই আশ্রয় নিয়েছিল ঃ

'নুগওয়া-র মতো কিছু কিছু গ্রামে প্রায় ২০০০ ব্রাহ্মণ অধিবাসী একত্র বাস করে এবং তারা সকলেই ভালো ও সুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে যাতে লাভজনকভাবে তারা তাদের ভূমিকর্ষণ ও চাষবাস চালিয়ে যেতে পারে। এই গ্রামে জমির পরিমাণ প্রায় ১৫০০ বিঘা, আর এই জমি তাদের ক্ষমতার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলে পায়কস্ত (চুক্তিবদ্ধ) রায়ত হিসেবে তারা আরও ২০টি গ্রাম জুড়ে তাদের কৃষিকাজ সম্প্রসারিত করেছে, কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটিতেই রাজস্ব দেওয়ার ব্যাপারে তারা তাদের অপরিমিত অনৈতিকতার পরিচয় দেয়, ক্ষুর হাতে নিয়ে সব সময় তৈরি থাকে (নিজের অঙ্গচ্ছেদের জন্য)। আমি শুনেছি, এদের মধ্যে ২০৩ জন পূর্বতন এক আমিল-এর পাল্কিবাহক মীর শরফ্ আলির সামনে নিজেদের অঙ্গচ্ছেদ করে, যার ফলে এমন দাঙ্গা হয়েছিল যে মীর দ্রুত একটা নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পায়। এর পরেই অবশ্য রাজা চৈত সিং তাদের মধ্যে এক মুসলমান জমাদার পাঠান এবং সে তাদের প্রচণ্ড শাস্তি দেয়। (*ডি. আর,* পরিশিষ্ট এইচ, পৃ. ২৩-২৪)'।

সেই সময়কার যুক্তপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের প্রচণ্ড অজ্ঞতা, সাধারণভাবে সম্পূর্ণ অশিক্ষার কথা যখন মাথায় রাখা হয়, বোঝা যায় যে অধঃপতিত বর্ণব্যবস্থা তার সামাজিক কার্যকারিতাকে অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছিল—এমনকী, হিন্দু ধার্মিকতার কেন্দ্রস্থল খোদ কাশীতেও। অবশ্য, ইতিহাসের গতিতে এই প্রথার অবসান ঘটতে পারে কেবলমাত্র উৎপাদন পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন, অর্থাৎ শিল্পায়নের মাধ্যমে। ক্ষণকালীন অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে অর্জন খুব সামান্যই। ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্ভিক্ষের সময় দেখা গেছে যে বিপুল সংখ্যক ক্ষুধার্ত মানুষ তথাকথিত নিচু জাতের হাতে রান্না করা খাবার খেতে অস্বীকার করছে। বিপুল সংখ্যক লোক অনাহারে মৃত্যুকেই বরং বেছে নিয়েছিল। জনগণনার প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, অনুশাসন ভাঙা মানুষদের মধ্য থেকে কিছু নতুন বর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকেই, নিঃসন্দেহে ক্ষিধের জ্বালায় গোপনে খাদ্যাখাদ্যের বিধিনিয়ম ভেঙেছিল, কিন্তু তাতে বর্ণব্যবস্থার কোন ক্ষতি হয়নি। তার কারণ জনগণের ব্যাপক অংশই থেকে গিয়েছিল সেকেলে উৎপাদন ব্যবস্থা সহ তাদের গ্রামজীবনের অচলায়তনে—যেখানে জমিদার ও কর আদায়কারীদের শোষণের হাত থেকে

বাঁচার জন্য, তাদের জ্ঞাত একমাত্র পদ্ধতিই ছিল জাতপাতের ভিত্তিতে গোষ্ঠী সংহতি বজায় রাখা। ইংরেজরা প্রত্যক্ষ আইনগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শুধু কতকগুলি নরঘাতী প্রথারই বিলোপ ঘটিয়েছিল (*ডি. আর* ১ পি. সি (পরিশিষ্ট); ১৩৫-৬ ১৪০-১), বর্ণপ্রথাকে স্পর্শও করেনি।

জমিদাররা আইনগত ছলচাতুরিতে নিজেদের আত্মীয়-পরিজন, উচ্চবর্ণীয় প্রজা ও ব্রাহ্মণদের আনুকূল্য দেখাতে পেরেছিল : জমি দিয়েছিল, পাওনা খাজনা না মেটানোর জন্য আদালতে অভিযোগ করেছিল, কিন্তু মামলায় জোর দেয়নি; ফলে প্রজা আদালতের এমন রায় পেয়েছে যে সে যতটুকু খাজনা শোধ করেছে সেটাই চুক্তিমাফিক এবং এতে কম খাজনায় তার প্রজাসত্ব সুনিশ্চিত হয়েছে। সবশেষে, নতুন এক শ্রেণীর মানুষ, ব্রিটিশ কালেক্টর অফিসের আমলারা নিজেদের নামে খাজনা দিতে শুরু করেছিল এবং এইভাবে নিরক্ষর কিছু কৃষকের জায়গায় নিজের নাম মালিক হিসেবে নথিবদ্ধ করেছিল। এই কৌশলের বিলোপ ঘটে অধিকারভুক্ত জমির পূর্ণাঙ্গ নথিভুক্তি ও ঘন ঘন পরিদর্শন সহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলনের ফলে। ব্রিটিশ-পূর্ব আমলে অবশ্য এই ধরনের কোন লোক বা কর-ইজারাদারের পক্ষে শুধুই নিজের নামে খাজনা দিয়ে তার পছন্দসই কোন জমির মালিক হওয়া সহজ ছিল, তবে যদি সে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে—গায়ের জোর, উপজাতি প্রথা, জাতপাতের ফাঁকফোকর ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে—সেই জমির দখল নিতে পারত।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঔরঙ্গজেবের আমল অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তিমকালকে বহু বিদেশী পর্যবেক্ষকই নিরীক্ষণ করেছেন :

তুরস্ক, পারস্য ও হিন্দুস্থান এই তিনটি দেশ জমি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে 'এটা আমার, ওটা তোমার' এই নীতি পরিত্যাগ করেছে; এবং পৃথিবীতে যা কিছু উৎকৃষ্ট ও কার্যোপযোগী তার ভিত্তি যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার তার ওপর আস্থা হারিয়ে ... আজ হোক বা কাল তারা বুঝতে পারবে কি ভুল করেছে, যার পরিণাম — অত্যাচার, ধ্বংস, ও দুঃখদুর্দশা। হে প্রভু, আমাদের কত আনন্দ ও কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত যে পৃথিবীতে আমাদের এই অংশে রাজারাই জমির একমাত্র মালিক নয়। ... যেহেতু, বাধ্য না করলে জমি কদাচিৎ চাষ করা হয়, এবং জলের সুবিধার জন্যে কেউই কূপ ও খাল সংস্কার করতে ইচ্ছুক বা সক্ষম নয়, তাই গোটা দেশে চাষবাস বড় একটা হয় না, এবং সেচের অভাবে দেশের একটা বড় অংশই নিষ্ফলা হয়ে থাকে। ... প্রচণ্ড ও সর্বজনীন অজ্ঞতাই সমাজের এরকম একটা অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। ... উৎপাদিত সামগ্রীর উন্নত মান থেকে এই ধারণা করা উচিত নয় যে কারিগরদের খুব সম্মান জানানো হয় বা তারা স্বাধীন অবস্থায় পৌঁছেছে। নিছক তীব্র প্রয়োজন বা লাঠি—পেটা খাওয়ার ভয় ছাড়া অন্য কিছুই তাকে কর্মরত রাখতে পারত না; সে কখনোই ধনী হতে পারে না, এবং যদি ক্ষুন্নিবৃত্তি ও সবচেয়ে মোটা কাপড়ে দেহের আচ্ছাদনের সংস্থান করতে পারে তাহলে সেটাকে মোটেই কোন তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে করে না। অর্থ রোজগার করলে সেই অর্থের যথাযথ অংশ তার পকেটে যায় না, বরং শুধুই সিন্দক ভরায় ব্যবসায়ীর—যে তার উর্দ্ধতনদের (সামন্ত অভিজাতরা) দৌরাত্ম্য ও নিপীড়নের হাত থেকে কিভাবে এদের বাঁচানো যায় তা নিয়ে আদৌ ভাবিত নয়। ... 'বকেয়া-নবিস', অর্থাৎ সমস্ত খবরাখবর জানানোর জন্য (মোগল সম্রাট) যে লোকগুলিকে প্রদেশগুলিতে পাঠিয়েছিলেন তারা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল—তা না হলে, প্রায় সবসময়েই যা হয়ে থাকে, তারা ঘুষ খেয়ে একটা আপস রফায় আসে, আর পাঁচজনের মতো তারাও তো লোভী। ... নিজের রাজস্ব ও

পৈতৃক সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে খেয়ে পরে আছে এমন কোন জমিদার, অভিজাত বা ধনী ভূস্বামী পরিবার পাওয়া যাবে না। ... রাজা (সভাসদদের) সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী বলে, বোঝা যায় যে, সভাসদদের পরিবারগুলি তাদের গৌরব নিয়ে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। .. কোন ওমরাহের পুত্রেরা বা অন্তত পৌত্ররা, হামেশাই তাদের পিতার মৃত্যুর পর ভিক্ষা করার পর্যায়ে চলে যায়, এবং কোন ওমরাহের অধীনে সৈনিকের কাজ নিতে বাধ্য হয়।'

মনুচ্চি (২.৪৫১-২) খাজনা আদায়ের ব্যাপারটাকে বর্ণনা করেছেন নিঃস্ব জনগণের বিরুদ্ধে বিরামহীন সামরিক তৎপরতা ও ডাকাতি বলে। তাদেরকে কোন অধিকারহীন বিজিত শত্রু হিসেবে গণ্য করা হত। কৃষকদের বাধ্য করা হত অভিযানের সময় কুলি ও শিবিরের বেগার মজুর হিসেবে কাজ করতে। কখনোসখনো, জাঠদের মতো কৃষকদের কোন গোষ্ঠী (*মনুচ্চি* ২.৩১৯-২১) অস্ত্র হাতে নিয়ে সমস্ত খাজনা আদায় বন্ধ করার কাজে নেতৃত্ব দিত—যা ছিল বিদ্রোহের সমান। টলমল করতে থাকা সাম্রাজ্যের রাজধানীতে একেবারে কাছে কিকান্দ্রায় আকবরের কবরস্থানে লুঠপাট চালানোর ও তাঁর অস্থি পুড়িয়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিও তাদের ছিল। ডাকাতরা স্বাভাবিকভাবেই ওৎ পেতে থাকত সব রাস্তায়, যদিও খাজনা-আদায়কারীদের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর তারা ছিল না। ভেনিসীয় পর্যটক তাঁর বর্ণনা শেষ করেছেন এই কৌতুককর মন্তব্যটি দিয়ে, 'এখানে আমাদের ইতালীয় প্রবচনটিই প্রযোজ্য : বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খায়' (৪.৪০৯)। এটাই, এককথায়, মাৎস্যন্যায়—যা রোধ করা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করা হয়েছিল *অর্থশাস্ত্র* ও *মনুস্মৃতি*-তে।

কোলবার্ত-কে লেখা এই চিঠিতে (বার্নিয়েরের[৮] ১.২৬৯-৩৩০; অনু. ২০০-২৩৮) কোন প্রকৃত উত্তরাধিকারহীন এক ক্ষয়প্রাপ্ত সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে দেকার্ত ও গস্‌সেন্দির-র দর্শন চর্চা করা এক ফরাসী বুর্জোয়ার প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে। তাঁর সদ্য জাগ্রত বুর্জোয়া চেতনা ক্ষণকালের জন্য সামন্তপ্রভুর নিশিডাকে ভুলেছিল। ফ্রান্সে *লি দ্য জাস্টিস* ['বিচারের শয্যা']-এর গন্ধ তখনও নাকে লেগে আছে, নিজস্ব ধরনে ষোড়শ লুই-ও ঔরঙ্গজেবের মতোই সার্বভৌম শাসক ছিলেন। কিন্তু শ্রেণী-ভিত্তি ও উৎপাদন সম্পর্কটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বুর্জোয়া অর্থনীতি যেটাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছিল তা হল ফ্রান্সে বণিকদের থেকে শুল্ক আদায়, মুনাফার ওপর কোন কর নয়। ঘটনাটা হলো, কোলবার্ত আর্থিক বিষয়ের সরকারি তত্ত্বাবধায়ক হতে পারতেন—যা ফ্রান্সের উদীয়মান শ্রেণীর অবস্থানকে স্পষ্ট করে। নিরাপত্তাহীনতা ভারতীয় বন্দর-নগরীগুলিতে ধনী বণিকদের উদ্ভব রোধ করতে পারেনি, কিন্তু তা বার্নিয়ে-র চোখ এড়িয়ে গেছে। সুরাটের বিজিভোরা (মোরল্যান্ড,[৯] গ. ১৫৩-৫)-র খ্যাতি ছিল 'পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী বণিক' হিসেবে, তাঁর আঘোষিত সম্পদের পরিমাণ ছিল কোটি কোটি টাকা। ১৬৪২-এ সুরাটে ইংরেজরা তাঁর বাণিজ্যিক একচ্ছত্রকে নাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চার বছর পরেও তিনি তা শক্ত হাতে ধরেছিলেন; প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘমেয়াদী লেনদেনে অর্থ যোগানের ব্যাপারে ইংরেজ বণিকরা তাঁর ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হত আর তিনিও তা করতেন স্বেচ্ছায়। তা সত্ত্বেও, ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এখানকার প্রাদেশিক শাসক তাঁকে স্বল্পকালের জন্য কারারুদ্ধ করেন; কিন্তু সেই শাসককে দিল্লির দরবারে ডেকে পাঠানো হয় এবং তাঁর পদচ্যুতি ঘটে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, এর পেছনে ঐ বণিকপ্রবরের কাছ থেকে উপঢৌকন পাওয়া তাঁর রক্ষাকর্তারা প্রভাব খাটিয়েছিল—কেননা এই বিচারের কোন নথিপত্র কোথাও পাওয়া যায়নি।

ফতেচাঁদের পরিবারের আদি দেশ যোধপুর এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীতে সরকারি কোন পদ না থাকলেও তিনি জগৎ শেঠ উপাধি ধারণ করে সোনা রূপার কারবার, পোদ্দারী এবং অতঃপর বাংলার অর্থনৈতিক জগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন—কোন সশস্ত্র সেনাবাহিনী না পুষেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁর মদত ছাড়া ইংরেজদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হত না। অন্যদিকে, তিনি বুঝেছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে কারবার করাটাই ধারাবাহিকভাবে লাভজনক, তাই চলতি ১২ শতাংশ হারের সুদের চেয়েও কম হারে তাদের ধার দিতেন। এক সের মাল তখন একশ' মাইল নিয়ে যেতে পরিবহণ খরচ হত আট আনা থেকে বারো আনা; তার ওপর যুক্ত হত রক্ষীদের খরচ এবং সম্রাট কিংবা সামন্ত জমিদারদের ধার্য করা শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য দেয়। খেয়ালখুশিমতো রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকানা ঘোষণা, বা বিশেষ কর চাপিয়ে তা কায়েম করা হত—যেমন ১৬৩৩ সালে নীলের ওপর ৩৩ শতাংশ কর ধার্য করা হয়েছিল; বাজারদর যখন ২৭ টাকা তখন সরকারের প্রতিনিধিকে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হত ১৮ টাকা দরে। ভারত থেকে তখন যে শোরা রপ্তানি করা হত ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তা পরিণত হয় রাষ্ট্রের একচেটিয়া কারবারে। মীর জুমলা বিধিবহির্ভূতভাবে ঢাকার এক শস্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫০,০০০ টাকা দাবি করেছিলেন, তাদের দুই নেতাকে মারধর করে ২৫,০০০ টাকা আদায় করেছিলেন, এবং শহরের মহাজনদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন আরো ৩,০০,০০০ টাকা। সুরাটের মতো বন্দরগুলিতে যেহেতু একজন মজুরের মাসিক বেতন ছিল দু'টাকা বা তারও কম তাই সেখানে স্থানীয় পণ্যোৎপাদকদের বিকাশ ঘটেছিল নিছকই প্রয়োজনের তাগিদে এবং ইংরেজ তত্ত্বাবধায়কদের অধীনে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হিন্দু ব্যবসায়ীরা উদ্যোগী ভূমিকা নিতে নিরুৎসাহিত হয়েছে জাতপাত এবং মুসলিম আধিপত্যের কারণে। মুসলমান ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে কিছুটা গুরুত্ব পেলেও তাদের আগ্রহ ছিল সামন্ত জমিদার হয়ে ওঠার। রাজবংশজাত মাহ্‌মুদ গাওয়ান ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি, বাহমনি রাজাদের সুযোগ্য মন্ত্রী ও রাজনীতিজ্ঞ। তিনি নিজের ও তাঁর পোষ্যদের ভরণপোষণের খরচ পুরোটাই জোগাড় করতেন তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি থেকে (*ফেরিস্তা* ২.৫১১-১৩); জায়গীরের আয় খরচ করতেন নিজের সেনাবাহিনীর বেতন দিতে, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় করতেন দান-খয়রাতে। তাঁর পরবর্তীকালে, মীর জুমলা ও অন্য প্রাদেশিক শাসকরা নিজেদের পদমর্যাদার অপব্যবহার করে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হতেন—হয় প্রত্যক্ষভাবে, না-হয় এক বা একাধিক ব্যবসায়ীকে তাদের অংশীদার হিসেবে নিতে বাধ্য করে। ইস্পাহানের জনৈক তেল-বিক্রেতার এই সন্তান একে একে গোলকোণ্ডার হীরা-ব্যবসায়ী ও খনির মালিক, সামন্ত অভিজাত, বিজাপুরের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, শিবির ত্যাগী এবং পরিণতিতে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি হন। এই ধরনের জমিদাররা বিশেষ একচ্ছত্রতা দাবি করত, জিনিসপত্র বিনাশুল্কে (রাজকর্মচারী হিসেবে) কিনে এনে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যে বিক্রি করে দিত। বণিক-পুঁজিবাদের ওপর সামন্ততান্ত্রিক বিশেষাধিকার ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আরো বেশি অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকরা নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত করেছিল জলদস্যু, ডাকাত ও ঘরশত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজারা স্থানীয়ভাবে যেসব ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল তারা অবশ্যম্ভাবীভাবেই তাতে অংশ নিতে, এবং পরে পরস্পরের সঙ্গে ও সাধারণ ভারতীয়দের সঙ্গে লড়াই করতে শুরু করে। পলাশীতে ক্লাইভের জয়লাভের (১৭৫৭) পর, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

যখন বাংলায় সামন্ততান্ত্রিক স্বত্ব অর্জন করল তখন টমাস রো (যিনি পর্তুগীজদের হাল কি হয়েছিল তা দেখেছিলেন) প্রস্তাবিত সামরিক ঝুঁকি ব্যতিরেকে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের যে মূল নীতিতে বর্জন করা হয় আরো বেশি লাভজনক এক নীতির পক্ষে। সুদ খাটানোয় ইসলাম ধর্মের নিষেধাজ্ঞা বিনিময় প্রথার মাধ্যমে মূলধন-সংগ্রহের সবচেয়ে আদিম সুযোগকে মুসলমানদের কাজে লাগাতে দেয়নি। শেষপর্যন্ত, বিনয়ী পার্সী দালালরাই প্রথম ইংরেজদের ধারায় পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হল, এবং তাদের দ্রুত অনুসরণ করল হিন্দু দালাল আর সুদখোররা।

আর মাত্র একটা মন্তব্য করা প্রয়োজন : বণিকরা শ্রমিকদের সংঘগুলির মদত পায়নি, সেগুলির বিলুপ্তি ঘটেছিল কয়েক শতাব্দী আগেই। সুদখোররা রমরমিয়ে উঠেছিল, কিন্তু যেসব জমিদার টাকা ধার নিত তাদের কাছ থেকে তা আদায়ের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তাদের নিজস্ব সংগঠনগুলির অভাব ছিল অস্ত্রের (এবং বর্ণের কারণে তা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্তও ছিল), যেটা বিদেশীরা ব্যবহার করতে পারত। শিবাজী দু'বার সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য-বন্দর সুরাট লুঠ করেছিলেন, মুঘল সৈন্যরা তাতে বাধা দেয়নি। কিন্তু সেইসঙ্গে ব্রিটিশ 'কারখানা'টিকে মুক্তিপণ হিসেবে দখল করতে তিনি ব্যর্থ হন। কারখানাটির একটা দেওয়াল ছিল এবং রক্ষিত হত খুবই অনুন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে, যদিও হানাদারদের ঠেকিয়ে রাখার পক্ষে সেগুলি তখনও ছিল যথেষ্ট। গায়ের জোরে উদ্বৃত্ত নিংড়ে নেওয়ার সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র যেহেতু উৎপাদনকেই কমিয়ে দিয়েছিল তাই তা নিজেকেও সচল রাখতে পারেনি। বিফলতার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে গিয়েছিল। রাজনৈতিক, আর্থিক, প্রশাসনিক, সামরিক—সব দিক থেকেই। এটা অবশ্য ভারতীয় চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য যে, ঔরঙ্গজেবের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াটা ছদ্মবেশ নিয়েছিল ধর্মের, যেমন মূল শোষণটাও নিয়েছিল। জাঠ, মারাঠা, রাজপুত অভ্যুত্থানগুলি ক্রমশই বেশি বেশি করে জোর দিয়েছিল তাদের হিন্দুত্বের ওপর, যদিও এতদিন পর্যন্ত মুসলমান শাসকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল ভালই। শিখ ধর্ম এই সময় থেকেই অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে গুরু গোবিন্দ সিং-এর নেতৃত্বে সামরিক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে। ঔরঙ্গজেবের নিজস্ব অভিজাতদের শিবির পাল্টানো সমেত আফগান বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে মূল কারণটা ধর্মীয় ছিল না। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ঠগীদের মতো দস্যুদের প্রকোপই শুধু বাড়িয়েছিল, যাদের মধ্যে, যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যসূচক যে, নরবলি প্রথার চল থেকে গিয়েছিল। এইভাবে, ভারতবর্ষ, যথেষ্ট পরিমাণে প্রাথমিক মূলধন থাকা সত্ত্বেও, তার বিশেষ ধরনের সামন্ততন্ত্র থেকে নিজস্ব কোন বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম দিতে পারল না। শুক্রাণুটা আনতে হল বাইরে থেকে।

১০.৭ ভারতীয় সোনা, ভারতের বাণিজ্য থেকে অপরিমেয় মুনাফা, এবং পরবর্তীকালে, ভারতীয় যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল, ভারতে নয়, ইংল্যাণ্ডে। এটা সম্ভব হত না, যদি না প্রাথমিক মূলধন ও বিনিময়যোগ্য পণ্য-পুঁজিকে আধুনিক পুঁজিতে রূপান্তরিত করার মতো পর্যাপ্ত প্রায়োগিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটত এবং এই আধুনিক পুঁজিই যন্ত্র ও তার অতিরিক্ত কিছুর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। আমেরিকার (ভারতের সোনার জন্যে পথ খুঁজতে গিয়ে এর আবিষ্কার ঘটেছিল) সোনা ও রূপা থেকে স্পেনের মুনাফা প্রতিক্রিয়া (রোমান ক্যাথলিক যাজকগোষ্ঠী) ও মৃতপ্রায় সামন্ততন্ত্রকেই শুধু শক্তিশালী করেছিল; পর্তুগালও তার প্রাচ্য-বাণিজ্য থেকে এর চেয়ে ভালো কোন ফল পায়নি—কেননা তার সব ডিমই রাখা ছিল বিজয়নগরের ঝুড়িতে। ওলন্দাজদের অগ্রগতি ঘটলেও, স্থলপথে স্পেন ও ফ্রান্সের এবং

সমুদ্রপথে ইংল্যাণ্ডের চাপ ছিল মারাত্মক। ফ্রান্স তখনও একশ বছর পেছনে, তার বুর্জোয়া বিপ্লবের অপেক্ষায়। কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ডই প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তগুলি পূরণ করেছিল। যখন ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, বা বেলজিয়াম, কঙ্গোর মতো পশ্চাৎপদ দেশকে ইউরোপের পুঁজি সাহায্যের বিষয়টা তুলে ধরা হয় তখন মাথায় রাখা উচিত বিপুল পরিমাণ পুঁজি সাহায্য তাদের কাছ থেকেও ইউরোপ গ্রহণ করেছিল—প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে কাঁচামাল কিনে। ইংরেজরা ভারতে যে পুঁজি লগ্নি করেছিল তা আসলে ভারতের নিজস্ব সম্পদ থেকেই নিংড়ে নেওয়া; 'বাংলা থেকে আদায় করা রাজস্বই [ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে] বাংলায় লগ্নির অর্থ যুগিয়েছিল' (*হান্টার,* ৩০৪)।

পরিশ্রমী পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন, যোড়শ শতাব্দীতে তুর্কিদের স্বপ্ন ছিল ভারত জয়ের; তাঁরা আরো বলেছেন যে, ভূমধ্যসাগরীয় প্রদেশগুলির মতো লোহিতসাগরেও যদি তুর্কি সাম্রাজ্যের জাহাজ তৈরির কাঠ থাকত, তাহলে ভারতের ইতিহাস হত সম্পূর্ণ অন্যরকম। এটা অনেকটা সেই ধরনের ঐতিহাসিক দর্শন, যাতে ক্লিয়োপেট্রার নাক যদি আরও ইঞ্চিখানেক লম্বা হত তাহলে বিশ্ব-ইতিহাসের কী কী পরিবর্তন ঘটত তা নিয়ে গবেষণা করা হয়। তুর্কিরা অনায়াসেই লোহিতসাগরের সঙ্গে নীলনদের একটি শাখার সংযোগ স্থাপনকারী ফারাওদের তৈরি প্রাচীন খালটিকে দখল করতে পারত—যেমনটা প্রথম দারিয়ুস করেছিলেন। পর্যাপ্ত জনবল থাকা সত্ত্বেও তা না-করা এই সহজ সত্যের দিকেই ইঙ্গিত দেয় যে তাদের নিজস্ব অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বুর্জোয়া-ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের শ্রেণী-ভিত্তিই তৈরি ছিল না। কোন তুর্কি মার্কোপোলো বা মিশনারির কথা জানা যায় না। একই কারণে পারস্যের নাদির শাহ্-র ভারত-আক্রমণও (১৭৩৯ খ্রী.) কোন ছাপ রেখে যায়নি। প্রাচ্যদেশীয় একটি সামন্ততন্ত্রের বদলে আর একটি সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা শুধুই বাহ্যিক ব্যাপার। অপরদিকে, মগধের উত্থানের সঙ্গে যে-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, কিন্তু সামন্ততন্ত্র যাকে ব্যাহত-করে, ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাকেই বিপরীত-মুখী করে দেয় : রাষ্ট্র সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার বদলে, সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রদখল করল।

সামরিক ক্ষেত্রে, সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির থেকে বুর্জোয়া পদ্ধতির পার্থক্য প্রতিফলিত হয়েছিল উন্নততর সাজসরঞ্জাম, অনেক নিখাদ আনুগত্য, দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও নৈতিক শক্তির মধ্যে—যে সবের কারণগুলি জানা থাকলেও তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে কদাচিৎ। ইংরেজরা এই দেশটি জয় ও দখল করেছিল ভারতীয় সেনাদের সাহায্যে, তাদের বেতনও দেওয়া হত ভারতের সম্পদ থেকেই। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের সামন্তপ্রভুদের সেনাবাহিনীগুলি হামেশাই ইউরোপীয় প্রশিক্ষক ও গোলন্দাজ বিশেষজ্ঞ ভাড়া করত। গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটা ছিল, ইংরেজরা তাদের সৈন্যদের জন্য ঠিকমতো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করত, প্রত্যেক সৈন্যকে—যুদ্ধ অথবা শান্তির সময়—প্রতিমাসে নিয়মিত নগদ অর্থে বেতন দিত; কেরানী তা আত্মসাৎ করতে বা সেনাপতি আটকে দিতে পারত না। একজন সামন্ত অভিজাত এবং সেই সঙ্গে মণিমুক্তার ব্যবসায়ী, ফরাসী তাভার্নিয়ে (*ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া,* অনু. ভি বল, ২খণ্ড, লণ্ডন ১৮৮৯) লিখেছিলেন :

'আমাদের একশ ইউরোপীয় সৈন্যর পক্ষে এই সমস্ত ভারতীয় সৈন্যর (ঔরঙ্গজেবের দেহরক্ষী) ১০০০ জনকে পরাস্ত করাটা আদৌ কষ্টকর কিছু নয়; কিন্তু অন্যদিকে এ কথাও সত্যি যে তাদের

পক্ষে ভারতীয় সৈন্যদের মতো মিতাচারী জীবনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়াটা ঢের বেশি কষ্টকর। কেননা একজন অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈন্য সামান্য ছাতুর সঙ্গে জল ও আখের গুড় মিশিয়ে ছোট ছোট দলা পাকিয়ে খায়; এবং সন্ধ্যেবেলা, প্রয়োজন হলে, তারা 'খিচড়ি' বানায়— জলে সামান্য একটু নুন, চাল এবং উপরোক্ত নামের শস্যটি (অবিকল উদ্ধৃত) একসাথে ফুটিয়ে। যখন এটা খায়, তারা প্রথমে গলা মাখনের মধ্যে আঙুলের মাথাগুলি ডুবিয়ে নেয়, এবং সৈন্য ও গরীব মানুষ উভয়েরই এটা সাধারণ খাবার। সেই সঙ্গে একথাও বলতে হবে যে, গরমে আমাদের সৈন্যরা মরে যাবে, তারা এই ভারতীয় সৈন্যদের মতো সারা দিন ধরে রোদের মধ্যে থাকতে পারবে না।' (১.৩৯০) ... '১১ সেপ্টেম্বর ফরাসী গোলন্দাজরা সবাই মিলে নবাবের তাঁবুতে (মীর জুমলা, গান্ডিকোট অবরোধ করার পর) গিয়ে চেঁচাতে থাকে যে, চারমাস ধরে তাদের প্রতিশ্রুত বেতন দেওয়া হয়নি এবং যদি তা না দেওয়া হয় তারা অন্য কোথাও চাকরির সন্ধানে চলে যাবে। সব শুনে নবাব তাদের পরের দিন পর্যন্ত শান্ত থাকতে বলেন। ১২ তারিখে গোলন্দাজরা ধৈর্য রাখতে না পেরে আবার নবাবের তাঁবুতে গেলে, তিনি তাদের তিন মাসের বেতন দেওয়ার নির্দেশ দেন, এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে চলতি মাসের শেষে চতুর্থ মাসের বেতন দিয়ে দেবেন। এই টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা একে অপরকে মদ্যপান করিয়ে আনন্দ দিতে থাকে, আর মোট টাকার অর্ধেকেরও বেশি নিয়ে চলে যায় *ব্যালানডাইন* ('নর্তকী')-রা।' (১.২২৮-৯)।

পরবর্তী পেশোয়াদের সময় থেকেই (যেমনটা নিম্নোদ্ভুত সামন্ততন্ত্রের শেষের দিকের যে কোন শাসকের ক্ষেত্রেও) কোন সেনাপতির জয়লাভের প্রতিক্রিয়াটাই ছিল, পাছে সে খুব বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে এই ভয়ে, অতিরিক্ত সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া। রঞ্জিৎ সিং-এর পরবর্তী শিখ শাসকরা তাদের লোকজনকে এত অবিশ্বাস করত যে প্রচণ্ড লড়াই করে ইংরেজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমিও তারা নিয়মিতভাবে ফেলে রেখে চলে যেত। ব্রিটিশ নৌবাহিনী, এমনকী ট্রাফালগারের যুদ্ধের পরও, তার সৈন্যদের নিংড়ে নিয়েছে, বেতন দিয়েছে খুব কম; কিন্তু দেশের বন্দরে পৌঁছনোর পর সেই বেতন দেওয়া হয়েছে, এবং পঙ্গু ও কর্মকালে নিহতদের উপর নির্ভরশীলদের দেওয়া হয়েছে ক্ষতিপূরণ। তাছাড়া, বখশিসও সকলকে নির্ধারিত অনুপাতে সততার সঙ্গে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। অভিযানের সময়, বা সেনা ছাউনির জন্যে সরবরাহ করা সমস্ত রসদের দামও ইংরেজরা দিয়ে দিত। তাদের কাছে যুদ্ধ ছিল আর পাঁচটা ব্যবসার মতোই একটা ব্যবসা—যার খরচ, মুনাফা ও ঝুঁকি সব কিছুরই হিসেব করা হয়েছে অর্থে। এটা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে ঘুষ দিয়ে একজন ভারতীয় সামন্ত-সেনাপতিকে আর একজনের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে ক্লাইভ তাঁর নিজের একটা ছোট্ট সেনাদলের সাহায্যে পলাশীর যুদ্ধ জিতেছিলেন। চার বছর পর (১৭৬১ খ্রী.) আফগানরাজ আহমদ শা দুরানীর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পানিপথের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মারাঠা বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল। বিজয়ী রাজার সৈন্যরা এই যুদ্ধের পর বিদ্রোহ করে, কেননা বছরের পর বছর তাদের বেতন দেওয়া হয়নি। মারাঠারা তাদের আপতকালীন পিন্ডারী দস্যুদের মাধ্যমে অসহায় গ্রামাঞ্চলে লুঠপাঠ চালিয়ে রসদ সংগ্রহ করত। সামন্তপ্রভুদের হাতে, যে-যুদ্ধে লুঠ ও পণবন্দী করে নগদ অর্থ মুনাফা করা যাবে না তেমন অভিযান করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ কদাচিৎ থাকত। ঔরঙ্গজেবের হাতে ছিল তাঁর পৈতৃক কোষাগারের অধিকাংশটাই—যা দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণ শাসনের ফলে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সিংহাসন দখলের জনযুদ্ধের পাঁচ বছর পরই নিজের সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণ ও প্রশাসনিক

কর্মচারীদের বেতন দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া, শাহজাহানের বিপুল ধনসম্পদের মধ্যে নগদ অর্থ ছিল সাকুল্যে ৬ কোটি টাকা; সিংহাসন, মণিমুক্তো, হাতি—এসব দিয়ে চলতি খরচ মেটানো যেত না।

ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের খুঁতগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছিল প্রয়োগগত ব্যর্থতার মধ্যে। কারিগরদের দক্ষতা ছিল পর্যাপ্ত, অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে অনেক উন্নত—টমাস রো ও অন্য বিদেশীরা তা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে শাসক শ্রেণীগুলির অবজ্ঞা এত বেশি ছিল যে এর উন্নতির মধ্যেই যে তাদের উন্নতিও নিহিত তা বুঝতেও পারেনি। ভারতে অঙ্গ-সংস্থাপন শুরু করেছিল সৈন্য-শিবিরের নাপিতরা, কপালের চামড়া কেটে নিয়ে নতুন নাক তারা বানাতে পারত (*মনুচ্চি* ২.৩০১); কুমোররা শক্ত মাটির ছাঁচ দিয়ে হাড় জোড়া দিত—যা আধুনিক প্লাস্টিক ছাঁচেরই পূর্বসূরি। কিন্তু জ্ঞানী ভারতীয় চিকিৎসকরা ব্যস্ত থাকত আবিসেন্নার বই আর ভাগবত নিয়ে। সবচেয়ে বিপর্যয়কর ব্যর্থতা স্বভাবতই ঘটেছিল সামরিক পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে—যেখানকার ত্রুটিগুলিকে বিশেষভাবে সমকালীন সমাজের ত্রুটি হিসেবেই দেখা হয়। সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দুর্গগুলি প্রায়শই গিরিপথগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত, কিন্তু এগুলির প্রধান কাজ ছিল নিজেদের লোকজনের হাত থেকে রাজাকে (তার ধনসম্পদ ও হারেম সমেত) রক্ষা করা। মারাঠা দুর্গগুলির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য, যদিও শিবাজী প্রথমে ছিলেন একজন জনপ্রিয় বিদ্রোহী। উঁচু, দুর্গম জায়গায় অবস্থিত এই দুর্গগুলিতে রসদ সরবরাহ করা ছিল কঠিন, এবং সবচেয়ে সেরা যে কামান তখন পাওয়া যেত তা দিয়েও খুব বেশি এলাকার ওপর আধিপত্য রাখা যেত না; কিন্তু একটা সুবিধা ছিল যে, কোন অবরোধ মোকাবিলা করার পক্ষে পর্যাপ্ত রসদ এগুলিতে মজুত করা যেত। দুর্গের সেনাপতিকে একটা গোপন সংকেত শব্দ দেওয়া হত এবং তার পরবর্তী সেনাপতি তার কানে ফিসফিস করে সেটা বলার পর তার হাতে দায়িত্ব অর্পন করে দিতে হত। এর কারণ রাজকীয় হুকুমনামা জাল হতে পারত এবং প্রায়শ সম্রাটের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুত্রই তা করত। দুর্গ এলাকা ছেড়ে কোথাও গেলে সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলে সন্দেহ করা হত। এই দুর্গগুলির সঙ্গে ইংল্যান্ডের নর্মান সামন্তদের দুর্গগুলির কোন তুলনা চলে না, সেগুলি আশপাশের গ্রামাঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করত। তবে উভয়ের মধ্যে একটা মিল আছে—তা হল, উভয়েই শাসকদের প্রতি জনগণের বিদ্বেষের ইঙ্গিত বহন করে।

যুদ্ধক্ষেত্রে গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহারের কৌশল প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে প্রচলন ঘটলেও, ভারতীয় সেনাপতিরা তা আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বাবরের প্রধান গোলন্দাজ যদি তার প্রত্যেকটি কামান থেকে প্রতি সকালে বারোটা করে গোলা ছুঁড়তে পারত তাহলে তাকে জাদুকর বলে মনে করা হত। বুক সমান উঁচু জায়গায় কামানগুলি বসিয়ে পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদির দুর্দমনীয় বিশাল বাহিনীতে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য সেগুলি থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল, আর আসল জয়টা অর্জন করেছিল পদাতিক বাহিনী। তালিকোটার যুদ্ধে *বিজয়নগরের সেনাপতিরা বোকার মতো গোলাবর্ষণ করেছিল পরিকল্পিতভাবে বসানো* ছটরাগুলির বদলে তামার মুদ্রা ভর্তি অজস্র কামানের এক ঘাঁটিতে। দ্বিতীয়বার গোলাবর্ষণের কোন প্রশ্নই ছিল না, এবং সারাদিন ধরে নিখুঁত সময়মতো পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিজাম আলি রাতের বেলা অবস্থান পরিবর্তনের জন্য দু'বার গোলন্দাজ বাহিনী (তখন সবসময়ই মূল বাহিনীর আগে থাকত)-কে সরিয়ে নিয়ে মারাঠাদের ফাঁদে

ফেলেছিলেন; তারা ভেবেছিল শত্রু সৈন্য পিছু হঠছে, এবং ধারণাটাকে আরও বদ্ধমূল করে দেওয়া হয় বাকি বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়ে। এরপর মারাঠারা একই দিকে ঘন ঘন গোলাবর্ষণ করতে লাগল এবং নেমে এল পাল্টা আক্রমণ। ভারতবর্ষে প্রকৃত গোলন্দাজ বাহিনীর বিকাশ ঘটিয়েছিল ফরাসীরা, বিশেষ করে বুসি—যিনি তোপের সাহায্যে উপদ্বীপ ছাড়িয়ে জিনজি দখল করেছিলেন। দ্রুত কামান দাগা ও সমন্বিত অভিযানের কৌশল, যা বরাবরই নীরস কাজ, ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি—যদিও বিদেশী গোলন্দাজ-বিশেষজ্ঞ ভাড়া করাটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দামুরিয়েজ ও কেলারম্যান এই পদ্ধতির সাহায্যেই ভালমিতে দলে দলে প্রতিবিপ্লবী-বাহিনীকে ধরাশায়ী করেছিলেন। গ্যেটে উপলব্ধি করেছিলেন যে এই কামান আক্রমণ বিশ্ব-ইতিহাসের এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। মারাঠারা তাদের সেনাবাহিনীর অতুলনীয় গতিশীলতার জন্যেই সারা ভারতকে পদদলিত করেছিল, কিন্তু পানিপথের যুদ্ধে—স্বভাবতই তাদের কারণে নয়—সামন্ততান্ত্রিক মর্যাদার কারণে এই বৈশিষ্ট্যকে বলি দেওয়া হয়। মারাঠাদের ভারি কামানগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের পক্ষে ছিল বড্ড জবরজঙ্গ, এবং নারীদের মতোই এক মস্ত বাধা। উভয়কেই পথে কোন দুর্গে নিরাপদে রেখে দিয়ে যাওয়ার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তাকে (আর পাঁচটা যুক্তিযুক্ত পরামর্শের মতোই) পেশোয়ার সেনাপতি সদাশিব রাও ভাউ নিজের ব্যক্তিগত অপমান ও বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্য মূর্খামীর সঙ্গে বদমেজাজের মিলন ঘটেছিল এবং তা তাঁর অনেক বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। কুশলী দুরানি যমুনা নদী পার হতে চাইছেন এ খবর পেয়েও তিনি তা বিশ্বাস করেননি, আফগানদের বিনা বাধায় পার হতে দিয়েছেন। রসদ সরবরাহ ব্যবস্থাটা ব্যর্থ হয়েছিল শুধু এই কারণে যে, সরবরাহকারী পিন্ডারী লুঠেরারা ছিল এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ গোবিন্দ পন্থ বুন্দেলে-র অধীনে, যিনি পাহারার বন্দোবস্ত করার কোন যুক্তি খুঁজে পাননি। একদিন দুপুরে, দিবানিদ্রার সময়, আফগান গুপ্তচর বাহিনীর একটা বড়সড় দল তাঁকে ও তাঁর পিন্ডারী সেনাপতিদের কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে—যারপর থেকে মারাঠা সৈন্যদের রসদ সরবরাহ ব্যবস্থাটা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও, পানিপথের বিপর্যয়ের পর মারাঠারা তাদের শক্তি ও মনোবল যথেষ্ট পরিমাণে ফিরে পায়, যার ফলে তেলেগাঁওতে এক অকল্পনীয় অবস্থানে ইংরেজদের ঘিরে ফেলে এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে তাদের পরাস্ত করে। বড়-গাঁওতে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ চুক্তির পর পুরো ইংরেজ বাহিনীকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তৎক্ষণাৎ চুক্তিগুলি মানতে অস্বীকার করে। কিন্তু, ভারতীয় সামরিক ব্যবস্থার মধ্যেকার ফাটল তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তালেগাঁও-তে মহাড়জি সিন্ধিয়া প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিজের হাতে রাখলেও, আর একটি অংশের দায়িত্ব দেওয়া হয় নানা ফড়নবীসের বিশ্বস্ত এক ব্রাহ্মণের হাতে। মহাড়জিকে সহযোগিতা করা নয়, বিশাল হোলকার বাহিনীর ওপর নজর রাখাই ছিল তার কাজ, কেননা এই বাহিনী শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাতে আগ্রহী বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল। তাছাড়া, নানা-র গোয়েন্দা ব্যবস্থা নিখুঁত ছিল, এবং ইংরেজদের প্রতিটি পরিকল্পনা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানতে পারতেন। কিন্তু, দাক্ষিণাত্যের দুরারোহ গিরিপথগুলি রক্ষার কোন ব্যবস্থা তিনি নেননি, চরম ঢিলেঢালা অবস্থায় রেখেছিলেন। প্রতিরক্ষার সামান্য ব্যবস্থাও ভোরঘাট গিরিপথকে অভেদ্য করে তুলত; যুদ্ধ আদৌ তেলেগাঁও-তে পৌঁছত না। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা কখনই নেওয়া হয়নি, এবং ইংরেজরা এত অনায়াসে তিনবার ভোরঘাট

গিরিপথ অতিক্রম করেছিল যে পুরনো বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণকারী রাজমাচী দুর্গটিও দখল করার প্রয়োজন বোধ করেনি। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস-কে কয়েকটা চোখে পড়ার মতো সামরিক তৎপরতা চালাতে হয়েছিল। এ কাজটা করেছিলেন ওলমে। তিনি উপদ্বীপের মানচিত্রে নেই এমন পথ দিয়ে এসে রাত্রে মই বেয়ে উঠে এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মহাড়জির অধিকৃত গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করে নেন, একটিও গুলিগোলা না ছুঁড়ে। তারপরও মারাঠারা গিরিপথে নজর দেয়নি, এবং যে কামানগুলি তারা বানিয়েছিল সেগুলি সবমিলিয়ে দেখতে ভাল হলেও কাজের যে ছিল না তা পুনার ইস্ট স্ট্রীটে দর্শনার্থীদের জন্য রাখা নিদর্শন কামান দুটি দেখলেই বোঝা যায়। সেকারণে ইংরেজ পদাতিকবাহিনী শেষ মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনীকে (অপ্রত্যাশিতভাবে একটা জলাভূমির মধ্যে ধরা পড়েছিল, যদিও সেটা ছিল তাদের নিজস্ব অঞ্চল!) কিরকি-তে তোপের মুখে উড়িয়ে দেয়। আধডজন ইংরেজ অফিসারের অধীনে দুটি হালকা কামান এবং ৬০০ ভারতীয় সেনা (যার মধ্যে অনেক মারাঠাও ছিল) শেষ পেশোয়ার সেনা বাহিনীর শ্রেষ্ঠ অংশটিকে কোরেগাও-তে পরাস্ত করে। এক দুঃসাহসিক নৈশ অভিযানে মই বেয়ে উঠে যে দুর্গটিকে দখল করার সময় শিবাজী তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে খুইয়েছিলেন সেই সিংহগড় অবরোধ ও দখল করতে গিয়ে ১৮১৮-তে ইংরেজদের কোন ক্ষতিই হয়নি। জয়টা এসেছিল শুধুই একটা পর্বতশিরায় টেনে হিঁচড়ে কামান তুলে দুর্গের ওপর তোপ চালিয়ে; কেননা দুর্গটির সেই পাশে প্রতিরক্ষার মতো পর্যাপ্ত প্রাচীর, বা কোন গোলন্দাজ বাহিনী, বা যথেষ্ট মনোবল, বুদ্ধিমত্তা ও উপযুক্ত নেতৃত্ব সম্পন্ন কোন সেনাদলও ছিল না—যারা তীব্রবেগে আক্রমণকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু এরপর, যখন ভোরঘাট দুর্গের ওপর ডিউক অফ ওয়েলিংটনের গোলন্দাজ বাহিনী ও সেনাশিবির জাঁকিয়ে বসল, তখন যারা তা বসতে দিয়েছিল তেমন কোন সামন্ত শাসকের পক্ষেই পুনা দখলের আশা করাটা ছিল কষ্টকর।

বাংলায় অল্প কিছু কাল ধরে সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে লুঠপাট চালানোর পর ইংরেজদের বুর্জোয়া পদ্ধতির শোষণে থিতু হতে হয়েছিল। এটা ছিল বিশুদ্ধভাবে হিসাব রক্ষা ও খরচের ব্যাপার। যেমন, বেনারসে ব্যবস্থাপনা প্রথমে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ঋণগ্রস্থ রাজার হাতে—যিনি দেনা মেটানো ও খাজনা আদায়ের খরচ মেটানোর মতো পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারেননি। ইংরেজরা অনেক ভালো হিসাব রাখত, অধিকাংশ অসাধুতা ও অত্যাচার বন্ধ করতে পেরেছিল, অনেক কম বলপ্রয়োগের দরকার হত, সুতরাং কর-বৃদ্ধি না ঘটিয়েই অনেক বেশি মুনাফা করতে পেরেছিল

'বহুক্ষেত্রেই প্রাদেশিক শাসন কর্তা সর্বসাধারণের জন্য কোন সমন বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন পিওনই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। ... (অথচ আগের রাজা বলবন্ত সিং) তার অবাধ্য প্রজাদের ভয় দেখিয়ে খাজনা আদায় করার জন্য সবসময়ই অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈন্য ব্যবহার করতে বাধ্য হতেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই প্রায়শ যেতেন তাদের প্রধানদের কাছে এবং সবসময় চক্কর দিয়ে বেড়াতেন নিজের এলাকায়।' (*ডি আর* ১.৪৫)।

এই একই সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তখন থেকে খাজনা-আদায়কারীর মর্যাদার জন্য একজন পরিচারক দেওয়াটাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছিল। তাছাড়া, ঐ জেলায় যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তখন ক্যাপ্টেন বোউযোউনারের নেতৃত্বে ১০০ সৈন্যের শুধু একটা কুচকাওয়াজই শান্তি

শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল, একটা গুলিও ছুঁড়তে হয়নি। খরচ আরও কমে গেল যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে সামন্ত জমিদারদের সৃষ্টি করল; এরা ছিল নতুন মালিকানা-স্বত্ব পাওয়া একটা শ্রেণী যাদের হাতে আগে কখনই তা ছিল না এবং নিংড়ে খাজনা আদায়ের একটা সুনিশ্চিত মাধ্যম-ও বটে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে :

'যদি বর্তমান ব্যবস্থা বজায় রাখা যায়, ব্যক্তিগত প্রয়াস যেমনই হোক না কেন, ব্যবসা বিপুলভাবে বেড়ে উঠবে। ... জমির স্বত্ব যদি উপযুক্ত লোকের হাতে দেওয়া হয়, এবং ভবিষ্যৎ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে আমাদের পুলিশ ও আদালত ব্যবস্থার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেওয়া যাবে, দেশের নিরাপত্তা ও সুবিধা বজায় রেখেই।' (*সিলেকশনস্ ফ্রম রেভিনিউ রেকর্ডস, নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্স,* এলাহাবাদ ১৮৭২)'।

যদি প্রশ্ন উঠত, 'জমির মালিক কে?' উত্তর পাওয়া যেত না—কেননা মালিকানার অর্থ ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে এবং ইউরোপীয় বুর্জোয়া বা আদি-বুর্জোয়া ব্যবস্থায় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। *লাম্বারদার*-দের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল খাজনা আদায়ের এবং তারা শীঘ্রই বুঝল এক নতুন ধরনের মালিকানা-স্বত্ব দাবি করা যেতে পারে, যদিও তারা ছিল গ্রাম-সংঘের প্রতিনিধি মাত্র। অতঃপর সমাধানটা করা হল জমিকে এক নতুন ধরনের স্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে—যা চিরাচরিত বিভিন্ন বাহ্যিক রূপের আড়ালে সন্দেহাতীতভাবেই বুর্জোয়া সম্পত্তি। কলমের এক খোঁচায় এটা করা হয়নি। কিন্তু করা হয়েছিল, এবং এমনভাবে যে, তা প্রত্যাহার করা ছিল সাধ্যাতীত। শেষের দিককার সামন্ততান্ত্রিক খাজনা আদায় পরিণত হয়েছিল কৃষক-লুণ্ঠনে, প্রাচীন প্রথার আবরণে গোষ্ঠীগত সংহতি থেকে কৃষকরা যেটুকু নিরাপত্তা পেতে পারত তার বাইরে আর কোন নিরাপত্তা তাদের ছিল না (*এফ* ও *এম* ১.৩৭৮-৮০)। নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে কর নির্ধারণ ও আরোপণের মধ্য দিয়ে মালিক শ্রেণীকে তার আওতাভুক্ত করা হল। তাদের এই নতুন সম্পত্তিও হল অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো একই আইনের অধীন এবং ব্যবসায়িক পণ্যের মতো অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরযোগ্য। অধিকারটা রক্ষিত হল এক দক্ষ বিচারব্যবস্থা ও সংহত পুলিশ বাহিনীর দ্বারা; এ দুটিই নিয়মিতভাবে বেতনপ্রাপ্ত, কোন সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য-নিরপেক্ষ, এবং আইন মোতাবেক—অর্থাৎ বুর্জোয়া আইন মোতাবেক সকল শ্রেণীর মানুষের ওপর সমান ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।

ভারতীয় বুর্জোয়াদের ধারাবাহিক বিকাশের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ-বিজয় যে বিশাল ফাঁক সৃষ্টি করেছিল তার কথাও মাথায় রাখতে হবে। সামন্তযুগের শেষের দিকের বড় বড় বণিক, লগ্নিকারী, বা একচেটিয়া-ব্যবসার মালিকরা নতুন ভারতীয় বুর্জোয়াতে রূপান্তরিত হয়নি। যে সামন্ততান্ত্রিক প্রাদেশিক শাসকদের ছায়ায় তারা তাদের লাভজনক কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল ইংরেজরা সেই শাসকদের উচ্ছেদ করে নিজেরা শাসক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরও উপড়ে দিয়েছিল। বৃহত্তম ভারতীয় বণিকরা কিছু দিন পরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মুনাফার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের পেছনে কোন শক্তিশালী শ্রমিক-সংঘ বা জনমত ছিল না, বা সেনাবাহিনীর উপর কোন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণও নয়। সুতরাং কোম্পানীর অর্থলোলুপ এজেন্ট—যারা নুন থেকে শুরু করে খাজনা-আদায় সমস্ত লাভজনক সামন্ততান্ত্রিক একাধিপত্য হস্তগত করেছিল এবং সেইসঙ্গে আমদানি-রপ্তানিও—তারা যে কেন বেশিদিন এদের নাকগলাতে দেবে তার

কোন কারণ ছিল না। ইংল্যাণ্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তার বণিকদের স্থান নিয়েছিল শিল্পবিপ্লবের ফসল নতুন শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীরা। কিন্তু তা কোন গায়ের জোরে হঠিয়ে দেওয়া ছিল না—ছিল ঠিক অর্থে নতুন যন্ত্রোৎপাদন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে নব্য প্রভাবশালী অংশীদারদের সঙ্গে সংযুক্তি। ভারতে যারা প্রথমদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে সমানে-সমানে কারবার করে মুনাফা করেছিল তাদের তখন ষোলকলা হয়ে গেছে; এরপর অনেককেই আপেক্ষিকভাবে গুরুত্বহীন জমিদারে রূপান্তরিত হতে হল। ভারতে উপজাতি মানুষদের শেষ উল্লেখযোগ্য অভ্যুত্থান ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল মহাজন, ব্যবসায়ী ও বহিরাগতদের শোষণ করার সম্পূর্ণ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। (*হান্টার* ২৩১-৬০)। সামন্ততন্ত্রের শেষ আলোড়ন ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার পর, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যস্থতাকারী দালালদের মধ্য থেকে যে নতুন শ্রেণীটির উদ্ভব ঘটল তারা অবশেষে নির্ভরশীল হয়েছিল যন্ত্রোৎপাদনের উপর, কিন্তু সে উৎপাদনের সিংহভাগই ছিল ইংল্যান্ডের; কাঁচামাল ও একটি বাজারের পরিবর্তে ভারত তা পেত। ভারতীয় প্রাক-পুঁজিবাদী মূলধন নিজের থেকে সরাসরি যন্ত্রসভ্যতার দিকে যেতে পারেনি, ফলে অগ্রগামী সর্বহারা শ্রেণীরও বিকাশ ঘটেনি—যেমনটা ঘটেছিল ইংল্যান্ডে। যন্ত্রপাতি, কৃৎকৌশল এবং প্রথম কৃৎকুশলীদেরও ইংল্যান্ড থেকে আনতে হয়েছিল। ভারতের পশ্চাদপদতার এটাই প্রধান কারণ। এখানে যারা পারমাণবিক যুগের কথা বলে তাদের তা বলতে হয় অদ্যাপি উপজাতি-স্তরে থেকে যাওয়া স্বদেশবাসীদের কনুইয়ের গুঁতোয় *ঠেলে* সরিয়ে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১. এই বৈশিষ্ট্যগুলি উদ্বৃত হয়েছে মারিয়ন গিবস-এর *ফিউডাল অর্ডার* ('এ স্টাডি অফ দি অরিজিনস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ইংলিশ ফিউডাল সোস্যাইটি') : *পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট সিরিজ,* সংখ্যা ৮, লণ্ডন ১৯৪৭ থেকে। সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন মরিস ডব তাঁর পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত গবেষণায়।

২. উদ্ধৃতিগুলি প্রধানত নেওয়া হয়েছে *দি বুক অফ সের মার্কো পোলো* (অনুবাদ-এইচ উইল, ঐ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে মার্সডেন কর্তৃক সংযোজিত)-এর তৃতীয় খণ্ড (বিশেষ করে ১৭ ও ২৭ অধ্যায়) থেকে; সম্পাদনা-জি বি পার্কস, নিউইয়র্ক ১৯২৭। একমাত্র ১০.১ বিভাগের শেষে উদ্ধৃত অংশটি আমি সরাসরি অনুবাদ করেছি পোলোর শ্রমসাধ্য মূল গদ্য রচনা *Il Milione* থেকে, লুইজি ফোসকোলো বেনেদিত্তো-র বিশ্লেষণমূলক সংস্করণ (ফিরেঞ্জা ১৯২৮)-এর সহযোগিতায়। ইংরেজি ভাষ্যটি শেষপর্যন্ত নির্ভরশীল থেকেছে বোলোগনা-র ফ্রা ফ্রান্সেসকো পিপিনো-র লাতিন-এর উপর—জি বি রামুসিওর *Navigazioni et Viaggi*-র মাধ্যমে। পিপিনো যখন তাঁর গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন মার্কোপোলো তখনও ভেনিসে বাস করতেন। অর্থের মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি, তাই প্রাপ্ত ভাষ্যটিই উদ্ধৃত করা হয়েছে এ বিষয়ে আরও পড়াশোনা করতে চান তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যাঁরা। তাছাড়া, অপরিহার্য পার্থক্যগুলির অস্তিত্ব একটি পোলীয় সূত্রেও আছে (বেনেদিত্তো, ভূমিকা, p. clxix)।

৩. এই অংশে আমার 'অরিজিনস অফ ফিউডালিজম ইন কাশ্মীর' (*জে বি বি আর এ এস*, ১৫০তম বর্ষ-উদযাপন সংখ্যা, বোম্বাই, ১৯৫৬) শীর্ষক লেখাটিরই সারসংক্ষেপ করা হয়েছে।

৪. রাজস্থানী ভাষায় *পৃথ্বী-রাজ রাসো* প্রকাশিত হয় *নাগরী প্রচারিণী সভা গ্রন্থমালা*-র চতুর্থ গ্রন্থ হিসেবে (বেনারস, ১৯০৪)। সংস্কৃত ভাষায় *পৃথ্বী-রাজ বিজয়* সম্ভবত লিখেছিলেন কাশ্মিরী কবি জয়ানক ('১১৭৮ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে', এইচ. বি. সারদা, *জে আর এ এস*, ১৯১৩,২৬১); জোনরাজ-এর একটি ভাষ্যসহ এটি সম্পাদনা করেছেন জি এইচ ওঝা এবং সি শর্মা গুলেরি (আজমীর, ১৯৪১)। বর্তমানে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখা রাজস্থানী ভাষার রচনাগুলির চেয়ে সংস্কৃত রাসোটি শিলালেখ ও জ্ঞাত উপাত্তগুলির অনেক কাছাকাছি বলে মনে হয়। মূঢ়তা ও ফেনিয়ে লেখার দিক থেকে রাজস্থানী রাসোগুলি সংস্কৃতকেও ছাড়িয়ে গেছে। মূল পাঠটি খুঁজে পেলে জয়পুরের রাজস্থান পুরাতত্ত্ব মন্দির-এর *রাজস্থান গ্রন্থমালায়* প্রকাশিত হবে।

৫. *জে এ এস বি* ২৩, ১৯২৭ (সংখ্যা ক্রোড়পত্র ৪০, পৃ. ১৪-১৮)-এ জি এইচ ওঝা কর্তৃক প্রকাশিত; এখানে শ্রী বপ্প-কে অষ্টম শতাব্দীর বলে পাঠ করা হয়েছে; হয়ত ৭৪৩-৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নাগদা-র কাল ভোজ হবেন। তবু, দ্রষ্টব্য *ই আই*, ৩০, পৃ. ৪, ৮-৯)।

৬. টড-এর *অ্যানালস অফ রাজস্থান* (প্রথম সংস্করণ, লন্ডন ১৮২৯; সুলভ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, লন্ডন ১৯১৪)-তে রাজস্থানী প্রথাগুলিকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে— যার অধিকাংশ নেওয়া হয়েছে রাসোগুলি থেকে এবং জীবিত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে। ভুল যেটা করা হয়েছে তা হলো সামরিক শাসনতন্ত্র ইত্যাদিই সামন্ততন্ত্রের গঠনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল এই চিন্তায়।

৭. এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে *বি জে, এম ই আই, ডি আর*, গ্রিয়ারসনের মূল্যবান রচনায় (এন জি জি) এবং অজস্র 'ডিস্ট্রিক্ট সেটলমেন্ট রিপোর্ট'-এ—যেগুলি খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। মহারাষ্ট্রের 'মিরাস' স্বত্ব-র জন্য দ্রষ্টব্য ডব্লিউ চ্যাপলিন : *রিপোর্টস* (অফ দি কমিশনার ইন দি ডেকান; বোম্বাই ১৮২৪), পৃ. ৩১-২; ৫৬-৭৩।

৮. *ভয়েজেস দ্য ফ্রাঙ্কো বার্নিয়ে*, ২খণ্ড, আমস্টারডাম ১৭০৯-১০। লেখক ছিলেন মন্তপেলিয়ে ফ্যাকাল্টির চিকিৎসক, এবং তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, পিয়ের গসেন্দি-র ছাত্র ও শেষ সহযোগী। ঔরঙ্গজেবের রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর আলোচনা (les états du Grand Mogol) সুন্দর বুর্জোয়া ধারণায় রঞ্জিত, অচেতনভাবে তত্ত্বায়নের চেষ্টা সত্ত্বেও এর বিবরণ মূলত সঠিক। কয়েকটি তত্ত্ব মার্কস ও এঙ্গেলসকে ভুল পথে চালিত করেছে, কেননা বন্দর-নগরীগুলির অবস্থা দিল্লি ও আগ্রার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, এবং সম্রাটের 'পাচ-হাজারী' বাহিনীর সেনাপতি আগা দানিশমন্দ খাঁ-র ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে বার্নিয়ে তা সবচেয়ে ভাল জানতেন। তাঁর গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ *ট্রাভেলস ইন দি মোগল এম্পায়ার* (১৬৫৬-১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এ কনস্টেবল-কৃত; ভিনসেন্ট স্মিথ কর্তৃক সংশোধিত, অক্সফোর্ড, ১৯১৪)-তে মূল রচনার স্বাদটি অনুপস্থিত।

৯. মুসলমান শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ডব্লিউ এইচ মোরল্যান্ড-এর গবেষণাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : (ক) *দি অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মোসলেম ইন্ডিয়া* (কেম্ব্রিজ, ১৯২৯): এখানে পরিভাষাগুলির বিভিন্ন অর্থ, বা বিভিন্ন শাসনের সময়কার পরিভাষিক শব্দাবলীর বিভিন্নতা নিয়ে যথাযথ আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলির প্রমিতকরণের (standardization)

সযত্ন প্রয়াস চালানো হয়েছে যা সাধারণ পাঠকের পক্ষে মূল গ্রন্থ বা তার অনুবাদ থেকে করা সম্ভব হতো না। (খ) *ইন্ডিয়া অ্যাট দি ডেথ অফ আকবর* (লণ্ডন ১৯২০)। (গ) *ফ্রম আকবর টু ঔরঙ্গজেব : এ স্টাডি ইন ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্টরি* (লন্ডন ১৯২৩)। মোগল যুগের শেষ দিকে বাংলার সাধারণ অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে দেখুন কালিকিঙ্কর দত্ত-র *স্টাডিজ ইন দি হিস্টরি অফ দি বেঙ্গল সুবা,* খণ্ড-১ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩); এস ভট্যাচার্য-র *দি ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানী অ্যান্ড দি ইকনমি অফ বেঙ্গল ফ্রম ১৭০৪ টু ১৭৪০* (লন্ডন ১৯৫৪)। মারাঠী ভাষায় লেখা এন জি চাপেকর-এর *বদলাপুর* (পুনা, ১৯৩৩) গ্রন্থটিতে বোম্বাই থেকে ৪২ মাইল দূরে ট্রেনে পুনা যাওয়ার পথের ধারের বদলাপুর গ্রামটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নিয়ে প্রশংসনীয় ধৈর্যের সঙ্গে গবেষণা চালানো হয়েছে (যদিও তাতে ধর্মবিশ্বাসগুলির উৎস ইত্যাদি সম্পর্কে অযৌক্তিক সব তত্ত্ব হাজির করা হয়েছে)। এই গ্রন্থটির পর পড়া উচিত বাইরের পণ্য উৎপাদন কীভাবে আরও ক্ষতিসাধন করেছে সে বিষয়ে ঐ একই গ্রাম সম্পর্কে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের কোন বিবরণ।

নির্দেশিকা